সুকুমার রায় সমগ্র রচনাবলী

২

মূল সম্পাদনায়
পুণ্যলতা চক্রবর্তী
কল্যাণী কার্লেকর

সম্পাদনায়
সমীর মৈত্র

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ-১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা ৭০০ ০০৭

প্রথম প্রকাশ :
আশ্বিন ১২, ১৩৬৭
সেপ্টেম্বর ২৯, ১৯৬০

দ্বিতীয় মুদ্রণ :
আশ্বিন ১৭, ১৩৬৭
অক্টোবর ৪, ১৯৬০

তৃতীয় মুদ্রণ :
কার্তিক ৩, ১৩৬৭
অক্টোবর ২১, ১৯৬০

চতুর্থ মুদ্রণ :
কার্তিক ১২, ১৩৬৭
অক্টোবর ৩০, ১৯৬০

পঞ্চম মুদ্রণ :
কার্তিক ১৮, ১৩৬৭
নভেম্বর ৫, ১৯৬০

প্রকাশিকা :
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ : ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

মুদ্রাকর :
মৃণাল দত্ত
একলা প্রিন্টিং প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৭২/১, শিশিরকুমার ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

অলঙ্করণ :
সুকুমার রায়

প্রচ্ছদ লিপি :
সুব্রত ত্রিপাঠী

বাঁধাই :
মহামায়া বাইণ্ডার্স
১২, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রকাশিকার কৈফিয়ত

দেরিতে হলেও সুকুমার সমগ্র রচনাবলী-র দ্বিতীয় খণ্ড পাঠক বন্ধুদের হাতে তুলে দিতে পেরে আজ আমরা আনন্দিত। অনেক বাধা, অনেক সঙ্কট পেরিয়ে এসেছি গত একটা বছর আমরা। যে কথা অতীতে আপনাদের বলার সুযোগ মেলে নি আমাদের।

সুকুমার সমগ্র রচনাবলীর প্রথম খণ্ড ছাপা হচ্ছিল এই শহরেরই কোনো-এক প্রখ্যাত ছাপাখানায়। আমাদের কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই ছাপাখানার কর্তৃপক্ষ নাকি বিদ্যুৎ সঙ্কট জনিত কারণে ছাপাখানার উপর লে-অফ প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন সেদিন। তার পুরোপুরি শিকার হয়ে পড়ল আপনাদের শুভেচ্ছাপুষ্ট এই ছোট্টো এশিয়া। আংশিক সরবরাহ পেলাম একতরফাভাবে মুদ্রক সংস্থার চুক্তি-লঙ্ঘিত বর্ধিত হারে।

যে কারণে গ্রাহক-বন্ধুদের সময়মতো বই দিয়ে উঠতে পারি নি আমরা। উপরন্তু সেই একই বই নূতন করে ছাপতে হয়েছে অফসেটে, বিরাট এক আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে আমাদের এই একই কারণে।

সুকুমার সমগ্র রচনাবলীর পাঠের ক্ষেত্রেও বলতে হচ্ছে—সম্প্রতি আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত সুকুমার সাহিত্য সমগ্র পড়ে আমরা জানতে পারলাম লেখকের বহু লেখার নাকি হদিশ মিলেছে নতুন করে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের শিখায়। অবশ্য উক্ত গ্রন্থের প্রকাশিত দুই খণ্ডে আমরা এমন অনেক লেখা পড়লাম যেগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রন্থে উপেন্দ্রকিশোরের নামে মুদ্রিত হয়েছিল। এমন-কি, স্বয়ং সম্পাদক মহাশয়ের সম্পাদিত মাসিক পত্রিকায় পুরানো সন্দেশ থেকে এই শিরোনামায় বেশ কিছু লেখা মুদ্রিত হয়েছিল—যার লেখক হিসাবে আমরা পড়েছিলাম উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর নাম। হঠাৎ রচনাবলী প্রকাশকালে সেই-সব লেখাগুলিই সুকুমার সাহিত্য সমগ্র-তে স্থান পেয়েছে। আমরা বেশ কিছুটা হতবাক হয়েছি এ ব্যাপারে। বাঙলা সাহিত্য সেও আজ যেন মূক হয়ে গিয়েছে। জানি না প্রকৃত আলোকপাত কে করতে পারেন আজ আমাদের।

যাঁদের সহযোগিতায় এ-বই-এর সুষ্ঠু প্রকাশ সম্ভব হয়েছে তাঁদের প্রত্যেকের জন্য রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। শত ব্যস্ততার মধ্যেও এ বই-এর সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব বহন করেছেন শ্রীসমীর মৈত্র, অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি শ্রীমতী কৃষ্ণা মৈত্রের কাছ থেকেও। পুরানো কালের হারিয়ে যাওয়া অমূল্য পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থরাজি দিয়ে মূল পাঠ উদ্ধারে সহযোগিতা করেছেন শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত, শ্রীদেবদত্ত দে, শ্রীঅশোককুমার মিত্র, শ্রীশ্যামাপ্রসাদ সরকার—এঁদের জন্য রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন। অভিনন্দন প্রাপ্য একলা প্রিন্টিং প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর প্রতিটি কর্মীবন্ধুর। তাঁদের মরণপণ সংগ্রামই সম্ভব করে তুলেছে এ-বই-এর প্রকাশ আজকের এই শুভ মুহূর্তে। বিশেষ করে ভুলবার নয় শ্রীকার্তিক ঘোষের আন্তরিক সহযোগিতার কথা। আর শুভেচ্ছা রইল আমার সহকর্মীদের প্রতি। তাঁদেরও সকলরকম সহযোগিতা এগিয়ে এনেছে সুষ্ঠুভাবে এ বই-এর প্রকাশকালকে। ভীড় করে আসছে আরো একাধিক বন্ধু-বান্ধব আপনজনদের কথা—যাঁদের সহযোগিতা নিয়ে বেরুল এ-বই।

সবশেষে ভালো-মন্দ বিচারের ভার ছেড়ে দিলাম আমার ছোট্টো পাঠকবন্ধুদের উপর—তাদের ভালো লাগলেই সার্থক মনে করব এই উদ্যোগ।

ভূমিকা

বাঙলা সাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও সুকুমার রায়-এর পরিচিতি ও খ্যাতি মূলত, শিশুসাহিত্যিক রূপে। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের সামগ্রিক পটভূমিতে এঁদের সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টির বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতার যদি সত্যিই কোনোদিন সার্থক মূল্যায়ন হয়—তবে আমরা সহজেই উপলব্ধি করব—সামগ্রিক বাঙলা সাহিত্যের বিচারেও এই পিতা-পুত্র বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। অবশ্য এ কথা উল্লেখ করা বাহুল্য যে, বাঙলা শিশুসাহিত্য বাঙলা সাহিত্যের কোনো বিচ্ছিন্ন অংশমাত্র নয়, তারই অঙ্গীভূত একটি বিশিষ্ট ধারা। এই বিশিষ্ট ধারার দুই ভিন্ন যুগের দুজন উজ্জ্বল স্বতন্ত্র পুরুষ হচ্ছেন উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার—এবং এটাই এঁদের প্রধানতম পরিচয়।

বাঙলা শিশুসাহিত্যের উৎস সন্ধান করতে গেলে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ধারা, রূপকথা, ছেলে ভুলানো ছড়া ইত্যাদির কথা স্বভাবতই মনে পড়বে। তথাপি আধুনিক অর্থে বাঙলা শিশুসাহিত্যের সূত্রপাত উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় প্রভাবেরই ফল—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। এই অর্থে বাঙলা শিশুসাহিত্যের উদ্যোগ পর্বে বিদ্যাসাগর-অক্ষয় দত্ত-রাজেন্দ্রলাল প্রমুখের পাঠ্য-রচনার কিংবা এই সময় প্রকাশিত 'পশ্বাবলী' ইত্যাদি পত্রিকায় শিশু বা বালকদের জন্য রচনাকে চিত্তহারী করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেলেও পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষা বা নীতি-উপদেশের অতিরিক্ত কিছু করার উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না। যদিও বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত প্রমুখ প্রতিভাবানদের স্পর্শে এর কোনো কোনো অংশ তুলনামূলকভাবে শিশু-উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু 'শিশুর বিষয় নিয়ে শিশুর জন্য রচনা'র সূত্রপাত হয় এর পরবর্তী পর্বে।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখ শিশুসাহিত্যিকদের উজ্জ্বল সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে শিশুসাহিত্যের এই স্বর্ণযুগের শুরু হয়। শিশুতোষ রচনার জাদুকর যোগীন্দ্রনাথ সরকার—'মাতৃভাষার আনন্দরূপের পরিচয় নিয়ে' তিনি বাঙলাদেশের শিশুর প্রথম অশ্রুহীন বর্ণপরিচয় ঘটালেন তাঁর ছড়া ও ছবির মধ্যে দিয়ে। কিন্তু খেলাচ্ছলে হলেও তাঁর মাথা থেকে স্কুলের চিন্তা নির্বাসিত হয় নি। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারই প্রথম এলেন শিশুকে গল্প শোনাতে। রূপকথার রাজ্যের নতুন দরজা খুলে গেল বাঙলাদেশের শিশুর কাছে। কিন্তু তিনিও পূর্ব ধারার সম্পূর্ণ রেশমুক্ত হতে পারলেন না। তাঁর 'চারু ও হারু' উপন্যাসের সর্বাঙ্গে নীতি-উপদেশের গন্ধ প্রকট। এই যুগে 'শিশুর বিষয় নিয়ে শিশুর জন্য' যিনি প্রথম গল্প শোনালেন, তাঁর নাম—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, যাঁর 'জগতে কৈশোর সমস্ত কিছুরই মাপকাঠি'। এত-দিনের চলতি ধারায় এ যেন এক বিদ্রোহের আভাস। প্রথার আনুগত্য বা 'অতি মৌন শিক্ষাব্রতীর অভিমান' এই দুটিই বিসর্জন দিয়ে, শিশুকে তিনিই প্রথম ইস্কুলের বাইরে গল্প শুনতে ডাকলেন।

শিশুসাহিত্যের এই স্বর্ণযুগ রবীন্দ্রপ্রতিভার আংশিক দ্যুতিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে এটা ঠিকই, কিন্তু 'সহজ পাঠ' ইত্যাদি পাঠ্যপুস্তকের সাফল্য বাদ দিলে, রবীন্দ্রনাথের 'শিশুসাহিত্য' হিসেবে চিহ্নিত রচনা প্রায় সম্পূর্ণই শিশুবিষয়ক কিন্তু শিশুর জন্য নয়। তাঁর বিচিত্র সাহিত্য জীবনের একটি ভগ্নাংশে তাঁর 'শৈশব-সাধনা'। উপরন্তু তাঁর কবি মেজাজটি সম্পূর্ণ শিশুসর্বস্ব হওয়া সম্ভব ছিল কিনা সেটাও ভেবে দেখা দরকার। তবুও মহাকবির কলমের গুণে বহু জায়গায় তা শিশুর পক্ষেও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর প্রমুখের সাহিত্য-সাধনার ধারায় শিশুর জন্য রচনা শুধু সর্বপ্রধানই নয়, প্রায় সর্বস্ব।

এর পরবর্তী পর্বকে বাঙলা শিশুসাহিত্যের প্রতিষ্ঠা ও জয়যাত্রার যুগ বলা যায়। এই যুগের শিশুসাহিত্য 'উপকরণে বিচিত্র, উদ্ভাবনে নিপুণ'। আর এই দুই যুগের 'সেতুবন্ধী সওদাগর' হচ্ছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তবে অবনীন্দ্রনাথও 'শিশুর বইয়ের ছল করে মানুষের (সকলের) বই লিখেছেন'। 'শকুন্তলা'র ব্যতিক্রম বাদ দিলে তাঁর শিশুগ্রন্থ সর্বজনীন।

এই নতুন পর্বের অগ্রপথিক সুকুমার রায়। আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন বাঙলা শিশুসাহিত্যে। পূর্বযুগের লক্ষণের কিছু কিছু আভাসের সন্ধান তাঁর রচনায়ও ইতস্তত পাওয়া যেতে পারে। যেমন উপেন্দ্র-কিশোরেও এই পরবর্তী যুগের কিছু কিছু আভাস লক্ষ্য করা যায়। যুগলক্ষণের দিক থেকে পিতা-পুত্রের এই এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গার মধিখানের চর হচ্ছেন অবন ঠাকুর—যিনি 'ছবি লেখেন'। কিন্তু পিতার সাহিত্যিক উত্তরাধিকারকে অতিক্রম করে বাল্যবঙ্গে এক নতুন জোয়ার আনলেন অভিনব 'খেয়াল রসে'র স্রষ্টা সুকুমার রায়। বাঙলা শিশুসাহিত্যে এ এক নতুন বিদ্রোহ—যার একতম নায়ক সুকুমার রায়।

১৩২১ সালের মাঘ মাসে বাল্যবঙ্গে এক প্রচণ্ড সাহিত্যিক বিস্ফোরণ ঘটালেন সুকুমার রায়--সন্দেশে তাঁর 'আবোল তাবোল' পর্যায়ের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হল 'খিচুড়ি'। তাঁর এই আবোল তাবোলের আজব দুনিয়ায় যে-সব উদ্ভট জীবজন্তুকে তিনি ছেড়ে দিলেন, তাদের দেখে সেদিনের কিশোর-দুনিয়ায় যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা একালের গ্রহান্তরে যাত্রার বিস্ময়ের সঙ্গেও কি তুলনীয়?

বাঙলার কিশোর-পাঠকদের কাছে তখনো লিয়রের ছড়ার বিচিত্র জগত বা ক্যারলের অ্যালিস–এর স্বপ্নরাজ্য তত পরিচিত নয়। কিন্তু তাদের সেজন্য আপসোস করার ক্ষতি সুদে-আসলে পূরণ করে দিয়েছেন সুকুমার। ক্যারলের রচনার জনপ্রিয়তার অন্যতম একটি কারণ তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু জন টেনিয়েলের আঁকা ছবিগুলি। অ্যালিসের আজব দেশের নানা বিচিত্র ছবি যদি তাঁর তুলিতে তিনি অমন সুন্দর করে, জীবন্ত করে তুলতে না পারতেন তা হলে অ্যালিসের এই বিশ্বব্যাপী একচ্ছত্র আধিপত্য কতটা ক্ষুণ্ণ হত তা ভাববার বিষয়। এমন-কি, অনেক সময় টেনিয়েল সাহেবের ছবিকে বাঁচাতে ক্যারল সাহেব নিজের লেখাকে সংশোধনও করেছেন। তাতে টেনিয়েল সাহেব বেঁচেছেন ঠিকই, সম্ভবত ক্যারল সাহেব বেঁচেছেন আরো বেশি করে।

বাঙলার কিশোর-পাঠকদের 'ভাগ্যবলে' সুকুমারকে কোনো টেনিয়েল সাহেবের খোঁজ করতে হয় নি। যে আজব দেশের হাঁসের পালকের থেকে তাঁর কলম তৈরি হয়েছিল, তারই আর-একটি পালক ভেঙে নিয়ে তিনি তাঁর তুলি বানিয়েছিলেন। এ ঘটনা যদি না ঘটত, তা হলে—হাঁসজারু, হাতিমি বা হুকোমুখো হ্যাংলা, কিংবা ট্যাঁশ গোরু, কিংবা হিজি বিজ্ বিজ্ বা চিল্লানোসরাস ইত্যাদি বস্তুগুলি কি—এইটি কোনো শিল্পীকে বোঝাতে গিয়ে গলদঘর্ম হয়ে সুকুমার সম্ভবত বহু আগেই তাঁর 'লেখায়' ইস্তফা দিতেন। এবং তাঁর অনেক রচনাই আজও বাঙলাদেশের কিশোর-পাঠকের কাছে প্রাগৈতিহাসিক শিলালিপির মতো মনে হত।

একদিকে আবোল তাবোল, হযবরল, হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি ও অন্যান্য বহু কবিতায় এই বিচিত্র শব্দসৃষ্টি ও উদ্ভট খেয়ালরসের বন্যা, অন্যদিকে কিশোর-হৃদয়ের সেই 'দুরন্ত রাজা' পাগলা দাশুর আবির্ভাব। তখনকার কিশোর-পাঠকের কাছে 'সন্দেশ'-এর পাতায় এ এক অভিনব ভোজ! বাঙলা সাহিত্যে এর আগে ও পরে ইস্কুলের গল্প (স্কুল স্টোরি) আরো লেখা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু 'পাগলা দাশু এ্যাণ্ড কোম্পানী' কে ম্লান করতে পারে এমন একটি চরিত্রও আজ পর্যন্ত সৃষ্টি হয় নি বলে আমার বিশ্বাস।

কিন্তু সুকুমার রায়ের আর-একটি পরিচয়ও ছিল। বাঙলাদেশে এ যাবৎ যত শিশু ও কিশোর পত্রিকা বেরিয়েছে তার মধ্যে 'সন্দেশ'-এর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। শিশু ও কিশোরদের জন্য পত্রিকা কি ধরনের হওয়া উচিত, তার যে একটা আদর্শ উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমার-সম্পাদিত 'সন্দেশ' তৈরি করে দিয়ে গিয়েছে, তাকে আজও কেউ অতিক্রম করতে পেরেছে বলে আমার মনে হয় না।

সম্পাদক হিসেবে সুকুমার কিশোর-মনকে আকর্ষণ করার জন্য, তাদের মনের ভোজ জোগাবার জন্য যে-সব লেখা লিখে গেছেন তার তথ্যমূল্য আজ অনেক ক্ষেত্রে না থাকতে পারে। কিন্তু শিশু ও কিশোর সাহিত্যের ভাষা কিরকম হওয়া উচিত তা আজও আমরা এই-সব লেখা পড়ে শিখতে পারি। এ ছাড়া পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে কিশোর-মনের কৌতূহলের চেহারাটা কিরকম ছিল তার একটা স্পষ্ট ধারণা আজকের পাঠকের কাছেও মূল্যবান। সেদিক থেকে এর ঐতিহাসিক মূল্যও অনস্বীকার্য। সন্দেশের সেই বিচিত্র রচনাগুলিও এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

মুখ্যত 'খেয়াল রসে'র স্রষ্টা হলেও আবোল তাবোল পর্বের কবিতার আগেও সন্দেশে সুকুমারের কিছু গল্প

ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে ওয়াসিলিসা ও পাজি পিটার (প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত) পরবর্তীকালে কোনো কোনো গ্রন্থে বা পত্রিকায় পুনর্মুদ্রণের সময় উপেন্দ্রকিশোরের নামেও ছাপা হয়েছিল। সন্দেশে রচনাগুলি স্বাক্ষরহীন থাকায়—এই গল্পদুটি ও আরো দু-একটি প্রথম দিকের সন্দেশে প্রকাশিত রচনা সম্পর্কে আমরা এঁদের ঘনিষ্ঠ দু-একজনের সাক্ষ্যে যা জেনেছি, তাতে আমাদেরও সংশয় নিরসন হয় নি। কিন্তু যেহেতু আমরা নিশ্চিত নই, তাই সম্প্রতি সেগুলি সুকুমার রায়ের নামে মুদ্রিত হওয়ায়, আমরাও সেই রচনাগুলি সুকুমার সমগ্র রচনাবলীতেই স্থান দিয়েছি। এরও আগে মুকুল পত্রিকায় তাঁর বাল্যরচনা নদী (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৩) ও টিক্-টিক্-টং (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪) এবং আশ্বিন ১৩১৩ সংখ্যায় সম্ভবত তাঁর প্রথম গদ্যরচনা সূর্যের রাজ্য' প্রকাশিত হয়েছিল। সন্দেশে প্রকাশিত তাঁর অন্যান্য রচনা এই খণ্ডে জীবজন্তুর কথা ও নানা নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত রচনাগুলির পর বর্তমান খণ্ডে অবশিষ্ট প্রায় সকল রচনাই সংকলিত হল। শুধুমাত্র ভাষা ও সাহিত্য, আলোকচিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে ইংরাজি ও বাঙলায় তাঁর 'গুরুতর' কয়েকটি প্রবন্ধ এর অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। এ ছাড়া, তাঁর মাত্র বারো-তেরো বছরের সামগ্রিক সাহিত্যিক জীবনের আরো কিছু কিছু রচনা হয়তো ইতস্তত ছড়িয়ে থাকতে পারে—যদি সেই রচনাগুলির ভবিষ্যতে সন্ধান প্রকাশ পায় তাহলে আমরা সেই সমস্ত রচনা নিয়ে পৃথকভাবে একটি তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের বাসনা রাখি। কিন্তু সেই নতুন প্রকল্প আমাদের কাছে আদৌ স্পষ্ট নয়।

বর্তমান খণ্ডে বিবিধ কবিতা পর্যায়ে 'ফাজিলের ডিক্‌শেনারি (রংমশাল, পূজাবার্ষিকী ১৩২৭) ও 'কলিকাতা কোথা রে' ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রকাশিত সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত পাতাবাহার সংকলন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। কবিতা দুটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত ও বন্ধুবর শ্রীঅশোককুমার মিত্র। এ ছাড়াও সনৎবাবু বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

যাঁর সর্বক্ষণের পরামর্শ ও উপদেশ আমাকে এই কাজে উৎসাহী করেছে—সেই সর্বজন শ্রদ্ধেয়া লীলাদির (শ্রীমতী লীলা মজুমদার) ঋণ আমার কাছে অপরিশোধ্য।

এই বই বিলম্বে প্রকাশের কারণ হিসেবে প্রকাশিকা তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু অন্য একটি গুরুতর কারণ হচ্ছে—বাজারে প্রচলিত বইয়ে অনেক ক্ষেত্রেই সুকুমারের 'সম্পাদিত' যে চেহারা আমরা পেয়েছি, সুকুমারের 'মূল রচনা'র সঙ্গে তার প্রভেদ অনেকখানি—এ বিষয়টি আমাদের এতই সংশয়িত করেছে যে এ সম্পর্কে সঠিক সতর্ক সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের কিছু বেশি সময় লেগেছে। বর্তমান খণ্ডে প্রত্যেকটি পর্যায়ের রচনার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক তথ্য ও 'পাঠ'-প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। মোটামুটিভাবে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই আমরা সন্দেশের পাঠ এবং প্রকাশিত কালানুক্রম অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে সব থেকে গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি—ইস্কুলের গল্প পর্যায়ে। তাই এই গল্পগুলির পাঠ প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন—

বর্তমান পর্যায়ে এই গল্পগুলির সন্দেশে মুদ্রিত 'পাঠ'কেই আমরা প্রায় অবিকৃতভাবে অনুসরণ করেছি। অপ্রচলিত ও প্রচলিত বিভিন্ন সংস্করণে গল্পগুলির যে মুদ্রিত পাঠ পাওয়া যায়, তার সঙ্গে সন্দেশের মুদ্রিত 'পাঠ'-এর অনেক ক্ষেত্রেই গুরুতর পার্থক্য আছে। এ ক্ষেত্রে যদি ধরে নিই যে, সেগুলি সর্বক্ষেত্রেই সুকুমার রায় স্বয়ং সম্পাদনা করেছেন, তা হলে এমন কিছু কিছু অসংগত ও অসমঞ্জস অংশ আছে, যার দায়িত্ব লেখকের উপর চাপালে, তাঁকেই সব থেকে বেশি অস্বস্তিতে ফেলা হবে। অন্যান্য প্রচলিত 'পাঠে'র সঙ্গে বর্তমান [illegible]ঠের তুলনামূলক বিচার করলেই সচেতন পাঠকের কাছে এই বক্তব্য প্রমাণিত হবে। এই পরিস্থিতিতে [illegible]ংগত পাঠ' নির্ধারণ করতে গিয়ে তৃতীয় আর-একটি 'পাঠ' প্রস্তুত করতে গেলে জটিলতা আরো বৃদ্ধি পা[illegible] ভেবেই সে প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়েছি। এমন-কি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'সম্পাদিত পাঠ' অনুসরণ করলে অপেক্ষাকৃত ভালো হত এ কথা ভেবেও, সে প্রলোভন সম্পাদককে সম্বরণ করতে হয়েছে। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নি যে প্রচলিত 'সম্পাদিত পাঠ' স্বয়ং লেখকেরই, সে ক্ষেত্রেও কৌতূহলী পাঠক এখানে অন্য-একটি দুষ্প্রাপ্য 'পাঠ'-এর সঙ্গে প্রচলিত 'পাঠ'-এর তুলনামূলক পরিচয়ে সামগ্রিকভাবে সুকুমার রায়কে বিচারের সুযোগ পাবেন। এত ব্যাপকভাবে না হলেও অন্যান্য রচনার ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

যাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতা ছাড়া আমার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব হত না—তিনি হচ্ছেন শ্রীমতী

কৃষ্ণা মৈত্র। এই কাজ করতে গিয়ে যাঁদের সর্বক্ষণ সহযোগিতা পেয়েছি তাঁরা হলেন এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানীর কর্ণধার বন্ধুবর শ্রীমৃণাল দত্ত ও শ্রীমতী গীতা দত্ত। তাঁদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এ ছাড়া বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের সহকর্মীদের কাছ থেকে যে সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি তাও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। পরিশেষে এই কাজ করতে গিয়ে আর আর যাঁদের সহযোগিতা পেয়েছি সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

সমীর মৈত্র

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

জন্ম : মে ১৮৮৭ : মৃত্যু : সেপ্টেম্বর ১৯২৩

হযবরল

বেজায় গরম। গাছতলায় দিব্যি ছায়ার মধ্যে চুপচাপ শুয়ে আছি, তবু ঘেমে অস্থির। ঘাসের উপর রুমালটা ছিল, ঘাম মুছবার জন্য যেই সেটা তুলতে গিয়েছি অমনি রুমালটা বলল, "ম্যাও!" কি আপদ! রুমালটা ম্যাও করে কেন?

চেয়ে দেখি রুমাল তো আর রুমাল নেই, দিব্যি মোটা-সোটা লাল টক্‌টকে একটা বেড়াল গোঁফ ফুলিয়ে প্যাট্‌প্যাট্‌ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে!

আমি বললাম, "কি মুশকিল! ছিল রুমাল, হয়ে গেল একটা বেড়াল।"

অমনি বেড়ালটা বলে উঠল, "মুশকিল আবার কি? ছিল একটা ডিম, হয়ে গেল দিব্যি একটা প্যাঁক্‌পেঁকে হাঁস। এ তো হামেশাই হচ্ছে।"

আমি খানিক ভেবে বললাম, "তা হলে তোমায় এখন কি বলে ডাকব ? তুমি তো সত্যিকারের বেড়াল নও, আসলে তুমি হচ্ছ রুমাল।"

বেড়াল বলল, "বেড়ালও বলতে পার, রুমালও বলতে পার, চন্দ্রবিন্দুও বলতে পার।" আমি বললাম, "চন্দ্রবিন্দু কেন ?"

শুনে বেড়ালটা "তাও জানো না ?" বলে এক চোখ বুজে ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্‌ করে বিশ্রীরকম হাসতে লাগল। আমি ভারি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। মনে হল, ঐ চন্দ্রবিন্দুর কথাটা নিশ্চয় আমার বোঝা উচিত ছিল। তাই থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম, "ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।"

বেড়ালটা খুশি হয়ে বলল, "হ্যাঁ, এ তো বোঝাই যাচ্ছে—চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ, রুমালের মা—হল চশমা। কেমন, হল তো ?"

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, কিন্তু পাছে বেড়ালটা আবার সেইরকম বিশ্রী করে হেসে ওঠে, তাই সঙ্গে সঙ্গে হুঁ-হুঁ করে গেলাম। তার পর বেড়ালটা খানিকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, "গরম লাগে তো তিব্বত গেলেই পার।"

আমি বললাম, "বলা ভারি সহজ, কিন্তু বললেই তো আর যাওয়া যায় না ?"

বেড়াল বলল, "কেন ? সে আর মুশকিল কি ?"

আমি বললাম, "কি করে যেতে হয় তুমি জানো ?"

বেড়াল এক গাল হেসে বলল, "তা আর জানি নে ? কলকেতা, ডায়মণ্ডহারবার, রানাঘাট, তিব্বত, ব্যাস্‌! সিধে রাস্তা, সওয়া ঘণ্টার পথ, গেলেই হল।"

আমি বললাম, "তা হলে রাস্তাটা আমায় বাতলে দিতে পার ?"

শুনে বেড়ালটা হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। তার পর মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু, সে আমার কর্ম নয়। আমার গেছোদাদা যদি থাকত, তা হলে সে ঠিক-ঠিক বলতে পারত।"

আমি বললাম, "গেছোদাদা কে ? তিনি থাকেন কোথায় ?"

বেড়াল বলল, "গেছোদাদা আবার কোথায় থাকবে ? গাছে থাকে।"

আমি বললাম, "কোথায় গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় ?"

বেড়াল খুব জোরে মাথা নেড়ে বলল, "সেটি হচ্ছে না, সে হবার জো নেই।"

আমি বললাম, "কিরকম ?"

বেড়াল বলল, "সে কিরকম জানো ? মনে কর, তুমি যখন যাবে উলুবেড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, তখন তিনি থাকবেন মতিহারি। যদি মতিহারি যাও, তা হলে শুনবে তিনি আছেন রামকিষ্টপুর। আবার সেখানে গেলে দেখবে তিনি গেছেন কাশিমবাজার। কিছুতেই দেখা হবার জো নেই।"

আমি বললাম, "তা হলে তোমরা কি করে দেখা কর ?"

বেড়াল বলল, "সে অনেক হাঙ্গাম। আগে হিসেব করে দেখতে হবে, দাদা কোথায় কোথায় নেই ; তার পর হিসেব করে দেখতে হবে, দাদা কোথায় কোথায় থাকতে পারে ; তার পর দেখতে হবে, দাদা এখন কোথায় আছে। তার পর দেখতে হবে, সেই হিসেব মতো যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছবে, তখন দাদা কোথায় থাকবে। তার পর দেখতে হবে—"

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, "সে কিরকম হিসেব ?"

বেড়াল বলল, "সে ভারি শক্ত। দেখবে কিরকম ?" এই বলে সে একটা কাঠি দিয়ে ঘাসের উপর লম্বা আঁচড় কেটে বলল, "এই মনে কর গেছোদাদা।" বলেই খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে রইল।

তার পর আবার ঠিক তেমনি একটা আঁচড় কেটে বলল, "এই মনে কর তুমি," বলে আবার ঘাড় বাঁকিয়ে চুপ করে রইল।

তার পর হঠাৎ আবার একটা আঁচড় কেটে বলল, "এই মনে কর চন্দ্রবিন্দু।" এমনি করে খানিকক্ষণ কি ভাবে আর একটা করে লম্বা আঁচড় কাটে, আর বলে, "এই মনে কর তিব্বত—" "এই মনে কর গেছোবৌদি রান্না করছে—" "এই মনে কর গাছের গায়ে একটা ফুটো—"

এইরকম শুনতে-শুনতে শেষটায় আমার কেমন রাগ ধরে গেল। আমি বললাম, "দূর ছাই! কি সব আবোল তাবোল বকছে, একটুও ভালো লাগে না।"

বেড়াল বলল, "আচ্ছা, তা হলে আর একটু সহজ করে বলছি। চোখ বোজ, আমি যা বলব, মনে মনে তার হিসেব কর।" আমি চোখ বুজলাম।

চোখ বুজেই আছি, বুজেই আছি, বেড়ালের আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই। হঠাৎ কেমন সন্দেহ হল, চোখ চেয়ে দেখি বেড়ালটা ল্যাজ খাড়া করে বাগানের বেড়া টপকিয়ে পালাচ্ছে আর ক্রমাগত ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্ করে হাসছে।

কি আর করি, গাছতলায় একটা পাথরের উপর বসে পড়লাম। বসতেই কে যেন ভাঙা-ভাঙা মোটা গলায় বলে উঠল, "সাত দুগুণে কত হয় ?"

আমি ভাবলাম, এ আবার কে রে ? এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, এমন সময় আবার সেই আওয়াজ হল, "কই জবাব দিচ্ছ না যে ? সাত দুগুণে কত হয় ?" তখন উপর দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা দাঁড়কাক শ্লেট পেনসিল দিয়ে কি যেন লিখছে, আর এক-একবার ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

আমি বললাম, "সাত দুগুণে চোদ্দো।"

কাকটা অমনি দুলে-দুলে মাথা নেড়ে বলল, "হয় নি, হয় নি, ফেল্।"

আমার ভয়ানক রাগ হল। বললাম, "নিশ্চয় হয়েছে। সাতেক্কে সাত, সাত দুগুণে চোদ্দো, তিন সাত্তে একুশ।"

কাকটা কিছু জবাব দিল না, খালি পেনসিল মুখে দিয়ে খানিকক্ষণ কি যেন ভাবল। তার পর বলল, "সাত দুগুণে চোদ্দোর নামে চার, হাতে রইল পেনসিল।"

আমি বললাম, "তবে যে বলছিলে সাত দুগুণে চোদ্দো হয় না ? এখন কেন ?"

কাক বলল, "তুমি যখন বলেছিলে, তখনো পুরো চোদ্দো হয় নি। তখন ছিল, তেরো টাকা চোদ্দো আনা তিন পাই। আমি যদি ঠিক সময় বুঝে ধাঁ করে ১৪ লিখে না ফেলতাম, তা হলে এতক্ষণে হয়ে যেত চোদ্দো টাকা এক আনা নয় পাই।"

আমি বললাম, "এমন আনাড়ি কথা তো কখনো শুনি নি। সাত দুগুণে যদি চোদ্দো হয়, তা সে সব সময়েই চোদ্দো। একঘণ্টা আগে হলেও যা, দশদিন পরে হলেও তাই।"

কাকটা ভারি অবাক হয়ে বলল, "তোমাদের দেশে সময়ের দাম নেই বুঝি?"

আমি বললাম, "সময়ের দাম কিরকম?"

কাক বলল, "এখানে কদিন থাকতে, তা হলে বুঝতে। আমাদের বাজারে সময় এখন ভয়ানক মাগ্যি, এতটুকু বাজে খরচ করবার জো নেই। এই তো কদিন খেটেখুটে চুরি-চামারি করে খানিকটে সময় জমিয়েছিলাম, তাও তোমার সঙ্গে তর্ক করতে অর্ধেক খরচ হয়ে গেল।" বলে সে আবার হিসেব করতে লাগল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বসে রইলাম।

এমন সময়ে হঠাৎ গাছের একটা ফোকর থেকে কি যেন একটা সুড়ুৎ করে পিছলিয়ে মাটিতে নামল। চেয়ে দেখি, দেড় হাত লম্বা এক বুড়ো, তার পা পর্যন্ত সবুজ রঙের দাড়ি, হাতে একটা হুঁকো তাতে কলকে-টলকে কিচ্ছু নেই, আর মাথা ভরা টাক। টাকের উপর খড়ি দিয়ে কে যেন কি-সব লিখেছে।

বুড়ো এসেই খুব ব্যস্ত হয়ে হুঁকোতে দু-এক টান দিয়েই জিজ্ঞাসা করল, "কই হিসেবটা হল?"

কাক খানিক এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, "এই হল বলে।"

বুড়ো বলল, "কি আশ্চর্য! উনিশ দিন পার হয়ে গেল, এখনো হিসেবটা হয়ে উঠল না?"

কাক দু-চার মিনিট খুব গম্ভীর হয়ে পেনসিল চুষল তার পর জিজ্ঞাসা করল, "কতদিন বললে?"

বুড়ো বলল, "উনিশ।"

কাক অমনি গলা উঁচিয়ে হেঁকে বলল, "লাগ্ লাগ্ লাগ্ কুড়ি।"

বুড়ো বলল, "একুশ।" কাক বলল, "বাইশ।" বুড়ো বলল, "তেইশ।" কাক বলল, "সাড়ে তেইশ।" ঠিক যেন নিলেম ডাকছে।

ডাকতে-ডাকতে কাকটা হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি ডাকছ না যে?"

আমি বললাম, "খামকা ডাকতে যাব কেন?"

বুড়ো এতক্ষণ আমায় দেখে নি, হঠাৎ আমার আওয়াজ শুনেই সে বন্‌বন্ করে আট দশ পাক ঘুরে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল।

তার পর হুঁকোটাকে দুরবীনের মতো করে চোখের সামনে ধরে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তার পর পকেট থেকে কয়েকখানা রঙিন কাঁচ বের করে তাই দিয়ে আমায় বার বার দেখতে লাগল। তার পর কোত্থেকে একটা পুরনো দরজির ফিতে এনে সে আমার মাপ নিতে শুরু করল, আর হাঁকতে লাগল, "খাড়াই ছাব্বিশ ইঞ্চি, হাতা ছাব্বিশ ইঞ্চি, আস্তিন ছাব্বিশ ইঞ্চি, ছাতি ছাব্বিশ ইঞ্চি, গলা ছাব্বিশ ইঞ্চি।"

আমি ভয়ানক আপত্তি করে বললাম, "এ হতেই পারে না। বুকের মাপও ছাব্বিশ ইঞ্চি, গলাও ছাব্বিশ ইঞ্চি? আমি কি শুওর?"

বুড়ো বলল, "বিশ্বাস না হয়, দেখ।"

দেখলাম ফিতের লেখা-টেখা সব উঠে গিয়েছে, খালি ২৬ লেখাটা একটু পড়া যাচ্ছে, তাই বুড়ো যা কিছু মাপে সবই ছাব্বিশ ইঞ্চি হয়ে যায়।

তার পর বুড়ো জিজ্ঞাসা করল. "ওজন কত?"

আমি বললাম, "জানি না!"

বুড়ো তার দুটো আঙুল দিয়ে আমায় একটুখানি টিপে-টিপে বলল, "আড়াই সের।"

আমি বললাম, "সেকি, পট্‌লার ওজনই তো একুশ সের, সে আমার চাইতে দেড় বছরের ছোটো।"

কাকটা অমনি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "সে তোমাদের হিসেব অন্যরকম।"

বুড়ো বলল, "তা হলে লিখে নাও--ওজন আড়াই সের, বয়েস সাঁইত্রিশ।"

আমি বললাম, "দূৎ! আমার বয়স হল আট বছর তিনমাস, বলে কিনা সাঁইত্রিশ।"

বুড়ো খানিকক্ষণ কি যেন ভেবে জিজ্ঞাসা করল, "বাড়তি না কমতি?"

আমি বললাম, "সে আবার কি?"

বুড়ো বলল, "বলি বয়েসটা এখন বাড়ছে না কমছে?"

আমি বললাম, "বয়েস আবার কমবে কি?"

বুড়ো বলল, "তা নয় তো কেবলই বেড়ে চলবে নাকি? তা হলেই তো গেছি! কোনদিন দেখব বয়েস বাড়তে বাড়তে একেবারে ষাট সত্তর আশি বছর পার হয়ে গেছে। শেষটায় বুড়ো হয়ে মরি আর কি!"

আমি বললাম, "তা তো হবেই। আশি বছর বয়েস হলে মানুষ বুড়ো হবে না!"

বুড়ো বলল, "তোমার যেমন বুদ্ধি! আশি বছর বয়েস হবে কেন? চল্লিশ বছর হলেই আমরা বয়েস ঘুরিয়ে দিই। তখন আর একচল্লিশ বেয়াল্লিশ হয় না—উনচল্লিশ, আটত্রিশ, সাঁইত্রিশ করে বয়েস নামতে থাকে। এমনি করে যখন দশ পর্যন্ত নামে তখন আবার বয়েস বাড়তে দেওয়া হয়। আমার বয়েস তো কত উঠল নামল আবার উঠল, এখন আমার বয়েস হয়েছে তেরো।" শুনে আমার ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল।

কাক বলল, "তোমরা একটু আস্তে-আস্তে কথা কও, আমার হিসেবটা চট্‌পট্‌ সেরে নি।"

বুড়ো অমনি চট্ করে আমার পাশে এসে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে ফিস্‌ফিস্ করে বলতে লাগল, "একটি চমৎকার গল্প বলব। দাঁড়াও একটু ভেবে নি।" এই বলে তার হুঁকো

দিয়ে টেকো মাথা চুলকাতে-চুলকাতে চোখ বুজে ভাবতে লাগল। তার পর হঠাৎ বলে উঠল, "হ্যাঁ, মনে হয়েছে, শোনো—

"তার পর এদিকে বড়োমন্ত্রী তো রাজকন্যার গুলিসুতো খেয়ে ফেলেছে। কেউ কিচ্ছু জানে না। ওদিকে রাক্ষসটা করেছে কি, ঘুমুতে-ঘুমুতে হাঁউ-মাঁউ-কাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ বলে হুড়্‌মুড়্ করে খাট থেকে পড়ে গিয়েছে। অমনি ঢাক ঢোল সানাই কাঁশি লোক লস্কর সেপাই পল্টন হৈ-হৈ রৈ-রৈ মার্-মার্ কাট্-কাট্—এর মধ্যে হঠাৎ রাজা বলে উঠলেন, 'পক্ষীরাজ যদি হবে, তা হলে ন্যাজ নেই কেন?' শুনে পাত্র মিত্র ডাক্তার মোক্তার আক্কেল মক্কেল সবাই বললে, 'ভালো কথা! ন্যাজ কি হল?' কেউ তার জবাব দিতে পারে না, সুড়্‌সুড়্ করে পালাতে লাগল।"

এমন সময় কাকটা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "বিজ্ঞাপন পেয়েছ? হ্যাণ্ডবিল?"

আমি বললাম, "কই না, কিসের বিজ্ঞাপন?" বলতেই কাকটা একটা কাগজের বাণ্ডিল থেকে একখানা ছাপানো কাগজ বের করে আমার হাতে দিল, আমি পড়ে দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে—

শ্রীশ্রীভুশণ্ডিকাগায় নমঃ

শ্রীকাক্কেশ্বর কুচ্‌কুচে

৪১নং গেছোবাজার, কাগেয়াপটি

আমরা হিসাবী ও বেহিসাবী খুচরা ও পাইকারী সকলপ্রকার গণনার কার্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করিয়া থাকি। মূল্য এক ইঞ্চি ১।৵০। CHILDREN HALF PRICE অর্থাৎ শিশুদের অর্ধমূল্য। আপনার জুতার মাপ, গায়ের রঙ, কান কট্‌কট্ করে কি না, জীবিত কি মৃত, ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিবরণ পাঠাইলেই ফেরত ডাকে ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

আমরা সনাতন বায়সবংশীয় দাঁড়িকুলীন, অর্থাৎ দাঁড়কাক। আজকাল নানাশ্রেণীর পাতিকাক, হেঁড়েকাক, রামকাক প্রভৃতি নীচশ্রেণীর কাকেরাও অর্থলোভে নানারূপ ব্যবসা চালাইতেছে। সাবধান! তাহাদের বিজ্ঞাপনের চটক দেখিয়া প্রতারিত হইবেন না।

কাক বলল, "কেমন হয়েছে ?"

আমি বললাম, "সবটা তো ভালো করে বোঝা গেল না।"

কাক গম্ভীর হয়ে বলল, "হ্যাঁ, ভারি শক্ত, সকলে বুঝতে পারে না। একবার এক খদ্দের এয়েছিল তার ছিল টেকো মাথা—"

এই কথা বলতেই বুড়ো মাৎ-মাৎ করে তেড়ে উঠে বলল, "দেখ্! ফের যদি টেকো মাথা বলবি তো হুঁকো দিয়ে এক বাড়ি মেরে তোর শ্লেট ফাটিয়ে দেব।"

কাক একটু থতমত খেয়ে কি যেন ভাবল, তার পর বলল, "টেকো নয়, টেপো মাথা, যে মাথা টিপে-টিপে টোল খেয়ে গিয়েছে।"

বুড়ো তাতেও ঠাণ্ডা হল না, বসে-বসে গজ্‌গজ্ করতে লাগল। তাই দেখে কাক বলল, "হিসেবটা দেখবে নাকি ?"

বুড়ো একটু নরম হয়ে বলল, "হয়ে গেছে ? কই দেখি।"

কাক অমনি "এই দেখ" বলে তার শ্লেটখানা ঠকাস্ করে বুড়োর টাকের উপর ফেলে দিল। বুড়ো তৎক্ষণাৎ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল আর ছোটো ছেলেদের মতো ঠোঁট ফুলিয়ে "ও মা, ও পিসি, ও শিবুদা" বলে হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে লাগল।

কাকটা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে, বলল, "লাগল নাকি! ষাট-ষাট!"

বুড়ো অমনি কান্না থামিয়ে বলল, "একষট্টি, বাষট্টি, চৌষট্টি—"

কাক বলল, "পঁয়ষট্টি।"

আমি দেখলাম আবার বুঝি ডাকাডাকি শুরু হয়, তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, "কই হিসেবটা তো দেখলে না ?"

বুড়ো বললে "হ্যাঁ-হ্যাঁ তাই তো! কি হিসেব হল পড় দেখি।"

আমি শ্লেটখানা তুলে দেখলাম ক্ষুদে-ক্ষুদে অক্ষরে লেখা রয়েছে—

"ইয়াদি কির্দ অত্র কাকালতনামা লিখিতং শ্রীকাক্কেশ্বর কুচ্‌কুচে কার্যঞ্চাগে। ইমারৎ খেসারৎ দলিল দস্তাবেজ। তস্য ওয়ারিশানগণ মালিক দখলিকার সত্ত্বে অত্র নায়েব সেরেস্তায় দস্ত বদস্ত কায়েম মোকররী পত্তনীপাট্টা অথবা কাওলা কবুলিয়ৎ। সত্যতায় কি বিনা সত্যতায় মুনসেফী আদালতে কিম্বা দায়রায় সোপর্দ আসামী ফরিয়াদী সাক্ষী সাবুদ গয়রহ মোকর্দমা দায়ের কিম্বা আপোস মকমল ডিক্রীজারী নিলাম ইস্তাহার ইত্যাদি সর্বপ্রকার কর্তব্য বিধায়—"

আমার পড়া শেষ না হতেই বুড়ো বলে উঠল, "এ-সব কি লিখেছ আবোল তাবোল ?"

কাক বলল, "ও-সব লিখতে হয়। তা না হলে আদালতে হিসেব টিকবে কেন ? ঠিক চৌকস-মতো কাজ করতে হলে গোড়ায় এ-সব বলে নিতে হয়।"

বুড়ো বলল, "তা বেশ করেছ, কিন্তু আসল হিসেবটা কি হল তা তো বললে না ?"

কাক বলল, "হ্যাঁ, তাও তো বলা হয়েছে। ওহে, শেষ দিকটা পড় তো ?"

আমি দেখলাম শেষের দিকে মোটা-মোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে—

সাত দুগুণে ১৪, বয়স ২৬ ইঞ্চি, জমা ৴২॥ সের, খরচ ৩৭ বৎসর।

কাক বলল, "দেখেই বোঝা যাচ্ছে অঙ্কটা এল-সি-এম্‌ও নয়, জি-সি-এম্‌ও নয়। সুতরাং হয় এটা ত্রৈরাশিকের অঙ্ক, নাহয় ভগ্নাংশ। পরীক্ষা করে দেখলাম আড়াই সেরটা হচ্ছে ভগ্নাংশ। তা হলে বাকি তিনটে হল ত্রৈরাশিক। এখন আমার জানা দরকার, তোমরা ত্রৈরাশিক চাও, না ভগ্নাংশ চাও ?"

বুড়ো বলল, "আচ্ছা দাঁড়াও, তা হলে একবার জিজ্ঞাসা করে নি।" এই বলে সে নিচু হয়ে গাছের গোড়ায় মুখ ঠেকিয়ে ডাকতে লাগল, "ওরে বুধো! বুধো রে!"

খানিক পরে মনে হল কে যেন গাছের ভিতর থেকে রেগে বলে উঠল, "কেন ডাকছিস ?"

বুড়ো বলল, "কাক্কেশ্বর কি বলছে শোন্।"

আবার সেইরকম আওয়াজ হল, "কি বলছে ?"

বুড়ো বলল, "বলছে, ত্রৈরাশিক না ভগ্নাংশ ?"

তেড়ে উত্তর হল, "কাকে বলছে ভগ্নাংশ ? তোকে না আমাকে ?"

বুড়ো বলল, "তা নয়। বলছে, হিসেবটা ভগ্নাংশ চাস, না ত্রৈরাশিক ?"

একটুক্ষণ পরে জবাব শোনা গেল, "আচ্ছা, ত্রৈরাশিক দিতে বল।"

বুড়ো গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ দাড়ি হাতড়াল, তার পর মাথা নেড়ে বলল, "বুধোটার যেমন বুদ্ধি! ত্রৈরাশিক দিতে বলব কেন ? ভগ্নাংশটা খারাপ হল কিসে ? না হে কাক্কেশ্বর, তুমি ভগ্নাংশই দাও।"

কাক বলল, "তা হলে আড়াই সেরের গোটা সের দুটো বাদ গেলে রইল ভগ্নাংশ আধ সের, তোমার হিসেব হল আধ সের। আধ সের হিসেবের দাম পড়ে—খাঁটি হলে দুটাকা চোদ্দোআনা, আর জল মেশানো থাকলে ছয় পয়সা।"

বুড়ো বলল, "আমি যখন কাঁদছিলাম, তখন তিন ফোঁটা জল হিসেবের মধ্যে পড়েছিল। এই নাও তোমার শ্লেট, আর এই নাও পয়সা ছটা।"

পয়সা পেয়ে কাকের মহাফুর্তি! সে 'টাক্-ডুমাডুম্ টাক্-ডুমাডুম' বলে শ্লেট বাজিয়ে নাচতে লাগল।

বুড়ো অমনি আবার তেড়ে উঠল, "ফের টাক-টাক বলছিস ? দাঁড়া। ওরে বুধো বুধো রে! শিগ্‌গির আয়। আবার টাক বলছে।" বলতে-না-বলতেই গাছের ফোকর থেকে মস্ত একটা পোঁটলা মতন কি যেন হুড়্‌মুড়্ করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। চেয়ে দেখলাম, একটা বুড়ো লোক একটা প্রকাণ্ড বোঁচকার নীচে চাপা পড়ে ব্যস্ত হয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে! বুড়োটা দেখতে অবিকল এই হুঁকোওয়ালা বুড়োর মতো। হুঁকোওয়ালা কোথায় তাকে টেনে তুলবে না সে নিজেই পোঁটলার উপর চড়ে বসে, "ওঠ্ বলছি, শিগ্‌গির ওঠ্" বলে ধাঁই-ধাঁই করে তাকে হুঁকো দিয়ে মারতে লাগল।

কাক আমার দিকে চোখ মট্‌কিয়ে বলল, "ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না ? উধোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে। এর বোঝা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে, এখন ও আর বোঝা ছাড়তে চাইবে কেন ? এই নিয়ে রোজ মারামারি হয়।"

এই কথা বলতে-বলতেই চেয়ে দেখি, বুধো তার পোঁটলাসুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েই

সে পোঁটলা উঁচিয়ে দাঁত কড়্মড়্ করে বলল, "তবে রে ইস্টুপিড্ উধো!" উধোও আস্তিন গুটিয়ে হুঁকো বাগিয়ে হুংকার দিয়ে উঠল, "তবে রে লক্ষ্মীছাড়া বুধো!"

কাক বলল, "লেগে যা, লেগে যা—নারদ-নারদ!"

অমনি ঝটাপট্, খটাখট্, দমাদম্, ধপাধপ্! মুহূর্তের মধ্যে চেয়ে দেখি উধো চিৎপাত শুয়ে হাঁপাচ্ছে, আর বুধো ছট্‌ফট্ করে টাকে হাত বুলোচ্ছে।

বুধো কান্না শুরু করল, "ওরে ভাই উধো রে, তুই এখন কোথায় গেলি রে?"

উধো কাঁদতে লাগল, "ওরে হায় হায়! আমাদের বুধোর কি হল রে!"

তার পর দুজনে উঠে খুব খানিক গলা জড়িয়ে কেঁদে, আর খুব খানিক কোলাকুলি করে, দিব্যি খোশমেজাজে গাছের ফোকরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তাই দেখে কাকটাও তার দোকানপাট বন্ধ করে কোথায় যেন চলে গেল।

আমি ভাবছি এইবেলা পথ খুঁজে বাড়ি ফেরা যাক, এমন সময় শুনি পাশেই একটা ঝোপের মধ্যে কিরকম শব্দ হচ্ছে, যেন কেউ হাসতে হাসতে আর কিছুতেই হাসি সামলাতে পারছে না। উঁকি মেরে দেখি, একটা জন্তু—মানুষ না বাঁদর, প্যাঁচা না ভূত, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—খালি হাত-পা ছুঁড়ে হাসছে, আর বলছে, "এই গেল গেল—নাড়ি-ভুঁড়ি সব ফেটে গেল!"
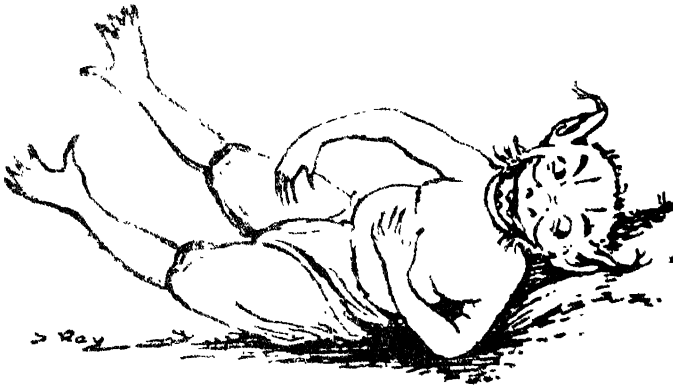
হঠাৎ আমায় দেখে সে একটু দম পেয়ে উঠে বলল, "ভাগ্যিস তুমি এসে পড়লে, তা না হলে আর একটু হলেই হাসতে-হাসতে পেট ফেটে যাচ্ছিল।"

আমি বললাম, "তুমি এমন সাংঘাতিক রকম হাসছ কেন?"

জন্তুটা বলল, "কেন হাসছি শুনবে? মনে কর, পৃথিবীটা যদি চ্যাপটা হত, আর সব জল গড়িয়ে ডাঙায় এসে পড়ত, আর ডাঙার মাটি সব ঘুলিয়ে প্যাচ্‌প্যাচে কাদা হয়ে যেত, আর লোকগুলো সব তার মধ্যে ধপাধপ্ আছাড় খেয়ে পড়ত, তা হলে—হোঃ হোঃ হোঃ হো—" এই বলে সে আবার হাসতে-হাসতে লুটিয়ে পড়ল।

আমি বললাম, "কি আশ্চর্য! এরজন্য তুমি এত ভয়ানক করে হাসছ?"

সে আবার হাসি থামিয়ে বলল, "না, না, শুধু এরজন্য নয়। মনে কর, একজন লোক

আসছে, তার এক হাতে কুলপিবরফ আর-এক হাতে সাজিমাটি, আর লোকটা কুলপি খেতে গিয়ে ভুলে সাজিমাটি খেয়ে ফেলেছে—হোঃ হোঃ, হোঃ হো, হাঃ হাঃ হাঃ হা—" আবার হাসির পালা।

আমি বললাম, "কেন তুমি এই-সব অসম্ভব কথা ভেবে খামকা হেসে-হেসে কষ্ট পাচ্ছ ?"

সে বলল, "না, না, সব কি আর অসম্ভব ? মনে কর, একজন লোক টিকটিকি পোষে, রোজ তাদের নাইয়ে খাইয়ে শুকোতে দেয়, একদিন একটা রামছাগল এসে সব টিকটিকি খেয়ে ফেলেছে— হোঃ হোঃ হোঃ হো—"

জন্তুটার রকম-সকম দেখে আমার ভারি অদ্ভুত লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কে ? তোমার নাম কি ?"

সে খানিকক্ষণ ভেবে বলল, "আমার নাম হিজি বিজ্ বিজ্। আমার নাম হিজি বিজ্ বিজ্, আমার ভায়ের নাম হিজি বিজ্ বিজ্, আমার বাবার নাম হিজি বিজ্ বিজ্, আমার পিসের নাম হিজি বিজ্ বিজ্—"

আমি বললাম, "তার চেয়ে সোজা বললেই হয় তোমার গুষ্টিসুদ্ধ সবাই হিজি বিজ্ বিজ্।"

সে আবার খানিক ভেবে বলল, "তা তো নয়, আমার নাম তকাই! আমার মামার নাম তকাই, আমার খুড়োর নাম তকাই, আমার মেসোর নাম তকাই, আমার শ্বশুরের নাম তকাই—"

আমি ধমক দিয়ে বললাম, "সত্যি বলছ ? না, বানিয়ে ?"

জন্তুটা কেমন থতমত খেয়ে বলল, "না, না, আমার শ্বশুরের নাম বিস্কুট।"

আমার ভয়ানক রাগ হল, তেড়ে বললাম, "একটা কথাও বিশ্বাস করি না।"

অমনি কথা নেই বার্তা নেই, ঝোপের আড়াল থেকে একটা মস্ত দাড়িওয়ালা ছাগল হঠাৎ উঁকি মেরে জিজ্ঞাসা করল, "আমার কথা হচ্ছে বুঝি ?"

আমি বলতে যাচ্ছিলাম 'না' কিন্তু কিছু না-বলতেই তড়্‌তড়্‌ করে সে বলে যেতে লাগল, "তা তোমরা যতই তর্ক কর, এমন অনেক জিনিস আছে যা ছাগলে খায় না। তাই আমি একটা বক্তৃতা দিতে চাই, তার বিষয় হচ্ছে—ছাগলে কি না খায়।" এই বলে সে হঠাৎ এগিয়ে এসে বক্তৃতা আরম্ভ করল—

"হে বালকবৃন্দ এবং স্নেহের হিজি বিজ্ বিজ্, আমার গলায় ঝোলানো সার্টিফিকেট দেখেই তোমরা বুঝতে পারছ যে আমার নাম শ্রীব্যাকরণ শিং বি. এ. খাদ্যবিশারদ। আমি খুব চমৎকার ব্যা করতে পারি, তাই আমার নাম ব্যাকরণ, আর শিং তো দেখতেই পাচ্ছ। ইংরাজিতে লিখবার সময় লিখি B. A. অর্থাৎ ব্যা। কোন-কোন জিনিস খাওয়া যায় আর কোনটা-কোনটা খাওয়া যায় না, তা আমি সব নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি, তাই আমার উপাধি হচ্ছে খাদ্যবিশারদ। তোমরা যে বল—পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়—এটা অত্যন্ত অন্যায়। এই তো একটু আগে ঐ হতভাগাটা বলছিল যে রামছাগল টিকটিকি খায়! এটা একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমি অনেকরকম টিকটিকি চেটে

দেখেছি, ওতে খাবার মতো কিচ্ছু নেই। অবশ্যি আমরা মাঝে-মাঝে এমন অনেক জিনিস খাই, যা তোমরা খাও না, যেমন—খাবারের ঠোঙা, কিম্বা নারকেলের ছোবড়া, কিম্বা খবরের কাগজ, কিম্বা সন্দেশের মতো ভালো ভালো মাসিক পত্রিকা। কিন্তু তা বলে মজবুত বাঁধানো কোনো বই আমরা কক্ষনো খাই না। আমরা কচিৎ কখনো লেপ কম্বল কিম্বা তোশক বালিশ এ-সব একটু-আধটু খাই বটে, কিন্তু যারা বলে আমরা খাট পালং কিম্বা টেবিল চেয়ার খাই, তারা ভয়ানক মিথ্যাবাদী। যখন আমাদের মনে খুব তেজ আসে, তখন শখ করে অনেকরকম জিনিস আমরা চিবিয়ে কিম্বা চেখে দেখি, যেমন, পেনসিল রবার কিম্বা বোতলের ছিপি কিম্বা শুকনো জুতো কিম্বা ক্যামবিসের ব্যাগ। শুনেছি আমার ঠাকুরদাদা একবার ফুর্তির চোটে এক সাহেবের আধখানা তাঁবু প্রায় খেয়ে শেষ করেছিলেন। কিন্তু তা বলে ছুরি কাঁচি কিম্বা শিশি বোতল, এ-সব আমরা কোনোদিন খাই না। কেউ-কেউ সাবান খেতে ভালোবাসে, কিন্তু সে-সব নেহাত ছোটোখাটো বাজে সাবান। আমার ছোটোভাই একবার একটা আস্ত বার্-সোপ খেয়ে ফেলেছিল—" বলেই ব্যাকরণ শিং আকাশের দিকে চোখ তুলে ব্যা-ব্যা করে ভয়ানক কাঁদতে লাগল। তাতে বুঝতে পারলাম যে সাবান খেয়ে ভাইটির অকালমৃত্যু হয়েছে।

হিজি বিজ্ বিজ্‌টা এতক্ষণ পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছিল, হঠাৎ ছাগলটার বিকট কান্না শুনে সে হাঁউ-মাঁউ করে ধড়্‌মড়িয়ে উঠে বিষম-টিষম খেয়ে একেবারে অস্থির! আমি ভাবলাম বোকাটা মরে বুঝি এবার! কিন্তু একটু পরেই দেখি, সে আবার তেমনি হাত-পা ছুঁড়ে ফ্যাক্‌ফ্যাক্ করে হাসতে লেগেছে।

আমি বললাম, "এর মধ্যে আবার হাসবার কি হল?"

সে বলল, "সেই একজন লোক ছিল, সে মাঝে-মাঝে এমন ভয়ংকর নাক ডাকাত যে সবাই তার উপর চটা ছিল। একদিন তাদের বাড়ি বাজ পড়েছে, আর অমনি সবাই দৌড়ে তাকে দমাদম মারতে লেগেছে—হোঃ হোঃ হোঃ হো—" আমি বললাম, "যত-সব

বাজে কথা।" এই বলে যেই ফিরতে গেছি, অমনি চেয়ে দেখি একটা নেড়ামাথা কে-যেন যাত্রার জুড়ির মতো চাপকান আর পায়জামা পরে হাসি-হাসি মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখে আমার গা জ্বলে গেল। আমায় ফিরতে দেখেই সে আবদার করে আহ্লাদীর মতো ঘাড় বাঁকিয়ে দুহাত নেড়ে বলতে লাগল, "না ভাই, না ভাই, এখন আমায় গাইতে বোলো না। সত্যি বলছি, আজকে আমার গলা তেমন খুলবে না।"

আমি বললাম, "কি আপদ! কে তোমায় গাইতে বলছে?"

লোকটা এমন বেহায়া, সে তবুও আমার কানের কাছে ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করতে লাগল, "রাগ করলে? হ্যাঁ ভাই, রাগ করলে? আচ্ছা, নাহয় কয়েকটা গান শুনিয়ে দিচ্ছি, রাগ করবার দরকার কি ভাই?"

আমি কিছু বলবার আগেই ছাগলটা আর হিজি বিজ্‌ বিজ্‌টা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ, গান হোক, গান হোক।" অমনি নেড়াটা তার পকেট থেকে মস্ত দুই তাড়া গানের কাগজ বার করে, সেগুলো চোখের কাছে নিয়ে গুনগুন করতে করতে হঠাৎ সরু গলায় চীৎকার করে গান ধরল—"লাল গানে নীল সুর, হাসি-হাসি গন্ধ।"

ঐ একটিমাত্র পদ সে একবার গাইল, দুবার গাইল, পাঁচবার, দশবার গাইল।

আমি বললাম, "এ তো ভারি উৎপাত দেখছি, গানের কি আর-কোনো পদ নেই?"

নেড়া বলল, "হ্যাঁ, আছে, কিন্তু সেটা অন্য একটা গান। সেটা হচ্ছে—অলিগলি চলি রাম, ফুটপাথে ধুমধাম, কালি দিয়ে চুনকাম। সে গান আজকাল আমি গাই না। আরেকটা গান আছে—নাইনিতালের নতুন আলু—সেটা খুব নরম সুরে গাইতে হয়। সেটাও আজকাল গাইতে পারি না। আজকাল যেটা গাই, সেটা হচ্ছে শিখিপাখার গান।" এই বলেই সে গান ধরল—

মিশিমাখা শিখিপাখা আকাশের কানে কানে
শিশি বোতল ছিপিঢাকা সরু সরু গানে গানে
আলাভোলা বাঁকা আলো আধো আধো কতদূরে,
সরু মোটা সাদা কালো ছলছল ছায়াসুরে।

আমি বললাম, "এ আবার গান হল নাকি? এর তো মাথামুণ্ডু কোনো মানেই হয় না।"

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, "হ্যাঁ, গানটা ভারি শক্ত।"

ছাগল বলল, "শক্ত আবার কোথায় ? ঐ শিশি বোতলের জায়গাটা একটু শক্ত ঠেকল, তা ছাড়া তো শক্ত কিছু পেলাম না।"

নেড়াটা খুব অভিমান করে বলল, "তা, তোমরা সহজ গান শুনতে চাও তো সে কথা বললেই হয়। অত কথা শোনাবার দরকার কি ? আমি কি আর সহজ গান গাইতে পারি না ?" এই বলে সে গান ধরল—

বাদুড় বলে, ওরে ও ভাই সজারু,
আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু।

আমি বললাম, "মজারু বলে কোনো-একটা কথা হয় না।"

নেড়া বলল, "কেন হবে না—আলবৎ হয়। সজারু কাঙ্গারু দেবদারু সব হতে পারে, মজারু কেন হবে না ?"

ছাগল বলল, "ততক্ষণ গানটা চলুক-না, হয় কি না হয় পরে দেখা যাবে।" অমনি আবার গান শুরু হল—

বাদুড় বলে, ওরে ও ভাই সজারু,
আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু।
আজকে হেথায় চাম্‌চিকে আর পেঁচারা
আসবে সবাই, মরবে ইঁদুর বেচারা।
কাঁপবে ভয়ে ব্যাঙগুলো আর ব্যাঙাচি,
ঘামতে ঘামতে ফুটবে তাদের ঘামাচি,
ছুটবে ছুঁচো লাগবে দাঁতে কপাটি,
দেখবে তখন ছিম্বি ছ্যাঙা চপাটি।

আমি আবার আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সামলে গেলাম। গান চলতে লাগল—

সজারু কয়, ঝোপের মাঝে এখনি
গিন্নী আমার ঘুম দিয়েছেন দেখ নি ?
জেনে রাখুন প্যাঁচা এবং প্যাঁচানি,
ভাঙলে সে ঘুম শুনে তাদের চ্যাঁচানি,
খ্যাংরা-খোঁচা করব তাদের খুঁচিয়ে—
এই কথাটা বলবে তুমি বুঝিয়ে।

বাদুড় বলে, পেঁচার কুটুম কুটুমী
মানবে না কেউ তোমার এ-সব ঘুঁতুমি।
ঘুমোয় কি কেউ এমন ভুসো আঁধারে?
গিন্নী তোমার হোঁৎলা এবং হাঁদাড়ে।
তুমিও দাদা হচ্ছ ক্রমে খ্যাপাটে
চিমনি-চাটা ভোঁপসা-মুখো ভ্যাঁপাটে।

গানটা আরো চলত কিনা জানি না, কিন্তু এইপর্যন্ত হতেই একটা গোলমাল শোনা গেল। তাকিয়ে দেখি আমার আশেপাশে চারদিকে ভিড় জমে গিয়েছে। একটা সজারু এগিয়ে বসে ফোঁৎফোঁৎ করে কাঁদছে আর একটা শাম্‌লাপরা কুমির মস্ত একটা বই দিয়ে আস্তে-আস্তে তার পিঠ থাবড়াচ্ছে আর ফিস্‌ফিস্‌ করে বলছে, "কেঁদো না, কেঁদো না, সব ঠিক করে দিচ্ছি।" হঠাৎ একটা তক্‌মা-আঁটা পাগড়ি-বাঁধা কোলাব্যাঙ রুল উঁচিয়ে চীৎকার করে বলে উঠল—"মানহানির মোকদ্দমা।"

অমনি কোত্থেকে একটা কালো ঝোল্‌লা-পরা হুতোমপ্যাঁচা এসে সকলের সামনে একটা উঁচু পাথরের উপর বসেই চোখ বুজে ঢুলতে লাগল, আর একটা মস্ত ছুঁচো একটা বিশ্রী নোংরা হাতপাখা দিয়ে তাকে বাতাস করতে লাগল।

প্যাঁচা একবার ঘোলা-ঘোলা চোখ করে চারদিক তাকিয়েই তক্ষুনি আবার চোখ বজে বলল, "নালিশ বাতলাও।"

বলতেই কুমিরটা অনেক কষ্টে কাঁদো-কাঁদো মুখ করে চোখের মধ্যে নখ দিয়ে খিমচিয়ে পাঁচ-ছয় ফোঁটা জল বার করে ফেলল। তার পর সর্দিবসা মোটা গলায় বলতে লাগল, "ধর্মাবতার হুজুর! এটা মানহানির মোকদ্দমা। সুতরাং প্রথমেই বুঝতে হবে মান কাকে বলে। মান মানে কচু। কচু অতি উপাদেয় জিনিস। কচু অনেকপ্রকার, যথা—মানকচু, ওলকচু, কান্দাকচু, মুখিকচু, পানিকচু, শঙ্খকচু, ইত্যাদি। কচুগাছের মূলকে কচু বলে, সুতরাং বিষয়টার একেবারে মূল পর্যন্ত যাওয়া দরকার।"

এইটুকু বলতেই একটা শেয়াল শাম্‌লা মাথায় তড়াক্‌ করে লাফিয়ে উঠে বলল, "হুজুর, কচু অতি অসার জিনিস। কচু খেলে গলা কুট্‌কুট্‌ করে, কচুপোড়া খাও বললে মানুষ চটে যায়। কচু খায় কারা? কচু খায় শুওর আর সজারু। ওয়াক্‌ থুঃ।" সজারুটা আবার ফ্যাঁৎফ্যাঁৎ করে কাঁদতে যাচ্ছিল, কিন্তু কুমির সেই প্রকাণ্ড বই দিয়ে তার মাথায় এক থাবড়া মেরে জিজ্ঞাসা করল, "দলিলপত্র সাক্ষী-সাবুদ কিছু আছে?" সজারু নেড়ার দিকে তাকিয়ে বলল, "ঐ তো ওর হাতে সব দলিল রয়েছে।" বলতেই কুমিরটা নেড়ার কাছ থেকে একতাড়া গানের কাগজ কেড়ে নিয়ে হঠাৎ এক জায়গা থেকে পড়তে লাগল—

একের পিঠে দুই গোলাপ চাঁপা জুঁই সান্‌ বাঁধানো ভুঁই
চৌকি চেপে শুই ইলিশ মাগুর রুই • গোবর জলে ধুই
পোঁটলা বেঁধে থুই হিন্‌চে পালং পুঁই • কাঁদিস কেন তুই।

সজারু বলল, "আহা ওটা কেন ? ওটা তো নয়।" কুমির বলল, "তাই নাকি ? আচ্ছা দাঁড়াও।" এই বলে সে আবার একখানা কাগজ নিয়ে পড়তে লাগল—

চাঁদনি রাতের পেতনীপিসি সজনেতলায় খোঁজ্ না রে—
থ্যাঁতলা মাথা হ্যাংলা সেথা হাড় কচাকচ্ ভোজ মারে।
চালতা গাছে আল্তা পরা নাক ঝুলানো শাঁখচুনি
মাক্ড়ি নেড়ে হাঁকড়ে বলে, আমায় তো কেঁউ ডাঁকছ নি!
মুণ্ডু ঝোলা উলটোবুড়ি ঝুলছে দেখ চুল খুলে,
বলছে দুলে, মিন্‌সেগুলোর মাংস খাব তুলতুলে।

সজারু বলল, "দূর ছাই! কি যে পড়ছে তার নেই ঠিক।"

কুমির বলল, "তা হলে কোনটা, এইটা ?—দই দম্বল, টোকো অম্বল, কাঁথা কম্বল করে সম্বল বোকা ভোম্বল—এটাও নয় ? আচ্ছা তা হলে দাঁড়াও দেখছি—নিঝুম নিশুত রাতে, একা শুয়ে তেতালাতে, খালি খালি খিদে পায় কেন রে ?—কি বললে ?—ও-সব নয় ? তোমার গিন্নীর নামে কবিতা ?—তা, সে কথা আগে বললেই হত। এই তো—রামভজনের

গিন্নীটা, বাপ রে যেন সিংহীটা! বাসন নাড়ে ঝনার্‌ঝন, কাপড় কাচে দমাদ্দম্‌।—এটাও মিলছে না? তা হলে নিশ্চয় এটা—

খুস্‌খুসে কাশি ঘুষ্‌ঘুষে জ্বর, ফুস্‌ফুসে ছ্যাঁদা বুড়ো তুই মর্‌।
মাজ্‌রাতে ব্যথা পাঁজ্‌রাতে বাত, আজ রাতে বুড়ো হবি কুপোকাত!"

সজারুটা ভয়ানক কাঁদতে লাগল, "হায়, হায়! আমার পয়সাগুলো সব জলে গেল! কোথাকার এক আহাম্মক উকিল, দলিল দিলে খুঁজে পায় না!"

নেড়াটা এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে ছিল, সে হঠাৎ বলে উঠল, "কোনটা শুনতে চাও? সেই যে--বাদুড় বলে ওরে ও ভাই সজারু—সেইটে?"

সজারু ব্যস্ত হয়ে বলল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেইটে, সেইটে।"

অমনি শেয়াল আবার তেড়ে উঠল, "বাদুড় কি বলে? হুজুর, তা হলে বাদুড়গোপালকে সাক্ষী মানতে আজ্ঞা হোক।"

কোলাব্যাঙ গাল-গলা ফুলিয়ে হেঁকে বলল, "বাদুড়গোপাল হাজির?"

সবাই এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল, কোথাও বাদুড় নেই। তখন শেয়াল বলল, "তা হলে হুজুর, ওদের সক্কলের ফাঁসির হুকুম হোক।"

কুমির বলল, "তা কেন? এখন আমরা আপিল করব?"

প্যাঁচা চোখ বুজে বলল, "আপিল চলুক! সাক্ষী আন।"

কুমির এদিক-ওদিক তাকিয়ে হিজি বিজ্‌ বিজ্‌কে জিজ্ঞাসা করল, "সাক্ষী দিবি? চার আনা পয়সা পাবি।" পয়সার নামে হিজি বিজ্‌ বিজ্‌ তড়াক্‌ করে সাক্ষী দিতে উঠেই ফ্যাক্‌ফ্যাক্‌ করে হেসে ফেলল।

শেয়াল বলল, "হাসছ কেন?"

হিজি বিজ্‌ বিজ্‌ বলল, "একজনকে শিখিয়ে দিয়েছিল, তুই সাক্ষী দিবি যে, বইটার সবুজ রঙের মলাট, কানের কাছে নীল চামড়া আর মাথার উপর লালকালির ছাপ। উকিল যেই তাকে জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি আসামীকে চেন? অমনি সে বলে উঠেছে, আজ্ঞে হ্যাঁ, সবুজ রঙের মলাট, কানের কাছে নীল চামড়া, মাথার উপর লাল কালির ছাপ—হোঃ হোঃ হোঃ হো—"

শেয়াল জিজ্ঞাসা করল, "তুমি সজারুকে চেন?"

হিজি বিজ্‌ বিজ্‌ বলল, "হ্যাঁ, সজারু চিনি, কুমির চিনি, সব চিনি। সজারু গর্তে থাকে, তার গায়ে লম্বা-লম্বা কাঁটা, আর কুমিরের গায়ে চাকা-চাকা ঢিপির মতো, তারা ছাগল-টাগল ধরে খায়।" বলতেই ব্যাকরণ শিং ব্যা-ব্যা করে ভয়ানক কেঁদে উঠল।

আমি বললাম, "আবার কি হল?"

ছাগল বলল, "আমার সেজোমামার আধখানা কুমিরে খেয়েছিল, তাই বাকি আধখানা মরে গেল।"

আমি বললাম, "গেল তো গেল, আপদ গেল। তুমি এখন চুপ কর।"

শেয়াল জিজ্ঞাসা করল, "তুমি মোকদ্দমার বিষয়ে কিছু জানো?"

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, "তা আর জানি নে? একজন নালিশ করে তার একজন উকিল থাকে, আর একজনকে আসাম থেকে নিয়ে আসে, তাকে বলে আসামী। তারও একজন উকিল থাকে। এক-একদিকে দশজন করে সাক্ষী থাকে! আর একজন জজ থাকে, সে বসে-বসে ঘুমোয়।"

প্যাঁচা বলল, "কক্ষনো আমি ঘুমোচ্ছি না, আমার চোখে ব্যারাম আছে তাই চোখ বুজে আছি।"

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, "আরো অনেক জজ দেখেছি, তাদের সক্কলেরই চোখে ব্যারাম।" বলেই সে ফ্যাক্‌ফ্যাক্ করে ভয়ানক হাসতে লাগল।

শেয়াল বলল, "আবার কি হল?"

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, "একজনের মাথার ব্যারাম ছিল, সে সব জিনিসের নামকরণ করত। তার জুতোর নাম ছিল অবিমৃষ্যকারিতা, তার ছাতার নাম ছিল প্রত্যুৎ-পন্নমতিত্ব, তার গাড়ুর নাম ছিল পরমকল্যাণবরেষু—কিন্তু যেই তার বাড়ির নাম দিয়েছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অমনি ভূমিকম্প হয়ে বাড়িটাড়ি সব পড়ে গিয়েছে। হোঃ হোঃ হোঃ হো—"

শেয়াল বলল, "বটে? তোমার নাম কি শুনি?"

সে বলল, "এখন আমার নাম হিজি বিজ্ বিজ্।"

শেয়াল বলল, "নামের আবার এখন আর তখন কি?

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, "তাও জানো না? সকালে আমার নাম থাকে আলুনারকেল আবার আর একটু বিকেল হলেই আমার নাম হয়ে যাবে রামতাড়ু।"

শেয়াল বলল, "নিবাস কোথায়?"

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, "কার কথা বলছ? শ্রীনিবাস? শ্রীনিবাস দেশে চলে গিয়েছে।" অমনি ভিড়ের মধ্যে থেকে উধো আর বুধো একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "তা হলে শ্রীনিবাস নিশ্চয়ই মরে গিয়েছে!"

উধো বলল, "দেশে গেলেই লোকেরা সব হুস্‌হুস্ করে মরে যায়।"

বুধো বলল, "হাবুলের কাকা যেই দেশে গেল অমনি শুনি সে মরে গিয়েছে।"

শেয়াল বলল, "আঃ, সবাই মিলে কথা বোলো না, ভারি গোলমাল হয়।"

শুনে উধো বুধোকে বলল, "ফের সবাই মিলে কথা বলবি তো তোকে মারতে-মারতে সাবাড় করে ফেলব।" বুধো বলল, "আবার যদি গোলমাল করিস তা হলে তোকে ধরে একেবারে পোঁটলা-পেটা করে দেব।'

শেয়াল বলল, "হুজুর, এরা সব পাগল আর আহাম্মক, এদের সাক্ষীর কোনো মূল্য নেই।"

শুনে কুমির রেগে ল্যাজ আছড়িয়ে বলল, "কে বলল মূল্য নেই? দস্তুরমতো চার আনা পয়সা খরচ করে সাক্ষী দেওয়ানো হচ্ছে।" বলেই সে তক্ষুনি ঠক্‌ঠক্ করে ষোলোটা পয়সা গুণে হিজি বিজ্ বিজের হাতে দিয়ে দিল।

অমনি কে যেন ওপর থেকে বলে উঠল, "১নং সাক্ষী, নগদ হিসাব, মূল্য চার আনা।" চেয়ে দেখলাম কাক্কেশ্বর বসে-বসে হিসেব লিখছে।

শেয়াল আবার জিজ্ঞাসা করল, "তুমি এ বিষয়ে আর কিছু জানো কি-না?"

হিজি বিজ্ বিজ্ খানিক ভেবে বলল, "শেয়ালের বিষয়ে একটা গান আছে, সেইটা জানি।"

শেয়াল বলল, "কি গান শুনি?"

হিজি বিজ্ বিজ্ সুর করে বলতে লাগল, "আয়, আয়, আয়, শেয়ালে বেগুন খায়, তারা তেল আর নুন কোথায় পায়—"

বলতেই শেয়াল ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠল, "থাক্-থাক্, সে অন্য শেয়ালের কথা, তোমার সাক্ষী দেওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে।"

এদিকে হয়েছে কি, সাক্ষীরা পয়সা পাচ্ছে দেখে সাক্ষী দেবার জন্য ভয়ানক হুড়োহুড়ি লেগে গিয়েছে। সবাই মিলে ঠেলাঠেলি করছে, এমন সময় হঠাৎ দেখি কাক্কেশ্বর ঝুপ্ করে গাছ থেকে নেমে এসে সাক্ষীর জায়গায় বসে সাক্ষী দিতে আরম্ভ করেছে। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই সে বলতে আরম্ভ করল, "শ্রীশ্রীভূশণ্ডিকাগায় নমঃ। শ্রীকাক্কেশ্বর কুচ্‌কুচে, ৪১নং গেছোবাজার, কাগেয়াপটি। আমরা হিসাবী ও বেহিসাবী খুচরা পাইকারী সকলপ্রকার গণনার কার্য—"

শেয়াল বলল, "বাজে কথা বোলো না, যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও। কি নাম তোমার?"

কাক বলল, "কি আপদ! তাই তো বলছিলাম—শ্রীকাক্কেশ্বর কুচ্‌কুচে।"

শেয়াল বলল, "নিবাস কোথায়?"

কাক বলল, "বললাম যে কাগেয়াপটি।"

শেয়াল বলল, "সে এখান থেকে কতদূর?"

কাক বলল, "তা বলা ভারি শক্ত। ঘণ্টা হিসেবে চার আনা, মাইল হিসাবে দশ পয়সা, নগদ দিলে দুই পয়সা কম। যোগ করলে দশ আনা, বিয়োগ করলে তিন আনা, ভাগ করলে সাত পয়সা, গুণ করলে একুশ টাকা।"

শেয়াল বলল, "আর বিদ্যে জাহির করতে হবে না। জিজ্ঞাসা করি, তোমার বাড়ি যাবার পথটা চেন তো?"

কাক বলল, "তা আর চিনি নে? এই তো সামনেই সোজা পথ দেখা যাচ্ছে।"

শেয়াল বলল, "এ-পথ কতদূর গিয়েছে?"

কাক বলল, "পথ আবার যাবে কোথায়? যেখানকার পথ সেখানেই আছে। পথ কি আবার এদিক-ওদিক চরে বেড়ায়? না, দার্জিলিঙে হাওয়া খেতে যায়?"

শেয়াল বলল, "তুমি তো ভারি বেয়াদব হে! বলি, সাক্ষী দিতে যে এয়েছ, মোকদ্দমার কথা কি জানো?"

কাক বলল, "খুব যা হোক! এতক্ষণ বসে-বসে হিসেব করল কে? যা কিছু জানতে চাও আমার কাছে পাবে। এই তো, প্রথমেই, মান কাকে বলে? মান মানে

কচুরি। কচুরি চারপ্রকার—হিঙে কচুরি, খাস্তা কচুরি নিমকি আর জিবেগজা! খেলে কি হয়? খেলে শেয়ালদের গলা কুট্‌কুট্‌ করে, কিন্তু কাগেদের করে না। তার পর একজন সাক্ষী ছিল, নগদ মূল্য চার আনা, সে আসামে থাকত, তার কানের চামড়া নীল হয়ে গেল—তাকে বলে কালাজ্বর। তার পর একজন লোক ছিল সে সকলের নামকরণ করত—শেয়ালকে বলত তেলচোরা, কুমিরকে বলত অষ্টাবক্র, প্যাঁচাকে বলত বিভীষণ—" বলতেই বিচার সভায় একটা ভয়ানক গোলমাল বেধে গেল। কুমির হঠাৎ খেপে গিয়ে টপ্‌ করে কোলাব্যাঙকে খেয়ে ফেলল, তাই দেখে ছুঁচোটা কিচ্‌ কিচ্‌ কিচ্‌ কিচ্‌ করে ভয়ানক চ্যাঁচাতে লাগল, শেয়াল একটা ছাতা দিয়ে হুস্‌ হুস্‌ করে কাক্কেশ্বরকে তাড়াতে লাগল।

প্যাঁচা গম্ভীর হয়ে বলল, "সবাই চুপ কর, আমি মোকদ্দমার রায় দেব।" এই বলেই কানে-কলম-দেওয়া খরগোশকে হুকুম করল, "যা বলছি লিখে নাও : মানহানির মোকদ্দমা, চব্বিশ নম্বর। ফরিয়াদী—সজারু। আসামী—দাঁড়াও। আসামী কই?" তখন সবাই বলল, "ঐ যা! আসামী তো কেউ নেই।" তাড়াতাড়ি ভুলিয়ে-ভালিয়ে নেড়াকে আসামী দাঁড় করানো হল। নেড়াটা বোকা, সে ভাবল আসামীরাও বুঝি পয়সা পাবে, তাই সে কোনো আপত্তি করল না।

হুকুম হল—নেড়ার তিনমাস জেল আর সাতদিনের ফাঁসি। আমি সবে ভাবছি এরকম অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি করা উচিত, এমন সময় ছাগলটা হঠাৎ "ব্যা-করণ শিং" বলে পিছন থেকে তেড়ে এসে আমায় এক ঢুঁ মারল, তার পরেই আমার কান কামড়ে দিল। অমনি চারদিকে কিরকম সব ঘুলিয়ে যেতে লাগল, ছাগলটার মুখটা ক্রমে বদলিয়ে শেষটায় ঠিক মেজোমামার মতো হয়ে গেল। তখন ঠাওর করে দেখলাম, মেজোমামা আমার কান ধরে বলছেন, "ব্যাকরণ শিখবার নাম করে বুঝি পড়ে-পড়ে ঘুমোনো হচ্ছে?"

আমি তো অবাক! প্রথমে ভাবলাম বুঝি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম। কিন্তু, তোমরা বললে বিশ্বাস করবে না, আমার রুমালটা খুঁজতে গিয়ে দেখি কোথাও রুমাল নেই, আর একটা বেড়াল বেড়ার উপর বসে বসে গোঁফে তা দিচ্ছিল, হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়েই খচ্‌মচ্‌ করে নেমে পালিয়ে গেল। আর ঠিক সেই সময়ে বাগানের পিছন থেকে একটা ছাগল ব্যা করে ডেকে উঠল।

আমি বড়োমামার কাছে এ-সব কথা বলেছিলাম, কিন্তু বড়োমামা বললেন, "যা, যা, কতগুলো বাজে স্বপ্ন দেখে তাই নিয়ে গল্প করতে এসেছে।" মানুষের বয়স হলে এমন হোঁতকা হয়ে যায়, কিছুতেই কোনো কথা বিশ্বাস করতে চায় না। তোমাদের কিনা এখনো বেশি বয়স হয় নি, তাই তোমাদের কাছে ভরসা করে এ-সব কথা বললাম।

সন্দেশ—জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র, ১৩২৯

কবিতাগুচ্ছ

'কবিতাগুচ্ছে'র অন্তর্গত তেরোটি কবিতা ১৩২৩ মাঘ থেকে ১৩৩০ কার্তিক এই প্রায় সাত বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে সন্দেশে প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে একমাত্র 'কিছু চাই' কবিতাটি সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পরে ১৩৩০-এর কার্তিক-সংখ্যা সন্দেশে প্রকাশিত হয়। অন্যান্য কবিতাগুলির প্রকাশের সময় সুকুমারই ছিলেন সন্দেশের সম্পাদক। ১৩১৩ বৈশাখ সংখ্যা 'মুকুল'-এ 'কানা-খোঁড়া সংবাদ' প্রথম প্রকাশিত হওয়ার সাড়ে চোদ্দো বছর পরে সংশোধিত আকারে সন্দেশে কবিতাটির বর্তমান-পাঠ প্রকাশিত হয়।

'আবোল তাবোল' পর্যায়ের কবিতাগুলির প্রথম কবিতা 'খিচুড়ি'র প্রকাশ কাল—১৩২১-এর মাঘ এবং শেষ কবিতা 'পালোয়ান' প্রকাশিত হয় ১৩৩০-এর ভাদ্র-সংখ্যা সন্দেশে—অর্থাৎ ঐ-সব উদ্ভট খেয়ালরসের কবিতার পাশাপাশিই বর্তমান পর্যায়ের নির্মল হাস্যরসের কবিতাগুলিও তিনি প্রায় একই সময় রচনা করে চলেছিলেন। কাব্যগুণে 'আবোল তাবোল' পর্যায়ের কবিতাগুলির সঙ্গে তুলনীয় না হলেও এই কবিতাগুলির মধ্যে সরল হাস্যরসিক সুকুমারের পরিচয় পেতে কষ্ট হয় না; উপরন্তু এগুলির কয়েকটিতে নাট্যগুণ ও কাহিনীরস এতে ভিন্নতর আস্বাদন এনে দিয়েছে। এই পর্যায়ের কবিতার মধ্যে 'আবোল তাবোল', 'বাবু', 'কানা-খোঁড়া সংবাদ' ও 'কিছু চাই' এই চারটি কবিতা ছাড়া অন্যগুলি সিগনেট প্রেস প্রকাশিত সুকুমার রায়ের কবিতা-সংকলন 'খাই খাই'-এর অন্তর্ভুক্ত হলেও, সব কবিতার সন্দেশে মুদ্রিত পাঠ-ই আমরা এ ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছি। কবিতাগুলির বিন্যাসেও সন্দেশে প্রকাশিত কালানুক্রম অনুসৃত হয়েছে।

সূচীপত্র

কাজের লোক

প্রথম। বাঃ—আমার নাম 'বাঃ'!
বসে থাকি তোফা তুলে পায়ের উপর পা!
লেখাপড়ার ধার ধারি নে, বছর ভরে ছুটি,
হেসে খেলে আরাম করে দুশো মজা লুটি।
কারে কবে কেয়ার করি, কিসের করি ডর?
কাজের নামে কম্প দিয়ে গায়ে আসে জ্বর।
গাধার মতো খাটিস তোরা মুখটা করে চুন—
আহাম্মুকি কাণ্ড দেখে হেসেই আমি খুন।

সকলে। আস্ত একটা গাধা তুমি স্পষ্ট গেল দেখা,
হাসছ যত, কান্না তত কপালেতে লেখা।

দ্বিতীয়। 'যদি' বলে ডাকে আমায়, নামটি আমার 'যদি'-
আশায় আশায় বসে থাকি হেলান দিয়ে গদি।
সব কাজেতে থাকত যদি খেলার মতো মজা,
লেখাপড়া হত যদি জলের মতো সোজা—
স্যাণ্ডোসমান ষণ্ডা হতাম যদি গায়ের জোরে,
প্রশংসাতে আকাশ-পাতাল যদি যেত ভরে—
উঠে পড়ে লেগে যেতাম বাজে তর্ক ফেলে।
করতে পারি সবই—যদি সহজ উপায় মেলে।

সকলে। হাতের কাছে সুযোগ, তবু 'যদি'র আশায় বসে—
নিজের মাথা খাচ্ছ বাপু নিজের বুদ্ধিদোষে।

তৃতীয়। আমার নাম 'বটে'! আমি সদাই আছি চটে—
কট্‌মটিয়ে তাকাই যখন, সবাই পালায় ছুটে।

চশমা পরে বিচার করে, চিরে দেখাই চুল—
উঠতে বসতে করছে সবাই হাজার গণ্ডা ভুল।
আমার চোখে ধূলো দেবে সাধ্যি আছে কার?
ধমক শুনে ভূতের বাবা হচ্ছে পগার পার!
হাসছ? বটে! ভাবছ বুঝি মস্ত তুমি লোক,
একটি আমার ভেংচি খেলে উল্টে যাবে চোখ।

সকলে। দিচ্ছ গালি, লোকের তাতে কিবা এল গেল?
আকাশেতে থুতু ছুঁড়ে—নিজের গায়েই ফেল।

চতুর্থ। আমার নাম 'কিন্তু', আমায় 'কিন্তু' বলে ডাকে,
সকল কাজে একটি কিছু গলদ লেগে থাকে।
দশটা কাজে লাগি কিন্তু আটটা করি মাটি,
ষোলো-আনা কথায় কিন্তু সিকিমাত্র খাঁটি।
লম্ফঝম্প বহুৎ কিন্তু কাজের নেইকো ছিরি—
ফোঁস্ করে যাই তেড়ে—আবার ল্যাজ গুটিয়ে ফিরি।
পাঁচটা জিনিস গড়তে গেলে, দশটা ভেঙে চুর—
বল্ দেখি ভাই, কেমন আমি সাবাস বাহাদুর!

সকলে। উচিত তোমায় বেঁধে রাখা নাকে দিয়ে দড়ি,
বেগার খাটা পণ্ড কাজের মূল্য কানাকড়ি।

পঞ্চম। আমার নাম 'তবু', তোমরা কেউ কি আমায় চেনো?
দেখতে ছোটো, তবু আমার সাহস আছে জেনো।
এতটুকু মানুষ, তবু দ্বিধা নাইকো মনে,
যে কাজেতেই লাগি আমি খাটি প্রাণপণে।
এমনি আমার জেদ, যখন অঙ্ক নিয়ে বসি,
একুশবারে না হয় যদি, বাইশবারে কষি।
হাজার আসুক বাধা, তবু উৎসাহ না কমে,
হাজার লোকে চোখ রাঙালে, তবু না যাই দমে।

সকলে। নিষ্কর্মারা গেল কোথা, পালাল কোন্ দেশে?
কাজের মানুষ কারে বলে দেখুক এখন এসে।
হেসে খেলে, শুয়ে বসে, কত সময় যায়,
সময়টা যে কাজে লাগায়, চালাক বলে তায়।

সন্দেশ—মাঘ, ১৩২৩

আবোল তাবোল

এক যে ছিল রাজা—(থুড়ি,
রাজা নয় সে ডাইনিবুড়ি) !
তার যে ছিল ময়ূর—(না না,
ময়ূর কিসের ? ছাগলছানা) ।
উঠোনে তার থাকত পোঁতা—
—(বাড়িই নেই, তার উঠোন কোথা) ?
শুনেছি তার পিসতুতো ভাই—
—(ভাই নয়তো, মামা-গোঁসাই) ।
বলত সে তার শিষ্যটিরে—
—(জন্মবোবা, বলবে কিরে) !
যাহোক, তারা তিনটি প্রাণী—
—(পাঁচটি তারা সবাই জানি) !
থোও না বাপু খ্যাঁচাখেঁচি !
(আচ্ছা বল, চুপ করেছি) ।
তার পরে সেই সন্ধ্যাবেলা,
যেমনি না তার ওষুধ গেলা,
অমনি তেড়ে জটায় ধরা—
—(কোথায় জটা ? টাক যে ভরা) !
হোক-না টেকো, হোক-না বুড়ো,
ধরব ঠেসে টুঁটির চুড়ো ;
হোক-না বামুন, হোক-না মুচি,
কাটব তেড়ে—কুচিকুচি ;
পিটব তারে হাড়ে মাসে,
দে দমাদম আড়ে পাশে ।
এখন বাছা পালাও কোথা ?
গল্প বলা সহজ কথা ?

সন্দেশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪

অসম্ভব নয়

এক যে ছিল সাহেব, তাহার
গুণের মধ্যে নাকের বাহার ।
তার যে গাধা বাহন, সেটা
যেমন পেটুক তেমনি ট্যাঁটা ।
ডাইনে বললে যায় সে বামে
তিন পা যেতে দুবার থামে ।
চলতে চলতে থেকে থেকে
খানায় খন্দে পড়ে বেঁকে ।
ব্যাপার দেখে এমনিতরো
সাহেব বললে "সবুর করো—
মামদোবাজি আমার কাছে ?
এ রোগেরও ওষুধ আছে ।"
এই-না বলে ভীষণ ক্ষেপে,
গাধার পিঠে বসল চেপে
মুলোর ঝুঁটি ঝুলিয়ে নাকে ।
—আর কি গাধা ঝিমিয়ে থাকে ?
মুলোর গন্ধে টগ্‌বগিয়ে
দৌড়ে চলে লম্ফ দিয়ে—
যতই ছোটে 'ধরব' বলে
ততই মুলো এগিয়ে চলে
খাবার লোভে উদাস প্রাণে
কেবল ছোটে মুলোর টানে—
ডাইনে বাঁয়ে মুলোর তালে
ফেরেন গাধা নাকের চালে ।

সন্দেশ—ফাল্গুন, ১৩২৪

জীবনের হিসাব

বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই চড়ি শখের বোটে,
মাঝিরে কন, "বলতে পারিস, সূর্যি কেন ওঠে ?
চাঁদটা কেন বাড়ে কমে ? জোয়ার কেন আসে ?"
বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে ফ্যাল্‌ফেলিয়ে হাসে।
বাবু বলেন, "সারা জনম মরলি রে তুই খাটি,
জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারি-আনাই মাটি !"

খানিক বাদে কহেন বাবু, "বল্ তো দেখি ভেবে,
নদীর ধারা ক্যাম্‌নে আসে পাহাড় হতে নেবে ?
বল্ তো কেন লবণপোরা সাগরভরা পানি ?"
মাঝি সে কয়, "আরে মশয় অত কি আর জানি ?"
বাবু বলেন, "এই বয়সে জানিস নেও তাকি ?
জীবনটা তোর নেহাৎ খেলো, অষ্ট-আনাই ফাঁকি।"

আবার ভেবে কহেন বাবু, "বল্ তো ওরে বুড়ো,
কেন এমন নীল দেখা যায় আকাশের ঐ চুড়ো ?
বল্ তো দেখি সূর্য-চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন ?"
বৃদ্ধ বলে, "আমায় কেন লজ্জা দেছেন হেন ?"
বাবু বলেন, "বলব কি আর, বলব তোরে কি তা—
দেখছি এখন জীবনটা তোর বারো-আনাই বৃথা।"

খানিক বাদে ঝড় উঠেছে, ঢেউ উঠেছে ফুলে,
বাবু দেখেন, নৌকোখানি ডুবল বুঝি দুলে।
মাঝিরে কন, "এ কি আপদ! ওরে ও ভাই মাঝি,
ডুবল নাকি নৌকো এবার ? মরব নাকি আজি ?"
মাঝি শুধোয়, "সাঁতার জানো ?" মাথা নাড়েন বাবু,
মূর্খ মাঝি বলে, "মশাই, এখন কেন কাবু ?"
বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব কোরো পিছে,
তোমার দেখি জীবনখানা ষোলো-আনাই মিছে।"

সন্দেশ—শ্রাবণ, ১৩২৫

ভেজীয়ান

চলে খচ্‌খচ্‌, রাগে গজ্‌গজ, জুতা মচ্‌মচ্‌ তানে,
ভুরু কট্‌মট্‌, ছড়ি ফট্‌ফট্‌, লাথি চট্‌পট্‌ হানে।

দেখে বাঘরাগ, লোকে 'ভাগভাগ' করে আগভাগ থেকে,
ভয়ে লাফঝাঁপ, বলে 'বাপ্‌ বাপ্‌' সবে হাবভাব দেখে।

লাথি চার চার খেয়ে মার্জার ছোটে যার যার ঘরে,
মহা উৎপাত করে হুট্‌পাট্‌, চলে ফুটপাথ পরে।

ঝাড়ু বর্দার হারুসর্দার ফেরে ঘরদ্বার ঝেড়ে,
তারই বালতি এ, দেখে ফাল দিয়ে আসে পালটিয়ে তেড়ে।

রেগে লালমুখে, হেঁকে গাল রুখে মারে তাল ঠুকে দাপে,
মারে ঠন্‌ঠন্‌, হাড়ে টন্‌টন্‌, মাথা ঝন্‌ঝন্‌ কাঁপে!

পায়ে কালসিটে! কেন বালতিতে মেরে চাল দিতে গেলে?
বুঝি ঠ্যাং যায়, খোঁড়া ল্যাংচায় দেখে ভ্যাংচায় ছেলে।

সন্দেশ—কার্তিক, ১৩২৫
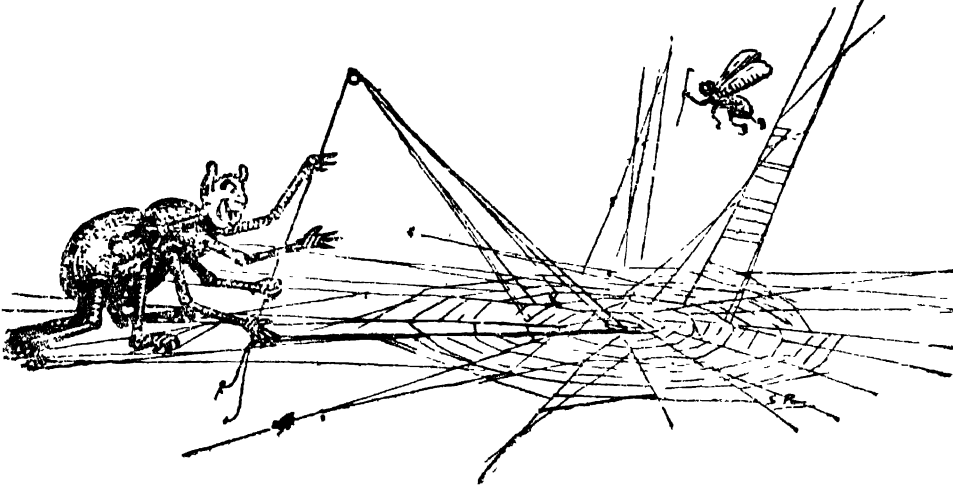
মূর্খমাছি

মাকড়সা। সানবাঁধা মোর আঙিনাতে—
জাল বুনেছি কালকে রাতে,
ঝুল ঝেড়ে সব সাফ করেছি বাসা।
আয়-না মাছি, আমার ঘরে
আরাম পাবি বসলে পরে,
ফরাস পাতা দেখবি কেমন খাসা!

মাছি। থাক্, থাক্, থাক্, আর বলে না,
আনকথাতে মন গলে না—
ব্যবসা তোমার সবার আছে জানা।
ঢুকলে তোমার জালের ঘেরে,
কেউ কোনোদিন আর কি ফেরে?
বাপ্ রে! সেথায় ঢুকতে মোদের মানা।

মাকড়সা। হাওয়ায় দোলে জালের দোলা,

চারদিকে তার জাল্‌না খোলা,

আপনি ঘুমে চোখ যে আসে জুড়ে!

আয়-না হেথা, হাত পা ধুয়ে

পাখনা মুড়ে থাক্‌-না শুয়ে—

ভন্‌ ভন্‌ ভন্‌, মরবি কেন উড়ে?

মাছি। কাজ নেই মোর দোলায় দুলে,

কোথায় তোমার কথায় ভুলে

প্রাণটা নিয়ে টান পড়ে ভাই শেষে।

তোমার ঘরে ঘুম যদি পায়

সে ঘুম কভু ভাঙবে না হায়—

সে ঘুম নাকি এমন সর্বনেশে!

মাকড়সা। মিথ্যে কেন ভাবিস মনে?

দেখ্‌-না এসে ঘরের কোণে,

ভাঁড়ার ভরা খাবার আছে কত!

দে টপাটপ্‌ ফেলবি মুখে,

নাচবি, গাবি, থাকবি সুখে

ভাবনা ভুলে বাদশা-রাজার মতো

মাছি। লোভ দেখালেই ভুলবে ভবি,

ভাবছ আমায় তেমনি লোভী!

মিথ্যে দাদা, ভোলাও কেন খালি?

করব কি ছাই ভাঁড়ার দেখে?

প্রণাম করি আড়[illegible] থেকে—

আজকে তোমার সেই গুড়ে ভাই বালি।

মাকড়সা। নধর কালো বদন ভরে
রূপ যে কত উপছে পড়ে !
অবাক দেখি মুকুটমালা শিরে !
হাজার চোখে মানিক জ্বলে !
ইন্দ্রধনু পাখার তলে !—
ছয় পা ফেলে আয়-না দেখি ধীরে

মাছি। মন ফুর্‌ফুর্‌ ফুর্তি নাচে—
একটুখানি যাই-না কাছে !
যাই যাই যাই—বাপ্‌ রে এ কি ধাঁধা !
ও দাদাভাই, রক্ষে কর !
ফাঁদ পাতা এ কেমনতরো !
আটকা পড়ে, হাত-পা হ'ল বাঁধা।

দুষ্টুলোকের মিষ্টি কথায়
নাচলে লোকের স্বস্তি কোথায় ?
এমনি দশাই তার কপালে লেখে।
কথার পাকে মানুষ মেরে
মাকড়জীবী ঐ যে ফেরে
গড় করি তায় অনেক তফাত থেকে ॥

(বিখ্যাত ইংরেজি কবিতার অনুসরণে)

সন্দেশ—শ্রাবণ, ১৩২৭

হারিয়ে পাওয়া

ঠাকুরদাদার চশমা কোথা ?
ওরে গণ্‌শা, হাবুল ভোঁতা,
দেখ্‌-না হেথা, দেখ্‌-না হোথা—খোঁজ্‌-না নীচে গিয়ে

কই কই কই ? কোথায় গেল ?
টেবিল টানো, ডেস্কো ঠেল,
ঘরদোর সব উল্‌টে ফেল—খোঁচাও লাঠি দিয়ে।

খুঁজছে মিছে কুঁজোর পিছে,
জুতোর ফাঁকে, খাটের নীচে,
কেউ-বা জোরে পর্দা খিঁচে—বিছ্‌না দেখে ঝেড়ে—

লাফিয়ে ঘুরে হাঁপিয়ে ঘেমে,
ক্লান্ত সবে পড়ল থেমে,
ঠাকুরদাদা আপনি নেমে আসেন তেড়েমেড়ে।

বলেন রেগে, "চশমাটা কি
ঠ্যাং গজিয়ে ভাগল নাকি ?
খোঁজার নামে কেবল ফাঁকি—দেখছি আমি এসে !"

যেমন বলা দারুণ রোষে,
কপাল থেকে অমনি খসে
চশমা পড়ে তক্তপোশে—সবাই ওঠে হেসে।

সন্দেশ—ভাদ্র, ১৩২৭

কানা-খোঁড়া সংবাদ

পুরাতন কালে ছিল দুই রাজা,
নাম-ধাম নাহি জানা,
একজন তার খোঁড়া অতিশয়,
অপর ভূপতি কানা।
মন ছিল খোলা, অতি আলাভোলা,
ধরমেতে ছিল মতি,
পরধনে সদা ছিল দোঁহাকার
বিরাগ বিকট অতি !
প্রতাপের কিছু নাহি ছিল ত্রুটি,
মেজাজ রাজারই মতো,
শুনেছি কেবল বুদ্ধিটা নাকি
নাহি ছিল সরু তত।
ভাই ভাই মতো ছিল দুই রাজা,
না ছিল ঝগড়াঝাঁটি
হেনকালে আসি তিন হাত জমি
সকল করিল মাটি।
তিন হাত জমি হেন ছিল তাহা
কেহ নাহি জানে কার,
কহে খোঁড়া রায়, "এক চক্ষু যার
এ জমি হইবে তার।"

শুনি কানা রাজা ক্রোধ করি কয়,
"আরে অভাগার পুত্র !
এ জমি তোমারই দেখ-না এখানি,
খুলিয়া কাগজপত্র।"
নক্‌শা রেখেছে একশো বছর
বাক্সে বাঁধিয়া আঁটি,
কীট কুটমতি কাটিয়া কাটিয়া
করিয়াছে তারে মাটি ;
কাজেই তর্ক না মিটিল হায়,
বিরোধ বাধিল ভারি,
হইল যুদ্ধ দ্বন্দ্ব মতন
চৌদ্দ বছর ধরি।
মরিল সৈন্য, ভাঙিল অস্ত্র,
রক্ত চলিল বহি,
তিন হাত জমি তেমনি রহিল,
কারও হারজিৎ নাহি।

তবে খোঁড়া রাজা কহে, "হায়, হায়,
তর্ক বিষম বটে,
ঘোরতর রণে অতি অকারণে,
মরণ সবার ঘটে।"
বলিতে বলিতে চটাৎ করিয়া
হঠাৎ মাথায় তার
অদ্ভুত এক বুদ্ধি আসিল
অতীব চমৎকার।
কহিল তখন খোঁড়া মহারাজ,
"শুন মোর কানা ভাই,
তুচ্ছ কারণে রক্ত ঢালিয়া
কখনো সুযশ নাই।
তার চেয়ে জমি দান করে ফেল
আপদ শান্তি হবে।"
কানা রাজা কহে, "খাসা কথা ভাই
কারে দিই কহ তবে।"
কহেন খঞ্জ, "আমার রাজ্যে
আছে তিন মহাবীর—
একটি পেটুক, অপর অলস
তৃতীয় কুস্তিগীর।

তোমার মুলুকে কে আছে এমন
এদের হারাতে পারে ?—
সবার সমুখে তিন হাত জমি
বখসিস্ দিব তারে।"
কানা রাজা কহে, "ভীমের দোসর
আছে তো মল্ল মম,
ফলাহারে পটু পঁচাশি পেটুক
অলস কুম্‌ড়াসম।
দেখা যাবে কার বাহাদুরি বেশি
আসুক তোমার লোক ;
যে জিতিবে সেই পাবে এই জমি"—
খোঁড়া বলে, "তাই হোক।"

পড়িল নোটিস ময়দান মাঝে
আলিশান সভা হবে,
তামাশা দেখিতে চারিদিক হতে
ছুটিয়া আসিল সবে।
ভয়ানক ভিড়ে ভরে পথ ঘাট,
লোকে হল লোকাকার,
মহা কোলাহল, দাঁড়াবার ঠাঁই
কোনোখানে নাহি আর।
তার পর ক্রমে রাজার হুকুমে
গোলমাল গেল থেমে,
দুই দিক হতে দুই পালোয়ান
আসরে আসিল নেমে।
লম্ফে ঝম্ফে যুঝিল মল্ল
গজকচ্ছপ হেন।
রুষিয়া মুষ্টি হানিল দোঁহায়—
বজ্র পড়িল যেন।
গুঁতাইল কত, ভোঁতাইল নাসা
উপাড়িল গোঁফদাড়ি,
যতেক দন্ত করিল অন্ত
ভীষণ চাপট মারি।
তার পরে দোঁহে দোঁহারে ধরিয়া
ছুঁড়িল এমনি জোরে,
গোলার মতন গেল গো উড়িয়া
দুই বীর বেগভরে।

কি হল তাদের কেহ নাহি জানে
নানা কথা কয় লোকে,
আজও কেহ তার পায় নি খবর
কেহই দেখে নি চোখে।

যাহোক এদিকে, কুস্তির শেষে
এল পেটুকের পালা,
যেন অতিকায় ফুটবল দুটি,
অথবা ঢাকাই জালা।
ওজনেতে তারা কেহ নহে কম
ভোজনেতে ততোধিক,
বপু সুবিপুল, ভুঁড়ি বিভীষণ—
ভারী সাতমণ ঠিক।
অবাক দেখিছে সভার সকলে
আজব কাণ্ড ভারি—
ধামা ধামা লুচি নিমিষে ফুরায়
দই ওঠে হাঁড়ি হাঁড়ি।
দাঁড়িপাল্লায় মাপিয়া সকলে
দেখে আহারের পরে,
দুজনেই ঠিক বেড়েছে ওজনে
সাড়ে তিনমণ করে।
কানা রাজা বলে, "এ কি হল জ্বালা,
আক্কেল নাহি কারও,
কেহ কি বোঝে না, সোজা কথা এই—
হয় জেতো, নয় হারো।"
তার পর এল কুঁড়ে দুইজন
ঝাঁকার উপরে চড়ে,
সভামাঝে দোঁহে শুয়ে চিৎপাত
চুপচাপ রহে পড়ে।
হাত নাহি নাড়ে, চোখ নাহি মেলে,
কথা নাহি কারও মুখে,
দিন দুই তিন রহিল পড়িয়া
নাসাগীত গাহি সুখে।
জঠরে যখন জ্বলিল আগুন
পরান কণ্ঠাগত,
তখন কেবল মেলিয়া আনন
থাকিল মড়ার মতো।

দয়া করে তবে সহৃদয় কেহ
নিকটে আসিয়া ছুটি,
মুখের নিকটে ধরিল তাদের
চাটিম কদলী দুটি।

খঞ্জের লোকে কহিল কষ্টে,
"ছাড়িয়ে দেনা রে ভাই,"
কানার ভৃত্য রহিল হাঁ করে,
মুখে তার কথা নাই!

তখন সকলে কাষ্ঠ আনিয়া
তায় কেরোসিন ঢালি,
কুঁড়েদের গায়ে চাপাইয়া রোষে
দেশলাই দিল জ্বালি।

খোঁড়ার প্রজাটি "বাপ্ রে!" বলিয়া
লাফ দিয়া তাড়াতাড়ি,
কম্পিতপদে চম্পট দিল
একেবারে সভা ছাড়ি।

'দুয়ো' বলি সবে দেয় করতালি,
পিছু পিছু ডাকে 'ফেউ'
কানার অলস বলে, "কি আপদ!
ঘুমুতে দিবি নে কেউ?"

শুনে সবে বলে, "ধন্য ধন্য!
কুঁড়ে-কুল-চূড়ামণি!"
ছুটিয়া তাহারে বাহির করিল
আগুন হইতে টানি।

কানার লোকের গুণপনা দেখে
কানা রাজা খুশি ভারি,
জমি তো দিলই আরো দিল কত,
টাকাকড়ি, ঘরবাড়ি।

সন্দেশ—কার্তিক, ১৩২৭

সাধে কি বলে গাধা

বললে গাধা মনের দুঃখে অনেকখানি ভেবে—
"বয়েস গেল খাটতে খাটতে, বৃদ্ধ হলাম এবে
কেউ করে না তোয়াজ তবু, সংসারের কী রীতি !
ইচ্ছে করে এক্ষুনি দিই কাজেকর্মে ইতি ।
কোথাকার ঐ নোংরা কুকুর, আদর যে তার কত—
যখন তখন ঘুমোচ্ছে সে লাটসাহেবের মতো !
ল্যাজ নেড়ে যেই ঘেউ ঘেউ ঘেউ, লাফিয়ে দাঁড়ায় কোলে,
মনিব আমার বোকচন্দর, আহ্লাদে যান গলে ।
আমিও যদি সেয়না হতুম, আরামে চোখ মুদে
রোজ মনিবের মন ভোলাতুম অমনি নেচে কুঁদে ।
ঠ্যাং নাচাতুম, ল্যাজ দোলাতুম, গান শোনাতুম সাধা—
এ বুদ্ধিটা হয় নি আমার—সাধে কি বলে গাধা !"

•

বুদ্ধি এঁটে বসল গাধা আহ্লাদে ল্যাজ নেড়ে ।
নাচল কত, গাইল কত, প্রাণের মায়া ছেড়ে ।

তার পরেতে শেষটা ক্রমে স্ফূর্তি এল প্রাণে
চলল গাধা খোদ মনিবের ড্রইংরুমের পানে।
মনিবসাহেব ঝিমুচ্ছিলেন চেয়ারখানি জুড়ে,
গাধার গলার শব্দে হঠাৎ তন্দ্রা গেল উড়ে।
চমকে উঠে গাধার নাচন যেমনি দেখেন চেয়ে,
হাসির চোটে সাহেব বুঝি মরেন বিষম খেয়ে।
ভাবল গাধা—এই তো মনিব জল হয়েছেন হেসে
এইবারে যাই আদর নিতে কোলের কাছে ঘেঁষে।

এই-না ভেবে এক্কেবারে আহ্লাদেতে ক্ষেপে
চড়ল সে তার হাঁটুর ওপর দুই-পা তুলে চেপে।
সাহেব ডাকেন 'ত্রাহি ত্রাহি' গাধাও ডাকে 'ঘ্যাঁকো'
(অর্থাৎ কিনা 'কোলে চড়েছি, এখন আমায় দ্যাখো !')
ডাক শুনে সব দৌড়ে এল ব্যস্ত হয়ে ছুটে,
দৌড়ে এল চাকর-বাকর মিস্ত্রি মজুর মুটে।
দৌড়ে এল পাড়ার লোকে, দৌড়ে এল মালি—
কারুর হাতে ডাণ্ডা লাঠি, কারু-বা হাত খালি।
ব্যাপার দেখে অবাক সবাই, চক্ষু ছানাবড়া—
সাহেব বললে, "উচিত মতন শাসনটি চাই কড়া।"
'হাঁ হাঁ' বলে ভীষণরকম উঠল সবাই চটে,
দে দমাদম্ মারের চোটে গাধার চমক ছোটে।
ছুটল গাধা প্রাণের ভয়ে গানের তালিম ছেড়ে,
ছুটল পিছে একশো লোকে হুড় মুড়িয়ে তেড়ে।
তিন-পা যেতে দশ ঘা পড়ে, রক্ত ওঠে মুখে—
কষ্টে শেষে রক্ষা পেল কাঁটার ঝোপে ঢুকে।
কাঁটার ঘায়ে চামড়া গেল, সার হল তার কাঁদা ;
ব্যাপার শুনে বললে সবাই, "সাধে কি বলে গাধা।"

সন্দেশ—ফাল্গুন ১৩২৭

জালা-কুঁজো সংবাদ

পেট মোটা জালা কয়, 'হেসে আমি মরি রে
কুঁজো তোর হেন গলা এতটুকু শরীরে!"
কুঁজো কয়, "কথা কস্ আপনাকে না চিনে,
ভুঁড়িখানা দেখে তোর কেঁদে আর বাঁচি নে।"
জালা কয়, "সাগরের মাপে গড়া বপুখান,
ডুবুরিরা কত তোলে তবু জল অফুরান।"
কুঁজো কয়, "ভালো কথা! তবে যদি দৈবে,
ভুঁড়ি যায় ভেস্তিয়ে, জল কোথা রইবে?"
"নিজ কথা ভুলে যাস্?" জালা কয় গর্জে,
"ঘাড়ে ধরে হেঁট করে জল নেয় তোর যে!"
কুঁজো কয়, "নিজ পায়ে তবু খাড়া রই তো—
বিঁড়ে বিনা কুপোকাৎ, তেজ তোর ঐ তো!"

সন্দেশ—চৈত্র, ১৩২৭

নাচের বাতিক

বয়স হল অষ্টআশি, চিম্‌সে গায়ে ঠুন্‌কো হাড়,
নাচছে বুড়ো উল্‌টোমাথায়—ভাঙলে বুঝি মুণ্ডুঘাড়!
হেঁইও বলে হাত-পা ছেড়ে পড়ছে তেড়ে চিৎপটাং,
উঠছে আবার ঝট্‌পটিয়ে এক্কেবারে পিঠ সটান্।
বুঝিয়ে বলি, "বৃদ্ধ, তুমি এই বয়েসে করছ কি?
খাও-না খানিক মসলা গুলে হুঁকোর জল আর হর্‌তকী।
ঠাণ্ডা হবে মাথার আগুন, শান্ত হবে ছট্‌ফটি—"
বৃদ্ধ বলে, "থাম্-না বাপু, সব তাতে তোর পট্‌পটি!
ঢের খেয়েছি মসলা পাঁচন, ঢের মেখেছি চর্বি তেল;
তুই ভেবেছিস আমায় এখন চাল মেরে তুই করবি ফেল?"
এই-না বলে ডাইনে বাঁয়ে লম্ফ দিয়ে হুশ্ করে
হঠাৎ খেয়ে উল্‌টোবাজি ফেলল আমায় 'পুশ' করে।

"নাচলে অমন উল্‌টোরকম", আবার বলি বুঝিয়ে তায়,
"রক্তগুলো হুড়্‌হুড়িয়ে মগজপানে উজিয়ে যায়।"

বললে বুড়ো, "কিন্তু বাবা, আসল কথা সহজ এই—
ঢের দেখেছি পরখ করে, কোথাও আমার মগজ নেই।
তাইতে আমার হয় না কিছু—মাথায় যে সব ফক্কিফাঁক—
যতই নাচি উল্‌টো নাচন, যতই না খাই চকিপাক।"
বলতে গেলাম—"তাও কি হয়"—অমনি হঠাৎ ঠ্যাং নেড়ে
আবার বুড়ো হুড়্‌মুড়িয়ে ফেলল আমায় ল্যাং মেরে
ভাবছি সবে মারব ঘুঁষি এবার বুড়োর রগ ঘেঁষে,
বললে বুড়ো, "করব কি বল? করায় এ-সব অভ্যেসে।
ছিলাম যখন রেল-দারোগা চড়তে হত ট্রেইনেতে
চলতে গিয়ে ট্রেনগুলো সব পড়ত প্রায়ই ড্রেইনেতে।
তুবড়ে যেত রেলের গাড়ি, লাগত গুঁতো চাক্কাতে,
ছিটকে যেতাম যখন তখন হঠাৎ এক-এক ধাক্কাতে।
নিত্যি ঘুমোই একচোখে তাই, নড়লে গাড়ি—অমনি 'বাপ্'—
এমনি করে ডিগ্‌বাজিতে এক্কেবারে শূন্যে লাফ।
তাইতে হল নাচের নেশা, হঠাৎ হঠাৎ নাচন পায়,
বসতে শুতে আপনি ভুলে ডিগ্‌বাজি খাই আচমকায়!
নাচতে গিয়ে দৈবে যদি ঠ্যাং লাগে তোর পাঁজরাতে,
তাই বলে কি চটতে হবে? কিম্বা রাগে গজরাতে?"
আমিও বলি, "ঘাট হয়েছে, তোমার ক্ষুরে দণ্ডবৎ!
লাফাও তুমি যেমন খুশি, আমরা দেখি অন্য পথ।"

সন্দেশ—চৈত্র, ১৩২৭

বাবু

অতি খাসা মিহি সুতি
ফিন্‌ফিনে জামা ধুতি,
চরণে লপেটা জুতি জরিদার।

এ হাতে সোনার ঘড়ি,
ও হাতে বাঁকানো ছড়ি,
আতরের ছড়াছড়ি চারিধার।

চক্‌চকে চুল ছাঁটা,
তায় তোফা টেরি কাটা—
সোনার চশমা আঁটা নাসিকায়।
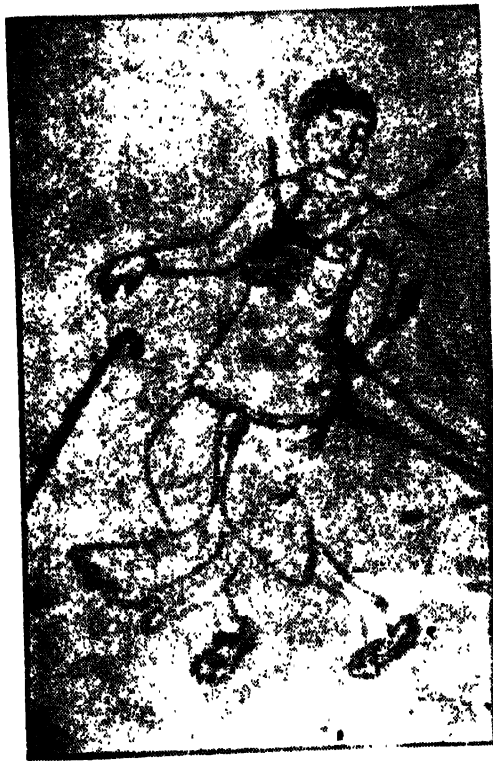
ঠোঁটদুটি এঁকেবেঁকে
ধোঁয়া ছাড়ে থেকে থেকে,
হালচাল দেখে দেখে হাসি পায়।

ঘোষেদের ছোটো মেয়ে
পিক্ ফেলে পান খেয়ে,
নিচু পানে নাহি চেয়ে, হায় রে!

সেই পিক্ থ্যাপ্ করে
লেগেছে চাদর ভরে
দেখে বাবু কেঁদে মরে যায় রে!

ওদিকে ছ্যাক্ড়াগাড়ি
ছুটে চলে তাড়াতাড়ি
ছিট্‌কিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি ঘোলাজল।

সহসা সে জল লাগে
জামার পিছন বাগে
বাবু করে মহারাগে কোলাহল।

সন্দেশ—আশ্বিন, ১৩২৯

কিছু চাই

কারোর কিছু চাই গো চাই ?
এই যে খোকা, কি নেবে ভাই ?
জলছবি আর লাট্টু লাটাই,
কেকবিস্কুট, লাল দেশলাই,
খেল্‌না, বাঁশি, কিম্বা ঘুড়ি,
লেড্‌-পেনসিল, রবার, ছুরি ?
এ-সব আমার বাক্সে নাই,
কারোর কিছু চাই গো চাই ?

কারোর কিছু চাই গো চাই ?
বৌমা কি চাও শুনতে পাই ?
ছিটের কাপড়, চিকন লেস,
ফ্যান্সি জিনিস, ছুঁচের কেস,
আলতা, সিঁদুর, কুন্তলীন,
কাঁচের চুড়ি, বোতাম, পিন্ ?
আমার কাছে ও-সব নাই,
কারোর কিছু চাই গো চাই ?

কারোর কিছু চাই গো চাই ?
আপনি কি চান কর্তামশাই ?
পকেট-বই কি খেলার তাস,
চুলের কলপ, জুতোর ব্রাস,
কলম, কালি, গঁদের তুলি,
নস্যি, চুরুট, সূতি গুলি ?
ও-সব আমার কিছুই নাই,
কারোর কিছু চাই গো চাই ?

সন্দেশ—কার্তিক, ১৩৩০

জীবনী

সন্দেশ পত্রিকা সম্পাদনার সময় পত্রিকার প্রয়োজনেই এই লেখাগুলোর জন্ম। সন্দেশের চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে নবম বর্ষ প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ ১৩২৩ সালের বৈশাখ থেকে ১৩২৮ সালের বৈশাখ সংখ্যা পর্যন্ত পুরো পাঁচ বছর ধরে এই ষোলোটি জীবনী-বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হয়। চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষে পাঁচটি করে ষষ্ঠ বর্ষে চারটি ও অষ্টম এবং নবম বর্ষে একটি করে লেখা সন্দেশে বেরিয়েছিল। লেখাগুলি সন্দেশে প্রকাশিত কালানুক্রমেই এখানে বিন্যস্ত হল, বিষয়ানুক্রমে নয়।

বিষয়ের দিক দিয়ে ষোলোটি প্রবন্ধের মধ্যে সাতটি বিজ্ঞানীদের জীবনের নানা ঘটনার ও বিভিন্ন আবিষ্কারের মজার মজার কাহিনী, তিনটি দেশ-আবিষ্কার বা এ্যাড্‌ভেঞ্চার কাহিনী বাকি দুটি দার্শনিক ও অন্যান্য স্মরণীয় কয়েকটি চরিত্রের জীবনের নানা ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত। প্রবন্ধগুলি লেখার সময় সন্দেশের কিশোর পাঠকদের মুখ সামনে রেখেই এগুলি রচনা করেছেন সম্পাদক সুকুমার—তাই ভাষার সহজ সরল আকর্ষণীয় সাবলীলতা কিশোর মনকে সহজেই প্রবন্ধগুলোর মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। কোনো কোনো প্রবন্ধে অনেক সময় বিভিন্ন ঘটনার সময়ের হিসাব স্বভাবতই তখনকার সময় ধরে করা হয়েছে। প্রত্যেকটি রচনার শেষেই প্রকাশের তারিখ থাকায় সেটা হিসেব করে নিতে পাঠকদের অসুবিধে হবে না। ভাষার দিক দিয়ে দশটি রচনা সাধুভাষায় ও ছটি রচনা চলিত ভাষায় রচিত হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে উভয় ভাষার মিশ্রণ লক্ষ্য করা যাবে। লেখকের ভাষার যথাযথ রূপ বজায় রাখার জন্যই সেগুলি সেইরকমই রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে সন্দেশের পাঠই সর্বত্র অনুসৃত হয়েছে, শুধু মাত্র দু-একটি শব্দ পত্রিকায় প্রকাশ সংক্রান্ত সংবাদের অপ্রাসঙ্গিকতা এড়াবার জন্য বর্জন করা হয়েছে।

সূচীপত্র

ডেভিড লিভিংস্টোন

স্কটল্যাণ্ডের এক গরিব তাঁতির ঘরে ১৮১৩ খৃস্টাব্দে ডেভিড লিভিংস্টোনের জন্ম হয়। খুব অল্প বয়স হতেই ডেভিড তার বাপের সঙ্গে কারখানায় কাজ করতে যেত সেখানে তাকে প্রতিদিন চৌদ্দ ঘণ্টা খাটতে হত। কিন্তু তার উৎসাহ এমন আশ্চর্য-রকমের ছিল যে, এত পরিশ্রমের পরেও সে রাত্রে একটা গরিব স্কুলে পড়তে যেত। যখনই একটু অবসর হত সে তার বই নিয়ে পড়ত, নাহয় মাঠে-ঘাটে ঘুরে নানারকম পোকা-মাকড়, গাছ-পাথর প্রভৃতি সংগ্রহ করে বেড়াত।

এমনি করে লিভিংস্টোনের বাল্যকাল কেটে গেল। তার পর উনিশ বৎসর বয়সে তাঁর মাইনে বাড়াতে, বাড়ির অবস্থা একটু ভালো হল। তখন তিনি কারখানার মালিকের সঙ্গে এমন বন্দোবস্ত করে নিলেন, যাতে তিনি বছরে ছয়মাস কাজ করতেন আর বাকি ছ'মাস গ্লাস্‌গো শহরে গিয়ে পড়াশুনা করতেন। সেখানে কয়েক বছর ডাক্তারি পড়ে এবং ধর্মশিক্ষার পরীক্ষা পাশ করে, সাতাশ বৎসর বয়সে তিনি অসভ্য জাতিদের মধ্যে শিক্ষা ও ধর্ম প্রচারের জন্য চাকুরি নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় গেলেন। আফ্রিকায় তখনো সাহেবেরা বেশি যাতায়াত আরম্ভ করে নি—ম্যাপের অনেক স্থানই তখন অজানা দেশ বলে লেখা থাকত। সেই অজানা দেশে অচেনা লোকের মধ্যে লিভিংস্টোন বাস করতে গেলেন।

পাদরি ডাক্তার লিভিংস্টোন দেখতে দেখতে আফ্রিকার নানা ভাষা শিখে ফেললেন, সেখানকার লোকেদের সঙ্গে মিশে তাদের সুখ-দুঃখের কথা সব জানলেন—আর দেশটাকে তাঁর এত ভালো লাগল যে, তার সেবায় জীবনপাত করতে তিনি প্রস্তুত হলেন। সে দেশের লোকের বড়ো দুঃখ যে, দুষ্ট পর্তুগীজ আর আরব দস্যুরা তাদের ধরে নিয়ে দাস করে রাখে, ছাগল-গোরুর মতো হাটে-বাজারে তাদের বিক্রি করে। বেচারীরা হাতির দাঁত, পাখির পালক ও নানারকম জন্তুর চামড়ার ব্যবসা করে, বিলাতি জাহাজে করে সওদাগরেরা তাদের জিনিস কিনে নিয়ে যায়। কিন্তু মাঝপথে এই-সব দুষ্টু লোকেরা

তাদের মারধর করে বেঁধে নিয়ে যায়। লিভিংস্টোন এই-সব অত্যাচারের কথা শুনে একেবারে খেপে গেলেন। তিনি বললেন, যেমন করে হোক, এ অত্যাচার থামাতে হবে।

তিনি দেখলেন, ব্যবসা করতে হলে সেই লোকদের এমন সব পথ দিয়ে যেতে হয়, যেখানে পর্তুগীজ আর আরবরা তাদের সহজেই ধরে ফেলতে পারে—সমুদ্রে যাওয়া আসার আর কোনো সহজ রাস্তা তাদের জানা ছিল না। তাদের দেশে বাণিজ্যের কোনো ভালো বন্দোবস্ত নাই। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় লোকদের মধ্যে ব্যবসা চালাবার কোনো সুযোগ নাই। লিভিংস্টোন তখন পথঘাটের সন্ধান করে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। বড়ো-বড়ো নদীর পথ ধরে দিনের পর দিন চলে চলে, কত নতুন দেশ, নতুন পাহাড়, নতুন লোকের খবর পেলেন। এই কাজ তাঁর এত ভালো লাগল আর তাতে তাঁর এত উৎসাহ হল যে, তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে, পাদরির কাজ ফেলে, এই কাজেই দিনরাত লেগে রইলেন।

ক্রমে তিনি বুঝতে পারলেন, আফ্রিকার এপার ওপার পুব-পশ্চিম যাওয়ার মতো পথ পাওয়া গেলে তবে বাণিজ্যের খুব সুবিধা হয়। ১৮৪৯ খৃস্টাব্দে এই রাস্তার খোঁজে তিনি কয়েকজন সে-দেশী লোকের সঙ্গে কালাহারি মরুভূমি পার হয়ে ক্রমাগত উত্তর-পশ্চিম মুখে ঘুরতে ঘুরতে, পাঁচ বছরে পর্তুগীজ রাজ্যে পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলে এসে হাজির হলেন। পথের কষ্টে এবং জ্বরে ভুগে তাঁর শরীর তখন একেবারে ভেঙে গেছে, আর যেন নড়বার শক্তি নাই। কিন্তু তিনি সহজে থামবার লোক নন ; কয়েক মাস বিশ্রাম করেই তিনি আবার ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এবার তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন সেখান থেকে একেবারে পূর্বদিকে সমুদ্রের কূল পর্যন্ত না গিয়ে তিনি থামবেন না।

জলের পথ দিয়ে নানা নদীর বাঁক ধরে ঘুরতে ঘুরতে, তিনি ক্রমে জাম্বেসি নদীতে এসে পড়লেন। তাঁর আগে আর কোনো বিদেশী সে জায়গা দেখে নাই। সেখানকার লোকদের সঙ্গে তিনি আলাপ করে এক আশ্চর্য খবর শুনলেন। তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমাদের দেশেও কি ধোঁয়ায় গর্জন করতে পারে?" লিভিংস্টোন বললেন, "সে কিরকম ?" তারা বলল, "তুমি ধোঁয়া-গর্জনের পাহাড় দেখ নি ?" লিভিংস্টোনের ভারি আগ্রহ হল, এ জিনিসটা একবার দেখতে হবে। সেই জাম্বেসি নদী দিয়ে নৌকা করে তিনি অনেক দূর গিয়ে দেখলেন, এক জায়গায় ধোঁয়ার মতো পাঁচটা স্তম্ভ উঠেছে, তার চারদিকের দৃশ্য এত সুন্দর যে, লিভিংস্টোনের বোধ হল এমন চমৎকার স্থান তিনি আগে আর কখনো দেখেন নি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, নদীটা গেল কোথায় ? সামনে খালি চড়া আর পাহাড় ; নদীর চিহ্নমাত্র নাই—আর পাহাড়ের ওদিকে খালি ধোঁয়া আর গর্জন। সেইখানে নৌকা বেঁধে লিভিংস্টোন হেঁটে দেখতে গেলেন ব্যাপারখানা কি ? গিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর বোধ হল যে তাঁর জন্ম সার্থক—তাঁর এত বৎসরের পরিশ্রম সার্থক। তিনি দেখলেন, নদীটা একটা পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে ঢুকে পাহাড়ের পেট কেটে তিনশো হাত খাড়া ঝরনার মতো ঝরে পড়ছে। এত বড়ো ঝরনা লিভিংস্টোন কোনোদিন চক্ষে দেখেন নি। পড়বার বেগে ঝরনার জল ভয়ানক শব্দে ধোঁয়ার মতো ছড়িয়ে প্রায় দুশো হাত উঁচু হয়ে উঠছে—তার উপর সূর্যের আলো পড়ে চমৎকার রামধনুর

ছুটা বেরিয়েছে—আর সেই ঝাপ্‌সা ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে রঙবেরঙের গাছপালা, পাহাড় জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, ঠিক যেন ছিটের পর্দা।

এমনি করে কত আশ্চর্য আবিষ্কার করতে করতে লিভিংস্টোন একেবারে নূতন পথ দিয়ে দুই বছরে আফ্রিকার পূর্বকূলে এসে পড়লেন। তার পর দেশে ফিরে গিয়ে সকলের কাছে সম্মান লাভ করে, তিনি দলবল নিয়ে আবার সেই জাম্বেসি নদীর ধারে ফিরে গেলেন। এবারে তাঁর স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে গেলেন– আর ইংরাজ গভর্নমেণ্ট তাঁকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন, তার পর তাঁর সঙ্গের লোকজন অনেকেই ফিরে গেলেন। ক্রমে বিলাত থেকে খরচ আসাও বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু লিভিংস্টোন একাই নিজের খরচে ঘুরতে লাগলেন। এবার নূতন পথে তিনি উত্তর-পূর্ব মুখে বড়ো-বড়ো হ্রদের দেশ দিয়ে একেবারে ইজিপ্টের কাছে 'নায়াসা'তে এসে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে সে-দেশী দু-চারটি লোক ছাড়া আর কেউ ছিল না—কিন্তু তারা তাঁকে এত ভালোবাসত যে, ঘোর বিপদের মধ্যেও তাঁকে ছেড়ে যেতে রাজি হয় নি।

লিভিংস্টোন কি তাদের কম ভালোবেসেছিলেন! সেই আঁধার দেশের লোকের দুঃখে তাঁর যে কী দুঃখ—তাঁর বইয়ের পাতায় পাতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। পর্তু-গীজদের অত্যাচারের বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর কথাগুলো যেন আগুন হয়ে উঠত। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ লেখা এই—'এই নির্জন দেশে বসে আমি এইমাত্র বলতে পারি, পৃথিবীর এই কলঙ্ক (দাস ব্যবসায়) যে মুছে দিতে পারবে—ভগবানের অজস্র আশীর্বাদে সে ধন্য হয়ে যাবে।"

১৮৮৬ খৃস্টাব্দে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি শেষবার আফ্রিকায় ঘুরতে গিয়েছিলেন—তার পর আর দেশে ফেরেন নি। এবার তিনি গোড়া হতেই নানারকম বিপদে পড়েছিলেন—তাঁর জন্য যে রসদ পাঠানো হল কতক তাঁর কাছে পৌঁছলই না—বাকি সব চুরি হয়ে গেল। তার আর কোনো খবরই পাওয়া গেল না। ক্রমে দেশের লোক ব্যস্ত হয়ে উঠল, লিভিংস্টোনের কি হল জানবার জন্য চারিদিকে লেখালেখি চলতে লাগল। শেষটা স্ট্যান্‌লি বলে একজন ওয়েলশ যুবক তাঁর খবর আনতে আফ্রিকায় গেলেন। এত বড়ো মহাদেশের মধ্যে একজন লোককে আন্দাজে খুঁজে বার করা যে খুবই বাহাদুরির কাজ, তাতে আর সন্দেহ কি? স্ট্যান্‌লি বছরখানেক ঘুরে তাঁর দেখা পেলেন বটে, কিন্তু তখন লিভিংস্টোনের মর-মর অবস্থা। তিনি এত রোগা আর দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে, দেখলে চেনা যায় না। স্ট্যান্‌লির সাহায্যে লিভিংস্টোন কতকটা সেরে উঠলেন এবং তাঁর সঙ্গে কিছুদিন ঘুরলেন, কিন্তু দেশে ফিরে যেতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, "আমি এই দেশের নির্জন নিস্তব্ধ জঙ্গলের মধ্যেই এ জীবন শেষ করব।" স্ট্যান্‌লি ফিরে গেলেন।

তার পর, বছরখানেক পরে একদিন লিভিংস্টোন তাঁর বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে বসলেন, আর উঠলেন না। তাঁর লোকেরা তাঁকে ডাকতে এল, তখন দেখল যে তিনি সেই অবস্থাতেই মারা গেছেন। বিশ্বাসী চাকরেরা

অসাধারণ কষ্ট স্বীকার করে পাহাড় জঙ্গল পার হয়ে, সমুদ্রের কূল পর্যন্ত তাঁর মৃতদেহ বয়ে এনে জাহাজে তুলে দিল। ইংলণ্ডে যাঁরা বীর, যাঁরা দেশের নেতা, যাঁদের কীর্তিতে দেশের গৌরব বাড়ে, তাঁদের কবর দেওয়া হয় 'ওয়েস্টমিনস্টার এবি'তে। সেই ওয়েস্ট-মিনস্টার এবিতে যদি যাও, সেখানে লিভিংস্টোনের সমাধি দেখতে পাবে।

সন্দেশ—বৈশাখ, ১৩২৩

পাস্তুর

মানুষের যতরকম রোগ হয়, আজকালকার ডাক্তারেরা বলেন, তার সবগুলিই অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর কীর্তি। এই জীবাণু বা 'মাইক্রোব' (Microbe) গুলিই সকল রোগের বীজ। পথেঘাটে বাতাসে মানুষের শরীরের ভিতরে বাহিরে ইহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। আজকালকার চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহাদের খাতির খুব বেশি। এই জীবাণুগুলির ভালোরূপ পরিচয় লওয়া, ইহাদের চালচলনের সংবাদ রাখা এবং এগুলিকে জব্দ করিবার নানাপ্রকার ব্যবস্থা করা, এখনকার ডাক্তারিবিদ্যার খুব একটা বড়ো ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার ফলে চিকিৎসাপ্রণালী আশ্চর্যরকম উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই-সমস্ত উন্নতি এবং এই নূতন প্রণালীর মূলে ফরাসী পণ্ডিত লুই পাস্তুর। পাস্তুর একা এ বিষয়ে নূতন আবিষ্কার ও নূতন চিন্তা দ্বারা মানুষের জ্ঞান ও চেষ্টাকে যে কতদূর অগ্রসর করিয়াছেন, ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়।

প্রায় চুরানব্বই বৎসর আগে পাস্তুরের জন্ম হয়। অতি অল্প বয়স হইতেই শিক্ষকদের মুখে তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা শুনা যাইত। সে সময়কার বড়ো-বড়ো বৈজ্ঞানিকদের কাছে তিনি বিজ্ঞানশিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতেই রসায়নবিদ্যায় তাঁহার খুব নাম শুনা গিয়াছিল। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে যখন তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া পারিসে আসেন তখনো লোকে তাঁহাকে খুব বড়ো রাসায়নিক পণ্ডিত বলিয়াই জানিত। কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাঁহার চোখ পড়িল আর-একটা ব্যাপারের উপরে—'জিনিস পচে কেন?' এই প্রশ্ন লইয়া তিনি ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা এবং পুরাতন শিক্ষকেরা ইহাতে ভারি দুঃখিত হইলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন, "পাস্তুরের এমন বুদ্ধি ছিল, চেষ্টা করিলে সে রসায়নশাস্ত্রে কত কি করিতে পারিত; সে কিনা একটা বাজে বিষয় লইয়া সময় নষ্ট করিতে বসিল।"

কিন্তু পাস্তুর ছাড়িবার লোক নহেন। তিনি ভাবিলেন ব্যাপারটা তলাইয়া দেখিতে হইবে। আগে লোকের ধারণা ছিল সব জিনিস বাতাস লাগিয়া 'আপনা-আপনি' পচিয়া যায়। পাস্তুর দেখাইলেন, দুধে একপ্রকার জীবাণু থাকে যাহার জন্য দুধ টকিয়া নষ্ট হইয়া যায়। মাখন যে পচে তাহাও আর-এক প্রকার জীবাণুর কাণ্ড। ভাত চিনি বা ফলের রস পচাইয়া যে মদ প্রস্তুত হয়, সেখানেও জীবাণু। নানাপ্রকার জীবাণু বাতাসে

ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইজন্যে অনেক জিনিস আদুল রাখিলে তাহা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। পাস্তুর আরো দেখাইলেন যে, খুব গরম লাগাইলে এই জীবাণুগুলি মরিয়া যায়। এইরূপে জীবাণু নষ্ট করিয়া এক টুকরা মাংস বা খানিকটা দুধ একটা শিশির মধ্যে আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দেখা গেল যে, এ অবস্থায় সেগুলি আর পচিতে পারে না। আজকাল লোকে দুধ জমাইয়া টিনে আঁটিয়া বিক্রি করে, নানাপ্রকার ফল চিনির রসে ফুটাইয়া মাসের পর মাস বোতলে পুরিয়া রাখে, কতরকম মাছ মাংস, কতরকম খাবার জিনিস বাতাসশূন্য পাত্রে করিয়া চালান দেয়। পাস্তুর যদি জীবাণু তাড়াইয়া জিনিস বাঁচাইবার সংকেতটি বলিয়া না দিতেন, তবে এ-সকল কিছুই সম্ভব হইত না।

এই সময়ে ফ্রান্সে রেশম পোকার একরকম রোগ দেখা দিয়া, রেশমের কারবারের ভয়ানক ক্ষতি আরম্ভ করিল। পাস্তুর এই ব্যাপারটার সন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন, এই রোগের মূলে একপ্রকার জীবাণু। সেই জীবাণুকে নষ্ট করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়া তিনি রোগ দূর করিলেন। ইহার পর পশুপাখির রোগের কথা আপনা হইতেই আসিয়া পড়িল। ঘেয়ো জ্বরের উৎপাতে দেশের ছাগল গোরু উজাড় হয় দেখিয়া তিনি সেই ঘেয়ো জ্বর দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঘেয়ো জ্বরের জীবাণুর সন্ধান করিয়া তাহার উপর নানারূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। ইহার ফলে তিনি যে চিকিৎসাপ্রণালী আবিষ্কার করিলেন, ডাক্তারমহলে এখনো তাহার জয়জয়কার চলিতেছে।

তিনি বলিলেন, রোগের বীজকে কাহিল করিয়া সেই বীজের টীকা দাও—তাহাতেই রোগ সারিবে। যাহার রোগ হইয়াছে তাহার দেহ হইতে জীবাণু সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে সাবধানে রাখিয়া বাড়িতে দাও, তার পর অন্য প্রাণীর দেহে সেই জীবাণুর সাহায্যে রোগ প্রবেশ করাও। এই প্রাণীটি যখন রুগ্ন হইবে এবং তাহার দেহে লক্ষ লক্ষ জীবাণু দেখা দিবে—তাহার শরীর হইতেই টীকার বীজ পাওয়া যাইবে।

পাগলা কুকুরে কামড়াইলে মানুষের 'জলাতঙ্ক' রোগ হয়। এই ভয়ানক রোগের জীবাণুগুলি এতই ছোটো যে, সেগুলি অণুবীক্ষণেও দেখা যায় না। কিন্তু পাস্তুর বলিলেন, "চোখে দেখা যাউক আর নাই যাউক, জীবাণু আছেই।" সেই অদৃশ্য জীবাণুর দ্বারা তিনি অন্য প্রাণীর মধ্যে রোগ জন্মাইয়া, টীকার বীজ প্রস্তুত করিলেন। একটি চাষার ছেলেকে নেকড়ে বাঘে কামড়াইয়াছিল—পাস্তুরের সর্বপ্রথম পরীক্ষা হইল তাহার উপরে। এই বালক যখন বাঁচিয়া গেল, তাহার পর হইতেই পাস্তুরের চিকিৎসাপ্রণালী ডাক্তারমহলে একেবারে পাকা হইয়া পড়িয়াছে। পারিস নগরে পাস্তুরের নামে যে বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, তাহার সম্মুখে এই কৃষক বালকের একটি সুন্দর প্রতিমূর্তি আছে।

এক সময়ে ডাক্তারেরা মানুষের দেহে একটু ছুরি চালাইতে হইলেই কত ব্যস্ত হইতেন, কিন্তু এখনকার অস্ত্রচিকিৎসক মানুষের হাত পা কাটিতেও আর ইতস্তত করেন না, কারণ তিনি জানেন, রোগের বীজ তাড়াইলেই আর ভয় নাই। তাই এত হাত ধোয়াধোয়ি, ফুটন্ত জলে ছুরি কাঁচি ডুবানো, এত সাবান আর এত কার্বলিক এসিড, নির্দোষ তুলা ও ব্যাণ্ডেজের জন্য এত কড়াকড়ি—দুষ্ট জীবাণু যাহাতে কোনো ফাঁকে ঢুকিতে না পারে। যুদ্ধের জায়গায় হাজার হাজার লোক আহত হইতেছে; তাহার শতকরা আশিজন বাঁচিয়া

উঠিতেছে কেবল পাস্তুরের প্রসাদে। আজ বিশ বৎসর হইল পাস্তুর মারা গিয়াছেন; ফরাসি জাতি রাজসম্মানে তাঁহার সমাধি দিয়া, সেই সমাধির উপর তাঁহারই নামে বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেখানে এখনো নূতন নূতন আবিষ্কার চলিতেছে। পাস্তুরের শিষ্যেরা এখন পৃথিবীর চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এখনো কত লোক কত কীর্তি সঞ্চয় করিতেছে।

পাস্তুরকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "তুমি সারা জীবন ধরিয়া কি দেখিলে এবং কি শিখিলে?" পাস্তুর বলিলেন, "দেখিলাম, এ জগৎব্যাপারের সকলই আশ্চর্য, সকলই অলৌকিক।"

সন্দেশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩

সক্রেটিস

সে প্রায় আড়াইহাজার বছর আগেকার কথা—গ্রীস দেশে এথেন্স নগরের একটি গরিবের ঘরে একটি কুশ্রী ছেলের জন্ম হয়। গরিবের ছেলে, পরনে তার ছেঁড়া কাপড়, দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় কিনা সন্দেহ—সে আবার লেখাপড়া শিখিবে কিরূপে? সে পাথরের মূর্তি গড়িতে পারিত—তাই বেচিয়া এবং অবসরমতো লোকের কাছে দু কথা শিখিয়া মানুষ হইতে লাগিল। এমন সময় ক্রাইটো নামে একটি ধনী লোক এই ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করিয়া, তাহার মিষ্ট ব্যবহারে এত খুশি হইলেন যে, তিনি তখনই নিজের খরচে তাহার পড়াশুনার ভালো ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সকলেই ভাবিল, গরিবের ছেলে লেখাপড়া শিখিয়া, এইবার একটা ভালো চাকুরি বা ব্যবসা করিবে।

এথেন্স নগরে তখন একদল লোক থাকিত, তাহাদের ব্যবসা ছিল পণ্ডিতি করা। তাহারা লোকের কাছে পয়সা লইয়া আড্ডা খুলিত এবং সেইখানে বড়ো-বড়ো কথা আওড়াইয়া চুলচেরা তর্ক করিয়া, নানারকম বিদ্যার ভড়ং দেখাইত। তাহাদের বোলচালে ভুলিয়া লোকে মনে করিত, না জানি তাহারা কত বড়ো পণ্ডিত। একটু বয়স হইলেই সেই গরিবের ছেলে এই পণ্ডিত মহলের পরিচয় লইতে আসিলেন। মুখে মিষ্টি মিষ্টি কথা, নিতান্ত ভালোমানুষটির মতো আস্তে আস্তে প্রশ্ন করেন, যেন তিনি কিছুই জানেন না—কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের ঠেলায় পণ্ডিতের দল অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিতে গিয়া এক-একজন পণ্ডিত এমন নাকাল হইয়া আসিলেন যে, দেখিতে দেখিতে তাঁহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। খালি পা, মোটা কাপড় পরা, খাঁদা বেঁটে গরিব লোকটিকে রাস্তায় ঘাটে সকলেই চিনিয়া ফেলিল। তিনি পথে বাহির হইলে সকলে দেখাইয়া দিত 'ঐ সক্রেটিস'।

দেখিতে দেখিতে এই-সব মূর্খ পণ্ডিতদের উপর সক্রেটিসের ঘোর অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'হায়, হায়, এই-সব অপদার্থের হাতে পড়িয়া, এথেন্সের ছেলেগুলি

একেবারে মাটি হইয়া গেল। ইহারা কেবল কথা কাটাকাটি করিতে শিখিল—কেহ জ্ঞানলাভ করিতে চায় না, মানুষের মতো মানুষ হইতে চায় না—শুধু লোকের কাছে নাম কিনিতে চায়, ছলেবলে ক্ষমতা জাহির করিতে চায়। সক্রেটিস তেজের সহিত চারিদিকে বলিতে লাগিলেন, "এমন করিয়া কোনো মানুষ বড়ো হইতে পারে না। কেবল টাকাকড়ি ও যশ-মানের জন্য ছুটাছুটি করিও না, ধর্মপথে থাক এবং জ্ঞানলাভ কর—নহিলে তোমরা অধঃপাতে যাইবে।" লোকে অবাক হইয়া গরিবের মুখে এই-সকল কথা শুনিত এবং যে একবার আসিত সেই তাঁহার কথায় ও আশ্চর্য ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যাইত। দেখিতে দেখিতে সক্রেটিসের অনেক বন্ধু ও শিষ্য জুটিয়া গেল। শহরের অনেক বড়ো-বড়ো লোক পর্যন্ত তাঁহার কাছে যাতায়াত আরম্ভ করিল। কোনো বিদেশী রাজা অনেক টাকার লোভ দেখাইয়া সক্রেটিসকে তাঁহার নিজের সভায় লইতে চাহিলেন। কিন্তু সক্রেটিস বলিলেন, "আমি এ অনগ্রহ লইয়া আপনার কাছে ঋণী থাকিতে চাহি না। আমার টাকারই-বা প্রয়োজন কি? এই এথেন্স শহরে অতি অল্প খরচেই দুবেলা আহার করিয়া থাকা যায়; আর কাছেই ঝরনার জল, তাহার জন্য পয়সা দিতে হয় না। সুতরাং আমার তো কোনো অভাব দেখি না।"

সে সময়ে গ্রীস দেশে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ চলিত। একবার কোনো-এক যুদ্ধে সক্রেটিসকে পাঠানো হইল। যাহারা যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই দেশে ফিরিয়া, সক্রেটিসের আশ্চর্য শক্তির প্রশংসা করিতে লাগিল। ঘোর শীতের সময়ে যখন বরফে সকল দিক ঢাকিয়া ফেলে, লোকেরা কম্বলের জামা গায়ে দিয়াও শীতে কাঁপিতে থাকে, সক্রেটিস তাহার মধ্যে খালি পায়ে সামান্য কাপড় পরিয়া অনায়াসে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ডেলিয়ামের যুদ্ধে যখন শত্রুপক্ষ সক্রেটিসের দলকে হটাইয়া দিল, তখনকার একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা বলিয়াছেন, সেই বিপদের সময়েও সক্রেটিসের শান্ত চেহারা ও নিশ্চিন্ত হাসিমখ দেখিয়া এথেন্সের লোকদের মনে আবার সাহস ফিরিয়া আসিল। শত্রুপক্ষের সৈন্যরা চারিদিকে মারধর করিতেছিল কিন্তু সক্রেটিসের কি আশ্চর্য তেজ, তাঁহার কাছে ঘেঁষিতেও কেহ সাহস পায় নাই।

সক্রেটিস নিজে গরিবের গরিব কিন্তু সারাজীবন সকলকে বিনা পয়সায় শিক্ষা দিতেন। এত বড়ো পণ্ডিত, কিন্তু তাঁহার মধ্যে অহংকারের লেশমাত্র ছিল না। কেহ তাঁহাকে রাগ করিয়া কথা বলিতে শুনে নাই; নিজের সামান্য কর্তব্যটুকুও অবহেলা করিতে দেখে নাই। শত্রুমিত্র সকলের জন্য মুখে তাঁহার হাসিটুকু লাগিয়াই থাকিত। কেহ কড়া কথা বলিলে বা মিথ্যা গালাগালি করিলেও তিনি তাহাতে বিরক্ত হইতেন না। কত দুষ্ট লোকে তাঁহার উপদেশ শুনিতে গিয়া কাঁদিয়া ফিরিত, তাঁহার মুখের একটি কথায় কত অন্যায়, কত অত্যাচার থামিয়া যাইত। দুঃখ বিপদের সময় কতদূর হইতে কত লোকে তাঁহার পরামর্শ শুনিবার জন্য ছুটিয়া আসিত। 'যাহা ন্যায় বুঝিব তাহাই করিব' এ কথা তাঁহার মুখেই শোভা পাইত, কারণ তাঁহার যেমন কথা তেমনি কাজ। এমন সাধু লোককে যে সকলে ভালোবাসিবে, ঋষি বলিয়া ভক্তি করিবে তাহাতে আশ্চর্য কি? কিন্তু সক্রেটিসেরও শত্রুর অভাব ছিল না। একদল লোক—কেহ হিংসায় কেহ রাগে কেহ

নিজের স্বার্থের জন্য—সর্বদা তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করিত। সক্রেটিসকে সে কথা জানাইলে তিনি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন।

একবার সে দেশের শাসনকর্তারা তাঁহাকে হুকুম দিলেন, "আমরা অমুককে সাজা দিব, তুমি তাহার খোঁজ করিয়া দাও।" সক্রেটিস তাঁহাদের মুখের উপর বলিলেন, "আমি অন্যায় কাজে সাহায্য করি না।" শাসনকর্তারা চটিলেন। আর একবার এথেন্সের লোকেরা কয়েকজন সেনাপতির উপর ক্ষেপিয়া, জুলুম করিয়া বিনা বিচারে তাহাদের মারিতে চাহিয়াছিল, একমাত্র সক্রেটিস ছাড়া সে কার্যে বাধা দিতে আর কাহারও সাহস হয় নাই। এই ব্যাপারেও তাঁহার অনেক শত্রু জুটিল। পণ্ডিতের দল তো আগে হইতেই ক্ষেপিয়া ছিল। তার পর যখন চারিদিক হইতে নানাশ্রেণীর লোকে সক্রেটিসের কাছে ঘন ঘন যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল, তখন শাসনকর্তারা ভাবিলেন, ইহার মনে নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে—এ হয়তো—কোনদিন এই-সকল লোককে ক্ষ্যাপাইয়া একটা গোলমাল বাধাইয়া তুলিবে। তাঁহারা সক্রেটিসকে শাসাইয়া দিলেন, "খবরদার, তুমি এথেন্সের যুবকদের সঙ্গে আর কথাবার্তা বলিতে পারিবে না।" সক্রেটিস তাহাতে ভয় পাইবেন কেন? তিনি পূর্বেরই মতো উৎসাহে সকলকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন—"যাহারা জ্ঞানের অহংকার করিয়া বেড়ায় তাহারাই যথার্থ মূর্খ, যাহারা অন্যায় করিয়া দেশের আইনকে ফাঁকি দেয়, তাহারা জানে না যে ভগবানের কাছে ফাঁকি চলে না। যে মানুষ খাওয়ায় পরায় অল্পতেই সন্তুষ্ট, সহজভাবে সরল কথায় সৎচিন্তায় সময় কাটায়, সেই সুখী—আধপেটা খাইয়াও সুখী; মানুষের নিন্দা অত্যাচারের মধ্যেও সুখী।" এমনি করিয়া ঋষি সক্রেটিস বাহাত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত যুবকের মতো উৎসাহে নিজের কাজ করিয়া গেলেন।

ইহার মধ্যে সক্রেটিসের শত্রুপক্ষ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার নামে মিথ্যা নিন্দা রটাইয়া এথেন্সের বিচারসভায় তাঁহার বিরুদ্ধে অন্যায় নালিশ উপস্থিত করিল। শত্রুর দল যে যেখানে ছিল সকলে হাঁ হাঁ করিয়া সাক্ষ্য দিতে আসিল, "সক্রেটিস বড়ো ভয়ানক লোক, সে এথেন্সের সর্বনাশ করিতেছে।" অন্যায় বিচারে হুকুম হইল, "সক্রেটিসকে বিষ খাওয়াইয়া মার।" সক্রেটিসের বন্ধুরা বলিলেন, "হায় হায়, বিনা দোষে সক্রেটিসের শাস্তি হইল।" সক্রেটিস হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা কি বলিতে চাও যে আমি দোষ করিয়া সাজা পাইলেই ভালো হইত?"

সক্রেটিসকে কয়েদ করিয়া রাখা হইল, কবে তাঁহাকে বিষ খাওয়ানো হইবে সে দিনও স্থির হইল। জেলের অধ্যক্ষ সক্রেটিসের ভক্ত ছিলেন, তিনি বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন সক্রেটিসকে রাতারাতি এথেন্স হইতে সরাইয়া ফেলিবেন; কিন্তু সক্রেটিস তাহাতে রাজি হইলেন না। তিনি বলিলেন, "আমার দেশের লোকে বিচার করিয়া বলিয়াছেন আমার শাস্তি হউক। আমি সে শাস্তিকে এড়াইয়া দেশের আইনকে অমান্য করিতে চাই না।" ক্রমে দিন ঘনাইয়া আসিল। সক্রেটিসের বন্ধুরা কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেলেন, কেহ কেহ রাগে দুঃখে এথেন্স ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন—মহাপণ্ডিত প্লেটো প্রভৃতি কয়েকটি শিষ্য শেষপর্যন্ত তাঁহার কাছেই বসিয়া রহিলেন। সক্রেটিসের

প্রশান্ত মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই, তিনি সকলকে আশ্বাস দিতেছেন, উৎসাহের সঙ্গে বলিতেছেন, "দেহ নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু দেহের মধ্যে যে থাকে সে অমর—এই দেহে যখন প্রাণ থাকিবে না, আমি তখনো থাকিব।" একজন শিষ্য বলিলেন, "মৃত্যুর পর আপনাকে কোথায় কবর দিব?" সক্রেটিস বলিলেন, "যেখানে ইচ্ছা; কিন্তু মৃত্যুর পর আমায় পাইবে কোথা?" এমন সময় জেলের প্রধান কর্মচারী কাঁদিতে কাঁদিতে বিষের পাত্র আনিয়া ধরিল এবং সক্রেটিসের কাছে ক্ষমা চাহিল। সক্রেটিস তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া, হাসিমুখে বিষ পান করিলেন। তার পর শিষ্যদের সহিত কথা বলিতে বলিতে ক্রমে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার হাত-পা অবশ হইয়া আসিল। শেষে মৃত্যু আসিয়া মহাপুরুষের জীবন শেষ করিয়া দিল। সক্রেটিস মরিয়া অমর হইলেন; তাঁহার নাম চিরকালের জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে থাকিয়া গেল।

সন্দেশ—আষাঢ়, ১৩২৩

ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল

এক চাষার এক কুকুর ছিল, তার নাম ক্যাপ। একদিন এক দুষ্ট লোকে পাথর ছুঁড়িয়া ক্যাপের একটি পা খোঁড়া করিয়া দিল। চাষা ভাবিল, 'এই খোঁড়া কুকুর লইয়া আমি কি করিব? এ আর আমার কোনো কাজে লাগিবে না।' শেষটায় কুকুর বেচারাকে মারিয়া ফেলাই ঠিক হইল। একটি ছোটো মেয়ে, তার নাম ফ্লরেন্স, সে এই কথা শুনিতে পাইয়া বলিল, "আহা মারবে কেন? আমায় দেও, আমি ওকে সারিয়ে দেব।" তার পর সে ক্যাপকে বাড়িতে লইয়া তার পায়ে পট্টি বাঁধিয়া, তাহাতে ঔষধ দিয়া, সেঁক দিয়া রীতিমতো শুশ্রূষা করিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার খোঁড়া পা সারাইয়া দিল। তখন সেই চাষা বলিল, "ভাগ্যিস আপনি ছিলেন, তা নইলে আমার এমন কুকুরকে আমি মিছামিছি মেরে ফেলতাম।"

কেবল এই একটি ঘটনা নয়, প্রায়ই এমন দেখা যাইত যে, মেয়েটি হয়তো বাগানে বেড়াইতেছে, আর কাঠবিড়ালিগুলা তাঁহার কাছ হইতে খাবার লইবার জন্য চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। বাড়ির ঘোড়াটা পর্যন্ত তাঁহার গলার আওয়াজ শুনিলে, বেড়ার উপর দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিত। ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল বড়োলোকের মেয়ে, তাঁহার পয়সাকড়ির ভাবনা ছিল না, কোনো অভাব ছিল না। তাঁহার বাবারও বড়ো ইচ্ছা, ছেলেমেয়েরা সকলে খুব ভালো লেখাপড়া শেখে। সুতরাং অল্প বয়স হইতেই যে ফ্লরেন্সের মনে লেখাপড়ার ঝোঁক ছিল সেটা কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু লোকে যে ঐ বয়স হইতেই তাঁহাকে ভালোবাসিত এবং শ্রদ্ধা করিত, সেটা তাঁহার লেখাপড়ার বাহাদুরির জন্য নয়—তার কারণ এই যে, তিনি যেমন মনপ্রাণ দিয়া সকলকে ভালোবাসিতেন, লোকের সেবা করিতে পারিতেন এবং লোকের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইতে পারিতেন, এমন আর কেহ পারিত না। আশেপাশে

যেখানে যত গরিবের স্কুল আর হাসপাতাল ছিল, ফ্লরেন্স তাহার সবগুলির মধ্যেই থাকিতেন। সেই সময়ে ইংলণ্ডে কয়েদীদের অবস্থা বড়ো ভয়ানক ছিল। জেলখানাগুলি অত্যন্ত নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর এবং তাহাদের বন্দোবস্ত এমন বিশ্রী যে, একবার যে জেলে ঢুকিয়াছে তাহার পক্ষে ভবিষ্যতে আবার ভালো হওয়া একরূপ অসম্ভব। মিসেস ফ্রাই নামে একজন ইংরাজ মহিলা এই কয়েদীদের উন্নতির জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতেছিলেন—কিসে তাহারা আবার চাকরি পায়, কিসে তাহারা সমাজের কাছে ভালো ব্যবহার পায়, কিসে তাহাদের মধ্যে আবার সাধুভাব ফিরিয়া আসে, তিনি এই চিন্তাতেই সমস্ত সময় কাটাইতেন। ইঁহার সঙ্গে ফ্লরেন্সের আলাপ হওয়ায়, দুজনেরই উৎসাহ খুব বাড়িয়া গেল।

ফ্লরেন্স বুঝিলেন যে ইংলণ্ডের হাসপাতালগুলির উন্নতি করিতে হইলে রোগীর সেবার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত লোক চাই। সেবার কাজ মেয়েদের দ্বারাই খুব ভালোরকমে হইবার কথা, সুতরাং তাঁহার মনে এই চিন্তা আসিল যে, এক-দল মেয়েকে রোগীর শুশ্রূষা বিষয়ে ভালোরকম শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

সে সময়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশে এ-বিষয়ে কিছু কিছু বন্দোবস্ত ছিল! সেখানে এমন সব শুশ্রূষাকারিণীর দল ছিল, যাঁহারা আবশ্যকমতো রোগীর শুশ্রূষা ও যুদ্ধক্ষেত্রে আহতের সেবার জন্য সকল সময়ে প্রস্তুত থাকিতেন। ফ্রান্স দেশে Sisters of mercy নামে একদল সন্ন্যাসিনী বহুকাল হইতে অতি আশ্চর্যরূপে এই কাজ করিয়া আসিতে-ছিলেন। জার্মানিতেও শুশ্রূষা-শিক্ষার ভালো বন্দোবস্ত ছিল। মিসেস ফ্রাইয়ের সঙ্গে ফ্লরেন্স পরামর্শ করিলেন, 'একবার ঐ-সকল দেশ ঘুরিয়া এই বিষয়ে কিছু শিক্ষা করিয়া আসি।' যেমন কথা তেমনি কাজ; ফ্লরেন্স পরম উৎসাহে বিদেশে গিয়া এই শিক্ষায় লাগিয়া রহিলেন। সেখানে তাঁহার বুদ্ধি উৎসাহ ও সেবার আগ্রহ দেখিয়া, সকলেই অবাক হইয়া গেল! তিনি ছয় মাসের মধ্যে রীতিমত পরীক্ষা পাশ করিয়া এবং সকল বিষয়ে আশ্চর্য সফলতা দেখাইয়া দেশে ফিরিলেন; কিন্তু এত পরিশ্রমের ফলে তাঁহার শরীর এমন ভাঙিয়া পড়িল যে, তাঁহার কাজ আরম্ভ করিতে আরো বছরখানেক দেরি হইয়া গেল। সুস্থ হইয়াই তিনি চারিদিকে হাসপাতাল আতুরাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের মধ্যে এক আশ্চর্য পরিবর্তন আনিয়া ফেলিলেন। তখন তাঁহার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর।

ইহার কিছুদিন পরেই ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে রুশিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের লড়াই বাধিয়া গেল। ইংরাজেরা সে সময়ে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিল না। তাড়াতাড়ি কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হইল। তাহাদের চিকিৎসার জন্য বা আহতের সেবার জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা করিবার সময় হইল না। ইহার ফল এই হইল যে, চারিদিকে অসম্ভবরকম বে-বন্দোবস্ত দেখা দিল; এমন-কি, রুগ্ন ও আহত সৈন্যগণ হাসপাতালে গিয়া, ঔষধপথ্য ও চিকিৎসার অভাবে দলে দলে মরিতে লাগিল। সে সময়ের অবস্থা এমন ভয়ানক হইয়াছিল যে, যুদ্ধে যত লোক মারা পড়ে তাহার সাতগুণ লোকে হাসপাতালে প্রাণ হারায়।

এই-সকল কথা ইংলণ্ডে পৌঁছিলে পর লোকে শিহরিয়া উঠিল। 'কি করা যায়,

কিরূপে এ অবস্থা দূর হয়' এই ভাবনায় সকলে অস্থির হইয়া পড়িল। তখন ইংলণ্ডের যুদ্ধমন্ত্রী নিজে ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেলকে লিখিলেন, "আপনি এই কাজের ভার লইতে পারেন কি ?" এমন ডাক শুনিয়াও কি ফ্লরেন্স নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন ? তিনি কিছুমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া, চৌত্রিশ জন শুশ্রূষাকারিণী (nurse) সঙ্গে যুদ্ধস্থানে চলিলেন। শুনিয়া দেশসুদ্ধ লোকে আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "আর ভয় নাই।"

'মিস নাইটিঙ্গেলের দল' যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছিয়া দেখিলেন কাজ বড়ো সহজ নয়। ছোট্টো একটি হাসপাতাল, তাহার মধ্যে চারহাজার লোক ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া শুইয়া আছে। অধিকাংশই জ্বর ও আমাশয়ে ভুগিতেছে—আহতের সংখ্যা খুবই কম। ঔষধের কোনো ব্যবস্থা নাই—পথ্যাপথ্যের বিচার নাই—যাহার ভাগ্যে যাহা জুটিতেছে সে তাহাই খাইতেছে। তার উপর হাসপাতালের বিছানাপত্র সমস্ত এমন ময়লা ও দুর্গন্ধ যে, সুস্থ লোকেও সেখানে অসুস্থ হইয়া পড়ে। শুশ্রূষাকারিণীর দল প্রথমে নিজেরা হাসপাতাল ধুইয়া সাফ করিলেন ; তার পর প্রত্যেকটি বিছানা মাদুর চাদর পরিষ্কার করিয়া কাচিলেন। কে কি খাইবে, কাহার কি ঔষধ চাই, এ-সমস্তের ব্যবস্থা করিলেন। মিস নাইটিঙ্গেল নিজে রান্নাঘরের সমস্ত গুছাইয়া পথ্যের বন্দোবস্ত করিলেন। দেখিতে দেখিতে হাসপাতালের চেহারা ফিরিয়া গেল। চারিদিক ঝর্‌ঝরে পরিষ্কার। ক্রমে হতাশ রোগীদের মুখে প্রফুল্লতা দেখা দিল—চারিদিকে সকলের উৎসাহ জাগিয়া উঠিল—সকলে বলিল, "মিস নাইটিঙ্গেল নিজে সব ভার লইয়াছেন, আর ভয় নাই।" যেখানে অর্ধেকের বেশি লোক বিনা চিকিৎসায় মরিতেছিল, সেখানে এখন শতকরা আটানব্বই জন প্রাণে বাঁচিয়া মিস নাইটিঙ্গেলের জয়জয়কার করিতে লাগিল। তাঁহার আর বিশ্রাম নাই, সকলের খবর লইতেছেন, সকলের কাছে কত কথা বলিতেছেন—কতজনকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য কত গল্প করিতেছেন—কতজন লিখিতে পারে না, তিনি তাহাদের চিঠি লিখিয়া দিতেছেন। সাধে কি তাহারা বলিত, "ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল স্বর্গের দেবী, তাঁহার ছায়া লাগিলে মানুষ পবিত্র হয়।"

তার পর যখন যুদ্ধ শেষ হইল, সকলে দেশে ফিরিল—তখন ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেলের সম্মানের জন্য বিপুল আয়োজন চলিতে লাগিল। তিনি সে-সমস্ত এড়াইয়া ভগ্ন শরীরে চুপচাপ লুকাইয়া দেশে ফিরিলেন। কিন্তু লোকে তাহা শুনিবে কেন ? তাহারা তাঁহার জন্য মনুমেন্ট তুলিয়া, লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা উঠাইয়া, তাঁহার নামে শুশ্রূষা-শিক্ষার আয়োজন করিয়া, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দেখাইয়াছে ; রাজা প্রজা সকলে মিলিয়া তাঁহার কাছে মাথা নত করিয়াছে ; দেশ-বিদেশ হইতে কতরকমের সম্মান তাঁহার উপর ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্বয়ং মহারানী ভিক্টোরিয়া বার বার তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি যে কাজ করিলে তাহার আর তুলনা হয় না।" ইহার পরেও মিস নাইটিঙ্গেল প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন এবং জীবনের শেষপর্যন্ত সর্বদাই অসংখ্য প্রকার সেবার কাজে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। এখন এই যে ইউরোপের যুদ্ধে এত 'রেডক্রস' 'এম্বুলেন্স' প্রভৃতির নাম শোন, আহতের সেবার জন্য এত চেষ্টা, এত আয়োজন দেখ, বলিতে গেলে এ-সমস্তেরই মূলে ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল।

সন্দেশ—ভাদ্র, ১৩২৩

অজানা দেশে

সেদিন একটা বইয়ে মাঙ্গো পার্কের কথা পড়ছিলাম। প্রায় সওয়া শো বৎসর আগে অর্থাৎ লিভিংস্টোনের অনেক পূর্বে মাঙ্গো পার্ক আফ্রিকার অজানা দেশ দেখতে গিয়েছিলেন। এক-একজন মানুষের মনে কেমন নেশা থাকে, নূতন দেশ নূতন জায়গার কথা শুনলে তারা সেখানে ছুটে যেতে চায়। তারা অসুবিধার কথা ভাবে না, বিপদ-আপদের হিসাব করে না—একবার সুযোগ পেলেই হয়। মাঙ্গো পার্ক এইরকমের লোক ছিলেন। তাঁর বয়স যখন চব্বিশ বৎসর মাত্র, তখন তিনি নাইগার নদীর সন্ধান করতে গিয়েছিলেন। তার কিছুদিন আগে একজন ইংরাজ সেই অজানা দেশে ডাকাতের হাতে মারা যান—অথচ পার্ক তা জেনেও মাত্র দুজন সে-দেশী চাকর সঙ্গে সেই পথেই বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর উদ্দেশ্য সেই নদী ধরে ধরে তিনি আফ্রিকার ঐ অঞ্চলটা বেশ করে ঘুরে আসবেন। তখনো আফ্রিকার ম্যাপে সেই-সব জায়গায় বড়ো-বড়ো ফাঁক দেখা যেত আর সেগুলোকে 'অজানা দেশ' বলে লেখা হত।

সে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সে সময়ে অনেকটা আরব ও মূর জাতীয় মুসলমানদের হাতে ছিল। ইউরোপীয় লোক সেখানে গিয়ে পাছে তাদের ব্যবসা কেড়ে নেয়, এই ভয়ে সাহেব দেখলেই তারা নানারকম উৎপাত লাগিয়ে দিত। পার্ককেও তারা কম জ্বালাতন করে নি; কতবার তাঁকে ধরে বন্দী করে রেখেছে—তাঁর সঙ্গের জিনিসপত্র কেড়ে নিয়েছে—তাঁর লোকজনকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে এমন-কি, তাঁকে মেরে ফেলবার জন্যও অনেকবার চেষ্টা করেছে। তার উপর সে দেশের অসহ্য গরম আর নানারকম রোগের উৎপাতেও তাঁকে কম ভুগতে হয় নি। একবার জলের অভাবে তাঁর এত কষ্ট হয়েছিল যে, তিনি গাছের পাতা শিকড় ডাঁটা চিবিয়ে তৃষ্ণা দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু তাতে কি তৃষ্ণা যায়? সারাদিন পাগলের মতো জল খুঁজে খুঁজে, সন্ধ্যার কিছু আগে ঘোড়া থেকে নামতে গিয়ে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তার পর যখন তাঁর জ্ঞান হল তখন তিনি চেয়ে দেখেন, ঘোড়াটা তখনো তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে সূর্য অস্ত গেছে, চারিদিক ক্রমেই অন্ধকার হয়ে আসছে, কাজেই আবার তাঁকে ঘোড়ায় চড়ে জলের সন্ধানে বেরুতে হল। তার পর যখন তাঁর দেহে আর শক্তি নাই, মনে হল প্রাণ বুঝি যায় যায়, তখন হঠাৎ উত্তরদিকে বিদ্যুৎ চমকিয়ে উঠল। তা দেখে তাঁর আবার উৎসাহ ফিরে এল, তিনি বৃষ্টির আশায় সেইদিকে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে ক্রমে ঠাণ্ডা বোধ হতে লাগল, বাদলা হাওয়া দেখা দিল তার পর কড়্‌কড়্‌ করে বাজ পড়ে ঝমাঝম্ বৃষ্টি নামল। পার্ক তখন তাঁর সমস্ত কাপড় বৃষ্টিতে ধরে দিয়ে, সেই ভিজা কাপড় নিংড়িয়ে তার জল খেয়ে তৃষ্ণা দূর করলেন। তখন ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার রাত্রি, বিদ্যুতের আলোতে কম্পাস দেখে দিক স্থির করে, আবার তাঁকে সারারাত চলতে হল।

একবার তিনি সারাদিন না খেয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে এক শহরে গিয়ে হাজির হতেই, সেখানকার রাজা হুকুম দিলেন, "তুমি গ্রামে ঢুকতে পারবে না।" তিনি সেখান থেকে এক গ্রামে গেলেন, সেখানেও লোকেরা তাঁকে দেখে ভয়ে পালাতে লাগল—তিনি যে

বাড়িতেই যান লোকে দরজা বন্ধ করে দেয়। শেষটায় হতাশ হয়ে তিনি একটা গাছের তলায় বসে পড়লেন। এইরকম অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর, একটি নিগ্রো স্ত্রীলোক আর তার মেয়ে এসে, তাঁকে ডেকে তাদের বাড়িতে নিয়ে খেতে আর বিশ্রাম করতে দিল। সে-দেশীয় মেয়েরা সন্ধ্যার পর ঘরে বসে চরকায় সুতো কাটে আর গান গায়। মাঙ্গো পার্কের নামে তারা গান বানিয়ে গেয়েছিল—সেই গানটার অর্থ এই—'ঝড় বইছে আর বৃষ্টি পড়ছে, আর বেচারা সাদা লোকটি শ্রান্ত অবশ হয়ে আমাদের গাছতলায় এসে বসেছে। ওর মা নেই, ওকে দুধ এনে দেবে কে? ওর স্ত্রী নেই, ওকে ময়দা পিষে দেবে কে? আহা, ঐ সাদা লোকটিকে দয়া কর। ওর যে মা নেই, ওর যে কেউ নেই।'

তিনি অনেকবার 'মূর'দের হাতে পড়েছিলেন। এক-একটা গ্রামে তিনি যান আর সেখানকার সর্দার তাঁকে ডেকে পাঠায়, নাহয় লোক দিয়ে ধরপাকড় করে নিয়ে যায়। এইরকম অবস্থায় তারা তাঁর কাছ থেকে, প্রায়ই কিছু-না-কিছু বকসিস আদায় না করে ছাড়ত না। এমনি করে তাঁর সঙ্গের জিনিসপত্র প্রায় সবই বিলিয়ে দিতে হয়েছিল। একবার এক সর্দার তাঁর ছাতাটি তাঁর কাছ থেকে আদায় করে মহা খুশি! ছাতাটাকে সে ফট্‌ফট্‌ করে খোলে আর বন্ধ করে; আর হো হো করে হাসে। কিন্তু ওটা দিয়ে কি কাজ হয়, সে কথাটা বুঝতে তার নাকি অনেকখানি সময় লেগেছিল। আসবার সময় মাঙ্গো পার্কের নীল কোট আর তাতে সোনালি বোতাম দেখে সর্দারমশাই কোটটাও চেয়ে বসলেন। তখন সেটা তাকে না দিয়ে আর উপায় কি? যাহোক, সর্দারের মেজাজ ভালো বলতে হবে, সে ছাতা আর কোটের বদলে তাঁকে অনেক জিনিসপত্র সঙ্গে দিয়ে, তাঁর চলাফিরার সুবিধা করে দিল। কিন্তু সকল সময়ে তিনি এত সহজে পার পান নি। আলি নামে এক মূর রাজার দল তাকে বন্দী করে, মাসখানেক খুব অত্যাচার করেছিল। প্রথমটা তারা ঠিক করল যে, এই বিধর্মী খৃস্টানটাকে মেরে ফেলাই ভালো। তার পর কি যেন ভেবে তারা আবার বলল, "ওর ঐ বেড়ালের মতো চোখ দুটো গেলে দেও।" যাহোক শেষটায় সেখানকার রানীর অনুগ্রহে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন।

এমনি করে অত্যাচার অপমান চুরি ডাকাতি সব সহ্য করে, মাঙ্গো পার্ক শেষটায় একেবারে ফকির হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর লোকজন কাপড়চোপড় জিনিসপত্র, এমন-কি, ঘোড়াটি পর্যন্ত সঙ্গে রইল না। কিন্তু এত কষ্ট সয়েও শেষটায় যখন তিনি নাইগার নদীর সন্ধান পেলেন, তখন তাঁর মনে হল এত কষ্ট এত পরিশ্রম সব সার্থক হয়েছে। এমনি করে তিনি দুই বৎসর সে দেশ ঘুরে, তার পর দেশে ফিরে আসেন। এই দুই বৎসরের সব ঘটনা তিনি প্রতিদিন লিখে রাখতেন। আমরা এখানে যা লিখছি তার প্রায় সবই তাঁর সেই ডায়ারি থেকে নেওয়া।

আফ্রিকার নিগ্রো জাতীয় লোকদের আমরা সাধারণত 'অসভ্য জাতি' বলে থাকি—কিন্তু মাঙ্গো পার্ক বলেন যে, মূর বা আরব জাতীয় লোকেদের মধ্যে যারা কতকটা 'সভ্য' হয়েছে, তাদের চাইতে এই অসভ্যেরা অনেক ভালো। আমাদের দেশে যেমন সাঁওতালেরা প্রায়ই খুব সরল আর সত্যবাদী হয়, মোটের উপর এরাও তেমনি। তাদের দেশে তারা বিদেশী লোক দেখে নি, কাজেই হঠাৎ অদ্ভুত পোশাক পরা হলদে চুল, নীল চোখ সাদা

রঙের মানুষ দেখলে তাদের ভয় হবারই কথা। কিন্তু তবু বিপদে-আপদে পার্ক তাদের কাছেই সাহায্য পেতেন—মূর বা আরবদের কাছে নয়।

দেশের নানান স্থানে নানান জাতীয় লোক, তাদের মধ্যে সর্বদাই যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে। একবার মাঙ্গো পার্ক মালাকোণ্ডা বলে একটা শহরে এসে শুনলেন, আরো উত্তরে খুব বড়ো একটা লড়াই চলছে—'ফুতা-তরা'র রাজা আবুল কাদের অসভ্য জালফদের রাজা দামেলকে আক্রমণ করেছেন। এই আবুল কাদের আর দামেলের যুদ্ধ বড়ো চমৎকার। আবুল কাদের একজন দূতকে দিয়ে দামেলের কাছে দুখানা ছুরি পাঠিয়ে দিলেন, আর বলে দিলেন, "দামেল যদি মুসলমান হতে রাজি হন, তবে এই ছুরি দিয়ে আবুল কাদের নিজের হাতে তাঁর মাথা কামিয়ে দিবেন, আর যদি রাজি না হন তবে ঐ ছুরিটি দিয়ে তাঁর গলা কাটা হবে। এর মধ্যে কোনটি তাঁর পছন্দ?" দামেল এ কথা শুনে বললেন, "কোনোটাই পছন্দ হচ্ছে না। আমি মাথাও কামাতে চাই না, গলায় ছুরিও বসাতে চাই না।" আবুল কাদের তখন প্রকাণ্ড দলবল সঙ্গে নিয়ে, জালফদের দেশে লড়াই করতে এলেন। জালফদের অত সৈন্য-সামন্ত নেই, তারা নিজেদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে, পথের পাতকুয়া সব বন্ধ করে, শহর গ্রাম সব ছেড়ে পালাতে লাগল। এমনি করে তিনদিন পর্যন্ত আবুল কাদের ক্রমাগত এগিয়েও লড়াইয়ের কোনো সুযোগ পেলেন না। তিনি যতই এগিয়ে চলেন, কেবল নষ্ট গ্রাম আর পোড়া শহরই দেখেন, কোথাও জল নাই খাবার কিছু নাই, লুটপাট করবার মতো কোনো জিনিসপত্র নাই। চতুর্থ দিনে তিনি পথ বদলিয়ে সারাদিন হেঁটে একটা জলা জায়গার কাছে এলেন। সেখানে কোনোরকমে তৃষ্ণা দূর করে ক্লান্ত হয়ে সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে, এমন সময় ভোররাত্রে দামেল তাঁর দলবল নিয়ে, মার মার করে তাদের উপরে এসে পড়লেন। আবুল কাদেরের দল সে চোট আর সামলাতে পারল না—তাদের কেউ কেউ পালিয়ে গেল, অনেকে মারা পড়ল, কিন্তু অধি-কাংশই জালফদের হাতে বন্দী হল—সেই বন্দীদের একজন হচ্ছেন আবুল কাদের নিজে। জালফরা মহা ফূর্তিতে আবুল কাদেরকে বেঁধে দামেলের কাছে নিয়ে গেল। সকলে ভাবল এইবার দামেল বুঝি তাঁর বুকে ছুরি মেরে তাঁর শত্রুতার প্রতিশোধ নেবেন। কিন্তু দামেল সেরকম কিছুই না করে, জিজ্ঞাসা করলেন, "আবুল কাদের, তুমি যথার্থ বল তো —আজ তুমি বন্দী না হয়ে যদি আমি বন্দী হতাম, আর তোমার কাছে আমায় নিয়ে যেত, তা হলে তুমি কি করতে?" আবুল কাদের বললেন, "তোমার বুকে আমার বল্লম বসিয়ে দিতাম। তুমি তার বেশি আর কি করবে?" দামেল বললেন, "তা নয়! তোমায় মেরে আমার লাভ কি? আমার এই-সব নষ্ট ঘরবাড়ি কি তাতে ভালো হয়ে যাবে, আমার প্রজারা কতজনে মারা পড়েছে—তারা কি আবার বেঁচে উঠবে? তোমায় আমি মারব না। তুমি রাজা, কিন্তু রাজার ধর্ম থেকে তুমি পতিত হয়েছ। যতদিন তোমার সে দুর্মতি দূর না হয়, ততদিন তুমি রাজত্ব করবার যোগ্য হবে না—ততদিন তুমি আমার দাসত্ব করবে।" এইভাবে তিন মাস নিজের বাড়িতে বন্দী করে রেখে তার পর তিনি আবুল কাদেরকে ছেড়ে দিলেন। এখনো নাকি সে দেশের লোকেরা দামেলের এই আশ্চর্য মহত্ত্বের কথা বলে গান করে।

নাইগার নদীর আশেপাশে যে-সব নিগ্রোরা থাকে তাদের 'মাণ্ডিঙ্গো' বলে। তাদের সম্বন্ধে পার্ক অনেক খবর সংগ্রহ করেছেন। তারা মনে করে, এই পৃথিবীটা একটা প্রকাণ্ড সমতল মাঠের মতো ; তার শেষ কোথায় কেউ জানতে পারে না, কারণ তার চারিদিক মেঘে ঘেরা। তারা বছরের হিসাব দেয় বড়ো-বড়ো ঘটনার নাম করে, যেমন 'কুরবানা যুদ্ধের বছর', 'দামেলের বীরত্বের বছর'। পার্ক যে-সকল গ্রামে গিয়েছিলেন, তার কোনো কোনোটিতে সেই বছরকে বলা হত 'সাদা লোক আসবার বছর'।

এর পরেও পার্ক আর-একবার দলবল নিয়ে আফ্রিকায় যান এবং সেইখানেই প্রাণ হারান। এবার গোড়াতেই জ্বর-জারি হয়ে তাঁর লোকজন সব মারা যেতে লাগল। সাতচল্লিশজন সাহেবের মধ্যে তিন মাসে কুড়িজন মারা গেল, বাকি অনেকগুলি অসুখে একেবারে কাহিল হয়ে পড়ল। চার মাসে তিনি আবার নাইগার নদীর ধারে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি আর সঙ্গে দুই-একটি নিগ্রো ছাড়া আর সকলেই প্রায় অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে। তার পর তিনি নৌকায় চড়ে জলের পথে কয়েকদিন গেলেন, কিন্তু চারিদিক থেকে মূরেরা ক্রমাগত আক্রমণ করে তাঁদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। শেষটা যখন তাঁর সঙ্গের সাতটিমাত্র সাহেব বেঁচে আছে, এমন সময় অনেক কষ্টে নিগ্রোদের দেশে এসে তিনি মনে করলেন, এতক্ষণে নিরাপদ হওয়া গেল। কিন্তু এইখানেই নদী পার হবার সময় তিনি দলবলসুদ্ধ নিগ্রোদের হাতে মারা গেলেন। তাঁর একটিমাত্র বিশ্বস্ত নিগ্রো চাকর, তাঁর চিঠিপত্র নিয়ে ফিরে এসে এই খবর দিল যে, নদীর স্রোতের মধ্যে নৌকাকে বেকায়দায় পেয়ে নিগ্রোরা তাদের মেরেকেটে সব লুটে নিয়েছে। তখন পার্কের বয়স চৌত্রিশ বৎসর মাত্র।

সন্দেশ—আশ্বিন, ১৩২৩

গ্যালিলিও

সে সাড়ে তিনশত বৎসর আগেকার কথা। ইটালি দেশে পিসা নগরে সম্ভ্রান্ত বংশে গ্যালিলিওর জন্ম হয়। গ্যালিলিওর পিতা অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, শিল্প সংগীত প্রভৃতি নানা বিদ্যায় তাঁহার দখল ছিল। কিন্তু তবু সংসারে তাঁহার টাকা পয়সার অভাব লাগিয়াই ছিল। সুতরাং তিনি ভাবিলেন, পুত্রকে এমন কোনো বিদ্যা শিখাইবেন, যাহাতে ঘরে দুপয়সা আসিতে পারে। স্থির হইল, গ্যালিলিও চিকিৎসা শিখিবেন।

কিন্তু বাল্যকাল হইতেই গ্যালিলিওর মনের ঝোঁক অন্যদিকে। ডাক্তারি বই পড়ার চাইতে তিনি কলকব্জা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেই বেশি ভালোবাসিতেন। সকলে বলিত, 'ও-সব শিখিয়া লাভ কি ? যাহাতে পয়সা হয় তাই শিখিতে চেষ্টা কর।' উনিশ বৎসর বয়সে একদিন ঘটনাক্রমে জ্যামিতি বিষয়ে এক বক্তৃতা শুনিয়া, গ্যালিলিও সেইদিন হইতেই জ্যামিতি শিখিতে লাগিয়া গেলেন। কিন্তু বেশিদিন তাঁহার কলেজে পড়া হইল না।

তাঁহার পিতার দুরবস্থা ক্রমে বাড়িয়া শেষটায় এমন হইল যে, তিনি আর পড়ার খরচ দিতে পারেন না। কলেজের কর্তারাও দেখিলেন, এ ছোকরা নিজের পড়াশুনার চাইতে জ্যামিতি ও অন্যান্য 'বাজে' বইয়েতেই বেশি সময় নষ্ট করে। বুঝাইতে গেলে উলটা তর্ক করে, আপনার জেদ ছাড়িতে চায় না। সুতরাং গ্যালিলিওর কলেজে টেঁকা দায় হইল। তিনি বাড়িতে ফিরিয়া আবার অঙ্কশাস্ত্রে মন দিলেন। তার পর পঁচিশ বৎসর বয়সে অনেক চেষ্টার পর, তিনি মাসিক ষোলো টাকা বেতনে সামান্য এক মাস্টারির চাকরি লইলেন।

কিন্তু এ চাকরিও তাঁহার বেশিদিন টিঁকিল না। কেন টিঁকিল না, সে এক অদ্ভুত কাহিনী। সে সময়ে লোকের ধারণা ছিল, এবং পণ্ডিতেরাও এইরূপ বিশ্বাস করিতেন যে, যে-জিনিস যত ভারী, শূন্যে ছাড়িয়া দিলে সে তত তাড়াতাড়ি মাটিতে পড়ে। গ্যালিলিও একটা উঁচু চূড়া হইতে নানারকম জিনিস ফেলিয়া দেখাইলেন যে, এ কথা মোটেও সত্য নয়। সব জিনিসই ঠিক সমান হিসাবে মাটিতে পড়ে। তবে কাগজ, পালক প্রভৃতি নিতান্ত হাল্‌কা জিনিস যে আস্তে আস্তে পড়ে তার কারণ এই যে, হাল্‌কা জিনিসকে বাতাসের ধাক্কায় ঠেলিয়া রাখে। ঠিক কিরকমভাবে জিনিস কত সেকেণ্ডে কতখানি পড়ে, তাহারও তিনি চমৎকার হিসাব বাহির করিলেন। কিন্তু এত বড়ো আবিষ্কারে লোকে খুশি না হইয়া বরং সকলে গ্যালিলিওর উপর চটিয়া গেল। পণ্ডিতেরা পর্যন্ত গ্যালিলিওর হিসাব প্রমাণ কিছু না দেখিয়াই সব আজগুবি বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। এবং তাহার ফলে ঘোর তর্ক উঠিয়া গ্যালিলিওর চাকরিটি গেল।

যাহা হউক, অনেক চেষ্টায় গ্যালিলিও আবার আর-একটি চাকরি জোগাড় করিলেন এবং কয়েক বৎসর একরূপ শান্তিতে কাটাইলেন। কিন্তু বিনা গোলমালে চুপচাপ করিয়া থাকা তাঁহার স্বভাব ছিল না। ১৬০৪ খৃস্টাব্দে চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি কোপানিকাসের মত সমর্থন করিয়া তুমুল তর্ক তুলিলেন। কোপানিকাসের পূর্বে লোকে বলিত, 'পৃথিবী শূন্যে স্থির আছে—সূর্য গ্রহ চন্দ্র তারা সব মিলিয়া তাহার চারিদিকে ঘুরিতেছে।' কোপানিকাস যখন বলেন যে 'পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে' তখন লোকে তাঁহার কথা গ্রাহ্য করে নাই। সুতরাং গ্যালিলিও যখন আবার সেই মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন আবার একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সে সময়কার পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে—কিন্তু গ্যালিলিও একাই তেজের সহিত তর্ক চালাইয়া সকলকে নিরস্ত করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে গ্যালিলিও দূরবীক্ষণের আবিষ্কার করেন। হল্যাণ্ড দেশের এক চশমাওয়ালা কেমন করিয়া দুইখানা কাঁচ লইয়া আন্দাজে পরীক্ষা করিতে গিয়া দৈবাৎ একটা দূরবীক্ষণ বানাইয়া ফেলে। এই সংবাদ ক্রমে ইটালি পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল ; গ্যালিলিও শুনিলেন যে, একরকম যন্ত্র বাহির হইয়াছে, তাহাতে দূরের জিনিস খুব নিকটে দেখা যায়। শুনিয়াই তিনি ভাবিতে বসিলেন এবং রাতারাতি জিনিসটার সংকেত বাহির করিয়া নিজেই একটা দূরবীন বানাইয়া ফেলিলেন। হল্যাণ্ডের চশমাওয়ালাটি দূরবীন দিয়া দূরের ঘরবাড়ি দেখিয়াই সন্তুষ্ট ছিল, গ্যালিলিও তাহাকে আকাশের দিকে ফিরাইলেন।

দুরবীনে আকাশ দেখিয়া তাঁহার মনে কী যে আনন্দ হইল, সে আর বলা যায় না। তিনি যেদিকে দুরবীন ফিরান, যাহা কিছু দেখিতে যান সবই আশ্চর্য দেখেন। চাঁদের উপর দুরবীন কষিয়া দেখা গেল, তার সর্বাঙ্গে ফোস্কা। কোন জন্মের সব আগ্নেয় পাহাড় তার সারাটি গায়ে যেন চাক বাঁধিয়া আছে। বৃহস্পতিকে দেখা গেল একটা চ্যাপ্টা গোলার মতো—তার আবার চার চারটি চাঁদ। সূর্যের গায়ে কালো কালো দাগ। ছায়াপথের ঝাপ্‌সা আলোয় যেন হাজার হাজার তারার গুঁড়া ছড়াইয়া আছে। শুক্রগ্রহ যে ঠিক আমাদের চাঁদের মতো বাড়ে কমে, দুরবীনে তাহাও ধরা পড়িল। এমনি করিয়া গ্যালিলিও কত যে আশ্চর্য ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন তাহার আর শেষ নাই। অবশ্য এ-সব কথাও লোকে বিশ্বাস করিতে চাহিল না—কোনো কোনো পণ্ডিত গ্যালিলিওর সঙ্গে তর্ক করিতে আসিয়া, তাঁহার দুরবীন দেখিয়া তবে সব বিশ্বাস করিলেন। কেহ কেহ সব দেখিয়াও বলিলেন, "ও-সব কেবল দেখার ভুল—চোখে ধাঁধা লাগিয়া ঐরূপ দেখায়—আসলে আকাশে ওরকম কিছু নাই।" একজন পণ্ডিত দুরবীন দিয়া বৃহস্পতির চাঁদ দেখিতে সাফ অস্বীকার করিলেন।

ক্রমে কথাটা গুরুতর হইয়া উঠিল। লোকে বলিতে লাগিল, গ্যালিলিও এইরকমভাবে যা-তা প্রচার করিতে থাকিলে লোকের ধর্মবিশ্বাস আর টিঁকিবে না। পৃথিবী স্থির হইয়া আছে, এ কথাই যদি লোকে বিশ্বাস না করে, তবে কিসে তাহারা বিশ্বাস করিবে? স্বয়ং ধর্মগুরু পোপ আদেশ দিলেন, "তুমি এই-সকল জিনিস লইয়া বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করিও না। তোমার যা বিশ্বাস, তা তোমারই থাক। তাহা লইয়া যদি লোকের মনে নানারকম সন্দেহ জন্মাইতে যাও, তবে ভালো হইবে না।" গ্যালিলিও বুঝিলেন যে 'ভালো হইবে না' কথাটার অর্থ বড়ো সহজ নয়। নিজের প্রাণটি বাঁচাইতে হইলে আর গোলমাল না করাই ভালো। কয়েক বৎসর গ্যালিলিও চুপ করিয়া রহিলেন—অর্থাৎ ঐ বিষয়ে চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহার মনের রাগ ও ক্ষোভ গেল না। কিছুদিন জোয়ার ভাঁটা ধূমকেতু ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া, তিনি আবার সেই পৃথিবী ঘোরার কথা লইয়া নাড়াচাড়া আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এবারে 'পৃথিবী ঘোরে' এ কথা স্পষ্টভাবে না বলিয়া, তিনি তাঁহার বিরুদ্ধদলকে নানারকমে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া সকলকে ক্ষ্যাপাইয়া তুলিলেন। তখন পাদরির দল তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিল যে, গ্যালিলিও ধর্মগুরু পোপকে অপমান করিয়াছেন। অভিযোগটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কিন্তু পাদরিদের ধর্মবিচার-সভায় গ্যালিলিওর উপর তাঁহার সমস্ত কথা ফিরাইয়া লইবার হুকুম হইল—না লইলে প্রাণদণ্ড। গ্যালিলিওর বয়স তখন প্রায় সত্তর বৎসর। অনেক অত্যাচারের পর তিনি তাঁহার কথা ফিরাইয়া লইলেন। সভায় সকলের সম্মুখে বলিলেন, "আমি যাহা শিক্ষা দিয়াছি, তাহা ভুল বলিয়া স্বীকার করিলাম।" কিন্তু মুখে এ কথা বলিলেও তাঁহার মন তাহা মানিল না—তিনি পাশের একটি বন্ধুকে দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "অস্বীকার করিলে হইবে কি? এই পৃথিবী এখনো চলিতেছে।"

এইরূপে নিজের জীবনের উপার্জিত সমস্ত সত্যকে অস্বীকার করিয়া, তিনি মনের ক্ষোভে ভগ্নদেহে বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। তার পর যে কয়েক বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন,

তাঁহাকে আর বাহিরে কোথাও বড়ো দেখা যাইত না। নিজে সারাজীবন সাধনা করিয়া যাহা সত্য বুঝিয়াছেন, তাহা প্রাণ খুলিয়া প্রচার করিতে পারিলেন না, এই দুঃখ লইয়াই তাঁহার জীবন শেষ হইল। যদি গ্যালিলিও জানিতেন আজ জগতের লোকে তাঁহার শিক্ষা এমন সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবে, তবে বোধ হয় বৃদ্ধের শেষ জীবন এত কষ্টের হইত না।

সন্দেশ—বৈশাখ, ১৩২৪

আর্কিমিডিস

প্রায় বাইশশত বৎসর আগে, গ্রীস সাম্রাজ্যের অধীন সাইরাকিউস নগরে আর্কিমিডিসের জন্ম হয়। আর্কিমিডিসের মতো অসাধারণ পণ্ডিত সেকালে গ্রীক জাতির মধ্যে আর দ্বিতীয় তো ছিলই না—সমস্ত পৃথিবীতে তাঁহার সমান কেহ ছিল কিনা সন্দেহ। দিনরাত তিনি আপনার পুঁথিপত্র লইয়া কী যে চিন্তায় ডুবিয়া থাকিতেন, আর অঙ্ক কষিয়া কষিয়া কত যে আশ্চর্য তত্ত্বের হিসাব করিতেন, লোকে তাহার কিছুই বুঝিত না—কেবল দু-দশজন পণ্ডিতলোকে পরম আগ্রহে আদর করিয়া তাঁহার সংবাদ লইত, আর অবাক হইয়া বলিত, "পণ্ডিতের মতো পণ্ডিত যদি কেউ থাকে, তবে সে হচ্ছে আর্কিমিডিস।"

সাইরাকিউসের রাজা হীয়েরো ছিলেন আর্কিমিডিসের বন্ধু। তিনি কেবলই বলিতেন, "এত বড়ো পণ্ডিত হইয়া তোমার কী লাভ হইল, যদি লোকে তোমার কদর না বোঝে? তুমি কেবল বিজ্ঞানের বড়ো-বড়ো তত্ত্ব আর সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম হিসাব নিয়া থাক; মানুষের কাজে লাগে এমন সব যন্ত্র করিয়া দেখাও—লোকে বুঝুক তুমি কত বড়ো পণ্ডিত!" বন্ধুর কথায় আর্কিমিডিস মাঝে মাঝে 'কেজো জিনিস' গড়িবার দিকে মন দিতেন। তাহার ফলে নানারকম 'স্ক্রু', জল তুলিবার জন্য প্যাঁচালো 'পাম্প' জলে-চালানো বাতাসে-চালানো কতরকম যন্ত্র প্রভৃতি সৃষ্টি হইল। পাখা টানিবার জন্য দেয়ালে যে চাকার 'পুলি' খাটানো থাকে, সেই পুলি জিনিসটাও আর্কিমিডিসের আবিষ্কার। বড়ো-বড়ো মালপত্র বোঝাই হইয়া এত যে কলের গাড়ি আর এত যে জাহাজ পৃথিবীময় ছুটিয়া বেড়াইতেছে, আর বড়ো-বড়ো কারখানায় এত যে ভারী ভারী কলকামান লোহালক্কড় লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে, সবখানেই দেখিবে মাল উঠানামার জন্য 'পুলি' না হইলে চলে না। মূর্খ লোকে যখন আর্কিমিডিসের কলকব্জার পরিচয় পাইল, তখন তাহারাও ভাবিতে লাগিল, 'লোকটা পণ্ডিত বটে।'

আর্কিমিডিসের জীবনের একটি গল্প তোমরা বোধ হয় অনেকে শুনিয়া থাকিবে। রাজা হীয়েরো এক সেকরার কাছে একটি সোনার মুকুট গড়াইতে দিয়াছিলেন। সেকরা মুকুটটি গড়িয়াছিল ভালোই কিন্তু রাজার মনে সন্দেহ হইল যে, সে সোনা চুরি করিয়াছে

এবং সেই চুরি ঢাকিবার জন্য মুকুটের মধ্যে খাদ মিশাইয়াছে। কোনো সহজ উপায়ে এই চুরি ধরা যায় কিনা জানিবার জন্য তিনি বন্ধু আর্কিমিডিসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আর্কিমিডিস সব শুনিয়া বলিলেন, "একটু ভাবিয়া বলিব।" ভাবিতে ভাবিতে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। একদিন স্নানের সময়ে কাপড় ছাড়িয়া সবে তিনি স্নানের টবে পা দিয়াছেন, এমন সময় খানিকটা জল উছলিয়া পড়ামাত্র, হঠাৎ সেই প্রশ্নের এক চমৎকার মীমাংসা তাঁহার মাথায় আসিল। তখন কোথায় গেল স্নান! তিনি তৎক্ষণাৎ, 'Eureka! Eureka!' (পেয়েছি! পেয়েছি!) বলিয়া রাস্তায় ছুটিয়া বাহির হইলেন।

যে জিনিস পাইয়া তিনি আনন্দে এমন আত্মহারা হইয়াছিলেন, বিজ্ঞানে এখনো তাহাকে 'আর্কিমিডিসের তত্ত্ব' বলা হয়। ভারী জিনিসকে জলে ছাড়িলে, তাহার 'ওজন' কমিয়া যায়; কি পরিমাণ কমিবে তাহাও হিসাব করিয়া বলা যায়। কোনো হাল্‌কা জিনিসকে জলে ভাসাইলে, তাহার খানিকটা ডোবে খানিকটা ভাসিয়া থাকে। ঠিক কতখানি ডোবে তাহারও হিসাব আছে। আর্কিমিডিসের তত্ত্বে এই-সকল কথারই আলোচনা করা হইয়াছে। আর্কিমিডিস রাজাকে বলিলেন, "ঐ মুকুটের ওজন যতখানি, ঠিক সেই ওজনের সোনা লইয়া একটা জলভরা পাত্রে পরীক্ষা করিতে হইবে। পাত্রের মধ্যে মুকুটটা ডুবাইয়া দিলে কতখানি জল উছলিয়া পড়ে, তাহা মাপিয়া দেখুন, তার পর আবার জল ভরিয়া সেই ওজনের একতাল সোনা ডুবাইয়া দেখুন কতটা জল পড়ে। মুকুট যদি খাঁটি সোনার হয়, তবে দুইবারেই ঠিক একই পরিমাণ জল বাহির হইবে। যদি খাদ মিশানো থাকে, তবে মুকুটটা সেই ওজনের সোনার চাইতে আয়তনে কিছু বড়ো হইবে, সুতরাং তাহাতে বেশি জল ফেলিয়া দিবে।"

কোনো কোনো চশমার কাঁচ এমন থাকে যে, তাহাতে অনেকখানি সূর্যের আলোককে অল্প জায়গার মধ্যে ধরিয়া আনা যায়। সেইরকম কাঁচ বেশ বড়ো করিয়া বানাইলে, তাহার মধ্যে রোদ ধরিয়া আগুন জ্বালানো চলে। সরার মতো গর্তওয়ালা আরশি দিয়াও এই কাজটি করানো যায়। আর্কিমিডিস এইরকম আরশিও বানাইয়াছিলেন। শোনা যায়, রোমের যুদ্ধ-জাহাজ যখন সাইরাকিউস আক্রমণ করিতে আসে, তখন তিনি এইরকম আরশি দিয়া কড়া রোদ ফেলিয়া, তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেন। কেবল তাহাই নয়, রোমীয় সেনাপতি মার্সেলাস যখন সৈন্য-সামন্ত লইয়া সাইরাকিউস আক্রমণ করিতে আসেন, তখন আর্কিমিডিস নগররক্ষার জন্য নানারকম অদ্ভুত নূতন নূতন যুদ্ধযন্ত্রের আয়োজন করিলেন। সে-সকল যন্ত্রের পরিচয় পাইয়া রোমীয় সৈন্য বহুদিন পর্যন্ত নগরের কাছে ঘেঁষিতে সাহস পায় নাই। তাহার পরে কত যুগ যুগ ধরিয়া, দেশে দেশে আর্কিমিডিসের অদ্ভুত কীর্তির কথা লোকের মুখে শোনা যাইত।

রোমীয় সৈন্যেরা সে-সকল যুদ্ধযন্ত্রের যে বর্ণনা দিয়াছে তাহা পড়িলে বেশ বুঝা যায়, সেগুলি তাহাদের মনে কিরকম ভয়ের সঞ্চার করিয়াছিল। বড়ো-বড়ো থামের মতো চূড়া হঠাৎ দেয়ালের উপর মাথা তুলিয়া হুড়্‌হুড়্ করিয়া শত্রুর উপর রাশি রাশি পাথর ছুঁড়িয়া মারে, আবার পর মুহূর্তেই দেয়ালের পিছনে ডুব মারে। বড়ো-বড়ো কলের ধাক্কায় কড়ি বড়গা ছুটিয়া শত্রুর জাহাজে গিয়া পড়ে, দূর হইতে প্রকাণ্ড নখালো সাঁড়াশি

চালাইয়া শত্রুর জাহাজ উপড়াইয়া আনে। এ-সকল দেখিয়া রোমের সৈন্য আর রোমের জাহাজ নগর ছাড়িয়া দূরে হটিয়া গেল। মার্সেলাস বলিলেন, "যুদ্ধ করিয়া সাইরাকিউস দখল করা কাহারও সাধ্য নয়। তোমরা পথঘাট আটকাইয়া এইখানেই বসিয়া থাক। নগরের খাদ্য যখন ফুরাইবে, তখন আপনা হইতেই ইহারা হার মানিবে।" প্রায় তিন বৎসর বিনা যুদ্ধে রোমীয়েরা সাইরাকিউসের চারিদিক ঘেরিয়া রাখিল। তার পর নগরের লোকেদের যখন না খাইয়া মারা যাইবার মতো অবস্থা হইল তখন সাইরাকিউস দখল করা সহজ হইয়া আসিল। মার্সেলাস হুকুম দিলেন, "যাও, নগর লুট করিয়া আনো। কিন্তু খবরদার, আর্কিমিডিসের কোনো অনিষ্ট করিও না।"

আর্কিমিডিস তখন কি একটা হিসাব করিতেছেন, নগরে কোথায় কি ঘটিতেছে, তাঁহার হুঁশও নাই। কতগুলা অঙ্ক ও রেখা কষিয়া তাহারই চিন্তায় তিনি ডুবিয়া আছেন। রোমীয় সৈন্যেরা সেই পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধকে আর্কিমিডিস বলিয়া চিনিতে পারিল না। তাহারা কোলাহল করিতে করিতে ঘরে ঢুকিয়া তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু তিনি তাঁহার চিন্তার মধ্যে এমনই তন্ময় হইয়াছিলেন যে, সে কথা তাঁহার কানেই গেল না। তিনি একবার খালি হাত তুলিয়া বলিলেন, "হিসাবে ব্যাঘাত দিয়ো না।" মূর্খ সৈনিক তৎক্ষণাৎ তলোয়ারের আঘাতে তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিল। তাঁহার জীবনের শেষ হিসাব আর সম্পূর্ণ হইল না- তাঁহারই রক্ত ধারায় সে হিসাব মুছিয়া ফেলিল! কি তত্ত্বের আলোচনায় তিনি এমন করিয়া তন্ময় হইয়াছিলেন, তাহা জানিবারও আর কোনো উপায় নাই।

আর্কিমিডিসের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া মার্সেলাসের দুঃখের আর সীমা রহিল না। তিনি পরম যত্নে আর্কিমিডিসের কবরের উপর অতি সুন্দর সমাধি নির্মাণ করাইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইয়াছিলেন। তাহার পর দুইহাজার বৎসর চলিয়া গেল, মানুষের ইতিহাসে এই বিজ্ঞানবীর মহাপুরুষের নাম এখনো অমর হইয়া আছে।

সন্দেশ—আষাঢ়, ১৩২৪

কলম্বস

চারশো বৎসর আগে ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিতে হইলে সকলেই পূর্বমুখে পারস্যের ভিতর দিয়া আসিত! তখন পণ্ডিতেরা সবেমাত্র পৃথিবীটাকে গোল বলিয়া বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রিস্টোফার কলম্বস নামে ইটালি দেশীয় এক নাবিক ভাবিলেন, যদি সত্য সত্যই পৃথিবীটা গোল হয়, তবে তো পূর্ব মুখে না গিয়া ক্রমাগত পশ্চিম মুখে গেলেও, সেই ভারতবর্ষের কাছাকাছিই কোথাও পৌঁছানো যাইবে। এ-বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস এতদূর হইয়াছিল যে, তিনি ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আপনার প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু কেবল বিশ্বাস আর সাহস থাকিলেই হয় না—কলম্বস

গরিব লোক, তিনি জাহাজ পাইবেন কোথা, লোকজন জোগাড় করিবেন কিসের ভরসায় ? তিনি দেশে দেশে ধনীলোকেদের কাছে দরখাস্ত করিয়া ফিরিতে ফিরিতে পর্তুগালে আসিয়া হাজির হইলেন। ক্রমে তাঁহার মতলবের কথা রাজার কানে গিয়া পৌঁছিল— তিনি তাঁর মন্ত্রীদের উপর এই বিষয়ে তদন্ত করিবার ভার দিলেন। মন্ত্রীরা ভাবিল, 'এ লোকটার কথা যদি সত্য হয়, তবে খামকা এই বিদেশীকে সাহায্য না করিয়া, আমরাই একবার এ চেষ্টাটা করিয়া দেখি-না-কেন ?' তাঁহারা কলম্বসের কাছে তাঁহার হিসাবসুদ্ধ সমস্ত নক্শা চাহিয়া লইলেন, এবং গোপনে কয়েকজন পর্তুগীজ নাবিককে সেই পশ্চিমের পথে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু কিছুদূর না যাইতেই ঝড় তুফান আর কেবল অকূল সমুদ্র দেখিয়া তাহারা ভয়ে ফিরিয়া আসিল। কলম্বস যখন জানিতে পারিলেন যে, রাজকর্মচারীরা তাঁহাকে এইভাবে ঠকাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তখন রাগে ও ঘৃণায় তিনি সে দেশ ত্যাগ করিয়া স্পেন রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইখানে সাত বৎসর রাজদরবারে দরখাস্ত বহিয়া, তার পর রানী ইসাবেলার কৃপায় তিনি তাঁহার এতদিনের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার সুযোগ পাইলেন। ১৪৯২ খৃস্টাব্দে, অর্থাৎ ঠিক চারশো পঁচিশ বৎসর পর্বে কলম্বস ভারতবর্ষের সন্ধানে যাত্রা করেন।

ক্রমাগত সত্তর দিন পশ্চিম মুখে চলিয়াও কলম্বস ডাঙার সন্ধান পাইলেন না। ইহার মধ্যে তাঁহার সঙ্গের লোকেরা কতবার নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে, কতবার তাহারা বাড়ি ফিরিবার জন্য জেদ করিয়াছে, সমুদ্রের কূল-কিনারা না দেখিয়া কতজনে ভেউ-ভেউ করিয়া কাঁদিয়াছে—এমন-কি, কলম্বসকে মারিয়া ফেলিবার জন্যও তাহারা কতবার ক্ষেপিয়াছে। কিন্তু কলম্বস অটল প্রশান্তভাবে সকলকে আশ্বাস দিয়াছেন, "ভয় নাই। আরেকটু ভরসা করিয়া চল, সমুদ্রের শেষ পাইবে।" একাত্তর দিনের দিন দূরে কূল দেখা দিল তখন সকলের আনন্দ দেখে কে। পরদিন তাঁহারা নূতন দেশে এক অজানা দ্বীপে অজানা জাতির মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। তার পর কী আনন্দে সে দেশ হইতে নানা ধনরত্ন অলংকারে জাহাজ ভরিয়া, সে-দেশী লোক সঙ্গে লইয়া, তাঁহারা সেই সংবাদ দিবার জন্য দেশে ফিরিলেন। তখন দেশে কলম্বসের সম্মান দেখে কে! কলম্বস ভাবিয়াছিলেন তিনি ভারতবর্ষের কাছে কোনো দ্বীপে আসিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি যেখানে গিয়াছিলেন সেটা আমেরিকার বাহামা দ্বীপপুঞ্জের কাছে; ইহার পর তিনি আরো দুবার পশ্চিমে যান, এবং শেষের বার আমেরিকা পৌঁছিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ-পর্যন্ত তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, তিনি ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার এই ভুলের জন্যই এখনো আমেরিকার লোকেদের 'ইণ্ডিয়ান' বলা হয়—আর ম্যাপে ঐ দ্বীপগুলার নাম লেখা হল পশ্চিম ইণ্ডিজ।

দুঃখের বিষয়, শেষজীবনে কলম্বসের অনেক শত্রু জুটিয়াছিল, তাহারা রাজার কাছে সত্য-মিথ্যা কোনোরকম নালিশ করিয়া রাজাকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তোলে। রাজা কলম্বসকে সভায় হাজির করিবার জন্য লোক পাঠান—তখন কলম্বস ষাট বৎসরের বৃদ্ধ। রাজার লোক কলম্বসের হাতে শিকল বাঁধিয়া, তাঁহাকে জাহাজে কয়েদ করিয়া রাজার কাছে চালান দিল। সৌভাগ্যক্রমে বৃদ্ধের দুর্দশা দেখিয়া রাজার

মনে কি দয়া হইল, তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু কলম্বস এ অপমানের কথা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভুলিতে পারেন নাই। মানুষের অকৃতজ্ঞতার কথা ভাবিতে ভাবিতে দারিদ্র্য ও অনাদরের মধ্যেই এই কীর্তিমান পুরুষের জীবন শেষ হইল।

সন্দেশ—আশ্বিন, ১৩২৪

'সামান্য' ঘটনা

এক-একটা সামান্য ঘটনা থেকে জগতে কত বড়ো-বড়ো কাণ্ড, কত আবিষ্কার, কত মারামারি, কত যুদ্ধবিগ্রহের আরম্ভ হয়েছে, সে কথা ভাবতে গেলে এক-এক সময় ভারি আশ্চর্য লাগে। আমাদের দেশে পুরাণে এরকম ঘটনার অনেক গল্প আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কৌরবদের মধ্যে যখন কেবল অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা আর কৃপাচার্য, এই তিনজনমাত্র বাকি রইলেন, তখন অন্ধকার রাত্রে গাছের তলায় শুয়ে অশ্বত্থামা দেখলেন, একটা পেঁচা এসে কতগুলা ঘুমন্ত কাককে অনায়াসে মেরে রেখে গেল। তাতেই অশ্বত্থামার মনে হঠাৎ এই ফন্দি জাগল যে, 'আমিও তো এমনি করে অন্ধকার রাত্রে পাণ্ডবশিবিরে ঢুকে যোদ্ধাদের মেরে ছারখার করে আসতে পারি।' যেমন মনে হওয়া, অমনি সেইমতো কাজে লাগা। সেই রাত্রের ভয়ংকর ব্যাপারের কথা তোমরা মহাভারতে পড়েছ।

ছেলেবেলায় ইংরাজিতে রবার্ট ব্রুসের গল্প পড়েছিলাম। স্কটল্যাণ্ডের যোদ্ধা রাজা রবার্ট ব্রুস প্রবল শত্রুর কাছে বার বার পরাজিত হয়ে শেষটায় রাজ্যের আশা ছেড়ে দিয়ে এক পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে আছেন; এমন সময় তিনি দেখলেন একটা মাকড়সা একখানি সুতো ধরে বার বার গুহার মুখটাকে বেয়ে উঠবার চেষ্টা করছে আর বার বার পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তবু সে চেষ্টা ছাড়ছে না। অনেক চেষ্টার পর শেষে সে ঠিকমতো উঠতে পারল। তা দেখে রাজা রবার্টের মনেও ভরসা এল—তিনি ভাবলেন, আর-একবার চেষ্টা করে দেখি। সেই চেষ্টার ফলে তিনি জয়লাভ করে আবার তাঁর রাজ্য ফিরে পেলেন।

বিজ্ঞানবীর নিউটন তাঁর বাগানে বসে দেখলেন, গাছ থেকে একটা ফল মাটিতে পড়ল। ঘটনাটা নিতান্তই সামান্য, কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার ফলাফল বড়ো সামান্য নয়। নিউটন ভাবতে বসলেন, 'ফলটা মাটিতে পড়ল কেন? জিনিসমাত্রই শূন্যে ছেড়ে দিলে মাটিতে পড়ে কেন? চারিদিক জুড়ে এত প্রকাণ্ড আকাশ পড়ে আছে, তা ছেড়ে এই পৃথিবীর মাটির উপরেই তার এত ঝোঁক কেন?' ভাবতে ভাবতে তিনি মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব আবিষ্কার করে ফেললেন। প্রথম, তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, পৃথিবীটা তার আশেপাশের সমস্ত টানে। কিন্তু শুধু পৃথিবীই কি টানে? চন্দ্র

সূর্য গ্রহ নক্ষত্র এদেরও কি সে শক্তি নেই? আর শুধু কাছের জিনিসকেই পৃথিবী টানে, অনেক দূর পর্যন্ত কি সে টান পৌঁছায় না? ভাবতে ভাবতে সিদ্ধান্ত হল এই যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রত্যেকটি জড়কণা অপর সমস্ত জড়কণার প্রত্যেকটিকে আকর্ষণ করে। যতদূরেই যাওয়া যায় সে আকর্ষণ ততই ক্ষীণ হয়ে আসে। এই পৃথিবী চন্দ্রকে টানছে চন্দ্রও পৃথিবীকে টানছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি পাথর, প্রত্যেকটি মাটির ঢেলা, প্রত্যেকটি ধূলিকণা পর্যন্ত জগতের আর-সমস্ত জিনিসকে আকর্ষণ করছে। নিউটন দেখালেন যে, এইভাবে গণনা করে দেখলে পৃথিবী গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি সকলেরই চলাফিরার ঠিকমতো হিসাব পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এত বড়ো তত্ত্বের আবিষ্কার আর দ্বিতীয় হয় নি বললেও চলে।

একটা মরা ব্যাঙের ঠ্যাঙের নাচন থেকে বিদ্যুৎপ্রবাহের আবিষ্কার হয়। গ্যালভানি (Galvani) নামে এক ইটালিয়ান পণ্ডিত পরীক্ষার জন্য একটা ব্যাঙ কেটে একটা লোহার শলাকায় ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। খানিক পরে তাঁর স্ত্রী দেখেন, সেই মরা ব্যাঙের ঠ্যাংটা এক-একবার ঝুলে পড়ছে আর এক-একবার হঠাৎ লাফিয়ে উঠছে। তিনি যদি এটাকে ভূতুড়ে কাণ্ড ভেবে ভয়ে পালাতেন, তবে তাঁর আর বিদ্যুতের তত্ত্ব আবিষ্কার করা হত না। কিন্তু তিনি ভয় পেলেন না, বরং এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ জানবার জন্য তাঁর কৌতূহল জেগে উঠল। তখন দেখা গেল, ঐ ব্যাঙের পায়ের নীচে এক টুকরো তামা রয়েছে, তাতে যতবার পা ঠেকছে ততবারই মরা ব্যাঙ নেচে উঠছে। গ্যালভানিও খবর পেয়ে দেখতে এলেন, আর পরীক্ষা করে দেখলেন যে, ওটা বিদ্যুতেরই কাণ্ড। এই যে এখন কত শহরে শহরে বিদ্যুতের কারখানা বসেছে, আর তারের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে ঘরে ঘরে পাখা চলছে, আলো জ্বলছে, এর গোড়াকার ইতিহাস যদি লিখতে হয় তবে তার মধ্যে ঐ ব্যাঙের নাচনটারও উল্লেখ থাকবে।

ভেড়ার লোম কেটে যে পশম তৈরি হয়, তাকে কাজে লাগাবার আগে তার জট ছাড়িয়ে আঁশ আল্‌গা করা দরকার। এই কাজ আগে হাতে করতে হত, পরে জট ছাড়াবার কলের সৃষ্টি হওয়াতে এখন কাজটা অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। যাদের চেষ্টায় এই কলের সৃষ্টি ও উন্নতি হয়, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হাইলম্যান নামে এক পশমওয়ালা। তিনি একদিন তাঁর মেয়েদের চুল আঁচড়ানো দেখে, মনে ভাবলেন, 'এইরকম করে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে পশমের জট ছাড়ানো হয় না কেন?' তিনি জট ছাড়াবার জন্য চিরুনির কল করলেন, তাতে পশমওয়ালাদের যে কত সুবিধা হয়ে গেল তা আর বলা যায় না। কিন্তু এর চাইতেও আশ্চর্য হচ্ছে সেলাইয়ের কলের ইতিহাস।

এলিয়াস্ হাউস আমেরিকার লোক; তাঁর বাল্যকালের শখ ছিল তিনি সেলাইয়ের কল বানাবেন। সে সময়ে সেলাইয়ের কাজ সমস্তই হাতে করতে হত, কিন্তু হাউস ভাবলেন, এতরকম কাজ কলে হচ্ছে, আর সেলাইটা হতে পারবে না কেন? তিনি বহুদিন ধরে এই বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করলেন, কিন্তু ছুঁচসুদ্ধ সুতোটাকে কাপড়ের ভিতর দিয়ে পারাপার করাতে গিয়ে তিনি মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন। নানারকম ফন্দি খাটিয়েও এই কাজটিকে তিনি কলে বাগাতে পারলেন না। তখন, একদিন রাত্রে

তিনি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন—এক অসভ্য রাজা তাঁকে বন্দী করে হুকুম দিয়েছে, এখনই আমাকে সেলাইয়ের কল বানিয়ে দাও, যদি না দাও তো তোমায় মেরে ফেলব। স্বপ্নের মধ্যে সেলাইয়ের কল বানানো গেল না। রাজা হুকুম দিলেন 'মার একে'। তখন কতগুলো লোক বল্লম দিয়ে তাঁকে মারতে এল, সেই বল্লমের মুখের ফলকের মাথাটা ফুটো। তৎক্ষণাৎ হাউসের ঘুম ভেঙে গেল, তিনি উঠে বসতেই সর্বপ্রথমে তার মনে হল 'বল্লমের মুখের কাছে ফুটো'। তিনি ভাবলেন, 'এই তো ঠিক হয়েছে। কলের ছুঁচের পিছনে সুতো না দিয়ে, এরকম মুখের কাছে সুতো দিলেই তো অনেকটা সহজ হয়ে আসে।' শেষকালে পরীক্ষায় তাই দেখা গেল—সেলাইয়ের কল করবার পক্ষে আর কোনো বাধাই রইল না। এই হল সেলাইয়ের কলের ইতিহাস।

এখানে সামান্য ঘটনাটি একটা স্বপ্ন মাত্র। এর পরে যখন সেলাইয়ের কল দেখবে, তখন এই কথাটি ভেবে দেখো যে, ওর আদি জন্মের ইতিহাসের মূল হচ্ছে একটি স্বপ্ন।

সন্দেশ—কার্তিক, ১৩২৪

ডারুইন

ছেলেবেলায় আমরা শুনিয়াছিলাম 'মানুষের পূর্বপুরুষ বানর ছিল'। ইহাও শুনিয়াছিলাম যে, ডারুইন নামে কে এক পণ্ডিত নাকি এ কথা বলিয়াছেন। বাস্তবিক ডারুইন এমন কথা কোনোদিন বলেন নাই। আসল কথা এই যে, অতি প্রাচীনকালে বানর ও মানুষের পূর্বপুরুষ একই ছিল। সেই এক পূর্বপুরুষ হইতেই বানর ও মানুষ, এ-দুই আসিয়াছে—কিন্তু সে যে কত দিনের কথা তাহা কেহ জানে না।

তখন হইতেই আমার মনে একটা সন্দেহ ছিল, পণ্ডিতেরা এত খবর জানেন কি করিয়া? তাঁহারা তো সেই প্রাচীনকালের পৃথিবীটাকে চক্ষে দেখিয়া আসেন নাই, তবে তাহার সম্বন্ধে এত সব কথা তাঁহারা বলেন কিসের জোরে? যাহা হউক, আমরা তো আর পণ্ডিত নই, তাই অনেক কথাই আমাদের মানিয়া লইতে হয়। মানিতে হয় যে এই পৃথিবীটা ফুটবলের মতো গোল এবং সে লাট্টুর মতো ঘোরে, আর সূর্যের চারিদিকে পাক দিয়া বেড়ায়—যদিও এ-সবের কিছুই আমরা চোখে দেখি না। ছেলেবেলায় ভাবিতাম, পণ্ডিতদের খুব বুদ্ধি বেশি তাই তাঁহারা অনেক কথা জানিতে পারেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি কেবল তাহা নয়। বুদ্ধি তো চাইই, তা ছাড়া আরো কয়েকটি জিনিস চাই যাহা না থাকিলে কেহ কোনোদিন যথার্থ পণ্ডিত হইতে পারে না। তার মধ্যে একটি জিনিস, ঠিকমতো দেখিবার শক্তি। সাধারণ লোকে যেমন দু-একবার চোখ বুলাইয়া মনে করে ইহার নাম 'দেখা'—পণ্ডিতের দেখা সেরকম নয়। তাঁহারা একই বিষয় লইয়া দিনের পর দিন দেখিতেছেন, তবু দেখার আর শেষ হয় না। মাথার উপর এত যে তারা সারারাত মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলে, আবার দিনের

আলোয় মিলাইয়া যায়, পণ্ডিতেরা কত হাজার বৎসর ধরিয়া তাহা দেখিতেছেন তবু তাঁহাদের তৃপ্তি নাই। বছরের কোন সময়ে কোন তারা ঠিক কোনখানে থাকে, কোন তারাটা কতখানি স্থির বা কিরকম অস্থির, তাদের রকমসকম কোনটার কেমন—এই-সবের সূক্ষ্ম হিসাব লইতে লইতে পণ্ডিতদের বড়ো-বড়ো পুঁথি ভরিয়া উঠে। সেই-সব হিসাব ঘাঁটিয়া তাহার ভিতর হইতে কত আশ্চর্য নূতন কথা তাঁহারা বাহির করেন, যাহা সাধারণ লোকের কাছে অদ্ভুত ও আজগুবি শুনায়।

আজ এক পণ্ডিতের কথা বলিব, তাঁহাকে কেহ বুদ্ধিমান বলিয়া জানিত না, মাস্টারেরা তাহার উপর কোনোদিনই কোনো আশা রাখেন নাই—বরং সকলে দুঃখ করিত, 'এ ছেলেটার আর কিছু হইবে না।' অথচ এই ছেলেই কালে একজন অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীতে আপনার নাম রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার নাম চার্লস ডারুইন। পড়ার দিকে ডারুইনের বুদ্ধি খুলিত না, কিন্তু একটা বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ আগ্রহ ছিল। সেটি কেবল নানা অদ্ভুত জিনিস সংগ্রহ করা। শামুক ঝিনুক হইতে আরম্ভ করিয়া, পুরাতন ভাঙা জিনিস বা পাথরের কুচি পর্যন্ত নানা জিনিসে তাঁহার বাক্স ও পড়িবার টেবিল বোঝাই হইয়া থাকিত। বালকের এই আগ্রহটা অন্য লোকের কাছে অন্যায় বাতিক বা উপদ্রব বলিয়াই বোধ হইত, কিন্তু তবু কেহ তাহাতে বড়ো-একটা বাধা দিত না। কারণ, ডারুইনের মনটা স্বভাবতই এমন কোমল এবং তাঁহার স্বভাব এমন মিষ্ট ছিল যে সকলেই তাঁহাকে ভালোবাসিত।

ছেলেবেলায় পড়ার মধ্যে একটি বই ডারুইন খুব মন দিয়া পড়িয়াছিলেন—তাহাতে পৃথিবীর নানা অদ্ভুত জিনিসের কথা ছিল। সেই বই পড়িয়া অবধি তাঁহার মনে দেশ-বিদেশ ঘুরিবার শখটা জাগিয়া উঠে। কলেজে আসিয়া ডারুইন প্রথমে গেলেন ডাক্তারি শিখিতে। সে সময় ক্লোরোফর্ম ছিল না, তাই রোগীদের সজ্ঞানেই অস্ত্রচিকিৎসার ভীষণ কষ্ট ভোগ করিতে হইত। সেই যন্ত্রণার দৃশ্য দেখিয়া করুণহৃদয় ডারুইনের মন এমন দমিয়া গেল যে, তাঁহার আর ডাক্তারি শেখা হইল না। তখন তিনি ধর্মযাজক হইবার ইচ্ছায় স্কটল্যাণ্ড ছাড়িয়া ইংলণ্ডে ধর্মতত্ত্ব শিখিতে আসিলেন। শিক্ষার দশা এবারও প্রায় পূর্বের মতোই হইল—কারণ, বাল্যকালে তিনি গ্রীক প্রভৃতি যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন, এ কয় বছরে তাহার সবই প্রায় ভুলিয়া বসিয়াছেন, ভুলেন নাই কেবল সেই নানা জিনিস সংগ্রহের অভ্যাসটা। কলেজে তাঁহার সহপাঠী বন্ধুরা দেখিত, ডারুইন সুযোগ পাইলেই মাঠে ঘাটে জঙ্গলে পোকামাকড় সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছেন। হয়তো সারাদিন কোনো পোকার বাসার কাছে পড়িয়া, তাহার চালচলন স্বভাব সমস্ত যারপরনাই মনোযোগ করিয়া দেখিতেছেন। এ বিষয়ে কেবল নিজের চোখে দেখিয়া তিনি এমন সব আশ্চর্য খবর সংগ্রহ করিতেন যাহা কোনো পুঁথিতে পাওয়া যায় না। বন্ধুরা এই-সব ব্যাপার লইয়া নানারকম ঠাট্টা-তামাশা করিত, কেহ কেহ বলিত, "ডারুইন পণ্ডিত হইবে দেখিতেছি!" ডারুইন যে পণ্ডিত হইতে পারেন, এটা কাহারও কাছে বিশ্বাসযোগ্য কথা বলিয়া বোধ হইত না।

এইরূপে বাইশ বৎসর কাটিয়া গেল। ১৮৩১ খৃস্টাব্দে 'বীগল্' নামে এক জাহাজ

পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইল—ডারুইন বিনা বেতনে প্রাণিতত্ত্ব সংগ্রহের জন্য তাহার সঙ্গে যাইবার অনুমতি পাইলেন। পাঁচ বৎসর জাহাজে করিয়া তিনি পৃথিবীর নানাস্থান ঘুরিয়া বেড়াইলেন এবং প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ে এমন আশ্চর্য নূতন জ্ঞান লাভ করিলেন যে, তাহা তাঁহার সমস্ত চিন্তা ও জীবনকে একেবারে নূতন পথে লইয়া চলিল। ডারুইন বলেন ইহাই তাঁহার জীবনের সবচাইতে স্মরণীয় ঘটনা।

তার পর কুড়ি বৎসর ধরিয়া ডারুইন এই-সমস্ত বিষয় লইয়া গভীরভাবে আলোচনা করিতে লাগিলেন। প্রাচীনকালে যে-সকল জীবজন্তু পৃথিবীতে ছিল, আজ তাহারা নাই, কেবল কতগুলি কঙ্কালচিহ্ন দেখিয়া আমরা তাহার পরিচয় পাই। আজ যে-সকল জীবজন্তু দেখিতেছি, তাহারাও ভুঁইফোঁড় হইয়া হঠাৎ দেখা দেয় নাই—ইহারাও সকলেই সেই আদিমকালের কোনো-না-কোনো জন্তুর বংশধর। কেমন করিয়া এ পরিবর্তন হইল? এরূপ পরিবর্তন হইবার কারণ কি? যে গাছের যে ফল তাহার বীচি পুঁতিলে সেই ফলেরই গাছ হয়, তাহাতে সেইরূপই ফল ফলে, আমরা তো এইরূপই দেখি। যে জন্তুর আকার-প্রকার যেমন, তার ছানাগুলাও হয় সেরূপ। শেয়ালের বংশে শেয়ালই জন্মে। শেয়ালের ছানা, তার ছানা, তার ছানা, তার ছানা, এরূপ যতদূর দেখিতে পাই সকলেই তো শেয়াল। তবে এ আবার কোন সৃষ্টিছাড়া নিয়ম, যাহাতে এক জন্তুর বংশে ক্রমে এমন জন্তুর জন্ম হয়, যাহাকে আর সেই বংশের সন্তান বলিয়া চিনিবার জো থাকে না? ডারুইন দেখিলেন তিনি যে-সমস্ত নূতন তত্ত্ব জানিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতেই নানা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এই-সকল প্রশ্ন ও সন্দেহের অতি চমৎকার মীমাংসা করা যায়।

যাহারা ওস্তাদ মালী তাহারা ভালো-ভালো গাছের ‘কলম' করিবার সময়, বা বীজ পুঁতিবার সময় যে সে গাছের বীজ বা কলম লইয়া কাজ করে না। ভালো গাছ, ভালো ফুল, ভালো ফল বাছিয়া বাছিয়া, তাহাদের মধ্যে নানারকম মিশাল করাইয়া, খুব সাবধানে পছন্দমতো গাছ ফুটাইয়া তোলে। যেগুলা তাহার পছন্দসই নয়, সেগুলাকে সে একেবারেই বাদ দেয়। তাহার ফলে অনেক সময় গাছের চেহারার আশ্চর্যরকম উন্নতি ও পরিবর্তন দেখা যায়। একটা সামান্য জংলি ফুল আজ মানুষের চেষ্টা ও যত্নে সুন্দর গোলাপ হইয়া উঠিয়াছে—নানা লোকে গোলাপের চর্চা করিয়া আপন পছন্দমতো নানারূপ বাছাই করিয়া, নানারকম মিশাল দিয়া কত যে নূতনরকমের গোলাপ গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার আর অন্ত নাই। যাহারা ব্যবসার জন্য বা শখের জন্য নানারূপ জন্তু পালে তাহারা জানে যে, কোনো জন্তুর বংশের উন্নতি করিতে হইলে, রুগ্‌ণ কুৎসিত বা অকর্মণ্য জন্তুগুলাকে বাদ দিতে হয়। তাহার পর যেরূপ গুণ ও লক্ষণ দেখিয়া বাছিয়া বাছিয়া জোড় মিলাইবে, বংশের মধ্যে সেই-সব লক্ষণ ও গুণ পাকা হইয়া উঠিবে। লম্বা শিংওয়ালা ভেড়া চাও তো বাছিবার সময় লম্বা শিং দেখিয়া বাছিবে। তাহাদের যে-সব ছানা হইবে, তাহাদের মধ্যে যেগুলার শিং ছোটো তাহাদের বাদ দিবে। এইরূপে ক্রমে লম্বা শিঙের দল গড়িয়া উঠিবে।

ডারুইন দেখিলেন, মানুষের বুদ্ধিতে যেমন নানারকম বাছাবাছি চলে, প্রাণিজগতেও সর্বত্রই স্বাভাবিকভাবে সেইরূপ বাছাবাছি চলে। যারা রুগ্‌ণ যারা দুর্বল, মরিবার সময়

তাহারাই আগে মরে, যাহারা বাহিরে নানা অবস্থার মধ্যে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে, তাহারাই টিঁকিয়া যায়। কাহারও গায়ে জোর বেশি, সে লড়াই করিয়া বাঁচে। কেহ খুব ছুটিতে পারে, সে শত্রুর কাছ হইতে পলাইয়া বাঁচে; কাহারও চামড়া মোটা, সে শীতের কষ্ট সহিয়া বাঁচে; কাহারও হজম বড়ো মজবুত, সে নানা জিনিস খাইয়া বাঁচে; কাহারও গায়ের রঙ এমন যে হঠাৎ চোখে মালুম হয় না, সে লুকাইয়া বাঁচে। বাঁচিবার মতো গুণ যাহার নাই সে বেচারা মারা যায়, আর সেই-সব গুণ আর লক্ষণ যাহাদের আছে তাহারাই বাঁচিয়া থাকে, তাহাদেরই বংশ বিস্তার হয়, আর বংশের মধ্যে সেই-সব বাছা বাছা গুণগুলিও পাকা হইয়া স্পষ্ট হইয়া উঠে। এইরূপে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য সংগ্রাম করিতে করিতে, বাহিরের নানা অবস্থার মধ্যে প্রত্যেক জন্তুর চেহারা নানারকম ভাবে গড়িয়া উঠে।

ডারুইন দেখাইলেন, এইরূপে এবং আরো নানা কারণে, আপনা হইতেই এক-একটা জন্তুর চেহারা নানারকমে বদলাইয়া যায়। সেই হুঁকার গল্প তোমরা শুনিয়াছ, যার সবই ঠিক ছিল কেবল নল্‌চে আর মালাটি বদল হইয়াছিল? এক-একটা জানোয়ারও ঠিক সেইরূপ নল্‌চে মালা সবই বদল করিয়া নূতন মতি ধারণ করে—তখন তাহাকে সম্পূর্ণ নূতন জন্তু বলিয়া ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

ডারুইনের কথা বলিতে গেলে দুটি গুণের কথা বিশেষ করিয়া বলিতে হয়—একটি তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায় আর একটি তাঁহার মিষ্ট স্বভাব। তাঁহার শরীর কোনো কালেই খুব সুস্থ ছিল না—জীবনের শেষ চল্লিশ বৎসর সে শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মনের শক্তি আশ্চর্যরকম সতেজ ছিল। প্রতিদিন ভোরের আগে ঘুম হইতে উঠিয়া তিনি বাগানে যাইতেন—সেখানে ফুল ফল মৌমাছি আর প্রজাপতির সঙ্গে পরিচয় করিতে করিতে কোনদিক দিয়া যে তাঁহার সময় কাটিয়া যাইত, কত সময় তাঁহার সে খেয়ালই থাকিত না।

ডারুইনকে যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা বলেন যে, সকলকে প্রাণ দিয়া এমন ভালোবাসিতে আর কেহ পারে না। শুধু মানুষ নয়, পশুপক্ষী নয়, গাছের ফুলটিকে পর্যন্ত তিনি এমনভাবে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন যে, লোকে অবাক হইয়া যাইত। ১৮৮২ খৃস্টাব্দে তিয়াত্তর বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইলে ইংরাজ জাতি সেই 'অল্পবুদ্ধি' ছাত্রকে পরম আদরে বিজ্ঞানবীর নিউটনের পাশে সমাধি দেন।

খোঁড়া মুচির পাঠশালা

পোর্টস্‌মাউথের বন্দরে এক খোঁড়া মুচি থাকিত, তাহার নাম জন পাউণ্ডস। ছেলেবেলায় জন তাহার বাবার সঙ্গে জাহাজের কারখানায় কাজ করিত। সেইখানে পনেরো

বৎসর বয়সে এক গর্তের মধ্যে পড়িয়া তাহার উরু ভাঙিয়া যায়। সেই অবধি সে খোঁড়া হইয়াই থাকে এবং কোনো ভারী কাজ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। গরিবের ছেলে, তাহার তো অলস হইয়াও পড়িয়া থাকিলে চলে না—কাজেই জন অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া এক বুড়া মুচির কাছে জুতা সেলাইয়ের কাজ শিখিতে গেল। তার পর শহরের একটা গলির ভিতরে ছোটো একটি পুরাতন ঘর ভাড়া করিয়া সে একটা মুচির দোকান খুলিল।

জনের রোজগার বেশি ছিল না, কিন্তু সে মানুষটি ছিল নিতান্তই সাদাসিধা; সামান্যরকম খাইয়া-পরিয়াই স্বচ্ছন্দে তাহার দিন কাটিয়া যাইত। এমন-কি, কয়েক বৎসরের মধ্যে সে কিছু টাকাও জমাইয়া ফেলিল। তখন সে ভাবিল, 'এখন আমার উচিত আমার ভাইদের কিছু সাহায্য করা।' তাহার দাদার এক ছেলে ছিল, সে ছেলেটি জন্মকাল হইতেই খোঁড়া মতন, তাহার পা দুইটা বাঁকা। জন দাদাকে বলিল, "এই ছেলেটির ভার আমি লইলাম।" ছেলেটিকে লইয়া জন ডাক্তারকে দেখাইল। ডাক্তার বলিলেন, "এখন উহার হাড় নরম আছে, এখন হইতে যদি পায়ে 'লাস্' বাঁধিয়া রাখ, তবে হয়তো সারিতেও পারে।" সামান্য মুচি, 'লাস্' কিনিবার পয়সা সে কোথায় পাইবে? সে রাত জাগিয়া পরিশ্রম করিয়া নিজের হাতে লাস্ বানাইল, এবং সেই লাস্ পরাইয়া, যত্ন ও শুশ্রূষার জোরে অসহায় শিশুটিকে ক্রমে সবল করিয়া তাহার খোঁড়ামি দূর করিল।

ততদিনে ছেলের লেখাপড়া শিখিবার বয়স হইয়াছে। পাউণ্ডস নিজেই তাহাকে শিক্ষা দিবার আয়োজন করিতে লাগিল। তাহার প্রথম ভাবনা হইল এই যে, একা একা লেখাপড়া শিখিলে শিশুর মনে হয়তো ফূর্তি আসিবে না, তাহার দু-একজন সঙ্গী দরকার। এই ভাবিয়া সে পাড়ার দু-একটি ছেলেমেয়েকে আনিয়া তাহার ক্লাশে ভর্তি করিয়া দিল। দুটি একটি হইতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দেখিতে দেখিতে পাঁচ-সাতটি হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাতেও খোঁড়া মুচির মন উঠিল না—সে ভাবিতে লাগিল, 'আহা, ইহারা কেমন আনন্দে উৎসাহে লেখাপড়া শিখিতেছে; কিন্তু এই শহরের মধ্যে এমন কতশত শিশু আছে, যাহাদের কথা কেহ ভাবিয়াও দেখে না।' তখন সে আরো ছাত্র আনিয়া তাহার ছোট্টো ক্লাশটিকে একটি রীতিমতো পাঠশালা করিয়া তুলিল।

যেদিন তাহার একটু অবসর জুটিত, সেইদিনই দেখা যাইত জন পাউণ্ডস খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে রাস্তায় রাস্তায় ছেলে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। যত রাজ্যের অসহায় শিশু, যাদের বাপ নাই, মা নাই, যত্ন করিবার কেহ নাই, তাহাদের ধরিয়া ধরিয়া সে তাহার পাঠশালায় ভর্তি করিত। ছেলে ধরিবার জন্য তাহার প্রধান অস্ত্র ছিল আলুভাজা! প্রথমে এই আলু-ভাজা খাওয়াইয়া পাউণ্ডস রাস্তার শিশুদের ভুলাইয়া আনিত। আলুভাজার লোভে তাহারা পাঠশালায় আসিত, কিন্তু যে আসিত সে আর ফিরিত না। মাস্টারমহাশয়ের কী যে আকর্ষণশক্তি ছিল, আর ঐ অন্ধকার পাঠশালার মধ্যে কী যে মধু ছেলেরা পাইত, তাহা কেহই বুঝিত না, কিন্তু ছাত্রের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিল।

চারহাত চওড়া, বারোহাত লম্বা, সরু বারান্দার মতো ঘর; তাহার মাঝখানে

বসিয়া মাস্টারমহাশয় জুতা সেলাই করিতেছেন আর পড়া বলিয়া দিতেছেন, আর চারিদিকে প্রায় চল্লিশটি ছাত্রের কোলাহল শুনা যাইতেছে। কেহ পড়িতেছে, কেহ লিখিতেছে, কেহ অঙ্ক বুঝাইয়া লইতেছে। কেহ সিঁড়ির উপর, কেহ মেঝের উপর, কেহ চৌকিতে, কেহ বাক্সে—আর নিতান্ত ছোটোদের কেহ কেহ হয়তো মাস্টারের কোলে—এই-রকম করিয়া মহা উৎসাহে লেখাপড়া চলিয়াছে। বাহিরের লোকে ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া অবাক হইয়া এই দৃশ্য দেখিত।

গরিব মাস্টার ছাত্রদের কাছে এক পয়সাও বেতন লইত না—এতগুলি ছাত্রকে সে বই জোগাইবে কোথা হইতে? তাহাকে শহরে ঘুরিয়া পুরানো পুঁথি, ছেঁড়া বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে হইত, এবং তাহাতেই ছেলেদের পড়ার কাজ কোনোরকমে চলিয়া যাইত। কয়েকখানা শ্লেট ছিল, তাহাতেই সকলে পালা করিয়া লিখিত। পাঠশালায় সামান্য যোগ বিয়োগ হইতে ত্রৈরাশিক পর্যন্ত অঙ্ক শিখানো হইত। কেবল তাহাই নয়, এই-সমস্ত ছেলেমেয়েরা তাহার কাছে কাপড় সেলাই করিতে এবং জুতা মেরামত করিতেও শিখিত। সকলে মিলিয়া তীর-ধনুক ব্যাট-বল ঘুড়ি-লাটাই খেলনা-পুতুল প্রভৃতি নানারকম জিনিস নিজেরাই তৈয়ারি করিত। তাহাদের খাওয়া-পরার সমস্ত অভাবের কথাও গরিব মাস্টারকেই ভাবিতে হইত। এই-সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া জন পাউণ্ডসের উপর কোনো-কোনো লোকের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তাহারা মাঝে মাঝে গরম কাপড়-চোপড় পাঠাইয়া দিত। সেই-সব কাপড় পরিয়া ছেলেমেয়েরা যখন উৎসাহে খোঁড়া মাস্টারের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইত, তখন মাস্টারমহাশয়ের মুখে আনন্দ আর ধরিত না।

এমন করিয়া কত বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল, জন পাউণ্ডস বুড়া হইয়া পড়িল, কিন্তু তাহার পাঠশালা চলিতে লাগিল। আগে যাহারা ছাত্র ছিল, তাহারা ততদিনে বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। কতজনে নাবিক হইয়া কত দেশ-বিদেশে ঘুরিতেছে, কতজনে সৈন্যদলে ঢুকিয়া যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইতেছে। নূতন ছাত্রদের পড়াইবার সময়ে এই-সব অতি পুরাতন ছাত্ররা তাদের বৃদ্ধ গুরুকে দেখিবার জন্য পাঠশালায় হাজির হইত। তাহারই ছাত্রেরা যে সৎপথে থাকিয়া উপার্জন করিয়া খাইতেছে, এবং এখনো যে তাহারা তাহাদের খোঁড়া মাস্টারকে ভোলে নাই, এই ভাবিয়া গৌরবে আনন্দে বৃদ্ধের দুইচক্ষু দিয়া দর্‌দর্ করিয়া জল পড়িত।

১৮৯৩ খৃস্টাব্দে নববর্ষের দিনে বাহাত্তর বৎসর বয়সে পাঠশালার কাজ করিতে করিতে বৃদ্ধ হঠাৎ শুইয়া পড়িল। বন্ধুবান্ধব উঠাইতে গিয়া দেখিল, তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। হয়তো তখনো লোকে ভালো করিয়া বোঝে নাই যে কত বড়ো মহাপুরুষ চলিয়া গেলেন। তাহার পর প্রায় আশি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, এখন ইংলণ্ডের শহরে-শহরে অসহায় গরিব শিশুদের শিক্ষার জন্য কত ব্যবস্থা, কত আয়োজন; কিন্তু এ-সমস্তের মূলে ঐ খোঁড়া মুচির পাঠশালা। সেই পাঠশালায় যাহারা পড়িতে আসিত, কেবল তাহারাই যে জন পাউণ্ডসের ছাত্র, তাহা নয়—যাহারা নিজেদের অর্থ দিয়া, দেহের শক্তি দিয়া, একাগ্র মন দিয়া, অসহায় গরিব শিশুদের শিক্ষা ও উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন তাহারা অনেকেই গৌরবের সঙ্গে এই খোঁড়া মুচিকে স্মরণ করিয়া বলিতেছেন, "আমরাও আচার্য জন পাউণ্ডসের শিষ্য।"

এই খোঁড়া মুচির নাম সকলের কাছে স্মরণীয় রাখিবার জন্য, তাঁহার ভক্তেরা মিলিয়া তাঁহার একটি পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

সন্দেশ—শ্রাবণ, ১৩২৫

পণ্ডিতের খেলা

সে প্রায় দেড়শত বৎসরের আগেকার কথা, একদিন এক ইংরাজ বুড়ি তাহার জানলা দিয়া দেখিতে পাইল যে, পাশের বাড়িতে বাগানে বসিয়া একজন বয়স্ক লোক সারাদিন কেবল বুদ্বুদ উড়াইতেছে। দুদিন চারদিন এইরকম দেখিয়া বুড়ি ভাবিল লোকটা নিশ্চয় পাগল—তা না হইলে, কাজ নাই কর্ম নাই, কেবল কচি খোকার মতো বুদ্বুদ লইয়া খেলা—এ আবার কোন দেশী আমোদ? বুড়ি তখন ব্যস্ত হইয়া থানায় গিয়া খবর দিল।

যে-লোকটি বুদ্বুদ উড়াইত, পুলিশে তাহার খবর লইতে গিয়া দেখিল, তিনি আর কেহ নহেন, স্বয়ং সার আইজাক নিউটন—যাঁহার মতো অত বড়ো বিজ্ঞানবীর হাজার বৎসরে দুটি পাওয়া দুষ্কর। বুদ্বুদের গায়ে যে রামধনুর মতো জমকাল রঙ দেখা যায়, নিউটন তখন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। নিউটনের পরেও ইয়ং প্রভৃতি বড়ো-বড়ো পণ্ডিতেরা এই অনুসন্ধান লইয়া বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়াছেন, এবং তাহার ফলে, আলোক জিনিসটা যে কি, এ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে।

মেঘের গায়ে রামধনুকের রঙ দেখিতে যে খুবই সুন্দর তাহাতে আর সন্দেহ কি? দেখিলে সকলেরই মনে কৌতূহল জাগে। শুধু মেঘের গায়ে নয়, আলোকের রঙিন খেলা স্ফটিক পাথর বা কাঁচের ঝাড়ে কেমন করিয়া ঝিক্‌মিক্ করে, তাহা সকলেই দেখিয়াছি। কিন্তু আমাদের দেখায় আর পণ্ডিতের দেখায় অনেক তফাত। নিউটন সেই রঙের খেলাকে নানারকমে খেলাইয়া দেখিলেন, আসল ব্যাপারটা কি। তার পর এই একই ব্যাপারের সন্ধান করিয়া কত পণ্ডিত যে কত নূতন তত্ত্ব বাহির করিলেন তাহার আর অন্ত নাই। কিন্তু আজও তাঁহাদের কৌতূহল মিটে নাই। বর্ণবীক্ষণ (Spectroscope) যন্ত্রে সূর্যের আলোক দেখায় যেন রামধনুকের ফিতা। সেই ফিতার মধ্যে রঙের মালা কেমন করিয়া সাজানো থাকে পণ্ডিতেরা হাজাররকম উপায়ে তাহার পরীক্ষা করিয়াছেন। এক-একরকম আলোর এক-একরকম রঙিন মালা। সূর্যের আলোক বর্ণবীক্ষণে পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, সূর্যের ভিতরকার গোলকটা যেমন গরম তাহার বাইরের আগুনটা সেরকম গরম নয়। সূর্যের আলোর রঙিন ছটায় তাঁহারা এক-একটা চিহ্ন দেখেন আর মাপিয়া বলেন, 'এটা লোহার জ্যোতি—এটা হাইড্রোজেনের আলো—এইটা গন্ধকের চিহ্ন, এইটা অঙ্গারের রেখা, এইটা ক্ষারের ধাতুর, এইটা চুনের ধাতুর—' ইত্যাদি। তারার আলোর রামধনু ফলাইয়া তাঁহারা বলিতে পারেন, এই

তারাটা গ্যাসের পিণ্ড, এই তারাটা জমাট আগুন, এই তারাটা বাষ্পে ঢাকা। এই-সমস্ত সংকেত শিখিবার মূলে ঐ রামধনুক দেখিবার কৌতূহল।

নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের সমুদ্রকূলে কতগুলা লোক প্রতিদিন ঘুড়ি উড়াইত, আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়িয়া থাকিত। সেখানকার নাবিকেরা এই 'নিষ্কর্মা' লোকেদের ছেলেখেলা দেখিয়া ঠাট্টা-তামাশা করিত। তাহারা জানিত না যে ঐ নিষ্কর্মার সর্দারটির নাম মার্কনি—সেই মার্কনি, যিনি বিনা তারে টেলিগ্রাফ পাঠাইবার কল বানাইয়াছেন। তারের সূতায় বাঁধা প্রকাণ্ড ঘুড়ি আকাশে উড়িত, আর একটা লোক সেই তারের সঙ্গে টেলিফোনের কল জুড়িয়া কান পাতিয়া পড়িয়া থাকিত। তার পর একদিন যখন সেই টেলিফোনের কলের মধ্যে টক্‌টক্ শব্দ শোনা গেল, তখন সকলের আনন্দ দেখে কে! তাহারা জানিত যে ঐ শব্দ আসিতেছে অতলান্তিক মহাসাগরের ওপার হইতে। এমনি করিয়া ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় বিনা তারে বিদ্যুতের খবর চলিতে আরম্ভ করিল।

ইংলণ্ডের যাঁহারা নামজাদা পণ্ডিত, তাঁহাদের মধ্যে মাইকেল ফ্যারাডের নাম বিশেষ স্মরণীয়। এক দপ্তরীর পুরাতন বইয়ের দোকানে কাজ করিয়া ফ্যারাডে অবসরমতো দোকানের বইগুলা পড়িতেন। এমনি করিয়া তাঁহার মনে শিখিবার আগ্রহ জাগিয়াছিল। তার পর এক অজানা ভদ্রলোকের অনুগ্রহে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ভালো বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার কৌতূহল এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে সেই কৌতূহল মিটাইতে গিয়া তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। বিদ্যুতের শক্তিতে কল চালাইবার সংকেত তিনিই আবিষ্কার করেন। বিদ্যুতের কল এখন পৃথিবীর সর্বত্রই চলিতেছে—বিদ্যুৎ ছাড়া সভ্যদেশের কাজ চলাই অসম্ভব। অথচ ফ্যারাডে যখন সর্বপ্রথমে একটি ছোটো চাকাকে বিদ্যুতের বলে ঘুরাইবার সংকেত দেখাইলেন, তখন অনেক লোকেই সেটাকে নেহাত একটা তামাশার জিনিসমাত্র মনে করিয়াছিল। কেহ কেহ ফ্যারাডেকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, এইরকমের খেলনা বানাইয়া তাঁহার মতো পণ্ডিত লোকের লাভ কি? ফ্যারাডে হাসিয়া বলিতেন, "নূতন একটা জ্ঞানলাভ করিলাম, ইহাই তো যথেষ্ট লাভ। আর কোনো লাভ যদি নাও হয় তাহাতেই-বা দুঃখ কি?"

গ্রামোফোনের কথা জানে না, এমন শিক্ষিত লোক আজকাল পাওয়া কঠিন। কিন্তু শব্দকে যে যন্ত্রের সাহায্যে ধরিয়া রাখা যায়, এ কথাটা কিছুদিন আগে পর্যন্ত মানুষের কল্পনায় আসে নাই। এডিসন যখন ফোনোগ্রাফের আবিষ্কার করেন, তখন তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া তাঁহার কর্মচারীরা কেহ কেহ ভয় পাইয়াছিল। ঘরে মানুষ নাই, তিনি কেবল একটা চোঙার সঙ্গে কথা বলিতেছেন, তার পর চোঙার মুখে কান পাতিয়া কি যেন শুনিতেছেন—এইরকম ব্যাপার তাহারা সর্বদাই দেখিত। তার পর এডিসন যখন তাহাদের ডাকিয়া কলের আওয়াজ শুনাইলেন—তখন কলের মধ্যে বিকৃত গলায় মানুষের মতো শব্দ শুনিয়া তাহাদের ভয়টা ঘোচে নাই কিন্তু এইটুকু তাহারা বুঝিয়াছিল যে ব্যাপারটা নেহাত পাগলের খেলা নয়।

বিলাতের পিল্‌ট্‌ ডাউন নামক স্থানে কতগুলা মজুর মাটি খুঁড়িতেছিল। মাটির মধ্যে মাঝে মাঝে পাথরের টুকরার মতো কি-সব জিনিস বাহির হইত, একজন সাহেব

সেইগুলা পয়সা দিয়া কিনিয়া লইত। সেগুলা যে প্রাচীন মানুষের চিহ্ন মজুরেরা তাহা জানিত না। তাহারা পয়সার লোভে সেই-সব সংগ্রহ করিয়া রাখিত, কিন্তু সাহেবটি পিছন ফিরিলেই তাহারা হাসাহাসি করিত, আর ইঙ্গিত করিয়া বলিত, 'লোকটার মাথায় কিছু গোল আছে।' একদিন হঠাৎ খুলির হাড়ের মতো এক টুকরা জিনিস পাইয়া সেই সাহেবের উৎসাহ ভয়ানক চড়িয়া গেল—এবং কিছুদিন বাদে কোথা হইতে এক বুড়া আসিয়া সেই সাহেবের সঙ্গে মিলিয়া মাটি ঘাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। একটার জায়গায় দুইটা পাগলকে দেখিয়া মজুরদেরও আমোদ বাড়িয়া গেল, কারণ ইঁহাদের উৎসাহের কারণ তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। দুজনের চেষ্টায় যাহার আবিষ্কার হইল বৈজ্ঞানিকেরা তাহার নাম দিয়াছেন পিল্‌ট্‌ ডাউনের খুলি। ইহা অতি প্রাচীনকালের একটা মানুষের মাথার টুকরা। কেহ কেহ বলেন এত প্রাচীন মানুষের চিহ্ন আর পাওয়া যায় নাই। খুলিটার বয়স লইয়া পণ্ডিতমহলে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়াছে। ইহার জন্য সাহেব দুটি ছয় মাস ধরিয়া মাটিতে বসিয়া 'রাবিশ' ঘাঁটিয়াছিলেন!

বনচাঁড়ালের গাছের পাতা আপনা-আপনি কাঁপিতে থাকে। ইহা অনেক লোকেই দেখিয়াছে কিন্তু আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কৌতূহল ইহাতেই জাগিয়া উঠিল। তিনি যে কতরকম কৌশল খাটাইয়া কতরকম পরীক্ষা করিয়া এই পাতাকে নাচাইয়া দেখিয়াছেন, তাহার যদি খবর লও, তবে বুঝিবে বৈজ্ঞানিকের 'দেখা' আর সাধারণ লোকের দেখায় তফাত্‌ কিরকম!

সন্দেশ—ভাদ্র, ১৩২৫

নোবেলের দান

পাঁচ বৎসর আগে যখন ইউরোপ হইতে সংবাদ আসিল যে, বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নোবেল প্রাইজ' পাইয়াছেন, তখন দেশময় একটা উৎসাহের ঢেউ ছুটিয়াছিল। 'নোবেল প্রাইজ' জিনিসটা কি তাহা অনেকেই জানিত না, তাহারা সে বিষয়ে আগ্রহ করিয়া খোঁজ করিতে লাগিল।

আলফ্রেড বের্নহার্ড নোবেল সুইডেন দেশের একজন রাসায়নিক ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে প্রায় সওয়া তিনকোটি টাকার সম্পত্তি দান করিয়া যান। যাঁহারা বিজ্ঞান-জগতে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, যাঁহারা সাহিত্যের উন্নতি করেন এবং বিশেষভাবে যাঁহারা জগতে শান্তি স্থাপনের সহায়তা করেন, প্রতি বৎসর তাঁহাদের সম্মানের জন্য এই সম্পত্তির আয় হইতে 'নোবেল প্রাইজ' নামে লক্ষাধিক টাকার অর্ঘ্য দেওয়া হয়। যে-কোনো দেশের যে-কোনো লোক এই অর্ঘ্যলাভের যোগ্য হইলেই তাহা পাইতে পারেন।

এই নোবেল লোকটির জীবনের কাহিনী বড়ো অদ্ভুত। দুর্বল স্বাস্থ্য লইয়া রুগ্‌ণ ভগ্ন দেহে তিনি সারাজীবন কাটাইয়াছিলেন। একদিকে তিনি অত্যন্ত ভীরু ও নিরীহ

ভালোমানুষ ছিলেন, সামান্য দুঃখ, কষ্ট বা উত্তেজনায় বিচলিত হইয়া পড়িতেন, কিন্তু অপরদিকে তাঁহার মনের এমন অসাধারণ বল ছিল, ঘোর বিপদের মধ্যে ও রোগের যাতনার মধ্যে তিনি শান্তভাবে কাজ করিয়া যাইতেন। সমস্ত জীবন তিনি বোমা ও বারুদের মশলা লইয়া নানারকম পরীক্ষা করিয়াছেন। এই পরীক্ষায় যে সকল সময়ে প্রাণটি হাতে করিয়া চলিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন; ইহাতে যে অনেক লোকের প্রাণ গিয়াছে তাহাও তাঁহার জানা ছিল, কিন্তু সে চিন্তা তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই।

আলফ্রেড নোবেলের পিতা রুশিয়ার যুদ্ধ কারখানার কারিকর ছিলেন। গোলাবারুদ লইয়া তাঁহার কারবার, এবং সেই কাজে বালক নোবেলও তাঁহার সহায় ছিল। কেবল যে যুদ্ধের কাজেই বারুদের ব্যবহার হয় তা নয়। তার একটি মস্ত কাজ পাহাড় ভাঙা। রেলপথ বসাইবার জন্য এবং রাস্তাঘাট বা সুড়ঙ্গ খুঁড়িবার জন্য অনেক সময়ে পাহাড় ভাঙিয়া সমান করিতে হয়। কোদাল ঠুকিয়া এই কাজ করিতে গেলে অসম্ভবরকম পরিশ্রম ও সময় নষ্ট করিতে হয়। সাধারণ বারুদের সাহায্যে এ কাজ অনেকটা সহজ হয়, কিন্তু বারুদের তেজও সব সময়ে এ কাজের পক্ষে যথেষ্ট নয়। নোবেলের সময়েও অনেক জিনিসের কথা লোকে জানিত, যাহার তেজ বারুদের চাইতেও ভয়ানক—কিন্তু এই-সমস্ত জিনিস এত সামান্য কারণে ফাটিয়া যায় যে তাহাকে কাজে লাগাইতে কেহ সাহস পাইত না। কাজ করিতে গিয়া সামান্য একটু গরম বা সামান্য একটু আঁচড় অথবা ধাক্কা লাগিলেই ঘরবাড়ি উড়িয়া এক প্রলয়কাণ্ড বাধিয়া যাইত। নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কার করিয়া সে অসুবিধা দূর করেন। ডিনামাইটের শক্তি সাধারণ বারুদের চাইতে আটগুণ বেশি অথচ তাহাকে লইয়া সাবধানে নাড়াচাড়া করিলে কোনো ভয়ের কারণ নাই।

ডিনামাইট ছাড়াও তিনি আরো অনেকরকম বারুদের মশলা আবিষ্কার করেন। আজকাল কামানের গোলা ছুঁড়িবার জন্য যে-সকল প্রচণ্ড বারুদ ব্যবহার হয় তাহাও নোবেলের আবিষ্কারের ফল। এই-সমস্ত সাংঘাতিক জিনিসের কারবারের জন্য নোবেল বড়ো-বড়ো কারখানা বসাইয়া পৃথিবী জুড়িয়া প্রকাণ্ড ব্যবসা চালাইয়া, তাহাতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন। একবার একটি কারিকরের অসাবধানতায় সমস্ত কারখানাটি উড়িয়া যায় এবং অনেক লোক মারা পড়ে ও অনেক লক্ষ টাকা নষ্ট হয়। তাহাতেও নোবেলের উৎসাহ দমে নাই—তিনি আবার নূতন করিয়া কারখানা করাইলেন এবং এরূপ দুর্ঘটনা যাহাতে আর না হয়, তাহার জন্য অনেক সুন্দর বন্দোবস্ত করিলেন। সে কারখানা আজও চলিতেছে।

কারখানার ভিতরে যদি ঢুকিয়া দেখ, তাহা হইলে বুঝিবে 'সাবধান হওয়া' কাহাকে বলে। যে-সকল স্থানে বিপদের সম্ভাবনা সেখানে প্রত্যেক ঘরের চারিদিকে মাটি উঁচু করিয়া পাহাড়ের মতো দেওয়াল দেওয়া হইয়াছে। ঘরগুলি খুব হালকা করিয়া তৈয়ারি, তাহার মেজের উপর পুরু করিয়া চট মোড়া। যাহারা কাজ করে, তাহাদের পায়ে কাপড়ের জুতা—কোথাও কোনো শব্দ করিবার নিয়ম নাই। সেখানে আগুন জ্বালানো দূরে থাকুক, কারখানার ত্রিসীমানার মধ্যে দিয়াশালাই আনিতে দেওয়া হয় না। কোনো-

রকম লোহার জিনিস সেখানে আনা নিষেধ, কাঁটাপেরেক পর্যন্ত আনিবার উপায় নাই। এইরকমের অসংখ্য নিয়ম নিষেধ মানিয়া তবে কারখানা চালাইতে হয়। ভগ্ন শরীরে এইরকম সাংঘাতিক জিনিসের কারবার করিয়া নিত্য বিপদের মধ্যে যাঁহার জীবন কাটিল, ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে মৃত্যুকালে তাঁহার শেষ চিন্তা হইল এই যে, জগতে শান্তি স্থাপনের জন্য, এবং জ্ঞান ও আনন্দের বিস্তারের জন্য উপায় করিতে হইবে। তাহারই ফলে, এই নোবেল প্রাইজ।

কিন্তু কেবল এই দানই নোবেলের শ্রেষ্ঠ দান নয়। ডিনামাইট প্রভৃতি যে-সমস্ত রাসায়নিক অস্ত্র তিনি জগতকে দিয়া গেলেন, সেও বড়ো সামান্য দান নয়। যুদ্ধের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে, সভ্য মানুষের যে-সমস্ত বড়ো-বড়ো কীর্তি, তাহার অনেকগুলিই সহজ ও সম্ভব হইয়াছে কেবল নোবেলের ঐ অস্ত্রের গুণে। মাটি উড়াইয়া পাহাড় ফাটাইয়া পাথর সরাইয়া পথঘাট রেলপুল বসানো হইতেছে, খালকাটিয়া নদীর পাড় ভাঙিয়া জলের স্রোতকে নানাদিকে চালানো হইতেছে, সমুদ্রের সঙ্গে সমুদ্র জুড়িয়া নূতন নূতন জলপথের সৃষ্টি হইতেছে, খনি ব্যবসায়ী খনি খুঁড়িতে গিয়া পাঁচ মাসের কাজ পাঁচ মিনিটে সারিতেছে, সভ্য দেশের চাষা বিনা লাঙলে সামান্য পরিশ্রমে বড়ো-বড়ো জমি ফুঁড়িয়া চষিয়া ফেলিতেছে।

নেপোলিয়ান যখন ইটালি বিজয় করিতে চলিলেন তখন সকলে বলিয়াছিল, "কি অসম্ভব কথা! এই দুরন্ত শীতে তুমি সৈন্য লইয়া আল্প্‌স্ পাহাড় পার হইবে কিরূপে?" নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন, "There shall be no Alps!" 'আল্প্‌স পাহাড় থাকিবে না'—অর্থাৎ সে আমায় বাধা দিতে পারিবে না। নেপোলিয়ান আল্প্‌স্ পার হইয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পর প্রায় শতবৎসর পরে যখন ফ্রান্স, ইটালি ও সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে আল্প্‌স্ পাহাড় ভেদ করিয়া রেলপথ বসানো হইতেছিল, তখন নোবেলও বলিতে পারিতেন, "There shall be no Alps!" লক্ষ যুগের পাহাড়ের বাঁধন একটি রুগ্নদেহ দুর্বল মানুষের বুদ্ধির কাছে পরাস্ত হইয়া ঝরিয়া পড়িল।

সন্দেশ—আশ্বিন, ১৩২৫

জোয়ান

সে প্রায় পাঁচশো বছর আগেকার কথা। ফরাসি জাতির তখন বড়োই দুঃখের দিন! দেশের রাজা হলেন পাগল—আর অপদার্থ রাজপুত্র সারাদিন আমোদেই মত্ত। দেশের মধ্যে কোথাও শান্তি নেই, শৃঙ্খলা নেই—চারিদিকে কেবল দলাদলি আর যুদ্ধবিবাদ। ঘরের শত্রু দেশের লোক, তার উপর বাইরের শত্রু ইংলণ্ডের রাজা। দেশসুদ্ধ সবাই দলাদলি নিয়ে ব্যস্ত, সেই সুযোগে ইংরাজরাজ দলবলসুদ্ধ ফ্রান্সের মধ্যে ঢুকে একধার থেকে দেশটা দখল করতে আরম্ভ করেছেন! তাঁকে বাধা দিবার কেউ নাই। এমনই দেশের দুর্দিন।

ফ্রান্সের এক নগণ্য গ্রামের সামান্য এক কৃষকের মেয়ে, তার নাম জোয়ান। সমস্ত দেশের দুঃখ যেন এই মেয়েটির প্রাণে এসে বেজেছিল। ফ্রান্সের লোকজন, ফ্রান্সের পাহাড় নদী, ফ্রান্সের ঘরবাড়ি সব যেন তার আপনার জিনিস ছিল। ফরাসি বীরদের আশ্চর্য কাহিনী শুনতে শুনতে তার উৎসাহ আগুন হয়ে জ্বলে উঠত, আর ফরাসিদের দুঃখের কথা ভাবতে ভাবতে তার চোখের জল আর ফুরাত না। ফ্রান্সকে সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। আর ভালোবাসত তার আপনার গ্রামটিকে। সেই মিউজ নদীর ধারে ছোট্টো ডমরেমি গ্রামটি, তার গির্জার গায়ে কত সাধু 'সেইণ্ট্', কত মহাপুরুষের পাথর-মূর্তি। সেখানে সারাদিন গির্জার জানলা দিয়ে রঙিন আলো বাইরে আসে। সেখানে বুড়ো ওক গাছ আছে, আর দেবতার কুয়ো আছে, তাদের সম্বন্ধে কত আশ্চর্য গল্প লোকের কাছে শোনা যায়। জোয়ানের কাছে এ-সমস্তই সুন্দর আর সমস্তই সত্যি বলে মনে হত। সে অবাক হয়ে গিজার কাছে বাগানে এসে বসে থাকত, আর ভাবত কে যেন তাকে ডাকছে। দেশের দুঃখে সে যখন কাঁদত তখন কে যেন তাকে বলত, 'ভয় নাই, জোয়ান। তোমার এ দুঃখ আর থাকবে না।' জোয়ান চেয়ে দেখত কোথাও কেউ নাই, খালি সেণ্ট মাইকেলের ঝক্‌ঝকে সুন্দর মূর্তিটি যেন তার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে কারা যেন আলোর পোশাক পরে তার কাছ দিয়ে চলে যেত। জোয়ান কিছু বুঝত না, কেবল আনন্দে তার সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত, তার দুচোখ বেয়ে দর্‌দর্ করে জল পড়ত। এমনি করে কতদিন যায়, একদিন হঠাৎ সে শুনল কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। অতি মধুর অতি সুন্দর গলায় কে যেন বলছে, 'জোয়ান! দুঃখিনী জোয়ান! ঈশ্বরের প্রিয় কন্যা জোয়ান! তুমি ওঠো। তোমার দেশকে বাঁচাও; রাজপুত্র আমোদে-বিলাসে ডুবে আছেন, তাঁকে উৎসাহ দাও; সৈন্যদের মনে নতুন সাহস জাগিয়ে তোল; রাজমুকুট রাজাকে ফিরিয়ে এনে দাও।' জোয়ান স্তব্ধ হয়ে সব শুনতে লাগল। সে যেন সত্যি সত্যিই দেখল সে আর সেই সামান্য কৃষকের মেয়ে নয়। তার মনে অদ্ভুত সাহস আর শক্তি এসেছে। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল যে ফ্রান্সের সৈন্য আবার বিপুল তেজে যুদ্ধ করছে, আর সে নিজে অস্ত্র ও পতাকা নিয়ে তাদের আগে আগে চলেছে।

এ কী অদ্ভুত কথা! সামান্য চাষার মেয়ে, সে না জানে লেখাপড়া, না জানে সংসারের কিছু, তার উপর একি অসম্ভব আদেশ! কিন্তু জোয়ানের মনে আর কোনো সন্দেহ হল না। সে সকলকে বলল, "আমায় রাজার কাছে নিয়ে চল।" এ কথা যে শোনে সেই হাসে, সেই বলে, "মেয়েটা পাগল।" তার বাবা বললেন, "মেয়েটার বড়ো সাহস বেড়েছে, কোনদিন বিপদ ঘটাবে দেখছি।" গ্রামের যে সর্দার সে বলল, "মেয়েটাকে ঘরে নিয়ে বন্ধ করে রাখ।" গির্জার যে বুড়ো পাদরি সেও এসে জোয়ানকে গালাগালি দিয়ে শাসিয়ে গেল। কিন্তু জোয়ান তবু তার সেই এক কথাই বলে, "আমি রাজার কাছে যাব।" যাহোক শেষে জোয়ানের কথাই ঠিক হল। ছদ্মবেশে গ্রাম থেকে বেরিয়ে, কত বাধা বিপদের ভিতর দিয়ে প্রায় আড়াইশো মাইল পথ পার হয়ে একদিন সে সত্যি সত্যিই রাজদরবারে গিয়ে হাজির হল। সেখানে গিয়ে সে রাজার কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, "আমি চাষার মেয়ে জোয়ান। ভগবান আমায় পাঠিয়েছেন শুধু

এই কথা বলবার জন্য যে, রীম্‌স্‌ নগর জয় করে আবার তুমি রাজা হবে।" পাড়াগেঁয়ে চাষার মেয়ে, তার মুখে এমন কথা শুনে সভাসুদ্ধ সকলে হেসে অস্থির। কিন্তু রাজার মুখে হাসি নেই—তিনি জোয়ানের শান্ত মুখের দিকে চেয়ে তার কথা শুনছেন আর তাঁর মনে হচ্ছে—এ মেয়ে বড়ো সামান্য মেয়ে নয়; এ যা বলছে তা সত্যি হবে। তখনই হুকুম হল, "সৈন্যেরা সব প্রস্তুত হও, আবার যুদ্ধে যেতে হবে। ঈশ্বরের দূত জোয়ান তোমাদের সেনাপতি হবেন।"

তার পর মহা উৎসাহে সব ফিরে চলল। যেদিকে ইংরাজ সৈন্য গ্রাম নগর সব দখল করে পথঘাট আগলিয়ে আছে সেইদিকে সবাই চলল। ঝক্‌ঝকে সাদা বর্ম পরে যোদ্ধার বেশে চাষার মেয়ে তাদের আগে আগে চলেছে। তার হাতে সাদা নিশান, তার উপর সোনালি কাজ করা যীশুখৃস্টের মূর্তি। চারিদিকের গ্রামবাসীরা এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখবার জন্য ছুটে এল—তারা জোয়ানকে ঘিরে আনন্দে কোলাহল করে বলতে লাগল, "দেবতার মেয়ে জোয়ান! দেবতার মেয়ে জোয়ান!" এমনি করে সকলে মিলে অর্লেয়াঁ শহরে ইংরাজের শিবিরের সামনে উপস্থিত হল। সেইখানে এসে জোয়ান ইংরাজের কাছে এই খবর পাঠাল, "তোমরা আমার কথা শোনো। নগরের চাবি আমার কাছে দিয়ে তোমরা এ শহর ছেড়ে চলে যাও, এ দেশ ছেড়ে তোমাদের দেশে ফিরে যাও। যদি না যাও তবে আমি তোমাদের দুর্গ ভেদ করে যাব আর চারিদিক এমন তোলপাড় করে তুলব যে হাজার বছর কেউ এ দেশে তেমন কাণ্ড দেখে নি।" ইংরাজ হেসে বললেন, "চাষার মেয়ে, চাষবাস গোরুবাছুর নিয়ে থাক।" কিন্তু জোয়ান তার দলবলসুদ্ধ যখন ইংরাজ শিবির আক্রমণ করলেন, তখন তাঁর অদ্ভুত উজ্জ্বল মূর্তি দেখে ইংরাজের সাহস ও বুদ্ধিবল সব যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। কে-বা তখন যুদ্ধ করে, কে-বা ফরাসি সৈন্যের সামনে দাঁড়ায়, দু-একবার মাত্র আক্রমণের বেগ সহ্য করে ইংরাজ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এক সপ্তাহ মধ্যেই অর্লেয়াঁ শহর উদ্ধার হয়ে গেল। এই সংবাদ যখন দেশময় ছড়িয়ে পড়ল তখন ফরাসিদের মনে কী যে উৎসাহের আগুন জ্বলে উঠল, তার আর বর্ণনা হয় না।

কিন্তু ফ্রান্সের যাঁরা সেনাপতি ছিলেন, তাঁদের হিংসুকে মনগুলো হিংসায় জ্বলতে লাগল। তাঁরা এতদিন যা করতে পারলেন না, একটা কোথাকার পাড়াগেঁয়ে চাষার মেয়ে কিনা তাই করে দিল। তাঁরা ভিতরে ভিতরে নানারকম শত্রুতা করে জোয়ানের কাজে বাধা দিতে লাগলেন। কিন্তু তাঁরা শত্রুতা করে আর কি করবেন—সৈন্যেরা তখন জোয়ানকেই মানে, দেশের লোক জোয়ানের কথাই শোনে, জোয়ানকে তারা দেবতার মতো ভক্তি করে। এমনি করে জোয়ান গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর উদ্ধার করতে করতে তাঁর সেই পুরানো ডমরেমি গ্রামের কাছে এসে পড়লেন। গ্রামের লোকেরা তখন দল বেঁধে তাদের জোয়ানকে দেখতে চলল। তারা দেখল, ফ্রান্সের সৈন্য আবার উৎসাহ করে যুদ্ধে চলেছে, আবার ফ্রান্সের গৌরবে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—আর তাদের আগে আগে রাজার সঙ্গে শ্বেত পতাকা নিয়ে আলোর মতো উজ্জ্বল পোশাকে চলেছেন চাষার মেয়ে জোয়ান! যারা আগে জোয়ানকে ঠাট্টা করেছিল, বাধা দিয়েছিল,

শাসন করতে চেয়েছিল, তারা আজ গর্ব করে বলতে লাগল, "এই তো আমাদের জোয়ান—আমাদের গ্রামের মেয়ে।" আর জোয়ানের বাবা, সেই বৃদ্ধ চাষা যে তার মেয়েকে ডুবে মরবার কথা বলেছিল, আনন্দে তার দুচোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। সে বলল, "আমার ঘরেও এমন মেয়ে জন্মেছিল!"

সেনাপতিরা চলেছেন পদে পদে বাধা দিবার জন্য। এক-একটা শহর জয় হয় আর তাঁরা রাজাকে বলেন, "আর গিয়ে কাজ নাই। হঠাৎ সৈন্যদের একটু উৎসাহ হয়ে কতগুলো শহর দখল করা গেছে। কিন্তু বেশি লোভ করলে, এর পরে ভারি বিপদ হবে।" কিন্তু জোয়ান বলে, "আমি জানি, রীম্‌স্ নগর পর্যন্ত আমায় যেতে হবে, সেখানে রাজার অভিষেক হবে।" যখন রাজার মনও বিমুখ হয়ে পড়ল, তখন জোয়ান কেঁদে বলল, "আর কিছুদিন আমার কথা শুনুন তার পর আমি চলে যাব। শেষে আর সময় হবে না, আমি আর এক বছরের বেশি বাঁচব না।" যখন ত্রয় নগরের কাছে এসে ইংরাজের সৈন্যবল দেখে কাপুরুষ রাজা মন্ত্রণা করতে বসলেন, তখন জোয়ান তাঁর মন্ত্রণাসভায় ঢুকে বলল, "এমন করে সময় নষ্ট করবেন না।" সভার মন্ত্রীরা বললেন, "তোমায় ছয়দিনমাত্র সময় দিলাম, এর মধ্যে যদি শহর দখল করতে না পার, তা হলে আমরা ফিরে যাব।" জোয়ান বলল, "ছয়দিন কেন? তিনদিন সময় দিন।" তার পরের দিনই সে সৈন্য নিয়ে ত্রয় নগরের দ্বারে উপস্থিত হতেই ইংরাজ প্রহরীরা বিনাযুদ্ধেই দ্বার ছেড়ে পথ ছেড়ে শহর ছেড়ে উত্তরের দিকে সরে পড়ল। তার পর ক্রমে রীম্‌স্ নগরও উদ্ধার হল; মহা সমারোহ করে রাজার অভিষেক হয়ে গেল, জোয়ান নিজের হাতে রাজার মাথায় মুকুট তুলে দিল। তখন রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "ফ্রান্সের গৌরবমণি জোয়ান! আজ তুমি কি পুরস্কার পেতে ইচ্ছা কর?" জোয়ান বলল, "আমার তো সব ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছে—যদি অনুগ্রহ করতে চান, তবে আমার জন্মস্থান ডমরেমি গ্রামকে আজ থেকে খাজনামুক্ত করে দিন।" সেই থেকে আজ পর্যন্ত ডমরেমি গ্রাম আর সরকারি খাজনা দেয় না—আজও রাজস্ব-হিসাবের খাতায় জোয়ানের নাম করে বলা হয়, তার খাতিরে খাজনা মাপ।

তার পর জোয়ান বলল, "আমার কাজ এখন শেষ হয়েছে। এখন আমি আমার গ্রামে ফিরে যাই।" কিন্তু সেনাপতিরা উলটা সুর ধরে বললেন, "এতদূর এলাম যখন, তখন পারিস পর্যন্ত যাওয়া যাক।" জোয়ানের মনে এতদিন আশা ছিল, উৎসাহ ছিল, কিন্তু এখন যেন আর তার সে ভরসা নাই। এতদিন তার মনে হত দেবতারা তার সঙ্গে আছেন, আজ প্রথম তার মনে হল সংসারে সে একা—পৃথিবীতে কেউ তার সহায় নেই। তবু রাজার আদেশ মানতে হবে। জোয়ান সৈন্য নিয়ে পারিসের দিকে চললেন। কিন্তু দুদিন না যেতেই অকৃতজ্ঞ নরাধম রাজা গোপনে ইংরাজের সঙ্গে সন্ধি করে, জোয়ানকে শত্রুর মুখে ফেলে নিজে দলবল নিয়ে সরে পড়লেন। জোয়ানের জীবনে এই প্রথমবার তার পরাজয় হল। এমন বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষ রাজা, কিন্তু জোয়ান তাকে ছাড়তে পারল না। দুদিন যেতে না যেতেই রাজা আবার বিপদে পড়েছেন; সে খবর শুনেই জোয়ান তাঁর উদ্ধারের জন্য সৈন্য নিয়ে ছুটে গেল। এই তার শেষ যাত্রা।

সু. স, র,—২-১১

একদিন ঘোর যুদ্ধের মধ্যে তার নিজেরই দলের লোক তাকে ইংরাজের কাছে ধরিয়ে দিল।

তার পরে সে কী দুঃখের দিন! শিশুর মতো নির্মল সুন্দর জোয়ানকে পশুর মতো খাঁচার মধ্যে পুরে, শিকল দিয়ে তার হাত-পা বেঁধে, তার শত্রুরা তাকে ধরে নিয়ে গেল। কত লোকে কাঁদল, কত লোকে তার জন্য আকুল হয়ে প্রার্থনা করল, কিন্তু দেশের রাজা, দেশের বীর যোদ্ধা সেনাপতি, কেউ তার উদ্ধারের জন্য ছুটে গেল না, কেউ তার হয়ে একটি কথা পর্যন্ত বলল না। রাজা নির্বাক নিশ্চিন্ত, রাজার বিরোধী যারা তারা ইংরাজের সঙ্গে যোগ দিল। দেশী বিদেশী সকল শত্রু মিলে এই একটি অসহায় মেয়েকে ধ্বংস করবার জন্য মিথ্যা বিচারের ভড়ং করতে বসল। কত তর্জন শাসন, আর কত অন্যায় নির্যাতন করে, কত মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে, তারা জোয়ানকে জব্দ করতে চাইল। যুদ্ধের মধ্যেও যে কাউকে আঘাত করে নি; যুদ্ধের সময়েও যে একদিনের জন্যও ভগবানকে ভোলে নি; যার শেষ বিশ্বাস ছিল অস্ত্রে নয়, বর্মে নয়, কিন্তু দেবতার আশীর্বাদে; ধর্ম-ব্যবসায়ী পাদরিরা তাকে শয়তানের দূত বলে, ধর্মদ্রোহী মিথ্যাবাদী বলে, পুড়িয়ে মারবার হুকুম দিলেন। শেষপর্যন্ত জোয়ানের বিশ্বাস টলে নি। সে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "যা করেছি, দেবতার আদেশে করেছি! তার জন্য আমার কোনো অপরাধ হয় নি।" কিন্তু যখন তাকে খোঁটার মধ্যে বেঁধে চারিদিকে কাঠ সাজিয়ে দিল, যখন নিষ্ঠুর ঘাতকেরা মশাল নিয়ে সেই কাঠে আগুন ধরাতে এল, তখন ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠল। তার মনে হল সেই ডমরেমি গ্রামের কথা—সেই যে গির্জার ধারে দেবতার বাণী সে শুনেছিল, সেই যে আলোর মতো দেবতারা তাকে ডেকে ডেকে আশার কথা বলেছিলেন—সেই কথা তার মনে হল। কিন্তু হায়! সেই দেবতারা আজ কোথায়? তাঁরাও কি জোয়ানকে ভুলে গেলেন? অসহায় শিশুর মতো জোয়ান কেঁদে উঠল, "সেন্ট মাইকেল! সেন্ট মাইকেল! আজ তুমি কোথায়?" সে ব্যাকুল ডাক শুনে নিষ্ঠুর বিচারকের চোখেও জল এল। চারিদিকে কান্নার রোল উঠল। কিন্তু অন্ধ হিংসার শাসন টলবার নয়। যার পায়ের ধুলো নেবার যোগ্য তারা নয়, সেই মেয়েকে পুড়িয়ে মেরে ধর্মযাজকেরা নিশ্চিন্ত হলেন—ভাবলেন যাহোক এতদিনে ধর্ম বাঁচল।

সন্দেশ—পৌষ, ১৩২৫

দানবীর কার্নেগী

বড়োলোক হবার সুখ থাকলেই যে মানুষ বড়োলোক হতে পারে না, তার দৃষ্টান্ত গল্পে তোমরা পড়েছ। এখন একটি সত্যিকারের বড়োলোকের কথা বলব, যিনি গরিব বাপ-মায়ের ঘরে জন্মেও কেবল আপনার চেষ্টায় ও আগ্রহে, জগতের মহাধনী ক্রোরপতিদের মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন।

১৮৩৫ খৃস্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের এক সামান্য পল্লীগ্রামের এক নগণ্য পরিবারে এনড্রু কার্নেগীর জন্ম হয়। তাঁর বয়স যখন তেরো বৎসর মাত্র তখন তাঁর বাবা উপার্জনের চেষ্টায় সপরিবারে আমেরিকায় চাকরি করতে যান। সেইখানে গিয়েই এক সুতোর কারখানায় তাঁতির মজুর হয়ে কার্নেগী মাসে সাড়ে বারো টাকা রোজগার করতে আরম্ভ করলেন। এই তাঁর প্রথম রোজগার। তার পর চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর আরেকটু ভালো একটা চাকরি জুটল, তিনি এক টেলিগ্রাফ আফিসের ছোকরা পিয়নের কাজ পেলেন। এই কাজ তিনি কেমন করে জোগাড় করলেন, সে গল্পটিও বড়ো চমৎকার।

টেলিগ্রাফ আফিসের দরজায় বিজ্ঞাপন ছিল, 'ছোকরা পিয়ন চাই।' তাই দেখে কার্নেগী খোঁজ নেবার জন্য ভিতরে ঢুকলেন। টেলিগ্রাফের কেরানী একটা অচেনা ছোকরাকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখেই, হাঁক দিয়ে বললে, "কি চাও?" কার্নেগী বললেন, "বড়ো-সাহেবকে চাই!" কেরানী তেড়ে উঠে বললে, "যাও, যাও, দেখা হবে না।" পরের দিন সকালে কার্নেগী আবার ঠিক তেমনিভাবে সেখানে গিয়ে হাজির। কেরানী দেখলে, সেই ছোকরা আবার এসেছে। সে আবার জিজ্ঞাসা করলে, "কি চাও?" জবাব হল, "বড়ো-সাহেবকে চাই।" সেদিনও কেরানী তাকে চট্‌পট্‌ ঘর থেকে বার করে দিল। পরের দিন আবার সেই সময়ে সেই ছোকরা এসে হাজির—বলে, "বড়ো-সাহেবকে চাই।" কেরানী ভাবল, 'ব্যাপারটা কি? আচ্ছা, একবার বড়ো-সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা যাক।' বড়ো-সাহেব সব শুনে বললেন, "পাঠিয়ে দাও তো, দেখি ছোকরা কি চায়।" সেইদিনই কার্নেগী টেলিগ্রাফ আফিসের কাজে ভর্তি হলেন। বাপ-মায় ভাবলেন, ছেলে 'চাকরে' হয়ে উঠল—বেশ দুপয়সা রোজগার করবে।

পিয়নের কাজ করতে করতেই কার্নেগী টেলিগ্রাফের কলকায়দা সব শিখে ফেললেন, আর কিছুদিন বাদেই তিনি সেখানকার রেলস্টেশনে তারওয়ালা বা অপারেটর হয়ে বসলেন। তার পর দেখতে দেখতে ক্রমে টেলি-বিভাগের বড়ো-সাহেব বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হতেও তাঁর বেশি দেরি লাগল না। এই সময় থেকে তিনি রেলগাড়ি আর খনির তেলের ব্যবসা করে খুব টাকা করতে আরম্ভ করেন। লাভের টাকা আবার নূতন নূতন ব্যবসায় খাটিয়ে তিনি বড়ো-বড়ো কারবার জমিয়ে তুললেন। তার পর ক্রমে পাঁচ-সাতটা প্রকাণ্ড লোহার কারখানা কিনে ফেলে তিনি নিজে সেইগুলো চালাতে লাগলেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স না হতেই তিনি পৃথিবীর মধ্যে একজন নামজাদা লোহার মালিক হয়ে উঠেছিলেন।

এমনি করে ১৯০১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করে, তিনি ছাপান্ন বৎসর বয়সে সব বিষয়কর্ম থেকে অবসর নিয়ে স্কটল্যাণ্ডে সেই তাঁর জন্মস্থানে গিয়ে বসলেন। বললেন, "রোজগার যথেষ্ট করেছি, এখন এই বুড়ো বয়সে আর 'টাকা টাকা' করে ছুটে বেড়ানো ভালো দেখায় না। এতদিন যা সঞ্চয় করেছি এখন দানের মতো দান করে তার সদ্ব্যবহার করতে হবে।" সেই থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর দানব্রত পালন করে গিয়েছেন।

কার্নেগীর মতো অথবা তাঁর চাইতেও বড়োলোক পৃথিবীতে আরো আছেন—কিন্তু এমন অজস্রভাবে দান আর কেউ করেছেন কিনা সন্দেহ; কত দেশে, কত শহরে শহরে গ্রামে

গ্রামে, কত ছোটো-ছোটো পাঠশালায়, কত বড়ো-বড়ো কলেজে, তাঁর কীর্তির পরিচয় রয়েছে। শুধু লাইব্রেরি করবার জন্যই নানা জায়গায় তিনি প্রায় বিশ কোটি টাকা খরচ করে গেছেন। স্কটল্যাণ্ডের গরিব ছাত্রদের পড়ার সাহায্যের জন্য তিনি অন্তত তিন কোটি টাকা দান করেছেন। তাঁর নিজের জন্মস্থান সেই ছোট্টো গ্রামটি আজ বেশ একটি শহর হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে কেবল তাঁর দানের জোরে। এই শহরটির উন্নতির জন্য তিনি যে সম্পত্তি রেখে গেছেন, তার আয় হয় বছরে চার লক্ষ টাকা। বীরত্বের পুরস্কারের জন্য আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে তিনি দুটি Hero fund বা বীর ভাণ্ডার স্থাপন করে গেছেন; বিপদের সময়ে অন্যের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে যারা নিজেরা আহত ও অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, এই ভাণ্ডার থেকে তাদের খাওয়া-পরার সমস্ত খরচ দেওয়া হয়। এমনি করে ছোটো-বড়ো যত অসংখ্যরকমের দান তিনি করে গেছেন, সব যদি এক সঙ্গে ধরা যায়, তা হলে তাঁর দানের হিসাব হয় প্রায় একশো কোটি টাকা!

এত টাকা আমাদের ভালো করে কল্পনাই হয় না। হিসাব বলবার সময় 'অযুত লক্ষ নিযুত কোটি অর্বুদ বৃন্দ' সব আমরা গড় গড় করে বলে যাই, কিন্তু সে যে কত বড়ো অঙ্কের হিসাব তার ধারণা করতে গেলেই মাথায় গোল লেগে যায়। একশো কোটি টাকা কতখানি জান? একজন লোক যদি প্রতি সেকেণ্ডে একটি করে টাকা দান করে, তা হলে একদিনে তার ছিয়াশি হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়। কিন্তু এই হিসাবেও একশো কোটি টাকা খরচ করতে তার অন্তত বত্রিশ বৎসর সময় লাগবে—তাও, যদি সারাদিন সারারাত না খেয়ে না ঘুমিয়ে সে কেবল ঐ কাজই করতে থাকে! একশো কোটি টাকা ভাঙিয়ে যদি পয়সা আনাও, তা হলে সেই পয়সা দিয়ে এই কলকাতার মতো গোটা দুই শহরকে একেবারে ঢেকে দেওয়া যাবে! এই ভারতবর্ষের সমস্ত লোক, ছেলে বুড়ো স্ত্রী পুরুষ, সবাই মিলে যদি সেই পয়সা কুড়োতে আসে, তা হলে প্রত্যেকে প্রায় দুইশো পয়সা নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে।

এই কয়েকদিন হল কার্নেগীর মৃত্যু-সংবাদ এদেশে এসেছে। তাঁর জীবনের সঞ্চিত টাকা তিনি প্রায় সমস্তই দান করে গিয়েছেন—তার তুলনায় যা বাকি রয়ে গেছে, সে কেবল সিন্দুকের মধ্যে এক মুষ্টির মতো।

সন্দেশ—ভাদ্র, ১৩২৬

পিপাসার জল

ইংলণ্ডের ইতিহাসে বীরত্বের জন্য যাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয়, সার ফিলিপ সিডনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। রানী এলিজাবেথ হইতে সাধারণ প্রজা পর্যন্ত সকলেই তাঁহার বীরত্বের কথা জানিত এবং তাঁহাকে সম্মান করিত। এলিজাবেথ বলিতেন, "সার ফিলিপ এই যুগের শ্রেষ্ঠ রত্ন।" সার ফিলিপ যে একজন বড়ো যোদ্ধা ছিলেন সে বিষয়ে কোনো

সন্দেহ নাই ; কিন্তু তিনি কেবল যোদ্ধা ছিলেন না—একাধারে যোদ্ধা, পর্যটক, পণ্ডিত, গায়ক ও কবি ছিলেন। কিন্তু লোকে আজও যে তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে, সে কেবল তাঁহার সাহস, বাহুবল বা প্রতিভার জন্য নয়। নানাদিকে তাঁহার নানা কীর্তির কথা যদি সমস্তই লোপ পাইয়া যায়, তবু তাঁহার মৃত্যুকালের শেষ বীরত্বের কাহিনীই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

সুট্‌ফেনের যুদ্ধে আহত হইয়া সার ফিলিপের মৃত্যু হয়। যুদ্ধের আরম্ভেই তাঁহার ঘোড়া মরিয়া যায় এবং তিনি আহত হইয়া মাটিতে পড়েন। কিন্তু তাঁহার যুদ্ধের উৎসাহ তখনো মিটে নাই ; তখনই আর-এক ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া তিনি আবার যুদ্ধের মাঝখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। খানিকক্ষণ ভীষণ যুদ্ধের পর তাঁহার এ ঘোড়াটিও যখন মারা পড়িল, তখন তিনি আবার এক ঘোড়া আনিয়া তৃতীয়বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এবারে শত্রুপক্ষের একটি গুলি তাঁহার বুকে লাগিয়া তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিল এবং তাঁহার ঘোড়া পাগলের মতো ছুটিতে ছুটিতে তাঁহাকে শিবিরের কাছে আনিয়া ফেলিয়া দিল। তাঁহার দলের লোকেরা সেখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল ; কিন্তু ডাক্তার বলিলেন, বাঁচিবার কোনো আশা নাই।

জ্বরে ও যন্ত্রণায় অবসন্ন হইয়া যখন তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল, তখন দারুণ পিপাসা দেখা দিল, একটু জলের জন্য তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে জল কি সব সময় পাওয়া যায় ? বহু চেষ্টার পর অনেক কষ্টে একটি ঘটিতে করিয়া একটু জল আনিয়া তাঁহার হাতে দেওয়া হইল। তিনি মাথা তুলিয়া সেই জল পান করিতে যাইবেন, এমন সময়ে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, যে তাঁহারই পাশ দিয়া দুজন লোকে একটি আহত সৈনিককে লইয়া যাইতেছে ; এবং সে বেচারি এমন করুণভাবে তাঁহার ঘটিটার দিকে তাকাইয়া আছে, যে মনে হয়, একটু জল পাইলে সে যেন বাঁচিয়া যায়। সার ফিলিপ তৎক্ষণাৎ ঘটিটি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "এই নাও, আমার চাইতে তোমার দরকার বেশি।" ("Thy need is greater than mine")

ইহার কিছু পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সারা জীবন নানা বীরত্বের পরিচয় দিয়া মৃত্যুকালেও তিনি দেখাইয়া গেলেন যে তিনি কত বড়ো বীর।

আর-একজন বীরের কথা শোনা যায়, যিনি পিপাসার সময়ে হাতের কাছে জল পাইয়াও সে জল পান করিতে চাহেন নাই। অস্ট্রিয়ার রাজা রুডল্‌ফ্‌ একবার যুদ্ধযাত্রা করিয়া সসৈন্যে এমন জায়গায় গিয়া পড়িলেন, যেখানে আশেপাশে কোথাও জল পাওয়া যায় না। জল আনিবার জন্য বহুদূরে লোক পাঠানো হইল ; তাহারা কখন ফিরিবে, পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া সকলে তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বেলা যতই বাড়িয়া চলিল, জলের জন্য সকলে ততই অস্থির হইয়া পড়িতে লাগিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "আহা, আমাদেরই এত যন্ত্রণা, রাজা রুডল্‌ফ্‌ না জানি কত কষ্ট পাইতেছেন।" শেষে এদিক-ওদিক অনেক খুঁজিয়া এক পথিকের কাছে একপেয়ালা জল পাওয়া গেল। সেই জল আনিয়া রাজাকে দেওয়া হইল। রুডল্‌ফ্‌ জলের পেয়ালা হাতে লইয়া বলিলেন, "এতগুলি তৃষ্ণার্ত লোক, এতটুকু জলে তাহাদের কি হইবে ? আমার পিপাসা শুধু আমার

নিজের জন্য নয়; আমার প্রত্যেক সৈন্যের পিপাসা যতক্ষণ না মিটিবে ততক্ষণ আমার তৃষ্ণা মিটিবে কিরূপে?" এই বলিয়া তিনি পেয়ালা মাটিতে উপুড় করিয়া পৃথিবীর জল পৃথিবীকে ফিরাইয়া দিলেন।

আর-একটি এইরূপ গল্প আছে, সেও বহুদিনের কথা। প্রায় তিনশো বৎসর আগে সুইডেনের সঙ্গে ডেনমার্কের যুদ্ধ হইয়াছিল। একটি যুদ্ধের পর অনেকগুলি আহত লোক যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন ডেন সৈনিকের সঙ্গে একবোতল জল ছিল। বোতল খুলিয়া সে সবেমাত্র জল পান করিতে যাইবে, এমন সময় সে শুনিতে পাইল একটু দূরে কে যেন যন্ত্রণায় কোঁকাইতেছে। শুনিয়া তাহার মনে ভারি দয়া হইল, সে টানিয়া হ্যাঁচড়াইয়া কোনোরকমে সেই লোকটির কাছে গিয়া দেখিল, সে একজন শত্রুপক্ষীয় সুইড! কিন্তু ডেন সৈনিকটি শত্রুমিত্র বিচার না করিয়া মুমূর্ষু শত্রুর মুখের কাছে বোতল লইয়া বলিল, "আহা। তোমার বড়ো বেশি আঘাত লাগিয়াছে--এই জল খাও।" সুইড সৈনিক এক মুহূর্ত কি ভাবিয়া, হঠাৎ এক পিস্তল তুলিয়া জলদাতার কাঁধে গুলি করিল। ডেন বেচারী, শত্রুর উপকার করিতে গিয়া আবার সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়া পড়িয়া গেল।

এমন করিলে কাহার না রাগ হয়? ডেন চীৎকার করিয়া বলিল, "হতভাগা, আমি তোকে জল দিতে গেলাম, আর তুই আমায় খুন করিতে উঠিলি? দাঁড়া, তোকে আমি আচ্ছারকম শাস্তি দেই। আগে সবটা জল তোকে দিতেছিলাম, এখন অর্ধেকের বেশি কখনই দিব না।" এই বলিয়া সে বোতলের জল খানিকটা পান করিয়া, তার পর বোতলটা শত্রুর হাতে গুঁজিয়া দিল।

সন্দেশ—বৈশাখ, ১৩২৮

ইস্কুলের গল্প

'সন্দেশ' পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে দশম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা (বৈশাখ ১৩২৩ থেকে আশ্বিন ১৩২৯) এই সাড়ে ছ'বছরে প্রকাশিত সুকুমার রায়ের গল্পগুলির মধ্যে আঠারোটি গল্প এই পর্যায়ে নির্বাচন করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিকে নজর রেখেই এই পর্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে—'ইস্কুলের গল্প'। এই গল্পগুলি প্রকাশের সময় সুকুমারই ছিলেন সন্দেশের সম্পাদক।

১৯৪০ সালের ২২ নভেম্বর এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স্ কলকাতা—পাগলা দাশু ও অন্যান্য কয়েকটি গল্প নিয়ে 'পাগলা দাশু' শিরোনামে সুকুমার রায়ের একটি গল্প-সংকলন প্রকাশ করেন। সুপ্রভা রায়ের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ এই বইয়ের একটি ভূমিকা লিখে দেন। পরবর্তী পৃষ্ঠায় রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে ভূমিকাটি মুদ্রিত হল। এই সংকলনের মোট বাইশটি গল্পের মধ্যে চোদ্দোটি গল্প 'ইস্কুলের গল্প' পর্যায়ে দেওয়া হল। এ ছাড়া দ্রিঘাংচু, সবজান্তা দাদা, হিংসুটি, বাজে গল্প ১ ও ২ (বাজে গল্প ৩ এই সংস্করণে মুদ্রিত হয় নি) যতীনের জুতো, পেটুক হাসির গল্প এই সাতটি গল্প আমাদের প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি বর্তমান খণ্ডে 'অন্যান্য গল্প' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৯৪৬ সালের ২২ জুন 'পাগলা দাশু'র সিগনেট প্রেস, কলকাতা, প্রকাশিত সংস্করণে—দ্রিঘাংচু, হিংসুটি, বাজেগল্প ১ ও ২, হাসির গল্প ও হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি এই পাঁচটি গল্প বর্জিত হয় এবং কালাচাঁদের ছবি, গোপালের পড়া ও ভুল গল্প এই তিনটি গল্প যুক্ত হয়ে মোট কুড়িটি গল্প নিয়ে 'পাগলা দাশু' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। ঐ সংস্করণে গল্পের সঙ্গে যে ছবিগুলি অঙ্কিত তা অধিকাংশ শ্রীসত্যজিৎ রায়ের আঁকা (দুটিমাত্র সুকুমার রায়ের)। সিগনেট সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের লেখা ভূমিকাটি বর্জিত হয়।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত সুকুমার সাহিত্য সমগ্রতে 'পাগলা দাশু' পর্যায়ে মূলত সিগনেট সংস্করণকেই অনুসরণ করা হয়েছে। তবে শ্রীসত্যজিৎ রায়ের আঁকা ছবিগুলি বর্জন করে লেখকের আঁকা ছবিগুলিই ছাপা হয়েছে। এম, সি, সরকার প্রকাশিত সংস্করণের দ্রিঘাংচু ও হিংসুটি গল্প দুটি 'বহুরূপী'র এবং বাজে গল্প ১ ও ২, হাসির গল্প ও হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি এই গল্পগুলি 'অন্যান্য গল্প' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'পাগলা দাশু'র প্রথম সংস্করণের চোদ্দোটি গল্পের সঙ্গে কালাচাঁদের ছবি (প্রথম সংস্করণে নেই, সিগনেট সংস্করণে আছে) গল্পটি আমরা বর্তমান পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছি। বাকি তিনটি গল্পের—পালোয়ান ও বিষ্ণুবাহনের দিগ্বিজয় এই দুটি প্রথম সংস্করণে বা সিগনেট সংস্করণে ছিল না। আনন্দ পাবলিশার্সের সুকুমার সাহিত্য সমগ্রতে এই দুটি গল্প 'অন্যান্য গল্প' পর্যায়ে প্রকাশিত হয়েছে। 'ইস্কুলের গল্প' পর্যায়ের প্রথম গল্প খোঁড়া সুধীর সন্দেশে প্রকাশিত হওয়ার পর আর কোনো সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয় নি। গল্পগুলির বিন্যাসে সন্দেশে প্রকাশিত কালানুক্রমই অনুসৃত হয়েছে। গল্পের সঙ্গে আঁকা ছবিগুলিও স্বয়ং লেখকের।

গল্পগুলির 'পাঠ'-এ প্রায় অবিকৃত ভাবে 'সন্দেশ'-এ মুদ্রিত 'পাঠ'কেই অনুসরণ করা হয়েছে প্রচলিত পাঠের সঙ্গে তার অনেক ক্ষেত্রে গুরুতর পার্থক্য আছে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

২৮।৪০

সুকুমারের লেখনী থেকে যে অবিমিশ্র হাস্যরসের উৎসধারা বাংলা সাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছে তা অতুলনীয়। তাঁর সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও স্বচ্ছন্দ গতি, তাঁর ভাবসমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা পদে পদে চমৎকৃতি আনে। তাঁর স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল সেইজন্যেই তিনি তার বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখাতে পেরেছিলেন। বঙ্গ সাহিত্যে ব্যঙ্গ রসিকতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আরো কয়েকটি দেখা দিয়েছে কিন্তু সুকুমারের অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাসের বিশেষত্ব তাঁর প্রতিভার যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে তার ঠিক সমশ্রেণীর রচনা দেখা যায় না। তাঁর এই বিশুদ্ধ হাসির দানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অকাল মৃত্যুর সকরুণতা পাঠকদের মনে চিরকালের জন্য জড়িত হয়ে রইল।

গৌরীপুর ভবন
কালিম্পং

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচীপত্র

খোঁড়া সুধীর

গ্রামের স্কুল ছাড়িয়া আমি প্রথম যে শহরের স্কুলে আসিয়া ভর্তি হইলাম, সেখানে আমার মাসতুতো ভাই খগেন্দ্রও থাকিত। সে আমার তিন বৎসর আগে এখানে আসিয়াছে। খগেন্দ্র আর আমি এক ক্লাশে পড়ি, বোর্ডিংয়েও এক ঘরেই থাকি।

আমাদের পাশের ঘরে নরেন ও সুধীর বলিয়া দুইটি ছেলে থাকে। তাহাদের দুইজনে দেখি খুব ভাব, তেমন ভাব আর কোনো ছেলেদের মধ্যে দেখি নাই। অথচ তাহাদের চেহারা যেমন উলটা, স্বভাবও তেমনি ভিন্ন রকমের। নরেনের রঙ ময়লা, দেখিতে লম্বা চওড়া, বেজায় ষণ্ডা, খুব হৈ চৈ করিয়া বেড়ায়; সুধীর ফর্সা রোগা ছোটোখাটো দেখিতে, আর খোঁড়া; সব সময়ে চুপচাপ থাকে।

একদিন আমি স্কুলের পর বোর্ডিংয়ের দিকে যাইতেছিলাম। হঠাৎ সামনে চাহিয়া দেখি বেচারা সুধীর খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া যাইতেছে, আর তাহার পিছু পিছু একটা ছেলে তাহাকে ভ্যাঙ্‌চাইয়া খোঁড়াইয়া চলিতেছে। নরেন যে পিছনে আসিতেছে তাহা সে দেখিতে পায় নাই। শুধু ভ্যাঙ্‌চাইয়া তাহার মন উঠিল না। সে বলিতে লাগিল, "খোঁড়া ন্যাং ন্যাং ন্যাং, কার বাড়িতে—" তাহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে নরেন আসিয়া বাঘের মতো তাহার উপরে পড়িল, আর দুই কাঁধে দুই হাত দিয়া এমন ঝাঁকড়ানি দিল যে ছেলেটা প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিলে বাঁচে।

সেদিন রাত্রে শুইবার সময় আমি খগেন্দ্রের কাছে এই গল্প করিলাম। খগেন্দ্র বলিল, "আমি থাকলে আমিও দু-চার ঘা দিতাম।" আমি বলিলাম, "সুধীর খোঁড়া বলেই বোধ হয় তার উপরে নরেনের এত মায়া।" খগেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "ওঃ, তা বুঝি জানিস না! এখন ওদের এত ভাব দেখছিস, কিন্তু এমন সময় ছিল যখন নরেন সধীরকে দুচক্ষে দেখতে পারত না।" আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, "সত্যি?" "তা না তো কি?" বলিয়া খগেন্দ্র লেপটা ভালো করিয়া টানিয়া গায়ে দিয়া বলিতে লাগিল— "সুধীর যখন নূতন এল তখন তার ছোটোখাটো ভালোমানুষের মতো চেহারা দেখে কেউ

তাকে বড়ো-একটা গ্রাহ্য করে নি। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল যে পড়াশোনায় সে খুব ভালো। আগে নরেন ক্লাশে সবচেয়ে ভালো ছিল; সুধীর এলে সুধীরই ফার্স্ট হতে লাগল। তাতে নরেন তার ওপর ভারি চটে গেল। দেখতে দেখতে ক্লাশে দুটো দল হয়ে উঠল। নরেন বড়োলোকের ছেলে, খেলাধুলায় সকলের সর্দার, তার অনেক চেলা। হ্যাঁ, আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি, সুধীর কিন্তু তখন খোঁড়া ছিল না। তার কোঁকড়ানো চুল, বড়ো-বড়ো চোখ আর সুন্দর মুখখানা দেখে, নরেন তার নাম রাখল খোকাবাবু—সেই নাম স্কুলময় প্রচার হয়ে গেল। একদিন সুধীরের বাড়ি থেকে কি চিঠি এল তাই পড়ে সুধীর কেঁদেছিল। সেদিন রাত্রে পড়বার সময় টেবিলের এককোণে একজন বলল, 'বেবি' (baby), আর একজন জোরে বলল, 'মাস্টারমশাই বেবি মানে কি খোকা?' একজন জোরে জোরে বলতে লাগল, 'c-r-y ক্রাই—ক্রাই মানে কান্না।' সুধীর বেচারা চুপ করে বসে রইল।

"একবার হল কি, এই গত বছর পূজার ছুটির পরে, প্রাইজের দুমাস আগে বলে দেওয়া হল যে, 'এবার ইংরাজি রচনার জন্য একটা আলাদা প্রাইজ দেওয়া হবে।' নরেনের দলের ছেলেরা বলল, 'নরেন প্রাইজ পাবে,' অন্য ছেলেরা বলল, 'সুধীর পাবে।' খুব একটা রেষারেষি চলল।

"তখন সুধীর আমাদের এই পাশের ঘরটাতেই থাকত। প্রাইজের রচনা দেবার আর একদিন মাত্র বাকি আছে—সুধীরের রচনা প্রায় লেখা হয়ে গেছে, নরেনেরও হয়েছে। রাত্রে সুধীর সেটাকে ভালো করে তুলবে বলে দেরাজ খুলে দেখে রচনার খাতা নেই। কত খুঁজল কোথাও পেল না। সে মনে করল বোধ হয় ভুলে বইয়ের সঙ্গে স্কুলে নিয়ে গিয়েছে, কোথায় পড়ে গেছে। লণ্ঠন নিয়ে কত খুঁজল কিন্তু কোথাও পেল না। তখন তার ঘরে রাজেন বলে একটি ছেলে থাকত সে বলল, 'আমি বলছি এ নিশ্চয় নরেনের কাজ। কাল সন্ধ্যার সময় আমি একবার পড়তে পড়তে উঠে এসেছিলাম। তখন বোধ হল নরেন আমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এ নিশ্চয় ওর কাজ।' সুধীর বলল, 'ছি! অমন বলতে নেই। আমরা তো ঠিক জানি না।'

"সুধীর আর কি করবে, তখন তাড়াতাড়ি করে আরেকটা রচনা লিখে দিল বটে, কিন্তু বেচারার ভালো করে লেখাই হল না। নরেনই প্রাইজ পেল। প্রায় মাসখানেক পরে একদিন সুধীর আর রাজেন নরেনের ঘরের নীচে উঠোন দিয়ে যাচ্ছিল; এমন সময় কতগুলো ছেঁড়া কাগজ ঝুর্‌ঝুর্‌ করে তাদের মাথার ওপরে পড়ল। রাজেন রেগে মাথা ঝাড়তে ঝাড়তে উপরের দিকে চেয়ে নরেনের হাতটা দেখতে পেল। তারা চলেই যাচ্ছিল; হঠাৎ এক টুকরো লেখা কাগজের উপর তাদের চোখ পড়ল। সেটা সুধীরের সেই হারানো খাতার পাতার টুকরো। রাজেন বলল, "আমি এক্ষুনি যাচ্ছি, মাস্টারদের এটা দেখাব।' সুধীর তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'এ নিয়ে আর গোলমাল করে কি হবে?'

"সেদিন ছুটির পর রাজেন নরেনকে পাকড়াও করল। নরেন তখন দোতলায় ঐ কাঠের সিঁড়িটার কাছে দাঁড়িয়েছিল। রাজেন গিয়ে বলল, 'তুমি সুধীরের রচনার খাতা চুরি করেছিলে! এই দেখ তার প্রমাণ। তা ছাড়া সেদিন রাত্রে আমি তোমাকে আমাদের

ঘরে যেতে দেখেছিলাম।' নরেন একটু ঠাট্টার হাসি হেসে বলল, 'দেখেছিলে তো বলে দিলে না কেন? সাহসে বুঝি কুলোয় নি?' কথায় কথায় রাগারাগি হয়ে শেষে নরেন যেই রাজেনকে মারতে যাবে এমন সময় হঠাৎ পা পিছলিয়ে সে রেলিঙের উপর পড়ে গেল। নরেনের প্রকাণ্ড শরীর, রেলিংটা তার ভার সামলাতে পারল না। রেলিঙ ভেঙে সে একেবারে খাড়া সিঁড়ি দিয়ে ঘুরপাক খেয়ে পড়ছে দেখে সবাই চেঁচিয়ে উঠল। ঠিক সেই সময়ে সুধীর সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছিল; সে বইটই ফেলে দৌড়ে নরেনকে ধরে ফেলল। কিন্তু তার ভার সুধীর সইতে পারবে কেন? দুজনে জড়াজড়ি করে সিঁড়ির নীচে পড়ে গেল। নরেন পড়ল উপরে সুধীর পড়ল নীচে। একটু বাদেই নরেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠল কিন্তু সুধীর আর ওঠেই না। সবাই মিলে ধরাধরি করে তাকে ঘরে আনল। ডাক্তার এসে বললেন, 'একটি পা ভেঙেছে দেখা যাচ্ছে, জ্ঞান না হলে আর কিছু বলতে পারছি না।' মাসখানেক ভুগে সুধীর সেরে উঠল, কিন্তু খোঁড়া পা আর সারল না।

"এই একমাসে নরেন একেবারে বদলে গেল—যতদিন সুধীর বিছানায় পড়েছিল, নরেন প্রাণপণে তার সেবা করত, নিজে বাজার থেকে তার জন্য ফল কিনে আনত, কত সময়ে রাত জেগে তাকে বাতাস করত--দুবেলা ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া-আসা করত। সেই অবধি তাদের একেবারে গলাগলি ভাব।"

সন্দেশ—বৈশাখ, ১৩২৩

আশ্চর্য কবিতা

চণ্ডীপুরের ইংরাজি স্কুলে আমাদের ক্লাশে একটি নূতন ছাত্র আসিয়াছে। তার বয়স বারো-চোদ্দোর বেশি নয়। সে স্কুলে আসিয়া প্রথম দিনই সকলকে জানাইল, "আমি পোইট্রি লিখতে পারি!" এ কথা শুনিয়া ক্লাশসুদ্ধ সকলে অবাক হইয়া গেল; কেবল দু-একজন হিংসা করিয়া বলিল, "আমরাও ছেলেবেলায় ঢের ঢের কবিতা লিখেছি।" নূতন ছাত্রটি বোধ হয় ভাবিয়াছিল, সে কবিতা লিখিতে পারে, শুনিয়া ক্লাশে খুব হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে, এবং কবিতার নমুনা শুনিবার জন্য সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিবে। যখন সেরূপ কিছুরই লক্ষণ দেখা গেল না, তখন বেচারা, যেন আপন মনে কি কথা বলিতেছে, এরূপভাবে, যাত্রার মতো সুর করিয়া একটা কবিতা আওড়াইতে লাগিল—

"ওহে বিহঙ্গম তুমি কিসের আশায়
বসিয়াছ উচ্চ ডালে সুন্দর বাসায়?
নীল নভোমণ্ডলেতে উড়িয়া উড়িয়া
কত সুখ পাও, আহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া!
যদ্যপি থাকিত মম পুচ্ছ এবং ডানা
উড়ে যেতাম তব সনে নাহি শুনে মানা"—

কবিতা শেষ হইতে না হইতেই ভবেশ অদ্ভুত সুর করিয়া এবং মুখভঙ্গি করিয়া বলিল—

"আহা, যদি থাকত তোমার ল্যাজ এবং ডানা
উড়ে গেলেই আপদ যেত—করত না কেউ মানা।"

শুনিয়া সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নূতন ছাত্র তাহাতে রাগিয়া বলিল, "দেখ বাপু, নিজেরা যা পার না, তা ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেওয়া ভারি সহজ। শৃগাল ও দ্রাক্ষাফলের গল্প শোন নি বুঝি?" একজন ছেলে অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো মুখ করিয়া বলিল, "শৃগাল এবং দ্রাক্ষাফল! সে আবার কি গল্প?" অমনি নূতন ছাত্রটি আবার সুর ধরিল—

"বৃক্ষ হ'তে দ্রাক্ষাফল ভক্ষণ করিতে
লোভী শৃগাল প্রবেশ করে দ্রাক্ষাক্ষেতে
কিন্তু হায় দ্রাক্ষা যে অত্যন্ত উচ্চে থাকে
শৃগাল নাগাল পাবে কিরূপে তাহাকে?
বারম্বার চেষ্টায় হয়ে অকৃতকার্য
'দ্রাক্ষা টক' বলিয়া পালাল ছেড়ে (সেই) রাজ্য—"

সেই হইতে আমাদের হরেরাম একেবারে তাহার চেলা হইয়া গেল। হরেরামের কাছে আমরা শুনিলাম যে ছোকরার নাম শ্যামলাল। সে নাকি এত কবিতা লিখিয়াছে যে একখানা দুপয়সার খাতা প্রায় ভর্তি হইয়াছে—আর আট-দশটি কবিতা হইলেই তাহার একশোটা পুরা হয়, তখন সে নাকি বই ছাপাইবে। শুনিয়া কেহ কেহ আরো অবাক হইয়া গেল—কাহারো কাহারো হিংসা আরো দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল।

ইহার মধ্যে একদিন এক কাণ্ড হইল। গোপাল বলিয়া একটি ছেলে স্কুল ছাড়িয়া যাইবে, এই উপলক্ষে শ্যামলাল এক প্রকাণ্ড কবিতা লিখিয়া ফেলিল! তাহার মধ্যে 'বিদায় বিদায়' বলিয়া অনেক 'অশ্রুজল' 'দুঃখশোক' ইত্যাদি কথা ছিল। গোপাল কবিতার আধখানা শুনিয়াই একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, "হতভাগা, ফের আমার নামে পোইট্রি লিখবি তো এক থাপ্পড় মারব। কেন রে বাপু দুনিয়ায় কি কবিতা লিখবার আর কোনো জিনিস পাও নি?" হরেরাম বলিল, "আহা, বুঝলে না? তুমি ইস্কুল ছেড়ে যাচ্ছ কিনা, তাই ও লিখেছে।" গোপাল বলিল, "ছেড়ে যাচ্ছি তো যাচ্ছি, তোর তাতে কি রে? ফের জ্যাঠামি করবি তো তোর কবিতার খাতা ছিঁড়ে দেব।" দেখিতে দেখিতে কথাটা স্কুলময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ছেলেরা, বিশেষত নীচের ক্লাশের ছেলেরা, দলে দলে শ্যামলালের কবিতা শুনিবার জন্য আসিতে লাগিল! ক্রমে কবিতা লেখার বাতিকটা ভয়ানক রকমের ছোঁয়াচে হইয়া স্কুলের প্রায় অর্ধেক ছেলেকে পাইয়া বসিল। ছোটো-ছোটো ছেলেদের পকেটে ছোটো-ছোটো কবিতার খাতা দেখা দিল—বড়োদের মধ্যে কেহ কেহ 'শ্যামলালের চেয়ে ভালো কবিতা' লিখিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল! স্কুলের দেয়ালে, পড়ার কেতাবে, পরীক্ষার খাতায়, চারিদিকে কবিতা গজাইয়া উঠিল।

পাঁড়েজির বৃদ্ধ ছাগল যেদিন শিং নাড়িয়া দড়ি ছিঁড়িয়া স্কুলের উঠানে দাপাদাপি

করিয়াছিল, আর শ্যামলালকে তাড়া করিয়া থানায় ফেলিয়াছিল, তাহার পরদিন ভারতবর্ষের বড়ো ম্যাপের উপর বড়ো-বড়ো অক্ষরে লেখা বাহির হইল—

পাঁড়েজির ছাগলের একহাত দাড়ি,
অপরূপ রূপ তার যাই বলিহারি!
উঠানে দাপট করি নেচেছিল কাল—
তার পর কি হইল জানে শ্যামলাল।

শ্যামলালের রঙটি কালো, কিন্তু কবিতা পড়িয়া সে যথার্থই চটিয়া লাল হইল, এবং তখনই তাহার নীচে একটা কড়া জবাব লিখিতে লাগিল। সে সবেমাত্র লিখিয়াছে, 'রে অধম দুরাচার, পাষণ্ড বর্বর!' এমন সময় গুরুগম্ভীর গলায় কে যেন ডাকিল, "শ্যামলাল!" ফিরিয়া দেখি হেডমাস্টার মহাশয়। "ম্যাপের ওপর কি লেখা হচ্ছে?" শ্যামলাল একেবারে থতমত খাইয়া বলিল, "আজ্ঞে, আমি আগে লিখি নি, আগে ওরা লিখেছিল।" "ওরা কারা?" শ্যামলাল বোকার মতো একবার আমাদের দিকে একবার কড়িকাঠের দিকে তাকাইতে লাগিল, কাহার নাম করিবে বুঝিতে পারিল না। মাস্টার-মহাশয় আবার বলিলেন, "ওরা যদি পরের বাড়ি সিঁদ কাটতে যায়, তুমিও কাটবে? ওরা যদি নিজের গলায় ছুরি বসায়, দেখাদেখি তুমিও বসাবে?" যাহা হউক, সেদিন অল্পের উপর দিয়াই গেল, শ্যামলাল একটু ধমক-ধামক খাইয়াই খালাস পাইল।

ইহার মধ্যে একদিন আমাদের নূতন শিক্ষকমহাশয় গল্প করিলেন যে তাঁহার সঙ্গে যাহারা এক ক্লাশে পড়িত, তাহাদের মধ্যে একজন নাকি অতি সুন্দর কবিতা লিখিত। একবার ইনস্পেকটার স্কুল দেখিতে আসিয়া তাহার কবিতা শুনিয়া তাহাকে সুন্দর ছবিওয়ালা বই উপহার দিয়াছিলেন। এই গল্পটি বোধ হয় অনেকেরই মনে লাগিয়াছিল। বোধ হয় অনেকেই মনে মনে স্থির করিয়াছিল, "ইনস্পেকটার আসিলে তাঁহাকে কবিতা শুনাইতে হইবে।'

ইহার মাসখানেক পরেই ইনস্পেকটার স্কুল দেখিতে আসিলেন। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি ছেলে সাবধানে পকেটের মধ্যে লুকাইয়া কবিতার কাগজ আনিয়াছে—বড়ো হলের মধ্যে সমস্ত স্কুলের ছেলেদের দাঁড় করানো হইয়াছে—হেডমাস্টার মহাশয় ইনস্পেকটারকে লইয়া ঘরে ঢুকিতেছেন, এমন সময় শ্যামলাল আস্তে-আস্তে পকেট হইতে একটি কাগজ বাহির করিল। আর কোথা যায়! পাছে, শ্যামলাল আগেই তাহার কবিতা পড়িয়া ফেলে, এই ভয়ে ছোটো-বড়ো পঁচিশ-ত্রিশটি কবিতাওয়ালা একসঙ্গে সাংঘাতিক রকম বিকট চিৎকার করিয়া যে যার কবিতা হাঁকিয়া উঠিল। মনে হইল, সমস্ত বাড়িটা করতালের মতো ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল—ইনস্পেকটার মহাশয় মাথা ঘুরিয়া মাঝপথেই মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন—ছাদের উপরে একটা বেড়াল ঘুমাইতেছিল সেটা হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়িয়া তিনতলা হইতে পড়িয়া গেল—স্কুলের দরোয়ান হইতে অফিসের কেশিয়ার বাবু পর্যন্ত হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল।

সকলে সুস্থ হইলে পর মাস্টারমহাশয় বলিলেন, "এত চেঁচাইলে কেন?" সকলে চুপ

করিয়া রহিল। আবার জিজ্ঞাসা হইল। "কে কে চেঁচাইয়াছিলে?" পাঁচ-সাতটি ছেলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "শ্যামলাল।" শ্যামলাল যে একা অত মারাত্মক রকম চেঁচাইতে পারে এ কথা কেহই বিশ্বাস করিল না—সুতরাং স্কুলসুদ্ধ ছেলেকে সেদিন স্কুলের পর আটকাইয়া রাখা হইল।

অনেক তম্বিতাম্বার পর একে একে সমস্ত কথা বাহির হইয়া পড়িল। তখন হেডমাস্টার মহাশয় বলিলেন, "কবিতা লেখার রোগ হয়েছে? ও রোগের ওষুধ কি?" বৃদ্ধ পণ্ডিত-মহাশয় বলিলেন, "বিষস্য বিষমৌষধম্—বিষের ওষুধ বিষ। বসন্তের ওষধ যেমন বসন্তের টিকা, কবিতার ওষুধ তস্য টিকা। তোমরা যে যা কবিতা লিখেছ তার টিকা করে দিচ্ছি। তোমরা একমাস প্রতিদিন পঞ্চাশবার ক'রে এটা লিখে এনে রোজ আমায় দেখাবে।" এই বলে তিনি টিকা দিলেন—

> পদে পদে মিল খুঁজি, গুনে দেখি চোদ্দো
> মনে করি লিখিতেছি ভয়ানক পদ্য!
> হয় হব ভবভূতি নয় কালিদাস
> কবিতার ঘাস খেয়ে চরি বারোমাস।

একমাস তিনি আমাদের কাছে এই লেখা প্রতিদিন পঞ্চাশবার আদায় না করিয়া ছাড়িলেন না। এ কবিতার কি আশ্চর্য গুণ তার পর হইতে কবিতা লেখার ফ্যাশান স্কুল হইতে একেবারেই উঠিয়া গেল।

সন্দেশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩

নূতন পণ্ডিত

আগে যিনি আমাদের পণ্ডিত ছিলেন, তিনি লোক বড়ো ভালো। মাঝে মাঝে আমাদের যে ধমক-ধামক না করিতেন, তাহা নয়—কিন্তু কখনো কাহাকেও অন্যায় শাস্তি দেন নাই। এমন-কি, ক্লাশে আমরা কত সময় গোল করিতাম; তিনি কেবল মাঝে মাঝে 'আঃ' বলিয়া ধমক দিতেন। তাঁহার হাতে একটা ছড়ি থাকিত। খুব বেশি রাগ করিলে সেই ছড়িটাকে টেবিলের উপর আছড়াইতেন—সেটাকে কোনোদিন কাহারো পিঠে পড়িতে দেখি নাই। তাই আমরা কেউ তাঁহাকে মানিতাম না।

আমাদের হেডমাস্টার মশাইটি দেখিতে তাঁর চাইতেও নিরীহ ভালোমানুষ। ছোট্টো বেঁটে মানুষটি, গোঁফদাড়ি কামান গোলগাল মুখ। তাহাতে সর্বদাই যেন হাসি লাগিয়াই আছে। কিন্তু চেহারায় কি হয়? তিনি যদি "শ্যামাচরণ কার নাম?" বলিয়া ক্লাশে আসিয়া আমায় ডাক দিতেন, তবে তাঁহার গলার আওয়াজেই আমার হাত-পা যেন পেটের মধ্যে ঢুকিয়া যাইত। তাঁহার হাতে কোনোদিন বেত দেখি নাই। কারণ বেতের কোনো দরকার হইত না—তাঁহার হুংকারটি যার উপর পড়িত সেই চক্ষে অন্ধকার দেখিত।

একদিন পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, "সোমবার থেকে আমি আর পড়াতে আসব না—কিছুদিনের ছুটি নিয়েছি। আমার জায়গায় আর-একজন আসবেন। দেখিস তাঁর ক্লাশে তোরা যেন গোল করিস নে।" শুনিয়া আমাদের ভারি উৎসাহ লাগিল ; তার পর যে কয়দিন পণ্ডিতমহাশয় স্কুলে ছিলেন, আমরা ক্লাশে এক মিনিটও পড়ি নাই। একদিন বেহারীলাল পড়ার সময় পড়িয়াছিল, সেইজন্য আমরা পরে চাঁদা করিয়া তাহার কান মলিয়া দিয়াছিলাম। যাহা হউক পণ্ডিতমহাশয় সোমবার আর আসিলেন না—তাঁহার বদলে যিনি আসিলেন তাঁহার গোল কালো চশমা, মুখভরা গোঁফের জংগল আর বাঘের মতো আওয়াজ শুনিয়া আমাদের উৎসাহ দমিয়া গেল। তিনি ক্লাশে আসিয়াই বলিলেন, "পড়ার সময়ে কথা বলবে না, হাসবে না, যা বলব তাই করবে—রোজকার পড়া রোজ করবে। আর যদি তা না কর, তা হলে তুলে আছাড় দেব!" শুনিয়া আমাদের তো চক্ষুস্থির।

ফকিরচাঁদের, তখন অসুখ ছিল, সে বেচারা কদিন পরে ক্লাশে আসিতেই নূতন পণ্ডিতমহাশয় তাহাকে পড়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন। ফকির থতমত খাইয়া ভয়ে আমতা-আমতা করিয়া বলিল "আজ্ঞে—আমি ইস্কুলে আসি নি—" পণ্ডিতমহাশয় রাগিয়া বলিলেন, "ইস্কুলে আস নি তো কোথায় এসেছ ? তোমার মামারবাড়ি ?" ফকির বেচারা কাঁদকাঁদ হইয়া বলিল, "সাতদিন স্কুলে আসি নি—কি করে পড়া বলব ?" পণ্ডিত-মহাশয়, "চোপরাও বেয়াদব—মুখের উপর মুখ" বলিয়া এমন ভয়ানক গর্জন করিয়া উঠিলেন, যে ভয়ে ক্লাশসুদ্ধ ছেলের মুখের তালু শুকাইয়া গেল।

আমাদের হরিপ্রসন্ন অতি ভালো ছেলে। সে একদিন স্কুলের আফিসে গিয়া খবর পাইল—সে নাকি এবার কী একটা 'প্রাইজ' পাইবে—খবরটা শুনিয়া বেচারা ভারি খুশি হইয়া ক্লাশে আসিতেছিল—এমন সময় নূতন পণ্ডিতমহাশয় "হাসছ কেন" বলিয়া হঠাৎ এমন ধমক দিয়া উঠিলেন যে মুখের হাসি এক মুহূর্তে আকাশে উড়িয়া গেল। তাহার পরদিন আমাদের ক্লাশের বাইরে রাস্তার ধারে কে যেন হো-হো করিয়া হাসিতেছিল ; শুনিয়া পণ্ডিতমহাশয় পাশের ঘর হইতে হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া আর কথাবার্তা নাই—"কেবল হাসি ?" বলিয়া হরিপ্রসন্নর গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া কয়েক চড় লাগাইয়া আবার হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই অবধি হরিপ্রসন্নর উপর তিনি বিনা কারণে—যখন তখন খাপ্পা হইয়া উঠিতেন।

দেখিতে দেখিতে স্কুলসুদ্ধ ছেলে নূতন পণ্ডিতের উপর হাড়ে চটিয়া গেল। একদিন আমাদের অঙ্কের মাস্টার আসেন নাই। হেডমাস্টার রামবাবু বলিয়া গেলেন—তোমরা ক্লাশে বসিয়া পুরাতন পড়া পড়িতে থাক। আমরা পড়িতে লাগিলাম, কিন্তু খানিক বাদেই পণ্ডিতমহাশয় পাশের ঘর হইতে, "পড়ছ না কেন ?" বলিয়া টেবিলে প্রকাণ্ড এক ঘুঁষি মারিলেন। আমরা বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, পড়ছি তো।" তিনি আবার বলিলেন "তবে শুনতে পাচ্ছি না কেন, চেঁচিয়ে পড়।" যেই বলা অমনি বোকা ফকিরচাঁদ,

"অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড—"

বলিয়া এমন চেঁচাইয়া উঠিল যে পণ্ডিতমহাশয়ের চোখ হইতে হঠাৎ চশমাটা পড়িয়া গেল। মাস্টারমহাশয় গম্ভীরভাবে ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন, তার পর কেন জানি না, হরিপ্রসন্নর কানে ধরিয়া তাহাকে সমস্ত স্কুল ঘুরাইয়া আনিলেন, তাহাকে তিনদিন ক্লাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে হুকুম দিলেন, একটাকা জরিমানা করিলেন, তাহার কালো কোটের পিঠে খড়ি দিয়া 'বাঁদর' লিখিয়া দিলেন, আর স্কুল হইতে তাড়াইয়া দিবেন বলিয়া শাসাইয়া রাখিলেন।

পরের দিন রামবাবু হরিপ্রসন্নকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহার কাছে সমস্ত কথা শুনিয়া আমাদের ক্লাশে খোঁজ করিতে আসিলেন। তখন ফকিরচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে হরে চেঁচায় নি—আমি চেঁচিয়েছি।" রামবাবু বলিলেন, "পণ্ডিতমহাশয়কে 'পাতকী' বলিয়া কি গালাগালি করিয়াছিলে?" ফকির বলিল, "পণ্ডিতমশাইকে কিছুই বলি নি; আমি পড়ছিলাম—

" 'অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড, তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড'।" এই সময়ে নূতন পণ্ডিতমহাশয় ক্লাশের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বোধ হয় শেষ কথাটুকু শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন তাঁহাকে লইয়া কিছু ঠাট্টা করা হইতেছে। তিনি রাগে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারাইয়া হাঁ-হাঁ করিয়া ক্লাশের মধ্যে আসিয়া রামবাবুর কালো কোট দেখিয়াই "তবে রে হরিপ্রসন্ন" বলিয়া হেডমাস্টার মহাশয়কে পিটাইতে লাগিলেন। আমরা ভয়ে কাঠ হইয়া রহিলাম। হেডমাস্টার মহাশয় অনেক কষ্টে পণ্ডিতের হাত ছাড়াইয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন যদি পণ্ডিতের মুখ দেখিতে! বেচারা ভয়ে একেবারে জুজু—তিন-চারবার হাঁ করিয়া আবার মুখ বুজিলেন, তার পর এদিক-ওদিক চাহিয়া এক দৌড়ে সেই যে স্কুল হইতে পলাইয়া গেলেন, আর কোনোদিন তাঁহাকে স্কুলে আসিতে দেখি নাই।

দুইদিন পরে পুরাতন পণ্ডিতমহাশয় আবার ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া আমাদের যেন ধড়ে প্রাণ আসিল—আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সকলে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর পণ্ডিতমহাশয়ের ক্লাশে গোলমাল করিব না। যতই পড়া দিন-না কেন, খুব ভালো করিয়া পড়িব।

সন্দেশ—আষাঢ়, ১৩২৩

জগ্যিদাসের মামা

তার আসল নামটি যজ্ঞদাস। সে প্রথম যেদিন আমাদের ক্লাশে এসেছিল পণ্ডিতমশাই তার নাম শুনেই এক ধমক দিলেন, "যজ্ঞের আবার দাস কি? যজ্ঞেশ্বর বললে তবু নাহয় বুঝি।" ছেলেটি বলল, "আজ্ঞে, আমি তো নাম রাখি নি, নাম রেখেছেন খুড়োমশাই।"

এই শুনে আমরা হো হো করে হেসে উঠতেই পণ্ডিতমশাই হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বানান কর যজ্ঞদাস।" আমি থতমত খেয়ে বললাম, "বর্গীয় জ"—পণ্ডিতমশাই বললেন, "দাঁড়িয়ে থাক।" তার পর একটা ছেলে ঠিক বানান বললে পর তিনি আরেক-

জনকে বললেন, "সমাস করে।" সে বেচারা ভয় পেয়ে বলল, যোগ্য ছিল দাস—হল যোগ্যদাস—অর্থাৎ—" পণ্ডিতমশাই বললেন, "থাক, থাক আর বলতে হবে না।"
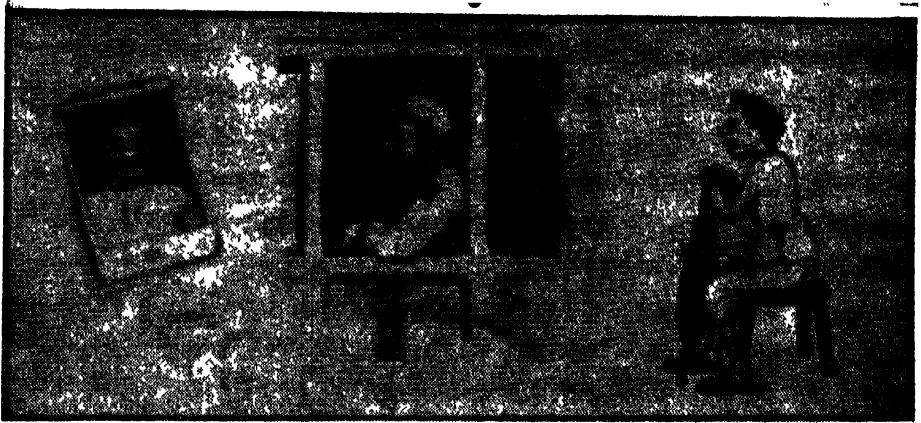
এমনি করে জগ্যিদাস আমাদের ক্লাশে ভর্তি হল। দুদিন না যেতেই বোঝা গেল যে, জগ্যিদাসের আর কোনো বিদ্যে থাকুক আর নাই থাকুক, আজগুবি গল্প বলবার ক্ষমতাটি খুব অসাধারণ। একদিন সে স্কুলে দেরি করে এসেছিল, কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল, "রাস্তায় আসতে পঁচিশটা কুকুর হাঁ হাঁ করে আমায় তেড়ে এসেছিল। আমি ছুটতে ছুটতে, হাঁপাতে হাঁপাতে, সেই কুণ্ডুদের বাড়ি পর্যন্ত চলে গেছিলাম।" পঁচিশটা দূরের কথা, দশটা কুকুরও আমরা একসঙ্গে চোখে দেখি নি, কাজেই কথাটা মাস্টারমশাইও বিশ্বাস করেন নি। তিনি বললেন, "এত মিছে কথা বলতে শিখলে কার কাছে?" জগ্যিদাস বলল, "আজ্ঞে, মামার কাছে।" সেদিন হেডমাস্টারের ঘরে জগ্যিদাসের ডাক পড়েছিল, সেখানে কি হয়েছিল আমরা জানি না, কিন্তু জগ্যিদাস যে খুশি হয় নি সেটা বেশ বোঝা গেল। কিন্তু সত্যি হোক আর মিথ্যে হোক, তার গল্প বলার বাহাদুরি ছিল। সে যখন বড়ো-বড়ো চোখ করে, গম্ভীর গলায়, তার মামাবাড়ির ডাকাত ধরার গল্প বলত তখন বিশ্বাস করি আর না করি, শুনতে শুনতে আমাদের মুখ আপনা হতেই হাঁ হয়ে আসত!

জগ্যিদাসের মামার কথা আমাদের ভারি আশ্চর্য ঠেকত। তাঁর গায়ে নাকি যেমন জোর, তেমনি অসাধারণ তাঁর বুদ্ধি। তিনি যখন 'রামভজন' বলে চাকরকে ডাক দিতেন, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পুলিশ নিয়ে ছুটে আসত। কুস্তি বল, লাঠি বল, ক্রিকেট বল, ফুটবল বল, সবটাতেই তাঁর সমান দখল। প্রথমটা আমরা বিশ্বাস করি নি, কিন্তু একদিন সে তার মামার ফোটো এনে দেখাল। দেখলাম, পালোয়ানের মতো চেহারা বটে! একেক বার ছুটি হত আর জগ্যিদাস তার মামাবাড়ি যেত, আর এসে যে-সব গল্প বলত তা কাগজে ছাপবার মতো!

একদিন ছুটি থেকে ফিরবার সময় স্টেশনে আমার সঙ্গে জগ্যিদাসের দেখা, একটা গাড়ির মধ্যে মাথায় পাগড়িবাঁধা চমৎকার জাঁদরেল চেহারার একটি কোন দেশী ভদ্রলোক

বসে! আমি স্কুলে ফিরতে ফিরতে জগ্যিদাসকে জিজ্ঞেস করলাম, "ঐ লোকটা কে রে?" জগ্যিদাস গম্ভীরভাবে বলল, "ঐতো আমার মামা!" আমি বললাম, "সে কি! তোমার মামার ফোটোতে তো দাড়ি ছিল না—" জগ্যিদাস বলল, "আজকাল দাড়ি রেখেছেন।" আমি বললাম, "ফোটোতে তো কালো দেখেছিলাম।" জগ্যিদাস বলল, "এবার দার্জিলিং গিয়ে ফর্সা হয়ে এসেছেন।" আমি ইস্কুলে গিয়ে গল্প করলাম, "আজ জগ্যিদাসের মামাকে দেখে এলুম।" জগ্যিদাসও খুব বুক ফুলিয়ে, মুখখানা গম্ভীর করে বলল, "তোমরা তো ভাই আমার কথা বিশ্বাস কর না। আচ্ছা, নাহয় মাঝে মাঝে দুটো-একটা গল্প বলে থাকি, তা বলে কি আমার সবই গল্প। আমার জলজ্যান্ত মামাকে সুদ্ধ তোমরা উড়িয়ে দিতে চাও?" এ কথায় অনেকেই মনে মনে লজ্জা পেয়ে ব্যস্ত হয়ে বারবার বলতে লাগল, "আমরা কিন্তু গোড়া থেকেই বিশ্বাস করেছিলাম।"

তার পর থেকে মামার প্রতিপত্তি ভয়ানক বেড়ে গেল। রোজই সব ব্যস্ত হয়ে থাকতাম মামার খবর শুনবার জন্য। কোনোদিন মামা যেতেন হাতি গণ্ডার বাঘ মারতে। কোনোদিন একাই তিনি পাঁচটা কাবুলিকে ঠেঙিয়ে ঠিক করতেন! এইরকম প্রায়ই হত।

তার পর একদিন সবাই আমরা টিফিনের সময় গল্প করছি, এমন সময়ে হেডমাস্টার মশাই ক্লাশে এসে বললেন, "যজ্ঞদাস, তোমার মামা এসেছেন।" হঠাৎ যজ্ঞদাসের মুখখানা আম্‌সির মতো শুকিয়ে গেল—সে আম্‌তা-আম্‌তা করে কি যেন বলতে গিয়ে আর বলতে পারল না। তার পর লক্ষ্মী ছেলেটির মতো চুপচাপ মাস্টারমশায়ের সঙ্গে চলল! আমরা বললাম, "ভয় হবে না? জান তো কিরকম মামা!" সবাই মিলে উৎসাহ আর আগ্রহে 'মামা' দেখবার জন্য একেবারে ঝুঁকে পড়লাম।

গিয়ে দেখি, একটি রোগা, কালো, ছোকরাগোছের ভদ্রলোক, চশমাচোখে গোবেচারার মতো বসে আছেন। জগ্যিদাস তাঁকেই গিয়ে প্রণাম করল!

সেদিন আমাদের সত্যিসত্যিই রাগ হয়েছিল। এমনি করে ফাঁকি দেওয়া! মিথ্যে করে মামা তৈরি! সেদিন আমাদের ধমকের চোটে জগ্যিদাস কেঁদেই ফেলল। সে তখন স্বীকার করল যে ফোটোটা কোন এক পশ্চিমা পালোয়ানের! আর সেই ট্রেনের লোকটাকে সে চেনেই না। তার পরে কোনো আজগুবি জিনিসের কথা বলতে হলেই আমরা বলতাম, "জগ্যিদাসের মামার মতো।"

সন্দেশ– শ্রাবণ, ১৩২৩

পাগলা দাশু

আমাদের স্কুলের যত ছাত্র তাহার মধ্যে এমন কেহই ছিল না, যে পাগলা দাশুকে না চিনে। যে লোক আর কাহাকেও জানে না, সেও সকলের আগে পাগলা দাশুকে চিনিয়া লয়। সেবার একজন নূতন দরোয়ান আসিল, একেবারে আনকোরা পাড়াগেঁয়ে লোক, কিন্তু

প্রথম যখন সে পাগলা দাশুর নাম শুনিল, তখনই সে আন্দাজে ঠিক ধরিয়া লইল যে, এই ব্যক্তিই পাগলা দাশু। কারণ তার মুখের চেহারায়, কথাবার্তায়, চলনে চালনে বোঝা যাইত যে তাহার মাথায় একটু 'ছিট' আছে। তাহার চোখদুটি গোল-গোল, কানদুটা অনাবশ্যক রকমের বড়ো, মাথায় এক বস্তা ঝাঁকড়া চুল। চেহারাটা দেখিলেই মনে হয়—

ক্ষীণদেহ খর্বকায় মুণ্ড তাহে ভারী
যশোরের কই যেন নরমূর্তিধারী।

সে যখন তাড়াতাড়ি চলে অথবা ব্যস্ত হইয়া কথা বলে, তখন তাহার হাত-পা ছোঁড়ার ভঙ্গি দেখিয়া হঠাৎ কেন জানি চিংড়িমাছের কথা মনে পড়ে।

সে যে বোকা ছিল তাহা নয়। অঙ্ক কষিবার সময়, বিশেষত লম্বা-লম্বা গুণ-ভাগের বেলায় তাহার আশ্চর্য মাথা খুলিত। আবার এক-এক সময় সে আমাদের বোকা বানাইয়া তামাশা দেখিবার জন্য এমন সকল ফন্দি বাহির করিত যে, আমরা তাহার বুদ্ধি দেখিয়া অবাক হইয়া থাকিতাম।

দাশু, অর্থাৎ দাশরথি, যখন প্রথম আমাদের স্কুলে ভর্তি হয়, তখন জগবন্ধুকে আমাদের ক্লাশের 'ভালো ছেলে' বলিয়া সকলে জানিত। সে পড়াশুনায় ভালো হইলেও, তাহার মতো অমন একটি হিংসুটে ভিজেবেড়াল আমরা আর দেখি নাই। দাশু একদিন জগবন্ধুর কাছে কি একটা ইংরাজি পড়া জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিল। জগবন্ধু পড়া বলিয়া দেওয়া দূরে থাকুক, তাহাকে বেশ দু কথা শোনাইয়া বলিল, "আমার বুঝি আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই? আজ এঁকে ইংরিজি বোঝাব, কাল ওঁর অঙ্ক কষে দেব, পরশু আরেকজন আসবেন আরেক ফরমাইস নিয়ে—ঐ করি আর কি!" দাশু সাংঘাতিক চটিয়া বলিল, "তুমি তো ভারি ছ্যাঁচড়া ছোটোলোক হে!" জগবন্ধু পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে নালিশ করিল, "ঐ নতুন ছেলেটা আমাকে গালাগালি দিচ্ছে।" পণ্ডিতমহাশয় দাশুকে এমনি দু-চার ধমক দিয়া দিলেন যে, সে বেচারা একেবারে দমিয়া গেল।

তার পর কয়দিন দাশু জগবন্ধুর সহিত কথাবার্তা কহে নাই। পণ্ডিতমহাশয় রোজ ক্লাশে আসেন আর, যখন দরকার হয়, জগবন্ধুর কাছে বই চাহিয়া লন। একদিন তিনি পড়াইবার সময় উপক্রমণিকা চাহিলেন, জগবন্ধু তাড়াতাড়ি তাহার সবুজ কাপড়ের মলাট দেওয়া উপক্রমণিকাখানা বাহির করিয়া দিল। পণ্ডিতমহাশয় বইখানি খুলিয়াই হঠাৎ গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বইখানা কার?" জগবন্ধু বুক ফুলাইয়া বলিল, "আমার।" পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, "হুঁ—নূতন সংস্করণ বুঝি? বইকে বই একেবারে বদলে গেছে।" এই বলিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন, "যশোবন্ত দারোগা—লোমহর্ষক ডিটেক্‌টিভ নাটক।" জগবন্ধু ব্যাপারখানা বুঝিতে না পারিয়া বোকার মতো তাকাইয়া রহিল। পণ্ডিতমহাশয় বিকটরকম চোখ পাকাইয়া বলিলেন, "স্কুলে আমার আদুরে গোপাল, আর বাড়িতে বুঝি নৃসিংহ অবতার?" জগবন্ধু আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পণ্ডিতমহাশয় এক ধমক দিয়া বলিলেন, "থাক, থাক, আর ভালোমানুষি দেখিয়ে কাজ নেই—ঢের হয়েছে।" লজ্জায়, অপমানে জগবন্ধুর দুই কান লাল হইয়া উঠিল—আমরা সকলেই তাহাতে বেশ খুশি হইলাম। পরে জানা গেল যে, এটি

দাশুভায়ার কীর্তি, সে মজা দেখিবার জন্য উপক্রমণিকার জায়গায় ঠিক ঐরূপ মলাট দেওয়া একখানা বই রাখিয়া দিয়াছিল।

দাশুকে লইয়া আমরা সর্বদাই ঠাট্টা-তামাশা করিতাম এবং তাহার সামনেই তাহার বুদ্ধি ও চেহারা সম্বন্ধে অনেক অপ্রীতিকর আলোচনা করিতাম। তাহাতে বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহার ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইত যেন সে বেশ আমোদ পাইতেছে। একেক সময়ে সে নিজেই উৎসাহ করিয়া আমাদের মন্তব্যের উপর রঙ চড়াইয়া নিজের সম্বন্ধে নানারকম অদ্ভুত গল্প বলিত! একদিন সে বলিল, "ভাই, আমাদের পাড়ায় যখনই কেউ আমসত্ত্ব বানায় তখনই আমার ডাক পড়ে। কেন জানিস?" আমরা বলিলাম, "খুব আমসত্ত্ব খাস বুঝি?" সে বলিল, "তা নয়। যখন আমসত্ত্ব শুকোতে দেয় আমি সেইখানে ছাদের ওপর বার দুয়েক এই চেহারাখানা দেখিয়ে আসি। তাতেই পাড়ার ত্রিসীমানার মধ্যে যত কাক সব 'ত্রাহি ত্রাহি' করে ছুটে পালায়। কাজেই আর আমসত্ত্ব পাহারা দিতে হয় না।"

প্রত্যেকবার ছুটির পরে স্কুলে ফিরিবার সময় দাশু একটা-না-একটা কাণ্ড বাধাইয়া আসে। একবার সে হঠাৎ পেণ্টেলুন পরিয়া স্কুলে হাজির হইল। ঢলঢলে পায়জামার মতো পেণ্টেলুন আর তাকিয়ার খোলের মতো কোট পরিয়া তাহাকে যে কিরূপ অদ্ভুত দেখাইতেছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতেছিল এবং সেটা তাহার কাছে ভারি একটা আমোদের ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "পেণ্টেলুন পরেছিস কেন?" দাশু একগাল হাসিয়া বলিল, "ভালো করে ইংরাজি শিখব বলে।" আরেকবার সে খামখা নেড়া মাথায় এক পট্টি বাঁধিয়া ক্লাশে আসিতে আরম্ভ করিল এবং আমরা সকলে তাহা লইয়া ঠাট্টা-তামাশা করায় যারপরনাই খুশি হইয়া উঠিল। দাশু আদপেই গান গাহিতে পারে না। তাহার যে তালজ্ঞান বা সুরজ্ঞান একেবারেই নাই, এ কথা সে বেশ জানে। তবু সেবার ইনস্পেক্টর সাহেব যখন স্কুল দেখিতে আসেন—তখন আমাদের খুশি করিবার জন্য সে চীৎকার করিয়া গান শুনাইয়াছিল। আমরা কেহ ওরূপ করিলে সেদিন রীতিমতো শাস্তি পাইতাম। কিন্তু দাশু 'পাগলা' বলিয়া কেহ তাহাকে কিছু বলিল না।

ছুটির পরে দাশু নূতন কি পাগলামি করে, তাহা দেখিবার জন্য আমরা ব্যস্ত হইয়া স্কুলে আসিতাম। কিন্তু যেবার সে অদ্ভুত এক বাক্স বগলে লইয়া ক্লাশে হাজির হইল, তখন আমরা বাস্তবিকই আশ্চর্য হইয়াছিলাম। আমাদের মাস্টারমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে দাশু, ও বাক্সের মধ্যে কি এনেছ?" দাশু বলিল, "আজ্ঞে, আমার জিনিসপত্র।" 'জিনিস-পত্রটা কিরূপ হইতে পারে, এই লইয়া আমাদের মধ্যে বেশ একটু তর্ক হইয়া গেল। দাশুর সঙ্গে বই, খাতা, পেনসিল, ছুরি, সবই তো আছে, তবে আবার জিনিসপত্র কি রে বাপু? দাশুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে সোজাসুজি কোনো উত্তর না দিয়া বাক্সটিকে আঁকড়াইয়া ধরিল এবং বলিল, "খবরদার, আমার বাক্স তোমরা কেউ ঘেঁটো না।" তাহার পর চাবি দিয়া বাক্সটাকে একটুখানি ফাঁক করিয়া, সে তাহার ভিতরে চাহিয়া কি যেন দেখিয়া লইল এবং 'ঠিক আছে' বলিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া হিসাব করিতে লাগিল। আমি একটুখানি দেখিবার জন্য উঁকি মারিতে গিয়াছিলাম—অমনি পাগলা মহা ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি চাবি ঘুরাইয়া বাক্স বন্ধ করিয়া ফেলিল।

ক্রমে আমাদের মধ্যে তুমুল আলোচনা আরম্ভ হইল। কেহ বলিল, "ওটা ওর টিফিনের বাক্স—ওর মধ্যে খাবার আছে।" কিন্তু একদিনও টিফিনের সময় তাহাকে বাক্স খুলিয়া কিছু খাইতে দেখিলাম না। কেহ বলিল, "ওটা বোধ হয় ওর মনিব্যাগ—ওর মধ্যে টাকা-পয়সা আছে, তাই ও সর্বদা কাছে কাছে রাখতে চায়।" আরেকজন বলিল, "টাকা-পয়সার জন্য অত বড়ো বাক্স কেন? ও কি ইস্কুলে মহাজনী কারবার খুলবে নাকি?"

একদিন টিফিনের সময়ে দাশু হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া বাক্সের চাবিটা আমার কাছে রাখিয়া গেল আর বলিল, "এটা এখন তোমার কাছে রাখ, দেখো হারায় না যেন। আর আমার আসতে যদি একটু দেরি হয়, তবে—তোমরা ক্লাশে যাবার আগে ওটা দরোয়ানের কাছে দিয়ে দিয়ো।" এই কথা বলিয়া সে বাক্সটা দরোয়ানের জিম্মায় রাখিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন আমাদেরও উৎসাহ দেখে কে! এতদিনে সুবিধা পাওয়া গিয়াছে, এখন হতভাগা দরোয়ানটা একটু তফাত গেলেই হয়। খানিকবাদে দরোয়ান তাহার রুটি পাকাইবার লোহার উনানটি ধরাইয়া কতকগুলা বাসনপত্র লইয়া কলতলার দিকে গেল। আমরা এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। দরোয়ান আড়াল হওয়ামাত্র আমরা পাঁচ-সাতজনে তাহার ঘরের কাছে সেই বাক্সের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলাম। তার পর আমি চাবি দিয়া বাক্স খুলিয়া দেখি, বাক্সের মধ্যে বেশ ভারী একটা কাগজের পোঁটলা নেকড়ার ফালি দিয়া খুব করিয়া জড়ানো। তার পর তাড়াতাড়ি পোঁটলার প্যাঁচ খুলিয়া দেখা গেল, তাহার মধ্যে একখানা কাগজের বাক্স—তার ভিতরে আরেকটি ছোটো পোঁটলা। সেইটি খুলিয়া একখানা কার্ড বাহির হইল, তাহার একপিঠে লেখা 'কাঁচকলা খাও' আরেকটি পিঠে লেখা 'অতিরিক্ত কৌতূহল ভালো নয়'। দেখিয়া আমরা এ-উহার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলাম। সকলের শেষে একজন বলিয়া উঠিল, "ছোকরা আচ্ছা যাহোক, আমাদের বেজায় ঠকিয়েছে।" আরেকজন বলিল, "যেমনভাবে বাঁধা ছিল, তেমনি করে রেখে দাও, সে যেন টের না পায় যে আমরা খুলেছিলাম। তা হলে সে নিজেই জব্দ হবে।" আমি বলিলাম, "বেশ কথা। ও ছোকরা আসলে পরে তোমরা খুব ভালোমানুষের মতো বাক্সটা দেখাতে বোলো আর ওর মধ্যে কি আছে—সেটা বার বার করে জানতে চেয়ো।" তখন আমরা তাড়াতাড়ি কাগজপত্রগুলি বাঁধিয়া, আগেকার মতো পোঁটলা পাকাইয়া বাক্সে ভরিয়া ফেলিলাম।

বাক্সে চাবি দিতে যাইতেছি, এমন সময়ে হো হো করিয়া একটা হাসির শব্দ শুনা গেল—চাহিয়া দেখি পাঁচিলের উপরে বসিয়া পাগলা দাশু হাসিয়া কুটিকুটি। হতভাগা এতক্ষণ চুপিচুপি তামাশা দেখিতেছিল। আর আমাদের কথাবার্তা সমস্ত শুনিতেছিল। তখন বুঝিলাম আমার কাছে চাবি দেওয়া, দরোয়ানের কাছে বাক্স রাখা, টিফিনের সময়ে বাইরে যাওয়ার ভান করা, এ-সমস্তই তাহার শয়তানি। আসল মতলবটি, আমাদের খানিকটা নাচাইয়া তামাশা দেখানো। খামখা আমাদের আহাম্মক বানাইবার জন্যই, সে মিছামিছি এ কয়দিন ধরিয়া ক্রমাগত একটা বাক্স, বহিয়া বেড়াইয়াছে।

সাধে কি বলি পাগলা দাশু? •

সন্দেশ—মাঘ, ১৩২৩

চীনে পটকা

আমাদের রামপদ একদিন এক হাঁড়ি, মিহিদানা লইয়া স্কুলে আসিল! টিফিনের ছুটি হওয়ামাত্র আমরা সকলেই মহা উৎসাহে সেগুলি ভাগ করিয়া খাইলাম। খাইল না কেবল 'পাগলা দাশু'।

পাগলা দাশু যে মিহিদানা খাইতে ভালোবাসে না, তা নয়। কিন্তু, রামপদকে সে একেবারেই পছন্দ করিত না--দুজনের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া চলিত! আমরা রামপদকে বলিলাম, "দাশুকে কিছু দে!" রামপদ বলিল, "কি রে দাশু, খাবি নাকি? দেখিস, খাবার লোভ হয়ে থাকে তো বল আর আমার সঙ্গে কোনোদিন লাগতে আসবি নে--তা হলে মিহিদানা পাবি।" এমন করিয়া বলিলে তো রাগ হইবারই কথা, কিন্তু দাশু কিছু না বলিয়া গম্ভীরভাবে হাত পাতিয়া মিহিদানা লইল, তার পর দরোয়ানের কুকুরটাকে ডাকিয়া সকলের সামনে তাহাকে সেই মিহিদানা খাওয়াইল! তার পর খানিকক্ষণ হাঁড়িটার দিকে তাকাইয়া কি যেন ভাবিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে হাসিতে স্কুলের বাহিরে চলিয়া গেল। এদিকে হাঁড়িটাকে শেষ করিয়া আমরা সকলে খেলায় মাতিয়া গেলাম--দাশুর কথা কেউ আর ভাবিবার সময় পাই নাই।

টিফিনের পর ক্লাশে আসিয়া দেখি দাশু অত্যন্ত শান্তশিষ্টভাবে এককোণে বসিয়া আপন মনে অঙ্ক কষিতেছে। তখনই আমাদের কেমন সন্দেহ হইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রে দাশু, কিছু করেছিস নাকি?" দাশু নিতান্ত ভালোমানুষের মতো বলিল, "হ্যাঁ, দুটো জি-সি-এম করে ফেলেছি।" আমরা বলিলাম, "দুৎ! সে কথা কে বলছে? কিছু দুষ্টুমির মতলব করিস নি তো?" এ কথায় দাশু ভয়ানক চটিয়া গেল। তখন পণ্ডিতমহাশয় ক্লাশে আসিতেছিলেন, দাশু তাঁহার কাছে নালিশ করে আর কি! আমরা অনেক কষ্টে তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া বসাইয়া রাখিলাম।

এই পণ্ডিতমহাশয় মানুষটি মন্দ নহেন। পড়ার জন্য কোনোদিনই তাড়াহুড়া করেন না। কেবল মাঝে মাঝে একটু বেশি গোল করিলে হঠাৎ সাংঘাতিকরকম চটিয়া যান। সে সময়ে তাঁর মেজাজটি আশ্চর্যরকম ধারালো হইয়া উঠে। পণ্ডিতমহাশয় চেয়ারে বসিয়াই, "নদী শব্দের রূপ কর" বলিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমরা বই খুলিয়া, হড়্‌বড়্‌ করিয়া যা তা খানিকটা বলিয়া গেলাম--এবং তাহার উত্তরে পণ্ডিতমহাশয়ের নাকের ভিতর হইতে অতি সুন্দর ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম নিদ্রা বেশ গভীর হইয়াছে। কাজেই আমরাও শ্লেট লইয়া 'টুকটাক্‌' আর 'দশ-পঁচিশ' খেলা শুরু করিলাম। কেবল মাঝে মাঝে যখন ঘড়্‌ঘড়ানি কমিয়া আসিত--তখন সবাই মিলিয়া সুর করিয়া 'নদী নদ্যৌ নদ্যঃ' ইত্যাদি আওড়াইতাম। দেখিতাম, তাহাতে ঘুমপাড়ানি গানের ফল খুব আশ্চর্যরকম পাওয়া যায়।

সকলে খেলায় মত্ত, কেবল দাশু এককোনায় বসিয়া কি যেন করিতেছে—সেদিকে আমাদের কোনো খেয়াল নাই। একটু বাদে পণ্ডিতমহাশয়ের চেয়ারের তলায় তক্তার নীচ হইতে 'ফট্' করিয়া কি একটা আওয়াজ হইল। পণ্ডিতমহাশয় ঘুমের ঘোরে ভ্রূকুটি করিয়া সবেমাত্র 'উঃ' বলিয়া কি যেন একটা ধমক দিতে যাইবেন, এমন সময়ে ফুট্‌ফাট্, দুম্‌দাম্, ধুপ্‌ধাপ্ শব্দে তাণ্ডব কোলাহল উঠিয়া সমস্ত স্কুলটিকে একেবারে কাঁপাইয়া তুলিল। মনে হইল যেন যত রাজ্যের মিস্ত্রি-মজুর সবাই একজোটে বিকট তালে ছাত পিটাইতে লাগিয়াছে—দুনিয়ার যত কাঁসারি আর লাঠিয়াল সবাই যেন পাল্লা দিয়া হাতুড়ি আর লাঠি ঠুকিতেছে। খানিকক্ষণ পর্যন্ত আমরা, যাহাকে পড়ার বইয়ে 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' বলে, তেমনি হইয়া হাঁ করিয়া রহিলাম। পণ্ডিতমহাশয় একবারমাত্র বিকট শব্দ করিয়া তার পর হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়িয়া একলাফে টেবিল ডিঙাইয়া একেবারে ক্লাশের মাঝখানে ধড়্‌ফড়্ করিয়া পড়িয়া গেলেন। সরকারি কলেজের নবীন পাল বরাবর 'হাইজাম্পে' ফার্স্ট প্রাইজ পায়; তাহাকেও আমরা এরকম সাংঘাতিক লাফাইতে দেখি নাই। পাশের ঘরে নীচের ক্লাশের ছেলেরা চীৎকার করিয়া 'কড়াকিয়া' মুখস্থ আওড়াইতেছিল—গোলমালে তারাও হঠাৎ আড়ষ্ট হইয়া থামিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে স্কুলময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল—দরোয়ানের কুকুরটা পর্যন্ত যারপরনাই ব্যস্ত হইয়া বিকট কেঁউ কেঁউ শব্দে গোল-মালের মাত্রা ভীষণরকম বাড়াইয়া তুলিল।

পাঁচ মিনিট ভয়ানক আওয়াজের পর যখন সব ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, তখন পণ্ডিত-মহাশয় বলিলেন, "কিসের শব্দ হইয়াছিল দেখ।" দরোয়ানজি একটা লম্বা বাঁশ দিয়া

অতি সাবধানে, আস্তে আস্তে তক্তার নীচ হইতে একটা হাঁড়ি ঠেলিয়া বাহির করিল— রামপদর সেই হাঁড়িটা ; তখনো তার মুখের কাছে এ কটুখানি মিহিদানা লাগিয়াছিল। পণ্ডিতমহাশয় ভয়ানক ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "এ হাঁড়ি কার ?" রামপদ বলিল, "আজ্ঞে, আমার।" আর কোথা যায়—অমনি দুই কানে দুই পাক ! "হাঁড়িতে কি রেখেছিলি ?" রামপদ তখন বুঝিতে পারিল যে গোলমালের জন্য সমস্ত দোষ তাহারই ঘাড়ে আসিয়া পড়িতেছে ! সে বেচারা তাড়াতাড়ি বুঝাইতে গেল, "আজ্ঞে, ওর মধ্যে করে মিহিদানা এনেছিলাম, তার পর"—মুখের কথা শেষ না হইতেই পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, "তার পর মিহিদানাগুলো চীনে পটকা হয়ে ফুটতে লাগল—না ?" বলিয়াই ঠাস্ ঠাস্ করিয়া দুই চড় !

অন্যান্য মাস্টাররাও ক্লাশে আসিয়া জড়ো হইয়াছিলেন ; তাঁহারও একবাক্যে হাঁ হাঁ করিয়া রুখিয়া আসিলেন। আমরা দেখিলাম বেগতিক। বিনা দোষে রামপদ বেচারা মার খায় বুঝি ! এমন সময়ে দাশু আমার শ্লেটখানা লইয়া পণ্ডিতমহাশয়কে দেখাইয়া বলিল, "এই দেখুন। আপনি যখন ঘুমাচ্ছিলেন, তখন ওরা শ্লেট নিয়ে খেলা কচ্ছিল— এই দেখুন, টুকটাকের ঘর কাটা।" শ্লেটের উপর আমার নাম লেখা—পণ্ডিতমহাশয় আমার উপর প্রচণ্ড এক চড় তুলিয়াই হঠাৎ কেমন থতমত খাইয়া গেলেন। তাহার পর দাশুর দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া বলিলেন, "চোপ্‌রও, কে বলেছে আমি ঘুমুচ্ছিলাম ?" দাশু খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া বলিল, "তবে যে আপনার নাক ডাকছিল ?" পণ্ডিতমহাশয় তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরাইয়া বলিলেন, "বটে ? ওরা সব খেলা কচ্ছিল ? আর তুমি কি কচ্ছিলে ?" দাশু অম্লানবদনে বলিল, "আমি তো পটকায় আগুন দিচ্ছিলাম।" শুনিয়াই তো সকলের চক্ষুস্থির ! ছোকরা বলে কি ?

প্রায় আধমিনিটখানেক কাহারো মুখে আর কথা নাই ! তার পর পণ্ডিতমহাশয় ঘাড় বাঁকাইয়া গম্ভীর গলায় হুংকার দিয়া বলিলেন, "কেন পটকায় আগুন দিচ্ছিলে ?" দাশু ভয় পাইবার ছেলেই নয়, সে রামদপকে দেখাইয়া বলিল, "ও কেন আমায় মিহিদানা দিতে চাচ্ছিল না ?" এরূপ অদ্ভুত যুক্তি শুনিয়া রামপদ বলিল, "আমার মিহিদানা আমি যা ইচ্ছা তাই করব।" দাশু তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "তা হলে, আমার পটকা, আমিও যা ইচ্ছা তাই করব।" এরূপ পাগলের সঙ্গে আর তর্ক করা চলে না ! কাজেই মাস্টারেরা সকলেই কিছু কিছু ধমকধামক করিয়া যে যার ক্লাশে চলিয়া গেলেন। সে 'পাগলা' বলিয়া তাহার কোনো শাস্তি হইল না।

ছুটির পর আমরা সবাই মিলিয়া কত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে তাহার দোষ বুঝাইতে পারিলাম না। সে বলিল, "আমার পটকা রামপদর হাঁড়ি। যদি আমার দোষ হয়, তা হলে রামপদরও দোষ হয়েছে। বাস্ ! ওর মার খাওয়াই উচিত।"

সন্দেশ—বৈশাখ, ১৩২৪

চালিয়াৎ

শ্যামচাঁদ আমাদের নীচের ক্লাশে পড়িত, কিন্তু তার দেমাকের দৌরাত্ম্যে সমস্ত স্কুলসুদ্ধ ছেলে অস্থির হইয়া থাকিত। শ্যামচাঁদের বাবা কোন একটা সাহেব অফিসে বড়ো কাজ করিতেন, তাই শ্যামচাঁদের পোশাকে-পরিচ্ছদে রকম-সকমে কায়দার আর অন্ত ছিল না। সে যখন দেড় বিঘৎ চওড়া 'কলার' আঁটিয়া রঙিন ছাতা মাথায় দিয়া নূতন জুতার মচ্‌মচ্‌ শব্দে গম্ভীর চালে ঘাড় উঁচাইয়া স্কুলে আসিত—তাহার সঙ্গে পাগড়িবাঁধা তক্‌মাআঁটা চাপরাশি এক রাজ্যের বই ও টিফিনের বাক্স বহিয়া আনিত—তখন তাহাকে দেখাইত ঠিক যেন পেখমধরা ময়ূরটির মতো! স্কুলের ছোটো-ছোটো ছেলেরা হাঁ করিয়া অবাক হইয়া থাকিত, কিন্তু আমরা সবাই একবাক্যে বলিতাম—'চালিয়াৎ'।

বয়সের হিসেবে শ্যামচাঁদ একটু বেঁটে ছিল। পাছে কেহ তাহাকে ছেলেমানুষ ভাবে এবং যথোপযুক্ত খাতির না করে, এইজন্য সর্বদাই সে অনাবশ্যকরকম গম্ভীর হইয়া থাকিত এবং কথায়বার্তায় ধরনে-ধারণে ইংরাজি বোলচাল দিয়া এমন বিজ্ঞের মতো ভাবপ্রকাশ করিত, যে স্কুলের দরোয়ান হইতে নীচের ক্লাশের ছাত্র পর্যন্ত সকলেরই তাক লাগিয়া যাইত। সকলেই ভাবিত, 'নাঃ, লোকটা কিছু জানে!' শ্যামচাঁদ প্রথম যেবার ঘড়ি-চেইন আঁটিয়া স্কুলে আসিল, তখন তাহার কাণ্ড যদি দেখিতে! পাঁচমিনিট অন্তর ঘড়িটাকে বাহির করিয়া সে কানে দিয়া শুনিত ঘড়িটা চলে কি না! স্কুলের যেখানে যত ঘড়ি আছে সব কটার ভুল তাহার দেখানো চাইই চাই! পাঁড়েজি দরোয়ানকে সে একদিন রীতিমতো ধমক লাগাইয়া বসিল—"এই! স্কুলের ক্লকটাতে যখন চাবি দাও তখন সেটাকে রেগুলেট কর না কেন? ওটাকে অয়েল করতে হবে—ক্রমাগতই স্লো চলছে!" পাঁড়েজির চৌদ্দপুরুষে কেউ কখনো ঘড়ি 'অয়েল' বা 'রেগুলেট' করে নাই। সে যে সপ্তাহে একদিন করিয়া চাবি ঘুরাইতে শিখিয়াছে, ইহাতেই তাহার দেশের লোকের বিস্ময়ের সীমা নাই! কিন্তু দেশভাইদের কাছে মানরক্ষা করিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "হাঁ, হাঁ, আভি হাম রেংলিট করবে।" পাঁড়েজির উপর এক চাল চালিয়া শ্যামচাঁদ ক্লাশে ফিরিতেই কতগুলা ছোটো ছেলে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল—শ্যামচাঁদ তাহাদের কাছে মহা আড়ম্বর করিয়া স্লো, ফাস্ট, মেইন স্প্রিং, রেগুলেট প্রভৃতি ঘড়ির সমস্ত রহস্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। ব্যাপার দেখিয়া আমরা সবাই বলিলাম, "চালিয়াৎ!"

একবার আমাদের একটি নূতন মাস্টার আসিয়াছিলেন, তিনি শ্যামচাঁদকে বেজায় অপ্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রথমত তিনি ক্লাশে আসিয়াই শ্যামচাঁদকে 'খোকা' বলিয়া সম্বোধন করিলেন! লজ্জায় ও অপমানে শ্যামচাঁদের মুখ কান একেবারে লাল হইয়া উঠিল—সে আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আমার নাম শ্যামচাঁদ ঘটক।" মাস্টারমহাশয় অত কি বুঝিবেন—"শ্যামচাঁদ? আচ্ছা বেশ, খোকা বস।" তার পর কয়েকদিন ধরিয়া স্কুলসুদ্ধ ছেলে তাহাকে 'খোকা, খোকা,' করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল।

কিন্তু কয়দিন পরেই শ্যামচাঁদ ইহার শোধ লইয়া ফেলিল। সেদিন সে ক্লাশে আসিয়াই পকেট হইতে কালো চোঙার মতো কি একটা বাহির করিল। মাস্টারমহাশয় সাদাসিধা ভালোমানুষ, তিনি বলিলেন, "কি হে খোকা, থার্‌মোমিটার এনেছ যে! জ্বরটর হয় নাকি?" শ্যামচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে না থার্‌মোমিটার নয়— ফাউনটেন পেন।" শুনিয়া সকলের তো চক্ষুস্থির! ফাউনটেন পেন! মাস্টার এবং ছেলে সকলেই উদগ্রীব হইয়া দেখিতে আসিলেন, ব্যাপারখানা কি! শ্যামচাঁদ বলিল, "এই একটা ভাল্‌কেনাইট টিউব, তার মধ্যে কালি ভরা আছে।" একটা ছেলে উৎসাহে বলিয়া উঠিল, "ও, বুঝেছি, পিচকিরি বুঝি? এইখানে টিপে দিলেই ছর্‌র্‌র্‌ করে কালি বেরুবে?" শ্যামচাঁদ কিছু জবাব না দিয়া খুব মাতব্বরের মতো একটুখানি মুচ্‌কি হাসিয়া কলমটিকে খুলিয়া তাহার সোনালি নিবখানা দেখাইয়া বলিল, "ওতে ইরিডিয়ম আছে—সোনার চেয়েও বেশি দাম।" তার পর যখন সে একখানা খাতা লইয়া সেই আশ্চর্য কলম দিয়া তর্‌তর্‌ করিয়া নিজের নাম লিখিতে লাগিল, তখন স্বয়ং মাস্টারমহাশয় পর্যন্ত বড়ো-বড়ো চোখ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তার পর শ্যামচাঁদ কলমটিকে তাঁর হাতে দিবামাত্র তিনি ভারি খুশি হইয়া সেটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দুইছত্র লিখিয়া বলিলেন, "কি কলই বানিয়েছে—বিলিতি কোম্পানি বুঝি?" শ্যামচাঁদ চট্‌পট্‌ বলিয়া ফেলিল, "আমেরিকান স্টাইলো এণ্ড ফাউনটেন পেন কোং ফিলাডেল্‌ফিয়া।" সেইদিন হইতে ক্লাশে তাহার 'খোকা' নাম ঘুচিল—কিন্তু আমরা আরো বেশি করিয়া বলিতাম, "চালিয়াৎ!"

যাহা হউক চালিয়াতের চালচলনের আলোচনা চলিতে চলিতে পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। ছুটির দিন স্কুলের উঠানে প্রকাণ্ড শামিয়ানা খাটানো হইল, কলিকাতা হইতে কে-এক বাজিওয়ালা আসিয়াছেন, তিনি 'ম্যাজিক' দেখাইবেন। যথাসময়ে সকলে আসিলেন, মাস্টার ছাত্র, লোকজন, নিমন্ত্রিত-অভ্যাগত সকলে মিলিয়া উঠান, সিঁড়ি, রেলিং, পাঁচিল একেবারে ভরিয়া ফেলিয়াছে। ম্যাজিক চলিতে লাগিল। একখানা সাদা রুমাল চোখের সামনেই লাল নীল সবুজের কারিকুরিতে রঙিন হইয়া উঠিল! একজন লোক একটা সিদ্ধ ডিম গিলিয়া মুখের মধ্য হইতে এগারোটা আস্ত ডিম বাহির করিল! ডেপুটি-বাবুর কোচম্যানের দাড়ি নিংড়াইয়া প্রায় পঞ্চাশটি টাকা বাহির করা হইল। তার পর ম্যাজিকওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, "কারও কাছে ঘড়ি আছে?" শ্যামচাঁদ তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমার ঘড়ি আছে।" ম্যাজিকওয়ালা তাহার ঘড়িটি লইয়া খুব গম্ভীরভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। ঘড়িটির খুব প্রশংসা করিয়া বলিল, "তোফা ঘড়ি তো!" তার পর চেনসুদ্ধ ঘড়িটাকে একটা কাগজে মুড়িয়া একটা হামানদিস্তায় দমাদম্‌ ঠুকিতে লাগিল। তার পর কয়েক টুকরা ভাঙা লোহা আর কাঁচ দেখাইয়া শ্যামচাঁদকে বলিল, "এইটা কি তোমার ঘড়ি?" শ্যামচাঁদের অবস্থা বুঝিতেই পার! সে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল, দু-তিনবার কি যেন বলিতে গিয়া আবার থামিয়া গেল। শেষটায় অনেক কষ্টে একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া রুমাল দিয়া ঘাম মুছিতে মুছিতে বসিয়া পড়িল। যাহা হউক, খানিক বাদে যখন একখানা পাঁউরুটির মধ্যে ঘড়িটাকে আস্ত অবস্থায় পাওয়া গেল, তখন 'চালিয়াৎ' খুব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—যেন তামাশাটা সে আগাগোড়াই বুঝিতে পারিয়াছে।

সবশেষে ম্যাজিকওয়ালা নানাজনের কাছে নানারকমের জিনিস চাহিয়া লইল—চশমা, আংটি, মনিব্যাগ, রূপার পেনসিল প্রভৃতি আট-দশটি জিনিস সকলের সামনে একসঙ্গে পোঁটলা বাঁধিয়া, শ্যামচাঁদকে ডাকিয়া তাহার হাতে পোঁটলাটা দেওয়া হইল। শ্যামচাঁদ বুক ফুলাইয়া পোঁটলা হাতে দাঁড়াইয়া রহিল—আর ম্যাজিকওয়ালা লাঠি ঘুরাইয়া, চোখ-টোখ পাকাইয়া বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া কি-সব বকিতে লাগিল। তার পর হঠাৎ শ্যামচাঁদের দিকে ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "জিনিসগুলো ফেললে কোথায়?" শ্যামচাঁদ পোঁটলা দেখাইয়া বলিল, "এই যে।" ম্যাজিকওয়ালা মহা খুশি হইয়া বলিল, "সাবাস ছেলে! দাও, পোঁটলা খুলে যার যার জিনিস ফেরত দাও।" শ্যামচাঁদ তাড়াতাড়ি পোঁটলা খুলিয়া দেখে তাহার মধ্যে খালি কয়েক টুকরা কয়লা আর ঢিল। তখন ম্যাজিকওয়ালার তম্বি দেখে কে? সে কপালে হাত ঠুকিয়া বলিতে লাগিল, "হায় হায়—আমি ভদ্রলোকদের কাছে মুখ দেখাই কি করে? কেনই-বা ওর কাছে দিতে গেছিলাম? ওহে, ও-সব তামাশা এখন রাখ, আমার জিনিসগুলো একবার ফিরিয়ে দাও দেখি।" শ্যামচাঁদ হাসিবে কি কাঁদিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না—ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া তাকাইয়া রহিল। তখন ম্যাজিকওয়ালা তাহার কানের মধ্য হইতে আংটি, চুলের মধ্যে পেনসিল, আস্তিনের মধ্যে চশমা—এইরূপে একটি-একটি জিনিস উদ্ধার করিতে লাগিল। আমরা হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলাম—শ্যামচাঁদও প্রাণপণে হাসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সমস্ত জিনিসের হিসাব মিলাইয়া ম্যাজিকওয়ালা যখন বলিল, "আর কি নিয়েছ?" তখন সে বাস্তবিকই ভয়ানক রাগিয়া বলিল, "ফের মিছে কথা! কক্ষনো আমি কিচ্ছু নিই নি।" তখন ম্যাজিকওয়ালা তাহার কোটের পিছন হইতে জ্যান্ত একটা পায়রা বাহির করিয়া

বলিল, "এটা বুঝি কিছু নয় ?" এবার শ্যামচাঁদ একেবারে ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পর পাগলের মতো হাত-পা ছুঁড়িয়া—সভা হইতে ছুটিয়া বাহির হইল। আমরা সবাই আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া চেঁচাইতে লাগিলাম—'চালিয়াৎ! চালিয়াৎ!'

সন্দেশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪

পালোয়ান

তাহার আসল নামটি যে কি ছিল, তাহা ভুলিয়াই গিয়াছি—কারণ আমরা সকলেই তাহাকে 'পালোয়ান' বলিয়া ডাকিতাম। এমন-কি, মাস্টারমহাশয়রা পর্যন্ত তাহাকে 'পালোয়ান' বলিতেন। কবে কেমন করিয়া তাহার এরূপ নামকরণ হইল, তাহা মনে নাই ; কিন্তু নামটি যে তাহাকে বেশ মানাইয়াছিল, এ কথা স্কুলসুদ্ধ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিত।

প্রথমত, তাহার চেহারাটি ছিল একটু অতিরিক্ত রকমের হৃষ্টপুষ্ট। মোটাসোটা হাত-পা, ব্যাঙের মতো গোব্‌দা গলা—তাহার উপরেই গোলার মতো মাথাটি—যেন ঘাড়ে পিঠে এক হইয়া গিয়াছে। তার উপর সে কলিকাতায় গিয়া স্বচক্ষে কাল্লু ও করিমের লড়াই দেখিয়া আসিয়াছিল, এবং বড়ো-বড়ো কুস্তির এমন আশ্চর্যরকম বর্ণনা দিতে পারিত যে শুনিতে শুনিতে আমাদেরই রক্ত গরম হইয়া উঠিত। এক-একদিন উৎসাহের চোটে আমরাও তাল ঠুকিয়া স্কুলের উঠানে কুস্তি বাধাইয়া দিতাম। পালোয়ান তখন পাশে দাঁড়াইয়া নানারকম অঙ্গভঙ্গি করিয়া আমাদের প্যাঁচ ও কায়দা বাতলাইয়া দিত। মাখন-লাল আমার চাইতে আড়াই বছরের ছোটো, কিন্তু পালোয়ানের কাছে 'ল্যাংমুচ্‌কির' প্যাঁচ শিখিয়া সে যেদিন আমায় চিৎপাত করিয়া ফেলিল, সেইদিন হইতে সকলেরই এই বিশ্বাস পাকা হইল যে, পালোয়ান ছোকরাটা আর কিছু না বুঝুক কুস্তিটা বেশ বোঝে।

ঘোষেদের পাঠশালার ছাত্রগুলা বেজায় ডানপিটে। খামখা এক-একদিন আমাদের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া তাহারা ঝগড়া বাধাইত। মনে আছে, একদিন ছুটির পরে আমি আর পাঁচ-সাতটি ছেলের সঙ্গে গোঁসাইবাড়ির পাশ দিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় দেখি পাঠশালার চারটা ছোকরা ঢেলা মারিয়া আম পাড়িতেছে। একটা ঢিল আরেকটু হইলেই আমার গায়ে পড়িত। আমরা দলে ভারি ছিলাম, সেই সাহসে আমাদের একজন ধমক দিয়া উঠিল, "এইও, বেয়াদব! মানুষ চোখে দেখিস নে ?" ছোকরাদের এমনি আস্পর্ধা, একজন অমনি বলিয়া উঠিল, "হাঁ, মানুষ দেখি, বাঁদরও দেখি!" শুনিয়া সব কটায় অসভ্যের মতো হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। আমার তখন ভয়ানক রাগ হইল, আমি আস্তিন গুটাইয়া বলিলাম, "পরেশ! দে তো আচ্ছা করে ঘা দুচ্চার কষিয়ে!" পরেশও দমিবার পাত্র নয়, সে হুংকার দিয়া বলিল, "গুপে, আন তো ঐ ছোকরাটার কানে ধরে।" গোপীকেষ্ট বলিল, "আমার হাতে বই আছে—ওরে ভুতো, তুই ধর

দেখি একবার চেপে—"। ভুতোর বাড়ি বাঙাল দেশে—তার মেজাজটি যখন মাত্রায় চড়ে তখন তার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না—সে একটা ছোকরার কানে প্রকাণ্ড এক কিল বসাইয়া দিল। কিল খাইয়াই সে হতভাগা একেবারে "গোব্‌রা দা" বলিয়া চীৎকার দিয়া উঠিল, আর সঙ্গে সঙ্গে বাকি তিনজনও "গোব্‌রা দা, গোব্‌রা দা" বলিয়া এমন একটা হৈ চৈ রব তুলিল, যে আমরা ব্যাপারটা কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া রহিলাম। এমন সময় একটা কুচ্‌কুচে কালো মূর্তি হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া দেখা দিল। আসিয়াই আর কথাবার্তা না বলিয়া ভুতোর ঘাড়ে ধাক্কা মারিয়া, গুপের কান মুলিয়া, আমার গালে খামখা ঠাস্‌ ঠাস্‌ করিয়া দুই চড় লাগাইয়া দিল। তার পর কাহার কি হইল আমি খবর রাখিতে পারি নাই। মোট কথা, সেদিন আমাদের যতটা অপমানবোধ হইয়াছিল, ভয় হইয়াছিল তাহার চাইতেও বেশি। সেই হইতে গোব্‌রার নাম শুনিলেই ভয়ে আমাদের মুখ শুকাইয়া আসিত।

পালোয়ানের কেরামতির পরিচয় পাইয়া আমাদের মনে ভরসা আসিল। আমরা ভাবিলাম, এবার যেদিন পাঠশালার ছেলেগুলা আমাদের ভ্যাংচাইতে আসিবে, তখন আমরাও আরো বেশি করিয়া ভ্যাংচাইতে ছাড়িব না। পালোয়ানও এ কথায় খুব উৎসাহ প্রকাশ করিল। কিন্তু অনেকদিন অপেক্ষা করিয়াও যখন তাহাদের ঝগড়া বাধাইবার আর কোনো মতলব দেখা গেল না, তখন আমাদের মনটা খুঁৎখুঁৎ করিতে লাগিল। আমরা বলিতে লাগিলাম, "ওরা নিশ্চয়ই পালোয়ানের কথা শুনতে পেয়েছে।" পালোয়ান বলিল, "হ্যাঁ, তাই হবে। দেখছ না, এখন আর বাছাদের টুঁ শব্দটি নেই।" তখন সবাই মিলিয়া স্থির করিলাম যে পালোয়ানকে সঙ্গে লইয়া গোব্‌রার দলের সঙ্গে ভালোরকম বোঝাপড়া করিতে হইবে।

শনিবার দুইটার সময় স্কুল ছুটি হইয়াছে, এমন সময়ে কে যেন আসিয়া খবর দিল যে গোব্‌রা চার-পাঁচটি ছেলেকে সঙ্গে লইয়া পুকুরপাড়ে বসিয়া গল্প করিতেছে। যেমন শোনা অমনি দলেবলে হৈ হৈ করিতে করিতে সেখানে হাজির। আমাদের ভাবখানা দেখিয়াই বোধ হয় তাহারা বুঝিয়াছিল যে, আমরা কেবল বন্ধুভাবে আলাপ করিতে আসি নাই। তাহারা শশব্যস্ত হইয়া উঠিতে না উঠিতেই আমরা তিন-চারজনে মিলিয়া গোব্‌রাকে একেবারে চাপিয়া ধরিলাম। সকলেই ভাবিলাম, এ যাত্রায় গোব্‌রার আর রক্ষা নাই। কিন্তু আহাম্মক রামপদটা একেবারে সব মাটি করিয়া দিল। সে বোকারাম ছাতা হাতে হাঁ করিয়া তামাশা দেখিতেছিল। এমন সময় পাঠশালার একটা ছোকরা এক থাবড়া মারিয়া তাহার ছাতাটা কাড়িয়া লইল। আমরা ততক্ষণে গোব্‌রাচাঁদকে প্রায় চিৎপাত করিয়া আনিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ আমাদের ঘাড়ে পিঠে ডাইনে বাঁয়ে ধপাধপ্‌ ছাতার বৃষ্টি শুরু হইল। আমরা মুহূর্তের মধ্যে একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলাম, আর সেই ফাঁকে গোব্‌রাও একলাফে গা ঝাড়া দিয়া উঠিল। তাহার পর চক্ষের নিমেষে তাহারা আমাদের চার-পাঁচজনকে ধরিয়া পুকুরের জলে ভালোরকমে চুবাইয়া রীতিমতো নাকাল করিয়া ছাড়িয়া দিল। এই বিপদের সময় আমাদের দলের আর সকলে কে যে কোথায় পলাইল, তাহার আর কিনারাই করা গেল না। সবচাইতে আশ্চর্য এই যে, ইহার মধ্যে পালোয়ান যে
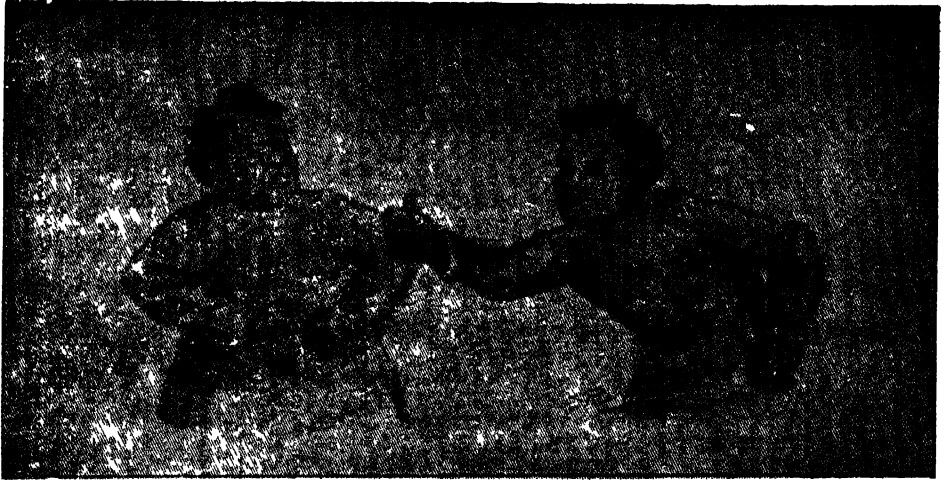
কখন নিরুদ্দেশ হইল—তাহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া আমাদের গলা ফাটিয়া গেল, তবু তাহার সাড়া পাইলাম না।

সোমবার স্কুলে আসিয়াই আমরা হাঁ হাঁ করিয়া পালোয়ানকে ঘিরিয়া ফেলিলাম, কিন্তু সে যে কিছুমাত্র লজ্জিত হইয়াছে, তাহাকে দেখিয়া এমন বোধ হইল না। সে খুব বোলচাল দিয়া লম্বা বক্তৃতা করিয়া বলিল, "তোরা যে এমন আনাড়ি, তা জানলে কি আমি তোদের সঙ্গে যাই? আচ্ছা, গোব্‌রা যখন তোর টুঁটি চেপে ধরল, তখন আমি যে 'ডানপটকান দে' বলে এত চেঁচালাম—কই, তুই তো তার কিছুই করলি না। আর ঐ গুপেটা, ওকে আমি এতবার বলেছি যে ল্যাংমুচ্‌কি মারতে হলে পালটা রোখ সামলে চলিস—তা তো ও শুনবে না। এরকম করলে আমি কি করব বল? ও-সব দেখে আমার একেবারে ঘেন্না ধরে গেল—তাই বিরক্ত হয়ে চলে এলুম। তার পর ভুতোটা, ওটা কি করল বল দেখি! আরে, দেখছিস যখন দোরোখা প্যাঁচ মারছে, তখন বাপু আহ্লাদ করে কাত হয়ে পড়তে গেলি কেন?" ভুতো এতক্ষণ কিছু বলে নাই, কিন্তু পালোয়ানের এই টিপ্পনি কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটার মতো তাহার মেজাজের উপর ছ্যাঁক করিয়া লাগিল। সে গলায় ঝাঁকড়া দিয়া মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, "তুমি বাপু কানকাটা কুকুরের মতো পলাইছিলা ক্যান্?" সর্বনাশ! পালোয়ানকে 'কানকাটা কুকুর' বলা! আমরা ভাবিলাম, 'দেখ, বাঙাল মরে বুঝি এবার!' পালোয়ান খুব গম্ভীর হইয়া বলিল, "দেখ বাঙাল! বেশি চালাকি করিস তো চরকি প্যাঁচ লাগিয়ে একেবারে তুর্কি নাচন নাচিয়ে দেব!" ভুতো বলিল, "তুমি নাচলে বান্দর নাচবা।" রাগে পালোয়ানের মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল। সে বেঞ্চি ডিঙাইয়া একেবারে বাঙালের ঘাড়ে গিয়া পড়িল। তার পর দুইজনে কেবল হুড়াহুড়ি আর গড়াগড়ি। আশ্চর্য এই, পালোয়ান এত যে কায়দা আর এত যে প্যাঁচ আমাদের উপর খাটাইত, নিজের বেলায় তার একটিও তাহার কাজে আসিল না। ঠিক আমাদেরই মতো হাত-পা ছুঁড়িয়া সে খামচাখামচি করিতে লাগিল। তার পর বাঙাল, যখন তাহার বুকের উপর চড়িয়া দুই হাতে তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিল,

তখন আমরা সকলে মিলিয়া দুজনকে ছাড়াইয়া দিলাম। পালোয়ান হাঁপাইতে হাঁপাইতে বেঞ্চে বসিয়া ঘাম মুছিতে লাগিল। তার পর গম্ভীরভাবে বলিল, "ছেলেবেলায় এই ডানহাতের কব্জিটা জখম হয়েছিল- তাই বড়ো-বড়ো প্যাঁচগুলো দিতে ভরসা হয় না—কি জানি হাতটা যদি আবার মচ্‌কে ফচ্‌কে যায়! তা নইলে ওকে একবার দেখে নিতুম।" ভুতো এ কথার কোনো উত্তর না দিয়া, তাহার নাকের সামনে একবার বেশ করিয়া 'কাঁচকলা' দেখাইয়া লইল।

ভুতো ছেলেটি দেখিতে যেমন রোগা এবং বেঁটে, তার হাত-পাগুলিও তেমনি লট্‌খটে, সুতরাং পালোয়ানের পালোয়ানি সম্বন্ধে অনেকের যে আশ্চর্য ধারণা ছিল, সেইদিনই তাহা ঘুচিয়া গেল। কিন্তু পালোয়ান নামটি আর কিছুতেই ঘুচিল না। সেটি শেষপর্যন্ত টিকিয়া ছিল।

সন্দেশ—আষাঢ়, ১৩২৪

সবজান্তা

আমাদের 'সবজান্তা' দুলিরামের বাবা কোন একটা খবরের কাগজের সম্পাদক। সেইজন্য আমাদের মধ্যে অনেকেরই মনে তাহার সমস্ত কথার উপরে অগাধ বিশ্বাস দেখা যাইত। যে কোনো বিষয়েই হোক, জার্মানির লড়ায়ের কথাই হোক আর মোহন-বাগানের ফুটবলের ব্যাখ্যাই হোক, দেশের বড়োলোকদের ঘরোয়া গল্পই হোক আর নানারকমের উৎকট রোগের বর্ণনাই হোক, যে কোনো বিষয়ে সে মতামত প্রকাশ করিত, একদল ছাত্র অসাধারণ শ্রদ্ধার সঙ্গে সে-সকল কথা শুনিত। মাস্টারমহাশয়দের মধ্যেও কেহ কেহ এ বিষয়ে তাহার ভারি পক্ষপাতী ছিলেন। দুনিয়ার সকল খবর লইয়া সে কারবার করে, সেইজন্য পণ্ডিতমহাশয় তাহার নাম দিয়াছিলেন 'সবজান্তা'।

আমার কিন্তু বরাবরই বিশ্বাস ছিল যে, সবজান্তা যতখানি পাণ্ডিত্য দেখায় আসলে তার অনেকখানিই উপরচালাকি। দু-চারিটি বড়ো-বড়ো শোনা-কথা, আর খবরের কাগজ পড়িয়া দু-দশটা খবর, এইমাত্র তার পুঁজি, তাহারই উপর রঙচঙ দিয়া নানারকম বাজে গল্প জুড়িয়া সে তাহার বিদ্যা জাহির করিত। একদিন আমাদের ক্লাশে পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে সে নায়েগারা জলপ্রপাতের গল্প করিয়াছিল। তাহাতে সে বলে যে নায়েগারা দশ মাইল উঁচু ও একশত মাইল চওড়া! একজন ছাত্র বলিল, "সে কি করে হবে? এভারেস্ট সবচেয়ে উঁচু পাহাড়, সেই মোটে পাঁচ মাইল—" সবজান্তা তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "তোমরা তো আজকালকার খবর রাখ না!" যখনই তাহার কোনো কথায় আমরা সন্দেহ বা আপত্তি করিতাম সে একটা যা-তা নাম করিয়া আমাদের ধমক দিয়া বলিত, "তোমরা কি অমুকের চাইতে বেশি জান?" আমরা বাহিরে সব সহ্য করিয়া থাকিতাম, কিন্তু এক-এক সময় রাগে গা জ্বলিয়া যাইত।

সবজান্তা যে আমাদের মনের ভাবটা বুঝিত না, তাহা নয়। সে তাহা বিলক্ষণ

বুঝিত এবং সর্বদাই এমন ভাব প্রকাশ করিত যে আমরা তাহার কথাগুলা মানি বা না মানি, তাহাতে তাহার কিছুমাত্র আসে যায় না। নানারকম খবর ও গল্প জাহির করিবার সময় সে মাঝে মাঝে আমাদের শুনাইয়া বলিত, "অবিশ্যি, কেউ কেউ আছেন, যাঁরা এ-সব কথা মানবেন না" অথবা "যাঁরা না পড়েই খুব বুদ্ধিমান তাঁরা নিশ্চয়ই এ-সব উড়িয়ে দিতে চাইবেন" ইত্যাদি। ছোকরা বাস্তবিকই অনেকরকম খবর রাখিত। তার উপর তার বোলচাল-গুলিও ছিল বেশ ঝাঁঝালো রকমের, কাজেই আমরা বেশি তর্ক করিতে সাহস পাইতাম না।

তাহার পর একদিন কি কুক্ষণে তাহার এক মামা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া আমাদেরই স্কুলের কাছে বাসা লইয়া বসিলেন। তখন আর সবজান্তাকে পায় কে! তাহার কথা-বার্তার দৌড় এমন আশ্চর্যরকম বাড়িয়া চলিল যে, মনে হইত বুঝিবা তাহার পরামর্শ ছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পুলিশের পেয়াদা পর্যন্ত কাহারও কাজ চলিতে পারে না। স্কুলের ছাত্র মহলে তাহার খাতির ও প্রতিপত্তি এমন আশ্চর্যরকম জমিয়া গেল যে, আমরা কয়েক বেচারা, যাহারা বরাবর তাহাকে নানারকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছি—আমরা একেবারে কোণঠাসা হইয়া রহিলাম। এমন-কি, আমাদের মধ্য হইতে দু-একজন তাহার দলে যোগ দিতেও আরম্ভ করিল।

অবস্থাটা শেষটায় এমন দাঁড়াইল যে স্কুলে আমাদের টেঁকা দায় হইল। দশটার সময় আমরা কাঁচুমাচু করিয়া ক্লাশে ঢুকিতাম আর ছুটি হইলেই সকলের ঠাট্টা-বিদ্রূপ হাসি-তামাশার হাত এড়াইবার জন্য দৌড়িয়া বাড়ি আসিতাম। টিফিনের সময়টুকু হেড-মাস্টার মহাশয়ের ঘরের সামনে একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো পড়াশুনা করিতাম।

এইরকম ভাবে কতদিন চলিত জানি না, কিন্তু একদিনের একটি ঘটনায় হঠাৎ সবজান্তা মহাশয়ের জারিজুরি সব এমনই ফাঁস হইয়া গেল যে, তাহার অনেকদিনকার খ্যাতি ঐ একদিনেই লোপ পাইল—আর আমরাও সেইদিন হইতে একটু মাথা তুলিতে পারিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সেই ঘটনারই গল্প বলিতেছি—

একদিন শুনা গেল লোহারপুরের জমিদার রামলালবাবু আমাদের স্কুলে তিনহাজার টাকা দিয়াছেন—একটি 'ফুটবল গ্রাউণ্ড' ও খেলার সরঞ্জামের জন্য। আরো শুনিলাম রামলালবাবুর ইচ্ছা সেই উপলক্ষে আমাদের একদিন ছুটি ও একদিন রীতিমতো ভোজের আয়োজন হয়। কয়দিন ধরিয়া এই খবরটাই আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। কবে ছুটি পাওয়া যাইবে, কবে খাওয়া এবং কি খাওয়া হইবে এই-সকল বিষয় জল্পনা চলিতে লাগিল। সবজান্তা দুলিরাম বলিল, যেবার সে দার্জিলিং গিয়াছিল, সেবার নাকি রামলালবাবুর সঙ্গে তাহার দেখা সাক্ষাৎ এমন-কি, আলাপ পরিচয় পর্যন্ত হইয়া-ছিল। রামলালবাবু তাহাকে কেমন খাতির করিতেন, তাহার কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া কি কি প্রশংসা করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সে স্কুলের আগে এবং পরে সারাটি টিফিনের সময়, এবং সুযোগ পাইলে ক্লাশের পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকেও, নানা অসম্ভবরকম গল্প বলিত। 'অসম্ভব' বলিলাম বটে, কিন্তু তাহার চেলার দল সে-সকল কথা নির্বিচারে বিশ্বাস করিতে একটুও বাধা বোধ করিত না।

একদিন টিফিনের সময় উঠানের বড়ো সিঁড়িটার উপর একদল ছেলের সঙ্গে বসিয়া সবজান্তা গল্প আরম্ভ করিল, "আমি একদিন দার্জিলিঙে লাটসাহেবের বাড়ির কাছের ঐ রাস্তাটায় বেড়াচ্ছি -এমন সময় দেখি রামলালবাবু হাসতে হাসতে আমার দিকে আসছেন, তাঁর সঙ্গে আবার এক সাহেব। রামলালবাবু বললেন, "দুলিরাম! তোমার সেই ইংরাজি কবিতাটা একবার এঁকে শোনাতে হচ্ছে। আমি এঁর কাছে তোমার সুখ্যাত করছিলাম, তাই ইনি সেটা শুনবার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়েছেন।" উনি নিজে থেকে বলছেন, তখন আমি আর কি করি? আমি সেই Casabianca থেকে আবৃত্তি করলুম—তার পর দেখতে দেখতে যা ভিড় জমে গেল! সবাই শুনতে চায়, সবাই বলে 'আবার কর'! মহামুস্কিলে পড়ে গেলাম, নেহাৎ রামলালবাবু বললেন তাই আবার করতে হল।" এমন সময়, কে যেন পিছন হইতে জিজ্ঞাসা করিল "রামলালবাবু কে?" সকলে ফিরিয়া দেখি, একটি রোগা নিরীহগোছের পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোক সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া আছেন। সবজান্তা বলিল, "রামলালবাবু কে, তাও জানেন না? লোহারপুরের জমিদার রামলাল রায়।" ভদ্রলোকটি অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "হাঁ তার নাম শুনেছি—সে তোমার কেউ হয় নাকি?" "না কেউ হয় না—এমনি, খুব ভাব আছে আমার সঙ্গে। প্রায়ই চিঠিপত্র চলে।" ভদ্রলোকটি আবার বলিলেন, "রামলালবাবু লোকটি কেমন?" সবজান্তা উৎসাহের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "চমৎকার লোক। যেমন চেহারা, তেমনি কথাবার্তা, তেমনি কায়দাদুরস্ত। এই আপনার চেয়ে প্রায় আধ হাতখানেক লম্বা হবেন, আর সেইরকম তাঁর তেজ! আমাকে তিনি কুস্তি শেখাবেন বলেছিলেন, আর কিছুদিন থাকলেই ওটা বেশ রীতিমতো শিখে আসতাম।" ভদ্রলোকটি বলিলেন, "বল কি হে? তোমার বয়স কত?" আজ্ঞে এইবার তেরো পূর্ণ হবে।" "বটে! বয়সের পক্ষে খুব চালাক তো! বেশ তো কথাবার্তা বলতে পার! কি নাম হে তোমার?" সবজান্তা বলিল, "দুলিরাম ঘোষ। রণদাবাবু ডেপুটি আমার মামা হন।" শুনিয়া ভদ্রলোকটি ভারি খুশি হইয়া হেডমাস্টার মহাশয়ের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

ছুটির পর আমরা সকলেই বাহির হইলাম। স্কুলের সম্মুখেই ডেপুটিবাবুর বাড়ি, তাহার বাহিরের বারান্দায় দেখি সেই ভদ্রলোকটি বসিয়া দুলিরামের ডেপুটি মামার সঙ্গে গল্প করিতেছেন। দুলিরামকে দেখিয়াই মামা ডাক দিয়া বলিলেন, "দুলি এদিকে আয়, এঁকে প্রণাম কর। এটি আমার ভাগনে দুলিরাম।" ভদ্রলোকটি হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, এর পরিচয় আমি আগেই পেয়েছি।" দুলিরাম আমাদের দেখাইয়া খুব আড়ম্বর করিয়া ভদ্রলোকটিকে প্রণাম করিল। ভদ্রলোকটি বলিলেন, "কেমন? আমায় তো তুমি জানই?" দুলি বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ আজ স্কুলে দেখেছিলাম।" ভদ্রলোকটি আবার বলিলেন, "আমার পরিচয় জান না বুঝি?" সবজান্তা এবার আর 'জানি' বলিতে পারিল না, আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। ভদ্রলোকটি তখন বেশ একটু মুচকি মুচকি হাসিয়া আমাদের শুনাইয়া বলিলেন, "আমার নাম রামলাল রায়, লোহারপুরের রামলাল রায়।"

দুলিরাম খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তার পর মুখখানা লাল করিয়া হঠাৎ এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া গেল। ব্যাপার দেখিয়া ছেলেরা রাস্তার উপর হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। তার পরের দিন আমরা স্কুলে আসিয়া দেখিলাম—সবজান্তা আসে

নাই— তাহার নাকি মাথা ধরিয়াছে। নানা অজুহাতে সে দু-তিনদিন কামাই করিল— তাহার পর যেদিন সে স্কুলে আসিল তখন তাহাকে দেখিবামাত্র তাহারই কয়েকজন চেলা, "কি হে! রামলালবাবুর চিঠিপত্র পেলে?" বলিয়া তাহাকে একেবারে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তার পর যতদিন সে স্কুলে ছিল, ততদিন তাহাকে খেপাইতে হইলে বেশি কিছু করার দরকার হইত না, খালি একটিবার রামলালবাবুর খবর জিজ্ঞাসা করিলেই বেশ তামাশা দেখা যাইত।

সন্দেশ—ভাদ্র, ১৩২৪

নন্দলালের মন্দ কপাল

নন্দলালের ভারি রাগ, অঙ্কের পরীক্ষায় মাস্টার তাহাকে 'গোল্লা' দিয়াছেন। অবশ্য সে যে খুব ভালো লিখিয়াছিল তাহা নয়, কিন্তু তা বলিয়া একেবারে গোল্লা দেওয়া কি উচিত ছিল? হাজার হোক, সে একখানা পুরা খাতা লিখিয়াছিল তো! তার পরিশ্রমের কি কোনো মূল্য নাই? ঐ যে ত্রৈরাশিকের অঙ্কটা সেটা তো তার প্রায় ঠিকই হইয়াছিল, কেবল একটু-খানি হিসাবের ভুল হওয়াতে উত্তরটা ঠিক মেলে নাই। আর ঐ যে একটা ডেসিম্যালের অঙ্ক ছিল, সেটাতে গুণ করিতে গিয়া সে ভাগ করিয়া বসিয়াছিল, তাই বলিয়া কি একটা নম্বরও দিতে নাই? আরো অন্যায় এই যে, এই কথাটা মাস্টারমহাশয় ক্লাশের ছেলেদের কাছে ফাঁস করিয়া ফেলিয়াছেন। কেন? আরেকবার হরিদাস যখন গোল্লা পাইয়াছিল, তখন তো সে কথাটা রাষ্ট্র হয় নাই! এ ভারি অন্যায়।

কেহ কেহ বলিল, "নন্দলাল চটো কেন? গোল্লা পাইয়াছ, তার জন্য কোথায় লজ্জিত হওয়া উচিত, না তুমি খামখা রাগিয়াই অস্থির!" নন্দলাল রাগিয়া আগুন হইল। কি! এতবড়ো কথা! সে যে ইতিহাসে একশোর মধ্যে পঁচাশি পাইয়াছে, সেটা বুঝি কিছু নয়? খালি অঙ্কে ভালো পারে নাই বলিয়াই তাহাকে লজ্জিত হইতে হইবে? সব বিষয়েই যে সকলকে ভালো পারিতে হইবে, তাহারই-বা অর্থ কি? স্বয়ং নেপোলিয়ান যে ছেলেবেলায় ব্যাকরণে একেবারে আনাড়ি ছিলেন, সে বেলা কি? তাহার এই যুক্তিতে ছেলেরা দমিল না এবং মাস্টারদের কাছে এই তর্কটা তোলাতে তাঁহারাও যে যুক্তিটাকে খুব চমৎকার ভাবিলেন, এমন তো বোধ হইল না! তখন নন্দলাল বলিল, তাহার কপালই মন্দ—সে নাকি বরাবর তাহা দেখিয়া আসিতেছে।

সেই তো যেবার ছুটির আগে তাহাদের পাড়ায় হাম দেখা দিয়াছিল, তখন বাড়িসুদ্ধ সকলেই হামে ভুগিয়া দিব্যি মজা করিয়া স্কুল কামাই করিল, কেবল বেচারা নন্দলালকেই নিয়মমতো প্রতিদিন স্কুলে হাজিরা দিতে হইয়াছিল। তার পর যেমন ছুটি আরম্ভ হইল, অমনি তাহাকেও জ্বরে আর হামে ধরিল—সমস্ত ছুটিটাই মাটি! সেই যেবার সে মামার-বাড়ি গিয়াছিল, সেবার তাহার মামাতো ভাইয়েরা কেহ বাড়ি ছিল না—ছিলেন কোথাকার এক বদমেজাজি মেসো, তিনি উঠিতে বসিতে কেবল ধমক আর শাসন ছাড়া আর কিছু জানিতেন না। তার উপর সেবার এমন বৃষ্টি হইয়াছিল যে একদিনও ভালো করিয়া

খেলা জমিল না, কোথাও বেড়ানো গেল না। সেইজন্য পরের বছর যখন আর সকলে মামার-বাড়ি গেল, তখন সে কিছুতেই যাইতে চাহিল না। পরে শুনিল সেবার নাকি সেখানে চমৎকার মেলা বসিয়াছিল, কোন রাজার দলের সঙ্গে পঁচিশটা হাতি আসিয়াছিল, আর বাজি যা-পোড়ানো হইয়াছিল সে একেবারে আশ্চর্যরকম! নন্দলালের ছোটো ভাই যখন বারবার উৎসাহ করিয়া তাহার কাছে এই-সকলের বর্ণনা করিতে লাগিল, তখন নন্দ তাহাকে একচড় মারিয়া বলিল, "যা যা! মেলা বক্‌বক্‌ করিস নে।" তাহার কেবল মনে হইতে লাগিল, সেবার সে মামার-বাড়ি গিয়াও ঠকিল এবার না গিয়াও ঠকিল! তাহার মতো কপাল-মন্দ আর কেহ নাই।

স্কুলেও ঠিক তাই। সে অঙ্ক পারে না—অথচ অঙ্কের জন্য দুই-দুইটা প্রাইজ আছে—এদিকে ভূগোল, ইতিহাস তাহার কণ্ঠস্থ কিন্তু ঐ দুইটার একটাতেও প্রাইজ নাই। অবশ্য সংস্কৃতেও সে নেহাত কাঁচা নয়, ধাতুপ্রত্যয়, বিভক্তি, সব চট্‌পট্‌ মুখস্থ করিয়া ফেলে—চেষ্টা করিলে সে কি পড়ার বই আর অর্থপুস্তকটাকে সড়্‌গড়্‌ করিতে পারে না? ক্ষুদিরাম পণ্ডিত-মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র—ক্লাশের মধ্যে সেই যা একটু সংস্কৃত জানে—কিন্তু তাহা তো বেশি নয়। নন্দলাল ইচ্ছা করিলে কি তাহাকে হারাইতে পারে না? নন্দ জেদ করিয়া স্থির করিল, 'একবার ক্ষুদিরামকে দেখে নেব। ছোকরা এ বছর সংস্কৃতের প্রাইজ পেয়ে ভারি দেমাক করছে—আবার অঙ্কের গোল্লার জন্য আমাকে খোঁটা দিতে এসেছিল। আচ্ছা, এবার দেখা যাবে!'

নন্দলাল কাহাকেও না জানাইয়া সেইদিন হইতেই বাড়িতে ভয়ানকভাবে পড়িতে শুরু করিল। ভোরে উঠিয়াই সে 'হসতি, হসত, হসন্তি', শুরু করে, রাত্রেও 'অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলী তরু' বলিয়া ঢুলিতে থাকে। কিন্তু ক্লাশের ছেলেরা এ কথার বিন্দু-বিসর্গও জানে না। পণ্ডিতমহাশয় যখন ক্লাশে প্রশ্ন করেন তখন মাঝে মাঝে উত্তর জানিয়াও সে চুপ করিয়া মাথা চুলকাইতে থাকে—এমন-কি, কখনো ইচ্ছা করিয়া দুই-একটা ভুল বলে—পাছে ক্ষুদিরাম তাহার পড়ার খবর টের পাইয়া আরো বেশি করিয়া পড়ায় মন দিতে থাকে। তাহার ভুল উত্তর শুনিয়া ক্ষুদিরাম মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে, নন্দলাল তাহার কোনো জবাব দেয় না; কেবল ক্ষুদিরাম নিজে যখন এক-একটা ভুল করে, তখন সে মুচকি-মুচকি হাসে আর ভাবে, 'পরীক্ষার সময়ে অমনি ভুল করলেই বাছাধন গেছেন! তা হলে এবার আর ওঁকে সংস্কৃতের প্রাইজ পেতে হবে না।'

ওদিকে ইতিহাসের ক্লাশে নন্দলালের প্রতিপত্তি কমিতে লাগিল। কারণ ইতিহাস আর ভূগোল নাকি একরকম করিয়া শিখিলেই পাশ করা যায়—তাহার জন্য নন্দর কোনো ভাবনা নাই; তাহার সমস্ত মনটা রহিয়াছে ঐ সংস্কৃত পড়ার উপরে—অর্থাৎ সংস্কৃতের প্রাইজটার উপরে। একদিন মাস্টারমহাশয় বলিলেন, "কি হে নন্দলাল, আজকাল বাড়িতে কিছু পড়াশুনা কর না নাকি? তা না হলে সব বিষয়েই যে তোমার এমন দুর্দশা হচ্ছে, তার অর্থ কি?' বাড়িতে কি পড় বল দেখি!" নন্দ আরেকটু হইলেই বলিয়া ফেলিত, 'আজ্ঞে, সংস্কৃত পড়ি!' কিন্তু কথাটাকে হঠাৎ সামলাইয়া, "আজ্ঞে সংস্কৃত—না সংস্কৃত নয়" বলিয়াই সে ভারি থতমত খাইয়া থামিয়া গেল। মাস্টারমহাশয় এক ধমক দিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে সংস্কৃত—না সংস্কৃত নয়—এর অর্থ কি?" ক্ষুদিরাম তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কই! সংস্কৃতও তো কিছু পারে না।" শুনিয়া ক্লাশসুদ্ধ ছেলে হাসিতে লাগিল।

নন্দ একটু অপ্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল—ভাগ্যিস, তাহার সংস্কৃত পড়ার কথাটা ফাঁস হইয়া যায় নাই!

দেখিতে দেখিতে বছর কাটিয়া আসিল—পরীক্ষার সময় প্রায় উপস্থিত। সকলে পড়ার কথা, পরীক্ষার কথা আর প্রাইজের কথা বলাবলি করিতেছে—এমন সময় একজন ছোকরা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে! নন্দ এবার কোন প্রাইজটা নিচ্ছ?" ক্ষুদিরাম নন্দর মতো গলা করিয়া, ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে সংস্কৃত, না সংস্কৃত নয়।" সকলে হাসিল, নন্দও খুব হো হো করিয়া সেই হাসিতে যোগ দিল। মনে ভাবিল, 'বাছাধন, এ হাসি আর তোমার মুখে বেশিদিন থাকছে না।'

যথাসময়ে পরীক্ষা আরম্ভ হইল এবং যথাসময়ে শেষ হইল। পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য সকলে আগ্রহ করিয়া আছে—নন্দও রোজ নোটিস বোর্ডে গিয়া দেখে, তাহার নামে সংস্কৃত প্রাইজ পাওয়ার কোনো বিজ্ঞাপন আছে কি না! তাহার পর একদিন হেডমাস্টার মহাশয় একতাড়া কাগজ লইয়া ক্লাশে আসিলেন, আসিয়াই তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এবার দুয়েকটা নতুন প্রাইজ হয়েছে আর অন্য বিষয়েও কোনো কোনো পরিবর্তন হয়েছে।" এই বলিয়া তিনি পরীক্ষার ফলাফল পড়িতে লাগিলেন। তাহাতে দেখা গেল ইতিহাসের জন্য কে যেন একটা রূপার মেডেল দিয়াছেন। ক্ষুদিরাম ইতিহাসে প্রথম হইয়াছে, সে-ই ঐ মেডেলটা পাইবে। সংস্কৃতে নন্দ প্রথম, ক্ষুদিরাম দ্বিতীয়—কিন্তু, এবার সংস্কৃতে কোনো প্রাইজ নাই!

হায় হায়! নন্দের অবস্থা তখন শোচনীয়। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল সে ছুটিয়া গিয়া ক্ষুদিরামকে কয়েকটা ঘুঁষি লাগাইয়া দেয়। তাহার এত চেষ্টার ফল কি না এই হইল! কে জানিত এবার ইতিহাসের জন্য প্রাইজ থাকিবে, আর সংস্কৃতের জন্য থাকিবে না। ইতিহাসের মেডেলটা সে তো অনায়াসেই পাইতে পারিত। কিন্তু তাহার মনের কষ্ট কেহ বুঝিল না—সবাই বলিল, "বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে—কেমন করে ফাঁকি দিয়ে নম্বর পেয়েছে।" নন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "কপাল মন্দ!"

সন্দেশ—আশ্বিন, ১৩২৪

ডিটেক্‌টিভ

জলধরের মামা পুলিসের চাকরি করেন, আর তার পিসেমশাই লেখেন ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। সেইজন্য জলধরের বিশ্বাস যে, চোর-ডাকাত, জাল-জুয়াচোর জব্দ করবার সবরকম সংকেত সে যেমন জানে, এমনটি তার মামা আর পিসেমশাই ছাড়া কেউ জানে না। কারও বাড়িতে চুরিটুরি হলে জলধর সকলের আগে সেখানে হাজির হয়; আর কে চুরি করল, কি করে চুরি হল, সে থাকলে অমন অবস্থায় কি করত এ-সব বিষয়ে খুব বিজ্ঞের মতো কথা বলতে থাকে। যোগেশবাবুর বাড়িতে যখন বাসন চুরি হল, তখন জলধর তাদের বলল, "আপনারা এইটুকু সাবধান হতে জানেন না—চুরি তো হবেই। দেখুন তো ভাঁড়ার ঘরের পাশেই অন্ধকার গলি, তার ওপর জানলার গরাদ নেই। একটু

সেয়ানা লোক হলে এখান দিয়ে বাসন নিয়ে পালাতে কতক্ষণ ? আমাদের বাড়িতে ও-সব হবার জো নেই। আমি রামদিনকে বলে রেখেছি, রোজ রাত্রে জানলার কাছে চাতালের উপর বাসনগুলো রেখে দিতে। চোরের বাছা যদি আসতে চান, জানলা খুলতে গেলেই বাসনপত্র সব ঝন্‌ঝন্ করে মাটিতে পড়বে। চোর জব্দ করতে হলে এ-সব কায়দা জানতে হয়।" সে সময়ে আমরা সকলেই জলধরের বুদ্ধির খুব প্রশংসা করেছিলাম, কিন্তু পরের দিন যখন শুনলাম সেই রাত্রেই জলধরদের বাড়িতে মস্ত চুরি হয়ে গেছে, তখন মনে হল আগের দিন অতটা প্রশংসা করা উচিত হয় নি।

জলধর কিন্তু তাতেও কিছুমাত্র দমে নি। সে বলল, "আমি যেরকম প্ল্যান করেছিলাম, তাতে চোর একবার বাড়িতে ঢুকলে তাকে আর পালাতে হত না কিন্তু ঐ আহাম্মক রাম-দিনটার বোকামিতে সব মাটি হয়ে গেল। যাক, আমার জিনিস চুরি করে তাকে আর হজম করতে হবে না। বাছাধন যেদিন আমার হাতে ধরা পড়বেন, সেদিন বুঝবেন ডিটেক্‌টিভ কাকে বলে। কিন্তু যাহোক চোরটা খুব সেয়ানা বলতে হবে। যোগেশবাবুদের বাড়িতে যেটা গেছিল সেটা আনাড়ির একশেষ। আমাদের বাড়িতে এলে সে ব্যাটা টের পেত।" কিন্তু দুমাস গেল, চারমাস গেল, ক্রমে প্রায় বছরও কেটে গেল, কিন্তু সে চোর আর ধরা পড়ল না।

চোরের উপদ্রবের কথা আমরা সবাই ভুলে গেছি, এমন সময়ে হঠাৎ আমাদের স্কুলে আবার চুরির হাঙ্গামা শুরু হল। ছেলেরা অনেকে টিফিন নিয়ে আসে, তা থেকে খাবার চুরি যেতে লাগল। প্রথম দিন রামপদর খাবার চুরি যায়। সে বেঞ্চির উপর খানিকটা রাবড়ি আর লুচি রেখে হাত ধুয়ে আসতে গেছে—এর মধ্যে কে এসে লুচিটুচি বেমালুম খেয়ে গিয়েছে। তার পর ক্রমে আরো দু-চারটি ছেলের খাবার চুরি হল। তখন আমরা জলধরকে বললাম, "কি হে ডিটেক্‌টিভ। এই বেলা যে তোমার চোরধরা বুদ্ধি খোলে না, তার মানেটা কি বল দেখি ?" জলধর বলল, "আমি কি আর বুদ্ধি খাটাচ্ছি না ? সবুর কর-না।" তখন সে খুব সাবধানে আমাদের কানে কানে এ কথা জানিয়ে দিল যে স্কুলের যে নূতন ছোকরা বেয়ারা এসেছে তাকেই সে চোর বলে সন্দেহ করে, কারণ সে আসবার পর থেকেই চুরি আরম্ভ হয়েছে।

আমরা সবাই সেদিন থেকে তার উপর চোখ রাখতে শুরু করলাম। কিন্তু দুদিন না যেতেই আবার চুরি। পাগলা দাশু বেচারা বাড়ি থেকে মাংসের চপ এনে টিফিন ঘরের বেঞ্চের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল, কে এসে তার আধখানা খেয়ে বাকিটুকু ধুলোয় ফেলে নষ্ট করে দিয়েছে। পাগলা তখন রাগের চোটে চীৎকার করে, গাল দিয়ে ইস্কুলবাড়ি মাথায় করে তুলল। আমরা সবাই বললাম, "আরে চুপ চুপ, অত চেঁচাস নে। তা হলে চোর ধরা পড়বে কি করে ?" কিন্তু পাগলা কি সে কথা শোনে ? তখন জলধর তাকে বুঝিয়ে বলল, "আর দুদিন সবুর কর, ঐ নতুন ছোকরাটাকে আমি হাতে হাতে ধরিয়ে দিচ্ছি—এ-সমস্ত ওরই কারসাজি।" শুনে দাশু বলল, "তোমার যেমন বুদ্ধি। ওরা হল পশ্চিমা ব্রাহ্মণ, ওরা আবার মাংস খায় নাকি ? দরোয়ানজিকে জিজ্ঞাসা কর তো ?" সত্যিই তো। আমাদের তো সে খেয়াল হয় নি। ও ছোকরা তো কতদিন রুটি পাকিয়ে খায়, কই, একদিনও তো ওকে মাছ-মাংস খেতে দেখি না। দাশু পাগলা হোক আর যাই হোক, তার কথাটা সবাইকে মানতে হল।

জলধর কিন্তু অপ্রস্তুত হবার ছেলেই নয়। সে একগাল হেসে বলল, "আমি ইচ্ছে করে তোদের ভুল বুঝিয়েছিলাম। আরে, চোরকে না ধরা পর্যন্ত কি কিছু বলতে আছে—কোনো পাকা ডিটেক্‌টিভ ওরকম করে না। আমি মনে মনে যাকে চোর বলে ধরেছি, সে আমিই জানি।"

তার পর কদিন আমরা খুব হুঁশিয়ার ছিলাম; আট-দশ দিন আর চুরি হয় নি। তখন জলধর বললে, "তোমরা গোলমাল করেই তো, সব মাটি করলে। চোরটা টের পেয়ে গেল যে আমি তার পেছনে লেগেছি। আর কি সে চুরি করতে সাহস পায়? তবু, ভাগ্যিস তোমাদের কাছে আসল নামটা ফাঁস করি নি।" কিন্তু সেইদিনই আবার শোনা গেল স্বয়ং হেডমাস্টার মহাশয়ের ঘর থেকে তাঁর টিফিনের খাবার চুরি হয়ে গেছে। আমরা বললাম, "কই, হে? চোর না তোমার ভয়ে চুরি করতে পারছিল না? তার ভয় যে ঘুচে গেল দেখছি!"

তার পর দুদিন ধরে জলধরের মুখে আর হাসি দেখা গেল না। চোরের ভাবনা ভেবে ভেবে তার পড়াশুনা সব এমনি ঘুলিয়ে গেল যে পণ্ডিতমশায়ের ক্লাশে সে আরেকটু হলেই মার খেত আর কি! দুদিন পরে সে আমাদের সকলকে ডেকে একত্র করল আর বলল তার চোর ধরবার বন্দোবস্ত সব ঠিক হয়েছে। টিফিনের সময়ে সে একটা ঠোঙায় করে সরভাজা, লুচি আর আলুর দম রেখে চলে আসবে। তার পর কেউ যেন সেদিকে না যায়। ইস্কুলের বাইরে যে জিমন্যাস্টিকের ঘর আছে সেখান থেকে লুকিয়ে টিফিনের ঘরটা দেখা যায়; আমরা কয়েকজন বাড়ি যাবার ভান করে সেখানে থাকব। আর কয়েকজন থাকবে উঠোনের পশ্চিম কোণের ছোটো ঘরটাতে। সুতরাং চোর যেদিক থেকেই আসুক, টিফিন ঘরে ঢুকতে গেলেই তাকে দেখা যাবে।

সেদিন টিফিনের পর পর্যন্ত কারও আর পড়ায় মন বসে না। সবাই ভাবছে কতক্ষণে ছুটি হবে আর চোর কতক্ষণে ধরা পড়বে। চোর ধরা পড়লে তাকে নিয়ে কি করা যাবে সে বিষয়েও কথাবার্তা হতে লাগল। মাস্টারমহাশয় বিরক্ত হয়ে ধমক দিতে লাগলেন, পরেশ আর বিশ্বনাথকে বেঞ্চির উপর দাঁড়াতে হল—কিন্তু সময়টা যেন কাটতেই চায় না! টিফিনের ছুটি হতেই জলধর তার খাবারের ঠোঙাটি টিফিন ঘরে রেখে এল। জলধর, আমি আর দশ-বারোজন উঠোনের কোণের ঘরে রইলাম আর একদল ছেলে বাইরে জিমন্যাস্টিকের ঘরে লুকিয়ে থাকল। জলধর বলল, "দেখ, চোরটা যেরকম সেয়ানা দেখছি আর তার যেরকম সাহস, তাকে মারধর করা ঠিক হবে না। লোকটা নিশ্চয়ই খুব ষণ্ডা হবে। আমি বলি সে যদি এদিকে আসে তা হলে সবাই মিলে তার গায়ে কালি ছিটিয়ে দেব আর চেঁচিয়ে উঠব। তা হলে দরোয়ান-টরোয়ান সব ছুটে আসবে। আর লোকটা পালাতে গেলেও ঐ কালির চিহ্ন দেখে ঠিক ধরা যাবে।" আমাদের রামপদ বলে উঠল, "কেন? সে যে খুব ষণ্ডা হবে তার মানে কি? সে তো কিছু রাক্ষসের মতো খায় বলে মনে হয় না। যা চুরি করে নিচ্ছে—সে তো কোনোদিনই খুব বেশি নয়।" জলধর বলল, "তুমিও যেমন পণ্ডিত! রাক্ষসের মতো খুব খানিকটা খেলেই বুঝি খুব ষণ্ডা হয়! তা হলে তো আমাদের শ্যামা-দাসকেই সকলের চেয়ে ষণ্ডা বলতে হয়। সেদিন ঘোষেদের নেমন্তন্নে ওর খাওয়া দেখেছিলে তো! বাপু হে, আমি যা বলেছি তার ওপর ফোড়ন দিতে যেয়ো না; আর তোমার যদি নেহাত বেশি সাহস থাকে, তুমি গিয়ে চোরের সঙ্গে লড়াই কোরো। আমরা কেউ তাতে

আপত্তি করব না। আমি জানি, এ-সমস্ত নেহাত যেমন-তেমন চোরের সাধ্য নয়—আমার খুব বিশ্বাস, যে লোকটা আমাদের বাড়িতে চুরি করেছিল, এ-সব তারই কাণ্ড।"

এমন সময়ে হঠাৎ টিফিন ঘরের বাঁদিকের জানলাটা খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল, যেন কেউ ভেতর থেকে ঠেলছে। তার পরেই সাদা মতন কি—একটা ঝুপ্ করে উঠোনের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। আমরা চেয়ে দেখলাম একটা মোটা হুলো বেড়াল, তার মুখে জলধরের সরভাজা! তখন যদি জলধরের মুখখানা দেখতে, সে এক বিঘৎ উঁচু হাঁ করে উঠোনের দিকে তাকিয়ে রইল। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন হে ডিটেক্‌টিভ! ঐ ষণ্ডা চোরটাই তো তোমার বাড়িতে চুরি করেছিল ? তা হলে এখন ওকেই পুলিসে দেই ?"

সন্দেশ—কার্তিক, ১৩২৪

বিষ্ণুবাহনের দিগ্বিজয়

বিষ্ণুবাহন খাসা ছেলে। তাহার নামটি যেমন জমকাল, তাহার কথাবার্তা চালচলনও তেমনি। বড়ো-বড়ো গম্ভীর কথা তাহার মুখে যেমন শোনাইত, এমন আর কাহারও মুখে শুনি নাই। সে যখন টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া হাত-পা নাড়িয়া 'দুঃশাসনের রক্তপান' অভিনয় করিত, তখন আমরা সবাই উৎসাহে হাততালি দিয়া উঠিতাম, কেবল দু-একজন হিংসুটে ছেলে নাক সিঁটকাইয়া বলিত, "ওরকম ঢের ঢের দেখা আছে।" ভুতো এই হিংসুক দলের সর্দার। সে বিষ্ণুবাহনকে ডাকিত 'খগা'। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "বিষ্ণুবাহন মানে গরুড়, আর গরুড় হচ্ছেন খগরাজ—খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল—তাই বিষ্ণুবাহন হলেন খগা।" বিষ্ণুবাহন বলিল, "ওরা আমার নামটাকে পর্যন্ত হিংসে করে।"

বিষ্ণুবাহনের কে এক মামা 'চন্দ্রদ্বীপের দিগ্বিজয়' বলে একখানা নতুন নাটক লিখিয়াছেন। বিষ্ণুবাহন একদিন সেটা আমাদের পড়িয়া শোনাইল। শুনিয়া আমরা সকলেই বলিলাম, "চমৎকার!" বিশেষত, যে জায়গায় চন্দ্রদ্বীপ, "আয় আয় কাপুরুষ, আয় শত্রু আয় রে" বলিয়া নিষাদরাজার সিংহদরজায় তলোয়ার মারিতেছেন। সেই জায়গাটা পড়িতে পড়িতে বিষ্ণুবাহন যখন হঠাৎ "আয় শত্রু আয়" বলিয়া ভুতোর ঘাড়ে ছাতার বাড়ি মারিল, তখন আমাদের এমন উৎসাহ হইয়াছিল যে আর-একটু হইলেই একটা মারামারি বাধিয়া যাইত। আমরা তখনই ঠিক করিলাম যে ওটা 'অ্যাকটিং' করিতে হইবে।

ছুটির দিন আমাদের অভিনয় হইবে, তাহার জন্য ভিতরে ভিতরে সব আয়োজন চলিতে লাগিল। রোজ টিফিনের সময় আর ছুটির পরে আমাদের তর্জন-গর্জনে পাড়াসুদ্ধ লোক বুঝিতে পারিত যে, একটা কিছু কাণ্ড হইতেছে। বিষ্ণুবাহন চন্দ্রদ্বীপ সাজিবে, সেই আমাদের কথাবার্তা শিখাইত আর অঙ্গভঙ্গি লম্ফঝম্ফ সব নিজে করিয়া দেখাইত। ভুতোর দল প্রথমটা খুব ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছিল, কিন্তু যেদিন বিষ্ণুবাহন কোথা হইতে একরাশ নকল গোঁফদাড়ি, কতগুলা তীর-ধনুক, আর রূপালি কাগজ মোড়া কাঠের তলোয়ার আনিয়া হাজির করিল, সেইদিন তাহারা হঠাৎ কেমন মুষড়াইয়া গেল।

ভুতোর কথাবার্তা ও ব্যবহার বদলাইয়া আশ্চর্যরকম নরম হইয়া আসিল এবং বিষ্ণুবাহনের সঙ্গে ভাব পাতাইবার জন্য সে হঠাৎ এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে, ব্যাপার দেখিয়া আমরা সকলেই অবাক হইয়া রহিলাম। তার পর দিনই টিফিনের সময় সে একটি ছেলেকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে, 'দূত হোক, পেয়াদা হোক, তাহাকে যাহা কিছু সাজিতে দেওয়া যাইবে, সে তাহাই সাজিতে রাজি আছে।' শেষ দৃশ্যে রণস্থলে মৃতদেহ দেখিয়া নিষাদরাজের কাঁদিবার কথা—আমরা কেহ কেহ বলিলাম, "আচ্ছা ওকে মৃতদেহ সাজতে দাও।" বিষ্ণুবাহন কিন্তু রাজি হইল না। সে ছেলেটাকে বলিল, "জিজ্ঞাসা করে আয়, সে তামাক সাজতে পারে কি না।" শুনিয়া আমরা হো হো করিয়া খুব হাসিলাম, আর বলিলাম, "এইবার ভুতোর মুখে জুতো।"

তার পর একদিন, আমরা হরিদাসকে দিয়া একটা বিজ্ঞাপন লিখাইলাম। হরিদাস ছবি আঁকিতে জানে, তার হাতের লেখাও খুব ভালো; সে বড়ো-বড়ো অক্ষরে একটা সাইন-বোর্ড লিখিয়া দিল—

'চন্দ্রদ্বীপের দিগ্বিজয়'

১৪ই আশ্বিন সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকা

আমরা মহা উৎসাহ করিয়া সেইটা স্কুলের বড়ো বারান্দায় টাঙাইয়া দিলাম। কিন্তু পরের দিন আসিয়া দেখি কে যেন 'চন্দ্রদ্বীপ' কথাটাকে কাটিয়া মোটা-মোটা অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে—'বিষ্ণুবাহন'—'বিষ্ণুবাহনের দিগ্বিজয়'! ইহার উপর ভুতো আবার গায়ে পড়িয়া বিষ্ণুবাহনকে শুনাইয়া গেল, "কিরে খগা, খুব দিগ্বিজয় করছিস যে!" এমনি করিয়া শেষে ছুটির দিন আসিয়া পড়িল। সেদিন আমাদের উৎসাহ যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিল, আমরা পর্দা ঘেরিয়া তক্তা ফেলিয়া মস্ত স্টেজ বাঁধিয়া ফেলিলাম। অভিনয় দেখিবার জন্য দুনিয়াসুদ্ধ লোককে খবর দেওয়া হইয়াছে, ছয়টা না বাজিতেই লোক আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা সকলে তাড়াহুড়া করিয়া পোশাক পরিতেছি, বিষ্ণু-বাহন ছুটাছুটি করিয়া ধমক-ধামক দিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া উপদেশ দিতেছে। দেখিতে দেখিতে সমস্ত যখন ঠিকঠাক হইল, তার পর ঘণ্টা দিতেই স্টেজের পর্দা সর্‌সর্‌ করিয়া উঠিয়া গেল, আর চারিদিকে খুব হাততালি পড়িতে লাগিল।

প্রথম দৃশ্যেই আছে, চন্দ্রদ্বীপ তাহার ভাই বজ্রদ্বীপের খোঁজে আসিয়া নিষাদরাজার দরজায় উপস্থিত হইয়াছেন এবং খুব আড়ম্বর করিয়া নিষাদরাজকে "আয় শত্রু আয়" বলিয়া যুদ্ধে ডাকিতেছেন। যখন তলোয়ার দিয়া দরজায় মারা হইবে তখন নিষাদের দল হুংকার দিয়া বাহির হইবে আর একটা ভয়ানক যুদ্ধ বাধিবে। দুঃখের বিষয়, বিষ্ণুবাহনের বক্তৃতাটা আরম্ভ না হইতেই সে অতিরিক্ত উৎসাহে ভুলিয়া খটাং করিয়া দরজায় হঠাৎ এক ঘা মারিয়া বসিল। আর কোথা যায়! অমনি নিষাদের দল 'মার্‌ মার্‌' করিয়া আমাদের এমন ভীষণ আক্রমণ করিল যে, নাটকে যদিও আমাদের জিতিবার কথা, তবু আমরা বক্তৃতা-টক্তৃতা ভুলিয়া যে যার মতো পিট্টান দিলাম। বাহিরে আসিয়া বিষ্ণুবাহন রাগে গজরাইতে লাগিল। আমরা বলিলাম, "আসল নাটকে কি আছে কেউ তো তা জানে না—নাহয়, চন্দ্রদ্বীপ হেরেই গেল।" কিন্তু বিষ্ণুবাহন কি সে কথা শোনে? সে লাফাইয়া ধমকাইয়া হাত-পা

নাড়িয়া শেষটায় নাটকের বইয়ের উপর এক কালির বোতল উলটাইয়া ফেলিল, এবং তাড়াতাড়ি রুমাল বাহির করিয়া কালি মুছিতে লাগিল। ততক্ষণে এদিকে দ্বিতীয় দৃশ্যের ঘণ্টা পড়িয়াছে।

বিষ্ণুবাহন ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া আবার আসরে নামিতে গিয়াই পা হড়্‌কাইয়া প্রকাণ্ড এক আছাড় খাইল। দেখিয়া লোকেরা কেহ হাসিল, কেহ 'আহা আহা' করিল, আর সব গোলমালের উপর সকলের চাইতে পরিষ্কার শোনা গেল ভুতোর চড়া গলার চীৎকার, "বাহবা বিষ্ণুবাহন।" বিষ্ণুবাহন বেচারা এমন অপ্রস্তুত হইয়া গেল যে সেখানে যাহা বলিবার তাহা বেমালুম ভুলিয়া, "সেনাপতি! এই কি সে রত্নগিরিপুর" বলিয়া একেবারে চতুর্থ দৃশ্যের কথা আরম্ভ করিল। আমি কানে কানে বলিলাম, "ওটা নয়", তাহাতে সে আরো ঘাবড়াইয়া গেল। তাহার মুখে দরদর করিয়া ঘাম দেখা দিল, সে কয়েকবার ঢোক গিলিয়া, তার পর রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে লাগিল। রুমালটি আগে হইতেই কালিমাখা হইয়াছিল, সুতরাং তাহার মুখখানার চেহারা এমন অপরূপ হইল, যে আমাদেরই হাসি চাপিয়া রাখা মুস্কিল হইল। ইহার উপর সে যখন ঐ চেহারা লইয়া, ভাঙা-ভাঙা গলায় "কোথায় পালাবে তারা শৃগালের প্রায়" বলিয়া বিকট আস্ফালন করিতে লাগিল, তখন ঘরসুদ্ধ লোক হাসিয়া গড়াগড়ি দিবার জোগাড় করিল। বিষ্ণুবাহন বেচারা কিছুই জানে না, সে ভাবিল, শ্রোতাদের কোথাও একটা কিছু ঘটিয়াছে, তাই সকলে হাসিতেছে। সুতরাং সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য আরো উৎসাহে হাত-পা ছুঁড়িয়া ভীষণ রকম তর্জন-গর্জন করিয়া স্টেজের উপর ঘুরিতে লাগিল। ইহাতেও হাসি ক্রমাগতই বাড়িতেছে দেখিয়া তাহার মনে কি যেন সন্দেহ হইল। সে হঠাৎ আমাদের দিকে ফিরিয়া দেখে আমরাও প্রাণপণে হাসিতেছি—এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই হাসিতেছি। তখন রাগে একেবারে দিগ্বিদিক ভুলিয়া সে তাহার 'তলোয়ার' দিয়া বিশুর পিঠে সপাং করিয়া এক বাড়ি মারিল। বিশু চন্দ্রদ্বীপের মন্ত্রী, তাহার মার খাইবার কথাই নয়, সুতরাং সে ছাড়িবে কেন? সে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া বিষ্ণুবাহনের গালে দুই চড় বসাইয়া দিল। তখন সেই স্টেজের উপরেই সকলের সামনে দুজনের মধ্যে একটা ভয়ানক হুড়াহুড়ি কিলাকিলি বাধিয়া গেল। প্রথমে, প্রায় সকলেই ভাবিয়াছিল ওটা অভিনয়ের লড়াই; সুতরাং অনেকে খুব হাততালি দিয়া উৎসাহ দিতে লাগিল। কিন্তু বিষ্ণুবাহন যখন দস্তুরমতো মার খাইয়া, "দেখুন দেখি স্যার, মিছিমিছি মারছে কেন" বলিয়া কাঁদ-কাঁদ গলায় হেডমাস্টার মহাশয়ের কাছে নালিশ জানাইতে লাগিল, তখন ব্যাপারখানা বুঝিতে আর কাহারও বাকি রহিল না।

ইহার পর, সেদিন যে আর অভিনয় হইতেই পারে নাই, এ কথা আর বুঝাইয়া বলিবার দরকার নাই। ছুটি হইবার তিনদিন পরেই বিষ্ণুবাহন তাহার মামারবাড়ি চলিয়া গেল। ঐ তিনদিন সে বাড়ি হইতে বাহির হয় নাই, কারণ তাহাকে দেখিলেই ছেলেরা চেঁচায়, "বিষ্ণুবাহনের দিগ্বিজয়!" ইস্কুলের গায়ে রাস্তার ধারে প্ল্যাকার্ড মারা 'বিষ্ণুবাহনের দিগ্বিজয়'—এমন-কি, বিষ্ণুবাহনের বাড়ির দরজায় খড়ি দিয়া বড়ো-বড়ো অক্ষরে লেখা—

'বিষ্ণুবাহনের দিগ্বিজয়'

সন্দেশ— ফাল্গুন, ১৩২৪

দাশুর কীর্তি

নবীনচাঁদ স্কুলে এসেই বলল, কাল তাকে ডাকাতে ধরেছিল। শুনে স্কুলসুদ্ধ সবাই হাঁ হাঁ করে ছুটে আসল। "ডাকাতে ধরেছিল ? বলিস কি রে ?" ডাকাত না তো কি ? বিকেলবেলায় সে জ্যোতিলালের বাড়িতে পড়তে গিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরবার সময়ে ডাকাতেরা তাকে ধরে, তার মাথায় চাঁটি মেরে, তার নতুন কেনা শখের পিরানটিতে কাদাজলের পিচকিরি দিয়ে গেল। আর যাবার সময় বলে গেল, "চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্—নইলে দড়াম্ করে তোর মাথা উড়িয়ে দেব।" তাই সে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে রাস্তার ধারে প্রায় বিশ মিনিট দাঁড়িয়েছিল ; এমন সময়ে তার বড়োমামা এসে তার কান ধরে বাড়িতে নিয়ে বললেন, "রাস্তায় সঙ সেজে এয়ার্কি করা হচ্ছিল ?" নবীনচাঁদ কাঁদ-কাঁদ গলায় বলে উঠল "আমি কি করব ? আমায় ডাকাতে ধরেছিল—" শুনে তার মামা প্রকাণ্ড এক চড় তুলে বললেন, "ফের জ্যাঠামি !" নবীনচাঁদ দেখল মামার সঙ্গে তর্ক করাই বৃথা—কারণ, সত্যিসত্যিই তাকে যে ডাকাতে ধরেছিল, এ কথা তার বাড়ির কাউকে বিশ্বাস করানো শক্ত ! সুতরাং তার মনের দুঃখ এতক্ষণ মনের মধ্যেই চাপা ছিল। স্কুলে এসে আমাদের কাছে বসতে না বসতেই সে দুঃখ একেবারে উথলিয়ে উঠল।

যাহোক, স্কুলে এসে তার দুঃখ বোধ হয় অনেকটা দূর হতে পেরেছিল, কারণ, স্কুলের অন্তত অর্ধেক ছেলে তার কথা শুনবার জন্য একেবারে ব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে পড়েছিল, এবং তার প্রত্যেকটি ঘামাচি, ফুসকুড়ি আর চুলকানির দাগটি পর্যন্ত তারা আগ্রহ করে ডাকাতির সুস্পষ্ট প্রমাণ বলে স্বীকার করেছিল। দুয়েকজন, যারা তার কনুয়ের আঁচড়টাকে পুরনো বলে সন্দেহ করেছিল, তারাও বলল যে হাঁটুর কাছে যে ছড়ে গেছে সেটা একেবারে টাটকা নতুন। কিন্তু তার পায়ের গোড়ালিতে যে ঘায়ের মতো ছিল সেটাকে দেখে কেষ্টা যখন বলল, "ওটা তো জুতোর ফোস্কা," তখন নবীনচাঁদ ভয়ানক চটে বলল, "যাও, তোমাদের কাছে আর কিচ্ছু বলব না !" কেষ্টাটার জন্য আমাদের আর কিছু শোনাই হল না।

ততক্ষণে দশটা বেজে গেছে, ঢং ঢং করে স্কুলের ঘণ্টা পড়ে গেল। সবাই যে যার ক্লাশে চলে গেলাম, এমন সময়ে দেখি পাগলা দাশু একগাল হাসি নিয়ে ক্লাশে ঢুকছে। আমরা বললাম, "শুনেছিস ? কাল নবুকে ডাকাতে ধরেছিল।" যেমন বলা, অমনি দাশরথি হঠাৎ হাত-পা ছেড়ে বইটই ফেলে খ্যাঃ খ্যাঃ খ্যাঃ খ্যাঃ করে হাসতে হাসতে একেবারে মেঝের ওপর বসে পড়ল ! পেটে হাত দিয়ে গড়াগড়ি করে, একবার চিত হয়ে, একবার উপুড় হয়ে, তার হাসি আর কিছুতেই থামে না। দেখে আমরা তো অবাক ! পণ্ডিতমশাই ক্লাশে এসেছেন, তখনো পুরোদমে তার হাসি চলছে। সবাই ভাবল, 'ছোঁড়াটা খেপে গেল নাকি ?' যা হোক, খুব খানিকটা হুটোপাটির পর সে ঠাণ্ডা হয়ে, বইটই গুটিয়ে বেঞ্চের ওপর উঠে বসল। পণ্ডিতমশাই বললেন, "ওরকম হাসছিলে কেন ?" দাশু নবীনচাঁদকে দেখিয়ে বলল, "ঐ ওকে দেখে।" পণ্ডিতমশাই খুব কড়ারকমের ধমক

লাগিয়ে তাকে ক্লাশের কোনায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন। কিন্তু পাগলার তাতেও লজ্জা নেই, সে সারাটি ঘণ্টা থেকে থেকে বই দিয়ে মুখ আড়াল করে ফিক্‌ফিক্ করে হাসতে লাগল।

টিফিনের ছুটির সময়ে নবু দাশুকে চেপে ধরল, "কিরে দেশো! বড়ো যে হাসতে শিখেছিস!" দাশু বলল, "হাসব না? তুমি কাল ধুচুনি মাথায় দেয়ি কিরকম নাচটা নেচেছিলে, সে তো আর তুমি নিজে দেখ নি? দেখলে বুঝতে কেমন মজা!" আমরা সবাই বললাম, "সে কিরকম? ধুচুনি মাথায় নাচছিল মানে?" দাশু বলল, "তাও জান না? ঐ কেষ্টা আর জগাই—ঐ যা! বলতে-না বারণ করেছিল!" আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "কি বলছিস ভালো করেই বল-না।" দাশু বলল, "কালকে শেঠেদের বাগানের পেছন দিয়ে নবু একলা একলা বাড়ি যাচ্ছিল, এমন সময়ে দুটো ছেলে—তাদের নাম বলতে বারণ—তারা দৌড়ে এসে নবুর মাথায় ধুচুনির মতো কি একটা চাপিয়ে তার গায়ের ওপর আচ্ছা করে পিচকিরি দিয়ে পালিয়ে গেল!" নবু ভয়ানক রেগে বলল, "তুই তখন কি করছিলি?" দাশু বলল, "তুমি তখন মাথার থলি খুলবার জন্য ব্যাঙের মতো হাত-পা ছুঁড়ে লাফাচ্ছিলে দেখে আমি বললাম, ফের নড়বি তো দড়াম্ করে মাথা উড়িয়ে দেব। তাই শুনে তুমি রাস্তার মধ্যে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে, তাই আমি তোমার বড়োমামাকে ডেকে আনলাম।" নবীনচাঁদের যেমন বাবুয়ানা, তেমনি তার দেমাক—সেইজন্য কেউ তাকে পছন্দ করত না, তার লাঞ্ছনার বর্ণনা শুনে সবাই বেশ খুশি হলাম। ব্রজলাল ছেলেমানুষ, সে ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বলল, "তবে যে নবীনদা বলছিল, তাকে ডাকাতে ধরেছে?" দাশু বলল, "দূর বোকা! কেষ্টা কি ডাকাত?" বলতে না বলতেই কেষ্টা সেখানে এসে হাজির। কেষ্টা আমাদের উপরের ক্লাশে পড়ে, তার গায়েও বেশ জোর আছে। নবীনচাঁদ তাকে দেখবামাত্র শিকারি বেড়ালের মতো ফুলে উঠল। কিন্তু মারামারি করতে সাহস পেল না, খানিকক্ষণ কট্‌মট্ করে তাকিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল। আমরা ভাবলাম গোলমাল মিটে গেল!

কিন্তু তার পরদিন ছুটির সময়ে দেখি, নবীন তার দাদা মোহনচাঁদকে নিয়ে হন্‌হন্ করে আমাদের দিকে আসছে। মোহনচাঁদ এনট্রান্স ক্লাশে পড়ে, সে আমাদের চাইতে

অনেক বড়ো, তাকে ওরকমভাবে আসতে দেখেই আমরা বুঝলাম এবার একটা কাণ্ড হবে। মোহন এসেই বলল, "কেষ্টা কই?" কেষ্টা দূর থেকে তাকে দেখেই কোথায় সরে পড়েছে, তাই তাকে আর পাওয়া গেল না। তখন নবীনচাঁদ বলল "ঐ দাশুটা সব জানে, ওকে জিজ্ঞেসা কর।" মোহন বলল, "কিহে ছোকরা, তুমি সব জান নাকি?" দাশু বলল, "না, সব আর জানব কোত্থেকে—এই তো সবে ফোর্থ ক্লাশে পড়ি, একটু ইংরিজি জানি, ভূগোল, বাংলা, জিওমেট্রি—" মোহনচাঁদ ধমক দিয়ে বলল, "সেদিন নবুকে যে কারা সব ঠেঙিয়েছিল, তুমি তার কিছু জান কি না?" দাশু বলল, "ঠ্যাঙায় নি তো—মেরেছিল, খুব আস্তে মেরেছিল।" মোহন একটুখানি ভেংচিয়ে বলল, "খুব আস্তে মেরেছে, না? কতখানি আস্তে শুনি তো?" দাশু বলল, "সে কিছুই না—ওরকম মারলে একটুও লাগে না।" মোহন আবার ব্যঙ্গ করে বলল, "তাই নাকি? কিরকম মারলে পরে লাগে?" দাশু খানিকটা মাথা চুলকিয়ে তার পর বললে, "ঐ সেবার হেডমাস্টার মশাই তোমায় যেমন বেত মেরেছিলেন সেইরকম।" এ কথায় মোহন ভয়ানক চটে দাশুর কান মলে দিয়ে চীৎকার করে বলল, "দ্যাখ বেয়াদব। ফের জ্যাঠামি করবি তো চাবকিয়ে লাল করে দেব। তুই সেখানে ছিলি কি না। আর কিরকম কি মেরেছিল সব খুলে বলবি কি না?"

জানই তো দাশুর মেজাজ কেমন পাগলাটেগোছের, সে একটুখানি কানে হাত বুলিয়ে তার পর হঠাৎ মোহনচাঁদকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে বসল। কিল, ঘুঁষি, চড়, আঁচড়, কামড়, সে এমনি চট্‌পট্‌ চালিয়ে গেল যে আমরা সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। মোহন বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবে নি যে ফোর্থ ক্লাশের একটা রোগাছেলে তাকে অমনভাবে তেড়ে আসতে সাহস পাবে—তাই সে একেবারে থতমত খেয়ে কেমন যেন লড়তেই পারল না। দাশু তাকে পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে মাটিতে চিৎপাত করে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "এর চাইতেও ঢের আস্তে মেরেছিল।" এনট্রান্স ক্লাশের কয়েকটি ছেলে সেখানে দাঁড়িয়েছিল। তারা যদি মোহনকে সামলে না ফেলত, তা হলে সেদিন তার হাত থেকে দাশুকে বাঁচানোই মুস্কিল হত।

পরে একদিন কেষ্টাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "হাঁরে, নবুকে সেদিন তোরা অমন করলি কেন?" কেষ্টা বলল, "ঐ দাশুটাই তো শিখিয়েছিল ওরকম করতে। আর বলেছিল, 'তা হলে এক সের জিলিপি পাবি'।" আমরা বললাম, "কই, আমাদের তো ভাগ দিলি নে?" কেষ্টা বলল, "সে কথা আর বলিস কেন? জিলিপি চাইতে গেলুম, হতভাগা বলে কিনা 'আমার কাছে কেন? ময়রার দোকানে যা, পয়সা ফেলে দে, যত চাস জিলিপি পাবি'।"

আচ্ছা, দাশু কি সত্যি সত্যি পাগল, না, কেবল মিচ্‌কেমি করে?

সন্দেশ—চৈত্র, ১৩২৪

কালাচাঁদের ছবি

কালাচাঁদ নিধিরামকে মারিয়াছে—তাই নিধিরাম হেডমাস্টার মহাশয়ের কাছে নালিশ করিয়াছে। হেডমাস্টার আসিয়া বলিলেন, "কি হে কালাচাঁদ, তুমি নিধিরামকে

মেরেছ?" কালাচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে না, মারব কেন? কান মলে দিয়েছিলাম, গালে খাম্‌চিয়ে দিয়েছিলাম, আর একটুখানি চুল ধরে ঝাঁকিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলাম।" হেডমাস্টার বলিলেন, "কেন ওরকম করেছিলে?" কালাচাঁদ খানিকটা আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া মাথা চুলকাইয়া বলিল, "আজ্ঞে, ও খালি খালি আমায় চটাচ্ছিল।" হেডমাস্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমায় মেরেছিল?" "না"। "তোমায় গাল দিয়েছিল?" "না।" "ধমকিয়েছিল?" "না।" "তবে?" "বার বার ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করে বোকার মতো কথা বলছিল, তাই আমার রাগ হয়ে গেল।" মাস্টারমহাশয় তাহার কান ধরিয়া বেশ ভালোরকম নাড়াচাড়া দিয়া বলিলেন, "মেজাজটা এখন হইতে একটু সংশোধন করিতে চেষ্টা কর।"

ছুটির পর আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁরে কালাচাঁদ, তুই খামখা ঐ নিধেটাকে মারতে গেলি কেন?" কালাচাঁদ বলিল, "খামখা মারব কেন? কেন মেরেছিলাম ওকেই জিজ্ঞেসা কর-না!" নিধেকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, "খামখা নয়তো কি? তুই বাপু ছবি এঁকেছিস—তার কথা আমায় জিজ্ঞাসা করতে গেলি কেন? আর যদি জিজ্ঞেস করলি, তা হলে তাই নিয়ে আবার মারামারি করতে এলি কেন?" আমরা বলিলাম, "আরে কি হয়েছে খুলেই বল্‌-না কেন।"

নিধিরাম বলিল, "কালাচাঁদ একটা ছবি এঁকেছে—ছবির নাম 'খাণ্ডবদাহন'। সেই ছবিটা আমায় দেখিয়ে ও জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন হয়েছে?' আমি বললাম, 'এটা কি এঁকেছ? মন্দিরের সামনে শেয়াল ছুটছে?' কালাচাঁদ বলল, 'না না মন্দির কোথায়? ওটা হল রথ। আর এগুলো তো শেয়াল নয়—রথের ঘোড়া।' আমি বললাম, 'সূর্যটাকে কালো করে এঁকেছ কেন? আর তালগাছের উপরে পদ্মফুল ফুটেছে কেন? আর ঐ চামচিকেটা লাঠি নিয়ে ডিগবাজি খাচ্ছে কেন?' কালাচাঁদ বলল, 'আহা তা কেন? ওটা তো সূর্য নয়, সুদর্শন চক্র! দেখছ না কৃষ্ণের হাতে রয়েছে? আর তালগাছ কোথায় দেখলে? ওটা তো অর্জুনের পতাকা! আর ঐগুলোকে বুঝি পদ্মফুল বলছ? ওগুলো দেবতা—খুব দূরে আছেন কিনা তাই ওরকম ছোটো-ছোটো দেখাচ্ছে। আর এইটা বুঝি চামচিকে হল—এটা তো গরুড় পাখি! একটা সাপকে তাড়া করেছে।' আমি বললাম, 'তা হবে! আমি ও-সব বুঝি-টুঝি না। আচ্ছা ঐ কালো কাপড় পরা মেয়েমানুষটি যে ওদের মারতে আসছে ওটি কে?' কালাচাঁদ বললে, 'তুমি তো আচ্ছা মুখ্যু হে! ওটা গাছে আগুন লেগে ধোঁয়া বেরুচ্ছে বুঝতে পাচ্ছ না? অবাক করলে যে!'

"তখন আমি বললাম, 'আচ্ছা এক কাজ কর-না কেন ভাই, ওটাকে খাণ্ডবদাহন না করে সীতার অগ্নিপরীক্ষা কর-না কেন? ঐ গাছটাকে শাড়ি পরিয়ে সীতা করে দাও। ঐ রথটার মাথায় জটা-টটা দিয়ে ওকে অগ্নিদেব বানাও! কৃষ্ণ অর্জুন আছেন, তাঁরা হবেন রাম লক্ষ্মণ। আর ঐ সুদর্শন চক্রে নাক হাত পা জুড়ে দিলেই ঠিক বিভীষণ হয়ে যাবে। তার পর চামচিকের পিছনে একটা লম্বা ল্যাজ দিয়ে তার ডানাদুটো মুছে দাও—ওটা হনুমান হবে এখন।' কালাচাঁদ বলল, 'হনুমানও হতে পারে, নিধিরামও হতে পারে।'

"আমি বললাম, 'তা হলে ভাই আর-এক কাজ কর। ওটাকে শিশুপাল বধ করে দাও। তা হলে কৃষ্ণকে বদলাতে হবে না। চক্র তুলে শিশুপালকে মারতে যাচ্ছে।

অর্জুনের মুখে পাকা গোঁফদাড়ি দিয়ে খুব সহজেই ভীষ্ম করে দেওয়া যাবে। আর রথটা হবে সিংহাসন, তার উপর যধিষ্ঠিরকে বসিয়ে দিয়ো। আর ঐ যে গরুড় আর সাপ, ঐটে একটু বদলিয়ে দিলেই গদা হাতে ভীম হয়ে যাবে। আর শিশুপাল তো আছেই— ঐ গাছটাতে একটু নাক মুখ ফুটিয়ে দিলেই হবে। তার পর রাজসূয় যজ্ঞের কয়েকটা রাজাকে দেখালেই- ব্যস!' কথাটা কালাচাঁদের পছন্দ হল না, তাই আমি অনেক ভেবেচিন্তে আবার বললাম, 'তা হলে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ কর-না কেন? ঐ রথটা হবে জনমেজয় আর কৃষ্ণকে জটা দাড়ি দিয়ে পুরুতঠাকুর বানিয়ে দাও। সুদর্শন চক্রটা হবে ঘিয়ের ভাঁড়। যজ্ঞের আগুনের মধ্যে তিনি ঘি ঢালছেন। ঐ ধোঁয়াগুলো মনে কর যজ্ঞেরই ধোঁয়া। একটা সাপ আছে, আরো কয়েকটা এঁকে দিও। আর অর্জুনকে কর আস্তীক—সে হাত তুলে তক্ষককে বলছে, 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ!' আর ঐ চামচিকেটা—মানে গরুড়টা—ওটাকে মুনিটুনি কিছু একটা বানিয়ে দিয়ো!' পতাকাটাকে কিরকম করতে হবে সেইটা বলতে যাচ্ছি, এমন সময় কালাচাঁদ আমায় এক ধাক্কা দিয়ে বলল, 'থাক থাক আর তোমার বিদ্যে জাহির করে কাজ নেই। সর দেখি!'

"আমি বললাম, 'তা অত রাগ কর কেন ভাই? আমি তো আর বলছি না যে আমার পরামর্শমতো তোমাকে চলতেই হবে। পছন্দ হয় কোরো, না হয় কোরো না—ব্যস্। এর মধ্যে আবার রাগারাগি কর কেন? আমার কথামতো না করে অন্য-একটা কিছু কর-না। মনে কর, ওটাকে সমুদ্রমন্থন করে দিলেও তো হয়। ঐ ধোঁয়াওয়ালা বড়ো গাছটা মন্দরপর্বত, রথটা ধন্বন্তরী কিম্বা লক্ষ্মী—মন্থন থেকে উঠে এসেছেন। ওদিকে সুদর্শন চক্রটা চাঁদ হতে পারবে। অর্জুনের পেছনে কতগুলো দেবতা এঁকে দাও আর এদিকে কৃষ্ণ আর চামচিকের দিকে কতগুলা অসুর—' কথাটা ভালো করে বলতে না বলতেই কালাচাঁদ আমার কান ধরে মারতে লাগল। আচ্ছা দেখ দেখি কি অন্যায়! আমি বন্ধুভাবে দুটো পরামর্শ দিতে গেলাম—তা তোমার পছন্দ হয় নি বলেই আমায় মারবে? যা বলেছি সব শুনলে তো, এর মধ্যে এত রাগ করবার কি হল বাপু?"

বাস্তবিক, কালাচাঁদের এ বড়ো অন্যায়—সে রাগ করিল কিসের জন্য। নিধিরাম তাহাকে মারে নাই, ধরে নাই, বকে নাই, গাল দেয় নাই, চোখ রাঙায় নাই, মুখ ভ্যাংচায় নাই—তবে তার রাগ করিবার কারণটা কি?

ব্যাপারটা কি বোঝা গেল না, তাই সন্ধ্যায় সবাই মিলিয়া কালাচাঁদের বাড়িতে গেলাম! আমি বলিলাম, "ভাই কালাচাঁদ, আমরা তোমার সেই ছবিটা দেখতে চাই। সেই যে সমুদ্র লঙ্ঘন না কি যেন?" রমাপ্রসাদ বলিল, "দ্যুৎ, সমুদ্র লঙ্ঘন কিসের? অগ্নি পরীক্ষা।" আর একজন কে যেন বলিল, "না না কি একটা বধ।" কেন জানি না, কালাচাঁদ হাঁ হাঁ করিয়া একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। "যাও যাও ইয়াকি করতে হবে না" বলিয়া সে তাহার ছবির খাতাখানি ফড়্ফড়্ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল—আর রাগে গজরাইতে লাগিল। আমরা হতভম্ব হইয়া রহিলাম। সকলেই বলিলাম, "কালাচাঁদের মাথায় বোধ হয় একটু পাগলামির ছিট আছে। নইলে সে খামখা এত রাগ করে কেন?"

সন্দেশ—আষাঢ়, ১৩২৫

ভোলানাথের সর্দারি

সকল বিষয়েই সর্দারি করিতে যাওয়া ভোলানাথের ভারি একটা বদঅভ্যাস। যেখানে তাহার কিছু বলিবার দরকার নাই সেখানে সে বিজ্ঞের মতো উপদেশ দিতে যায়; যে কাজের সে কিছুমাত্র বোঝে না, সেই কাজেও সে চট্‌পট্ হাত লাগাইতে ছাড়ে না। এইজন্য গুরুজনেরা তাহাকে বলেন 'জ্যাঠা'—আর সমবয়সীরা বলে 'ফড়্‌ফড়িরাম'। কিন্তু তাহাতে তাহার কোনো দুঃখ নাই, বিশেষ লজ্জাও নাই। সেদিন তাহার তিন ক্লাশ উপরের বড়ো-বড়ো ছেলেরা যখন নিজেদের পড়াশুনা লইয়া আলোচনা করিতেছিল, তখন ভোলানাথ মুরুব্বির মতো গম্ভীর হইয়া বলিল, "ওয়েবস্টারের ডিকশনারি সবচাইতে ভালো। আমার বড়্‌দাদা যে দু-ভলুম ওয়েবস্টারের ডিকশনারি কিনেছেন, তার এক-একখানা বই এ-ত্তোখানি বড়ো আর এ-ম্-নি মোটা! আর লাল চামড়া দিয়ে বাঁধানো!" উঁচু ক্লাশের একজন ছাত্র আচ্ছা করিয়া তাহার কান মলিয়া বলিল, "কিরকম লাল হে? তোমার এই কানের মতো?" কিন্তু তবু, ভোলানাথ এমন বেহায়া, সে তার পরদিনই সেই তাহাদেরই কাছে ফুটবল সম্বন্ধে কি যেন মতামত দিতে গিয়া এক চড় খাইয়া আসিল।

বিশুদের একটা ইঁদুর ধরিবার কল ছিল। ভোলানাথ হঠাৎ একদিন, "এটা কিসের কল ভাই" বলিয়া খামখা সেটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া কলকব্‌জা এমন বিগড়াইয়া দিল যে কলটা একেবারেই নষ্ট হইয়া গেল। বিশু বলিল, "না জেনেশুনে কেন টানাটানি করতে গেলি?" ভোলানাথ কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া বলিল, "আমার দোষ হল বুঝি? দেখ তো, হাতলটা কিরকম বিচ্ছিরি বানিয়েছে। ওটা আরো অনেক মজবুত কর্‌া উচিত ছিল। কলওয়ালা ভয়ানক ঠকিয়েছে।"

ভোলানাথ পড়াশুনায় যে খুব ভালো ছিল তাহা নয়, কিন্তু তবু, মাস্টারমহাশয় যখন কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন সে জানুক আর না জানুক, তাড়াতাড়ি সকলের আগে জবাব দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিত। জবাবটা অনেক সময়েই বোকার মতো হইত, শুনিয়া মাস্টারমহাশয় ঠাট্টা করিতেন, ছেলেরা হাসিত, কিন্তু ভোলানাথের উৎসাহ তাহাতে কমিত না।

সেই যেবারে ইস্কুলে বই চুরির হাঙ্গামা হয় সেবারও সে এইরকম সর্দারি করিতে গিয়া খুব জব্দ হয়। হেডমাস্টার মহাশয় ক্রমাগত বই চুরির নালিশে বিরক্ত হইয়া একদিন প্রত্যেক ক্লাশে ক্লাশে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে চুরি করিতেছে তোমরা কেউ কিছু জান?" ভোলানাথের ক্লাশে এই প্রশ্ন করিবামাত্র ভোলানাথ তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আমার বোধ হয় হরিদাস চুরি করে!" জবাব শুনিয়া আমরা সবাই অবাক হইয়া গেলাম, হেডমাস্টার মহাশয় বলিলেন, "কি করে জানলে যে হরিদাস চুরি করে?" ভোলানাথ অম্লানবদনে বলিল, না, জানি নে—কিন্তু আমার মনে হয়।" মাস্টারমহাশয় ধমক দিয়া বলিলেন, "জান না, তবে অমন কথা বললে কেন? ওরকম মনে করবার তোমার কি কারণ আছে।"

ভোলানাথ আবার বলিল, "আমার মনে হচ্ছিল, বোধ হয় ও নেয়—তাই তো বললাম। আর তো কিছু আমি বলি নি।" মাস্টারমহাশয় গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "যাও, হরিদাসের কাছে ক্ষমা চাও।" তখনই ভোলানাথের কান ধরিয়া হরিদাসের কাছে ক্ষমা চাওয়ানো হইল। কিন্তু তবু কি তাহার চেতনা হয় ?

ভোলানাথ সাঁতার জানে না, কিন্তু তবু সে বাহাদুরি করিয়া হরিশের ভাইকে সাঁতার শিখাইতে গেল ! রামবাবু হঠাৎ ঘাটে আসিয়া পড়েন তাই রক্ষা। তা না হইলে দুজনকেই সেদিন ঘোষ পুকুরে ডুবিয়া মরিতে হইত। কলিকাতায় মামার নিষেধ না শুনিয়া চলতি ট্রাম হইতে নামিতে গিয়া ভোলানাথ কাদার উপর যে আছাড় খাইয়াছিল, তিনমাস পর্যন্ত তাহার আঁচড়ের দাগ তাহার নাকের উপর ছিল। আর বেদেরা শেয়াল ধরিবার জন্য যেবার ফাঁদ পাতিয়া রাখে, সেবার সেই ফাঁদ ঘাঁটিতে গিয়া ভোলানাথ কিরকম আটকা পড়িয়াছিল, সে কথা ভাবিলে আজও আমাদের হাসি পায়। কিন্তু সবচাইতে যেবার সে জব্দ হইয়াছিল সেবারের কথা বলি শোন।

আমাদের স্কুলে আসিতে হইলে কলেজবাড়ির পাশ দিয়া আসিতে হয়। সেখানে একটা ঘর আছে তাহাকে বলে লেবরেটরি। সে ঘরে নানারকম অদ্ভুত কলকারখানা থাকিত। ভোলানাথের সবটাতেই বাড়াবাড়ি, সে একদিন একেবারে কলেজের ভিতরে গিয়া দেখিল, একটা কলের চাকা ঘুরানো হইতেছে আর কলের একদিকে চড়াক্ চড়াক্ করিয়া বিদ্যুতের মতো ঝিলিক জ্বলিতেছে। দেখিয়া ভোলানাথের ভারি শখ হইল, সেও একবার কল ঘুরাইয়া দেখে। কিন্তু কলের কাছে যাওয়ামাত্র কে একজন তাহাকে এমন ধমক দিয়া উঠিল, যে ভয়ে এক দৌড়ে সে ইস্কুলে আসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। কিন্তু কলটা একবার নাড়িয়া দেখিবার ইচ্ছাটা তাহার কিছুতেই গেল না।

একদিন বিকালে যখন সকলে বাড়ি যাইতেছি, তখন ভোলানাথ যে কোন সময়ে কলেজবাড়িতে ঢুকিল তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই : সে চপিচুপি কলেজবাড়ির লেবরেটরি বা যন্ত্রখানায় ঢুকিয়া অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখে ঘরে কেউ নাই, তখনই ভরসা করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া সে কলকব্জা দেখিতে লাগিল। সেইদিনের সেই কলটা আলমারির আড়ালে উঁচু তাকের উপর তোলা রহিয়াছে, সেখানে তাহার হাত যায় না। অনেক কষ্টে সে টেবিলের পিছন হইতে একখানা বড়ো চৌকি লইয়া আসিল। এদিকে কখন যে কলেজের কর্মচারী চাবি দিয়া ঘরের তালা আঁটিয়া চলিয়া গেল, সেও ভোলানাথকে দেখে নাই, ভোলানাথেরও সেদিকে চোখ নাই। চৌকির উপর দাঁড়াইয়া ভোলানাথ দেখিল কলটার কাছে একটা অদ্ভুত বোতল ; সেটা যে বিদ্যুতের বোতল ভোলানাথ তাহা জানে না। সে বোতলটাকে ধরিয়া সরাইয়া রাখিতে গেল। অমনি বোতলের বিদ্যুৎ হঠাৎ তাহার শরীরের ভিতর দিয়া ছুটিয়া গেল, মনে হইল যেন তাহার হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কিসের একটা ধাক্কা বাজিয়া উঠিল, সে মাথা ঘুরিয়া চৌকি হইতে পড়িয়া গেল।

বিদ্যুতের ধাক্কা খাইয়া ভোলানাথ খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিল। তার পর ব্যস্ত হইয়া পলাইতে গিয়া দেখে দরজা বন্ধ। অনেকক্ষণ দরজায় ধাক্কা দিয়া, কিল, ঘুঁষি,

লাথি, মারিয়াও দরজা খুলিল না। জানলাগুলি অনেক উঁচুতে, আর বাহির হইতে বন্ধ করা—চৌকিতে উঠিয়াও নাগাল পাওয়া গেল না। ভোলানাথের কপালে দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। সে ভাবিল প্রাণপণে চীৎকার করা যাক—যদি কেউ শুনিতে পায়। কিন্তু তাহার গলার স্বর এমন বিকৃত শুনাইল আর মস্ত ঘরটাতে এমন অদ্ভুত প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল, যে নিজের আওয়াজে নিজেই সে ভয় পাইয়া গেল। ওদিকে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। কলেজের বটগাছটির উপর হইতে একটা প্যাঁচা হঠাৎ 'ভুত-ভুতুম-ভুত' বলিয়া বিকটশব্দে ডাকিয়া উঠিল। সেই শব্দে একেবারে দাঁতে দাঁত লাগিয়া ভোলানাথ এক চীৎকারেই অজ্ঞান!

কলেজের দরোয়ান তখন আমাদের ইস্কুলের পাঁড়েজি আর দু-চারটি দেশভাইয়ের সঙ্গে জুটিয়া মহা উৎসাহে, 'হাঁ হাঁ রে কাঁহা গয়ো রাম' বলিয়া ঢোল করতাল পিটাইতে ছিল, কোনোরূপ চীৎকার শুনিতে পায় নাই। রাত-দুপুর পর্যন্ত তাহাদের কীর্তনের হল্লা চলিল; সুতরাং জ্ঞান হইবার পর ভোলানাথ যখন দরজায় দুম্‌দুম্ লাথি মারিয়া চেঁচাইতে-ছিল, তখন সে শব্দ গানের ফাঁকে ফাঁকে তাহাদের কানে একটু আধটু আসিলেও তাহারা গ্রাহ্য করে নাই। পাঁড়েজি একবার খালি বলিয়াছিল, কিসের শব্দ একবার খোঁজ লওয়া যাক—তখন অন্যেরা বাধা দিয়া বলিয়াছিল, "আরে, চিল্লানে দেও।" এমনি করিয়া রাত বারোটার সময় যখন তাহাদের উৎসাহ ঝিমাইয়া আসিল, তখন ভোলানাথের বাড়ির লোকেরা লণ্ঠন হাতে হাজির হইল। তাহারা বাড়ি-বাড়ি ঘুরিয়া কোথাও তাহাকে আর খুঁজিতে বাকি রাখে নাই। দরোয়ানদের জিজ্ঞাসা করায় তাহারা একবাক্যে বলিল, 'ইস্কুলবাবুদের' কাহাকেও তাহারা দেখে নাই। এমন সময় সেই দুম্‌দুম্ শব্দ আর চীৎকার আবার শোনা গেল।

তার পর ভোলানাথের সন্ধান পাইতে আর বেশি দেরি হইল না! কিন্তু তখনো উদ্ধার নাই—দরজা বন্ধ, চাবি গোপালবাবুর কাছে, গোপালবাবু বাসায় নাই, ভাইঝির বিবাহে গিয়াছেন, সোমবার আসিবেন! তখন অগত্যা মই আনাইয়া, জানলা খুলিয়া, শার্শীর কাঁচ ভাঙিয়া, অনেক হাঙ্গামার পর ভয়ে মৃতপ্রায় ভোলানাথকে বাহির করা হইল। সে ওখানে কি করিতেছিল, কেন আসিয়াছিল, কেমন করিয়া আটকা পড়িল, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাহার বাবা প্রকাণ্ড একচড় তুলিতেছিলেন, কিন্তু ভোলানাথের ফ্যাকাশে মুখখানা দেখিবার পর সে চড় আর তাহার গালে নামে নাই।

নানাজনে জেরা করিয়া তাহার কাছে যে-সমস্ত কথা আদায় করিয়াছেন, তাহা শুনিয়াই আমরা তাহার আটকা পড়িবার বর্ণনাটা দিলাম। সে কিন্তু আমাদের কাছে এত কথা কবুল করে নাই। আমাদের সে আরো উলটা বুঝাইতে চাহিয়াছিল যে, সে ইচ্ছা করিয়াই বাহাদুরির জন্য কলেজবাড়িতে রাত কাটাইবার চেষ্টায় ছিল! যখন সে দেখিল যে তাহার সে কথা কেহ বিশ্বাস করে না, বরং আসল কথাটা ক্রমেই ফাঁস হইয়া পড়িতেছে, তখন সে এমন মুষড়াইয়া গেল যে অন্তত মাস তিনেকের জন্য তাহার সর্দারির অভ্যাসটা বেশ একটু দমিয়া পড়িয়াছিল।

সন্দেশ—চৈত্র, ১৩২৫

ব্যোমকেশের মাঞ্জা

"টোকিও, কিয়োটো, নাগাসাকি, য়োকোহামা"—বোর্ডের ওপর প্রকাণ্ড ম্যাপ ঝুলিয়ে হারাণচন্দ্র জাপানের প্রধান নগরগুলি দেখিয়ে যাচ্ছে। এর পরেই ব্যোমকেশের পালা, কিন্তু ব্যোমকেশের সে খেয়ালই নেই। কাল বিকেলে ডাক্তারবাবুর ছোট্টো ছেলেটার সঙ্গে প্যাঁচ খেলতে গিয়ে তার দুটো দুটো ঘুড়ি কাটা গিয়েছিল, সে কথাটা ব্যোমকেশ কিছুতেই আর ভুলতে পারছে না। তাই সে বসে বসে সুতোর জন্যে কড়ারকমের একটা মাঞ্জা তৈরির উপায় চিন্তা করছে। চীনে শিরিস গালিয়ে তার মধ্যে বোতলচুর আর কড়্‌কড়ে ক্রমেরি পাউডার মিশিয়ে সুতোয় মাখালে পর কিরকম চমৎকার মাঞ্জা হবে, সেই কথা ভাবতে ভাবতে উৎসাহে তার দুইচোখ কড়িকাঠের দিকে গোল হয়ে উঠছে। মনে মনে মাঞ্জা দেওয়া ঘুড়ির সুতোটা সবে তালগাছের আগা পর্যন্ত উঠে আশ্চর্য কায়দায় ডাক্তারের ছেলের ঘুড়িটাকে কাটতে যাচ্ছে এমন সময়ে গম্ভীর গলায় ডাক পড়ল, "তার পর, ব্যোমকেশ এস দেখি।"

ঐরকম ভীষণ উত্তেজনার মধ্যে সুতো, মাঞ্জা, ঘুড়ির প্যাঁচ সব ফেলে আকাশের উপর থেকে ব্যোমকেশকে হঠাৎ নেমে আসতে হল একেবারে চীনদেশের মধ্যিখানে। একে তো ও দেশটার সঙ্গে তার পরিচয় খুব বেশি ছিল না, তার উপর যাও দু-একটা চীনদেশী নাম সে জানত, ওরকম হঠাৎ নেমে আসবার দরুন সেগুলোও তার মাথার মধ্যে কেমন বিচ্ছিরিরকম ঘণ্ট পাকিয়ে গেল। পাহাড়, নদী, দেশ, উপদেশের মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতে বেচারা বেমালুম পথ হারিয়ে ফেলল। তার কেবলই মনে হতে লাগল যে চীনদেশের চীনে শিরিস, তাই দিয়ে হয় মাঞ্জা। মাস্টারমশাই দুই-দুইবার তাড়া দিয়ে যখন তৃতীয়বার চড়া গলায় বললেন, "চীনদেশের নদী দেখাও," তখন বেচারা একেবারেই দিশেহারা আর মরিয়া মতন হয়ে বলল, "সাংহাই।" সাংহাই বলবার আর কোনো কারণ ছিল না, বোধ হয় তার সেজোমামার যে স্ট্যাম্প সংগ্রহের খাতা আছে তার মধ্যে ঐ নামটাকে সে পেয়ে থাকবে--বিপদের ধাক্কায় হঠাৎ কেমন করে ঐটেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

গোটা দুই চড়চাপড়ের পর ব্যোমকেশবাবু তার কানের উপর মাস্টারমশায়ের প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে, বিনা আপত্তিতে বেঞ্চের উপর আরোহণ করলেন। কিন্তু কানদুটো জুড়োতে না জুড়োতেই মনটা তার সেই হারানো ঘুড়ির পেছনে উধাও হয়ে আবার সুতোর মাঞ্জা তৈরি করতে বসল। সারাটা দিন বকুনি খেয়েই তার সময় কাটল, কিন্তু এর মধ্যে কত উঁচুদরের মাঞ্জা দেওয়া সুতো তৈরি হল আর কত যে ঘুড়ি গণ্ডায় গণ্ডায় কাটা পড়ল সে কেবল ব্যোমকেশই জানে।

বিকেলবেলায় সবাই যখন বাড়ি ফিরছে, তখন ব্যোমকেশ দেখলে, ডাক্তারের ছেলেটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মস্ত একটা লাল রঙের ঘুড়ি কিনছে। দেখে ব্যোমকেশ তার

মন্টু পাঁচকড়িকে বলল, "দেখেছিস, পাঁচু, আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে আবার ঘুড়ি কেনা হচ্ছে! এ-সব কিন্তু নেহাত বাড়াবাড়ি। নাহয় দুটো ঘুড়িই কেটেছিস বাপু, তার জন্যে এত কি গিরিঙ্গাড়ি!" এই বলে সে পাঁচুর কাছে তার মাঞ্জা তৈরির মতলবটা খুলে বলল। শুনে পাঁচু গম্ভীর হয়ে বলল, "তা যদি বলিস, তুই আর মাঞ্জা তৈরি করে ওদের সঙ্গে পারবি ভেবেছিস? ওরা হল ডাক্তারের ছেলে, নানারকম ওষুধমসলা জানে। এই তো সেদিন ওর দাদাকে দেখলাম, শানের ওপর কি একটা আরক ঢেলে দিল আর ভস্‌ভস্‌ করে গ্যাঁজালের মতো তেজ বেরতে লাগল। ওরা যদি মাঞ্জা বানায়, তা হলে কারও মাঞ্জার সাধ্যি নেই যে তার সঙ্গে পেরে ওঠে!" শুনে ব্যোমকেশের মনটা কেমন দমে গেল। তার ধ্রুবরকম বিশ্বাস হল যে ডাক্তারের ছেলেটা নিশ্চয় কোনো আশ্চর্যরকম মাঞ্জার খবর জানে। তা নইলে ব্যোমকেশের চাইতেও চারবছরের ছোটো হয়ে সে কেমন করে তার ঘুড়ি কাটল? ব্যোমকেশ স্থির করল, যেমন করে হোক ওদের বাড়ির মাঞ্জা খানিকটা জোগাড় করতেই হবে। সেটা একবার আদায় করতে পারলে তার পর সে ডাক্তারের ছেলেকে দেখে নেবে।

বাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি জলখাবার সেরে নিয়েই ব্যোমকেশ দৌড়ে গেল ডাক্তারবাবুর ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করতে। সেখানে গিয়ে সে দেখে কি, কোণের বারান্দায় বসে, সেই ছোট্টো ছেলেটা একটা ডাক্তারি খলের মধ্যে কি যেন মসলা ঘুঁটছে। ব্যোমকেশকে দেখেই সে একটা চৌকির তলায় সব লুকিয়ে ফেলে সেখান থেকে সরে পড়ল। ব্যোমকেশ মনে মনে বলল, 'বাপু হে! এখন আর লুকিয়ে করবে কি? তোমার আসল খবর আমি টের পেয়েছি' এই বলে সে এদিক-ওদিকে তাকিয়ে দেখল, কোথাও কেউ নেই। একবার সে ভাবল, কেউ আসলে এর একটুখানি চেয়ে নেব। আবার মনে হল, কি জানি, চাইলে যদি না দেয়? তার পর ভাবল, দূর! ভারি তো জিনিস তা আবার চাইবার দরকার কি? এই এতটুকু মাঞ্জা হলেই প্রায় দুশোগজ সুতোয় শান দেওয়া হবে। এই ভেবে সে চৌকির তলা থেকে এক খাবল মসলা তুলে নিয়েই এক দৌড়ে বাড়ি এসে হাজির।

আর কি তখন দেরি সয়? দেখতে দেখতে দক্ষিণের বারান্দা জুড়ে সুতো খাটিয়ে মহা উৎসাহে তার মাঞ্জা দেওয়া শুরু হল। যাই বল, মাঞ্জাটা কিন্তু ভারি অদ্ভুত— কই, তেমন কড়্‌কড়্‌ করছে না তো! বোধ হয় খুব মিহি গুঁড়োর তৈরি—আর কালো কাঁচের গুঁড়ো। দুঃখের বিষয়, বেচারার কাজটা শেষ না হতেই সন্ধে হয়ে এল, আর তার বড়দা এসে বললে, "যা, যা! আর সুতো পাকাতে হবে না, এখন পড়্‌গে যা।"

সে রাত্তিরে ব্যোমকেশের ভালো করে ঘুমই হল না। সে স্বপ্ন দেখল যে, ডাক্তারের ছেলেটা হিংসে করে তার চমৎকার সুতোয় জল ফেলে সব নষ্ট করে দিয়েছে। সকাল হতে না হতেই ব্যোমকেশ দৌড়ে গেল তার সুতোর খবর নিতে। কিন্তু গিয়েই দেখে কে এক বুড়ো ভদ্রলোক ঠিক বারান্দার দরজার সামনে বসে তার দাদার সঙ্গে গল্প করছেন, তামাক খাচ্ছেন। ব্যোমকেশ ভাবল, 'দেখ তো কি অন্যায়! এর মধ্যে থেকে এখন সুতোটা আনি কেমন করে?' যা হোক, খানিকক্ষণ ইতস্তত করে সে খুব সাহসের সঙ্গে গিয়ে চট্‌ করে তার সুতো খুলে নিয়ে চলে আসছে—এমন সময়ে, হঠাৎ কাশতে গিয়ে বুড়ো লোকটির

কলকে থেকে খানিকটা টিকে গেল মাটিতে পড়ে। বৃদ্ধ তখন ব্যস্ত হয়ে হাতের কাছে কিছু না পেয়ে, ব্যোমকেশের সেই মাঞ্জা মাখনো কাগজটা দিয়ে টিকেটাকে তুলতে গেলেন।

সর্বনাশ! যেমন টিকের ওপর কাগজ ছোঁয়ানো, অমনি কিনা ভস্‌ভস্‌ করে কাগজ জ্বলে উঠে ভদ্রলোকের আঙুল-টাঙুল পুড়ে, বারান্দার বেড়ায় আগুন-টাগুন লেগে এক হুলুস্থূল কাণ্ড! অনেক চেঁচামেচি, ছুটোছুটি আর জল ঢালাঢালির পর যখন আগুনটুকু নিভে এল, আর ভদ্রলোকের আঙুলের ফোস্কায় মলম দেওয়া হল, তখন তার দাদা এসে তার কান ধরে বললেন, "হতভাগা! কি রেখেছিলি কাগজের মধ্যে বল তো?" ব্যোমকেশ কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে, "কিচ্ছু তো রাখি নি, খালি সুতোর মাঞ্জা রেখেছিলাম।" দাদা তার কৈফিয়তটা নিতান্তই আজগুবি মনে করে, "আবার এয়াকি হচ্ছে?" বলে বেশ দু-চার ঘা কষিয়ে দিলেন। বেচারা ব্যোমকেশ এই বলে তার মনকে খুব খানিক সান্ত্বনা দিল যে, আর যাই হোক, তার সুতোটুকু রক্ষা পেয়েছে। ভাগ্যিস সে সময়মতো খুলে এনেছিল, নইলে তার সুতোও যেত, পরিশ্রমও নষ্ট হত।

বিকেলে সে বাড়ি এসেই চট্‌পট্‌ ঘুড়ি আর লাটাই নিয়ে ছাতের উপর উঠল। মনে মনে বলল, 'ডাক্তারের পো আজ একবার আসুক-না, দেখিয়ে দেব প্যাঁচ খেলাটা কাকে-বলে।' এমন সময়ে পাঁচকড়ি এসে বড়ো-বড়ো চোখ করে বলল, "শুনেছিস?" ব্যোমকেশ বললে, "না—কি হয়েছে?" পাঁচু বললে, "ওদের সেই ছেলেটাকে দেখে এলুম, সে নিজে নিজে দেশলাইয়ের মসলা বানিয়েছে, আর চমৎকার লাল নীল দেশলাই তৈরি করেছে।" ব্যোমকেশ হঠাৎ লাটাই-টাটাই রেখে, এত বড়ো হাঁ করে জিজ্ঞেস করল, "দেশলাই কিরে! মাঞ্জা বল?" শুনে পাঁচু বেজায় চটে গেল, "বলছি লাল নীল আলো জ্বলছে, তবু বলবে মাঞ্জা, আচ্ছা গাধা যা হোক!"

ব্যোমকেশ কোনো জবাব না দিয়ে, দেশলাইয়ের মসলা মাখানো সুতোটার দিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে রইল। সেই সময়ে ডাক্তারদের বাড়ি থেকে লাল রঙের ঘুড়ি উড়ে এসে ঠিক ব্যোমকেশের মাথার উপরে ফর্‌ফর্‌ করে তাকে যেন ঠাট্টা করতে লাগল। তখন সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল, বলল, "আমার অসুখ করেছে।"

সন্দেশ—চৈত্র, ১৩২৬

আজব সাজা

"পণ্ডিতমশাই, ভোলা আমায় ভ্যাংচাচ্ছে।" "না, পণ্ডিতমশাই, আমি কান চুলকোচ্ছিলাম তাই মুখ বাঁকা মতন দেখাচ্ছিল!" পণ্ডিতমশাই চোখ না খুলিয়াই অত্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন, "আঃ! কেবল বাঁদরামি! দাঁড়িয়ে থাক।" আধ মিনিট পর্যন্ত সব চুপচাপ। তার পরই আবার শোনা গেল, "দাঁড়াচ্ছিস না যে?" "আমি দাঁড়াব কেন? তোকেই তো দাঁড়াতে বলল।" "যাঃ আমায় বলেছে না আর কিছু! গণ্‌শাকে জিজ্ঞেস কর। কিরে গণ্‌শা, ওকে দাঁড়াতে বলেছে না?" গণেশের বুদ্ধি কিছু মোটা, সে আস্তে আস্তে উঠিয়া গিয়া পণ্ডিত-

মহাশয়কে ডাকিতে লাগিল, "পণ্ডিতমশাই! ও পণ্ডিতমশাই!" পণ্ডিতমশাই বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি বলছিস, বল-না।" গণেশচন্দ্র অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে দাঁড়াতে বলেছেন পণ্ডিতমশাই?" পণ্ডিতমহাশয় এক মুহূর্ত কট্‌মটে চোখ মেলিয়াই সাংঘাতিক ধমক দিয়া বলিলেন, "তোকে বলেছি, দাঁড়া!" বলিয়াই আবার চোখ বুজিলেন।

গণেশচন্দ্র দাঁড়াইয়া রহিল। আবার মিনিটখানেক সব চুপচাপ। হঠাৎ ভোলা বলিল, "ওকে এক পায়ে দাঁড়াতে বলেছিল না ভাই?" গণেশ বলিল, "কক্ষনো না, খালি দাঁড়া বলেছে।" বিশু বলিল, "এক আঙুল তুলে দেখিয়েছিল, তার মানেই এক পায়ে দাঁড়া।" পণ্ডিতমশাই যে ধমক দিবার সময়ে তর্জনী তুলিয়াছিলেন, এ কথা গণেশ অস্বীকার করিতে পারিল না। বিশু আর ভোলা জেদ করিতে লাগিল, "শিগ্‌গির এক পায়ে দাঁড়া বলছি, তা না হলে এক্ষুনি বলে দিচ্ছি।"

গণেশ বেচারা ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি এক পা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অমনি ভোলা আর বিশুর মধ্যে তুমুল তর্ক বাধিয়া গেল। এ বলে ডান পায়ে দাঁড়ানো উচিত, ও বলে, না, আগে বাঁ পা। গণেশের মহা মুস্কিল! সে আবার পণ্ডিতমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে গেল, "পণ্ডিতমশাই, কোন পা?"

পণ্ডিতমশাই তখন কি যেন একটা স্বপ্ন দেখিয়া অবাক হইয়া নাক ডাকিতেছিলেন। গণেশের ডাকে হঠাৎ তন্দ্রা ছুটিয়া যাওয়ায় তিনি সাংঘাতিকরকম বিষম খাইয়া ফেলিলেন। গণেশ বেচারা তাহার প্রশ্নের এরকম জবাব একেবারেই কল্পনা করে নাই, সে অত্যন্ত ভয় পাইয়া বলিল, "ঐ যা, কি হবে?" ভোলা বলিল, "দৌড়ে জল নিয়ে আয়।" বিশু বলিল, "শিগ্‌গির মাথায় জল দে।" গণেশ এক দৌড়ে কোথা হইতে একটা কুঁজা আনিয়া ঢক্‌ঢক্‌ করিয়া পণ্ডিতমশায়ের টাকের উপর জল ঢালিতে লাগিল। পণ্ডিতমশায়ের বিষম খাওয়া খুব চট্‌পট্‌ থামিয়া গেল, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া গণেশের হাতে জলের কুঁজা ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

ভয়ে সকলেই খুব গম্ভীর হইয়া রহিল, খালি শ্যামলাল বেচারার মুখটাই কেমন যেন আহ্লাদীগোছের হাসি-হাসি মতন, সে কিছুতেই গম্ভীর হইতে পারিল না। পণ্ডিত-মশাইয়ের রাগ হঠাৎ তাহার উপরেই ঠিকরাইয়া পড়িল। তিনি বাঘের মতন গুমগুমে গলায় বলিলেন, "উঠে আয়!" শ্যামলাল ভয়ে কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "আমি কি করলাম? গণ্‌শা জল ঢালল, তা আমার দোষ কি?" পণ্ডিতমশাই মানুষ ভালো, তিনি শ্যামলালকে ছাড়িয়া গণ্‌শার দিকে তাকাইয়া দেখেন তাহার হাতে তখনো জলের কুঁজা। গণেশ কোনো প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়াই বলিয়া ফেলিল, "ভোলা আমাকে বলেছিল।" ভোলা বলিল, "আমি তো খালি জল আনতে বলেছিলাম। বিশু বলছিল, মাথায় ঢেলে দে।" বিশু বলিল, "আমি কি পণ্ডিতমশায়ের মাথায় দিতে বলেছি? ওর নিজের মাথায় দেওয়া উচিত ছিল, তা হলে বুদ্ধিটা ঠাণ্ডা হত।"

পণ্ডিতমহাশয় খানিকক্ষণ কট্‌মট্‌ করিয়া সকলের দিকে তাকাইয়া তার পর বলিলেন, "যা! তোরা ছেলেমানুষ, তাই কিছু বললাম না। খবরদার আর অমন করিস নে।"

সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, কিন্তু পণ্ডিতমশাই কেন যে হঠাৎ নরম হইয়া গেলেন কেহই তাহা বুঝিল না। পণ্ডিতমশাইয়ের মনে হঠাৎ যে তাঁর নিজের ছেলেবেলার কোন দুষ্টুমির কথা মনে পড়িয়া গেল, তাহা কেবল তিনিই জানেন।

সন্দেশ—আষাঢ়, ১৩২৭

দাশুর খ্যাপামি

স্কুলের ছুটির দিন। স্কুলের পরেই ছাত্রসমিতির অধিবেশন হবে। তাতে ছেলেরা মিলে অভিনয় করবে। দাশুর ভারি ইচ্ছা ছিল সেও একটা কিছু অভিনয় করে। একে ওকে দিয়ে সে অনেক সুপারিশও করিয়েছিল, কিন্তু আমরা সবাই কোমর বেঁধে বললাম, 'সে কিছুতেই হবে না।'

সেই তো গতবার যখন আমাদের অভিনয় হয়েছিল, তাতে দাশু সেনাপতি সেজেছিল; সেবারে সে অভিনয়টা একেবারে মাটি করে দিয়েছিল। যখন ত্রিচূড়ের গুপ্তচর সেনাপতির সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে বলল, "সাহস থাকিলে তবে খোল তলোয়ার!" দাশুর তখন, "তবে আয়, সম্মুখ সমরে"—বলে তখনি তলোয়ার খুলবার কথা। কিন্তু দাশুটা আনাড়ির মতো টানাটানি করতে গিয়ে তলোয়ার তো খুলতে পারলই না, মাঝে থেকে ঘাবড়ে গিয়ে কথাগুলোও বলতে ভুলে গেল। তাই দেখে গুপ্তচর আবার, "খোলো তলোয়ার!" বলে হুংকার দিয়ে উঠল। দাশুটা এমনি বোকা, সে অমনি, "দাঁড়া, দেখছিস না বকলস আটকিয়ে গেছে" বলে চেঁচিয়ে তাকে এক ধমক দিয়ে উঠল। ভাগ্যিস আমি তাড়াতাড়ি তলোয়ারটা খুলে দিলাম, তা না হলে ঐখানেই অভিনয় বন্ধ হয়ে যেত। তার পর শেষের দিকে রাজা যখন জিজ্ঞাসা করলেন, "কিবা চাহ পুরস্কার, কহ সেনাপতি," তখন দাশুর বলবার কথা ছিল, "নিত্যকাল থাকে যেন রাজপদে মতি", কিন্তু দাশুটা তা না বলে, তার পরের আরেকটা লাইন আরম্ভ করেই, হঠাৎ জিভ কেটে, "ঐ যাঃ! ভুলে গেছিলাম" বলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। আমি কট্‌মট্ করে তাকাতে, সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে ঠিক লাইনটা আরম্ভ করল।

তাই এবারে তার নাম হতেই আমরা জোর করে বলে উঠলাম, "না, সে কিছুতেই হবে না।" বিশু বলল, "দাশু একটিং করবে? তা হলেই চিত্তির!" ট্যাঁপা বলল, তার চাইতে ভজু মালিকে ডেকে আনলেই হয়!" দাশু বেচারা প্রথম খুব মিনতি, করল, তার পর চটে উঠল, তার পর কেমন মুষড়ে গিয়ে মুখ হাঁড়ি করে বসে রইল। যে কদিন আমাদের তালিম চলছিল, দাশু রোজ এসে চুপটি করে হলের এক কোনায় বসে বসে আমাদের অভিনয় শুনত। ছুটির কয়েকদিন আগে থেকে দেখি, ফোর্থ ক্লাশের ছোটো গণ্‌শার সঙ্গে দাশুর ভারি ভাব হয়ে গেছে। গণ্‌শা ছেলেমানুষ, কিন্তু সে চমৎকার আবৃত্তি করতে পারে—তাই তাকে দেবদূতের পার্ট দেওয়া হয়েছে। দাশু রোজ তাকে

নানারকম খাবার এনে খাওয়ায়, রঙিন পেনসিল আর ছবির বই এনে দেয়, আর বলে যে ছুটির দিন তাকে একটা ফুটবল কিনে দেবে। হঠাৎ গণ্শার উপর দাশুর এতখানি টান হবার কোনো কারণ আমরা বুঝতে পারলাম না। কেবল দেখতে পেলাম, গণ্শাটা খেলনা আর খাবার পেয়ে ভুলে 'দাশুদা'র একজন পরম ভক্ত হয়ে উঠতে লাগল।

ছুটির দিনে আমরা যখন অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, তখন আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারা গেল। আড়াইটা বাজতে না বাজতে দেখা গেল, দাশুভায়া সাজঘরে ঢুকে পোশাক পরতে আরম্ভ করেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, "কি রে? তুই এখানে কি করছিস?" দাশু বলল, "বাঃ, পোশাক পরব না?" আমি বললাম, "পোশাক পরবি কি রে? তুই তো আর একটিং করবি না।" দাশু বলল, "বাঃ, খুব তো খবর রাখ। আজকে দেবদূত সাজবে কে জান না?" শুনে হঠাৎ আমাদের মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগল, আমি বললাম, "কেন, গণ্শার কি হল?" দাশু বলল, "কি হয়েছে, তা গণ্শাকে জিজ্ঞেস করলেই পার।" তখন চেয়ে দেখি, সবাই এসেছে, কেবল গণ্শাই আসে নি। অমনি রামপদ, বিশু আর আমি, ছুটে বেরলাম গণ্শার খোঁজে।

সারাটি স্কুল খুঁজে, শেষটায় টিফিন ঘরের পিছনে হতভাগাকে খুঁজে পাওয়া গেল। সে আমাদের দেখেই পালাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আমরা তাকে চট্‌পট্‌ গ্রেপ্তার করে টেনে নিয়ে চললাম। গণ্শা কাঁদতে লাগল, "না আমি কক্ষনো একটিং করব না, তা হলে দাশুদা আমায় ফুটবল দেবে না। আমরা তবু তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় অঙ্কের মাস্টার হরিবাবু সেখানে এসে উপস্থিত। তিনি আমাদের দেখেই ভয়ংকর লাল চোখ করে ধমক দিয়ে উঠলেন, "তিন-তিনটে ধাড়ি ছেলে মিলে ঐ কচি ছেলেটার পেছনে লেগেছিস? তোদের লজ্জাও করে না?" বলেই আমাকে আর বিশুকে একেকটি চড় মেরে আর রামপদর কান মলে দিয়ে হন্‌হন্‌ করে চলে গেলেন। এই সুযোগে হাতছাড়া হয়ে গণেশচন্দ্র আবার চম্পট দিল। আমরাও অপমানটা হজম করে ফিরে এলাম। এসে দেখি, দাশুর সঙ্গে রাখালের মহা ঝগড়া লেগে গেছে। রাখাল বলছে, "তোকে আজ কিছুতেই দেবদূত সাজতে দেওয়া হবে না।" দাশু বলছে, "বেশ তো, তা হলে আর কেউ দেবদূত সাজুক, আমি রাজা কিংবা মন্ত্রী সাজি। পাঁচ-ছটা পার্ট আমার মুখস্থ হয়ে আছে।" এমন সময়ে আমরা এসে খবর দিলাম যে, গণ্শাকে কিছুতেই রাজী করানো গেল না। তখন অনেক তর্কবিতর্ক আর ঝগড়াঝাঁটির পর স্থির হল যে, দাশুকে আর ঘাঁটিয়ে দরকার নেই, তাকেই দেবদূত সাজতে দেওয়া হোক। শুনে দাশু খুব খুশি হল আর আমাদের শাসিয়ে রাখল যে, "আবার যদি তোরা কেউ গোলমাল করিস, তা হলে কিন্তু গতবারের মতো সব ভণ্ডুল করে দেব।"

তার পর অভিনয় আরম্ভ হল। প্রথম দৃশ্যে দাশু বিশেষ কিছু গোলমাল করে নি, খালি স্টেজের সামনে একবার পানের পিক ফেলেছিল। কিন্তু তৃতীয় দৃশ্যে এসে সে একটু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করল। এক জায়গায় তার খালি বলবার কথা, "দেবতা বিমুখ হলে মানুষে কি পারে?" কিন্তু সে এই কথাটুকুর আগে কোত্থেকে আরো চার-পাঁচ লাইন জুড়ে দিল। আমি তাই নিয়ে আপত্তি করেছিলাম, কিন্তু দাশু বলল, "তোমরা যে লম্বা-লম্বা বক্তৃতা কর সে

বেলা দোষ হয় না, আমি দুটো কথা বেশি বললেই যত দোষ!" এও সহ্য করা যেত, কিন্তু শেষ দৃশ্যের সময় তার মোটেও আসবার কথা নয়, তা জেনেও সে স্টেজে আসবার জন্য জেদ ধরে বসল। আমরা অনেক কষ্টে, অনেক তোয়াজ করে, তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে, শেষ দৃশ্যে দেবদূত আসতেই পারে না, কারণ তার আগের দৃশ্যেই আছে যে দেবদূত বিদায় নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। শেষ দৃশ্যেও আছে যে মন্ত্রী রাজাকে সংবাদ দিচ্ছেন যে দেবদূত মহারাজকে আশীর্বাদ করে স্বর্গপুরী প্রস্থান করেছেন। দাশু অগত্যা তার জেদ ছাড়ল বটে, কিন্তু বেশ বোঝা গেল সে মনে মনে একটুও খুশি হয় নি।

শেষ দৃশ্যের অভিনয় আরম্ভ হল। প্রথম খানিকটা অভিনয়ের পর মন্ত্রী এসে সভায় হাজির হলেন। এ কথা সে কথার পর তিনি রাজাকে সংবাদ দিলেন, "বারবার মহারাজে আশিস করিয়া, দেবদূত গেল চলি স্বর্গ অভিমুখে।" বলতেই হঠাৎ কোত্থেকে, "আবার সে এসেছে ফিরিয়া" বলে একগাল হাসতে হাসতে দাশু একেবারে সামনে এসে উপস্থিত। হঠাৎ এরকম বাধা পেয়ে মন্ত্রী তার বক্তৃতার খেই হারিয়ে ফেলল, আমরাও সকলে কিরকম যেন ঘাবড়িয়ে গেলাম—অভিনয় হঠাৎ বন্ধ হবার জোগাড় হয়ে এল। তাই দেখে দাশু খুব সর্দারি করে মন্ত্রীকে বলল, "বলে যাও কি বলিতেছিলে।" তাতে মন্ত্রী আরো কেমন ঘাবড়িয়ে গেল। রাখাল প্রতিহারী সেজেছিল, সে দাশুকে কি যেন বলবার জন্য যেই একটু এগিয়ে গেছে, অমনি দাশু, "চেয়েছিল জোর করে ঠেকাতে আমারে এই হতভাগা"—বলে এক চাঁটি মেরে তার মাথার পাগড়ি ফেলে দিল। ফেলে দিয়েই সে রাজার শেষ বক্তৃতাটা—"এ রাজ্যেতে নাহি রবে হিংসা, অত্যাচার, নাহি রবে দারিদ্র্য যাতনা" ইত্যাদি—নিজেই গড়্‌গড়্‌ করে বলে গিয়ে, "যাও সবে নিজ নিজ কাজে" বলে অভিনয় শেষ করে দিল। আমরা কি করব বুঝতে না পেরে সব বোকার মতো হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। ওদিকে ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল আর ঝুপ্‌ করে পর্দা নেমে গেল।

আমরা সব রেগেমেগে লাল হয়ে দাশুকে তেড়ে ধরে বললাম, "হতভাগা, দেখ দেখি সব মাটি করলি, অর্ধেক কথা বলাই হল না।" দাশু বলল, "বা তোমরা কেউ কিছু বলছ না দেখেই তো আমি তাড়াতাড়ি যা মনে ছিল সেইগুলো বলে দিলাম। তা না হলে তো আরো সব মাটি হয়ে যেত!" আমি বললাম, "তুই কেন মাঝখানে এসে সব গোল বাধিয়ে দিলি? তাই তো সব ঘুলিয়ে গেল।" দাশু বলল, "রাখাল কেন বলেছিল যে আমায় জোর করে আটকিয়ে রাখবে? তা ছাড়া তোমরা কেন আমায় গোড়া থেকে নিতে চাচ্ছিলে না আর ঠাট্টা করছিলে? আর রামপদ কেন বারবার আমার দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকাচ্ছিল?" রামপদ বলল, "ওকে ধরে ঘা দু-চার লাগিয়ে দে।"

দাশু বলল, "লাগাও না, দেখবে আমি এক্ষুনি চেঁচিয়ে সকলকে হাজির করি কি না!"

সন্দেশ—আশ্বিন, ১৩২৯

নানা নিবন্ধ

এই পর্যায়ের প্রথম উনসত্তরটি প্রবন্ধ মাঘ ১৩২০ থেকে শ্রাবণ ১৩৩০ এই সাড়ে ন' বছর ধরে 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত হয়। সন্দেশের কিশোর-পাঠকদের কথা মনে রেখেই পত্রিকার প্রয়োজনে এই লেখাগুলির জন্ম। তাই এর মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে তথ্যের দিক থেকে যার আজ আর কোনো মূল্য নেই। বলা বাহুল্য বিজ্ঞান ও চিন্তা জগতের তথা সামগ্রিকভাবে সময়ের অগ্রগতিই তার কারণ। তবু আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেকার কিশোর-মনের কৌতূহলের চেহারা কি ধরনের ছিল তার একটি ধারণা পাঠকরা এই নিবন্ধগুলির মধ্যে পাবেন। সেদিক থেকে এই রচনাগুলির একটি ঐতিহাসিকমূল্য অবশ্যই প্রাপ্য।

চাঁদে যাওয়ার পরিকল্পনা থেকে কলকাতার পাতাল রেল প্রকল্প—বিষয়ের বৈচিত্র্যের দিক থেকে অনেক কিছুই পাঠকরা এই নিবন্ধমালায় খুঁজে পাবেন, কিশোর-পাঠকদের কাছে যা কৌতুক ও কৌতূহল দুইই জোগাবে।

প্রবন্ধগুলি সন্দেশে প্রকাশিত কালানুক্রমেই বিন্যস্ত হল। শ্রাবণ ১৩৩০ সংখ্যার সন্দেশে প্রকাশিত 'বুমেরাং' নিবন্ধটি উহ্যনাম পণ্ডিত এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। সমস্ত নিবন্ধ-গুলির সঙ্গেই প্রকাশের তারিখ উল্লেখ আছে।

সন্দেশ-এর 'পাঠ'ই এখানে যথাসম্ভব অবিকৃতভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই নিবন্ধের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক চিত্রও ছিল; সেগুলি প্রায় সমস্তই বিবর্ণ হয়ে যাওয়ায় ছবিগুলি দেওয়া সম্ভব হয় নি। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই ছবি-গুলির প্রসঙ্গে যে-সব কথা ছিল তা সম্পাদনার প্রয়োজন হয়েছে। 'পাঠে'র সঙ্গতি বজায় রাখার জন্যই এই ন্যূনতম সম্পাদনা অনিবার্য ছিল।

এই পর্যায়ের শেষ নিবন্ধ 'সূর্যের রাজ্য' মুকুল পত্রিকায় আশ্বিন ১৩১৩ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। সম্ভবত এটি সুকুমার রায়ের প্রথম মুদ্রিত গদ্যরচনা। এই রচনা প্রকাশের সময় সুকুমারের বয়স ছিল প্রায় উনিশ বছর। স্বতন্ত্র সময়ের রচনা বলে —কালানুক্রমে না দিয়ে এটি এই পর্যায়ের শেষে দেওয়া হয়েছে। ১৬৬ পৃষ্ঠার প্রবন্ধের শিরোনামে 'বাড়ি' স্থানে 'ঘড়ি' হবে।

সূচীপত্র

সূক্ষ্ম হিসাব

একজন লোককে তাহার বয়স জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ কাগজ পেনসিল লইয়া হিসাব করিয়া বলিল, "আঠারো বৎসর তিন মাস ষোলো দিন চার ঘণ্টা —কত মিনিট ঠিক বলতে পারলাম না।" যিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন তিনি তো উত্তর শুনিয়া চটিয়াই লাল। বাস্তবিক, আমাদের সকল কাজের যদি এরকম চুলচেরা সূক্ষ্ম হিসাব রাখিতে হইত, তবে হিসাবের খবর লইতেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়া যাইত।

মনে কর বাহিরে ভয়ানক ঝড় বহিতেছে। একজন বলিল, "উঃ, ভয়ানক জোরে হাওয়া দিচ্ছে।" যিনি সূক্ষ্ম হিসাব চান তিনি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিবেন, "ভয়ানক জোরটা কিরকম জোর ? ঘণ্টায় কত মাইল হিসাবে বাতাস চলছে ? একদিকেই যাচ্ছে, না দিক বদলাচ্ছে ? কিরকমভাবে বাড়ে কমে ?" ইত্যাদি। যাঁহারা মেঘ বৃষ্টি বাতাস লইয়া আলোচনা করেন তাঁহারা এইরকম সব খবর সংগ্রহ করিবার জন্য নানারকম সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম কল ব্যবহার করেন। বাহিরে খুব একচোট বৃষ্টি হইয়া গেল। লোকে দেখিয়া বলিল, "বাস রে, কি ঝমাঝম্ বৃষ্টি।" কিন্তু আমাদের সূক্ষ্ম হিসাবী পণ্ডিত হয়তো বলিবেন, "এই বৃষ্টিকে যদি সমানভাবে মাটির উপর ধরিয়া রাখা যাইত তবে ঠিক এক ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি জল দাঁড়াইত।"

শীত গ্রীষ্ম বুঝাইবার জন্য আমরা কতখানি ঠাণ্ডা বা কতখানি গরম তাহাও ভাষায় কতকটা বলিতে চেষ্টা করি—যেমন, 'শীতে হাড় জমে গেল ; বড্ডো শীত ; বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে ; একটু যেন গরম ; বেশ গরম ; ভয়ানক গ্রীষ্ম ; উঃ, গরমে গা ঝলসে গেল' ইত্যাদি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের কাছে যাও, তিনি চট্ করিয়া বলিয়া দিবেন 'আর এত 'ডিগ্রী' ঠাণ্ডা হইলেই বরফের মতো ঠাণ্ডা হইবে' বা 'আর এত 'ডিগ্রী' গরম বাড়িলে ফুটন্ত জলের মতো গরম হইবে।' এক ঘটি ঠাণ্ডা জল রহিয়াছে, তুমি তাহাতে এক ফোঁটা গরম জল ফেলিয়া দাও—কোনো তফাত বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু এমন যন্ত্র আছে যাহা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিতে পারিবেন, 'এই জলটা একটু গরম হইল।' এখান হইতে পঞ্চাশ হাত দূরে একটা বাতি জ্বালিয়া রাখ আর এখানে বসিয়া যন্ত্রের মুখ তাহার দিকে ফিরাইয়া দাও। অমনি দেখিবে, কলের মধ্যে সূক্ষ্ম কাঁটা সেই গরমেই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

একটি কাগজের ঠোঙায় খানিকটা চাল রহিয়াছে। তুমি হয়তো দাঁড়িপাল্লা দিয়া মাপিয়া বলিলে, "আধ সের চাল।" বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের কাছে যাও, তিনি তাঁহার চমৎকার দাঁড়িপাল্লায় ওজন করিয়া বলিবেন, "না, ঠিক আধ সের হয় নি। আরো প্রায় দেড়খানা চাল দিলে তবে ঠিক আধ সের হবে।"

আমরা কথায় বলি 'চুল চেরা' হিসাব আর মনে করি চুলকে চিরিতে গেলে বুঝি হিসাবটা নিতান্তই সূক্ষ্মরকম হয়। কিন্তু যাঁহারা অণুবীক্ষণ লইয়া কাজ করেন তাঁহারা বলিবেন, "চুলটা তো একটা দস্তুরমতো মোটা জিনিস। একটা চুলকে হাজারবার চিরলে তবে বলি—'হ্যাঁ, হিসাবটা কতকটা সূক্ষ্ম বটে'।" অণুবীক্ষণের সাহায্যে পণ্ডিতেরা যে-সকল সূক্ষ্ম জিনিসের খবর রাখেন, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি এতই সূক্ষ্ম যে তাদের একটার কাছে একটা ছোটো পিঁপড়া যেন ছারপোকার পাশে হাতির মতো দেখায়। এক ইঞ্চিকে একশোভাগ, হাজারভাগ, লক্ষভাগে চিরিয়াও পণ্ডিতদের হিসাবের পক্ষে যথেষ্ট সূক্ষ্ম হয় না। এক চৌবাচ্চা জলের মধ্যে একটা সরিষার মতো ছোটো চিনির টুকরা ফেলিয়া দাও। তাহার এক চামচ জলের মধ্যে যতটুকু চিনি থাকে তাহার চাইতেও অল্প পরিমাণ জিনিস পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা সেই-সব জিনিস সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য খবর সংগ্রহ করিয়াছেন।

খুব তাড়াতাড়ি 'কাট্' বলিতে চেষ্টা কর তো। কতক্ষণ সময় লাগে? হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে কথাটা শেষ হইতে প্রায় এক সেকেণ্ডের দশভাগের একভাগ সময় লাগে। একটা দ্রুত চলন্ত ট্রেন ততক্ষণে পাঁচ-ছয় হাত চলিয়া যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবীর কাছে সময়ের এ-হিসাবটা খুবই মোটা। ট্রেনটা এক চুল পরিমাণ নড়িতে যতটুকু সময় লাগে সেইটুকু সময়ের মধ্যে যাহা ঘটিতেছে বৈজ্ঞানিক তাহার সন্ধানও রাখিয়া থাকেন। এইখানে হঠাৎ একটা আলো জ্বালিয়া দেখ, আলোক ছুটিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে এবং তৎক্ষণাৎ লোকে দেখিবে 'এই আলো জ্বলিল'? 'তৎক্ষণাৎ' বলিলাম কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলিবেন 'তৎক্ষণাৎ নয়, একটু পরে। ঐ অনেক দূরে যারা রয়েছে তাদের কাছে আলো পৌঁছিতে কিছু সময় চাই তো।' যদি জিজ্ঞাসা করো 'কতখানি সময় লাগে' তিনি বলিবেন, "ট্রেনটা যতক্ষণে এক ইঞ্চি যাবে, আলো ততক্ষণে কলকাতা থেকে ছুটে গিয়ে মধুপুরে হাজির হবে।"

সন্দেশ—মাঘ, ১৩২০

শিকারী গাছ

উপযুক্ত রকম জল মাটি বাতাস আর সূর্যের আলো পাইলেই গাছেরা বেশ খুশি থাকে, আর তাহাতেই তাহাদের রীতিমতো শরীর পুষ্টি হয় আমরা তো বরাবর এইরকমই দেখি এবং শুনি। তাহারা যে আবার পোকা-মাকড় খাইতে চায়, শিকার ধরিবার জন্য নানারকম অদ্ভুত যদি খাটাইয়া রাখে এবং বাগে পাইলে পাখিটা ইঁদুরটা পর্যন্ত হজম

করিয়া ফেলে, এ কথাটা চট্ করিয়া বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে পৃথিবীর নানাজায়গায় নানা জাতীয় গাছ এই শিকারী-বিদ্যা শিখিয়াছে। তাহারা যে শখ করিয়া পোকা খাওয়া অভ্যাস করিয়াছে তাহা নয়, ঠেলায় পড়িয়াই ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছে। অনেক শিকারী গাছের বাস এমন স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় এবং সেই-সকল জায়গা গাছের পক্ষে এত অস্বাস্থ্যকর যে সেখানে তাহারা তাহাদের শরীর রক্ষার উপযোগী মাল-মসলা ভালো করিয়া জোগাড় করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায়, দু-একটা পোকা মাছি বা ফড়িং যদি তাহারা খাইতে না পারিত তবে তাহাদের বাঁচিয়া থাকাই মুস্কিল হইত।

আগেই বলিয়াছি, শিকারী গাছ নানারকমের আছে। ইহাদের শিকার ধরিবার জায়গাও নানারকম। কোনো কোনো গাছের পাতায় মাছি বা পোকা বসিলে পাতাগুলি আস্তে আস্তে গুটাইয়া যায়। মাছি বেচারা কিছুই জানে না, নিশ্চিন্ত মনে পাতার রস খাইতেছিল, হঠাৎ দেখে চারিদিকে ঘেরা, তাহার মধ্যে সে বন্দী। পাতার গায়ে লোমের মতো সরু সরু কাঁটা, তাহারই মুখে আঠার মতো রস লাগানো থাকে ; সেই রসে আটকাইয়া শিকারের পলাইবার আরো অসুবিধা হয়। শুধু তাহাই নহে, পাতা গুটাইয়া গেলে পরে সেই-সকল কাঁটার মুখ হইতে একরকম তীব্র হজমি রস বাহির হইতে থাকে ; তখন পোকাটা যতই ছট্‌ফট্ করে, ততই আরো বেশি করিয়া রস বাহির হয়। তাহাতেই শিকার মরিয়া শেষে হজম হইয়া যায়। তার পর আপনা হইতেই আবার পাতা খুলিয়া যায়। জলের মধ্যে একরকম গাছ থাকে, তাহার সাদা ফুল ; জলের ধারে একটা খুব রঙচঙে গাছ হয়, তাহার পাতাগুলির চেহারা কতকটা কদম ফুল গোছের। আর একরকমের গাছ আছে তাহাতে ঠিক যেন মোচার খোলের মতো পাতা সাজানো। এই সবগুলিই একপ্রকারের শিকারী গাছ এবং ইহাদের শিকার ধরিবার কায়দাও প্রায় একরকম। মনে কর, একটা মস্ত পোকা ঐ কদম ফুলের মতো গাছটিতে উঠিয়াছে আর একটু পরেই গাছের পাতাগুলি গুটাইয়া মাঝখানে আসিয়া মিলিবে—একটি ফুটন্ত ফুল মুড়িয়া আবার কুঁড়ি হইয়া গেলে যেমন হয়, সেইরূপ। তখন পোকা বেচারার আর পলাইবার পথ থাকিবে না।

আর-এক রকমের অদ্ভুত গাছ আছে, এক-একটা পাতার আগায় গোলাপি রঙের কী একটা জিনিস, তাহার চারদিকে কাঁটা। এই জিনিসগুলি Fly-trap (মাছি-মারা ফাঁদ)। এক-একটা ফাঁদ যেন মাঝখানে কব্জা দিয়া আটকানো, বইয়ের মতো খোলে আবার বন্ধ হয়। কোনো পোকা হয়তো পাতায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কোনো বিপদের চিহ্নও নাই ; ঘুরিতে ঘুরিতে সে ঐ ফাঁদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত। হয়তো দূরে থাকিয়া তাহার ঐ রঙটা খুব পছন্দ হইয়াছিল—তাই সে দেখিতে আসিল ব্যাপারখানা কি। কিন্তু সে তো জানে না যে ফাঁদের গায়ে সরু সূতার মতো কি লাগানো রহিয়াছে, তাহাতে ছুঁইলেই ফাঁদ বন্ধ হইয়া যায়। সে যেমন একটি সূতায় পা অথবা ডানা লাগাইয়াছে অমনি—খট্! ফাঁদ ছুটিয়া একেবারে বেমালুম বন্ধ হইয়া গেল। এখানে আর আঠার দরকার নাই, কারণ ফাঁদটি রীতিমতো মজবুত এবং খুব চট্‌পট্ কাজ সারে। আর-এক

রকম শিকারী গাছ আছে, তাহাদের শিকার ধরিবার জন্য থলি বা চোঙা থাকে। এই থলি বা চোঙার মধ্যে পোকা বেশ সহজেই ঢুকিতে পারে কিন্তু বাহির হওয়া তত সহজ নয়। ইহাদের ভিতর সরু সরু কাঁটা থাকে—সেগুলির মুখ সব নীচের দিকে, আর তার গায়ে মোমের মতো একরকম কি মাখানো থাকে, তাহাতে পোকাগুলি বেশ সহজেই সুড়্‌সুড়্‌ করিয়া পিছলাইয়া নামিতে পারে। কিন্তু উপরে উঠিবার সময় তো আর পিছলাইয়া উঠা যায় না—তা ছাড়া কাঁটার খোঁচাও যথেষ্ট খাইতে হয়। এই-সকল থলির তলায় প্রায়ই জল জমিয়া থাকে, পোকা যখন বারবার পলাইবার চেষ্টা করিয়া হয়রান হইয়া পড়ে, তখন সে ঐ জলের মধ্যে পড়িয়া মারা যায়। এই-সকল গাছে পোকাকে ফাঁকি দিবার এতরকম উপায় থাকে যে ভাবিলে অবাক হইতে হয়। কোনোটার মুখে ঢাকনি থাকে; সে ঢাকনির উপর হইতে চাপ দিলে খুলিয়া যায়। কিন্তু ভিতর হইতে ঠেলিলে খোলে না। প্রায় সবগুলিরই মুখের কাছে খুব সুন্দর রঙিন কাজ আর তার চারিদিকে মধু। সেই মধু খাইতে খাইতে পোকা ভিতরের দিকে ঢুকিতে থাকে—যত খায় তত মিষ্টি। শেষে এক জায়গায় গিয়া দেখে তাহার পরে আর মধু নাই—তখন সে ফিরিতে চায়। কিন্তু ফিরিতে আর পারে না। কোনো কোনো থলির ভিতরে খানিকটা জায়গা স্বচ্ছ মতন— ঠিক যেন শার্শী। পোকাগুলি মনে করে এই পলাইবার পথ—আর ক্রমাগত সেই শার্শীর গায়ে উড়িয়া উড়িয়া হয়রান হইয়া পড়ে। কখনো কখনো এমনও হয় কোনো ছোটো পাখি বা ইঁদুর হয়তো জল খাইতে আসিয়া ফাঁদের মধ্যে পড়িয়া যায় এবং আর বাহির হইতে না পারিয়া প্রাণ হারায়।

সন্দেশ—চৈত্র, ১৩২০

কাগজ

এমন সময় ছিল যখন মানুষ লিখিতে শিখিয়াছে, কিন্তু কাগজ বানাইতে শিখে নাই। কোনো কোনো দেশে তখন পাথরে খোদাই করিয়া লিখিবার রীতি ছিল। কেহ-বা নরম মাটিতে লিখিয়া সেই মাটি পরে পোড়াইয়া ইঁটের টালি বানাইয়া লইত। সেই ইঁটেতেই তাহাদের কাগজের কাজ চলিয়া যাইত। কিন্তু এইরূপ ইঁটের টালি নিয়া লেখাপড়া করা যে বিশেষ অসুবিধার কথা তাহা সহজেই বুঝিতে পার। মনে কর কোনো ছাত্র পাঠশালায় যাইতেছে। অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিনঝুড়ি ইঁটের পুঁথি চলিল—আর লিখিবার জন্য একতাল কাদা। সামান্য কয়েকখানা চিঠি পাঠাইতে হইলেই প্রাণান্ত পরিশ্রম—মাটি আনো রে, জল আনো রে, ঠাসিয়া কাদা করো রে, চৌকস করো রে, টালি বানাও রে, তবে তাহাতে অক্ষর লেখো রে, পোড়াও রে, ঠাণ্ডা করো রে, মুটে ডাকো রে— হাঙ্গামের আর অন্ত নাই।

ইহার চাইতে আমাদের দেশে যে গাছের পাতায় লেখার রীতি অনেকদিন চলিয়া আসিয়াছে সেটা অনেক সহজ এবং সুবিধাজনক। ছয়হাজার বছর আগে ইজিপ্টে 'পেপিরাস'

গাছের কচি ছাল পিটিয়া থ্যাৎলাইয়া কাগজের মতো একরকম জিনিস তৈয়ার করিত। এই 'পেপিরাস' কথা হইতেই ইংরাজি পেপার (Paper) শব্দটা আসিয়াছে। কিন্তু এই পেপিরাস জিনিসটাকেও ঠিক কাগজ বলা যায় না। কাগজ তৈয়ারির উপায় প্রথম বাহির হইয়াছিল চীনদেশে ; কিন্তু চীনারা এই বিদ্যা আর কাহাকেও শিখাইত না। প্রায় বারো-শত বৎসর হইল কতকগুলি চীনা কারিকর আরবীদের সঙ্গে যুদ্ধে ধরা পড়ে। তাহাদের কাছে আরবের কারিকরেরা কাগজ বানাইতে শিখিয়া লইল, এবং সেইসময় হইতেই এই বিদ্যা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। আরব হইতে ইজিপ্ট, ইজিপ্ট হইতে আফ্রিকার অন্যান্য জায়গায় হয়।

তার পর স্পেন, জার্মানি, ইংলণ্ডে সকল জায়গায়ই ক্রমে ক্রমে কাগজের কারখানা দেখা দিল। সে সময়ে ছেড়া নেকড়া দিয়া সমস্ত কাগজ তৈয়ারি হইত এবং সেটা আগাগোড়াই হাতে হইত। পরিষ্কার নেকড়াকে ভিজাইয়া একটা দাঁতাল জিনিস দিয়া ঠেঙানো হইত ; তাহাতে নেকড়াটা ছিঁড়িয়া সুতার আঁশের মতো টুকরা টুকরা হইয়া যাইত। তাহাতে জল মিশাইয়া আরো অনেকক্ষণ পিটিলে কতকটা পাতলা মণ্ডের মতো একটা জিনিস হয়। এই নেকড়ার মণ্ডকে চালনিতে চালিয়া নানারকমে ছাঁকিয়া ঝাঁকাইয়া, লুচির মতো বেলিয়া তবে কাগজ তৈয়ারি হইত। সে সময়ে লোক কাগজটাকে খুব একটা শৌখিন জিনিস বলিয়াই মনে করিত, কিন্তু ক্রমে কাগজের দাম কমিয়া আসিল, কাগজ বানাইবার নানারকম কল বাহির হইল আর কাগজের কাটতি এত বাড়িয়া গেল যে কাগজওয়ালারা দেখিল এত ছেঁড়া নেকড়াই জোগাড় করা সম্ভব নয়। তখন চারিদিক খোঁজ পড়িয়া গেল, আর কি জিনিস হইতে কাগজ করা যাইতে পারে। প্রথমত স্পেনদেশের এস্পার্টো ঘাসে খুব কাগজ হইত, তার পর ক্রমে দেখা গেল তাহাতেও কুলায় না। সেই হইতে কাগজ বানাইবার জন্য কত জিনিস লইয়া যে পরীক্ষা হইয়াছে তাহা বলা যায় না। আখের ছিব্‌ড়া, কলার খোসা, পাট, খড়, ঘাস, বাঁশ, কাঠ—সুতার মতো আঁশওয়ালা, আখের মতো ছিবড়াওয়ালা যতরকম জিনিস আছে তার কোনোটিই বাকি নাই। মোটের উপর বলা যাইতে পারে কাঠ, এস্পার্টো ঘাস আর পুরাতন নেকড়া ও কাগজ হইতেই আজকাল কাগজ প্রস্তুত হয়।

বোলতা যে চাক বানায় তাহার মধ্যে একটা জিনিস থাকে সেটা ঠিক কাগজের মতো। বোলতারা গাছের শাস খায় এবং সেই শাঁসকে চিবাইয়া হজম করিয়া এই কাগজ বাহির করে। আজকাল কাগজের কলেও সেইরূপে কাঠ ঘাস প্রভৃতি জিনিস হইতে নানারকম কাগজ তৈয়ারি হয়। অবশ্য কাগজওয়ালাদের ঐ-সব জিনিস বোলতার মতো চিবাইতে হয় না ; এ-সব কাজই কলে হয়।

যে কাঠ হইতে কাগজ প্রস্তুত হয় সেই কাঠ আসে আমেরিকা ও নরওয়ের জঙ্গল হইতে। জঙ্গলওয়ালারা বড়ো-বড়ো গাছের গুঁড়ি কাটিয়া কলের মুখে ফেলিয়া দেয়—আর কলের আর-এক মাথায় কাঠ কুচি হইয়া বাহির হয়। সেই কুচিকে গুঁড়াইয়া, সিদ্ধ করিয়া পরিষ্কার করিতে হয়, তার পর সেই ক্ষীরের মতো নরম কাঠকে চাপ দিয়া পাতলা পাতলা পাটালি বানানো হয়—এবং সেই পাটালি কাগজওয়ালাদের কাছে চালান দেওয়া হয়।

কাগজওয়ালারা এই পাটাগুলিকে আবার জলে ঘুঁটিয়া মণ্ড তৈয়ারি করেন, সেই মণ্ডকে সিদ্ধ করিয়া ঝোলের মতো করেন। এই ঝোল লোহার নলে করিয়া কাগজের কলের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়। কল একদিকে কাঠ, ঘাস বা নেকড়ার ঝোল খাইতে থাকে আর একদিকে চার-পাঁচ মাইল লম্বা কাগজের থান বাহির করিতে থাকে। সমস্ত দিনরাত কল চলিলে বারো হাত চওড়া আড়াই মাইল লম্বা একখানা কাগজের থান বাহির হয়। তাহার পরে গরম জলের চৌবাচ্চার মধ্যে সেই মণ্ড গুলিয়া ঝোল তৈয়ারি হয়।

ঝোলটা যখন কলের মধ্যে চালানো হয় তখন সেটা একটা লম্বা চলন্ত ছাঁকনির উপর পড়ে। ছাঁকনিটা চলিতে থাকে আর মাঝে মাঝে কেমন একটা ঝাঁকানি দেয়, তাহাতে জল ঝরিয়া যায় এবং ঝোল ক্রমে চাপ বাঁধিয়া আসে। এমনিভাবে চলিতে চলিতে ঝোলটা কলের আরেক মাথায় আসিয়া পড়ে—সেখানে লুচি বেলিবার বেলুনের মতো অনেকগুলা 'রোলার' খাটানো থাকে। ছাঁকনিটা এইখানে আসিয়া ঝোলটাকে একটা রোলারের গায়ে ছিটকাইয়া দেয়। কিন্তু সে ঝোল আর এখন ঝোল নাই; এখন তাহার চেহারা অনেকটা ভিজা বুটিং কাগজের মতো। এতক্ষণে তাহাকে ঠিক কাগজ বলা চলে।

রোলারের গায়ে কাগজ লাগিবামাত্র রোলার তাহাকে টানিতে থাকে। তার পর সেই টানে কাগজও অনেকগুলি রোলারের মধ্যে ঘুরপাক খাইতে থাকে। এমনি করিয়া কাগজকে ক্রমাগত চাপ দিতে হয়, লুচির মতো বেলিতে হয়, ঘষিতে ও পালিশ করিতে হয়, তাহাতেই কাগজ ক্রমে পাতলা ও মোলায়েম হইয়া আসে।

অবশ্য এই সমস্ত কাজই কলে আপনা-আপনি হইতে থাকে। দু-একজন লোক থাকে তারা কেবল দেখে সমস্ত কল ঠিকমতো চলিতেছে কিনা। চব্বিশ ঘণ্টা সমান হিসাবে কাজ চলে; কলের এক মাথায় অনবরত ঝোল আসিয়া পড়িতেছে—সেই ঝোলসুদ্ধ ছাঁকনি কেবলই ছুটিতেছে, ছাঁকনি হইতে জমাটবাঁধা কাগজ ক্রমাগতই রোলারের উপর লাফাইয়া পড়িতেছে, রোলারেরও বিশ্রাম নাই, সেও কাগজ টানিতেছে আর ঠেলিয়া বাহির করিতেছে।

সন্দেশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১

লুপ্ত শহর

'লুপ্ত শহর' লিখিলাম বটে—কিন্তু আসলে সে শহর এখনো একেবারে লোপ পায় নাই। শহরের পথঘাট, দোকানপাট, এমন-কি, ঘরের আসবাব পর্যন্ত অনেক জায়গায় ঠিক রহিয়াছে অথচ সে শহর আর এখন শহর নাই—সেখানে লোক থাকে না, কোনো কাজ চলে না—মাঝে মাঝে নানা দেশ হইতে লোক আসে কিন্তু সেও কেবল 'তামাশা' দেখিবার জন্য।

পম্পেয়াই—আড়াইহাজার বৎসরের পুরাতন শহর, ইটালির পাগলা পাহাড় ভিসুভিয়াস তাহাতে ছাই চাপা দিয়া আগুন ঢালিয়া একেবারে শহরকে শহর বুজাইয়া দিয়াছিল। প্রায় আঠারোশত বৎসর এমনিভাবে শহর চাপা পড়িয়াছিল—সেখানে যে শহর ছিল সেই কথাই লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল—কারণ বাহির হইতে শহরের চিহ্নমাত্র দেখা যাইত

না। চাষারা নিশ্চিন্তে চাষ করিত, লোকে স্বচ্ছন্দে চলা-ফিরা করিত, কাহারও মনে হয় নাই যে এই মাটি খুঁড়িলেই প্রকাণ্ড শহর বাহির হইয়া পড়িবে। তার পর, সে প্রায় একশত বৎসরের কথা, সেই মাটির নীচ হইতে মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব জিনিস বাহির হইতে লাগিল। বাড়ির টুকরা, পাথরের বেদী, বাঁধানো রাস্তা এই-সকল দেখিয়া তখন লোকের মনে পড়িল দুহাজার বৎসর আগে এইখানে প্রকাণ্ড শহর ছিল।

পম্পেয়াই বড়ো যেমন-তেমন শহর ছিল না সেকালের ইতিহাসে লেখে, তিনলক্ষ লোক সে শহরে বাস করিত। জায়গাটা সমুদ্রের ধারে আর খুব স্বাস্থ্যকর, তাই বড়ো-বড়ো রোমান ধনীরা অনেকে সেখানে থাকিতেন। খুব জমকাল শহর বলিয়া সে সময় পম্পেয়াই-এর খুব নাম ছিল। তাহার বাড়িঘর, পথঘাট, বাগান, সাজসজ্জা বড়োলোকের শহরেরই মতো ছিল। ভিসুভিয়াসের যে কোনোরকম দুষ্ট মতলব আছে তাহা কেহ তখন জানিত না তাই একেবারে পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া শহর বসানো হইয়াছিল।

শহর ধ্বংস হয় ৭৯ খৃস্টাব্দে। তখন রোমান ধনীরা তাঁহাদের সুন্দর শহরকে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া আরামে আলস্যে দিন কাটাইতেছেন--পম্পেয়াই শহর বাবুয়ানায় মত্ত। কোনো বিপদের চিহ্ন নাই, তখন বলিতে গেলে পৃথিবীময় রোমান রাজ্য—রোমের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, রোমানদের সঙ্গে শত্রুতা করে কার সাধ্য! লোকে নিশ্চিন্ত আছে কোথাও ভয় নাই। মাঝে মাঝে একটু-আধটু ভূমিকম্প হইত, পাহাড়ের ভিতরে গুর্‌গুর্‌ শব্দ শোনা যাইত, কিন্তু তাহাতেও লোকের বিশেষ কোনো ভয় নাই। কিছুদিন দেখিয়া শুনিয়া সকলেরই সে-সব অভ্যাস হইয়া গেল। তার পর একদিন হঠাৎ পাহাড়ের চূড়া ভাঙিয়া কালো ধোঁয়া দম্‌কা হাওয়ার মতো চারিদিকে ছুটিয়া বাহির হইল। সেই ধোঁয়ায় পঞ্চাশ মাইল পথ এমন অন্ধকার হইয়া গেল যে মাটি আর আকাশ তফাত করা যায় না। তার পরে খানিকক্ষণ গরম ধুলার তুফান চলিল। ইহার মধ্যে যাহারা শহর ছাড়িয়া পলাইয়াছিল তাহাদের অনেকে বাঁচিতে পারিয়াছিল। কিন্তু শহরের মধ্যে একজন লোকও বাঁচে নাই। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল, ক্রমাগত ভয়ানক বাজ পড়িতে লাগিল। ভূমিকম্প আরম্ভ হইল, বাড়িঘর ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, ভিসুভিয়াস সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ফুলিয়া ফুলিয়া শেষটায় ভয়ানক শব্দে ফাটিয়া গেল। পাহাড়ের ভিতর হইতে লক্ষ লক্ষ মণ জ্বলন্ত পাথর ছিটকাইয়া চারিদিকে আগুন বৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহার পরেও হয়তো অনেক লোক বাঁচিতে পারিত কিন্তু এখানেই বিপদের শেষ হইল না। ভিসুভিয়াসের ভিতরকার পাথর গরমে গলিয়া ভাঙা পাহাড়ের ফাটল দিয়া শহরের উপর গড়াইয়া পড়িল, সমস্ত শহরটা যেন টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। অনেকে আগুনের ভয়ে সমুদ্রের দিকে পলাইয়াছিল কিন্তু সেখানেও রক্ষা নাই। এই প্রলয় কাণ্ডের মধ্যে সমুদ্র কি স্থির থাকিতে পারে? সে প্রথমটা তীর হইতে পিছাইয়া গেল। দেখিয়া বোধ হইল যেন সমুদ্র আগুনের ভয়ে হটিয়া যাইতেছে। সমুদ্রের জন্তুগুলি শুকনা ডাঙায় পড়িয়া কত যে মারা গেল তাহার ঠিক নাই। কিন্তু সমুদ্র যাইবে কোথায়? একটু পরেই ভূমিকম্পের একটা ধাক্কার সঙ্গে সে আবার আসিয়া পড়িল, এবং নৌকা ঘরবাড়ি পথঘাট যাহা ছিল সমস্ত ভাঙিয়া ভাসাইয়া প্রমাণ করিয়া দিল যে, 'আমিও বড়ো কম

নই।' জল, মাটি, আকাশ—এই তিনের রেষারেষির মধ্যে পড়িয়া দেখিতে দেখিতে দেশটার চেহারা বদলাইয়া গেল। ভিসুভিয়াসের উপরটা আগে ছাদের মতো সমান ছিল—সেই জায়গাটা বাটির মতো গর্ত হইয়া গেল—সেই বাটির মধ্যে আবার একটা নূতন ছুঁচাল চূড়া বাহির হইল। আর পম্পেয়াই?—পম্পেয়াই যেখানে ছিল সেখানে প্রায় ত্রিশ হাত উঁচু পাথর মাটি আর ছাই।

সেই পম্পেয়াইকে আবার এতদিন পরে মানুষে কত যত্নে খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া বাহির করিতেছে। দুহাজার বৎসর আগে মানুষেরা কি খাইত, তাহাদের ঘরবাড়ির বন্দোবস্ত কিরকম ছিল, তাহাদের হাট-বাজার, সরাইখানা, সভাঘর, মন্দির কিরূপ ছিল এখন আমরা চোখের সামনে দেখিতে পাই। ভিসুভিয়াস একদিকে যেমন শহরকে নষ্ট করিয়াছে আর-একদিকে আবার সেই ভাঙা শহরকে ছাই চাপা দিয়া এতকাল আশ্চর্যরকম রক্ষা করিয়াছে। খুঁড়িতে খুঁড়িতে কত মানুষের মৃতদেহ পাওয়া যায়—সেগুলি সমস্তই জমিয়া পাথর হইয়া রহিয়াছে। কোনো জায়গায় দু-একটি, কোথাও অনেকগুলি লোক একত্র মরিয়া আছে। কোথাও মা অন্ধকারে তাঁহার শিশুকে খুঁজিতে গিয়া মারা পড়িয়াছেন। কাহারও হাতে টাকার থলি, কাহারও হাতে গহনার বাক্স।

চারিদিকে ভয়ের ছবি; লোকে ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে পলাইয়াছে—অন্ধকারে পথ হারাইয়া দিক্‌বিদিক ভুলিয়া পাগলের মতো ছুটিয়াছে। এই গোলমাল ব্যস্ততার ঠিক মধ্যেই এক রোমান প্রহরী ফটকে পাহারা দিতেছিল। আশ্চর্য তাহার সাহস, সে তাহার জায়গা ছাড়িয়া এক পা-ও নড়ে নাই, পালাইবার চেষ্টাও করে নাই। ফটকে থাকিতে হইবে এই তাহার কর্তব্য—সুতরাং 'যো হুকুম!' সে ফটকের সামনে খাড়া থাকিয়াই মারা গেল এবং এইরূপ অবস্থাতেই অস্ত্রশস্ত্র বর্মসুদ্ধ তাহার দেহ পাওয়া গিয়াছে। কর্তব্যনিষ্ঠার এইরূপ আশ্চর্য পরিচয় জগতে খুব কমই পাওয়া যায়।

এখন সেই শহরের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া যাইতে কেমন অদ্ভুত লাগে। অনেক জায়গায় দুহাজার বৎসর আগে যে জিনিসটি যেখানে ছিল এখনো ঠিক তেমনি আছে—এক জায়গায় একটা টেবিলে খাওয়া-দাওয়া চলিতেছিল হঠাৎ লোকে খাওয়া ফেলিয়া পলাইয়াছে—সেই টেবিল সেই খাওয়া তেমনি রহিয়াছে—রুটিটা জমিয়া পাথরের মতো হইয়া গিয়াছে—ছিপি-আঁটা মাটির বোতলে মদ ছিল, সেই মদ পর্যন্ত ঠিক রহিয়াছে! এক জায়গায় হাঁড়িতে কি যেন জ্বাল হইতেছিল—সেই হাঁড়ি এখনো চুল্লির উপর সেইভাবে বসানো রহিয়াছে! কোনো জায়গায় বাড়ির ইঁট পুড়িয়া ঝামা হইয়া গিয়াছে; আবার কোথাও সাদা টালি, লাল কালো নানারকম পাথরের কাজ, সমস্তই পরিষ্কার রহিয়াছে। একটা দেয়ালের গায়ে বিজ্ঞাপন লেখা আছে—

"আসেলিনাস্ ও স্মাইরিনে বলিতেছেন—ফস্‌কাস্‌কে তোমাদের অলডারম্যান পদে নিযুক্ত কর।" ফস্‌কাস্ বেচারা এই সম্মান পাইয়াছিল কি না তাহা জানিবার আর কোনো উপায় নাই।

সন্দেশ—আষাঢ়, ১৩২৬

ডুবুরী জাহাজ

প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে একজন ফরাসি লেখক একটা গল্প লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এক অদ্ভুত জাহাজের কথা ছিল। সে জাহাজকে মাছের মতো জলের উপর বা নীচ দিয়া যেমন ইচ্ছা চালানো যাইত। সে সময়ে লোকের কাছে গল্পটা খুবই অসম্ভবগোছের শুনাইয়াছিল এবং অনেকে গল্পলেখকের 'আজগুবি কল্পনার' খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর এরূপ গল্পে লোকের আশ্চর্য হইবার কথা নয়, কারণ, বাস্তবিকই ঐরকম জাহাজ এখন অনেকগুলি তৈয়ার হইয়াছে। শুধু ইংলণ্ডেই এখন অন্তত পঁচাশিটা এইরূপ জাহাজ আছে।

জাহাজটা যতক্ষণ জলের উপরে থাকে ততক্ষণ তাহার পিঠে নানারকম মাস্তুল দড়ি, কলকব্জা ইত্যাদি দেখা যায়, কিন্তু জাহাজ ডুব মারিবার আগে এ-সমস্ত গুটাইয়া লওয়া হয়। তখন কেবল দুটি চোঙা আর একটি টুপির মতো ঢাকনি জাহাজের উপরে থাকে। ঢাকনিটার গায়ে পুরু কাঁচের শার্শী দেওয়া থাকে, তাহার ভিতর দিয়া জাহাজের কাপ্তান বাহিরের সমস্ত দেখিতে পান। জাহাজটা যতক্ষণ আধ-ডোবা অবস্থায় থাকে ততক্ষণ এইভাবে দেখার কাজ চলিতে পারে, কিন্তু আর কয়েক হাত ডুবিলেই সে পথ বন্ধ। তখন ঐ চোঙা দুটিই চোখের কাজ করে—চোঙার আগায় আয়না ও কাঁচ সুদ্ধ একটি যন্ত্র বসানো থাকে, যন্ত্রটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারিদিকে তাকাইতে থাকে—আর জাহাজের কাপ্তান নীচে বসিয়া সেই আয়নার সাহায্যে বাহিরের সমস্ত অবস্থা দেখিতে পান। দশ হাতের নীচে গেলে এই 'দিকবীক্ষণ' যন্ত্রও ডুবিয়া যায়, তখন কেবল আন্দাজে আর কম্পাস্ দেখিয়া জাহাজ চালাইতে হয়।

জাহাজের মধ্যে একটা লোহার চৌবাচ্চা থাকে—চৌবাচ্চাটা খালি থাকিলে জাহাজ জলের উপরে ভাসে কিন্তু চৌবাচ্চাটার মধ্যে জল ভরিলে জাহাজ ভারি হইয়া ক্রমে ডুবিয়া যায়। এইরকমে জল বাড়াইয়া বা কমাইয়া জাহাজকে অল্প বা বেশি ডুবানো যায়। তাড়াতাড়ি জল ভরিবার বা খালি করিবার জন্য জাহাজের মধ্যে বড়ো বড়ো 'পাম্প'-কল রাখা হয়—তাহার সাহায্যে এক মিনিটের মধ্যে জাহাজকে পঞ্চাশ হাত জলের নীচে ডুবাইয়া দেওয়া যায়। জাহাজের দুই পাশে ও পিছনে মাছের ডানা ও লেজের মতো হাল বসানো থাকে, সেইগুলিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জাহাজের মুখ ডাইনে বাঁয়ে উপরে নীচে যেমন ইচ্ছা ফিরানো যায়। পিছন দিকে দুইটা পাখার মতো ইস্ক্রুপ ঘুরিতে থাকে তাহাই জল কাটিয়া জাহাজকে চালায়। জাহাজের ভিতরে বড়ো বড়ো লোহার বোতলে চাপ দিয়া বাতাস ভরিয়া রাখা হয়। তাহাতে জাহাজের বাতাস অনেকক্ষণ পরিষ্কার রাখিবার সুবিধা হয় এবং অন্যান্য কাজও চালান যায়। ক্রমাগত চব্বিশ ঘণ্টা জলের নীচে থাকিলেও জাহাজের লোকেরা কোনোরকম অসুবিধা বোধ করে না। জাহাজে এরূপ বন্দোবস্ত করা যায় যাহাতে একটা জাহাজ কোথাও না থামিয়া চারহাজার মাইল স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারে।

মনে কর আমরা এইরূপ একটা জাহাজের মধ্যে ঢুকিয়াছি—ঢুকিয়াই সকলের আগে চোখে পড়ে—জাহাজের এক মাথা হইতে আর এক মাথা পর্যন্ত কেবল চাকা আর লোহা আর কলকব্জা। চেয়ার টেবিল আসবাবপত্র নাই বলিলেই হয়। সমস্ত জাহাজটা যেন একটা প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক কারখানা ; সেই বিদ্যুতে জাহাজ চলে এবং জাহাজের বাতি জ্বালা রান্না করা পর্যন্ত সমস্ত কাজ হয়। জাহাজের কাপ্তান কোথায় ? ঐ যে তিনি জাহাজের টুপির নীচে বসিয়া দিকবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া চারিদিক দেখিতেছেন।

কাপ্তান উপর হইতে হুকুম করিতেছেন আর অন্য একটি কর্মচারী নাবিকদিগের দ্বারা সেই হুকুম তামিল করাইতেছেন। প্রত্যেক লোক তাহার নিজের নিজের জায়গায় প্রস্তুত হইয়া আছে—কখন কি হুকুম আসে! কাপ্তান বলিলেন 'জাহাজ ডাইনে ফিরাও', অমনি একটা চাকা ঘুরাইবামাত্র জাহাজ ডাইনে ফিরিয়া গেল। 'থাম! টর্পিডোওয়ালা, প্রস্তুত হও।' টর্পিডো কেন? শত্রুপক্ষের জাহাজ দেখা গিয়াছে! টর্পিডো বড়ো সাংঘাতিক অস্ত্র। একবার বিপক্ষের জাহাজে ভালোমতো টর্পিডো দাগিতে পারিলে আর দ্বিতীয়বার মারিবার দরকার হয় না। একটা প্রকাণ্ড ছুঁচোবাজির মতো তার চেহারা—তার ভিতরে বারুদ আর অদ্ভুত কল-কারখানা। ডুবুরী জাহাজের সামনেই টর্পিডোর কলখানা—সেই কলের চাবি টিপিলেই টর্পিডো ঘণ্টায় চারশো মাইল বেগে ছুটিয়া বাহির হয় এবং বিপক্ষের জাহাজে বা অন্য কোনো শক্ত জিনিসে ঠেকিয়া বাধা পাইবামাত্র ভয়ানক শব্দে ফাটিয়া ও জাহাজ ফাটাইয়া এক তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া দেয়। বড়ো ডুবুরী জাহাজে তিন-চারটি পর্যন্ত টর্পিডো কল থাকে। 'টর্পিডোওয়ালা, প্রস্তুত হও!' হুকুম আসিবামাত্র তাহারা প্রস্তুত! সকলেই জানিয়াছে বিপক্ষের জাহাজ আসিতেছে—কাহারও মুখে টুঁ শব্দটি নাই। জাহাজের মধ্যে কেবল কলের বন্‌বন্‌ শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নাই।

হুকুম আসিল 'চল্লিশ হাত নামাও'—বলিতে বলিতে জাহাজ ডুবিতে লাগিল। একটা কলের কাঁটা আস্তে আস্তে সরিয়া যাইতে লাগিল—কুড়ি হাত, পঁচিশ হাত, ত্রিশ হাত। চল্লিশ-এর দাগে কাঁটা নামিল। এখন আর বাহিরের কিছুই দেখা যায় না। কাপ্তান এখন ঘড়ির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছেন। বিপক্ষের জাহাজটি ঠিক কোনদিকে এবং কত দূরে তিনি খুব ভালো করিয়া তাহার হিসাব লইয়াছেন—তাঁহার জাহাজ কিরকম জোরে চলিতেছে তাহাও তিনি জানেন—সুতরাং তিনি ঠিক বলিতে পারেন কোন মুহূর্তে দুই জাহাজে কতখানি তফাত থাকিবে। নিঃশব্দে জলের নীচে জাহাজ চলিতেছে—শত্রুজাহাজ কিন্তু তাহার কিছুই জানে না। 'জাহাজ উঠিতে দাও'—আবার কলের কাঁটা নড়িয়া উঠিল—'ত্রিশ হাত, বিশ হাত, দশ হাত—বাস!'—'সম্মুখের টর্পিডো হুঁশিয়ার হও।' এতক্ষণে দিকবীক্ষণ যন্ত্র ভাসিয়া উঠিয়াছে—আবার সব দেখা যাইতেছে। আধ মাইল দূরে শত্রুর জাহাজ—প্রকাণ্ড যুদ্ধজাহাজ! প্রায় কুড়িটা ডুবুরীর সমান। কাপ্তান একমনেই হিসাব করিতেছেন জাহাজটা আরেকটু সামনে সরুক, আরেকটু, আরেকটু—বাস! 'ছাড়'! একটা ভয়ানক ধাক্কা লাগিল—ডুবুরী জাহাজ কাঁপিতে কাঁপিতে প্রায় কাত হইয়া গেল—হালের নাবিক তাড়াতাড়ি তাহাকে সামলাইয়া লইল। কিন্তু বিপক্ষের জাহাজে যে টর্পিডো লাগিল সে আর তাহা সামলাইতে পারিল না। জাহাজের গায়ে বিশ হাত গর্ত—জাহাজটা

মাতালের মতো টলিতে টলিতে গব্‌গব্‌ করিয়া জল খাইতে লাগিল, তার পর মাথা নিচু করিয়া ডিগবাজী খাইয়া দেখিতে দেখিতে এত বড়ো জাহাজটা ডুবিয়া গেল।

ডুবুরী কিন্তু সেখানে দাঁড়াইয়া থাকে নাই—সে একেবারে ডুব মারিয়া প্রাণপণে ছুটিয়াছে। যতক্ষণ সে তাহার 'চোখ'টুকু মাত্র বাহির করিয়া চোরের মতো আসিতেছিল শত্রুরা তাহাকে দেখিতে পারে নাই, কিন্তু টর্পিডো ছাড়িবামাত্র জল তোলপাড় হইয়া উঠিল —আর সকলেই বুঝিতে পারিল 'ঐ ডুবুরী'। বিপক্ষের কামান হইতে একটি গোলা যদি ডুবুরীর ঘাড়ে পড়ে তবে আর তার রক্ষা নাই। শুধু যে যুদ্ধের সময়েই ডুবুরী জাহাজের বিপদের ভয় থাকে তাহা নয়। জলের পথে চলাফিরা করিতে গিয়া তাহার যে কত সময় কতরকম দুর্ঘটনা ঘটে ভাবিলেও ভয় হয়। জলের নীচ হইতে উঠিতে গিয়া হয়তো কোনো জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া গেল। হয়তো কোনখানে এতটুকু ফাঁক কোথায় কলের কব্‌জা এতটুকু বেঠিক বসিয়াছে—আর অমনি জাহাজ বিগড়াইয়া একেবারে পাথরের মতো ডুবিয়া গেল—শত চেষ্টায়ও আর তাহাকে উঠানো গেল না। এরকম কতবার ঘটিয়াছে এবং কত লোক তাহাতে মারা গিয়াছে। জাহাজ ডুবিয়া গেল, ডুবুরী নামাইয়া দেখা গেল ভিতরে মানুষ বাঁচিয়া আছে, ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দ করিলে তাহারা ভিতর হইতে সাড়া দেয়, অথচ তাহাদের বাঁচাইবার কোনো উপায় নাই। যাহাতে এরকম দুর্ঘটনা না হয়, তাহার জন্য প্রতি বৎসর কত নূতন নূতন বন্দোবস্ত করা হইতেছে এবং জাহাজ ডুবিলেও যাহাতে ভিতরের লোকেরা পলাইয়া আসিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা হইতেছে।

সন্দেশ—শ্রাবণ, ১৩২১

পাতাল পুরী

পাতাল দেশটা কোথায় তাহা আমি জানি না। অনেকে বলেন আমেরিকার নামই পাতাল। সে যাহাই হউক, মোটের উপর পাতাল বলিতে আমরা বুঝি যে, আমাদের নীচে একটা কোনো জায়গা—আমরা এই যে মাটির উপর দাঁড়াইয়া আছি, তার উপরে যেন স্বর্গ আর নীচে যেন পাতাল।

এখানে যে জায়গার কথা বলিতেছি সেটাকে পাতালপুরী বলা হইল এইজন্য যে সেটা মাটির নীচে। মাটির নীচে ঘরবাড়ি, মাটির নীচে রেলগাড়ি, মাটির নীচে হোটেল সরাই গির্জা—সমস্ত শহরটাই মাটির নীচে। শহরটা কিসের তৈয়ারি জান? নুনের। আসলে সেটা একটা নুনের খনি। অস্ট্রিয়ার কাছে—মাটির নীচে এই অদ্ভুত শহর। হাজার হাজার বৎসর লোকে এই খনিতে খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া লবণ তুলিয়াছে। এখনো প্রতি বৎসর এই খনি হইতে প্রায় বিশ লক্ষ মণ লবণ বাহির হয়—কিন্তু তবু লবণ ফুরাইবার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। মাটির নীচে পঁচিশ মাইল চওড়া পাঁচশো মাইল লম্বা লবণের মাঠ। খুঁড়িয়া দেখা গিয়াছে একহাজার ফুটের নীচেও লবণ।

খনির মধ্যে খানিকটা জায়গায় বড়ো সুরঙ্গ কাটিয়া পথঘাট করা হইয়াছে তাহার মাঝে

মাঝে এক-একটা বড়ো ঘরের মতো। খনিটা ঠিক যেন একটা সাততলা পুরী, তার নীচের চারতলায় কুলিরা কাজ করে, উপরের তিনতলায় লবণ প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে—সেখানে এখন লোকে তামাশা দেখিতে আসে।

খনির মুখে ঢুকিলেই লবণের সিঁড়ি ; সেই সিঁড়ি বাহিয়া লোকে নীচে নামে—কিম্বা যদি ইচ্ছা হয় নীচে নামিবার যে কল আছে সেখানে পয়সা দিলেই কলে চড়িয়া নীচে নামা যায়।

প্রথমতলায় অর্থাৎ উপরের তলায়, একটা প্রকাণ্ড সভাঘর। চারিদিকে লবণের দেয়াল, লবণের থাম, লবণের কারিকুরি, তার মধ্যে লবণের ঝাড়লণ্ঠন। এই ঘর দেড়শত বৎসর আগে তৈয়ারি হইয়াছিল। কত বড়ো-বড়ো লোকে, রাজারাজড়া পর্যন্ত, এই সভায় বসিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিয়া গিয়াছেন। সভার এক মাথায় একটা সিংহাসন। একখানা আস্ত লবণের টুকরা হইতে এই সিংহাসন কাটা হইয়াছে।

ঘরের মধ্যে যখন আলো জ্বালানো হয়, তখন সমস্ত ঘরটি স্ফটিকের মতো জ্বলিতে থাকে। লাল নীল সাদা কতরকম রঙের খেলায় চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়। লবণ জিনিসটা যে কতদূর সুন্দর হইতে পারে শুধু খানিকটা নুনের গুঁড়া বা কর্‌কচের টুকরা দেখিয়া তাহার ধারণাই করা যায় না।

সভাঘরের খুব কাছেই সেণ্ট আণ্টনির মন্দির। মন্দিরের মধ্যে আলো বেশি নাই, লবণের থামগুলি আধা-আলো আধা-ছায়ায় আর স্ফটিকের মতো ঝক্‌ঝক্ করে না ; এক-এক জায়গায় সাদা মার্বেল পাথরের মতো দেখায়। মন্দিরের ভিতরটায় জাঁক-জমক বেশি নাই। চারিদিক নিস্তব্ধ—সভাঘরের হৈ চৈ গোলমাল এখানে একেবারেই পৌঁছায় না।

এখান হইতে দ্বিতীয় তলায় নামিবার জন্য আবার সিঁড়ি—সিঁড়িটা একটা প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে নামিয়াছে। ঘরের ছাদটা একটা গম্বুজের মতো। চারিদিকে বড়ো-বড়ো কাঠের ঠেকা দেওয়া হইয়াছে তা না হইলে ছাদ ভাঙিয়া পড়িতে পারে। ঘরটা এত উঁচু যে তাহার মধ্যে আমাদের গড়ের মাঠের মনুমেণ্টটিকে অনায়াসে খাড়া করিয়া বসানো যায়। ঘরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড লবণের ঝাড়লণ্ঠন, তাহার মধ্যে তিনশত মোমবাতি জ্বালানো হয়—কিন্তু তাতেও এত বড়ো ঘরের অন্ধকার দূর হয় না।

দেড়শত বৎসর আগে এই ঘরেই খনির আড্ডা ছিল। লবণ খুঁড়িতে খুঁড়িতে খনিতে বড়ো-বড়ো ফাঁক হইয়া যায়। এই ঘরটিও সেইরকম একটি ফাঁক মাত্র। লোকে উপর হইতে লবণ তুলিতে আরম্ভ করে—ক্রমে যতই লবণ ফুরাইয়া আসিতে থাকে তাহারা একতলা দোতলা করিয়া ততই নীচে নামিতে থাকে।

তৃতীয় তলায় নামিয়া কতগুলি ছোটোখাটো ঘর ও নানা লোকের কীর্তিস্তম্ভ দেখিয়া লবণের পোল পার হইতে হয়। তার পরেই হোটেল রেলওয়ে স্টেশন ইত্যাদি। সেগুলিও দেখিবার মতো জিনিস।

মাটির সাতশত ফিট নীচে একটা লোনা হ্রদ আছে, এমন লোনা জল বোধ হয় আর কোথাও নাই। অন্ধকার গুহা, তার মধ্যে ঠাণ্ডা কালো জল—কোথাও একটু কিছু শব্দ

হইলে চারিদিকে গম্‌গম্‌ করিয়া প্রতিধ্বনি হইতে থাকে। সেই জলের উপর লোকে যখন নৌকা চালায় তখন জলের ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ চারিদিক হইতে অন্ধকারে ফিস্‌ফিস্‌ করিতে থাকে—যেন পাতালপুরীর হাজার ভূতে কানে কানে কথা বলে।

সন্দেশ—আশ্বিন, ১৩২১

উঁচু বাড়ি

লোকে বলে—'মনুমেণ্টের মতো উঁচু!' সেরকম উঁচু বাড়ি দেখলে আমরা বলি, 'ইস্‌! বড্ডো উঁচু বাড়ি।' কিন্তু একটিবার আমেরিকায় ঘুরে এস, তার পরে সেই বাড়িই তোমার চোখে নিতান্তই ছোটো ঠেকবে। মনুমেণ্টের মাথায় অমন আরো দু-চারটা মনুমেণ্ট চাপাও তবে আমেরিকার লোকে বলবে, 'হ্যাঁ, কতকটা উঁচু বটে!' নিউইয়র্কের একটি বাড়ি পঞ্চান্ন তলা—সাড়ে সাতশো ফট! একটা সাধারণ তিনতলা বাড়ি প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু—এইরকম উনিশটা বাড়ি একটার মাথায় আরেকটা চাপালে তবে সাড়ে সাতশো ফুট উঁচু হয়! আমেরিকার এক-একটা শহরে বিশতলা ত্রিশতলা চল্লিশতলা বাড়ির ছড়াছড়ি। ভাবতে গেলে আমাদের মাথা ঘুলিয়ে যায়।

এক-একটি বাড়ি যেন এক-একটি শহর! তার মধ্যে কত অফিস কত দোকান কত হোটেল গির্জা ইস্কুল থিয়েটার বায়স্কোপ ডাকঘর সভা-সমিতি! বাড়ির এক-এক জায়গায় সারি সারি খাঁচার মতো ঘর—তাতে চড়ে লোকে উঠছে নামছে, বিশ-পঁচিশতলা সিঁড়ি ভেঙে কণ্ট করে উঠতে হয় না। বাড়ির মধ্যে ত্রিশ হাজার লোক—সকলেই ব্যস্ত, চারিদিকে ছুটাছুটি অথচ কোনো গোলমাল নেই। বন্দোবস্ত এমন সুন্দর যে কিছু একটা দরকার হলে তার জন্য হাঁ করে বসে থাকতে হয় না বা বিশ মাইল দূরে ছুটতে হয় না। বাড়িতেই সবরকম দোকান- ঘরে বসে টেলিফোন কর, যা চাও দু মিনিটের মধ্যে ঘরে এসে হাজির!

বাড়িতে ঢুকলে দেখবে শুধু যে মাথার উপরে এতখানি দালান আছে তা নয়—মাটির নীচেও দশ বিশতলা! সেখানে সূর্যের আলো যাবার উপায় নাই—সারাদিন আলো জ্বেলে কাজ চলে। ঐ-সব নীচের তলাগুলোতে নানারকম কলকারখানা—ইলেকট্রিক কোম্পানির বড়ো-বড়ো চাকাওয়ালা কল, বাড়ি গরম রাখবার জন্য বড় বড় 'বয়লার'—বড়ো-বড়ো ছাপাখানা তাতে সকাল সন্ধ্যা খবরের কাগজ ছাপা হয়।

কোনো কোনো রাস্তার দুধারে এইরকম দশ-বিশতলা বাড়ির সার চলেছে—তার ছায়ায় রাস্তা যেন অন্ধকার—সেখানে সূর্যের মুখ দেখা যায় না—আকাশ দেখতে হলে ঘাড় বাঁকিয়ে উপরে তাকাতে হয়। কিন্তু যারা একেবারে উপরে ত্রিশতলা বা চল্লিশতলায় থাকে তাদের আলো বাতাসের কোনো অভাব হয় না! রাস্তার ধুলা শহরের কুয়াশা অত উঁচুতে পৌঁছায় না—কাজেই সেখানকার হাওয়া অতি পরিষ্কার।

বাড়িগুলো দেখতে যেমন আশ্চর্য, এগুলি তৈয়ার করার কায়দাও তেমনি অদ্ভুত। বাড়ি

তুলবার আগে প্রায় একশো-দেড়শো হাত গর্ত কেটে ভিত খুঁড়তে হয়। যেখানে বাড়ি হবে, তার চারদিকে খুব মজবুত আর খুব উঁচু 'কপিকল' বসায়। সেই কলে বড়ো-বড়ো লোহার থাম চাপিয়ে থামগুলাকে হিসাবমতো ঠিক ঠিক জায়গায় বসানো হয়। তার পর থামের গায়ে লোহার কড়ি বরগা বসিয়ে সেগুলোকে পেরেক স্ক্রু দিয়ে এঁটে দেয়। এমনি করে সমস্ত বাড়িটার একটা কঙ্কাল আগে খাড়া করা হয়। তার পর ঢালাই করা পাথুরে মাটির দেওয়াল দিয়ে কঙ্কালটিকে ভরাট করে তাতে দরজা জানালা বসালে পর তখন সেটা বাড়ির মতো দেখতে হয়। যারা এই-সকল কাজ করে তাদের যে অনেকখানি সাহস দরকার তা বুঝতেই পার। মাটি থেকে চারশো হাত উপরে লোহার বরগার উপর দিয়ে হাঁটাহাটি করা—তার উপরে বসে কাজকর্ম করা, কখনো-বা উপর নীচ ওঠা নামা—এ-সব যেমন তেমন লোকের কাজ নয়।

সন্দেশ—মাঘ, ১৩২১

রাবণের চিতা

লোকে বলে রাবণের চিতায় যে আগুন দেওয়া হয়েছিল সে আগুন নাকি এখনো নিভানো হয় নি—এখনো তা জ্বলছে। কোথায় গেলে সে আগুন দেখা যায় তা আমি জানি না—কিন্তু এমন আগুন দেখা গেছে যা বছরের পর বছর ক্রমাগতই জ্বলছে; মানুষ তাতে জল ঢেলে মাটি চাপা দিয়ে নানারকমে চেষ্টা করেও তাকে নিভাতে পারে নি।

খনি থেকে কয়লা এনে সেই কয়লা দিয়ে লোকে আগুন জ্বালায়। কিন্তু তা না করে যদি একেবারে খনির মধ্যেই আগুন ধরিয়ে খনিকে খনি জ্বালিয়ে দেওয়া যায় তবে কিরকম হয়? বাস্তবিকই এমন সব কয়লার খনি আছে যার আশেপাশে বারোমাসই আগুন জ্বলে। সে-সব খনির লোকেরা সব সময়ে ভয়ে ভয়ে থাকে—কখন সে আগুন খনির মধ্যে এসে পড়ে। কোনোদিকে যদি খনির দেয়াল একটু গরম হয় কিম্বা খনির কাছে কোনো জায়গা যদি বসে-যাবার মতো হয়, তবেই হৈচৈ লেগে যায়—'আগুন আসছে, আগুন আসছে। খনির একদল লোক আছে তাদের কাজ কেবল আগুন তাড়ানো। যেদিক দিয়ে আগুন আসছে বোধ হয়, তারা সেইদিকে ইঁট পাথরের দেয়াল তুলে আগুনের পথ বন্ধ করে দেয়। আগুন তখন বাধ্য হয়ে আর কোনো দিক ঠেলে তার পথ করে নেয়। কেমন করে কোথা হতে আগুন আসে তা সব সময়ে বলা যায় না। মাটির নীচে হয়তো বিশ-পঁচিশ মাইল জায়গা জুড়ে কয়লার স্তর রয়েছে—কোথাও একশো হাত, কোথাও হয়তো পাঁচ হাত মাত্র পুরু। তারই কোনোখানে যদি কোনো গতিকে আগুন ধরে আর তার আশেপাশে পাহাড়ের ফাটলে যদি বাতাস যথেষ্ট থাকে—তবেই সে আগুন একেবারে 'রাবণের চিতা' হয়ে দাঁড়ায়।

খোলা বাতাসে কয়লা যেমন ধূ ধূ করে জ্বলে যায়, মাটির নীচে তেমন হয় না—সেখানে আগুন যেন শামুকের মতো আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে থাকে। যেদিকে তার পথ

খোলা, যেদিকে একটু কয়লা আর বাতাস—আগুন একদিনে হোক এক বছরে হোক, সেদিকটা দখল করবেই। অনেক দিন আগে একবার ইংলণ্ডের একটা গির্জা হঠাৎ বসে যেতে আরম্ভ করল—তার দেয়াল মেঝে সব দেখতে দেখতে হাঁ করে উঠল। এঞ্জিনিয়ার এসে মাটি খুঁড়ে দেখেন বারো হাত নীচেই কয়লার স্তর আর তাতে আগুন লেগেছে—কয়লা যতই পুড়ে যাচ্ছে, উপরের মাটিও ততই ধ্বসে পড়ছে। তখন পরামর্শ করে সকলে গির্জার মেঝেটা খুঁড়ে প্রকাণ্ড একটা ফুটো করলেন। সেই ফুটোর মধ্যে প্রায় এক পুকুর জল ঢেলে দেওয়া হল—তার পর মাটি খুঁড়ে লোহার শিক বসিয়ে তার নীচে দেয়ালের গায়ে দেয়াল তুলে সবাই ভাবল, 'এবারে আগুন জব্দ হয়েছে।' কিন্তু সাতাশ বৎসর পরে আবার সেই আগুন কয়লা পুড়িয়ে পুড়িয়ে তিনদিক ঘুরে গির্জার পিছনে এসে হাজির।

অনেকদিন আগে লিভারপুলের কাছে টড্ নদীর ধারে এক কয়লার খনি ছিল। হঠাৎ কেমন করে সেই খনির এক কোণে আগুন লেগে যায়। খনিসুদ্ধ লোক প্রাণপণ চেষ্টা করেও যখন সে আগুন নিভানো গেল না, তখন খনির কর্তারা খাল কাটিয়ে টড্ নদীকে খনির মধ্যে ছেড়ে দিলেন। তাতে তখনকার মতো আগুন চাপা পড়ল বটে কিন্তু জলের স্রোত খনির এমন দুরবস্থা করল যে কর্তারা ভয় পেয়ে গেলেন। তার পর যখন কিছুদিন না যেতেই আগুন আবার আর একদিকে এসে উঁকি মারল তখন সকলেই বললেন আগুন নিভাবার চেষ্টা বৃথা—ওকে কোনোরকমে ঠেকিয়ে রাখ। যেদিকে আগুন আসবার ভয় সেদিকের কয়লা সরিয়ে ফেল, বড়ো-বড়ো খাল কেটে দেয়াল তুলে, তার পথ বন্ধ কর। তা হলেই আগুন আর ছড়াতে পারবে না—ক'দিন বাদে আপনি নিভে যাবে। এইরকমে ছাব্বিশ বছর আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ চলল। একদল লোক কেবল ঐ কাজেই দিনরাত লেগে রইল ; যারা ছোটো ছিল তারা প্রায় বুড়ো হয়ে এল ; খনির পাশে দেয়ালের পর দেয়াল উঠল, আগুনের উপর নীচে চারদিকে ঘেরাও হয়ে গেল—কিন্তু আগুন কি থামতে চায়! দেয়াল ভেঙে, পাথর ফাটিয়ে আগুনের শিখা বার বার দেখা দিতে লাগল ; আগুন বেড়েই চলল।

একদিকে যেমন আগুন, আর একদিকে জল! পাহাড়ের ফাটল দিয়ে টড্ নদীর জল এসে খনির মধ্যে দিনরাত পড়ত—সেই জল পাম্পকল দিয়ে ক্রমাগত বাইরে ফেলে দিতে হয়। একদিন টড্ নদীর জোয়ার লেগে উপরের মাটি ধ্বসে গিয়ে কবেকার পুরানো এক সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে খনির ভিতরে হু-হু করে জল ঢুকল। ভাগ্যিস তখন খনির মধ্যে লোক ছিল না, গোলমাল শুনে তারা সকলে খনির মুখের কাছে দৌড়ে এল। ব্যাপারটা কী বুঝতে কারও বাকি রইল না ; সকলেই বলতে লাগল এই জল যদি আগুনে গিয়ে পড়ে, তবে কি হবে? আগুনে জলে যখন দেখা হল তখন কয়েক মিনিট ধরে একটা ভয়ানক গর্জন আর যুদ্ধ চলল—ফুটন্ত জল ফোয়ারার মতো দুশো হাত উঁচু হয়ে এমন জোরে ছুটে বেরুল যে তার ধাক্কায় খনির মুখের কলকব্জা সব কোথায় উড়ে গেল। তার পর দেখতে দেখতে সব চুপচাপ। আগুন ঠাণ্ডা হল আর সঙ্গে সঙ্গে খনির দফাও ঠাণ্ডা।

গিরিধির কাছে একটা কয়লার স্তরে আজ ক'বছর হল আগুন ধরেছে। গরমে মাটি ফাটিয়ে পাহাড় তাতিয়ে সে আগুন এখনো জ্বলছে।

সন্দেশ—ফাল্গুন, ১৩২৯

ডুবুরী

জলের তলায় ডুব দিয়ে যাদের কাজ করতে হয় তাদের বলে ডুবুরী। লোকে যে-সকল দামী মুক্তা দিয়ে গহনা বানায় সেই মুক্তাগুলি জন্মায় সমুদ্রের নীচে এক জাতীয় ঝিনুকের মধ্যে। ঝিনুক থেকে একরকম রস বেরিয়ে খোলার মধ্যে ফোড়ার মতো হয়ে জমে থাকে—তাকে আমরা বলি 'মুক্তা'। সবচেয়ে বড়ো আর ভালো যে-সব মুক্তা, সেগুলি জন্মায় একরকম পোকার উৎপাতে। সেই পোকার কেমন বদ অভ্যাস, সে সুবিধা পেলেই ঝিনুকের খোলার মধ্যে ঢুকে ঝিনুক বেচারাকে অস্থির করে তোলে। ঝিনুকও তখন বেশ করে রস ঢেলে দিয়ে তাকে জীবন্ত কবর দিয়ে রাখে। সেই পোকার কবরগুলিকে ডুবুরীরা সমুদ্রের তলা থেকে কুড়িয়ে আনে, আর শৌখিন লোকে হাজার হাজার টাকা দিয়ে সেগুলি কিনে যত্ন করে তুলে রাখে।

যে-সব মুক্তা অল্প জলে থাকে ডুবুরীরা কেবল সেইগুলিকেই আনতে পারে—কারণ বড়ো জোর দেড়শো হাতের বেশি এ-পর্যন্ত কোনো ডুবুরীই নামতে পারে নি। এমন অনেক ডুবুরী আছে যারা শুধু একটা পাথর-বাঁধা দড়ি নিয়ে দম বন্ধ করে প্রায় দেড় মিনিট কি দু-মিনিট ত্রিশ-চল্লিশ হাত জলের নীচে থাকতে পারে। কিন্তু আজকালকার ডুবুরীরা একরকম অদ্ভুত পোশাক পরে জলে নামে। ডুবুরীর পিঠে একটা দড়ি বাঁধা থাকে, তাই টেনে ডুবুরী উপরের লোকদের ইশারা করে আর তারা তাকে উঠায় নামায়। ডুবুরীর মাথায় একটা লোহার মুখোশ—তাতে পুরু কাঁচের জানালা বসানো, তাই দিয়ে সে দেখতে পায়—আর টুপির আগায় একটা নল তা দিয়ে উপর থেকে বাতাস আসে, তবে সে নিশ্বাস ফেলতে পারে। পোশাকটি এমন যে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোনোখান দিয়ে এক ফোঁটাও জল ঢুকতে পারে না। ডুবুরীদের পায়ে প্রকাণ্ড ভারি সীসার জুতো আর পিঠেও সীসার বোঝা। জলের নীচে কাজ করার বিপদ অনেকরকম। প্রথম ভয় এই যে যদি পোশাকের মধ্যে কোনোরকমে জল ঢুকতে পারে তবে ডুবুরীকে পিষে থ্যাঁৎলা করে ফেলবে। পোশাকটিকে সমস্তক্ষণ বাতাস দিয়ে ফুটবলের মতো পাম্প করে রাখতে হয়—তা হলেই ডুবুরী আর জলের চাপ টের পায় না। ঐজোরে পাম্প-করা বাতাস যখন পোশাকের মধ্যে ঢোকে তখন ডুবুরীর গায়ের সমস্ত রক্ত আর রস বোতলে-পোরা সোডা ওয়াটারের মতো সেই বাতাস শুষে নেয়। এ অবস্থায় যদি তাকে হঠাৎ উপরে টেনে তোল, তবে সোডার বোতল খুললে যা হয় তার শরীরের মধ্যে তেমনি একটা কাণ্ড চলতে থাকে। এইরকমে কত লোক মারা গেছে। সেইজন্য তুলবার সময়ে খুব সাবধানে আস্তে আস্তে দড়ি টানতে হয় আর মাঝে মাঝে থামাতে হয়। যদি পোশাকটি ভালো করে এঁটে পরা না হয়, আর সীসার বোঝাটি কোনোরকম খুলে যায় তবে ডুবুরী তৎক্ষণাৎ বিদ্যুতের মতো ছিট্‌কিয়ে উপরে ভেসে উঠবে; তাতেও তার হাড়গোড় চুরমার হয়ে যেতে পারে। এ-সব ছাড়া হাঙর বা অন্য জলজন্তুর

ভয় তো আছেই। ডুবুরীরা হাঙরের চাইতেও ভয় করে 'অক্টোপাস'কে। পিটার স্নেল একজন নামজাদা ডুবুরী ছিল। সে একবার জলে নামতেই একটা প্রকাণ্ড অক্টোপাস শুঁড়ের মতো আট পা বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। ভয়ে স্নেল পাগলের মতো ছুরি চালাতে চালাতে তার দড়ি ধরে প্রাণপণে টানতে লাগল। অনেক টানাটানির পর যখন তাকে প্রায় আধমরা অবস্থায় উপরে তোলা হল, তখনো জানোয়ারটার কয়েকটা কাটা পা তার গায়ে লেগে ছিল। তার ওজন প্রায় আধ মণ।

আর একটি জিনিস আছে যাকে ডুবুরী দিয়ে কুড়িয়ে এনে লোকে তার ব্যবসা করে। তাকে আমরা বলি 'স্পঞ্জ' (sponge)—সেই যে ফুটোওয়ালা নরম জিনিস যাতে জল শুষে নেয় আবার চাপ দিলে জল বেরিয়ে যায়। স্পঞ্জ জিনিসটা একরকম অদ্ভুত জলজন্তুর খোলস বা কঙ্কাল বা বাসা—যা ইচ্ছা বলতে পার। সমুদ্রের তলায় স্পঞ্জের দল সার বেঁধে মাটি আঁকড়িয়ে পড়ে থাকে, ডুবুরীরা তাকে সেখান থেকে ছিনিয়ে আনে।

রাউল নামে একজন লোক স্পঞ্জ তুলবার জন্য একরকম ডুবুরী গাড়ি তৈরি করেছেন। দুজন ডুবুরী তার মধ্যে স্বচ্ছন্দে বসতে পারে। স্পঞ্জ দেখবার জন্য গাড়ির সামনে একটা উজ্জ্বল আলো থাকে। গাড়ির নীচে চাকা আর পিছনে দুটা দাঁড়, তাতেই তার চলাফিরা চলে। আর সামনে ডাণ্ডার আগায় একটা হাঁ-করা মতন জিনিস আছে—তা দিয়ে স্পঞ্জ আঁকড়ে আনে।

আজকাল ডুবুরীর পোশাকের নানারকম উন্নতি হয়েছে—কোনোটার পিঠে বাতাসের বন্দোবস্ত, তার আলাদা নল লাগে না; কোনোটার মধ্যে টেলিফোনের কল, উপরের সঙ্গে কথাবার্তা চলে—আর কোনোটার এমন সুবিধা আছে যে ডুবুরী ইচ্ছা করলে কারও সাহায্য ছাড়াই উপরে উঠতে পারে।

সন্দেশ—বৈশাখ, ১৩২২

ছাপাখানার কথা

ছেলেবেলায় একটা ছাপাখানা দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম একটা লোহার কল রয়েছে, সেটাকে তারা 'প্রেস' বলে। তার পাশে একটা কালি-মাখানো টেবিল আর অন্য একটা টেবিলে একতাড়া কাগজ। প্রেসের সামনের দিকে একটা লোহার তক্তার উপর অনেকগুলো উঁচু-উঁচু অক্ষর বসানো রয়েছে। একটা ছেলে একটা মোটা 'রুল' দিয়ে টেবিলের কালি নিয়ে সেই অক্ষরগুলোতে মাখাচ্ছে। আর একজন লোক সেই তক্তার সঙ্গে আঁটা একটা ফ্রেমের উপর কাগজ বসিয়ে, কাগজসুদ্ধ ফ্রেমটাকে মুড়ে সেই অক্ষরগুলোর উপর ফেলে দিচ্ছে। তার পর একটা হাতল ঘুরিয়ে সেইগুলোকে একেবারে প্রেসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আর একটা প্রকাণ্ড হাতল টেনে দিচ্ছে। তার পর হাতল ছেড়ে দেওয়া, তক্তা টেনে বার করা, কাগজ খুলে নেওয়া, আবার কালি দেওয়া, কাগজ দেওয়া, ইত্যাদি। এই-রকম ক্রমাগত চলছে আর প্রত্যেকবার এক-একখানা ছাপা হচ্ছে; এমনি করে ঘণ্টায়

দুশো-তিনশো করে ছাপা হয়। ব্যাপারটা আমার কাছে ভারি আশ্চর্য লেগেছিল। কিন্তু এ-সব প্রেস এখন আমাদের দেশেও নিতান্ত 'সেকেলে' হয়ে গেছে।

আজকালকার কোনো বড়ো ছাপাখানায় যদি যাও, প্রেসের রকমারি দেখে অবাক হয়ে যাবে। তার অধিকাংশ কলে চলে, আগাগোড়াই তার কলে কাজ হয়। প্রথম যে কলের প্রেস দেখেছিলাম সে কথা আমার এখনো মনে আছে। প্রেসটাকে দর্জির সেলাই কলের মতো পায়ে চালাতে হয়। সেটা যখন চলে তখন বোধ হয় যেন একবার হাঁ করছে, একবার মুখ বুজছে। যে প্রেস চালায় সে ঐ হাঁ-করা প্রেসের মধ্যে তার কাগজ বসিয়ে দেয়; আর প্রেসটা সেই কাগজের উপর অক্ষরের 'টাইপ' দিয়ে এক কামড় বসিয়ে দেয়—তাতেই ছাপা হয়ে যায়। কালির জন্য ভাবতে হয় না; প্রেসের মাথায় কতগুলো রুল বসানো আছে, সেগুলো কালি মেখে তৈরি হয়ে থাকে, যেই প্রেসটা হাঁ করে, আর প্রেসম্যান তার কাগজ বদলিয়ে দেয় অমনি রুলগুলো সুড়ুৎ করে সেই উঁচু-উঁচু অক্ষরগুলোর উপর কালি মাখিয়ে পালায়! পায়ে না চালিয়ে প্রেসের সঙ্গে মোটর জুড়ে দিলে মোটরেই প্রেস চালাতে পারে।

কিন্তু পড়বার বই বা মাসিক কাগজপত্র ছাপবার জন্য যে-সব বড়ো-বড়ো প্রেস থাকে, সেগুলো আরো খট্‌মটে। তাতে একটা প্রকাণ্ড লোহার চোঙা থাকে, তার গায়ে কাগজ ঠেলে দিলে সে আপনি কাগজ টেনে নেয়। একটা লোহার টেবিল মতো থাকে, তার উপর টাইপ বসানো; সেই টেবিলটা টাইপসুদ্ধ ছুটাছুটি করে! একবার রুলের তলা দিয়ে ছুটে কালি মেখে এসে আবার কাগজ-জড়ানো 'চোঙার' নীচ দিয়ে গড়াতে গিয়ে চোঙাটাকে চেপে ঘুরিয়ে কাগজের গায়ে ছাপ মেরে দেয়। ছাপা হয়ে গেলে কাগজটাকে হাতে করে সরিয়ে নিতে হয় না—প্রেসটা আপনি তাকে ঠিক জায়গায় এনে ফেলে দেয়। এমনি করে ঘণ্টায় দু-তিন হাজার বেশ সহজেই ছাপা যায়।

কিন্তু ছাপাখানা কি ভয়ানক ব্যাপার হতে পারে তা যদি তুমি দেখতে চাও তবে খুব বড়ো খবরের কাগজওয়ালাদের কাছে গিয়ে দেখ: সেখানে প্রেসের ঘরে ঢুকতেই মনে হবে যেন কানে তালা লেগে গেল। প্রেসের ভন্‌ভন্ শব্দে নিজের চেঁচানি নিজেই শুনতে পাবে না। কল এত তাড়াতাড়ি চলে যে, কখন কি করে ছাপা হচ্ছে কিছু বুঝবার জো নেই। এমন প্রেসও আছে, যাতে বারো পৃষ্ঠা খবরের কাগজ প্রতি ঘণ্টায় এক লাখ করে ছাপা হয়। যদি প্রেসটার ভিতর ভালো করে তাকিয়ে দেখ, দেখবে একদিকে একটা লোহার ডাণ্ডায় প্রায় চার-পাঁচ হাত চওড়া কাগজের ফিতে জড়ানো—ফিতেটা লম্বায় হয়তো দু-তিন মাইল হবে। প্রেসের মধ্যে পর পর কতগুলো প্রকাণ্ড লোহার চোঙা ভয়ানক জোরে বন্‌বন্ করে ঘুরছে—আর সেই সঙ্গে হুড়্‌হুড়্ করে কাগজের 'ফিতে' টেনে নিয়ে, তার উপর ছেপে যাচ্ছে। মাইলকে মাইল কাগজ চোখের সামনে দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাচ্ছে। বিলাতে একটা বড়ো খবরের কাগজ (Daily Mail) ছাপতে প্রতি সপ্তাহে তিনশো মণ কালি আর দশ হাজার মাইল কাগজ খরচ হয়।

এতে একদিনে যা ছাপা হবে, দেড়শো বছর আগেকার কাঠের প্রেসে এক বছরেও তা পেরে উঠত না।

সন্দেশ—বৈশাখ, ১৩২৩

কাপড়ের কথা

ঐ যে জামাটা তুমি গায়ে দিয়েছ, ওর কাপড়টা তৈরি করতে কত লোককে কত হাঙ্গাম করতে হয়েছে, তুমি কি একবার ভেবে দেখেছ ? তুলার ক্ষেতে যখন তুলা হল, তখন কত লোকে এসে সেই-সব তুলা গাছ থেকে তুলে নিয়ে এক জায়গায় জড় করল। কলে সেই তুলার বীচি পরিষ্কার করে তাকে গাঁটে বেঁধে ফেলল। তার পর সেই তুলা কত দেশ-বিদেশে ঘুরে, কাপড়ের কলে এসে হাজির হল।

আমি একদিন একটা কাপড়ের কল দেখতে গিয়েছিলাম। সেটা খুব বড়ো কল নয়—তার চেয়ে অনেক বড়ো কল আমাদের দেশে আছে। কিন্তু তারই সব কাণ্ডকারখানা দেখলে অবাক হয়ে থাকতে হয়। প্রকাণ্ড এক তিনতলা বাড়ি—তার ছাদে অনায়াসে একটা ফুটবল খেলার জায়গা হতে পারে! প্রথমেই গেলাম তিনতলায়। সেখানে একটা প্রকাণ্ড বাষ্পে-চালানো কপিকল আছে; তুলার চালান এলে প্রথমেই গাঁটগুলি কপিকলে করে তিনতলায় তোলা হয়। তার পর গাঁট খুলে তুলা কলে পরিষ্কার করা হয়। সেই কলে তুলাকে ঝেড়ে আছড়িয়ে দমকা হাওয়ায় উড়িয়ে ধুলা, বালি, বীচি, খড়, কুটো সমস্ত বার করে ফেলে, তার পর সেই পরিষ্কার তুলায় চাপ দিয়ে আর একটা কলে মোটা মোটা লেপের মতন তৈরি হয়। সেই 'লেপ'গুলি তার পর দোতলায় চালান করে। সেখানে সেই 'লেপ' থেকে সূতা কাটা হয়। সে এক বিরাট ব্যাপার। প্রথমে অনেকগুলো কলে সেই 'লেপ' থেকে জাহাজ বাঁধা দড়ির মতো মোটা দড়ি তৈরি হয়। তার পর আর-একটা কলে সেই দড়ি থেকে টেনে মোটা সূতা বার করা হয়। এমনি করে কলের পর কল—তাতে সূতা ক্রমেই খুব সরু হয়ে আসে। এ ঘরের কল-কারখানা বড়োই অদ্ভুত। চারিদিকে প্রকাণ্ড লম্বা-লম্বা কল সারি সারি সাজানো, তার প্রত্যেকটাতে হাজার হাজার লম্বা 'নলি' (সূতা পাকাবার জন্য ছোটো-ছোটো কাঠের 'লাটাই') বন্‌বন করে ঘুরছে আর সূতা পাকানো হচ্ছে। তা ছাড়া কলকব্জা যে কতরকম চলছে তার আর কথাই নাই। দেখলে চোখে ধাঁধা লেগে যায়, কিন্তু কারখানার কোথাও একটু গোলমাল দেখতে পাবে না। যে যার কাজ করছে আর সব কল ঠিক চলছে। সূতা কাটা হয়ে গেলে, তৈরি সূতার 'নলি'গুলো আর-একটা কলের কাছে নিয়ে যায়। এটা হচ্ছে কাপড়ের 'টানা' দেবার কল। 'টানা' কাকে বলে জান? কাপড়ে লম্বালম্বিভাবে যে-সূতা থাকে তাকে 'টানা' বলে, আর চওড়াভাবে যে সূতা থাকে তাকে 'পড়েন' বলে। এই টানা দেবার কল বড়ো আশ্চর্য। হাজার হাজার নলি থেকে সূতা টেনে একটা চিরুনির মতো জিনিসের ভিতর দিয়ে গলিয়ে নিয়ে একটা রোলারে জড়ায়। কল চলতে চলতে যদি একটাও সূতা ছিঁড়ে যায়, অমনি আপনি-আপনি 'ঢং' করে ঘণ্টা বেজে ওঠে আর কল থেমে যায়। সেই সূতাটা জোড়া দিলে তবে কল চলবে। একসঙ্গে অনেক থান কাপড়ের টানা দেওয়া হয়ে থাকে। টানার সূতায় রোলার ভর্তি হয়ে গেলে সেই রোলারটাকে একতলায় চালান করা হয়। সেখানে কলে সূতায় মাড় দেওয়া হয়।

সূতায় মাড় মাখানো, বেশি মাড় চেঁচে ফেলে দেওয়া বাতাস দিয়ে তাড়াতাড়ি সূতাকে শুখানো, —এ-সবই কলে হয়। তার পর তাঁতে চড়াবার জন্য সেই সূতাকে গুছিয়ে ঠিক করে। একে বলে 'ব' তোলা। এ-কাজটা হয়ে গেলে তার পর কাপড় বোনা হয়। আগের সব কাজ যত সহজে কলে হয়, কাপড় বোনা তত সহজে হয় না। 'টানা'র সূতার টান যদি একটু বেশি হয়ে যায়, অমনি পট্ করে সূতা ছিঁড়ে যায়। তখনই তাঁত থামিয়ে সূতা জোড়া দিয়ে দিতে হয়।

তাঁত যখন চলে তখন বড়ো মজার দেখায়। টানার সূতা উঠছে আর নামছে, আর তার ফাঁকের ভিতর দিয়ে 'পড়েনে'র সূতার 'মাকু' ঠক্‌ঠক্ করে ছুটে যাচ্ছে আর আসছে, —ঠিক যেন একটা ইঁদুর দৌড়াচ্ছে। কাপড় বোনা হয়ে গেলে, তাকে মেজে ঘসে মোলায়েম করে, সুন্দর করে ভাঁজ করে, ছাপ লাগিয়ে, তার পর তাকে বাজারে পাঠানো হয়। মোলায়েম করার কলটি বড়ো মজার। দুটো ফাঁপা রোলার গায়ে গায়ে লাগানো রয়েছে, তার মাঝখান দিয়ে কাপড়টা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ফাঁপা রোলারের ভিতর ফুটন্ত জলের বাষ্প চালিয়ে দিয়ে রোলার দুটোকে খুব গরম করা হয়, তার পর আস্তে আস্তে সে দুটিকে ঘোরানো হয়। তখন কাপড়টাও গরমে আর চাপে খুব মোলায়েম হয়ে বেরিয়ে আসে। তার পর সেই কাপড় ভাঁজ করার কলে নিয়ে যায়। সেই কলের দুটো হাত আছে, তা দিয়ে কাপড়টাকে চট্‌পট্ ভাঁজ করে ফেলে। তার পর প্যাক করার ঘরে সেই কাপড়ে ছাপ মেরে, তাকে বেঁধে, কাগজ মুড়ে বাজারে পাঠাবার জন্য তৈরি করে রাখে।

এ-সব তো নিতান্ত সাধারণ কাপড়ের কথা হল। যদি রঙিন বা ছিটের কাপড় হয়, তবে তার জন্য ধোলাই করা, সূতায় রঙ দেওয়া, নকশা তোলা, ইত্যাদি আরো নানারকম হাঙ্গামের দরকার হয়।

সন্দেশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩

পার্লামেন্টের বাড়ি

বিলাতের যে শাসন-সভা, যেখানে সে দেশের খরচপত্র আইনকানুন ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি নানা ব্যাপারের আলোচনা ও ব্যবস্থা করা হয়—তার নাম পার্লামেণ্ট। পার্লামেণ্টের বাড়ির দুই মাথায় দুই চূড়া—তারই একটার গায়ে মাটি হইতে প্রায় একশো পঁচিশ হাত উঁচুতে পার্লামেণ্টের ঘড়ি বসানো। ঘড়িটা এত বড়ো যে রাস্তার লোকে এক মাইল দূর হইতে সেই ঘড়ি দেখিয়া অনায়াসে সময় ঠিক করিতে পারে।

রাস্তা হইতেই প্রকাণ্ড ঘড়িটা চোখে পড়ে, কিন্তু বাস্তবিক ঘড়িটা যে কত বড়ো তাহা বুঝিতে হইলে একটিবার তাহার ভিতরে ঢোকা দরকার। একটি লোহার প্যাঁচানো সিঁড়ি ঘুরিয়া ঘড়ির কামরায় ঢুকিতে হয়। ঘড়ির চারিদিকে চারিটি মুখ, এক-একটি মুখে এক-একটি ঘর, তাতে দোতালা বাড়ির মতো উঁচু ঘষা কাঁচের জানলা। জানলার বাহিরে ঘড়ির কাঁটা—এক-একটা সাড়ে সাত হাত লম্বা। রাত্রে সেই ঘরগুলির মধ্যে

জানলার পিছনে অনেকগুলি বড়ো-বড়ো গ্যাসের বাতি জ্বালাইয়া রাখে, তাহাতে ঘড়ির সমস্ত মুখটা আলো হইয়া উঠে। কিন্তু এই ঘরের মধ্যে ঘড়ির কলকবৃজা কিছুই দেখা যায় না। ঘড়ির যে ঘণ্টা বাজে তাহাও এখান হইতে দেখিবার জো নাই—সে-সমস্ত ভিতরের আর-একটা ঘরের মধ্যে। ঘণ্টাটি একটি দেখিবার জিনিস। গম্বুজের মতো প্রকাণ্ড কাঁসার ঘণ্টা, তার ওজন সাড়ে তিনশত মণেরও বেশি। প্রথম যখন ঘণ্টাটি তৈয়ারি হইয়াছিল তখন কিছুকাল ব্যবহারের পর সেটা ফাটিয়া যায় ; তখন সেটাকে আবার ঢালাই করিয়া নূতন করিয়া গড়া হইল। কিছুদিন পরে নূতন ঘণ্টাতেও ফাটল দেখা দিল। তার পর বছর তিনেক ঘণ্টা বাজানো বন্ধ ছিল ; পরে হাতুড়িটা বদলাইয়া একটা হালকা, অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ মণ ওজনের হাতুড়ি দেওয়ায় আর ফাটল বাড়িতে পারে নাই। এই বড়ো ঘণ্টাটি ছাড়া আরো চারিটি ছোটো-ছোটো ঘণ্টা আছে, সেগুলি পনেরো মিনিট অন্তর টুং টাং করিয়া বাজে। 'ছোটো' বলিলাম বটে কিন্তু এগুলির এক-একটির ওজন ত্রিশ হইতে একশো মণ। ঘড়ির পেণ্ডুলামটি প্রায় সাড়ে আট হাত লম্বা, দোলকটির ওজন প্রায় চার মণ।

ঘড়িতে দম দেওয়া এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। প্রতি সোম বুধ ও শুক্রবার দুইজন লোককে ক্রমাগত কয় ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া এই কাজটি করিতে হয়। ছোটো-ছোটো ঘণ্টা-গুলি যতক্ষণ বাজিতে থাকে; সেই ফাঁকে তাহারা একটু বিশ্রাম করিয়া নেয়, আবার মিনিট পনেরো চাবি ঘুরায়—এইরকম করিয়া সারাটা বিকাল ধরিয়া দম দেওয়া হয়। এই-সমস্ত কলকারখানার উপরে, একেবারে চূড়ার আগায় একটা প্রকাণ্ড বাতি। এই বাতি যখন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে তখন লোকে বুঝিতে পারে, পার্লামেণ্ট সভা বসিয়াছে। চূড়ার কাছে উঠিলে আর একটা আশ্চর্য জিনিস দেখা যায়—ঘড়ির কলকব্জার অনেক নীচে একটা জায়গায় দিনরাত একটা প্রকাণ্ড চুল্লি জ্বলিতেছে। চুল্লির আঁচে ঘড়ির ভিতরটা সকল সময় সমানভাবে গরম থাকে ; কোথাও এলোমেলো ঠাণ্ডা লাগিয়া কলকব্জা বিগড়াইতে পারে না।

এত বড়ো ঘড়ি, ইহার জন্য খরচও হইয়াছে কম নয়। ঘড়ির চারটি মুখের জানলায় লেখা কাঁটা ইত্যাদি সুদ্ধ প্রায় আশি হাজার টাকা লাগিয়াছে। ঘণ্টাগুলির দাম প্রায় লাখ টাকা কলকব্জার ষাটহাজার টাকা। সমস্ত ঘড়িটার মোট দাম প্রায় সওয়া তিনলক্ষ টাকা।

সন্দেশ—আষাঢ়, ১৩২৩

রেলগাড়ির কথা

এমন কত জিনিস আছে যা আমরা সর্বদাই দেখে থাকি এবং তাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য-বোধ করি না। অথচ, সেই-সব জিনিসই যখন প্রথম লোকে দেখেছিল, তখন খুব একটা হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। প্রথম যে বেচারা ছাতা মাথায় দিয়ে ইংলণ্ডের রাস্তায় বেরিয়েছিল, তাকে সবাই মিলে ঢিল ছুঁড়ে এমনি তাড়াহুড়ো করেছিল যে, বেচারার প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

সার ওয়াল্টার র‍্যালে যখন বিলাতে আলু আর তামাকের প্রচলন করলেন, তখনো তাঁকে রীতিমত নাকাল হতে হয়েছিল। শোনা যায়, তিনি একদিন খুব আরাম করে নিজের ঘরে বসে 'পাইপ' মুখে দিয়ে তামাক টানছিলেন, এমন সময় তাঁর চাকর এসে সেই ব্যাপার দেখে, মনিবের মুখে আগুন লেগেছে মনে করে, একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। কি করবে কিছু বুঝতে না পেরে সে এক বালতি জল নিয়ে সার ওয়াল্টারের মাথায় ঢেলে দিল। আলু খেতেও প্রথমটা লোকে কম আপত্তি করে নি। 'আলু ভয়ানক বিষাক্ত জিনিস,' 'আলু খেয়ে লোক মরে যাচ্ছে,' এইরকম সব অদ্ভুত গুজব চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে বহুদিন পর্যন্ত লোকের মনে ভয় জন্মিয়ে রেখেছিল।

কলকাতায় হাওড়ার পোল যখন তৈরি হয় নি, তখন একজন সাহেব বলেন যে নৌকার উপর খিলান ভাসিয়ে এইরকম পোল তৈরি হতে পারে। এ কথাটা সে সময়ে লোকের কাছে এমনই অদ্ভুত ঠেকেছিল যে খবরের কাগজে পর্যন্ত সেই বেচারার নামে নানারকম ঠাট্টা-তামাশা বেরিয়েছিল। অথচ এখন হাজার হাজার লোকে প্রতিদিন পোলের উপর যাওয়া-আসা করছে—সেটা বাস্তবিক একটা অদ্ভুত ব্যাপার কিনা, কেউ সে কথা ভেবে দেখবার অবসর পায় না।

রেলগাড়ির প্রচলনও এমনি করেই হয়েছিল। প্রায় একশো বৎসর আগে জর্জ স্টিফেনসন বাষ্পের জোরে গাড়ি চালিয়ে তাতে লোকের যাতায়াতের ব্যবস্থা করবার প্রস্তাব করেন। তখন সে প্রস্তাবে এতরকম আপত্তি উঠেছিল যে, ক্রমে তর্কটা পার্লামেণ্ট পর্যন্ত গড়ায়। শেষটায় অনেক ঝগড়াঝাটি গণ্ডগোলের পর, স্টিফেনসনকে নানারকম জেরা করে তার পর অনুমতি দেওয়া হল—"আচ্ছা, তোমার রেলগাড়িটা নাহয় একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক!" স্টিফেনসন সহজে জেদ ছাড়বার লোক ছিলেন না—তাই তিনি শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে ছাড়েন নি।

এই জর্জ স্টিফেনসনের জীবনের কথা অতি অদ্ভুত। নিতান্ত গরিবের ঘরে যার জন্ম, যে লেখাপড়ার কোনোরকম সুযোগ পায় নি এবং ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত কেবল কয়লার খনিতে সামান্য কাজ করেই জীবন কাটিয়েছে, তার মনে এমন আশ্চর্য শক্তি আসে কোথা হতে, ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। স্টিফেনসনেরা ছয় ভাইবোন। বাপ-মা অত্যন্ত গরিব, কাজেই ছেলেবেলা থেকেই সব কটি ভাইকে টাকা উপার্জনের চেষ্টা করতে হত। তারা নানান কাজ করে একেকজন দিনে প্রায় দু-আনা রোজগার করত। খনিতে নানারকম কল-কারখানা থাকে, সেগুলার উপর জর্জের ভারি নজর ছিল। সুযোগ পেলেই সে সেগুলাকে নেড়েচেড়ে তার ভিতরের কলকব্জা খুলে দেখত। বইটই কিছুমাত্র না পড়েও কেবল নিজে দেখেশুনে এ-সকল বিষয়ে তার আশ্চর্য দখল জন্মেছিল। সে সময়ে কয়লার খনিতে যে-সকল এঞ্জিন ব্যবহার হত তাদের 'খাড়া এঞ্জিন' বলা যায়—অর্থাৎ সে এঞ্জিন এক জায়গায় খাটানো থাকে; তার চাকার সঙ্গে দড়ি শিকল বা লোহার হাতল জুড়ে গাড়ি টানা, মোট বওয়া, জিনিসপত্র উঠানো-নামানো প্রভৃতি নানারকম কাজ চালানো হয়। সেই সময় হতেই চাকায়-বসানো চলন্ত এঞ্জিন গড়বার খেয়াল স্টিফেনসনের মাথায় চেপেছিল।

যা হোক ক্রমে স্টিফেনসনের অবস্থার উন্নতি হতে লাগল। ক্রমে তার সপ্তাহে বারো

শিলিং (নয় টাকা) মাইনে হল—তার উপর জুতা সেলাই করে আর ঘড়ি মেরামত করেও সে কিছু কিছু উপার্জন করতে লাগল। সকলে বলল, "জর্জ মস্ত রোজগেরে হয়েছে।" এইভাবে প্রায় ত্রিশ বৎসর কেটে গেল, এর মধ্যেই পাকা এঞ্জিনিয়ার বলে স্টিফেনসনের বেশ একটু নাম হয়েছে।

১৮১৪ খৃস্টাব্দে তেত্রিশ বৎসর বয়সে এক খনির মালিককে রাজি করিয়ে স্টিফেনসন তার প্রথম চলন্ত এঞ্জিনের পরীক্ষা করেন। এই এঞ্জিনের সঙ্গে কয়লার গাড়ি জুড়ে দেখা গেল যে পাঁচশত মণ কয়লা উঁচু রাস্তায় ঘণ্টায় চার মাইল করে নেওয়া যায়। আগে ট্রামের লাইন বসিয়ে তার উপর লোকেরা গাড়ি ঠেলে নিত, সেই লাইনের উপরই এঞ্জিন বসিয়ে কয়লা চালানো হতে লাগল। তার পর বছরখানেকের মধ্যে আরো ভালো দুটি এঞ্জিন তৈয়ারি হল। ক্রমে আশেপাশে আরো কত কয়লার খনিতে স্টিফেনসনের এঞ্জিন চলতে লাগল। এমনি করে আট-দশ বৎসর কেটে গেল।

তখন স্টকটন হতে ডার্লিংটন পর্যন্ত কয়েক মাইল ট্রামের লাইন বসিয়ে ঘোড়ার ট্রাম করবার কথা হচ্ছিল। স্টিফেনসন প্রস্তাব করলেন, ঐ লাইনের উপর এঞ্জিনের গাড়ি চালানো হোক। অনেক কথাবার্তা হাঁটাহাঁটির পর, ট্রামের কর্তারা রাজি হলেন। ১৮২৫ খৃস্টাব্দে এই লাইন যেদিন খোলা হল তখন 'স্টিফেনসনের লোহার ঘোড়া' দেখবার জন্য ভিড় জমে গিয়েছিল। কয়লা আর ময়দায় বোঝাই হয়ে একগাড়ি যাত্রী নিয়ে স্টিফেনসনের এঞ্জিন স্টকটন হতে রওয়ানা হল; স্টিফেনসন নিজে তার ড্রাইভার। গাড়ির আগে আগে কোম্পানির লোক ঘোড়ায় চড়ে নিশান নিয়ে ছুটল। কিন্তু স্টিফেনসন তাঁর এঞ্জিনে পুরো দম দিয়ে এমন ছুটিয়ে দিলেন যে, সে লোকটির আর সঙ্গে যাওয়া হল না। ডার্লিংটনে সমস্ত মালপত্র নামিয়ে সমস্ত ট্রেনটিকে পঙ্গপালের মতো লোক-বোঝাই করে স্টিফেনসন স্টকটনে ফিরে এলেন। না জানি সে সময়ে লোকের মনে কিরকম উৎসাহ হয়েছিল।

কিন্তু এতেও গোলমাল মিটল না। এর পর যখন মানচেস্টার থেকে লিভারপুল পর্যন্ত রেল করবার কথা হল, তখন আবার তুমুল ঝগড়া আরম্ভ হল। রেলগাড়ি জিনিসটাতেই অনেকের আপত্তি; কেউ কেউ তাকে 'শয়তানের যন্ত্র' বলে গাল দিতেও ছাড়ে নি। এর মধ্যে আবার অন্য কয়েকটি এঞ্জিনওয়ালা এসে বললেন, "আমরা আরো ভালো এঞ্জিন বানিয়েছি—আমাদের উপর ভার দাও।" কেউ বললেন, "স্টিফেনসন আবার কোথাকার কে? নাম জানি না, ধাম জানি না—এত বড়ো কাজের ভার কি যার তার উপর দেওয়া যায়?" তখন চারিদিক থেকে পার্লামেণ্টের কাছে দরখাস্ত যেতে লাগল। পার্লামেণ্টের হুকুমে সব এঞ্জিন এক জায়গায় আনিয়ে তার পরীক্ষা নেওয়া হল। পরীক্ষায় স্টিফেনসনের এঞ্জিন আর সবক'টাকে একেবারে পিছনে ফেলে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল ছুটে সকলের মনে এমন তাক লাগিয়ে দিল যে, যারা ঝগড়া করতে এসেছিল তাদের আর কথাটি কইবার মুখ রইল না। এঞ্জিনওয়ালারা তাদের এঞ্জিনের ঝ্যাক্-ঝ্যাকানি বন্ধ করে লজ্জায় বাড়ি চলে গেল।

এমনি করে ১৮৩০ খৃস্টাব্দে রীতিমতো রেলের চলাচল আরম্ভ হল। তার পর কত

এঞ্জিন তৈরি হল, কত দিকে কত রেলের লাইন বসে গেল, গরিবের ছেলে স্টিফেনসন মস্ত ধনীলোক হয়ে গেলেন। কিন্তু জীবনের শেষপর্যন্ত তাঁর সাদাসিধা চালচলন আর সহজ সরল ব্যবহারের কোনো পরিবর্তন হয় নি। স্টিফেনসনের একমাত্র ছেলে রবার্টও কালে একজন নামজাদা এঞ্জিনিয়ার হয়েছিলেন: রেলের পোল তৈরি বিষয়ে তাঁর বিশেষ-রকম সুনাম ছিল।

সন্দেশ—শ্রাবণ, ১৩২৩

সূর্যের কথা

সূর্যটা একটা গোল আগুনের পিণ্ড, এ কথা আমরা সকলেই জানি। গোল, সেটা চোখেই দেখতে পারি—আর 'আগুন' কি না তা একটিবার দুপুর রোদে দাঁড়ালেই আর বুঝতে দেরি লাগে না। পণ্ডিতেরা বলেন, এই পৃথিবীটার মতো তেরো লক্ষ পিণ্ডের তাল পাকালে তবে ঐ সূর্যটার সমান বড়ো হয়। তাঁরা কেমন করে জানলেন? যাঁরা জরিপ করেন তাঁরা জানেন, খুব দূরের জিনিসকে নানারকমে পরখ করে এমন হিসাব পাওয়া যায় যা থেকে চট্ করে বলা যায় যে জিনিসটা কতখানি দূরে। এই কৌশলটি পণ্ডিতেরা সূর্যের উপর খাটিয়েছেন। পৃথিবীর দুই জায়গায় দুইজন লোক বসে সূর্যটাকে খুব সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন, কোন সময়ে সেটাকে আকাশের ঠিক কোন জায়গায় দেখা যায়—এবং দুজনের হিসাব মিলিয়ে অঙ্ক কষে বলেছেন যে সূর্যটা এখান থেকে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে। সে যে কতদূর তা আমাদের কল্পনাতেই আসে না। একটা এঞ্জিন যদি ঘণ্টায় ষাট মাইল করে ক্রমাগত ছুটে আজ সূর্যের দিকে রওয়ানা হয়, সে একশো সাতাত্তর বছর পরে (২০৯৩ খ্রীস্টাব্দে) সূর্যে গিয়ে পৌঁছাবে। পণ্ডিতেরা এই-সকল মাপ নিয়ে বলছেন যে ঐ সূর্যের পাশে পৃথিবীটাকে বসালে সেটা দেখাবে যেন একটি তরমুজের পাশে একটি মুসুরির ডাল।

সূর্যটা কিসের তৈরি? সূর্যের আলোক পরীক্ষা করে পণ্ডিতেরা বলেন যে, পৃথিবীটা যা দিয়ে তৈরি সূর্যটাও ঠিক তাই দিয়েই তৈরি। তবে, সেই-সব মালমসলা জমে এখানে যেমন জল মাটি পাথর হয়েছে সেখানে তা হবার জো নেই—কারণ, সেখানকার সর্বনেশে গরমে সব জিনিস সত্য সত্যই আগুন হয়ে উঠে। লোহা শুধু গলে যায় তা নয়, ফুটন্ত জলের মতো টগ্‌বগ্ করে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। এই ফুটন্ত আগুন আর জ্বলন্ত বাষ্প সূর্যের চারিদিক ঘিরে লক্‌লক্ করতে থাকে। শুধু চোখে মনে হয় সূর্যটা বেশ একটি মোলায়েম গোল জিনিস, তার গায়ে কোথাও আঁচড়ের দাগটি পর্যন্ত নেই। কিন্তু আসলে তা নয়। ভালো দুরবীন দিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, তার সমস্ত গা ভরে আগুনের চিক্‌মিকি খেলছে—আগুনের সমুদ্রে আগুনের ঢেউ, তার মধ্যে বড়ো-বড়ো আগুনের ডেলা পাগলের মতো ডুবছে আর ভাসছে। তা ছাড়া সূর্যের গায়ে প্রায়ই ছোটো বড়ো ফোস্কা দেখা যায়—ফোস্কাগুলি তত উজ্জ্বল নয়, তাই দেখতে হঠাৎ কালো দেখায়; জলের মধ্যে

যেমন বুদ্‌বুদ্‌ ওঠে সূর্যের গায়ে তেমনি আগুনের ফোস্কা ওঠে আর ফেটে পড়ে। এক-একটি বুদ্‌বুদ্‌ মাঝে মাঝে এত বড়ো হয় যে, কালো কাঁচ দিয়ে দেখলে সেগুলোকে শুধু চোখেই দেখতে পার। ঐরকম এক-একটা বুদ্‌বুদের মধ্যে ইচ্ছা করলে, দু-দশটা পৃথিবীকে স্বচ্ছন্দে পুরে রাখা যায়। ঐ ফোস্কাগুলি এক-একটি আগুনের ঘূর্ণিচক্র, তার চারিদিকে দম্‌কা আগুন ঠেলে উঠছে।

সূর্যের তেজ এত বেশি যে তার চারিদিকে যে আগুনের শিখা ঝড়ের মতো উঠছে আর পড়ছে, সেগুলি আমরা দেখতেই পাই না। সূর্যের যখন পূর্ণগ্রহণ হয়, চাঁদটা মাঝে পড়ে তার চক্‌চকে শরীরটিকে আড়াল করে ফেলে, তখন তাদের চেহারা দেখা যায় আগুনের লকলকে জিভের মতো! শিখাগুলি হাজার হাজার মাইল জুড়ে দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলতে থাকে, কখনো আগুনের ঝাপটা দিয়ে মিনিটে ছয় হাজার মাইল ছুটে যায়, কখনো শান্ত মেঘের মতো সূর্যের গায়ে ভেসে বেড়ায়। এক-একটাকে দেখে মনে হয় যেন আগুনের ফোয়ারা উঠছে। তার মধ্যে যদি আমাদের এই পৃথিবীটিকে ছেড়ে দেও, এটি চক্ষের নিমেষে গলে বাষ্প হয়ে কোথায় যে মিলিয়ে যাবে সে আর খুঁজেই পাবে না। সূর্যের চারিদিকের এই অগ্নিমেঘের স্তরটিকে দিনের আলোতে দেখবার জন্য পণ্ডিতেরা আশ্চর্যরকম উপায় বার করেছেন, তার জন্য তাঁদের এখন আর গ্রহণের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় না।

কিন্তু সূর্যের চারিদিকে আর-একটি জিনিস আছে যেটিকে গ্রহণ ছাড়া দেখবার জো নেই—সেটিকে সূর্যের কিরীট (Corona) বলা যায়। পৃথিবীর চারিদিকে যেমন বাতাসের আবরণ, সূর্যের চারিদিকেও তেমনি বহুদূর পর্যন্ত এই কিরীটের ঢাকনি। যাঁরা সূর্যের পূর্ণগ্রহণ দেখেছেন তাঁরা বলেন, এমন আশ্চর্য অদ্ভুত দৃশ্য আর কিছু নেই। যখন গ্রহণ সম্পূর্ণ হয়ে আসতে থাকে, চাঁদের কালো ছায়া যখন চোখের সামনে পাহাড় সমুদ্র সব গ্রাস করে ফেলতে থাকে, আকাশের অদ্ভুত ফ্যাকাশে রঙ আর পৃথিবীর অন্ধকার দেখে, পশুপাখি পর্যন্ত ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়, সেই সময়ে সূর্যের তেজ চাপা পড়ে তার আশ্চর্য কিরীটের শোভা দেখা যায়। শুধু এই কিরীটের সুন্দর স্নিগ্ধ আলো দেখবার জন্যই কত লোকে পয়সাকড়ি খরচ করে হাজার হাজার মাইল পার হয়ে গ্রহণ দেখতে যায়। এই কিরীটের চেহারা সব সময়ে একরকম থাকে না—কখনো সেটা চারিদিকে বেশ সমান ভাবে গোল হয়ে থাকে, কখনো তার মধ্যে ভয়ানক ঝড় ঝাপটার লক্ষণ দেখা যায়—কখনো তা থেকে লম্বালম্বা ছটা বেরিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে; মোটের উপর বলা যায়, যে সময়ে সূর্যের গায়ে ফোস্কা বেশি দেখা যায় সেই সময়ে তার আগুনের শিখাগুলিরও অত্যাচার বাড়ে আর সেই অত্যাচারে তার কিরীটটিকেও ঘাঁটিয়ে তোলপাড় করে তোলে। আমরা জানি যে পৃথিবীটা চব্বিশ ঘণ্টায় একবার পাক খায়, তাতেই আমাদের দিন-রাত হয়। সূর্যটাকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সেও ভয়ংকর বেগে লাট্টুর মতো ক্রমাগত পাক খাচ্ছে—কিন্তু একটি পাক খেতে তার ছাব্বিশ দিন সময় লাগে।

অনেকের বিশ্বাস এই যে, সূর্যটা এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে আছে—আর পৃথিবী গ্রহ চন্দ্র সবাই মিলে ঘুরতে ঘুরতে তার চারিদিক প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু আসলে তা

নয়—বিশ্বজগতে কারো স্থির হয়ে বসে থাকবার হুকুম নাই। আমাদের এই পৃথিবী এবং আর-সমস্ত গ্রহকে নিয়ে সূর্য ভয়ানক বেগে শূন্যে ছুটে চলেছে। সে কোনদিকে কিরকম বেগে চলছে, তাও পণ্ডিতেরা হিসাব করে ঠিক করেছেন। এই হিসাবে সূর্য ঘণ্টায় প্রায় কুড়ি হাজার মাইল পথ ছুটে চলেছে।

শুনলে হঠাৎ হয়তো মনে হতে পারে, এমন সাংঘাতিকভাবে চলতে গিয়ে হয়তো কোনদিন কোনো তারার সঙ্গে তার ছুঁ লেগে যাবে—কিন্তু সেরকম ভয়ের কোনো কারণ নেই। এই-সব তারাগুলি এক-একটি এত দূরে যে সূর্যটা দশলক্ষ বৎসর এইভাবে ছুটলেও কোনো তারার কাছে পৌঁছবার সম্ভাবনা নেই। তোমরা হিসাব করে দেখ—এক ঘণ্টায় যদি কুড়ি হাজার মাইল যাওয়া যায় তা হলে দশলক্ষ বৎসরে কত মাইল? ২০০০০×২৪×৩৬৫×১০০০০০০! তা হলে এক-একটি তারা কতখানি দূরে একবার ভাবতে চেষ্টা কর।

সন্দেশ—ভাদ্র, ১৩২৪

ডাকঘরের কথা

সন্দেশের ধাঁধার উত্তরের চিঠিগুলি সেদিন দেখছিলাম। কেউ আধ মাইল দূর থেকে লিখেছে চিঠি, কেউ লিখেছে পনেরোশো মাইল দূর থেকে—কিন্তু এক পয়সার পোস্টকার্ডে প্রায় সকলেই লিখেছে। এক পয়সা খরচে পনেরোশো মাইল চিঠি পাঠানো, একি কম সস্তা হল? হঠাৎ মনে হতে পারে অত কম মাশুলে এতদূর চিঠি পাঠাতে ডাকঘরের বুঝি লোকসান হয়; কিন্তু তারা কি দুই-এক খানা চিঠি পাঠায়? প্রতিদিন লাখে লাখে চিঠি আর পার্সেল তারা পাঠায়; তাতেই তাদের খরচে পুষিয়ে যায়। ডাকঘরের বন্দো-বস্তই-বা কি কম আশ্চর্যরকম! তুমি হয়তো কলকাতায় বসে একটা পোস্টকার্ডে চিঠি লিখে ডাকবাক্সে সেটাকে ফেলে দিলে। কিছুক্ষণ পরে ডাকঘরের লোক এসে ডাকবাক্সের চাবি খুলে চিঠিগুলো ডাকঘরে নিয়ে গেল। সেখানে অনেকগুলি লোকে মিলে চিঠির উপরে ডাকঘরের ছাপ মারে, আর এক-একটা থলিতে এক-একটা রেলে পাঠাবার চিঠিগুলি ভরে ফেলে—যেমন দার্জিলিং মেলে দার্জিলিং, খরসান, জলপাইগুড়ি, রাজসাহী, কুচবিহার, এসব জায়গার চিঠি; পঞ্জাব মেলে বর্ধমান, মধুপুর, পাটনা, বাঁকিপুর, এলাহাবাদ, দিল্লী, লাহোর এই-সব জায়গার চিঠি। তার পর সব ছোটো ডাকঘর থেকে বড়ো ডাকঘরে থলেগুলি পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকে স্টেশনে চলে যায়! রেলের গাড়ির মধ্যে আবার ডাকঘরের বন্দোবস্ত আছে। সেখানে থলিগুলো খুলে প্রত্যেক জায়গাকার চিঠি আলাদা করে এক-একটা খোপে ভরে রাখে। তার পর সব চিঠি বাছা হয়ে গেলে এক-এক জায়গার চিঠি এক-একটা আলগা থলিতে ভরে ফেলে। সেখানে যখন রেল পৌঁছায় তখন রেলের ডাকঘর থেকে সেই সেই জায়গার চিঠিগুলো নামিয়ে দেয়। তার পর আবার ডাকঘরে সেই থলি নিয়ে গিয়ে তার থেকে চিঠি বের করে, বেছে, পিয়ন দিয়ে বাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে

দেওয়া হয়। এত হাঙ্গামার পরেও চিঠি যে ঠিকমতো গিয়ে পৌঁছায় এই আশ্চর্য—ক্বচিৎ ডাকঘরের কোনো লোকের দোষে হারাতে পারে। পৃথিবীর যে-কোনো জায়গার একজন লোকের ঠিকানা খুঁজে বের করে তার ঠিকানায় একখানা চিঠি লিখে দাও; তার পর ব্যস্, আর ভাবতে হবে না—সেটা ঠিক সেই লোকের কাছে হাজির হবে।

সব সময়ই যে রেলে ডাক যায় তা নয়। রেলে যায়, জাহাজে যায়, ছোটো স্টিমারে যায়, নৌকায় যায়, গাড়িতে যায়, মানুষের পিঠে যায়, কুকুরে-টানা গাড়িতে যায়—এমন-কি, এরোপ্লেনে করে আকাশ দিয়েও যায়। এমন জায়গাও তো আছে যেখানে ডাক-ঘর নাই। সেখানের ঠিকানাতে চিঠি লিখলেও চিঠি ঠিকই পৌঁছায়। তবে সেখানে চিঠি যেতে কিছু দেরি লাগে। ইউরোপে যে-সব সৈন্য যুদ্ধ করছে তাদের কাছেও চিঠি যাবার উপায় আছে। সে যেখানেই থাকুক-না কেন তার নাম আর তার সৈন্য-দলের নাম, এইটুকু জানলেই লড়াইয়ের ডাকঘরওয়ালারা ঠিক তার কাছে চিঠি কিংবা পার্সেল পৌঁছে দেবে। আমাদের দেশে অনেক জায়গায় 'রানার'-এর ডাকের বন্দোবস্ত আছে। একজন লোক কাঁধে করে চিঠির থলি নিয়ে এক ডাকঘর থেকে অন্য ডাকঘরে পৌঁছে দেয়। হাজারিবাগে আগে ঐরকম বন্দোবস্ত ছিল। তখন অনেক 'রানার' বাঘের মুখে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে। অনেক সময় দুষ্টু লোকে নির্জন রাস্তায় পেয়ে 'রানার'কে মেরে চিঠিপত্র খুলে টাকাকড়ি নিয়ে চলে যায়।

প্রায় সত্তর বৎসর আগে কোনো দেশে টিকিট অথবা পোস্টকার্ড ব্যবহারের নিয়ম ছিল না। তখন চিঠিপত্র পাঠাতে অত্যন্ত বেশি খরচ হত। ইংলণ্ডের সার রোল্যাণ্ড হিল প্রথমে টিকিট ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। সে সময়ে চিঠির মাশুল এত বেশি ছিল যে গরিব লোকের পক্ষে চিঠি পাওয়া বড়ো মুশকিলের কথা ছিল। যার কাছে চিঠি যাবে তাকেই মাশুল দিতে হত; আর অনেক সময় মাশুল দিতে না পারায় অনেক গরিব লোককে দরকারি চিঠিও ফিরত দিতে হত। লণ্ডন থেকে মাত্র চার মাইল দূরে একটা জায়গায় একটা চিঠি পাঠাতে এক টাকারও বেশি খরচ হত। পার্লামেণ্ট সভার সভ্যেরা বিনা পয়সায় চিঠি পাঠাতে পারতেন—চিঠির উপর তাঁর একটা নাম সই থাকলেই হল। তাঁরা অনেক সময় তাঁদের বন্ধুদের চিঠির উপরও সই করে দিতেন আর বন্ধুরা সব বিনা পয়সায় চিঠি পাঠাতেন। কেবল চিঠি নয়, অনেক বড়ো-বড়ো জিনিসও তাঁরা ঐরকম সই করে বিনা পয়সায় পাঠাতেন। গরিব লোকেরই বড়ো মুশকিল হত। তারা নিরুপায় হয়ে শেষে নানারকম ফাঁকি দিতে আরম্ভ করল। একজন তার বোনকে বলল যে সে যখন তাকে চিঠি লিখবে তার উপরের ঠিকানার পাশে কতকগুলি চিহ্ন থাকবে; সেই চিহ্ন দেখে বোঝা যাবে সে ভালো আছে কি অসুস্থ হয়েছে। বোনও সেইরকম চিহ্ন দিয়ে তার ভাইকে চিঠি লিখত। চিঠির ভিতরে কিন্তু কেবল সাদা কাগজ। চিঠি যখন পৌঁছাত তখন তার উপরের চিহ্নগুলি দেখে নিয়ে তারা চিঠিটা ফেরত দিত আর বলত, "অত মাশুল দিয়ে চিঠি নেবার ক্ষমতা আমার নেই।" এইরকম আরো কত উপায়ে লোকেরা ডাকঘরকে ঠকাত।

রোল্যাণ্ড হিল যখন টিকিট ব্যবহারের প্রস্তাব করেন তখন বিলাতে পার্লামেণ্ট সভায়

ভয়ানক আপত্তি হয়। কিন্তু অনেক খবরের কাগজওয়ালা তাঁর প্রস্তাবের সপক্ষে লেখেন আর সাধারণ লোকেও অনেক সভাসমিতি করে তাঁর হয়ে বলেন। রোল্যাণ্ড হিল ছেলেবেলায় গরিব লোক ছিলেন ; তিনি গরিবের কষ্ট ভালো করে বুঝতেন আর তাদের জন্যে খাটতেও সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর মনে ছিল, ছেলেবেলায় একদিন তাঁকে একটা চিঠির মাশুল জোগাড় করার জন্য রাস্তায় ঘুরে ছেঁড়া কাপড় বিক্রি করতে হয়েছিল। তিনি চিঠি পাঠাবার খরচ সম্বন্ধে অনেক হিসাব করে বললেন, "চিঠি পাঠাবার খরচ অত্যন্ত সামান্য ; বেশি খরচ ডাকঘরেরই হয়! আর অনেক চিঠি লোকে নেয় না বলে ডাকঘরের বিস্তর টাকা লোকসান হয়। বড়ো লোকেরা তো বিনা পয়সায়ই অনেক চিঠি পাঠান। এর চেয়ে ভালো বন্দোবস্ত হয় যদি নিয়ম করা যায় যে, চিঠি পাঠাবার আগে মাশুল দিতে হবে। আর মাশুল দেওয়া হয়েছে কিনা বুঝবার জন্য চিঠির উপর একটা টিকিট লাগিয়ে দিলেই হবে। কত মাশুল দেওয়া হল তা টিকিটেই লেখা থাকবে!" অনেক আপত্তির পর পার্লামেন্ট একবার এ উপায়টা পরীক্ষা করতে রাজী হলেন। রোল্যাণ্ড হিলের উপরেই সব বন্দোবস্তের ভার পড়ল। কয়েক বৎসর পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, এই ডাকটিকিটের বন্দোবস্ত এত সুবিধাজনক যে এর বিরুদ্ধে আর কোনো আপত্তিই টেঁকে না। তখন থেকে বিলাতে টিকিটের চল আরম্ভ হল আর দেখতে দেখতে সমস্ত পৃথিবীময় টিকিটের ব্যবস্থার আরম্ভ হল। ডাকঘরের বন্দোবস্তও রোল্যাণ্ড হিলের বুদ্ধিতেই অনেকটা হয়েছে।

সন্দেশ—অগ্রহায়ণ, ১৩২৩

অসুরের দেশ

যে-জাতি শিল্পে বাণিজ্যে বেশ অগ্রসর, যাহারা লেখাপড়ার চর্চা করে, হিসাব করিয়া পাকা দালান ইমারত গাঁথিতে জানে এবং নানারূপ ধাতু ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারে বেশ অভ্যস্ত, মোটের উপর তাহাকে সভ্য জাতি বলা যায়! ইতিহাসের প্রাচীন যুগে যে-সকল সভ্য জাতির নাম পাওয়া যায় তাহার মধ্যে একটা জাতির কথা শুনি যাহার নাম অসুর বা আশুর। ইংরাজিতে তাহাকে বলে আসিরিয়া (Assyria)। এই অসুর দেশের নাম প্রাচীন বাইবেল প্রভৃতি পুরাতন পুঁথিতে অনেক স্থানে পাওয়া যায় এবং একশত বৎসর আগে এই দেশের সঙ্গে মানুষের ঐটুকু মাত্র পরিচয় ছিল। মানুষ অসুরের দেশ ও তাহার রাজধানী নিনেভের কাহিনী কেবল পুঁথিতেই পড়িয়া আসিত কিন্তু তাহার চেহারা কেহ চোখে দেখে নাই। কারণ, যেখানে শহর ছিল সে স্থানে খোঁজ করিতে গেলে কেবল মাটির ঢিপি আর প্রকাণ্ড ময়দান ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইত না।

এই অসুরের সঙ্গে আমাদের পুরাণের অসুরদের কোনো সম্পর্ক আছে কি না তাহা আমি জানি না। এখন মেসোপটেমিয়ার যেখানে ইংরাজের সহিত তুর্কির লড়াই চলিতেছে তাহার প্রায় তিনশত মাইল উত্তরে প্রাচীন অসুরের দেশ ছিল। ইহা কেবল আন্দাজের কথা

নয়—বাস্তবিকই সেখানে ময়দান খুঁড়িয়া মানুষ সেই পুরাতন লুপ্ত শহরকে বাহির করিয়াছে। প্রায় সাড়ে চারহাজার বৎসরের পুরাতন শহর, সেখানে এই অসুর জাতি দু হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়া পরে যুদ্ধবিগ্রহে একেবারে ধ্বংস পায়। সেও প্রায় আড়াই হাজার বৎসর আগেকার কথা—তখনো বুদ্ধের জন্ম হয় নাই।

কথায় বলে 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়'। এক-একজন লোক থাকে তাহাদের অন্নবস্ত্রের অভাব নাই, সংসারে বিশেষ কোনো দুঃখ নাই অথচ তাহাদের কী যে খেয়াল, তাহারা ঘরবাড়ি ছাড়িয়া একটা কোনো হাঙ্গামা লইয়া ব্যস্ত থাকে। উত্তরে দক্ষিণে বরফের দেশে, আফ্রিকার মরুভূমিতে, পাহাড়ের চূড়ায় তাহারা অস্থির হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এইরূপ মাথা-পাগলা লোকের দ্বারা জগতের অনেক বড়ো-বড়ো আবিষ্কার হইয়া গিয়াছে। অসুরের রাজ্য আবিষ্কারও এইরূপেই হয়। লেয়ার্ড (Layard) নামে এক ইংরাজ সিংহলে কি একটা ভালো চাকরি পাইয়া এ দেশে আসিতেছিলেন। সোজা পথে জাহাজে চড়িয়া আসিলেই হইত, কিন্তু তাঁহার শখ হইল ডাঙার পথে মেসোপটেমিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেখিয়া তিনি এ দেশে আসিবেন।

কিন্তু ঐ-যে খেয়ালের মাথায় তিনি মেসোপটেমিয়া গেলেন, উহাতেই তাঁহার সব কাজকর্ম উলটাইয়া গেল। মেসোপটেমিয়ার উত্তরে বেড়াইবার সময় তাঁহার মনে হইল এই তো সেই প্রাচীন সভ্য জাতির দেশ, এখানে খুঁজিলে কি তাহাদের চিহ্ন পাওয়া যায় না? তাঁহার আর চাকরি করা হইল না—তিনি কতকগুলি মজুর লইয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিলেন। খুঁড়িতে খুঁড়িতে তাঁহার সঙ্গের টাকাপয়সা সব ফুরাইয়া আসিল, তিনি আবার টাকা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার দেখাদেখি আরো দু-চারটি লোক আসিয়া মাটি-খোঁড়া ব্যাপারে যোগ দিল। তখন তুর্কি রাজকর্মচারীদের মনে সন্দেহ জাগিল, 'এই লোকগুলা খামকা ঘরবাড়ি ছাড়িয়া বিদেশে আসিয়া মাটি কাটিতে চায় কেন? নিশ্চয়ই ইহাদের মনে কোনো দুষ্ট মতলব আছে।' সুতরাং তাহারা মাটি-কাটা বন্ধ করিয়া দিতে চাহিল। তার পর যখন মাটির ভিতর হইতে নানারকম অদ্ভুত মূর্তি আর ঘরবাড়ি বাহির হইতে লাগিল তখন এই আশ্চর্য কাণ্ড দেখিয়া সে-দেশী মজুরগুলা এমন ঘাবড়াইয়া গেল যে, তাহারাও কাজ করিতে চায় না। ইহার উপর সে দেশে নানারকম হিংস্র জন্তুর অত্যাচার ও জ্বরজারির উৎপাত তো ছিলই।

যাহা হউক, অনেক পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে—ইংরাজ ও ফরাসি গভর্নমেন্টের সাহায্যে শেষটায় মাটির নীচ হইতে একেবারে অসুরের রাজধানী বাহির হইয়া পড়িল। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য! কবে আড়াই হাজার বছর আগে সে শহর ধ্বংস হইয়াছে, লোকজন কোনকালে সে-দেশ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে অথচ এতদিন পরে তাহাদের সেই পুরাতন কীর্তিগুলি আবার কঙ্কালের মতো মাটির নীচ হইতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে।

সেকালের ইতিহাসে জানা যায় যে, নিনেভে শহর শত্রুর হাতে পড়িয়া আগুনে নষ্ট হয়—তাহার প্রমাণ এখনো চারিদিকে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আগুনেও সব নষ্ট করিতে পারে নাই। এখনো কত মূর্তি, কত কারুকার্য আর পাথরে আঁকা কত

ছবি আছে যাহা দেখিলে মনে হয় না যে এগুলি সেই লুপ্ত যুগের জিনিস। সেই সময়ে যে-সকল রঙ ব্যবহার হইত সেই রঙগুলি পর্যন্ত এক-এক জায়গার বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। এক-একটি ঘরের ছাদ, দেওয়াল প্রভৃতি এমন অবস্থায় আছে যে, সমঝদার লোকে তাহা দেখিয়া বলিতে পারে নূতন অবস্থায় ঘরটি ঠিক কিরকম ছিল। এই-সকল ছবি ও মূর্তি দেখিলে বোঝা যায় যে, সে দেশের লোকদের বেশ সৌন্দর্যজ্ঞান ছিল। ছবির মধ্যে লড়াই ও শিকারের ছবিই খুব বেশি—মাঝে মাঝে রাজারাজড়ার ছবিও আছে। ছবি দেখিয়া সে দেশের লোকদের অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক ও চেহারা সম্বন্ধে অনেক খবর জানা যায়। অসুরের দল আর তাহাদের শত্রুর দলের মধ্যে এ বিষয়ে কিরূপ তফাত ছিল, তাহাও অনেক ছবিতে পরিষ্কার দেখানো হইয়াছে। অসুরেরা বড়োই যুদ্ধপ্রিয় ছিল এবং প্রায়ই অন্যান্য জাতিদের সঙ্গে লড়াই লইয়া ব্যস্ত থাকিত।

অসুরদের কথা বলিতে হইলে তাহাদের ভাষার কথাও বলিতে হয়। সে ভাষায় এখন আর কেহ কথা বলে না, সে দেশের লোকেরা পর্যন্ত তাহার সম্বন্ধে কোনোরূপ সংবাদ জানে না—ভাষার একমাত্র চিহ্ন সেকালের অক্ষর। মাটির উপর বাটালি দিয়া তীরের ফলকের মতো অদ্ভুত সব আঁচড় কাটিয়া অক্ষর লেখা হইত। সেই মাটি পোড়াইয়া ইঁটের 'পুঁথি' তৈয়ারি হইত। একশত বৎসর আগে সে অক্ষর পড়িতে পারে এমন লোক পৃথিবীতে ছিল না। অথচ আজকাল পণ্ডিতেরা এই-সব আঁচড় পড়িয়া তাহা হইতে কত সংবাদ কত ইতিহাস উদ্ধার করিতেছেন। বিদ্যা বুদ্ধি ও বাণিজ্যে বাবিলনের লোকেরা অসুরদের চাইতে অনেক বেশি অগ্রসর ছিল, সুতরাং তাহাদের ভাষা ধর্ম শিল্প সাহিত্য আইনকানুন প্রভৃতি প্রায় সকল বিষয়েই অসুরেরা বাবিলনের অল্পাধিক অনুকরণ করিত। একটা উঁচু পাহাড়ের গায়ে বাবিলনের অক্ষরের পাশে পারস্যের অক্ষরে লেখা একটা যুদ্ধের বর্ণনা দেখিয়া একজন ইংরাজ পণ্ডিত এই দুয়ের তুলনা করিয়া বাবিলনের অক্ষরের সংকেত বাহির করেন। এইভাবে গ্রীক অক্ষরের সাহায্যে ইজিপ্টের অদ্ভুত ছবিওয়ালা অক্ষরের রহস্য বাহির করা হয়। এই-সকল পুরাতন অক্ষরে লেখা ইঁটের পুঁথি, কীর্তিস্তম্ভ বা খোদাই-করা পাহাড় প্রভৃতি হইতে অসুরদের ইতিহাসের অনেক কথা জানা গিয়াছে। অনেক রাজার নাম ও তারিখ, অনেক যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা, ছোটো বড়ো নানা জাতির সহিত সন্ধি ও বিবাদের সংবাদ এ-সমস্তই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। অসুরদের প্রধান অস্ত্র ছিল তীর-ধনুক। তাহারা ঘোড়ায় ও রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিত, সঙ্গে পদাতিক সৈন্যও থাকিত। যেমন যোদ্ধা তেমনি শিকারী। আমাদের দেশের মতো অসুরের দেশেও সেকালের রাজারা মৃগয়া করিতেন। হিংস্র জন্তু নষ্ট করিয়া প্রজাকে রক্ষা করা রাজারই কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইত।

অসুরে রাজাদের বীরত্বের কথা বলিতে গেলে একজনের কথা বিশেষভাবে বলা উচিত, তাঁহার নাম টিগলাৎ-পিলেসের। তিন হাজার বৎসর আগে ইনি অসুর দেশের রাজা হইয়া নানা দেশ জয় করেন। তাঁহার শাসনে অসুরের রাজ্য ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইনি যখন উত্তরে দিগ্বিজয় করিতে বাহির হন তখন বাবিলনের সৈন্যেরা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করে এবং রাজমন্দিরের দেবমূর্তি চুরি করিয়া লইয়া

যায়। টিগলাৎ-পিলেসের ইহার প্রতিশোধের জন্য বাবিলন আক্রমণ করেন ও তাহার রাজধানী পর্যন্ত লুটিয়া অনেকখানি দেশ অধিকার করিয়া ফেলেন। একদিকে যেমন যোদ্ধা, অন্যদিকে টিগলাৎ-পিলেসের একজন অসাধারণ শক্তিশালী শিকারী ছিলেন। হাতি সিংহ প্রভৃতি ভয়ানক জন্তু তিনি নিজের হাতে তীর-ধনুক ও তলোয়ার লইয়া শিকার করিতেন। তিনি রথে চড়িয়া প্রকাণ্ড দশটা হাতি ও প্রায় আটশত সিংহ শিকার করেন—ইহা ছাড়া পায়ে হাঁটিয়া যে-সকল সিংহ মারেন তাহার সংখ্যাও একশতের উপর হইবে।

টিগলাৎ-পিলেসের মারা গেলে পর অসুরদের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া পড়ে। তাহাদের প্রকাণ্ড রাজ্য ক্রমেই ছোটো হইতে থাকে। প্রায় দুইশত বৎসর পরে আরো কয়েকটি শক্তিশালী রাজার আবির্ভাব হয় এবং ইঁহারা আবার দেশকে জাগাইয়া তোলেন। এই-সকল রাজাদের মধ্যে অসুর-নসির-পালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহার রাজত্ব-কালের নানারূপ চিহ্ন ও পরিচয় খুব প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাতে দেখা যায় যে, ইনি একদিকে যেমন শৌখিন, অপর দিকে যুদ্ধের সময় তেমনি হিংস্র ও নিষ্ঠুর ছিলেন। দেশ-বিদেশের লোক তাঁহার নামে ভয়ে কাঁপিত!

ইঁহার রাজত্বের পর হইতে ক্রমে আবার অসুরদের অবনতি আরম্ভ হয়। তার পর অসুররাজকুলের শেষ যোদ্ধা মহাবীর অসুরবানি-পালের সময়ে আর একবার এ দেশ মাথা তুলিয়া উঠে। উৎসাহের চোটে অসুরেরা একেবারে আফ্রিকায় গিয়া ইজিপ্ট জয় করিয়া ফেলিল- দক্ষিণে আরবের মরুভূমিতে সসৈন্যে হাজির হইল। কিন্তু ইহাই তাহাদের শেষ কীর্তি। ক্রমাগত যুদ্ধ-বিদ্রোহের ফলে সমস্ত জাতি যখন অবসন্ন হইয়া পড়িল তখন প্রবল শত্রুরাও সুযোগ বুঝিয়া চারিদিক হইতে তাহাদের রাজ্য লুটিয়া লইল। অবশেষে পারস্যের দুর্দান্ত সেনাদল আসিয়া তাহাদের রাজধানী ঘিরিয়া ফেলিল। নিনেভে শহরের চারিদিকে প্রকাণ্ড দেওয়াল ঘেরা। এই দেওয়ালের জোরে অসুরেরা তিন বৎসর ধরিয়া তাহাদের প্রাচীন শহরের জন্য লড়াই করিল—কিন্তু অবশেষে হার মানিতেই হইল। তার পর এতদিনের সাধের শহর শত্রুর হাতে পড়িয়া একেবারে ছারখার হইয়া গেল।

কোথায়-বা অসুর রাজ্য—আর কোথায়-বা সেই অসুর জাতি। দুহাজার বছর সারা দেশ কাঁপাইয়া যাহারা রাজত্ব করিল এখন কেই-বা তাহাদের খবর রাখে। অত বড়ো নিনেভে শহর, সেও মাটির নীচে কবর চাপা পড়িল। এখন আবার লোকে সেই কবর খুঁড়িয়া তাহার কংকাল বাহির করিয়াছে! সেখানে গিয়া দেখ শ্মশানের মতো দেশ, লোক নাই জন নাই, আছে কেবল মৃত শহরের জীর্ণ কংকাল, আর রাত্রের অন্ধকারে সিংহের হুংকার।

সন্দেশ—মাঘ, ১৩২৩

নীহারিকা

তোমরা আকাশে 'কালপুরুষ' দেখিয়াছ? আজকাল অর্থাৎ এই ফাল্গুন মাসে প্রথম রাত্রে যদি দক্ষিণমুখী হইয়া দাঁড়াও তবে প্রায় মাথার উপর এই 'কালপুরুষ'কে

দেখিতে পাইবে, আর একবারটি যদি তাহাকে চিনিয়া রাখ তবে আর কোনোদিন ভুলিবে না।

পৃথিবীর যেমন মানচিত্র বা 'ম্যাপ' হয়, আকাশেরও তেমনি মানচিত্র আছে। এই-রকমের অনেক মানচিত্রে আকাশের তারার সঙ্গে অনেক অদ্ভুত ছবি আঁকা থাকে; তাহার মধ্যে যদি কালপুরুষ বা Orion-এর ছবি খুঁজিতে যাও, তবে হয়তো দেখিবে একটা হাত-পাসুদ্ধ মূর্তি আঁকা আছে কিন্তু আকাশে খুঁজিলে অবশ্য সেরকম কোনো চেহারা পাইবে না—দেখিবে কেবল ঐ তারাগুলি।

আকাশের গায়ে যে এত হাজার হাজার তারা জড়ানো রহিয়াছে, মানুষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই তাহার মধ্যে নানারকম ছবি ও মূর্তির কল্পনা করিয়া আসিতেছে। কতগুলা তারা মিলিয়া হয়তো অর্ধচন্দ্রের মতো দেখায়, মানুষে বলিল 'ওটা ধনুকের মতো'; কোনোটা হয়তো মুকুট, কোনোটা ষাঁড়ের মাথা, কোনোটা ভল্লুক, কোনোটা যমজ ভাই, কোনোটা যোদ্ধা, এইরূপ নানারকম কল্পনার মূর্তিতে সমস্ত আকাশটিকে ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেক সময়েই এ-সকল কল্পনাকে নিতান্তই আজগুবি বলিয়া মনে হয় কিন্তু এই কালপুরুষের-বেলা বোধ হয় কল্পনাটা বেশ খাটিয়াছে। দুই হাত দুই পা আর মাথা সবই মিলিতেছে, তার উপর আবার কোমরবন্ধ। তলোয়ারটি পর্যন্ত বাদ যায় নাই। এত কথা যে বলিলাম সে কেবল ঐ তলোয়ারটির জন্য। ঐ তলোয়ারটার দিকে একবার ভালো করিয়া দেখ দেখি; তিনটি তারার মধ্যে মাঝেরটি একটু কেমন কেমন দেখায় না? আর সবগুলি তারা পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে হীরার টুকরার মতো, কিন্তু এটা যেন কেমন একটু ঝাপসা ঠেকে। শুধু চোখে এই পর্যন্ত; কিন্তু দুরবীন দিয়া দেখ, আরো তফাত দেখিবে। যত বড়োই দুরবীন কষো-না কেন, আর সব তারাগুলিকে কেবলই ঝিক্‌মিকে হীরার মতো দেখিবে কিন্তু এই 'তারা'টিকে দেখিবে যেন সাদা মেঘের মতো। আকাশে এইরকম মেঘের মতো জিনিস আরো অনেক দেখা যায়—ইহাদের নাম নীহারিকা, ইংরাজিতে বলে Nebula।

পণ্ডিতেরা বলেন, এই নীহারিকাগুলা এককালে তারা হইবে এবং এই তারাগুলাও এককালে নীহারিকা ছিল। আমরা যাহাকে সৌরজগত বলি—এই সূর্য এবং গ্রহ উপগ্রহ-সুদ্ধ তাহার বিশাল পরিবারটি—এই-সমস্তই এককালে কোনো এক প্রকাণ্ড নীহারিকার মধ্যে খিচুড়ি পাকাইয়া ছিল। সে যে কত বড়ো ব্যাপার তাহা কল্পনাও করা যায় না। সেই নীহারিকা আকাশের একটা প্রকাণ্ড কোণ জুড়িয়া জ্বলন্ত বাষ্পের মতো দপ্‌দপ্ করিয়া জ্বলিত। তাহার মধ্যে না ছিল চন্দ্র সূর্য, না ছিল পৃথিবী।

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কাহারও স্থির হইয়া থাকিবার নিয়ম নাই, একটা কণাপ্রমাণ বস্তু আর একটি কণাকে পাইলে এ উহাকে টানিয়া লয়, দশটা কণা একত্র হইলেই পরস্পরের দিকে ছুটিয়া জমাট বাঁধিতে চায়। সুতরাং এত বড়ো নীহারিকাটি যে স্থির হইয়া থাকিবে, এমন কোনো উপায় ছিল না—সে আপনার ভিতরকার টানাটানির মধ্যে পড়িয়া ঘুরপাক খাইতে লাগিল আর তাহার মধ্যখানে প্রকাণ্ড একটা বাষ্পের ঢিপি জমাট হইতে লাগিল। এই জমাট ঢিপিকেই এখন আমরা সূর্য বলি।

কালপুরুষের নীহারিকার চেহারা একবার দেখ—ঐ জমাট মেঘের মতো জিনিসটার ভিতর হইতে কত ডালপালা বাহির হইয়াছে ; ঐ ডালপালাগুলি আবার আলগাভাবে জমাট বাঁধিয়া গ্রহ উপগ্রহের সৃষ্টি করিবে। ঘুরন্ত চাকার গা হইতে যেমন করিয়া কাদা ছিটকাইয়া যায়, এক-একটা নীহারিকার চক্র হইতে ঠিক যেন সেইরকম জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। দেখিতে অবশ্য সমস্ত নীহারিকাটি স্থির দেখা যায়—কারণ, জিনিসটা এত দূরে যে ঘণ্টায় লক্ষ মাইল বেগে ছুটিলেও এখান হইতে তাহাকে একেবারে স্তব্ধ দেখা যাইবে।

আকাশে এইরকম নীহারিকা কত যে আছে, তাহার আর অন্ত নাই। কোনোটা একেবারে ঝাপসা কুয়াশার মতো, কোনোটার মধ্যে সবে একটু জমাট বাঁধিতেছে, কোনোটা রীতিমতো গোলা পাকাইয়া উঠিতেছে। এক-একটার চেহারা ঠিক যেন ঘুরন্ত চরকি বাজির মতো, মনে হয় যেন জ্বলন্ত চক্র হইতে আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। আবার এমন নীহারিকাও আছে যাহাকে এখন দেখিতে ঠিক তারার মতোই দেখায় ; সে যে এক সময়ে নীহারিকা ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ এখনো তাহার আশেপাশে অতি ঝাপসা কুয়াশার মতো নীহারিকার শেষ নিশ্বাসটুকু লাগিয়া আছে। সে এত ঝাপসা যে, অনেক সময় খুব বড়ো দূরবীক্ষণ দিয়াও তাহার কিছুমাত্র ধরা যায় না, ধরা পড়ে কেবল ফোটোগ্রাফের প্লেটে।

ফোটোগ্রাফের প্লেটে কেমন করিয়া ছবি তোলে দেখিয়াছ তো ? ক্যামেরার ভিতর হইতে সে টুক্ করিয়া একটিবারমাত্র তোমার দিকে তাকায় আর ঐ এক দৃষ্টিতেই তোমার চেহারার ছাপটুকু নিজের মধ্যে ধরিয়া লয়। সে একবার যাহা ভালো করিয়া ধরে তাহা আর ভুলিতে চায় না। এক মিনিট খুব ঝাপসা জিনিসের দিকে তাকাইলে মানুষের চোখ শ্রান্ত হইয়া পড়ে—সে তখন আর ভালো দেখে না ; কিন্তু ফোটোগ্রাফের প্লেট যত বেশি করিয়া তাকায় ততই বেশি দেখিতে পায়। এমনি করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া সে ঐ অন্ধকারের মধ্যেই অনেক আশ্চর্য জিনিসের সংবাদ বাহির করে। এইরকম ফোটোগ্রাফ দেখিলে বোঝা যায় যে, সমস্ত আকাশটাই প্রায় নীহারিকায় ঢাকা—আকাশের যেদিকে তাকাও সেইদিকেই নীহারিকার জাল।

সন্দেশ—ফাল্গুন, ১৩২৩

মাটির বাসন

মাটির বাসন গড়িতে জানে না, এমন জাতি পৃথিবীতে খুব কমই আছে। নিতান্ত অসভ্য মানুষ যাহারা কাপড় পরিতে জানে না, যাহারা বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের মধ্যেও মাটির বাসনের চল আছে। অতি প্রাচীনকালের মানুষ, যাহারা পাথর শানাইয়া অস্ত্র গড়িত, যাহারা ধাতুর ব্যবহার শিখে নাই, তাহাদের কবর খুঁড়িলে মাটির গেলাস ঘটি বাটি পাওয়া যায়। কেবল তাহাই নয়, এক-একটা জিনিসের উপর তাহারা নানারূপ কারুকার্য করিয়া তাহাদের সৌন্দর্যবোধের যে পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে এখনো

পর্যন্ত তাহার চিহ্ন মাঝে মাঝে দেখিতে পাই। যাহারা আগুনের ব্যবহার করিতে জানিত না তাহারা মাটির বাসন গড়িয়া রোদে শুকাইয়া লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিত ; কোনো কোনো স্থলে বাঁশের বা পাতার ঝুড়ি বানাইয়া তাহার গায়ে মাটি লেপিয়া বাসন বানানো হইত, এরূপও দেখা গিয়াছে।

দশহাজার বৎসর আগে ইজিপ্ট দেশে যে মাটির বাসন তৈয়ারি হইত, তাহার সুন্দর সুন্দর নমুনা পাওয়া গিয়াছে। বাসনগুলি সমস্তই হাতে গড়া, কারণ, কুমারের চাকে মাটি গড়িবার কায়দা সে সময়ে তাহাদের জানা ছিল না। কিন্তু এ কাজে তাহাদের হাত এমন সাফাই ছিল যে, বড়ো-বড়ো জালার মতো পাত্রগুলির গড়নেও কোথাও খুঁত ধরিবার জো নাই। বড়ো-বড়ো জাহাজী নৌকা করিয়া এই-সকল বাসন দেশ-বিদেশে চালান হইত এবং তখনকার লোকে আগ্রহ করিয়া তাহা কিনিত। বাসনগুলির উপর চকচকে কালো পালিশ থাকিত, তাহার গায়ে সাদা রঙের কারুকার্য।

মাটির বাসন নানারকমের। সাধারণ 'মেটে বাসন' যাহা অল্প আঁচে পোড়াইলেই চলে, আমাদের দেশে তাহার কিছুমাত্র অভাব নাই। গেলাস, ভাঁড়, সরা, মালসা হইতে আরম্ভ করিয়া কুঁজা, কলসী, জালা পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাইবে। কিন্তু 'সাধারণ মাটির' জিনিসও যে কত সুন্দর হইতে পারে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই নানা দেশের লোকে নানাভাবে তাহা দেখাইয়া আসিতেছে।

আর একরকম মাটির জিনিস হয়, তাহাকে পাথুরে মাটি বলা যায়। এগুলিকে কড়া আগুনে পোড়াইলে পাথরের মতো মজবুত হয় এবং তখন তাহাকে অসংখ্য প্রকার দরকারি কাজে লাগানো যায়। বাড়ি বানাইবার টালি, ড্রেনের পাইপ, নানারূপ খেলনা প্রভৃতি কত জিনিস তৈয়ারি হয়। তাহাতে আবার নানারকম রঙ দেওয়া ও ইচ্ছামতো পালিশ ধরানো চলে।

সাদা মাটির বাসন হইলেই আমরা অনেক সময়ে তাহাকে 'চীনেমাটি' বলি—কিন্তু আসল চীনামাটি অতি উঁচু দরের জিনিস। চীনেমাটির বাসন এক সময়ে কেবল চীন দেশেই তৈয়ারি হইত। প্রায় সাতশত বৎসর আগে মুসলমান সম্রাট সালাদিনের কাছে চীন সম্রাট কতগুলা উপহার পাঠাইয়াছিলেন তাহার মধ্যে কতগুলা চীনা বাসন ছিল। তেমন বাসন কেহ চক্ষে দেখে নাই। পাতলা ঝিনুকের মতো স্বচ্ছ, ডিমের খোলার মতো হালকা, সে আশ্চর্য বাসনের কথা চারিদিকে রটিয়া গেল।

এই চীনা বাসনের সংকেত শিখিবার জন্য ছয় শতাব্দী ধরিয়া কত লোকে যে কতরকম চেষ্টা করিয়াছে, তাহার আর অন্ত নাই। এই একটি বিদ্যাকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টায় কত লোকে জীবনপাত করিয়াছে এবং তাহার ফলে কেবল এইটুকুমাত্র জ্ঞানলাভ করিয়াছে যে, অমন পাতলা স্বচ্ছ সুন্দর জিনিস করা একেবারেই সহজ নয়। জিনিসটা পাতলা হয় তো স্বচ্ছ হয় না, স্বচ্ছ যদি হয় তবে এমন 'ঠুন্‌কো' যে একটু ধরিতে গেলেই ভাঙিয়া যায়। হয়তো আর সবই ঠিক হইল কিন্তু উপরের মোলায়েম পালিশটুকু ধরিল না, হয়তো কোথায় একটি চুল বা এক কণা বালি ছিল কিংবা চুল্লির আঁচ ঠিক সমান ছিল না, তাহাতেই বাসনটি পোড়াইবার সময় ফাটিয়া গেল। এইরকম করিয়া লোকে হাজারবার ঠেকিয়া ঠেকিয়া তবে এ বিদ্যা শিখিয়াছে।

গ্রীস প্রভৃতি দেশে এক সময়ে অতি সুন্দর মাটির ঘড়া ও ফুলদানি তৈয়ারি হইত কিন্তু গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার পর এই শিল্প নষ্ট হইয়া যায়। ইহার পর বহু বৎসর পর্যন্ত ইউরোপে মাটির জিনিস বলিতে সাধারণ মোটা বাসনপত্রই বুঝিত। তার পর মুসলমানদের দৌলতে যখন এই লুপ্ত শিল্প আবার জাগিয়া উঠে তখন হইতে দক্ষিণ ইউরোপে, বিশেষত ইটালিতে নানারূপ শিল্পের বাসন দেখা দিতে লাগিল। তখনো তাহারা চীনামাটি গড়িতে পারে নাই বটে কিন্তু মাটির উপর সাদা পালিশ চড়াইয়া তাহার চমৎকার নকল করিতে শিখিয়াছিল। বহুদিন পর্যন্ত এই ব্যবসায় ইটালির একচেটিয়া ছিল।

যাহাদের চেষ্টায় ও যত্নে এই শিল্পের ব্যবসা ইউরোপের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তাহাদের মধ্যে প্যালিসির নাম বিশেষভাবে করা যায়। বার্নার্ড প্যালিসির বাড়ি ছিল ফ্রান্স দেশে। সেখানে ছবি আঁকিয়া, কাঁচ রঙাইয়া ও জরীপের কাজে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার দিন যাইত। হয়তো এইভাবেই তাঁহার সারা জীবন কাটিয়া যাইত ; কিন্তু একদিন তিনি একখানা 'মাটির পেয়ালা দেখিলেন, তেমন জিনিস আর তিনি কখনো দেখেন নাই—বিশেষত তাহার উপর যে পালিশ করা এনামেলের কাজ ছিল, তাহাতেই প্যালিসিকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। প্যালিসি তখন একেবারে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, ঐরকম পালিশের সংকেত না শিখিয়া তিনি ছাড়িবেন না।

সেইদিন হইতে তাঁহার আর অন্য চিন্তা নাই, জীবনের আর কোনো কাজ নাই, তিনি কেবল চুল্লি জ্বালাইয়া ভাঙা পাথর আর মাটির মসলা গলাইতেছেন, আর দেখিতেছেন পালিশ ঠিক হইল কিনা। নিজে লেখাপড়া জানেন না, কোনোদিন এ ব্যবসা শিখেন নাই, অথচ উৎসাহের তাড়নায় শক্তি সময় ও অর্থ অজস্র ঢালিয়া দিতেছেন - তাহাতে কি যে লাভ হইবে তাহা কেহই বোঝে না। লোকে পাগল বলিতে লাগিল, তাঁহার স্ত্রী বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বাড়ির লোকে অস্থির হইয়া পড়িল, কিন্তু তাঁহার সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। দুই বৎসর হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর তিনশত মাটিব পেয়ালা গড়িয়া তাহার উপর নানারকম মসলার প্রলেপ দিয়া তিনি চুল্লিতে চড়াইলেন। চুল্লি জুড়াইলে পর দেখা গেল, একটিমাত্র বাসনের গায়ে অতি চমৎকার সাদা পালিশ ধরিয়াছে! তখন প্যালিসির আনন্দ দেখে কে!

এতদিন পর্যন্ত তিনি চারি ক্রোশ পথ হাঁটিয়া এক ব্যবসায়ীর চুল্লিতে তাঁহার জিনিসগুলা পোড়াইয়া আনিতেন। এখন হইতে তিনি নিজের বাড়িতে একটি চুল্লি বানাইতে সংকল্প করিলেন। ইঁটের পাঁজায় ইঁট কিনিয়া তিনি নিজে তাহা বহিয়া আনিতেন এবং আপনার হাতে সাজাইয়া চুল্লি গড়িতেন। তার পর, চুল্লি খাড়া হইলে তিনি অনেক কাঠ ও কয়লা সংগ্রহ করিয়া চুল্লি জ্বালাইলেন এবং একশত মাটির বাসন বসাইয়া তাহাতে মসলা চড়াইলেন—এই মসলা গলিলে পর বাসনে এনামেলের মতো সাদা পালিশ হইবে। কিন্তু মসলা আর গলিতে চায় না। সারারাত কাটিয়া গেল, তার পর দিন গেল রাত গেল, এমনি করিয়া ছয়দিন ছয়রাত্র চুল্লির পাশে বসিয়া বৃথায় কাটিল। তখন প্যালিসি নূতন মসলা বানাইয়া আবার আগুন চড়াইলেন। প্যালিসির

তখন আর দিক্‌বিদিক জ্ঞান নাই। তিনি আহার-নিদ্রা ছাড়িয়া কেবল চুল্লিতে কাঠ জোগাইতেছেন। ক্রমে কাঠ সব ফুরাইয়া আসিল—তিনি বাগানের কাঠের বেড়া ভাঙিয়া আগুনে দিলেন। তাহাও যখন ফুরাইয়া আসিল তখন বাড়ির টেবিল চেয়ার যাহা সম্মুখে পাইলেন সব ভাঙিয়া ভাঙিয়া জ্বালানি কাঠ করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে শহরের মধ্যে ছুটিয়া বাহির হইয়াছে, আর সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে যে প্যালিসি পাগল হইয়া বাড়িঘর ভাঙিয়া ফেলিতেছেন। শুনিয়া সকলে ব্যস্ত হইয়া দেখিতে আসিল, ব্যাপারখানা কি। ততক্ষণে প্যালিসির মসলা গলিয়া চমৎকার সাদা পালিশ হইয়া ফুটিয়াছে—তিনি অতি যত্নে সেগুলিকে ঠাণ্ডা করিয়া বাহির করিতেছেন।

প্যালিসি স্থির করিলেন তিনি তাঁহার আবিষ্কারকে ব্যবসায়ে লাগাইবেন। এক কুমারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তিনি ছয় মাসে তাহাকে দিয়া কতগুলি সুন্দর সুন্দর বাসন গড়াইলেন। কিন্তু সেগুলিতে পালিশ ধরাইবার সময় তাঁহার চুল্লি ফাটিয়া ধুলা ও ঝুল পড়িয়া তাঁহার চমৎকার পালিশ করা বাসনগুলিতে দাগ ধরাইয়া দিল। প্যালিসি কিছু বলিলেন না, বাসনগুলি ভাঙিয়া আবার চুল্লি মেরামত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে ধৈর্য আর বীরত্বের আর তুলনা হয় না। খোলা বাগানে সারাদিন রোদে ঘামিয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া তিনি চুল্লির তদ্বির করিতেন; বাড়ির বাহির হইলে লোকে তাঁহাকে দেখিয়া হাসাহাসি করিত; সারাদিন পরিশ্রমের পর যখন তাঁহার শরীর মন অবসন্ন হইয়া আসিত, তিনি বাড়িতে ঢুকিবামাত্র চারিদিক হইতে সকলে ঠাট্টা বিদ্রূপ নিন্দা ও অভিযোগ করিত। এতরকম অশান্তির মধ্যে ষোলো বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া প্যালিসি আপনার ব্যবসায়কে সফল করিয়া রাজসম্মান লাভ করেন। কিন্তু এখানেও তাঁহার দুঃখের শেষ হয় নাই। ব্যবসায়ে কৃতকার্য হইবার পরেও শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁহাকে নানা শত্রুর হাতে অনেক অত্যাচার সহিতে হইয়াছিল। সে-সকল অত্যাচার তিনি যেরূপ তেজের সহিত সহ্য করিয়াছিলেন তাহা প্যালিসির মতো বীরেরই উপযুক্ত। সকল বিষয়ে তিনি যাহা সত্য বুঝিতেন নির্ভীকভাবে তাহা প্রচার করিতেন; এইজন্য তাঁহার নিজের স্বাধীন ধর্মমত বজায় রাখিতে গিয়া তিনি নানারকমে লাঞ্ছিত হন এবং অবশেষে আশি বৎসর বয়সে মৃত্যুভয়কে অগ্রাহ্য করিয়া এক অন্ধকার কয়েদখানায় বন্দী অবস্থায় মারা যান।

সন্দেশ—ফাল্গুন, ১৩২৩

ঘুড়ি ও ফানুষ

জলের চাইতে হালকা জিনিস যেমন জলে ভাসে বাতাসের চেয়ে হালকা জিনিস তেমনি বাতাসে ভাসে। আগুনের উপরকার তপ্ত বাতাস সাধারণ ঠাণ্ডা বাতাসের চাইতে অনেক পাতলা; তাই সে উপরে উঠে—আর সেই উপরমুখী স্রোতের টানে যত রাজ্যের কয়লা

ধুলো সবসুদ্ধ টেনে তোলে। সেই কয়লা ধুলাসুদ্ধ ময়লা বাতাসের স্রোতকে আমরা বলি ধোঁয়া।

এইরকম হালকা ধোঁয়াকে পাতলা থলির মধ্যে পুরে আমরা তাকে আকাশে ওড়াই—আর সেই কাগজের থলিকে বলি ফানুষ। সেই ফানুষ যদি খুব বড়ো হয়, আর মজবুত করে তৈরি হয়, তখন তাকে বলি 'বেলুন'।

এ তো গেল হালকা জিনিসের কথা। কিন্তু বাতাসের চাইতে ভারি জিনিসও অনেক সময় আকাশে ওঠে—যেমন ঘুড়ি। চলন্ত বাতাসের কেমন একটা ধাক্কা দিবার শক্তি আছে, সে বড়ো-বড়ো ভারী জিনিসকেও ঠেলে তোলে। ঘূর্ণী বায়ুর সময়ে বাতাসের জোর যখন খুব বেড়ে ওঠে তখন তার ধাক্কায় ঘরবাড়ি পর্যন্ত উড়িয়ে নেয়। ঘুড়ির সুতায় যতক্ষণ টান থাকে ততক্ষণ আপনা হতেই বাতাসের ধাক্কায় ঘুড়িকে উপর দিকে ঠেলে রাখে, কিন্তু বাতাস যখন থেমে আসে তখন ঘুড়ির সুতো ধরে ক্রমাগত টান না দিলে সে বাতাসের ধাক্কাও পায় না, কাজেই তার উপর ভর করে উঠতেও পারে না।

ফানুষকে বাড়িয়ে যেমন প্রকাণ্ড বেলুনের সৃষ্টি হয়েছে তেমনি সাধারণ ঘুড়ির 'পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ' হচ্ছে মানুষ তোলা ধাউস ঘুড়ি। এরোপ্লেনের সৃষ্টি হবার আগে লোকে এইরকম ঘুড়িতে চড়ে নানারকম পরীক্ষা করে দেখেছে। এরকম করে শত্রুর চালচলন দেখবার জন্য নানারকম ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এর অসুবিধা এই যে বাতাসের জোর না থাকলে কিছু করবার উপায় নাই। তা ছাড়া, ঘুড়ি মাত্রেই এক জায়গায় আটকা থাকে, তার পক্ষে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব নয়। সুতরাং ঘুড়িই বলো আর ফানুষই বলো, সকলেই বাতাসের খেয়ালের অধীন।

মানুষ অনেককাল হতেই চায়, পাখির মতো আকাশে উড়তে। কেবল ফানুষে চড়ে বা ঘুড়িতে উঠে হাওয়ার ঠেলায় ভেসে বেড়িয়ে তার মন উঠে না। পাখির নকল করে বড়ো-বড়ো ডানা বানিয়ে তার সাহায্যে উড়ে বেড়াবার চেষ্টা অনেকদিন হতেই চলে আসছে। হাতে পিঠে ডানা লাগিয়ে লোকে সাহস করে পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়েছে—আর তাতে কতজনের প্রাণও গিয়েছে। লিলিয়েন্থেল প্রভৃতি যাঁরা এই বিষয়ে বেশ কৃতকার্য হয়েছিলেন তাঁরাও অতিরিক্ত সাহস করতে গিয়ে শেষে মারা পড়েন। তবু লোকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করতে ছাড়ে নি। পরীক্ষার ফলে মোটের উপর এইটুকু বোঝা গেছে যে পাখির মতো ডানা ঝাপটিয়ে ওড়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, তবে বাতাস ভালো থাকলে একটু উঁচু জায়গা থেকে আরম্ভ করে অনেক দূর পর্যন্ত হাওয়ায় ভেসে যাওয়া যায়। শুধু ভেসে যাওয়া নয়, অনেক সময় ডাইনে-বাঁয়ে এদিক-ওদিক একটু-আধটু ঘোরাফেরাও সম্ভব হয়। এ বিষয়ে আমেরিকার দুটি ভাই—অভিল ও উইলবার রাইট—সকলের চেয়ে বাহাদুরি দেখিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের তৈরি ডানার সাহায্যে দশ-বিশ মাইল পর্যন্ত অনেকবার ঘুরে এসেছেন। কিন্তু এতে করে উপর থেকে নীচে নামা বেশ সহজ বটে, কিন্তু বাতাস ঠেলে উপরে ওঠা একরকম অসম্ভব বললেই হয়। ঘুড়ির যখন সুতো ছিঁড়ে যায় তখন সে পাথরের মতো ধপ্ করে না পড়ে কেমন ভেসে ভেসে হেলে দুলে এগিয়ে পড়ে। নানা কৌশল খাটিয়ে নানারকম আকারের ঘুড়িকে এইভাবে বাতাসে ভাসিয়ে কত হাজাররকম

পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে; এবং তার ফলে এটুকু বোঝা গেছে যে, জাহাজ যেমন করে জল কেটে এগিয়ে চলে তেমনি করে যদি বাতাস কেটে ঘুড়িকে ঠেলে নেওয়া যায়, তবে হয়তো তাকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে চালানো যেতে পারে। এই চেষ্টার ফলে যে জিনিস দাঁড়িয়েছে তারই নাম এরোপ্লেন।

এরোপ্লেনের চেহারা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার দরকার নাই, কারণ, তার ছবি তোমরা অনেক দেখেছ। কিন্তু সেটা যে একটা ঘুড়িমাত্র এ কথাটা তার পাখির মতো চেহারা দেখে সব সময়ে মনে আসে না। কিন্তু বাস্তবিক সেটা ঘুড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। ঘুড়িকে ওড়াতে হলে যেমন সুতো ধরে টানা দরকার, এরোপ্লেনকে ঠিক তেমনি বাতাস ঠেলে কলের জোরে টানতে হয়। সুতরাং ঘুড়িতে যতরকম বদভ্যাস আর কেরামতি দেখা যায়, এরোপ্লেনেও প্রায় সেইরকম। ঘুড়ির মতো সেও বেখাপ্পা 'গোঁৎ' খেতে চায়, হঠাৎ শূন্যের মাঝে কাত হয়ে পড়তে চায়, আর এলোমেলো বাতাসে ঘুরপাক খেয়ে উলটাতে চায়। এতরকম তাল সামলে তবে এরোপ্লেন চালানো শিখতে হয়। ঘুড়িতে যদি বেখাপ্পা জোরে হ্যাঁচকা টান দেও তবে সে যেমন ফস্ করে ফেঁসে যেতে পারে, এরোপ্লেনও তেমনি ডানা ভেঙে ধপ্ করে পড়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। যারা এ বিষয়ে ওস্তাদ, তাদের কাছে এরোপ্লেনের এ-সব পাগলামি নিতান্তই সামান্য ব্যাপার। তারা ইচ্ছা করেই কত সময় এরোপ্লেন সুদ্ধ শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে তামাশা দেখায়, এরোপ্লেনকে নানারকমে গোঁৎ খাওয়ায়।

ঘুড়ি আর ফানুষে যে তফাত, 'এরোপ্লেন' আর 'এয়ারশিপ' বা আকাশ-জাহাজে ঠিক সেই তফাত। ফানুষকে অর্থাৎ বেলুনকে ইচ্ছামতো এদিক-ওদিক চালাবার চেষ্টাতেই আকাশ-জাহাজের সৃষ্টি। গোল বেলুন বাতাসের উলটোমুখে চলতে গেলে চ্যাপ্টা হয়ে যায়, তাই তাকে চমচমের মতো ছুঁচাল করে বানায়—তা হলে সে সহজেই বাতাস ফুঁড়ে এগুতে পারে। তার পিছনে হাল ও আশেপাশে মাছের ডানার মতো থাকে—তা দিয়ে জাহাজকে ইচ্ছামতো ডাইনে বাঁয়ে উপর নীচে চালানো যায়। আর থাকে বিদ্যুতের পাখার মতো মস্ত একটা ঘুরন্ত জিনিস, সেইটার ধাক্কায় বাতাস ঠেলে জাহাজ চলে। এরোপ্লেনেও অবশ্য ঠিক এইরকম পাখা থাকে।

এই যুদ্ধের সময়ে এরোপ্লেন আর এয়ারশিপগুলি কিরকম কাজে লেগেছে তার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলি। এরোপ্লেনগুলো চলে ব্যস্তবাগীশের মতো ফর্‌ফর্ করে, তারা দিন-দুপুরে যখন তখন যেখানে সেখানে উড়ে যায় আর নানারকম খবর আনে। দরকার হলে ধাঁ করে শত্রুর শিবিরে বা গোলা-বারুদের গুদামে বা অস্ত্রের কারখানায় দু-দশটা বোমা ফেলে আসে, অথবা বন্দুক দিয়ে শত্রুর এরোপ্লেন বা জাহাজ আক্রমণ করে। এ-সব ছোটোখাটো কাজে এরোপ্লেনেই সুবিধা বেশি। দশ বছর আগে বিলাতের লোকেও এরোপ্লেন জিনিসটাকে একটা আশ্চর্য তামাশার ব্যাপার মনে করত, অথচ এখন এই যুদ্ধে কত হাজার হাজার এরোপ্লেন ঘোরাফিরা করে—কে তার খবর রাখে?

আকাশ-জাহাজগুলো প্রকাণ্ড গম্ভীর জিনিস, একেবারে কুড়ি-ত্রিশ মণ বোমা নিয়ে ফেরে। তার উপর কামান বন্দুকও সঙ্গে থাকে। তারা আসে যায় [illegible]

দিনের বেলা বেরুতে গেলে তাদের আর রক্ষা নাই—কারণ, অত বড়ো জিনিসকে গোলা মেরে ফুটো করতে কতক্ষণ? রাতদুপুরে যখন তারা ঘুমন্ত শহরের উপর বোমা ফেলতে থাকে—তখন চারদিক হতে বড়ো বড়ো 'Search light'-এর আলোর ধারা আকাশ হাতড়ে তাকে খুঁজে বেড়ায়। একবারটি তার উপর আলো ফেলতে পারলেই যত রাজ্যের কামান তার উপর তাক্ করতে থাকে। তার পর চারিদিক হতে এরোপ্লেনগুলা ভিমরুলের মতো ঘিরে আসে! তখন জাহাজটিকে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়। এরকম অবস্থায় এরোপ্লেনের সর্বদাই চেষ্টা থাকে জাহাজের উপরে উঠবার জন্য। কারণ, উপর থেকে বোমা ফেলে তার পিঠ ভেঙে দেওয়াই হচ্ছে জাহাজ মারবার সবচাইতে ভালো উপায়। ফানুষ জাহাজ যত উঁচুতে যেমন তাড়াতাড়ি উঠতে পারে ঘুড়ির নৌকা তেমন পারে না; কাজেই জাহাজ কাছে আসবার আগে থেকেই এরোপ্লেন অনেকখানি উঠে থাকে—যাতে ঠিক সময়ে সে জাহাজের ঘাড়ের উপর নামতে পারে।

সন্দেশ—চৈত্র, ১৩২৩

ক্লোরোফর্ম

আমরা মহাভারতে পড়িয়াছি, বিরাট রাজার গৃহে অজ্ঞাতবাসের শেষদিকে অর্জুন কৌরবদলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের মধ্যে তিনি সম্মোহন অস্ত্র মারিয়া শত্রুদলকে অজ্ঞান করিয়া ফেলেন। সম্মোহন অস্ত্রটা কিরূপ তাহা জানি না—কিন্তু আজকালকার ডাক্তারেরা এই বিদ্যাটি রোগীদের উপর অনেক সময়েই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহার ফলে, রোগীকে অজ্ঞান করাইয়া তাহার হাত পা কাটিয়া ফেলা হয়, অথচ রোগী তাহার কিছুই জানিতে পারে না। ব্যাপারটি অতি সহজ! রোগীর নাকের কাছে খানিকটা ঔষধ ধরিয়া তাহাকে শুঁকিতে দেওয়া হইল—রোগী সেই মিষ্ট গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে বেহুঁশ হইয়া গেল। বাস্, তার পর চট্‌পট্ ছুরি চালাইয়া কাজ সারিয়া লইলেই হয়।

আফিং খাইলে বা অন্য নানারকম নেশা করিলে মানুষের জ্ঞান থাকে না। একবার একটা মাতাল নেশার ঘোরে খানায় পড়িয়া পা ভাঙিয়া ফেলে। ডাক্তার সেই নেশার অবস্থাতেই তাহার পায়ের উপর অস্ত্র-চিকিৎসা করেন—মাতাল তাহার কিছুমাত্র বুঝিতে পারে নাই। কোনো অসুখের যন্ত্রণা যখন রোগের পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়ে ডাক্তারেরা তখন আফিং জাতীয় ঔষধ খাওয়াইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখেন—সে ঘুমে শরীরের সমস্ত বেদনাবোধকে এমন অবশ করিয়া ফেলে যে, রোগী আর কোনোরূপ যন্ত্রণা টের পায় না।

কিন্তু এরূপভাবে নেশা ধরাইয়া চিকিৎসা করার বিপদ অনেক। একে তো এই-সকল ঔষধে শরীরের মধ্যে নানারূপ অনর্থ ঘটাইয়া থাকে, চিকিৎসা শেষ হইবার বহু পরেও ঔষধের দরুণ নানারূপ উৎপাত চলিতে থাকে। তাহার উপর আবার ঔষধের অভ্যাস একবার ধরিয়া গেলে—তাহাতে রোগীকে একেবারে নেশার মতো পাইয়া বসে।

তখন বিনা প্রয়োজনেও রোগী ঐ-সকল ঔষধের জন্য পাগল হইয়া উঠে—এবং ঔষধের দাস হইয়া সমস্ত জীবনটিকে মাটি করিয়া ফেলে।

১৮০০ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ একশো সতেরো বৎসর পূর্বে হাম্‌ফ্রে ডেভি নামে একজন অসাধারণ ইংরাজ পণ্ডিত একপ্রকার 'গ্যাস' লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। ইংরাজিতে ইহাকে 'Laughing Gas' অর্থাৎ হাসাইবার গ্যাস বলা হয়। এই জিনিসটিকে নিশ্বাসের সঙ্গে টানিতে গেলে ঘাড়ে মাথায় কেমন সুড়্‌সুড়্‌ করিতে থাকে—তাহাতে অনেকের হাসি আসে। ডেভি দেখিলেন, শুধু সুড়্‌সুড়্‌ করে তাহা নয়, একটু বেশি করিয়া টানিলে মানুষ অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এইরকমভাবে একটুখানি গ্যাস শুঁকাইয়া মানুষকে মিনিট-খানেক বেশ আরামে বেহুঁশ করিয়া রাখা যায়। তাহাতে খুব দুর্বল লোকেরও কোনো অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না। ডেভি বলিলেন, "এই উপায়ে বেশ সহজেই বিনা যন্ত্রণায় ছোটোখাটো অস্ত্র-চিকিৎসা চলিতে পারে।" দুঃখের বিষয় সে সময়কার অস্ত্র-চিকিৎসকের এ কথায় কান দেন নাই। চল্লিশ বৎসর পরে একজন আমেরিকান ডাক্তার এই গ্যাসের সাহায্যে বিনা যন্ত্রণায় একটি রোগীর দাঁত তুলিয়া দেখান যে, ডেভির কথাটা নেহাত মিথ্যা নয়। সেই অবধি নানারূপ ছোটোখাটো অস্ত্র-চিকিৎসায়, বিশেষত দাঁতের ডাক্তারিতে এই গ্যাসের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু সামান্য এক মিনিট সময়ের মধ্যে তো আর রীতিমতো অস্ত্র-চিকিৎসা চলে না। সুতরাং অধিকাংশস্থলেই চিকিৎসার যন্ত্রণা দূর করিবার আর উপায় ছিল না। সেই সময়কার রোগীদের কাছে অস্ত্র-চিকিৎসার মতো ভয়ানক জিনিস আর কিছু ছিল কিনা সন্দেহ। যে কয়েদীর প্রাণদণ্ড হইবে সে যেমন করিয়া ফাঁসির কথা ভাবে, রোগী তেমনি করিয়া চিকিৎসার কথা ভাবিত। কবে 'অস্ত্র করা' হইবে, সেই ভাবনায় রোগী আগে হইতেই আধমরা হইয়া থাকিত। প্রায় সকল রোগীকেই ধরিয়া বাঁধিয়া জবরদস্তি করিয়া তবে ছুরি চালাইতে হইত। এইরকম যখন অবস্থা তখন আমেরিকা হইতে সংবাদ আসিল সেখানকার এক ডাক্তার 'ইথার' অর্থাৎ সুরা জাতীয় একপ্রকার ঔষধের সাহায্যে রোগীকে বহুক্ষণ নিরাপদে অজ্ঞান রাখিবার উপায় বাহির করিয়াছেন।

জেমস্‌ সিম্‌সন্‌ নামে একটি উৎসাহী চিকিৎসক সেই সময়ে এডিনবরায় চিকিৎসা করিতেছিলেন। ছাত্র অবস্থায় সেই সময়কার অস্ত্র-চিকিৎসার ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া সিম্‌সন্‌ এক সময়ে আরেকটু হইলেই ডাক্তারি-ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতেন। বিনা যন্ত্রণায় চিকিৎসার কথা শুনিয়া তিনিও পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সিম্‌সনের কয়েকটি বন্ধুও তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। প্রতিদিন রাত্রে কয় বন্ধু মিলিয়া যত রাজ্যের ঔষধ শুঁকিয়া শুঁকিয়া নানারূপে তাহার নিশ্বাস লইয়া দেখিতেন—ঐরকম অবসাদ আসে কিনা। এ বিষয়ে তাঁহাদের কিরূপ উৎসাহ ছিল সে সম্বন্ধে সিম্‌সনের কোনো বন্ধু একটি সুন্দর গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ বন্ধুটির বাড়িতে একটি নূতন উগ্র ঔষধ দেখিয়া সিম্‌সন্‌ তৎক্ষণাৎ জিনিসটা বিষাক্ত কি না তাহার বিচার না করিয়াই তাহা লইয়া পরীক্ষা করিতে উদ্যত হন। কিন্তু বন্ধুটি বাধা দিয়া আগে দুইটা খরগোসের উপর তা প্রয়োগ করেন। ফলে দুইটা খরগোসই মারা যায়।

যাহা হউক অনেকদিন ধরিয়া অনেক পরীক্ষার পর সিম্‌সন্ একদিন এক শিশি ক্লোরোফর্ম আনিয়া হাজির করিলেন। সেইদিন আহারের পর দুটি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া তিনি পরীক্ষায় বসিলেন। ক্লোরোফর্মের শিশিতে নাক গুঁজিয়া জোরে জোরে নিশ্বাস টানিতে টানিতে তিনজনেই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। যখন সিম্‌সনের জ্ঞান হইল তিনি দেখিলেন বন্ধু দুটি তখনো মোহের ঘোরে বেহুঁশ হইয়া আছেন। তিনি উৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "ইথারের চাইতেও চমৎকার।"

সেইদিন হইতে চিকিৎসকগণ এই সম্মোহন অস্ত্রটিকে আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাহার ফলে অস্ত্র-চিকিৎসার বিভীষিকা সাড়ে পনেরো-আনা পরিমাণ দূর হইয়াছে। পূর্বে যে-সকল অবস্থায় ছুরি ছোঁয়াইতে না ছোঁয়াইতে রোগী যন্ত্রণায় মারা যাইত—সেরূপ সাংঘাতিক ক্ষেত্রেও এখন আর রোগীর সে ভয়ের কারণ নাই।

সন্দেশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪

মরুর দেশে

'মরু' নামটিতেই বলিয়া দেয় যে দেশটি মরা। গাছপালা জীবজন্তু সেখানে বাড়িতে পায় না; মানুষ সেখানে বাস করিতে গেলে দুদিনের বেশি টিঁকিতে পারে না; এমনি ভয়ানক সে দেশ।

পৃথিবীর 'ম্যাপ' যদি দেখ, দেখিবে আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমে সাহারার প্রান্ত হইতে চীন সাম্রাজ্যের মাঝামাঝি পর্যন্ত বড়ো-বড়ো দেশ জুড়িয়া Desert (পরিত্যক্ত দেশ) বা মরুভূমি পড়িয়া আছে। তা ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই মানুষের আবাসের আশেপাশেই ছোটো বড়ো ফাঁকা দেশ—সেখানে ঘর নাই বাড়ি নাই, আছে খালি বালির মাঠ আর বালির ঢিপি। মেরুর কাছে সাইবিরিয়া বা গ্রীনল্যাণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশেও এমন সব ফাঁকা জায়গা আছে যেখানে বছরের মধ্যে আট মাস ধরিয়া সারাটি দেশ শ্মশানের মতো পড়িয়া থাকে—কেবল বসন্তের কাছাকাছি একটু-আধটু গাছপালার চেহারা দেখা যায়।

কিন্তু বাস্তবিক 'মরুভূমি' বলিতে কেবল সেই-সব দেশকেই বুঝায় যেখানে বারো মাস কেবল বালির স্তূপ ছাড়া আর কিছু দেখিবার জো নাই—যেখানে শুকনা বালি রৌদ্রে তাতিয়া সমস্ত দেশটাকে একেবারে শুকাইয়া রাখে। সারা বছর সেখানে বৃষ্টি নাই—গাছপালার মধ্যে কৃচিৎ কোথাও একটু সুবিধা পাইয়া হয়তো দু-দশটি মনসা গাছ মাথা তুলিয়াছে। মরুভূমির ধারে কিনারায় হয়তো দু-চারিটা সাপ বিছা বা গিরগিটি মাঝে মাঝে দেখা যায়—কিন্তু যতই ভিতরে যাও ততই দেখিবে জনপ্রাণীর কোনো সাড়া নাই। মাছিটা পর্যন্ত সেখানে শুকাইয়া মরে। চারিদিকে কেবল বালি, তার মধ্যে জন্তুই-বা বাঁচে কি খাইয়া, আর গাছই-বা রস পায় কোথায়? মনসা জাতীয় গাছগুলার পাতা মোটা, তাহাতে রস থাকে অনেক বেশি—আর তাদের ছাল পুরু, তাহাতে রসটাকে তাড়াতাড়ি শুকাইতে দেয় না। তাহারা বালির নীচে সরস মাটিতে প্রাণপণে শিকড় বসাইয়া কোনোরকমে বাঁচিয়া থাকে।

মরুভূমির মধ্যে আগাগোড়াই কেবল যদি বালি থাকিত, তবে তাহার ভিতরকার সংবাদ লওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব হইত। কিন্তু বালির নীচেও তো জমি আছে—সেই জমির মধ্যে কত ঝরনা কত জলাশয় বালির চাপে চাপা পড়িয়া থাকে, মাঝে মাঝে যেখানে বালির চাপ কম অথবা জলের বেগ খুব বেশি সেখানে সমস্ত চাপ ঠেলিয়া জল একেবারে উপরে উঠিয়া আসে। জলের পরশ পাইয়া তাহার চারিদিকে খেজুরগাছ আর নানারকম লতাপাতা গজাইয়া উঠে, গাছের ছায়ায় ছায়ায় সমস্ত জায়গাটিকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখে। দেখিলে মনে হয় যেন এক-একটি তীর্থস্থান। এক-একটি মরুতীর্থের ধারে ধারে ছোটো-ছোটো গ্রাম বসিয়া যায়—মরুপথের যাত্রীরা পথ চলিতে চলিতে এই-সকল জায়গায় আসিয়া বিশ্রাম করে।

বাতাস যেখানে শুকনা, সেখানকার জমি অল্পেই তাতিয়া উঠে আর তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়। সেইজন্য মরুভূমিতে যেমন গরম খুব বেশি, শীতও তেমনি প্রচণ্ড; এক সময়ে যেমন মাটিতে পা ফেলিবামাত্র ফোস্কা উঠিয়া যায়—আরেক সময় হয়তো জল জমিয়া বরফ হইয়া থাকে। দিনেরবেলা যেখানে গরমে শরীর ঝলসিয়া যায় রাত্রে সেইখানেই কম্বলের উপর কম্বল চাপাইয়া তবু শীত মানিতে চায় না। এইরূপ শীত গ্রীষ্মের লড়াইয়ের মধ্যে বাতাস বড়ো-একটা স্থির থাকিতে পারে না। যেখানেই গরম বেশি, বাতাস সেখান হইতে চিমনির ধোঁয়ার মতো উপরে উঠিতে থাকে। তখন চারিদিক হইতে ঠাণ্ডা বাতাস ঝড়ের মতো ছুটিয়া আসিয়া এক তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া তোলে। মরুপথের বিপদ অনেক—চলিতে চলিতে পথ হারাইলে তৃষ্ণায় মরিতে হয়—চোরাবালির পাহাড় ধ্বসিয়া কত মানুষ প্রাণ হারায়—শীতে জমিয়া গরমে পুড়িয়া কত সময়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। কিন্তু, যতরকম বিপদ আছে তাহার মধ্যে মানুষ সবচাইতে ভয় করে মরুভূমির ঝড়কে। সে ঝড় যে কত বড়ো সাংঘাতিক ব্যাপার হইতে পারে তাহা চোখে না দেখিলে কল্পনা করা যায় না। দমকা বাতাসের ঝাপটায় মরুভূমির তপ্ত বালি হু হু করিয়া ছুটিতে থাকে, বাতাসের আঁচে আর বালির ঘষায় সর্বাঙ্গে ফোস্কা পড়িয়া যায়, ধুলায় অন্ধ হইয়া দম আটকাইয়া মানুষগুলা পাগলের মতো ছুটিতে থাকে। তার উপর বাতাসের ঘূর্ণীটানে মরুভূমির বালি যখন পাক দিয়া উঠিতে থাকে তখন সেই বালুস্তম্ভের মুখে যে পড়ে তাহার আর রক্ষা নাই। বালির স্তম্ভে চাপা পড়িয়া কত বড়ো-বড়ো যাত্রীদল যে মারা গিয়াছে তাহার আর হিসাব নাই।

এত বালি আসিল কোথা হইতে? সাহারা মরুভূমিতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মণ বালি ক্রমাগত উড়িয়া উড়িয়া পশ্চিমে সমুদ্রের মধ্যে গিয়া পড়িতেছে—তবু মনে হয় বালির আর শেষ নাই। সাহারার মধ্যে এবং পুবে উত্তরে আশেপাশে বেলেপাথরের পাহাড়। কোনো কালে সে স্থানে সমুদ্র ছিল—তাহার নরম বালি জমাট বাঁধিয়া এখনো পাহাড় হইয়া সঞ্চিত আছে। বাতাসে সেই পাহাড়কে রেণু রেণু করিয়া উড়াইয়া মরুভূমির মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে—আবার মরুভূমির বালিকে সেই কোথাকার সমুদ্রের মধ্যে নিয়া ফেলিতেছে। মোটের উপর দেখা যায় যে, বালি ক্ষয় হইতে হইতে ক্রমে সমস্ত মরুভূমিটাই নিচু হইয়া আসিতেছে। এখন যেখানে মরুভূমি দেখা যায় শেষে তাহারই কত জায়গায় মানুষের থাকিবার মতো চমৎকার জমি দেখা দিবে।

•

মরুভূমির কথা বলিতে গেলেই উটের কথা আসিয়া পড়ে। উটের শরীরটিকে মরুভূমির উপযোগী করিয়াই গড়া হইয়াছে। চ্যাটাল চ্যাটাল পা, তার আষ্টেপৃষ্টে কড়ায় ঢাকা—ঝামা দিয়া ঘসিলেও তাহাতে ফোস্কা পড়ে না। ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই—এক পেট ঘাস খাইয়া তিন দিন উপোস থাকে—এক ঢোক জল লইয়া সারাদিন পথ চলে। সবদিকে তার সবই ভালো—মন্দের মধ্যে কেবল তার মেজাজটি। আরবদের বিশ্বাস যে উট যদি একবার রাগ করে তবে একদিন হউক, এক বৎসর হউক, সে প্রতিহিংসা না লইয়া ছাড়িবে না। সেইজন্য কোনো উটের মেজাজ বিগড়াইতে দেখিলেই তাহারা মাটির উপর নানারকম পোশাক ছড়াইয়া উটকে তাহার মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। উট তখন ঐগুলার উপর মনের সুখে লাথি চাঁটি মারিয়া মেজাজ ঠাণ্ডা করে।

মরুর দেশের কথা বলিলাম। এখন মরু সাগরের (Dead Sea) কথা বলিয়া শেষ করি। মরু সাগরটি একটা মাঝারি গোছের হ্রদ—পঞ্চাশ মাইল লম্বা, আট-দশ মাইল চওড়া। কিন্তু তার মধ্যে কোথাও একটি মাছ বা কোনোরকম জলের প্রাণী নাই। সমুদ্রের জলকে শুকাইয়া ঘন করিলে যেরূপ হয়, মরু সাগরের অবস্থা ঠিক সেইরূপ। জল এমন ভারি যে তাহার মধ্যে ডুবিয়া মরিবার ভয় নাই আর এমন লবণাক্ত যে জলে স্নান করিলে সর্বাঙ্গে চাপ বাঁধিয়া নুন জমিতে থাকে।

সন্দেশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪

যুদ্ধের আলো

সেকালে অর্থাৎ পুরাণে যে কালের কথা বলা হয় সেই কালে লড়াইটা হত দিনের বেলায়। ভীষ্মপর্বে দশ দিন ধরে লড়াই হল; প্রতিদিনই দেখি সন্ধ্যা না হতেই শঙ্খ-ধ্বনি করে যুদ্ধ থেমে গেল, তার পর যে যার মতো শিবিরে ফিরে গেল। এইরকম দিনেরবেলা লড়াই করে রাত্রে সবাই নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করত। কিন্তু আজকালকার যুদ্ধে এরকম হবার জো নেই। এখন কি দিন কি রাত, কোনো সময়েই নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব নয়। শত্রু যে কখন কোন সুযোগে ঘাড়ে এসে পড়বে, তার জন্য সর্বদা সজাগ থাকতে হয় সৈন্যেরা যুদ্ধ থামিয়ে সবাই মিলে অস্ত্রশস্ত্র গুটিয়ে শিবিরে ফিরে গেল, এরকমটি কোনো সময়েই হতে পারে না। কারণ, যুদ্ধক্ষেত্রে সব সময়েই সৈন্য হাজির রাখতে হয়।

কামানেরও বিশ্রাম নেই। রাত্রের অন্ধকারে ঝড়ে বাদলে যখন তখন সে হুংকার দিয়ে উঠছে। তার চোখে দেখবার দরকার হয় না, কেবল ম্যাপ দেখে অঙ্ক কষে হিসাব করে সে গোলা ছুঁড়ছে; দিনেরাতে কোনো সময়েই শত্রুকে নিশ্চিন্ত থাকতে দেয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যরা খাদ কেটে তারই মধ্যে হয়তো খোলা ময়দানে কত রাত কাটাচ্ছে। সেখানে সারারাত ধরে কড়া পাহারা বসান আছে—কোনোখানে টুঁ শব্দটি হলেই তারা কান খাড়া করে শোনে। কোথাও কোনো ভয়ের কারণ দেখলেই ঘণ্টা বাজিয়ে সকলকে সতর্ক করে দেয়—আর আকাশে তারাবাজি ছুটিয়ে চারদিক আলো করে দেখে, শত্রু আসছে কি না।

যেমন ডাঙায় তেমনি জলে—আবার আকাশেও তেমনি। কোথাও দিনের অপেক্ষায় কেউ বসে থাকে না। কত যুদ্ধের জাহাজ সারারাত সমুদ্রের মধ্যে হাঁ হাঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার 'Search light'-এর ঝক্‌ঝকে আলো খড়্গের মতো অন্ধকার কেটে চারিদিক খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেই আলো যেখানে পড়ে সেখানে যেন একেবারে রাতকে দিন করে ফেলে। সেই আলোর মুখে যদি কোনো শত্রুজাহাজ পড়ে তবে তার আর লুকোবার জো নাই। সে যেদিকে যাবে, আলো তার পিছন পিছন ঘুরবে। আর সেই আলোতে পরখ করে যুদ্ধজাহাজ তার উপর কামান দাগবে। তখন তার প্রাণভয়ে পালানো ছাড়া আর উপায় নেই। অন্ধকার রাত্রে জার্মানদের বোমাওয়ালা 'জেপেলিন' বেলুনগুলো যখন আকাশ বেয়ে চোরের মতো আসতে থাকে তখন তার সাড়া পেলেই অমনি বড়ো-বড়ো আলোর ঝাপটা চারিদিকে ছুটে বেরোয়—আকাশ হাতড়ে খুঁজবার জন্য। যুদ্ধের সময় আলোর ব্যবহারটা যতই ভয়ানক হোক-না কেন, তামাশা হিসাবে আলোটা দেখতে ভারি সুন্দর। বড়ো-বড়ো দরকারি ব্যাপারের সময় দশ-বিশটা জাহাজ একসঙ্গে মিলে যখন আলোর খেলা দেখাতে থাকে তখন সে এক চমৎকার দৃশ্য হয়।

কিন্তু জাঁকাল ব্যাপারের কথা যদি বলো তবে রাত্রে ডাঙায় লড়াইয়ের সময় যে আলোর খেলা চলে, তার আর তুলনা হয় না। চারিদিকে হাজার হাজার কামান আর বন্দুক, তাদের মুখে মুখে লাল আগুন ঝিক্‌মিক্ করে উঠছে। থেকে থেকে রঙ-বেরঙের তারাবাজি ছুঁড়ে নানারকম সংকেত চলছে। মনে কর, জার্মান খাদের উপর তারা ফুটছে—সাদা লাল, সাদা লাল—তার মানে, 'শত্রু সৈন্য এদিকে আসছে—কামান চালাও। খানিক পরে হয়তো দেখবে, লাল সবুজ লাল সবুজ লাল সবুজ—জার্মানরা বলছে, 'আমরা কোণঠাসা হয়েছি—শীঘ্র উদ্ধার কর।' মাঝে মাঝে এক-একটা বড়ো-বড়ো 'ফানুষ তারা' আস্তে আস্তে জ্বলতে জ্বলতে চারিদিক আলো করে মাটিতে পড়ছে—সেই আলোতে লড়াই আবার জমে উঠছে। হয়তো আশেপাশে ভাঙাচোরা গ্রামগুলোতে আগুন ধরে এক-একদিকে আকাশের গায়ে লাল হয়ে উঠেছে। তার উপর, থেকে থেকে শত্রুদের চোখ ধাঁধিয়ে বিদ্যুতের আলোর মতো 'সার্চ লাইট' এসে পড়েছে। উপরে নীচে চারিদিকে বড়ো-বড়ো গোলা ফাটছে—এক মুহূর্ত আলোর ঝিলিক্, তার পর পাহাড় প্রমাণ ধোঁয়া। আলোয় আঁধারে ছায়ায় ধোঁয়ায় মিলে কি ভীষণ তামাশা!

সন্দেশ—আষাঢ়, ১৩২৪

প্রলয়ের ভয়

পুরাণে আমরা প্রলয়ের কথা পড়েছি। কবে প্রলয় হয়েছিল, আবার কবে হবে, কেমন করে প্রলয় হয়, এই-সবের নানারকম বর্ণনাও* তাতে আছে। প্রলয়ের সময়ে সমস্ত সৃষ্টি যে জলে ডুবে যাবে এ কথাও বার বার করে বলা হয়েছে। আশ্চর্য এই যে, নানান দেশে নানান জাতির ইতিহাসে প্রলয়ের প্রায় একই ধরনের বর্ণনা আছে। অন্তত

ঐ কথাটা অনেক দেশের অনেক পুরাণেই শোনা যায় যে, একবার প্রলয় হয়ে এই পৃথিবীটা ডুবে গেছিল। তাতে সমস্ত জীবজন্তু প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। পণ্ডিতেরা বলেন, এ কথাটার মধ্যে একটুখানি সত্যিকারের ইতিহাস আছে। যাঁরা ভূতত্ত্ববিদ অর্থাৎ যাঁরা পাথর পাহাড় ঘেঁটেঘুঁটে পৃথিবীর পুরানো কথার সংবাদ নিয়ে ফেরেন তাঁরা বলেন যে মানুষের জীবনে বড়ো-বড়ো রোগের মতো পৃথিবীর জীবনেও এক-একটা বড়ো-বড়ো 'সংকট যুগ' দেখা গিয়েছে। যুগে যুগে বড়ো-বড়ো দেশের জলবায়ুর পরিবর্তন হয়েছে, গ্রীষ্মের দেশ হিমের হাওয়ায় বরফে ঢেকে গিয়েছে, আর দুরন্ত শীতের দেশে বরফ ঠেলে সবুজ ঘাস আর বনজঙ্গল দেখা দিয়েছে। যেখানে দেশ ছিল সেখানে কত সাগর হয়েছে—আবার, কত কত সাগর ফুঁড়ে নতুন দেশ মাথা তুলেছে। আর, মাঝে মাঝে এক-একটা বন্যা এসে পাহাড় ধুয়ে পৃথিবী ধুয়ে দেশকে দেশ সাফ করে দিয়েছে। এইরকম ছোটো বড়ো কত প্রলয় এই পৃথিবীর উপর দিয়ে চলে গিয়েছে—আমরা এখনো পুরাণের মধ্যে, গল্পের মধ্যে তারই একটু আভাস পাই, আর পাহাড়ে পর্বতে পাথরের স্তরে তার নানারকম পরিচয় দেখি।

একজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, "এই যে সূর্য এ চিরকাল এমন থাকবে না। একদিন এরও তেজ ফুরিয়ে যাবে—এ-ও তখন নিভে যাবে।" এই কথা শুনে একজন ভীতু-গোছের ভদ্রলোক তাঁকে চিঠি লেখেন যে, "মহাশয়, আপনি যেরকম বিপদের কথা বললেন তা শুনে আমার বড়ো ভয় হয়েছে। সেরকম প্রলয়টা কবে হবে, আর আমার ছেলেপিলেদের জন্য তা হলে কিরকম ব্যবস্থা করলে তারা বাঁচতে পারে—আমায় একটু জানাবেন কি?" জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত তার উত্তরে লিখলেন, "আপনার এত ব্যস্ত হবার কোনো কারণ নেই—আপনার ছেলেরা যদি লাখ বছরও বেঁচে থাকে, তবু এ সূর্যকে আজ যেমন দেখছে তখনো তেমনই দেখবে—তেজ ফুরাতে আরো অনেক দেরি আছে। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" লোকে বড়ো-বড়ো ঝড় বৃষ্টি ভূমিকম্প আগুনের উৎপাত দেখে তা থেকে প্রলয় জিনিসটা কি রকম, তার একটা আন্দাজ করে। বাস্তবিক, ছোটোখাটো প্রলয় পৃথিবীর উপর দিয়ে সব সময়েই চলেছে। কিন্তু আজ যে প্রলয়ের কথা বলব সেটা কিছু সত্যিকার প্রলয় নয়—লোকে প্রলয়ের হুজুকে যে নানা-রকম মিথ্যা ভয়ের সৃষ্টি করে, তারই কথা।

অপরিচিত জিনিস দেখলেই তার সম্বন্ধে মানুষের ভয় বিস্ময় বা কৌতূহল জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। যে জিনিস সর্বদাই দেখতে পায় তাতে মন এমন অভ্যস্ত হয়ে যায় যে সেটাতে আর কোনোরকম আশ্চর্য বোধ হয় না। মনে কর, এই সূর্য যদি প্রতিদিন না উঠে হঠাৎ এক-একদিন ঐরকম ভয়ানক আগুনের মতো মূর্তি নিয়ে হাজির হত, তা হলে অধিকাংশ লোকেই যে একটা প্রলয়কাণ্ড হবে মনে করে ভয়ে অস্থির হত তা বুঝতেই পার। চাঁদকেও যদি দু-দশ বছরে কৃচিৎ এক-আধবার দেখা যেত তবে লোকে না জানি কত আগ্রহ করে কত আশ্চর্য হয়ে তাকে দেখত, আর না জানি সেটা আমাদের চোখে কি সুন্দর লাগত।

ধূমকেতুগুলো যদি মাঝে মাঝে এক-আধটা না এসে ঐ চন্দ্র সূর্যেরই মতো নিতান্ত সাধারণ জিনিস হত, তবে তাদের ঐ ঝাপসা ঝাঁটার মতো চেহারা দেখে ভয় পাবার

কোনোই কারণ থাকত না। কিন্তু তারা কিনা হঠাৎ কেমন করে খবর না দিয়ে আসে যায়, মানুষের কাছে তাই তাদের এত খাতির! পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের লোকেই ধূমকেতুকে একটা অলক্ষণ কিংবা উৎপাত বলে মনে করে। ধূমকেতু যখন আসে তখন যার যা কিছু বিপদ-আপদ সবের জন্যেই ঐ ধূমকেতুকেই লোকে দোষী করে। সে সময়ে রোগ মৃত্যু যুদ্ধ বিদ্রোহ সবই 'ঐ ধূমকেতুর জন্য'। সুতরাং ধূমকেতু এসে পৃথিবী ধ্বংস করবে, এই ভয়টা মানুষের মধ্যে থাকা কিছু আশ্চর্য নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে কত বড়ো-বড়ো দুর্ঘটনাকে যে মানুষ ধূমকেতুর ঘাড়ে চাপিয়েছে তা আর বলে শেষ করা যায় না! নানা দেশের ইতিহাসে নানা সময়কার ধূমকেতুর যেরকম অদ্ভুত ভয়ংকর সব বর্ণনা পাওয়া যায় তাতেই বোঝা যায় যে লোকে তাদের কিরকম ভয়ের চোখে দেখেছে। আমরা ছেলেবেলায় একবার খবরের কাগজে গুজব শুনেছিলাম যে কোথাকার এক 'পাগলা ধূমকেতু' নাকি পৃথিবীর দিকে আসছে—আর কোনো জ্যোতিষী নাকি গুণে বলেছেন যে সে অমুক তারিখে এই পৃথিবীকে এমন ঢু লাগাবে যে তখন কেউ বাঁচে কিনা সন্দেহ। এই খবরটা নিয়ে তখন চারিদিকে খুব একটা হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। কয়েক বৎসর আগে যখন 'হ্যালির ধূমকেতু' এসে দেখা দেয় তখন কেউ কেউ গুণে দেখিয়েছিলেন যে ঐ ধূমকেতুর ঝাঁটার মতো লেজটা পৃথিবীর উপর এসে পড়বে। ঐ লেজের বাড়ি খেলে পৃথিবীর অবস্থাটা কি হবে তাই নিয়ে কাগজেপত্রে খানিকটা তর্কাতর্কিও হয়েছিল, কিন্তু সময় হলে দেখা গেল যে তাতে পৃথিবীর তো কিছু হলই না, বরং লেজটাই ছিঁড়ে দু টুকরো হয়ে গেল। সুতরাং ধূমকেতুর ধাক্কা লেগে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার কল্পনাটা কোনো কাজের কল্পনা নয়, কারণ ধূমকেতুর লেজটা এমনই অসম্ভবরকম হালকা যে পৃথিবীর সঙ্গে গুঁতোগুঁতি করতে গেলে তারই বিপদ হবার কথা। তবে পণ্ডিতেরা বলেন যে পৃথিবীকে যদি কোনোদিন কোনো ধূমকেতুর মাথাটার ভিতর দিয়ে যেতে হয় তা হলে অবস্থাটা কেমন হয়, ঠিক বলা যায় না। সম্ভবত তখন খুব একটা জমকাল গোছের উল্কাবৃষ্টি হবে।

উল্কাবৃষ্টি জিনিসটা আমি কখনো চোখে দেখি নি, কিন্তু তার যে বর্ণনা শুনেছি সে ভারি চমৎকার! আকাশে মাঝে মাঝে তারার মতো এক-একটা কি যেন হঠাৎ ছুট্ দিয়ে কোথায় মিলিয়ে যায়—দেখে লোকে বলে 'তারা খস্‌ল'; কিন্তু আসলে সে তারা নয় —উল্কা। ঐরকম উল্কা যদি মাঝে মাঝে এক-আধটা না খসে একেবারে ঝাঁকে ঝাঁকে হাজারে হাজারে আকাশের উপর দিয়ে ছুটে যায়—তখন তাকে বলে 'উল্কাবৃষ্টি'। এর মতো জমকাল ব্যাপার অতি অল্পই আছে। আমরা আকাশে যে-সব গ্রহ-নক্ষত্র দেখি তারা সবাই ভালো মানুষের মতো স্থির হয়ে থাকে, তারা ওরকম পাগলের মতো ছুটাছুটি করে না। সুতরাং হাজার হাজার উল্কাকে অমনভাবে ছুটাছুটি করতে দেখলে হঠাৎ মনে কেমন ভয় হয়—যদি দু-চারটা ঘাড়ে এসে পড়ে, তা হলে অবস্থাটা কিরকম হবে। কিন্তু আসলে তেমন ভয় পাবার কিছুই নেই। উল্কাগুলির প্রায় সমস্তই পৃথিবীতে পড়বার ঢের আগেই বাতাসের ঘষায় আপনা হতেই জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায়। যদি না জ্বলত তবে আমরা তাদের দেখতেই পেতাম না; কারণ, একে তারা অধিকাংশই নিতান্ত ছোটো, তার উপর তাদের নিজেদের কোনো আলো নেই; কেবল মরবার সময় যখন তারা আপন "বুকের পাঁজর

জ্বালিয়ে নিয়ে" জ্বলে মরে তখন তার সেই শেষ আলোতে আমরা তাদের একটুক্ষণ দেখি মাত্র। যা হোক, ভয়ের কারণ নাই-বা থাকুক একেবারে হাজার হাজার উল্কা পৃথিবীর উপর ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরছে এ কথা ভাবতেও খুব আশ্চর্য লাগে। ব্যাপারটা চোখে দেখতে আরো আশ্চর্য, তাতে আর সন্দেহ কি?

আর একটি ভয়ানক জমকাল ব্যাপারের কথা না বললে একটা মস্ত কথা বাদ থেকে যায়—সেটি হচ্ছে সূর্যের পূর্ণগ্রহণ। এ জিনিসটি যিনি একবার চোখে দেখেছেন তিনি আর কখনো ভুলতে পারেন না। যখন গ্রহণটা পূর্ণ হয়ে আসতে থাকে, চারিদিক অন্ধকারে ঘিরে ফেলে, চাঁদের প্রকাণ্ড কালো ছায়া দেখতে দেখতে চোখের সামনে পাহাড় নদী সব গ্রাস করে ছুটে আসতে থাকে—যখন বনের পশু আর আকাশের পাখি পর্যন্ত ভয়ে কেউ স্তব্ধ হয়ে থাকে, কেউ চীৎকার করে আর্তনাদ করে তখন মানুষের মনটাও যে ভয়ে বিস্ময়ে কেঁপে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি? বিশেষত যারা অশিক্ষিত বা অসভ্য যাদের কাছে সূর্যের এই হঠাৎ নিভে যাওয়ার কোনোই অর্থ নেই, তারা যে তখন পাগলের মতো অস্থির হয়ে বেড়াবে, এ তো খুবই স্বাভাবিক। তারাও প্রলয় বলতে ঠিক এইরকমই একটা কিছু কল্পনা করে—এমনই একটা অদ্ভুত বিরাট গম্ভীর ব্যাপার- যার ভয়ংকর মূর্তিতে মানুষের মনকে একেবারে দমিয়ে অবশ করে দেয়।

সন্দেশ—শ্রাবণ, ১৩২৪

ধুলার কথা

ঘরের দেয়াল মেঝে আসবাবপত্র যতই ঝাড়ি যতই মুছি, খানিকক্ষণ রাখিয়া দিলেই আবার দেখি, যেই ধুলা সেই ধুলা। এত ধুলা আসেই-বা কোথা হইতে, আর এ ধুলার অর্থই-বা কি?

টেবিলের উপর হইতে খানিকটা ধুলা সংগ্রহ করিয়া অণুবীক্ষণ দিয়া দেখ—তাহার মধ্যে চুন, সুরকি, কয়লার গুঁড়া হইতে সূতার আঁশ, পোকার ডিম, ফুলের রেণু পর্যন্ত প্রায় সবই পাওয়া যাইতে পারে। আরো সূক্ষ্মভাবে দেখিতে পারিলে কত সাংঘাতিক রোগের বীজও তাহার মধ্যে দেখা যাইবে। জানলার ফাঁক দিয়া যে আলোর রেখা ঘরের মধ্যে আসে তাহার মধ্যেও চাহিয়া দেখ, ধুলা যেন কিল্‌বিল্ করিতেছে। এই ধুলার মধ্যেই আমরা বাস করি চলি ফিরি, নিশ্বাস লই। মানুষ যত দূর দেখিয়াছে, যত দূর খুঁজিয়াছে, ধুলার আর শেষ কোথাও নাই। আকাশে খুঁজিয়া দেখ; যত দূর উঠিবে, তত দূর ধুলা— যেখানে মেঘ নাই কুয়াশা নাই, বাতাস যেখানে অসম্ভবরকম পাতলা সেখানেও ধুলার অভাব নাই। সে ধুলা যে কত সূক্ষ্ম তাহা চোখে মালুম হয় না, অণু-বীক্ষণের হিসাব দিয়া বুঝিতে হয়। অথচ সে ধুলাও বড়ো সামান্য নয়—সেই ধুলাই সারাটি আকাশকে নীল রঙে রাঙাইয়া রাখে, সেই ধুলাই উদয়াস্তের সময় সূর্য কিরণকে শুষিয়া এমন আশ্চর্য জমকাল রঙের সৃষ্টি করে। আরো দূরে যাও, পৃথিবী ছাড়িয়া

যেখানে আকাশের খোলা ময়দান পড়িয়া আছে সেখানে যাও; দেখিবে, যে নিয়মে গ্রহ চন্দ্র সকলে আপন আপন পথে ঘুরিতেছে সেই একই নিয়মে অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণাও আকাশপথে বড়ো-বড়ো চক্র আঁকিয়া চলিতেছে। এই প্রকাণ্ড পৃথিবী যদি একটি ধূলিকণার মতোই হইত, তবুও সে এমনিভাবে বছরের পর বছর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিত—কে তখন তাহার খবর রাখিত?

এই পৃথিবীর উপর ধুলার যে অদ্ভুত খেলা চলিয়াছে তাহাকে ধুলার খেলা বলিয়া জানে কয়জন? যখন কণায় কণায় বৃষ্টিজল জমিয়া বর্ষাধারা নামিতে থাকে, যখন কুয়াশার ঘনঘটায় চারিদিক ঢাকিয়া ফেলে তখন নিশ্চয় জানিয়ো এ-সমস্তই ধুলার কৃপায়। ধুলা না থাকিলে বাষ্পকণা জমিয়া জল হয় না, স্বচ্ছ আকাশে মেঘ কুয়াশার জন্ম হয় না।

সুতরাং ধুলা জিনিসটাকে আমরা যতই অকাজের জিনিস বলিয়া উড়াইয়া দেই-না কেন, উৎপাত মনে করিয়া তাহাকে যতই দূর করিতে চাই-না কেন, আর তাহার পরিচয় লওয়াটা যতই অনাবশ্যক ভাবি-না কেন, আসলে সে বড়ো একটা সামান্য জিনিস নয়। তোমরা হয়তো বলিবে, 'সামান্য না হউক, জিনিসটা বড়ো বিশ্রী ও নোংরা।' হাঁ, নোংরা বটে। যখন সে আমার সাফ কাপড় ময়লা করিয়া দেয়, আবার ঘরের মধ্যে যেখানে সেখানে জমিয়া থাকে, যেখানে তাহাকে দিয়া আমার কোনো দরকার নাই সেইখানে আসিয়া পড়ে—তখন তাহাকে নোংরা বলি। কিন্তু 'ধুলা' বলিলেই যে একটা নোংরা বিশ্রী কিছু ভাবিতে হইবে, এরূপ মনে করা ঠিক নয়। প্রজাপতির পালক ঝাড়িলে যে ধুলা পড়ে তাহা চোখে দেখিতে অতি সূক্ষ্ম একটুখানি হালকা গুঁড়ার মতো দেখায়—দেখিলে কেহই তাহাকে ধুলা ছাড়া আর কিছুই বলিবে না। কিন্তু অণুবীক্ষণ দিয়া তাহাকে এমনই সুন্দর দেখায়! বাতাসে যে-সকল ধূলিকণা ভাসিয়া বেড়ায় তাহার মধ্যেও কত সময়ে কত আশ্চর্যরকমের কারিকুরি দেখা যায়।

গভীর সমুদ্রের তলা হইতে পাঁক ঘাঁটিয়া বা পচা পুকুরের উপরকার ময়লা ছাঁকিয়া যে জীবন্ত ধূলি বাহির হয় তাহার মতো সুন্দর জিনিস খুব অল্পই আছে। এগুলিকে উদ্ভিদ বলিতে পার, কিন্তু উদ্ভিদ বলিতে সাধারণত যেরকম জিনিস মনে করিয়া বসি, এগুলি একেবারেই সেরূপ নয়। ইংরাজিতে ইহাদিগকে ডায়াটম্ (Diatom) বলে—আমরা এখানে তাহাকেই জীবন্ত ধূলি বলিতেছি। তাহাদের কতরকম চেহারা, তাহার উপর কতরকম কারিকুরি! এই 'Diatom' কথাটি, ইহার o অক্ষরটির মধ্যে যেটুকু ধরে তাহার চাইতেও কম পরিমাণ ধূলিকে অণুবীক্ষণের সাহায্যে ফোটো তুলিয়া দেখিতে পার। তাহার চাইতেও ছোটো 'ডায়াটম্' অসংখ্য প্রকারের আছে। জলের উপর শেওলার মতো এই অদ্ভুত জিনিসগুলা কত সময়ে ভাসিতে থাকে। সাধারণ লোকে তাহাকে নোংরা ও বিশ্রী বলিয়া এড়াইয়া চলে, তাহার ভিতরে যে কি আশ্চর্য সূক্ষ্ম কাজ তাহারা সে সংবাদ রাখে না। কিন্তু যাঁহারা এ-সকলের চর্চা করেন তাঁহারা যত্ন করিয়া এই ময়লা ঘাঁটিয়া এই-সব উদ্ভিদ সংগ্রহ করেন ও তাহাদের চালচলন আকার-প্রকার লক্ষ্য করিয়া তাহাদের জীবন সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য কথা আমাদের শুনাইয়া থাকেন। ডায়াটম্‌গুলিকে পোড়াইয়া

সাফ করিলেও তাহার এই জীব-কংকাল সহজে নষ্ট হয় না—এগুলি এমনই মজবুত। ইহাদের আসল বাহার এই কংকালগুলিতেই। জীবন্ত অবস্থায় এই কংকালগুলি সবুজ কোষের মধ্যে ঢাকা থাকে। ইহাদের কারিকুরিগুলা তখন অণুবীক্ষণ দিয়াও চোখে পড়ে না।

এ পর্যন্ত অন্তত দশহাজার রকমের ডায়াটম্ পাওয়া গিয়াছে। ছবিকে যত বড়ো করিবে তাহার গায়ের কারিকুরির মধ্যে ততই আরো আশ্চর্য সূক্ষ্ম কাজ দেখা যাইবে।

জীবন্ত অবস্থায় এই ডায়াটম্গুলির মধ্যে আরেকটি অদ্ভুত ব্যবস্থা দেখা যায় এই যে হাত-পা কিছুই নাই, অথচ তাহারা চলিয়া বেড়ায়। জলের মধ্যে এমন সুন্দর সহজভাবে তাহারা ঘুরিয়া চলে যে দেখিলে আশ্চর্য লাগে। কি করিয়া যে তাহারা চলে, তাহার কারণ ঠিক করিতে গিয়া বড়ো-বড়ো পণ্ডিতদের অবধি মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে।

সন্দেশ—ভাদ্র, ১৩২৪

আকাশ আলেয়া

মানুষের বুদ্ধিতে আজ পর্যন্ত কত অসংখ্যরকমের আলোর সৃষ্টি হয়েছে। সেই কাঠে ঘষা আগুন থেকে শুরু করে আজকালকার বিদ্যুতের আলো পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে তার নাম করতে গেলেও প্রকাণ্ড তালিকা হয়ে পড়ে। সেই কতরকমের তেলের প্রদীপ, কত শত চর্বি-বাতি, মোমের বাতি, কত অসংখ্য গ্যাসের আলো, বিদ্যুতের আলো, তার 'ঠাণ্ডা আলো' হিসাব রাখে কে। মানুষের তৈরি জিনিসে কাজ চলে ভালো, তাতে আর সন্দেহ নাই। রোদের আলো আর চাঁদের আলো আর প্রকৃতির নানা খেয়ালের নানারকমের আলো, কেবল এই নিয়ে আজকালকার নিতান্ত অসভ্য মানুষেরও জীবন চলে না। কিন্তু তবু বলতে হয় যে, এই প্রকৃতির রাজ্যে আমরা যতরকমের আলো দেখি, মানুষের তৈরি এই-সব আলো তারই অতি সামান্য নকল মাত্র। সূর্যের কথা ছেড়েই দিলাম, আকাশের মেঘে যে বিদ্যুতের আলো চমকায় তার সঙ্গে মানুষের কোন 'ইলেকট্রিক্ লাইটের' তুলনা হয়? সামান্য জোনাকি পোকার গায়ে যে আলো জ্বলে যাতে গরম হয় না অথচ আলো হয়, মানুষ তার নকলে 'ঠাণ্ডা আলো' জ্বালাবার জন্য কত চেষ্টা করেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত পেরে ওঠে নি। সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের কিরণ-মুকুট হতে যে অদ্ভুত আলো বেরোয়, তার গম্ভীর শোভায় পশুপাখি পর্যন্ত ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়; মানুষের মাথায় সেরকম আলোর কল্পনাও আসে না।

কিন্তু এই পৃথিবীতে সবচাইতে অদ্ভুত আর সবচাইতে সুন্দর যে আলো সে হচ্ছে মেরুদেশের 'আকাশ আলেয়া' বা 'মেরুজ্যোতি'। তাকে দেখতে হলে উত্তরে কিংবা দক্ষিণে মেরুর প্রদেশে যেতে হয়। সেখানে শীতকালের রাত্রে মেরুর চারিদিকে কয়েকশত মাইল দূর পর্যন্ত আলোর অতি চমৎকার খেলা চলতে থাকে। শুধু এই আলো দেখবার জন্যই প্রতি বৎসর কত দূরদেশের কত শত যাত্রী নরওয়ের উত্তরে দুরন্ত শীতের মধ্যে বেড়াতে যায়।

চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র এদের আলো কেমন স্থির। তারাগুলো অনেক সময়ে মিটমিট করে বটে, কিন্তু এলোমেলোভাবে কেউ নড়েচড়ে বেড়ায় না। কিন্তু 'আকাশ আলেয়া' বাস্তবিক ঐ সুদূর আকাশের জিনিস নয়, তার জন্মস্থান এই পৃথিবীর বাতাসেরই চূড়ার উপরে। বাতাস সেখানে অসম্ভবরকম হালকা, তার উপরে সূর্যের বিদ্যুৎকিরণ পড়ে তাকে চঞ্চল করে 'আকাশ আলেয়া'র সৃষ্টি করে—সুতরাং 'আকাশ আলেয়া'র চালচলনটাও কিছু অস্থিররকমের। কিন্তু অস্থির বলতে একেবারে বিদ্যুতের মতো দুরন্ত একটা কিছু মনে কোরো না। তার অস্থিরতা শ্রাবণের তুফান হাওয়ার মতো নয়, বসন্তের ঝিরঝিরে বাতাসের মতো।

'আকাশ আলেয়া'র রঙ রামধনুর চাইতেও সুন্দর, কারণ সেটা সত্যিকার আলোক-শিখা; আলোকটা তার নিজেরই আলো—আর রামধনুর আলো সূর্যের আলোর ধার-করা ছায়া মাত্র। তা ছাড়া অন্ধকার আকাশের কালো জমির উপরে রঙের খেলা যেমন খোলে, দিনেরবেলায় মেঘের গায়ে তেমন করে খুলতেই পারে না। অতি সুন্দর অতি স্নিগ্ধ হালকা নীল লাল সবুজ রঙের শিখার মতো এই আলো আকাশ জুড়ে খেলা করে। কখনো উপরে ওঠে, কখনো নীচে নামে, কখনো মিনিটে মিনিটে বহুরূপীর মতো রঙ বদলায়, কখনো রঙিন পর্দার মতো দুলতে থাকে, কখনো ঘূর্ণার পাকের মতো ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে, কখনো ধূমকেতুর ল্যাজের মতো আকাশের গায়ে খাড়া থাকে, আবার কখনো আলগা হয়ে টুকরো হয়ে আকাশময় ছড়িয়ে পড়ে। এক-এক সময়, বিশেষত শীতের রাতে এই আলোর খেলা এমন সুন্দর হয় যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার তামাশা দেখেও ক্লান্তিবোধ হয় না।

এই পৃথিবীটা একটা প্রকাণ্ড চুম্বকের গোলা—সেই চুম্বকের এক মাথা উত্তরে আর এক মাথা দক্ষিণে, মেরুর কাছে। আর সূর্যটা যেন একটা প্রকাণ্ড বিদ্যুৎশক্তির কুণ্ড—তার মধ্যে থেকে নানারকম আলো আর বিদ্যুতের তেজ আকাশের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে; তার খানিকটা আমরা দেখি, আর অনেকটাই হয়তো দেখি না। পণ্ডিতেরা বলেন, এই সূর্যের বিদ্যুৎ-ছটা আর পৃথিবীর চুম্বকশক্তি আর এই আলেয়ার আলো এই তিনটার মধ্যে ভিতরে ভিতরে খুব একটা সম্পর্ক দেখা যায়। সূর্যটা কেবল যে পৃথিবীকে আলো দেয় আর গরম রাখে তা নয়, সে নানারকম অদৃশ্য তেজে পৃথিবীকে ভিতরে বাইরে সব সময়েই নানানরকমে চঞ্চল করে রাখছে। সূর্যের গায়ে যখন ঘূর্ণির মতো দাগ দেখা যায় তখন পৃথিবীতেও চুম্বকের দৌরাত্ম্যে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রগুলো চঞ্চল হয়ে ওঠে—আর মেরুর আকাশে যেখানে পৃথিবীর এই চুম্বকের মাথা সেখানে এই আলেয়ার আলো আরো দ্বিগুণ উৎসাহে নূতন বাহার দেখিয়ে খেলা করতে থাকে। এগারো বছর পর পর সূর্যের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের এক-একটা বড়ো-বড়ো উৎপাত দেখা যায়—ঠিক সেই সময়েই পৃথিবীতেও চুম্বকের উপদ্রব আর আকাশ আলেয়ার বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে।

তোমরা জান, পাম্প্‌ দিয়ে ফুটবলে বাতাস পোরা যায়—কিন্তু একরকম উলটা 'পাম্প' আছে তা দিয়ে বাতাস খালি করে ফেলে। পণ্ডিতেরা এইরকমে বোতলের মধ্যে থেকে

বাতাস বের করে সেই ফাঁকা বোতলের মধ্যে বিদ্যুৎ চালিয়ে আকাশ আলেয়ার নকল করতে পেরেছেন। কিন্তু একটা বোতলের মধ্যে আলোর তামাশা আর খোলা আকাশের প্রকাণ্ড শরীরে আলোর খেয়াল-খেলা, এ দুয়ের মধ্যে অনেক তফাত।

সন্দেশ—আশ্বিন, ১৩২৪

আষাঢ়ে জ্যোতিষ

মানুষের বিদ্যায় যেখানে কুলায় না, কল্পনা সেখানের অভাব পুরাইয়া লয়। প্রাচীন কালের মানুষ যাহারা চন্দ্র সূর্য মেঘ বৃষ্টি আগুন বিদ্যুৎ দেখিয়া অবাক হইত অথচ কোনো ঘটনার কারণ খুঁজিয়া পাইত না, কোনো কিছুর মর্ম বুঝিত না, তাহারাও এই-সব ব্যাপার সম্বন্ধে নানারকম কল্পনা করিতে ছাড়ে নাই। সেই-সব প্রাচীনকালের কল্পনা কিন্তু কত দেশের কত পুরাণে কত গল্পের আকারে এখনো খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কেমন করিয়া সৃষ্টি হইল, তাহার কতরকম কাহিনী লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে, আজও তাহা শুনিলে আমাদের কৌতূহল জাগে। নানান দেশের নানান কাহিনীর মধ্যে সত্য ঘটনা আর কল্পিত কাহিনী এমনভবে জড়ানো আছে যে, তার কতটুকু সত্য আর কতটুকু মিথ্যা তাহা ঠিক করাই কঠিন।

এই পৃথিবীর সম্বন্ধেই কত গল্প মানুষে বানাইয়াছে। আমাদের দেশেই এক-এক পুরাণে তার এক-একরকম ঘটনা। এই পৃথিবীকে শূন্যে রাখিবার জন্য বাসুকীর মাথায় তাহাকে বসানো হইল, আবার তাহাতেও লোকের মন ওঠে নাই—মানুষ ক্ষীর সমুদ্রে কচ্ছপের কল্পনা করিয়া সেই কচ্ছপের পিঠে হাতি, হাতির পিঠে বাসুকীসুদ্ধ পৃথিবীকে চাপাইয়াছে। গ্রীস দেশের পুরাণে পৃথিবীটাকে পাতলা চাকতির মতো কল্পনা করা হইয়াছে। সেই অদ্ভুত চাকতি টুকরা টুকরা হইয়া সমুদ্রের মধ্যে ছড়ানো রহিয়াছে—সেই সমুদ্রের আর শেষ নাই, কূলকিনারা কোথাও নাই। কোনো-কোনো দেশে এই জগৎটাকে একটা ঢাকনি-দেওয়া সরার মতো মনে করা হইত। চন্দ্র সূর্যসুদ্ধ আকাশটা ঢাকনি আর পৃথিবীটা সরা। এই পৃথিবীর চেহারার বর্ণনাই কি কম পাওয়া যায়? তিন কোনা, চার কোনা, টাকার মতো, বাটির মতো, পদ্মের মতো, কতরকমের কল্পনা।

নরওয়ে দেশের পুরাণে বলে এই পৃথিবীটা একটা দৈত্যের মৃতদেহ। পৃথিবীর স্থলের ভাগ তার মাংস, এই সমুদ্রগুলি তার রক্ত, পাহাড়গুলি তার হাড় আর দাঁত আর গাছপালা সব তার গায়ের লোম আর চুলের জটা। সৃষ্টির আদিকাল হইতে অন্ধকার আর শীতের দৈত্যগুলার সঙ্গে আগুন ও আলোর দেবতাদের লড়াই লাগিয়া আছে। দৈত্য-যোদ্ধা ঈমিরকে রথ করিয়া দেবতারা তার শরীরটাকে আকাশের একটা প্রকাণ্ড ফাঁকের মধ্যে গুঁজিয়া সেইখানে এই পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। মনের মতো পৃথিবী গড়িয়া তাঁহারা দৈত্যের মাথার খলিটা দিয়া আকাশ বানাইলেন, সেই আকাশে দৈত্যের মগজ ছিটাইয়া মেঘের সৃষ্টি হইল। তখন সকলে বলিলেন, এমন সুন্দর পৃথিবী, ইহাকে অন্ধকার রাখা

চলে না, ইহার জন্য আলো চাই। তাঁহারা সমস্ত আকাশটার গায়ে আগুন ছিটাইয়া তার পর বড়ো-বড়ো দুইটা আগুনের গোলা দিয়া চন্দ্র সূর্য গড়িলেন। সেই চন্দ্র সূর্যের চমৎকার রথ গড়া হইল। সল্ (সূর্য) ও মানি (চন্দ্র) নামে দুই মহাবীর হইলেন রথের সারথি।

সমস্তই ঠিক হইল, কেবল দুইটা ভয়ানক দৈত্য নেকড়ে বাঘের চেহারা ধরিয়া কখন যে চন্দ্র সূর্যের পিছনে ছুটিতে লাগিল দেবতারা তাহাদের আটকাইতে পারিলেন না। দৈত্য দুইটার নাম স্কোল্ (ঘৃণা) ও হাটি (বিদ্বেষ)। তাহারা দেবতাদের এই কীর্তি নষ্ট করিবে বলিয়া সেই হইতে আজ পর্যন্ত পিছন পিছন ছায়ার মতো ছুটিয়া চলিতেছে। কখন এক-একবার তাহারা একেবারে চন্দ্র সূর্যের ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহাদের গিলিবার আয়োজন করে; তখন স্বর্গে মর্ত্যে—চারিদিকে ভয়ানক কোলাহল করিয়া লোকে হায় হায় করিতে থাকে; সেই কোলাহলের ভয়ে দৈত্যেরা মুহূর্তের জন্য দমিয়া যায় আর চন্দ্র সূর্যও সেই ফাঁকে আবার ছুটিয়া বাহির হয়। এইরকম ভাবে গ্রহণের পর গ্রহণ আসে আর চন্দ্র সূর্যের প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে। এমন একদিন আসিবে যখন এই দৈত্য চন্দ্র সূর্যকে একেবারে গিলিয়া হজম করিয়া ফেলিবে তখন প্রলয় আসিয়া সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।

চন্দ্রের একটি ছেলে আর একটি মেয়ে, তাহাদের নাম হিউকি আর বিল্। তাহারা আগে পৃথিবীতে থাকিত। সেই সময়ে তাহাদের নিষ্ঠুর বাপ সারারাত তাহাদের দিয়া জল বহাইত। সেইজন্য চন্দ্র তাহাদের পৃথিবী হইতে কাড়িয়া নিয়া নিজের বুকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। ঐ যে চাঁদের গায়ে কালো-কালো দাগ দেখিতে পাও সেগুলি আর কিছু নয়, হিউকি ও বিল্ তাহাদের মায়ের কোলে ঘুমাইয়া আছে। ইংরাজিতে যে ছেলে ভুলানো ছড়া শুনা যায়—

Jack and Jill went up the hi!l to fetch a pail of water.

(জ্যাক্ ও জিল্ জল আনিতে পাহাড়ে উঠিল)।

সেই ছড়ার জ্যাক্ ও জিল্ বাস্তবিক এই হিউকি ও বিল্। তাহাদের গল্প নরওয়ে দেশের নাবিকদের মুখে মুখে ইংলণ্ড পর্যন্ত আসিয়া এখন এইরকম দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের দেশের পুরাণেও এইরূপ গল্প আছে—সমুদ্রমন্থনে অমৃত উঠিল, দৈত্যদিগকে ফাঁকি দিয়া দেবতারা সে অমৃত বাঁটিয়া খাইলেন। রাহু দৈত্য লুকাইয়া দেবতাদের সঙ্গে বসিয়া সে অমৃতের ভাগ লইল। চন্দ্র সূর্য রাহুকে ধরিয়া ফেলিলে বিষ্ণু সুদর্শনচক্র দিয়া তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। সেই অবধি রাহুর কাটা মাথা রাগিয়া এক-একবার চন্দ্র সূর্যের ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে গিলিবার আয়োজন করে আর তাহাতেই গ্রহণ হয়।

সন্দেশ—কার্তিক, ১৩২৪

অলংকারের কথা

সুন্দর শরীরটিকে সাজাইয়া আরো সুন্দর করিব, মানুষের এই ইচ্ছাটি পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়। কিন্তু শরীরটি কিরকম হইলে যে ঠিক সুন্দর হয় আর কেমন করিয়া সাজাইলে যে তাহার সৌন্দর্য বাড়ে এ বিষয়ে নানাজাতির মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত দেখা যায়। আমাদের দেশে সাধারণত সুন্দর পুরুষ বা সুন্দরী মেয়ে বলিতে আমরা যা বুঝি, আফ্রিকার বাসুটো বা হটেণ্টট জাতির কাছে তাহার বর্ণনা করিতে গেলে তাহারা হয়তো আমাদের নিতান্তই বেয়াকুব ঠাওরাইবে।

যে ছেলেটা একেবারে ধ্যাপ্‌সা মোটা, আমাদের দেশের ছেলেরা তাহাকে পাইলে প্রশংসা করা দূরে থাকুক বরং তাহাকে খ্যাপাইয়া অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার কাছে পলিনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে যে-সব অসভ্য জাতি বাস করে, তাহাদের অনেকের মধ্যে মোটা হওয়ার শখটা খুবই বেশি। বিশেষত ছেলেপিলেরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে মোটা না হয় তবে বাপমায়ের আর দুঃখের সীমা থাকে না। ছেলেদের চাইতে আবার মেয়েদের মোটা হওয়াটা আরো বেশি দরকার। যে সহজে মোটা হয় না তাহাকে জোর করিয়া খাওয়াইবার এবং ঘরে বন্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। তাহাকে কোনো-রকম কাজকর্ম করিতে দেওয়া হয় না, পাছে সে খাটিয়া রোগা হইয়া পড়ে।

আফ্রিকার মূর জাতি এবং পারস্য তুরস্ক ও আমেরিকার কোনো কোনো জাতির পছন্দটা ঠিক ইহার উলটা। সেখানে মেয়েরা যে যত রোগা হইতে পারে ততই তার কদর বেশি। তাহারা কত কষ্টে কত সাবধানে আহার কমাইয়া, নানারকম পথ্যাপথ্য বিচার করিয়া চলে। একটু মোটা হইবার লক্ষণ দেখা দিলে তাহাদের ভাবনা-চিন্তার আর সীমা থাকে না।

চীন দেশে পা ছোটো করিবার জন্য মেয়েরা কত যন্ত্রণা সহ্য করে তাহা তোমরা বোধ হয় জান। তাহারা ছেলেবেলা থেকেই মুড়িয়া বাঁধিয়া পাগুলাকে এমন অস্বাভাবিক অকর্মণ্য ও বিকৃত করিয়া ফেলে যে দেখিলে আতঙ্ক হয়। আবার এমন জাতিও আছে যাহারা হাঁটুর নীচে তাগা আঁটিয়া পা-টাকে জন্মের মতো ফুলাইয়া দেয় আর মনে করে পায়ের চমৎকার শোভা বাড়িয়াছে।

অস্ট্রেলিয়ার কোনো কোনো জাতি চ্যাপ্টা নাকের ভারি ভক্ত। সে দেশের মায়েরা নাকি খোকাখুকিদের নাকের ডগাগুলি প্রতিদিন চাপিয়া চাপিয়া অল্পে-অল্পে দমাইয়া দেয়। ইংরাজ ছেলেমেয়েদের নাক দেখিয়া তাহারা ভারি নাক সিঁটকায়, আর বলে যে, 'ইহাদের বাপমায়েরা নিশ্চয়ই ছেলেপিলেদের নাক ধরিয়া টানাটানি করে, নইলে নাকগুলা এমন বিশ্রীরকম বাড়ে কি করিয়া!'

উত্তর আমেরিকার 'রেড ইণ্ডিয়ান'দের মধ্যে চ্যাপ্টা কপালের ভারি খাতির। তাহারা ছেলেবেলায় কপালে এমনভাবে পট্টি বাঁধিয়া রাখে যে, কপালটি বনমানুষের কপালের মতো চ্যাপ্টা ও ঢালু হইয়া দাঁড়ায়।

কানটা মাথার পাশে লাগিয়া থাকিবে কি বাদুড়ের মতো আলগা হইয়া থাকিবে এ বিষয়েও মতভেদ দেখা যায়। সুতরাং দেশ বিশেষে ও জাতি বিশেষে কানের উপরেও নানারকম চাপাচাপি ঠেলাঠেলির কৌশল খাটানো হয়। শরীরটিকে এইরকমে যতটা সম্ভব গড়িয়া পিটিয়া কোনোরকমে পছন্দসই করিতে পারিলে তার পরেও তাহাকে সাজাইবার দরকার হয়। সাজাইবার সবচাইতে সহজ উপায় তাহাতে রঙ মাখানো। এই রঙ লেপিবার শখটি অনেক জাতির মধ্যেই দেখা যায় এবং তাহার রকমারিও অনেক প্রকারের। লাল হলদে সাদা এবং কালো, সাধারণত এই কয়রকম রঙেই সব কাজ চলিয়া থাকে। এই-সকল রঙে সমস্ত দেহখানি চিত্র-বিচিত্র করিয়া আঁকিলে দেখিতে কেমন সুন্দর হয় বল দেখি? কেবল যে সৌন্দর্যের জন্যই রঙ লাগানো হয় তাহা নয়, অনেক দেশে লড়াইয়ের সময় বড়ো-বড়ো যোদ্ধারা নানারকম রঙ লাগাইয়া অদ্ভুত বিকট চেহারা করিয়া বাহির হয়। রঙ লাগাইবার কায়দা কানুন আবার এমন হিসাবমতো যে তাহাতে জাতি, ব্যবসায়, বংশ প্রভৃতি সমস্ত পরিচয়ই দেওয়া হয়।

কিন্তু রঙের একটা মস্ত অসুবিধা এই যে জীবন্ত চামড়ার উপর তাহাকে পাকা করিয়া মাখানো চলে না। স্নান করিতে গেলেই বা বৃষ্টিতে ভিজিলেই সমস্ত ধুইয়া যায়— সুতরাং যাহাদের শখ বেশি তাহারা কাঁচা রঙ ছাড়িয়া উল্কি আঁকিতে শুরু করিল। উল্কি আঁকা এক বিষম ব্যাপার। শরীরের মধ্যে ক্রমাগত ছুঁচ বিঁধাইয়া বিঁধাইয়া চামড়ার ভিতরে ভিতরে রঙ ভরিয়া তবে উল্কি আঁকিতে হয়। শৌখিন লোকেরা অল্পে-অল্পে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমন-কি, বৎসরের পর বৎসর এইরূপে শরীরকে রীতিমতো যন্ত্রণা দিয়া উল্কি রচনা করে। উল্কি আঁকার ওস্তাদ যাহারা, লোকে মোটা মোটা মাহিনা দিয়া তাহাদের কাছে উল্কি আঁকাইতে যায়। উল্কির কাজ অনেক দেশেই প্রচলিত, আছে, কিন্তু এ বিষয়ে জাপানীদের মতো কারিকর আর বোধ হয় কোথাও দেখা যায় না।

উল্কির অসুবিধা এই যে, গায়ের রঙটা নিতান্ত ময়লা হইলে তাহার উপর উল্কি ভালো খোলে না। সুতরাং আফ্রিকার নিগ্রো জাতিদের মধ্যে, বিশেষত কঙ্গো অঞ্চলের নিগ্রোদের মধ্যে এবং আরো অনেক দেশের কৃষ্ণবর্ণ লোকেদের মধ্যে উল্কির প্রচলন নাই। তাহাদের মধ্যে উল্কির বদলে একরকম ঘা-মরা দাগের ব্যবহার দেখা যায়, সে জিনিসটা উল্কির চাইতেও সাংঘাতিক। প্রথমত শরীরে অস্ত্র খোঁচাইয়া বড়ো-বড়ো ঘা বানাইতে হয়, তার পর নানারকম উপায়ে সেই তাজা ঘাগুলিকে অনেকদিন পর্যন্ত জিয়াইয়া রাখিতে হয়। এতরকম কাণ্ড-কৌশলের পর শেষে ঘা যখন শুকাইয়া উঠে তখন উঁচু উঁচু দাগের মতো তাহার চিহ্ন থাকিয়া যায়। কেবল সৌন্দর্যের খাতিরেই স্ত্রী-পুরুষ সকলে শখ করিয়া এত যন্ত্রণা সহ্য করে। শুনিয়াছি, ইউরোপ ও আমেরিকার কোনো কোনো শৌখিন মেমসাহেব দাঁতের মধ্যে ফুটা করিয়া তাহাতে হীরা মুক্তা বসাইয়া অলংকারের চূড়ান্ত করিয়া থাকেন।

বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে, অলংকারের শখটা মানুষের এক অদ্ভুত খেয়াল বলিয়া মনে হয়। রসায়নশাস্ত্রে বলে হীরা আর কয়লা, এই দুইটা আসলে একই জিনিস। যে

মুক্তার এত আদর সেই মুক্তাও একটা পোকার রস ছাড়া আর কিছুই নয়। সভ্যদেশে সোনা রূপা দিয়া অলংকার গড়ে, কিন্তু অনেক দেশে তামা, লোহা, দস্তা, সীসা পর্যন্ত অলংকার হিসাবে চলিয়া যায়। প্রবাল, নুড়ি, শঙ্খ, কড়ি, হাতির দাঁত, হাঙরের দাঁত, মানুষের হাড়, পাখির পালক, সমুদ্রের শ্যাওলা, কাঁচের পুঁথি, ছেঁড়া নেকড়া, ফলের বীচি, ফুল, পাতা, কাঠ—এমন-কি, জোনাকি পোকা বা জীবন্ত পাখি ও কচ্ছপ পর্যন্ত দেশ হিসাবে অলংকার বলিয়া আদর পাইয়া থাকে! কিন্তু যতরকম আশ্চর্য অলংকারের কথা শুনিয়াছি তাহার মধ্যে যেটি আমার কাছে সবচাইতে অদ্ভুত ঠেকিয়াছে সেটি হইতেছে টেলিগ্রাফের তার। প্রথম যখন পূর্ব আফ্রিকার নিগ্রো জাতিরা টেলিগ্রাফের নূতন পুরাতন তারগুলি খুব কিনিত তখন তাহার কারণ বুঝা যায় নাই। পরে দেখা গেল ঐ তারগুলিকে তাহারা মজবুত করিয়া হাতে বা পায়ে প্যাঁচাইয়া সদর্পে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মেয়েদের মধ্যে যাহারা নিতান্ত শৌখিন তাহারা হাত-পা ও গলা একেবারে তারে ঢাকিয়া ফেলে। কেহ কেহ এমন মজবুত করিয়া তার বাঁধে যে, গায়ের চামড়ায় একেবারে স্ক্রুর মতো দাগ বসিয়া যায়। বর্মাতে কোনো কোনো জায়গায় মেয়েরা গলায় এমন করিয়া তার জড়ায় যে তাহাতে গলা অস্বাভাবিকরকম লম্বা হইয়া পড়ে।

গলার অলংকারের কথা বলিতে গেলে কঙ্গো প্রদেশের আর-এক জাতির কথা মনে পড়ে। তাহাদের মেয়েরা গলায় গোল জাঁতার মতো পিতলের হাঁসুলি পরে, সেগুলি যত বড়ো আর যত ভারি হয় ততই লোকে বেশি করিয়া বাহবা দেয়! তাহার এক-একটা প্রায় আধ মণ পর্যন্ত ভারি হইতে দেখা গিয়াছে।

তার পর নাক-কানের কথা আর বেশি কি বলিব! আমাদের দেশেই এক-এক সময় নথ বা মাকড়ির যেরকম উৎকট চেহারা হয় তাহা দেখিয়া বিদেশী কেহ যদি হাসে, তবে সেটা কি খুব অন্যায় হয়? নাকের গহনার একটা অদ্ভুত ছবি দেখিয়াছি, তাহাতে একটি মেয়ের নাক ফুটা করিয়া কতগুলো মোটা-মোটা কাঠি বসানো হইয়াছে। কাঠিগুলা শিকারী বিড়ালের গোঁফের মতো মুখের দুই দিকে বাহির হইয়া রহিয়াছে।

নাক-কান ফুটা করিয়া গহনা পরা এ দেশে সকলেই দেখিয়াছ কিন্তু ঠোঁট বা গাল ফুঁড়িয়া অলংকার বসানো কোথাও দেখিয়াছ কি? দক্ষিণ আমেরিকার বামন জাতির মধ্যে উপরের ঠোঁটে আংটি গাঁথিবার প্রথা চলিত আছে। গ্রীনল্যাণ্ডের এস্কিমো জাতির মধ্যে এবং উত্তর আমেরিকার কোনো কোনো স্থানে তলার ঠোঁট চিরিয়া তাহার মধ্যে কাঠের চাকতি গুঁজিয়া রাখা হয়। আফ্রিকার কোনো কোনো স্থানে ঠোঁট বা গাল ফুটা করিয়া তাহাতে হাতির দাঁতের ছিপি বসাইবার দস্তুর আছে! সৌন্দর্যের জন্য লোকে এত কষ্টও সহ্য করে।

এখন চুলের কথা বলিয়া শেষ করি। নানা ফ্যাশানের চুল ছাঁটা, টেরিকাটা, বাবড়ি রাখা, ঝুঁটি বাঁধা, এ-সব তো আমরা সর্বদাই দেখি। কিন্তু কোনো মেয়ে যদি মাথায় আঠা লেপিয়া, চুলগুলিকে দড়ির ছড়ের মতো ঝুলাইয়া তাহার উপর লাল রঙ মাখাইয়া আসে, তবে সেটা কেমন দেখাইবে? কিংবা যদি মাথায় চুনকাম করিয়া চুলগুলাকে একেবারে

ইঁটের মতো চাকা বাঁধিয়া রাখে, তাহা হইলেই-বা কেমন হয় ? আফ্রিকা দেশে অনেক জায়গায় এরকম জিনিস অহরহই দেখিতে পাওয়া যায় !

সন্দেশ—অগ্রহায়ণ, ১৩২৪

গাছের ডাকাতি

ধীর শান্ত ক্ষমাশীল লোকের কথা বলতে হলে আমাদের দেশে গাছের সঙ্গে তার তুলনা দেওয়া হয়—'তরোরিব সহিষ্ণুণা'। গাছের মহত্ত্বের কথা ছেলেবেলায় কত যে পড়েছি এখনো তার কিছু কিছু মনে পড়ে। 'ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াং নোপসংহরতি দ্রুমঃ' —যে লোক পাশে বসে গাছের ডাল কাটছে তার কাছ থেকেও গাছ তার ছায়াটুকু সরিয়ে নেয় না। আরো শুনেছি, 'কঠিন অপ্রিয় বাক্য করিলে শ্রবণ, রক্তজবা রাগ ধরে মনুজ লোচন। ইহাদের শিরোপরে লোষ্ট্র নিক্ষেপণে, সুফল প্রদান করে বিনম্র বদনে।' এমন যে শান্ত নিরীহ গাছ সেও নাকি আবার অত্যাচার করে! নানারকম কৌশল করে, বিষ ঢেলে, ফাঁদ পেতে, হুল্ ফুটিয়ে, সঙ্গিন চালিয়ে, গোলা মেরে, সাঁড়াশি বিঁধিয়ে কত উপায়ে যে তারা দৌরাত্ম্যি করে তা শুনলে পরে তোমরা বলবে 'গাছের পেটে এত বিদ্যে'।

এর আগে শিকারী গাছের কথা বলেছি। তাতে গাছেরা কেমন করে আশ্চর্যরকম ফাঁদ পেতে পোকামাকড় ধরে খায়, তার গল্প দেওয়া হয়েছিল ; তারা নানারকম লোভ দেখিয়ে, রঙের ছটায় মন ভুলিয়ে পোকাদের সব ডেকে আনে ; কিন্তু যারা আসে তারা আর ফিরে যায় না। মধু খেতে খেতে কখন যে তারা ফাঁদের মধ্যে গিয়ে পড়ে সেটা তাদের খেয়ালই থাকে না ; কখন হঠাৎ টপ্ করে ফাঁদের মুখ বুজে যায়, কিংবা গাছের আঠালো রসে তাদের পা আটকিয়ে যায়, কিংবা ফাঁদের মধ্যে পিছল পথে উঠতে গিয়ে আর উঠতে পারে না তখন বেচারাদের ছট্‌ফটানি সার। এরা মাংসাশী গাছ, পোকামাকড় খেয়ে এরা বেঁচে থাকে, তাই প্রাণের দায়ে একটু-আধটু হিংসাবৃত্তি না করলে এদের চলবে কেন ?

খোঁজ করলে দেখা যায়, অনেক সময় গাছে গাছেও লড়াই চলে। অল্পে অল্পে দিনের পর দিন নিঃশব্দে সে লড়াই চলতে থাকে। এক জায়গায় দশ-বিশটা গাছ থাকলেই তাদের মধ্যে কিছু না কিছু রেষারেষি বেধে যায়। সকলেই চায় প্রাণ ভরে আলো আর বাতাস পেতে—সুতরাং যারা প্রবল তারা গায়ের জোরে সকলকে ঠেলেঠুলে বেড়ে ওঠে আর দুর্বল বেচারিরা আড়ালে অন্ধকারে শুকিয়ে মরে।

এক-একরকম গাছ থাকে তাদের কেমন অভ্যাস, তারা অন্য গাছের গায়ে পড়ে পাক দিয়ে উঠে তার পর তাদের চিপ্‌সে মারে। এক-এক সময় দেখা যায়, একটা গাছ সিন্ধবাদের বুড়োর মতো আর-একটা গাছের ঘাড়ে চেপে রয়েছে। গাছের অন্য বিদ্যা যেমনই থাক, সে তো হনুমানের মতো লাফাতে পারে না, তা হলে সে অন্যের ঘাড়ে চড়ল কি করে ? চড়তে হয় নি, ঐ ঘাড়ের উপরেই তার জন্ম হয়েছে। ঐখানে কবে কোন

পাখি এসে ফলের বীজ ফেলে গেছে, সুবিধা পেয়ে সেই বীজ এখন ডালপালা মেলে, মাটি পর্যন্ত শিকড় ঝুলিয়ে প্রকাণ্ড গাছ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে নীচের গাছটার খুবই আপত্তি থাকবার কথা, কিন্তু আপত্তি থাকলেই-বা শোনে কে? যেখানে সেখানে জন্ম নিয়ে বেড়ে ওঠায় এক-একটি গাছের বেশ একটু বাহাদুরি দেখা যায়। আমাদের দেশের অশ্বত্থগাছ এ বিষয়ে একেবারে পাকা ওস্তাদ। ছাতে দালানে পোড়ো মন্দিরে অন্য গাছের ঘাড়ে কারখানায় চিমনির চূড়ায়, যেখানে তাকে সুযোগ দেবে সেখানেই সে মাথা উঁচিয়ে বেড়ে উঠবে। বটগাছের জন্মও অনেক সময়ে অন্য গাছের ঘাড়ের উপর হয়—সেইখানে বাড়তে বাড়তে সে যখন বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয় তখন নীচের গাছটিকে সে অল্পে-অল্পে ফাঁস দিয়ে চেপে মারে। এইরকম করে সে বড়ো-বড়ো তালগাছকেও কাবু করে ফেলতে পারে।

আর একদল গাছ আছে তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সব সময় তৈরি থাকে, পাছে কেউ তাদের অনিষ্ট করে। শুকনা বালির দেশে মনসাগাছের বাড়তি খুব বেশি। মনসা গাছের পুরু ছাল, তার মধ্যে জলভরা নরমশাঁস, তাতে ক্ষুধাও মেটে তৃষ্ণাও দূর হয়। কিন্তু মনসাগাছের গা-ভরা কাঁটা, জানোয়ারের সাধ্য কি তার কাছে ঘেঁষে। গোরু ছাগলে কত সময়ে ক্ষুধার তাড়ায় কাঁটার কথা ভুলে গিয়ে মনসাগাছে মুখ দিতে গিয়ে নাকে মুখে কাঁটার খোঁচা খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে পালিয়ে আসে। মনসা জাতীয় গাছ নানা-রকমের হয়, কোনটা ছোটোখাটো, তার পুরু পুরু চ্যাটাল পাতা, কোনোটার পাতা নেই একেবারে থামের মতো খাড়া, কোনোটার চেহারা ঝোপের মতো, কোনোটার ভুট্টার মতো, কোনোটা চল্লিশ হাত লম্বা, কোনোটা বড়ো জোর এক হাত কি দেড় হাত। কিন্তু এক বিষয়ে সবাই সমান, সকলের গায়ে শজারুর মতো কাঁটা। কোনোটার কদমফুলের মতো সুন্দর চেহারা, দেখে হাত দিতে ইচ্ছে হয়—কিন্তু একটিবার হাত দিলেই বুঝবে কেমন মজা।

এই গাছগুলার কাঁটা এক-এক সময়ে এমন সরু হয় যে, হঠাৎ দেখলে বোঝা যায় না—কিন্তু ধরতে গেলে একেবারে ঝাঁকে ঝাঁকে কাঁটা চামড়ার মধ্যে ফুটে যায়। কাঁটাওয়ালা গাছ নানারকমের আছে, তার মধ্যে কোনো কোনোটি শুধু কাঁটাতেই সন্তুষ্ট নয়, তারা কাঁটার মধ্যে বিষ ভরে রাখে। তাতে কাঁটার খোঁচা আর বিষের জ্বালা দুটোই বেশ একসঙ্গে টের পাওয়া যায়। আবার দু-একটার কাঁটা নিতান্তই সামান্য—সরু শুঁয়ার মতো কিন্তু তাদের বিষ বড়ো তেজালো। বিছুটির পাতা অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে মনে হয় যেন অসংখ্য হুল উঁচিয়ে আছে—তাতে হাত দিবামাত্র তার আগাটুকু ভেঙে গিয়ে ভিতর থেকে বিষাক্ত রস বেরিয়ে আসে। এক-এক জাতীয় বিছুটি আছে—তাদের বিষে অসহ্যরকম যন্ত্রণা হয় এবং সপ্তাহ ভরে তার জ্বর চলে। এক সাহেব একবার এইরকম এক বিছুটি ঘাঁটতে গিয়ে তার পর নয় দিন শয্যাগত ছিলেন। তিনি বলেছেন যে বিছুটি লাগবার পর সারাদিন তাঁর মনে হত যেন তপ্ত লোহা দিয়ে কে তাঁর হাতের মধ্যে ঘা মারছে।

'ওল খেয়ো না ধরবে গলা'—এ কথা আমিও জানি তোমরাও জান; কিন্তু জঙ্গলের ধারে যখন বুনো ওলের নধর সবুজ পাতাগুলো ছড়িয়ে থাকে, তা খেলে যে গলা ধরবে এ কথা গোরু ছাগলে কি করে জানবে? এই-সব পাতার মধ্যে ছুঁচের চাইতেও সরু অতি

সূক্ষ্ম দানা থাকে, সেইগুলি গলায় জিভে ফুটে মুখের অবস্থা সাংঘাতিক করে তোলে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপে একরকম বেত পাওয়া যায়। তার পাতা খেলে গলা ফুলে কথা তো বন্ধ হয়ই, অনেক সময় দম বন্ধ হয়ে যেতে চায়। শুনা যায়, সেখানকার নিষ্ঠুর দাস-ব্যবসায়ীরা এই পাতা খাইয়ে ক্রীতদাসদের শাসন করত। এই বেতের নাম Dumb Cane বা 'বোবা বেত'।

আত্মরক্ষার জন্যেই অধিকাংশ গাছ নানারকমের ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় নেয়। কিন্তু কেবল নিজেকে বাঁচিয়েই সকলে সন্তুষ্ট নয়, বংশরক্ষার জন্যে তাদের যে-সব উপায় খাটাতে হয় সেগুলিও এক-এক সময় কম সাংঘাতিক নয়। অনেক গাছের ফল বা বীজ দেখা যায় যেন কাঁটায় ভরা। এইরকম কাঁটাওয়ালা নখওয়ালা ফল সহজেই নানা জানোয়ারের গায়ের চামড়ায় লেগে এক জায়গার ফল আর-এক জায়গায় গিয়ে পড়ে। তাতে জানোয়ারের অসুবিধা খুবই হতে পারে—কিন্তু গাছের বংশ বিস্তারের খুব সুবিধা হয়। এক-একটা ফলের কাঁটার সাজ অনাবশ্যকরকমের সাংঘাতিক বলে মনে হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় একরকম ফল হয় সে ফল মানুষে খায় না, তার গুণের মধ্যে তার প্রকাণ্ড দুইটি বঁড়শির মতো শিং আছে, তার একটি কোনো জন্তুর গায়ে বিঁধলে তার সাধ্য কি যে ছাড়িয়ে ফেলে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে, এই ফলের কামড় ছাড়াতে গিয়ে গোরু ছাগল বা হরিণের মুখের মধ্যে বঁড়শি আটকে গিয়েছে। পোষা জন্তু হলে মানুষের সাহায্যে সে উদ্ধার পেয়ে যায়, কিন্তু বনের জন্তু নিরুপায়। তারা কেবল অস্থির হয়ে পাগলের মতো ছুটে বেড়ায়--তাতে আধ-খোলা ফলের ভিতরকার বীচিগুলা চারিদিকে ছিটিয়ে পড়বার সুযোগ পায়, কিন্তু নিরীহ জন্তুর প্রাণটি যায়। এই ফলকে সে দেশের লোকে 'শয়তানের শিং' বলে।

এর চাইতেও ভয়ানক হচ্ছে আফ্রিকার সিংহ মারা ফল। আঁকশির মতো চেহারা, তার চারিদিকে 'বাঘনখা' ফলের মতো বড়ো-বড়ো নখ। নখের গায়ে ভীষণরকম কাঁটা তাদের এক-এক মুখ এক-এক দিকে--একটাকে ছাড়াতে গেলে আর-একটা বেশি করে বিঁধে যায়। প্রতি বছর সে দেশে হাজার হাজার হরিণ, ভেড়া আর ছাগল এইভাবে জখম হয়। যেখানে নখ বসে সেখানে ঘা হয়ে পচে ওঠে, তাতে ফল যদি খসে যায় তা হলে কতক রক্ষা ; না হলে শেষটায় প্রাণ নিয়ে টানাটানি। স্বয়ং পশুরাজ সিংহও যে এর হাত থেকে সকল সময়ে নিস্তার পেয়ে থাকেন তা নয়। এর জন্যে সিংহের প্রাণ দিতে হয়েছে এমনও দেখা গিয়েছে।

আর-এক রকম গাছ আছে, তাদের ফল পাকলে ফেটে যায় আর ভিতরের বীচি-গুলা সব ছিটিয়ে পড়ে। কোনো কোনো গাছে এই বীজ ছড়ানো কাজটি বেশ একটু জোরের সঙ্গে হয়। এক বাঁদরের গল্প শুনেছি, সে খুব বাহাদুরি করে গিলার গাছে বসে বসে মুখ ভ্যাংচাচ্ছিল। গিলার ফল হয় বড়ো-বড়ো সিমের মতো—সেগুলো পেকে পটকার মতো আওয়াজ করে ফেটে যায় আর চারিদিকে গিলা ছিটায়, বাঁদর তো সে খবর রাখে না, সে আরাম করে ল্যাজ ঝুলিয়ে বসে খুব একটা উৎকটরকম দুষ্টুমির ফন্দি আঁটছে, এমন সময় ফট্ করে গিলা ফেটে তার কানের কাছে চাঁটি মেরে গেল। বাঁদরটা হঠাৎ

হাত-পা ছেড়ে পড়তে পড়তে সামলে গেল—তার পর দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ফিরে দেখে কেউ নেই। এরকম অদ্ভুত কাণ্ড দেখে তার ভয় হল, না কি হল, তা জানি না কিন্তু সে এক লাফে সেই যে পালাল, একেবারে বিশ-ত্রিশটা গাছ না ডিঙিয়ে আর থামল না। দক্ষিণ আমেরিকায় একরকম ফল আছে, সে এই বিদ্যাতে গিলার চাইতেও ওস্তাদ। তার ফলগুলো ফাটবার সময় বন্দুকের মতো আওয়াজ করে আর তার ভিতরকার বীচিগুলো এমন জোরে ছুটে যায় যে ভালো করে তার চোট লাগলে মানুষ পর্যন্ত জখম হতে পারে।

ছেলেবেলায় একরকম গাছের গল্প পড়েছিলাম, তারা নাকি মানুষ ধরে টেনে খায়। কিন্তু আজকাল পণ্ডিতেরা এ কথা বিশ্বাস করেন না—কারণ, অনেক খোঁজ করেও সে গাছের কোনোরকম প্রমাণ পাওয়া যায় নি। যে গাছ পোকামাকড় খায়, সে সুযোগ পেলে পাখিটা বা ইঁদুরটা পর্যন্ত হজম করতে পারে। কিন্তু যে যদি মানুষ পর্যন্ত খেতে আরম্ভ করে তা হলে তো আর রক্ষা নেই।

সন্দেশ—পৌষ, ১৩২৪

কয়লার কথা

আমি এক টুকরো কয়লা। রাস্তার ধারে পড়ে আছি, কেউ আমার খবর নেয় না। একটি ছোট্টো ছেলে তার মার সঙ্গে যেতে যেতে খপ্ করে আমায় কুড়িয়ে নিল। দেখে মা বললেন, "আরে, ছি ছি—নোংরা। ওটা ফেলে দাও।" ছেলেটা অমনি আমায় তাচ্ছিল্য করে ফেলে গেল। দেখে রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলতে লাগল। হায় রে! আমার যদি কথা কইবার শক্তি থাকত, একবার আচ্ছা করে শুনিয়ে দিতাম।

কি শোনাতাম? কেন, আমার বয়সের কথা, আমার বংশের কথা, আমার গুণের কথা। সে কথা এখন কি আর তোমরা বিশ্বাস করবে?

হাজার হাজার বছর আগে যখন তোমরা কেউ ছিলে না, তোমাদের মতো দু-পেয়ে জন্তুরা যখন পৃথিবীর উপর সর্দারি করতে শেখে নি, আমি তখন ছিলাম ভীষণ বড়ো জঙ্গলের প্রকাণ্ড গাছের মধ্যে। তোমরা যাকে বল 'বনস্পতি' আমি ছিলাম সেইরকম জাঁকালো গাছের জ্যান্ত ডাল। কত যুগের পর যুগ আমরা সেখানে ছায়া দিয়েছি, কত অদ্ভুত পাখি আমার উপর বসে বিশ্রাম করেছে, কত বিদ্‌ঘুটে জন্তু সেই গাছের আশেপাশে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু অমন যে বিরাট জঙ্গল সে ও কি চিরকাল টিঁকতে পারে? এমন দিন এল, যখন সে জঙ্গলের আর চিহ্নমাত্র রইল না। যেখানে জঙ্গল ছিল সেখানে ছাই ভস্ম ধুলা বালির চাপের নীচে, ভিজা মাটি আর বৃষ্টির জলে মরা কাঠ পচতে লাগল। কত পথ-হারানো নদীর স্রোত কত কাদামাটি জঞ্জাল এনে তার উপরে ফেলে গেল; কত ভূমিকম্পে কত আগুনের উৎপাতে সেই জমি কতবার ধ্বসে পড়ল, কতবার ফেঁপে উঠল। কত পাহাড়-গলা পাথর এসে কত নতুন জমি তৈরি হল, তার উপরে নতুন মাঠ, নতুন বন, নতুন প্রাণীর খেলা চলল। আমরা যুগ যুগ ধরে তারই তলায় পচতে পচতে চাপে আর

গরমে পাথর হয়ে জমে উঠলাম। এমনি যে কত হাজার বছর ছিলাম, তার কি আর হিসাব রেখেছি? সেখানে মাটির নীচে কবরের মধ্যে বাইরের কোনো খবর পৌঁছায় না—বাইরের কেউ তার খবর জানে না।

তার পর একদিন শুনলাম কিসের শব্দ—কে যেন কি ঠুকছে। দিনের পর দিন রোজই ঠুকছে—খটাখট্ ঠকাঠক্ খটাং খটাং। ডাইনে বাঁয়ে চারিদিকে সেই একই শব্দ। শব্দ কাছে আসতে আসতে একদিন একেবারে আমারই সামনে এসে পড়ল—দেখলাম, তোমাদেরই মতো কতগুলো অদ্ভুত দু-পেয়ে জন্তু আমাদের সব ঠুকে ঠুকে কেটে নিচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম আমাদের কাজ বুঝি ফুরিয়েছে—এখন থেকে চিরটা কাল বুঝি এমনিভাবেই কাটাতে হবে। কিন্তু দেখলাম, তা নয়। আমাদের নেবার জন্যই এরা খেটেখুটে রাস্তা কেটে নেমে এসেছে।

তার পর বাইরে এসে দেখলাম, পৃথিবী আর সে পৃথিবী নাই! সে-সব গাছপালা নাই, সে-সব জীবজন্তু নাই—যেদিকে তাকাই কেবল দেখি এই দু-পেয়ে জন্তুর আশ্চর্য সব কাণ্ডকারখানা। তুমি ছোকরা, বড়ো যে আমায় তাচ্ছিল্য করে কথা কইছ, তুমি জান আমার খাতির কত? আমারই এই কালো রূপকে রাঙিয়ে নিয়ে তোমার ঘরের আগুন জ্বলে, আমার গুণেই রেল চলে, স্টিমার চলে, কলকারখানা সবই চলে। এই কলকাতার রাস্তায় গ্যাসের বাতি, বলি, এ গ্যাস আসে কোথা হতে? কয়লা চুঁয়ে জ্বালানি গ্যাস হয় —আর হয় এমোনিয়া আর তেল-কয়লা—যাকে তোমরা বলো Coalter।

শুধু কি তাই? ঐ এমোনিয়া দিয়ে কত যে কাজ হয়, প্রতি বছর কত হাজার মণ গাছের সার তৈরি হয়, তোমরা কি তার খবর রাখ? তার পর ঐ যে আলকাতরার মতো চট্‌চটে কালো নোংরা জিনিস, যাকে তেল-কয়লা বললাম—তা থেকে রাসায়নিক পণ্ডিতেরা কত যে আশ্চর্য জিনিস বানিয়েছেন, তাদের নাম করতে গেলেও প্রকাণ্ড পুঁথি হয়ে যায়। কত আশ্চর্য সুন্দর রঙ, ছবির রঙ, কাপড়ের রঙ, কালির রঙ; কত নতুন নতুন সুগন্ধ, এসেন্সে ফুলের গন্ধ, সিরাপে ফলের গন্ধ। কত ডাক্তারি ওষুধপত্র—পোকা মারবার, রোগের বীজ মারবার কত অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র; কত নূতন নূতন যুদ্ধসামগ্রী, কত বোমার মসলা, কত বারুদের মসলা, আর ছোটোবড়ো কত যে নকল জিনিস তার আর অন্তই নাই। এ-সবই সম্ভব হচ্ছে কেবল আমার জন্যই, অথচ তোমরা তো আমায় খাতির করবে না—কারণ, আমি যে কয়লা, আমি যে নোংরা ময়লা কালো রাস্তার কয়লা।

সন্দেশ—ফাল্গুন, ১৩২৪

জাহাজ ডুবি

সমুদ্রে চলিতে চলিতে প্রতি বৎসরই কত জাহাজ ডুবিয়া মরে। কেহ মরে ঝড় তুফানে, কেহ মরে ঢেউয়ের ঝাপটায়, কেহ মরে পাহাড়ের গুঁতায়, আর কেহ মরে অন্য জাহাজের ধাক্কা লাগিয়া—যুদ্ধের কথা নাহয় ছাড়িয়াই দিলাম। এইরকম কত উপায়ে

জাহাজ মরিতেছে তাহার ঠিকানাই নাই। এই-সকল জাহাজের মধ্যে কত সময় কত লাখ লাখ টাকার জিনিস থাকে, সেগুলি সমুদ্রের তলায় পড়িয়া নষ্ট হইবে—ইহা কি মানুষের সহ্য হয়? বিলাতে বড়ো-বড়ো ব্যবসাদার কোম্পানি আছে, তাহারা ডোবা-জাহাজ হইতে মাল উদ্ধার করে। এই কাজকে Salvage বলে! ইহাতে তাহারা এক-একসময় অনেক টাকা লাভ করিয়া থাকে। গভীর সমুদ্রে জাহাজ ডুবিলে তাহাকে আর বাঁচাইবার উপায় থাকে না; কিন্তু জল যদি খুব বেশি না হয় তবে অনেক সময় একেবারে জাহাজকে জাহাজ উঠাইয়া ফেলা যায়।

জাহাজ উঠাইবার নানারকম উপায় আছে। এক উপায়, তাহার সঙ্গে বাতাসপোরা বড়ো-বড়ো বাক্স বাঁধিয়া তাহাকে হালকা করিয়া ভাসাইয়া তোলা। আর এক উপায়, তাহার চারিদিকে দেয়াল ঘিরিয়া সেই দেয়ালের ভিতরকার সমুদ্রকে 'পাম্প' দিয়া শুকাইয়া ফেলা। রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় জাপানীরা যখন পোর্ট আর্থার দখল করে তখন সেখানকার বন্দরে রুশেরা কতগুলা জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছিল। জাপানীরা দেয়াল তুলিয়া সমস্ত বন্দরের মুখ আঁটিয়া দেয়; তার পর বড়ো-বড়ো কল দিয়া বন্দরের জল সেঁচিয়া ফেলিতেই জাহাজগুলা বাহির হইয়া পড়িল। জাপানীরা সেই জাহাজ আবার মেরামত করাইয়া কাজে লাগাইয়াছে।

একবার স্পেন হইতে কিছু দূরে একটি জাহাজ জখম হইয়া ডুবিতে আরম্ভ করে। জাহাজের কাপ্তান দেখিল স্পেন পর্যন্ত পৌঁছিবার আগেই জাহাজ ডুবিয়া যাইবে। জাহাজের নীচেকার খোলে হাজার মণ লবণ বোঝাই রহিয়াছে—সকলে মিলিয়া সারাদিন লবণ ফেলিলেও তাহার কিছুই কমতি হইবে না। তাই তিনি হুকুম দিলেন, "জাহাজ ছাড়িতে হইবে, নৌকা নামাও।" এমন সময় এক সালভেজ কোম্পানির জাহাজ আসিয়া হাজির—তাহারা আসিয়াই ব্যাপার দেখিয়া জাহাজ ডুবিবার আগেই তাহা কিনিতে চাহিল। লবণ-জাহাজের কাপ্তান বলিল, "মাঝ সমুদ্রে জাহাজ ডুবিলে কিনিয়া লাভ কি?" সালভেজ কাপ্তান বলিল, "জাহাজ ডুবিতে দিব না।" শুনিয়া লবণের কাপ্তান হাসিয়া বলিল, "আমি তো জাহাজ ছাড়িয়াই দিব—তুমি কিনিতে চাও আমার আপত্তি কি?" জাহাজ কিনিয়াই নূতন কাপ্তান তাহাতে জল বোঝাই করিতে লাগিল—পুরাতন নাবিকেরা বলিল, "আহা কর কি? একেই জাহাজ ডুবিতেছে, আবার জল চাপাইতেছ? তুমি পাগল নাকি?" কাপ্তান কোনো কথা না বলিয়া লবণের মধ্যে ক্রমাগতই জল ঢালিতে লাগিল। তার পর সমস্ত লবণ জলে গুলিয়া সেই লবণ-গোলা জলে পাম্প বসাইয়া হুড়হুড় করিয়া জল সেঁচিয়া ফেলিল। জাহাজ হালকা হইয়া ভাসিয়া উঠিল। পুরাতন কাপ্তান ব্যাপার দেখিয়া আহাম্মক বনিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।

সন্দেশ—চৈত্র, ১৩২৪

আশ্চর্য আলো

আজকাল শহরে শহরে বিদ্যুতের আলো দেখা যায়। জাহাজে রেলগাড়িতে সবখানেই 'বিজলীবাতি'র আমদানি হইয়াছে। জল জোগাইবার জন্য রাস্তায় যেমন নল বসানো হয়, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পাঠাইবার জন্য সেইরকম লোহা বা তামার তার খাটাইতে হয়। জলের কারখানায় বড়ো-বড়ো দমকলের চাপে জল ঠেলিয়া উঁচুতে তোলে, সেই তোলা-জল শহরের নল বাহিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বিদ্যুতের ব্যবস্থাও কতকটা সেইরকম —বিদ্যুতের কারখানায় বড়ো-বড়ো কলে বিদ্যুৎ জমাইয়া রাখে, আর সেই বিদ্যুৎ আপনার চাপে তারের পথ ধরিয়া বহুদূর পর্যন্ত ছুটিয়া যায়। নলের মুখ বন্ধ থাকিলে যেমন জল আর চলে না, তেমনি তার কাটিয়া দিলে বা কোনোখানে তারের জোড় খুলিয়া গেলে বিদ্যুতেরও চলার পথ বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু জলের চাপ যদি খুব বেশি হয়, তবে সে অনেক সময়ে সকল বাধা ঠেলিয়া আপনার পথ করিয়া লয়—জলের তোড়ে রাস্তাঘাট ভাসাইয়া বিষম কাণ্ড উপস্থিত করে। সেইরকম বিদ্যুতের প্রবল স্রোত যদি সহজ পথ না পায় তবে সেও আকাশ চিরিয়া জোর করিয়া আপনার পথ কাটিতে জানে। ঝড়ের সময়ে আকাশ ফুঁড়িয়া মেঘে মেঘে বিদ্যুতের হানাহানি চলে, সেই পথহারা বিদ্যুৎ পৃথিবীর ঘাড়ে পড়িলে যে ভয়ানক কাণ্ড হয় তাহারই নাম 'বাজ পড়া'। নর্দমা কাটিয়া যেমন জল সরায়, বুদ্ধিমান মানুষে তেমনি বাড়ির পাশে লোহার শিক খাড়া করিয়া বিদ্যুতের জন্য সহজ পথ করিয়া রাখে।

পণ্ডিতেরা বোতলের ভিতরে এইরকম বিদ্যুৎ ছুটাইয়া অনেক আশ্চর্য পরীক্ষা করিয়াছেন। বোতলটাকে খালি করিয়া তাহার মধ্যে বিদ্যুৎ চালাইলে অতি অদ্ভুত রঙিন আলোর খেলা দেখা যায়। কেবল রঙের খেলা নয়, পণ্ডিতেরা তাহার মধ্যে এমন সব আশ্চর্য কাণ্ড দেখিতে পান যে তাহার আলোচনার জন্যই কত লোকে সারা জীবন ভরিয়া খাটিতেছেন।

বোতলকে 'খালি' করার কথা বলিলাম কিন্তু তাহার অর্থ কি? সাধারণত, আমরা যাহাকে 'খালি বোতল' বলি তাহা মোটেও খালি নয়, কারণ, তাহার ভিতরটা আগাগোড়াই বাতাসে পোরা। সেই বাতাসকে কলে চুষিয়া বাহির করিলে যাহা থাকে পণ্ডিতেরা তাহাকে বলেন Vacuum অর্থাৎ ফাঁকা আকাশ। এইরকম একটা বোতলের দুই দিকে তার জুড়িয়া তাহার মধ্যে বিদ্যুতের ঝিলিক চালাইলে দেখা যায় যে সেই ফাঁকা বোতলের মধ্যে বিদ্যুতের এক নূতন চেহারা বাহির হয়। বিদ্যুতের তেজ স্নিগ্ধ জ্যোতির মতো বোতলের এক মাথা হইতে আর এক মাথায় ছড়াইয়া পড়ে, আর বোতলের ভিতরটা আশ্চর্য সুন্দর আলোয় ভরিয়া জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতে থাকে।

দেখিবার জিনিস এবং শিখিবার জিনিস ইহার মধ্যে এত আছে যে সে-সব কথা আজ আর বলিবার সময় নাই, কেবল একটা আশ্চর্য ব্যাপারের কথা এখানে বলিব।

তাহার কথা তোমরা অনেকে হয়তো শুনিয়াছ—তাহার নাম 'রঞ্জনের আলো' বা X-Ray (অজানা আলো)। ফাঁকা বোতলের মধ্যে বিদ্যুতের আঘাতে এই আশ্চর্য আলোর জন্ম হয়। কাঁচ ফুঁড়িয়া সেই আলো বাহিরে চলিয়া আসে, কিন্তু তাহাকে চোখে দেখা যায় না।

কোনো কোনো জিনিস আছে, তাহারা নানারকম তেজ শুষিয়া সেই তেজে আবার আপনি আলো দিতে থাকে। একরকম পাথর দেখা যায়, তাহারা দিনের আলোক জমাইয়া রাখে আর অন্ধকারে জ্বল্‌জ্বল্ করে। রাত্রে সময় দেখিবার জন্য আজকাল একরকম ঘড়ি কিনিতে পাওয়া যায়, তাহার কাঁটা ও সময়ের অঙ্কগুলা আপনার আলোয় টিম্‌টিম্ করিয়া জ্বলিতে থাকে। আজকাল যুদ্ধেও এইরূপ মসলা-মাখানো একপ্রকার রঙের ব্যবহার হয়; যেখানে শত্রুর ভয়ে ভালোরকম আলো জ্বালিবার উপায় নাই সেখানে এই জ্বলন্ত রঙের চিহ্ন আঁকিয়া নানারকম সংকেত জানানো হয়, অন্ধকারে পথ দেখাইয়া চলাফেরার সুবিধা করা হয়।

ফাঁকা বোতলের ঐ অদৃশ্য তেজ ধরিবার জন্যও নানারকম মসলা পাওয়া যায়। একটা পর্দার উপর সেই মসলা মাখাইয়া তাহাকে ঐ বিদ্যুৎ-পোরা বোতলের কাছে আনিলেই পর্দাটা আলো হইয়া ওঠে। বোতলটাকে কালো কাগজে মুড়িয়া ফেল, তবুও পর্দা জ্বলিতে থাকিবে। বোতলের উপর কাঠের বাক্স চাপা দেও—কাঠ ভেদ করিয়া সে অদৃশ্য আলো মসলার পর্দাকে জ্বালাইয়া তুলিবে। কিন্তু বিদ্যুৎ চালানো একটিবার বন্ধ করিয়া বোতলের তেজ নিভাইয়া দাও, সেই সঙ্গে পর্দার আলোও নিভিয়া যাইবে। পর্দার সামনে যদি একখানা লোহার টুকরা ধর, তাহা হইলেও যেখানে লোহার আড়াল পড়িয়াছে সেইখানে পর্দা জ্বলিবে না—কারণ বোতলের আলো লোহার ভিতর দিয়া যাইতে পারে না। একটা পয়সা আনিয়া পর্দার সামনে ধর, তাহারও পরিষ্কার গোল ছায়া পড়িবে। এইরকম পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, পর্দার উপর হাড়ের ছায়া পড়ে কিন্তু মাংস বা চামড়ার কোনো ছায়া পড়ে না।

এইজন্য পর্দার সামনে তোমার জামাসুদ্ধ হাতখানা ধরিলে তোমার জামাও দেখিবে না আর নধরপুষ্ট মাংস-ভরাট আঙুলও দেখিবে না—দেখিবে কতগুলো হাড়ের ছায়া।

একটি কাঠবিড়ালের ছবি তোল। ছবিতে হাড়গোড় সবই উঠিবে—অথচ অমন জমকাল ল্যাজটির চিহ্নমাত্র থাকিবে না। জ্যান্ত জীবের এরকম কংকালছায়া সর্বপ্রথম দেখেন রঞ্জেন বা রণ্টগেন সাহেব (Rontgen), তিনিই ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে, অর্থাৎ বাইশ বৎসর আগে ঐরূপ জ্বলন্ত পর্দার সাহায্যে এই আলো আবিষ্কার করেন। প্রথম যখন তিনি পর্দার সামনে হাতের আড়াল দিয়া দেখেন তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে কতগুলা হাড়ের ছায়া দেখিবেন। তাই হঠাৎ আপনার 'হাড্ডিসার' ছায়া দেখিয়া তিনি ভারি আশ্চর্যবোধ করিয়াছিলেন।

তামাশা হিসাবেও এটা একটা দেখিবার মতো ব্যাপার, তাহাতে আর সন্দেহ কি! কাঠের বাক্সের মধ্যে চামড়ার ব্যাগ, কাগজ কলম, হাড়ের বোতাম, ছুঁচসুতা, চাবি ভরিয়া একবার পর্দার আলোর সামনে ধর—কাঠের বাক্স ছায়াতে কাঁচের মতো স্বচ্ছ দেখাইবে আর তাহার ভিতরকার ছুঁচ, চাবি আর কলমের মুখটা স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িবে।

বোতামের ফিকে ছায়া দেখা যাইবে কিন্তু কাগজ সুতা বা চামড়ার ব্যাগ খুঁজিয়া পাওয়া মুস্কিল হইবে—অথচ ব্যাগের ভিতর যদি টাকা পয়সা থাকে তাহারও পরিষ্কার ছায়া পড়িবে।

কিন্তু পণ্ডিতেরা কেবল তামাশা দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না, তাঁহারা ইহার নিয়ম-কানুন বাহির করিয়া ব্যাপারটাকে অনেকরকম কাজে লাগাইয়াছেন। ডাক্তারেরা এই আলোকের সাহায্যে রোগীর দেহ পরীক্ষা করিতেছেন, নানারকম কৌশল করিয়া জ্যান্ত মানুষের বুকের ধুক্‌ধুকানি আর পাকস্থলীর হজমক্রিয়া দেখিতেছেন, শরীরের ভিতরে কোথায় হাড় ভাঙিল, কোথায় গুলি লাগিল, কোথায় উৎকট রোগের সঞ্চার হইল, সব চোখে দেখিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। আজকালকার যুদ্ধে কত হাজার হাজার আহত সৈন্যকে এই আলোকে পরীক্ষা করিয়া আঘাতের রকমটা স্পষ্ট বুঝিয়া তাহার চিকিৎসা করা হইতেছে। ব্যবসা বাণিজ্যে নানা জিনিসের ভেজাল ধরিবার জন্য ও নানারকম খুঁত পরীক্ষার জন্যও এই আলোর ব্যবহার হয়। প্রথম যাঁহারা এই-সকল পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, এ আলো কি সাংঘাতিক জিনিস। অদৃশ্য আলোয় ক্রমাগত কাজ করিতে করিতে অনেকের চোখ অন্ধ হইয়াছে, হাতে সাংঘাতিক ঘা হইয়া হাতটি নষ্ট হইয়াছে, এমন-কি, কেহ কেহ প্রাণ পর্যন্ত দিয়াছেন। এমন সর্বনেশে আলো!

তোমাদের কাহারও মনে কি এমন অহংকার আছে যে তোমার চেহারাটি খুব সুন্দর? যদি থাকে, তবে একটিবার এই আলোতে ঐ মুখখানির ফোটো তুলাইয়া দেখ। তাহা হইলে বোধ হয় আর রূপের দেমাক থাকিবে না।

সন্দেশ—বৈশাখ, ১৩২৫

পিরামিড

ইংরাজিতে Seven Wonders of the world বা পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য কীর্তির কথা শুনিতে পাই। ইজিপ্টের পিরামিড তার মধ্যে একটি। 'একটি' বলিলাম বটে কিন্তু আসলে পিরামিড একটি নয়, অনেকগুলি। ইজিপ্টের নানা জায়গায় ঘুরিলে হয়তো একশো গণ্ডা পিরামিড খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাহার মধ্যে অধিকাংশই ভাঙা ইঁট পাথরের স্তূপমাত্র। বাস্তবিক দেখিবার মতো নামজাদা পিরামিড খুব অল্পই আছে, তাহাদের মধ্যে কাইরো নগরের কাছে যে তিনটি পিরামিড সেইগুলিই সকলের চাইতে আশ্চর্য।

আশ্চর্য বলি কিসে? প্রথম আশ্চর্য তার বিপুল আয়তন। সবচাইতে বড়ো যে পিরামিড, যাহাকে চেয়প্‌স্ বা খুফুর পিরামিড বলে সেটি প্রায় সাড়ে তিন শো হাত উঁচু! একটা সাধারণ তিনতলা বাড়ির দশ গুণ। দূর হইতে দেখিলে মনে হয় একটা ইঁটের পাঁজা—তাহার গায়ে কোনো কারুকার্য নাই, গঠনের কোনো বিশেষত্ব নাই। দেখিয়া বিশেষ কোনো সম্ভ্রমের উদয় হয় না। কিন্তু একটিবার কাছে গিয়া তাহার নীচে দাঁড়াইয়া

দেখ, কি বিরাট কাণ্ড! এক-একটি ইঁট এক-একটি প্রকাণ্ড পাথর—তার মধ্যে নিতান্ত ছোটো যেটি, তাহার ওজন পঞ্চাশ মণের কম হইবে না! আর খুব বড়ো-বড়োগুলা এক-একটি হাজার দেড়হাজার মণ।

কত পাথর! চারিদিকে চাহিয়া দেখ কেবল পাথরের উপর পাথর। না জানি কত বৎসর ধরিয়া কত সহস্র লোকের প্রাণপণ পরিশ্রমে এত পাথর একত্র করিয়া এমন স্তূপ গড়িয়াছে। ভাবিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়। প্রায় একশত বিঘা জমির উপরে এই প্রকাণ্ড জিনিসটাকে দাঁড় করানো হইয়াছে। এই কলিকাতা শহরের সমস্ত ঘরবাড়ি ভাঙিয়া যদি পিরামিড গড়িতে যাও দেখিবে তাহাতেও মালমসলায় কুলাইবে না—সমস্ত শহর স্তূপাকার করিয়াও অত বড়ো পিরামিড গড়িতে পারিবে না। অথচ এমন অসম্ভব কাজও মানুষে করিয়াছে। নীল নদীর ওপার হইতে পাহাড় কাটিয়া মানুষ পাথর আনিয়াছে, সেই পাথর নৌকায় তুলিয়া নদী পার করিয়াছে, তার পর দুই মাইল পথ সেই পাথর টানিয়া লইয়াছে, আর ধাপে ধাপে সেই পাথর সাজাইয়া প্রকাণ্ড পিরামিড গড়িয়াছে।

সে কি আজকার কথা! প্রায় ছয়হাজার বৎসর হইল, রাজা চেয়প্স্ ভাবিয়াছিলেন নিজের গোরস্থান বানাইয়া পৃথিবীতে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া যাইবেন, সেই কল্পনাই ত্রিশ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পিরামিডের মূর্তি ধরিয়া দাঁড়াইল।

এই ছয়হাজার বৎসরে পিরামিডের চেহারা অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে। আগে তাহার উপরে সাদা পাথরের পালিশ করা ঢাকনি ছিল, এখন কেবল দু-এক জায়গায় তাহার একটু-আধটু চিহ্নমাত্র বাকি আছে। একটা পিরামিডের চূড়ায় এখনো সেকালের সেই সাদা ঢাকনিটি লাগিয়া আছে, তাহাতে দেখা যায় যে ছয়হাজার বৎসর আগে পিরামিডের চেহারা কেমন মোলায়েম ছিল। এখন আর তাহার সে চেহারা নাই, চারিদিকে পাথরের ধাপ বাহির হইয়া পড়িয়াছে—চেষ্টা করিলে তাহার সাহায্যে পিরামিডের গা বাহিয়া চূড়ায় উঠা যায়। এমন দুরবস্থা না হইবে-বা কেন? অন্তত দু-তিনহাজার বৎসর ধরিয়া লোকে এই পিরামিডের পাথর খসাইয়া সেই পাথরে নিজেদের ঘরবাড়ি মসজিদ বানাইয়াছে। পিরামিডের কাছাকাছি যত কোঠা দালান তাহার মধ্যে কতগুলা যে এইরূপ চোরাই মালে তৈরি তাহার আর সংখ্যা নাই।

ছয়হাজার বৎসর আগেকার মানুষ, তাহারা কেমন করিয়া এত বড়ো-বড়ো পাথর সাজাইয়া এমন পিরামিড গড়িল একালের মানুষ ভাবিয়া তাহার কিনারা পায় না। তবে সেকালের গ্রীক লেখক হেরোডোটস এ-বিষয়ে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে পিরামিড বিষয়ে মোটামুটি অনেক সংবাদ পাওয়া যায়।

তাহাতে দেখা যায় যে নদীর ওপার হইতে পিরামিডের ভিত্তি পর্যন্ত পাথর বহিবার জন্য প্রায় দুইহাজার হাত লম্বা, চল্লিশ হাত চওড়া এক রাস্তা বানাইতে হইয়াছিল। রাস্তাটা আগাগোড়া পালিশ-করা পাথরের তৈরি, তার একদিক প্রায় বত্রিশ হাত উঁচু, আর-একদিক ক্রমে ঢালু হইয়া নদী পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। একলক্ষ লোক ক্রমাগত দশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া এই রাস্তা বানাইয়াছিল। যতক্ষণ রাস্তা বানানো হইতেছিল, ততক্ষণে আর-

একদল লোকে পাহাড়ে জমি ভাঙিয়া পিরামিডের ভিত্তি সমান করিতেছিল। সেই ভিত্তির উপর আশ্চর্য কৌশলে ঘর বসাইয়া তাহারই চারিদিকে রাজার সমাধি-মন্দির তৈরি হইয়াছে।

হেরোডোটস বলেন পিরামিড শেষ করিতে আরো বিশ বৎসর লাগিয়াছিল। কত অসংখ্য ক্রীতদাস কত হাজার হাজার প্রজা মিলিয়া এই কাজে লাগিয়াছিল তাহার আর হিসাব পাওয়া যায় না। কিন্তু একটি যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে সে অতি চমৎকার। এক সময়ে পিরামিডের গায়ে আয়-ব্যয়ের একটা ফর্দ লেখা ছিল—তাহারই একটুখানি হেরোডোটসের সময় পর্যন্ত টিঁকিয়াছিল। তাহাতে দেখা যায় যে মজুরদের খোরাকির জন্য পেঁয়াজ রসুন আর মুলা এই তিন জিনিসেরই খরচ লাগিয়াছিল প্রায় ত্রিশলক্ষ টাকা। এখন ভাবিয়া দেখ সমস্ত পিরামিডটাতে না জানি কত কোটি কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল। শোনা যায় রাজা ইহার জন্য তাঁহার যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া একেবারে সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের ধনরত্ন যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহার প্রায় সমস্তই তাঁহার সঙ্গে কবরের মধ্যে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার কিছুই বাকি নাই, আছে কেবল শূন্য কবরের কতগুলা ভাঙা পাথর মাত্র। ভিতরে মূল্যবান যাহা কিছু ছিল মানুষে লুঠ করিয়া তাহার আর কিছু রাখে নাই। পিরামিডের ভিতরটা কিরকম, অনেকদিন পর্যন্ত তাহা জানিবার কোনো উপায় ছিল না, এমন-কি, উহা বাস্তবিকই সমাধিস্তম্ভ কিনা, সে-বিষয়ে নানারকম তর্ক শোনা যাইত। কিন্তু এখন মানুষে আবর্জনা সরাইয়া তাহার ভিতরে ঢুকিবার সুড়ঙ্গ পথ বাহির করিয়াছে। ভিতরের ব্যবস্থাও অতি আশ্চর্য।

পিরামিডের গোড়ার কাছেই একটা নীচমুখী সুড়ঙ্গ—সেটা খানিক দূরে গিয়া দুমুখো হইয়া গিয়াছে। একটা মুখ মাটির নীচে একটা খালি ঘর পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে—আর-এক মুখ উপরের দিকে উঠিয়াছে। সেদিকে রানীর কবরঘর—তার উপর প্রকাণ্ড সিঁড়ি, তার পরে রাজার সমাধি। সমাধির উপরে আবার পাঁচতলা ঘর। তা ছাড়া আরো ছোটোখাটো ঘর আছে, ঘরের মধ্যে বাতাস আনিবার জন্য বড়ো-বড়ো লম্বা নলের মতো সুড়ঙ্গ আছে—আর আছে কতগুলো বড়ো-বড়ো পাথর যাহার কোনো অর্থ বোঝা যায় না।

কেবল প্রকাণ্ড জিনিস বলিয়াই যে পিরামিডের সম্মান করি তাহা নয়--যাহারা পিরামিড গড়িয়াছে, ওস্তাদ কারিকর হিসাবেও তাহারা নমস্কারযোগ্য। বড়ো-বড়ো পাথরকে অদ্ভুত কৌশলে তাহারা এমন নিখুঁতভাবে জোড়া দিয়াছে যে, আজও সেই জোড়ের মুখে একটি ছুঁচ ঢুকাইবার মতোও ফাঁক হয় নাই। যে চতুষ্কোণ জমির উপরে পিরামিড বানানো হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি কোণ সূক্ষ্ম হিসাবে মাপিয়া সমান করা হইয়াছে, চতুষ্কোণের চারটি দিক এমন নিখুঁতভাবে সমান, যে নিপুণ জরীপের হিসাবে তাহাতে দু আঙুল পরিমাণও তফাত পাওয়া যায় না। ঘড়ির কলের মতো এমন সূক্ষ্ম হিসাব ধরিয়া যে জিনিস খাড়া করা হইল, তাহার ওজন ১৯০,০০০,০০০, উনিশকোটি মণ। এই ভারতবর্ষের অর্ধেক লোককে যদি দাঁড়িপাল্লায় চাপাও তবে এইরকম একটা ওজন পাইতে পার।

যাহারা পিরামিড বানাইল, তাহারা কিরকম লোক ছিল? তাহাদের চালচলন পোশাক পরিচ্ছদ বাড়িঘর আচার-ব্যবহার এ-সবই-বা কিরকম ছিল? জানিতে ইচ্ছা হয় না কি? যাঁহারা পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত, কেবল প্রাচীনকালের খবর খুঁজিয়া ফেরেন, তাঁহারা ইজিপ্টের মাটি খুঁড়িয়া তাহার ভিতর হইতে সেই কোনকালের ইতিহাসকে টানিয়া বাহির করিয়াছেন। কত ঘরবাড়ি, কত আসবাবপত্র, কত অদ্ভুত ছবি, কত মোমে আঁটা মৃতদেহ, (Mummy) তাহার আর অন্ত নাই। ইজিপ্টে মৃতদেহ রক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল, সে অতি আশ্চর্য। মৃতদেহকে পরিষ্কার করিয়া নানারকম মসলা মাখাইয়া মোমজামার ফিতা দিয়া এমন করিয়া মোড়া হইত যে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া সে দেহ আর পচিতে পারিত না। ফিতার উপর ফিতা, প্যাঁচের উপর প্যাঁচ। এক-একটি রাজার মৃতদেহ মুড়িতে পাঁচ-দশ মাইল ফিতা অনায়াসেই খরচ হইয়া যাইত। তাহার মধ্যে দেহগুলি কাঠ হইয়া শুকাইয়া থাকিত, কিন্তু পচিত না। এইরূপে অতি প্রাচীনকালের ইতিহাসে যে-সকল রাজার নাম শোনা যায় তাহাদেরও অনেকের আস্ত দেহ পাওয়া গিয়াছে।

ইজিপ্টের আর-একটি জিনিস তাহার 'ছবির ভাষা'। তাহাদের মনের কথাগুলি ভাষার অক্ষরে না লিখিয়া তাহারা ছবি আঁকিয়া বুঝাইয়া দিত। ইহাতে কত সুবিধা হইয়াছে বুঝিতেই পার। 'রাজা যুদ্ধ করিতে গেলেন' ইহা ভাষায় না বলিয়া যদি জলজ্যান্ত ছবি আঁকিয়া দেখাই তবে এ কথাটুকু তো বলা হয়ই, সঙ্গে সঙ্গে রাজা কিরকম পোশাক পরিতেন, কিরকম রথে চড়িতেন, কিরকম অস্ত্র লইতেন, তাহাও বোঝাইয়া দেওয়া যায়। বাস্তবিকই এই-সমস্ত ছবি আর ঘরবাড়ির চিত্র দেখিয়া সেকালের ইজিপ্টকে কল্পনার চোখে বেশ পরিষ্কার করিয়া দেখা সম্ভব হয়।

সন্দেশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫

দক্ষিণ দেশ

কলম্বসের আগে লোকে আমেরিকার কথা জানিত না—সে সময়ে লোকে তিনটিমাত্র মহাদেশের কথা জানিত। আমেরিকা আবিষ্কারের পর প্রায় একশত বৎসর পর্যন্ত আর কোনো নূতন মহাদেশের কথা শুনা যায় নাই। ১৬০১ খৃস্টাব্দে এক পর্তুগীজ নাবিক আসিয়া বলে যে ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ অঞ্চলে সে এক প্রকাণ্ড নূতন দেশ দেখিয়াছে। তার পাঁচ বৎসর পরে স্পেন দেশের এক জাহাজের কাপ্তান বলে সেও নাকি ঐ দেশের কাছ দিয়া আসিয়াছে। তার পর বহুদিন পর্যন্ত ওলন্দাজ নাবিকদের মুখে ঐ দেশের কথা মাঝে মাঝে শুনা যাইত। কেহ কেহ সেই নূতন দেশে যাইবার চেষ্টায় জাহাজ ডুবি হইয়া মারা যায়। দু-একজন দেশে ফিরিয়া বলে, "দেশটা একেবারে ফাঁকা—দেখিবার কিছু নাই।"

১৬৪২ খৃস্টাব্দে টাসমান নামে এক সাহসী ওলন্দাজ নাবিক এই নূতন দেশের সন্ধানে বাহির হন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে একটা দ্বীপে গিয়া জাহাজ ভিড়াইলেন,

তাঁহারই নামে সেই দ্বীপের নাম হইয়াছে টাসমানিয়া। দ্বীপটাকে তিনি দ্বীপ বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই—তিনি ভাবিলেন, এই সেই প্রকাণ্ড নূতন দেশ। দুঃখের বিষয় দ্বীপটা তাঁহার ভালো করিয়া দেখা হয় নাই। একদল নাবিক লইয়া তীরে নামিতেই তাঁহারা দেখিলেন একটা গাছের গায়ে কতগুলা খাঁজ কাটা রহিয়াছে। অস্ত্রের দাগ দেখিয়া তাঁহারা বুঝিলেন এখানে মানুষ আছে। তিনহাত-সাড়ে তিনহাত অন্তর এক-একটি খাঁজ দেখিয়া নাবিকেরা ভাবিল ঐ খাঁজে খাঁজে পা দিয়া যাহারা গাছে চড়ে তাহাদের পা নিশ্চয়ই সাংঘাতিক লম্বা, সুতরাং তাহারা নিশ্চয়ই রাক্ষস। রাক্ষসের ভয়ে তাহাদের আর নূতন দেশ দেখা হইল না। টাসমানের পর যাহারা নূতন দেশ দেখিতে আসে তাহারা সকলেই হল্যাণ্ড দেশের লোক—তাহারা সে দেশের নাম দিল 'নূতন হল্যাণ্ড'। ইহার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে ড্যাম্পিয়ার নামক এক ইংরাজ অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে জাহাজ লাগাইলেন। সে এক আশ্চর্য সুন্দর জায়গা! তীরে নামিতেই তাজা ফুলের গন্ধে তাঁহাদের মনটা খুশি হইয়া উঠিল। সবুজ গাছগুলি ফুলে ফুলে রঙিন হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে রঙ-বেরঙের নানান পাখি উড়িয়া উড়িয়া ফিরিতেছে। তাহারা ডাঙায় নামিয়া চারিদিক ঘুরিয়া কত অদ্ভুত দৃশ্য আর তাহার চাইতেও কত অদ্ভুত জন্তু দেখিতে পাইলেন। একটা জন্তু, তার ইঁদুরের মতো মুখ, প্রায় মানুষের মতো বড়ো—সে দুই পায়ে ভর দিয়া বিশ হাত লম্বা লাফ দেয়। তোমরা জান সে জন্তুর নাম কাঙারু কিন্তু সে-সময়ে অমন জন্তু কেহ দেখে নাই। সেদেশের মানুষদের তিনি দেখিলেন—রোগা লম্বা, সরু সরু হাত-পা আর কুচ্‌কুচে কালো। তাহারা কাপড় পরিতে জানে না; গাছের ছাল পরিয়া থাকে।

ড্যাম্পিয়ারের পর আরো প্রায় আশি বৎসর কেহ সে দেশের বড়ো একটা খবর লয় নাই। ১৭৬৯ খৃস্টাব্দে আবার আর-একজন ইংরাজ নাবিক তাহার সন্ধান করিতে বাহির হইলেন। ইঁহার নাম কাপ্তান কুক। কাপ্তান কুকের মতো অমন সাহসী নাবিক সেকালে খুব কমই ছিল। তিনি জাহাজে করিয়া কত যে নূতন দেশের সন্ধানে ঘুরিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা করিতে গেলেও প্রকাণ্ড পুঁথি হইয়া যায়। কাপ্তান কুক প্রথম যেখানে গেলেন সেটা অস্ট্রেলিয়া নয়, সেটাকে এখন নিউজিল্যাণ্ড বলা হয়। নিউজিল্যাণ্ডের চারিদিক ঘুরিয়া তিনি দেখিলেন এটা একটা দ্বীপ—আসল মহাদেশটা আরো পশ্চিমে। তার পর নিউজিল্যাণ্ড ছাড়িয়া উনিশ দিন পরে তিনি 'নূতন হল্যাণ্ডে' উপস্থিত হইলেন। অনেক ঘুরিয়া একটা সুবিধামতো জায়গায় জাহাজ ঠেকাইতেই চারিদিক হইতে কতগুলা কাদামাখা অদ্ভুত লোক আসিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়াইল! তার পর নাবিকেরা যখন জাহাজ হইতে ডাঙায় নামিবার চেষ্টা করিল তখন তাহারা বল্লম ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। জাহাজ হইতে কতগুলা ফাঁকা আওয়াজ করিতে তাহারা একটু ভয় পাইল, কিন্তু তাহাতে কেহ মরিল না দেখিয়া আবার তাহাদের সাহস ফিরিয়া আসিল। তখন একটা লোকের পায়ে ছর্‌রা মারিতেই তাহারা ভয় পাইয়া পলাইল।

জাহাজ মেরামতের জন্য কাপ্তান কুককে কিছুদিন সেখানে থাকিতে হইল। এই সময়ের মধ্যে নাবিকেরা সেদেশী লোকেদের সঙ্গে বেশ ভাব করিয়া লইয়াছিল। জাহাজ

মেরামত হইলে কাপ্তান কুক তীর ধরিয়া ধরিয়া উত্তর দিক পর্যন্ত ঘুরিয়া দেখিলেন। নূতন দেশের সমস্ত পূর্ব দিকটাতে ইংরাজের অধিকার ঘোষণা করিয়া তিনি তাহার নাম রাখিলেন 'নিউ সাউথ ওয়েলস'। তার পর কথা উঠিল এই নূতন দেশটাকে লইয়া কি করা যায়। ইংরাজ গভর্নমেণ্ট বলিলেন, 'যে-সকল কয়েদী অপরাধীদের দ্বীপান্তরে তাড়ানো আবশ্যক, তাহাদের ঐখানে চালান করিয়া দাও।' তখন এগারটি জাহাজ বোঝাই করিয়া কয়েদী পাঠানো হইল। তাহাদের পাহারার জন্য সৈন্য গেল, শাসন ব্যবস্থার জন্য সরকারি কর্মচারী গেল, স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া দলে দলে ডাক্তার নাবিক মজুর গেল। কাপ্তান ফিলিপ হইলেন এই দলের গভর্নর বা শাসনকর্তা। তাঁহারা সুবিধামতো জায়গা খুঁজিয়া সেইখানে কাঠের ঘরবাড়ি বসাইয়া বেশ ছোটোখাটো একটি শহর পত্তন করিলেন।

কাপ্তান ফিলিপ সেদেশী লোকদের মনে সদ্ভাব জাগাইবার জন্য নানারকম চেষ্টা করিয়াও তাহাদের ভয় ও সন্দেহ দূর করিতে পারেন নাই। ভালো-ভালো বকসিস দিয়া নানারকমে লোভ দেখাইয়া তিনি দুই-এক জনকে অনেকটা বশ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে বেন্নিলনি নামে একজন ছোকরাকে তিনি নিজের বাড়িতে আনিয়া কয়েকদিন খুব আমোদে রাখিয়াছিলেন। বেন্নিলনি যখন তাহার লোকদের কাছে ফিরিয়া গেল তখন তিনি একদিন অনেকরকম উপহার লইয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। দুঃখের বিষয় একজন সেদেশী লোকের সঙ্গে 'হ্যাণ্ডশেক' করিতে যাওয়ায় সে হঠাৎ কেমন ভুল বুঝিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া কাঁধের কাছে বল্লম বিঁধাইয়া দেয়। বেন্নিলনির যত্নে ও সাহায্যে সেবার তিনি বাঁচিয়া গেলেন। ইহার পর হইতে বেন্নিলনি তাঁহার খুব ভক্ত হইয়া উঠিল এবং ক্রমে সেদেশী লোকেদের সঙ্গে তাঁহার অনেকটা বনিবনাও হইয়া গেল।

এমনি করিয়া নূতন দেশে ইংরাজের উপনিবেশ আরম্ভ হইল। কথা ছিল মাঝে মাঝে বিলাত হইতে জাহাজে করিয়া রসদ আসিবে, তাহাতে তাহাদের খাবার কষ্ট ঘুচিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইংলণ্ড হইতে জাহাজ আসিয়া পৌঁছিতে অসম্ভবরকম বিলম্ব হইয়া গেল। শহরের চাল ময়দা শাক সবজী গোরু ছাগল সব ফুরাইয়া আসিল। গভর্নর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক লোকেই দিনে তিন ছটাক ময়দার রুটি, দুই ছটাক মাংস আর এক ছটাক চালের ভাত খাইয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ কোনোরকমে দিন কাটাইতে লাগিল।

তাহাতেও যখন খাদ্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় একদিন তিন জাহাজ বোঝাই করিয়া রসদ আসিয়া হাজির হইল। এইরকম কষ্টের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় ইংরাজ রাজ্যের পত্তন হইল। তাহার পর আরো কত লোক সেদেশে আসিতে আরম্ভ করিল: কেহ চাষবাসের জন্য, কেহ খনি খুঁড়িবার জন্য, কেহ দেশ আবিষ্কারের জন্য, কেহ কেবলমাত্র চাকুরি খুঁজিবার জন্য। একটা শহর ছিল দেখিতে দেখিতে দুই-চার দশটা শহর জাগিয়া উঠিল। ততদিনে তাহার 'নিউ হল্যাণ্ড' নাম ঘুচিয়া নূতন নাম হইয়াছে, অস্ট্রেলিয়া বা 'দক্ষিণ দেশ'।

অস্ট্রেলিয়ার মাঝখানে অনেকটাই সে সময়ে অজানা দেশ ছিল। বড়ো-বড়ো মরুভূমি, সেখানে কি আছে তাহা অনেকদিন পর্যন্ত কেহ জানিত না। ঐ-সকল অজানা দেশে যাইবার জন্য অনেক লোকে চেষ্টা করিতে লাগিল। এই-সকল ভ্রমণবীরের বীরত্ব-কাহিনী

শুনিলে অবাক হইতে হয়। ফিণ্ডার্স আর বাস্ নামক দুই ইংরাজ ছোকরা নানা জায়গায় ঘুরিয়া অনেক নূতন স্থানের সংবাদ আনিয়াছিল। একটা সামান্যরকমের নৌকায় চড়িয়া তাহারা নদীতে ও সমুদ্রে পাড়ি দিয়া ফিরিত, ফিণ্ডার্স বড়ো আমুদে লোক ছিল, সে একবার কতগুলা সেদেশী লোকের হাতে পড়ে। তাহাদের ভাবগতিক মোটেই সুবিধামতো ছিল না, তাই তাহাদের খুশি রাখিবার জন্য সে নানারকম কাণ্ড করিয়াছিল; এমন-কি, শেষটায় রসিকতা করিয়া তাহাদের কয়েকজনের দাড়ি পর্যন্ত কাঁচি দিয়া ছাঁটিয়া দিয়াছিল। তাহাতে সেই লোকেরা নাকি ভারি খুশি হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেয়।

অস্ট্রেলিয়ার অজানা দেশে যাওয়া বড়োই বিপদের কথা। লোকের অত্যাচার আর মরুভূমি তো আছেই, তাহার উপর মাঝে মাঝে এমন চোরামাটি যে তাহার উপর চলিতে গেলে পাঁকে ডুবিয়া মরিতে হয়। সে দেশের নদীগুলাও কেমন বেয়াড়া, তাহাদের মতি-গতির যেন কিছুই স্থির নাই। লেফটেনাণ্ট অক্সলি এক জায়গায় প্রকাণ্ড নদী দেখিয়াছিলেন, সে নদীতে বান আসিয়া তাঁহাকে অনেকবার নাকাল করিয়াছিল। ছয় বৎসর পরে কাপ্তান স্টার্ট সেইখানে গিয়া দেখেন খট্‌খটে শুকনা ডাঙা, তাহার মাঝে মাঝে ছোটোখাটো বিলের মতো—নদীর চিহ্নমাত্র নাই।

১৮৪০ খৃস্টাব্দে আয়ার নামে এক সাহেব অস্ট্রেলিয়ায় মাঝখানের অজানা দেশটা দেখিবার জন্য বাহির হন। তিনি দক্ষিণ হইতে উত্তরে চলিতেছিলেন—দিনের পর দিন চলিয়া কেবল লাল বালি আর শুকনা হ্রদ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান নাই; তার পর তিনি পশ্চিমমুখে গিয়া সেদিকেও সামান্য কাঁটাঝোপ ছাড়া আর কোনো গাছ পাইলেন না। জলের কষ্ট এত বেশি যে চল্লিশ দিনে তিনি দেড়শত মাইল পথও যাইতে পারেন নাই—বার বার জলের জন্য ফিরিতে হইত। অন্য কোনো লোক হইলে সেইখানে উৎসাহ নিভিয়া যাইত, কিন্তু আয়ার বলিলেন, সমুদ্র না পাওয়া পর্যন্ত এইভাবে চলিব, নাহয় মরিব। লোকজন সকলে বিদায় লইল, সঙ্গে রহিল কেবল ব্যাকস্টার নামে এক সাহেব আর তিনটি সেদেশী লোক। চলিতে চলিতে মরুভূমির ধুলায় তাঁহাদের চোখ অন্ধপ্রায় হইয়া আসিল, জলের কষ্ট অসহ্য হইয়া উঠিল, তাঁহাদের ঘোড়াগুলি একে একে পড়িয়া মরিল, সঙ্গের ছাগল-ভেড়াগুলিও দুর্বল হইয়া মরিতে লাগিল, তার উপর কোথা হইতে একরকম মাছি আসিয়া দেখা দিল, তাহার কামড়ের যন্ত্রণায় সর্বাঙ্গ জ্বলিতে থাকে। খাবার জিনিস যখন ফুরাইয়া আসিল, তখন সঙ্গের দুটি লোক ব্যাকস্টারকে মারিয়া খাবার চুরি করিয়া পলাইল। একজন মাত্র দেশী লোক সঙ্গে লইয়া আয়ার চলিতে লাগিলেন। একটি ঘোড়া তখনো বাঁচিয়াছিল, তাঁহারা সেইটিকে মারিয়া তার কাঁচা মাংস খাইলেন। সেই মাংসও যখন পচিয়া উঠিল তখন কেবল এক-এক মুঠা ময়দা জলে গুলিয়া তাহাতেই একদিনের আহার চালাইতে লাগিলেন। শেষটায় এমন দিন আসিল যখন ময়দাও ফুরাইয়া গেল। সেদিন খালি পেটে ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহারা এক অজানা সমুদ্রের ধারে আসিয়া দেখেন কোথা হইতে এক জাহাজ আসিয়াছে। আর কতগুলি ফরাসী নাবিক নৌকায় করিয়া তীরে আসিয়া উঠিয়াছে। আয়ার অবাক, নাবিকেরাও অবাক। এমনি করিয়া মরিতে মরিতে আয়ার বাঁচিয়া গেলেন।

আয়ারের পর ডাক্তার লাইকহার্ড ঐ মরুভূমি পার হইতে গিয়া দলেবলে মারা পড়েন। কাপ্তান স্টার্ট আর একবার চেষ্টা করিতে গিয়া অন্ধ হইয়া যান। ম্যাকডুয়াল স্টুয়ার্ট দুইবার চেষ্টা করিয়া দুইবারই মরিতে মরিতে বাঁচিয়া আসেন। আরো অনেকে আধাপথ সিকিপথ গিয়া আর যাইতে পারে নাই। তার পর বার্ক আর উইলস্ এক প্রকাণ্ড দল লইয়া বাহির হন। মরুভূমির মাঝখানে একটা হ্রদ পর্যন্ত গিয়া তাহার ধারে আড্ডা বসানো হইল এবং বার্ক আর উইলস্ আর দুইজন ইংরাজকে সঙ্গে লইয়া আরো অগ্রসর হইয়া চলিলেন। তাহারা গিয়াছিলেন ভালোই কিন্তু ফিরিবার সময় খাবার ফুরাইয়া গিয়া তাঁহাদের বিপদ ঘটিল। তাঁহারা যতদিনের হিসাব করিয়াছিলেন, পথে নানা গোলমাল হইয়া তাহার তিন-চারগুণ সময় লাগিয়া গেল।

আড্ডায় ফিরিতে যখন আর চার দিন মাত্র বাকি তখন ঐ চারজনের মধ্যে একজন অবসন্ন হইয়া মারা গেল। বাকি তিনজন এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহাকে কবর দিতে তাহাদের সমস্ত দিন লাগিল। এই দেরিতেই তাহাদের সর্বনাশ হইল। চারিদিন পরে কোনোরকমে পথ পার হইয়া যখন আড্ডায় পৌঁছিল তখন দেখিল সেখানকার লোকজন তার কয়েক ঘণ্টা পূর্বেই তাহাদের আশা ছাড়িয়া দিয়া সে আড্ডা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। হায়! হায়! আর কয়েক ঘণ্টা আগে আসিলেই তাহাদের এ সর্বনাশ হইত না। তিনজনেই তখন অবসন্ন আর চলিবার শক্তি নাই। তাহারা কোনোরকমে উঠিয়া বসিয়া হামাগুড়ি দিয়া চলিতে লাগিল—যদি দলের দেখা পায়। এরকম করিয়া আর কতদিন চলা যায়! খানিক পথ গিয়া উইলস্ এক গাছতলায় শুইয়া পড়িল। সেই তার শেষ শোয়া। একে নিজেদের কষ্ট, তার উপর বন্ধুর এই অবস্থা— বার্ক আর কিং পাগলের মতো হইয়া আহার খুঁজিতে বাহির হইল। কোনোরকমে দুই মাইল গিয়া বার্কও পথের পাশেই মরিয়া পড়িল। তার পর কিং একাই ঘুরিতে ঘুরিতে এক জায়গায় সেদেশী খাবারের সন্ধান পাইয়া বাঁচিয়া গেল। পরে যখন আড্ডার লোকেরা তাহাদের উদ্ধারের জন্য লোক পাঠাইল, তখন তাহারা দেখিল একটা নদীর ধারে ছেঁড়া ময়লা কাপড়-পরা পাগলের মতো চেহারা, ধুলামাখা জটা চুল একটি লোক বসিয়া আছে—অনেক কষ্টে তাহারা চিনিতে পারিল, এই লোকটিই কিং।

সন্দেশ—আষাঢ়, ১৩২৫

ভূমিকম্প

দুপুরবেলায় দিব্য আরামে শুইয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় দুর্‌দুর্ দুর্‌দুর্ করিয়া ঘরবাড়ি কাঁপিয়া উঠিল, ঝাড়-লণ্ঠন পাখা সব দুলিতে লাগিল, তার পর খাট চৌকি সবসুদ্ধ খটাখট্ করিয়া এমন ঝাঁকানি লাগাইয়া দিল যে, আর নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করা সম্ভব হইল না। ততক্ষণে চারিদিকে লোকজনের ছুটাছুটি আরম্ভ হইয়াছে, শাঁখ কাঁসর ঘণ্টার শব্দ শুনা যাইতেছে আর সকলেই বলিতেছে 'ভূমিকম্প, ভূমিকম্প'। পরের দিন কাগজে

ভূমিকম্পের নানারকম বর্ণনা বাহির হইল—কেমন করিয়া বড়ো-বড়ো গির্জার চূড়াগুলি দুলিতে দুলিতে পড়ো-পড়ো হইয়াছিল, কেমন করিয়া হাইকোর্টের জজসাহেব হইতে উকিল ব্যারিস্টার পেয়াদা পর্যন্ত সবাই ছুটিয়া বাহির হইয়াছিল, কেমন করিয়া দোকানের বাবুরা আর আপিসের বড়ো-বড়ো সাহেবেরা দোকানপাট কাগজপত্র সব ফেলিয়া রাস্তায় ছুটিয়া বাহির হইয়াছিল ইত্যাদি অনেক কথা। আর জানা গেল এই যে, কেবল যে কলিকাতাতেই ভূমিকম্প হইয়াছে তাহা নয়, বাংলার নিচু জমি হইতে আসামের পাহাড় পর্যন্ত সব জায়গাতেই সেই এক কাঁপুনি।

শাস্ত্রে যে বলে পৃথিবীটা স্থির আর 'অচলা', পণ্ডিতেরা সে কথা অনেকদিনই মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছেন। পৃথিবী যে শূন্যের মধ্যে প্রকাণ্ড চক্র আঁকিয়া সূর্যের চারিদিকে ছুটিয়া চলে এবং চলিতে চলিতে লাটিমের মতো ঘুরপাক খায়, এ-সকল কথা আমরা সকলেই জানি। সে চলুক আর ঘুরুক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই—কারণ সেটা আমরা টের পাই না, কিন্তু মাঝে মাঝে সে আবার গা-ঝাড়া দেয় কেন? পাহাড় পর্বত কাঁপাইয়া, জমি জঙ্গল ফাটাইয়া, বাড়ি ঘর দোর উলটাইয়া এ আবার কেমন উপদ্রব? সেদিন যে ভূমিকম্প হইল, সে তো নেহাৎ সামান্যরকমের। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে এ দেশে যে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে অনিষ্ট করিয়াছিল আরো অনেক বেশি। সেবারে পূর্ববাংলায় আর আসামে অনেক লোক মারা পড়িয়াছিল এবং কলিকাতা শহরেও বড়ো-বড়ো কোঠা দালান ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। আর রেলপুলে টেলিগ্রাফের থাম কত যে নষ্ট হইয়াছিল তাহার আর সংখ্যা নাই।

ভূমিকম্প মানে মাটির কাঁপুনি। এ কাঁপুনি তো বলিতে গেলে রোজই কতবার করিয়া হইতেছে। রাস্তা দিয়া দমকল ছুটিয়া গেল, ঘোড়সোয়ার পল্টন গেল, মাটি গুম্‌গুম্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এমন-কি, একজন মোটা লোক যদি সিঁড়ি দিয়া উৎসাহ করিয়া নামিতে যায়, তাহাতেও বাড়ির ভিতরে ছোটোখাটো রকমের ভূমিকম্প হয়। যদি বেশ সূক্ষ্মরকম যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, তবে পাশের ঘরে বিড়াল হাঁটিয়া গেলে এই ঘরে তাহার চলাফিরার সাড়া পাইবে। কিন্তু ভূমিকম্প বলিতে আমরা এরকম কাঁপুনি বুঝি না। মাটির ভিতর হইতে যে ধাক্কা আসে, মাটির তলে তলে যাহা বহুদূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে, তাহারই নাম ভূমিকম্প। কোথায় খাসিয়া পাহাড়ের মধ্যে মাটির নীচে কোন গভীর তলে একটু নাড়াচাড়া পড়িয়াছে আর সমস্ত বাংলা দেশটা ভূমিকম্পের ধাক্কায় কাঁপিয়া উঠিয়াছে। সিমলা পাহাড়ে আর লঙ্কা দ্বীপে পর্যন্ত কম্পনলিপি যন্ত্রে (Seismograph) তার স্পষ্ট সাড়া পাওয়া গিয়াছে। বাস্তবিক, যাঁহারা এই-সকল সূক্ষ্ম যন্ত্রের হিসাব লইয়া কারবার করেন, তাঁহারা বলেন প্রায় প্রতিদিনই পৃথিবীর নানাস্থানে ছোটো-বড়ো নানারকমের ভূমিকম্প চলিতেছে। কয়েক বছর আগে যখন আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো নগরে বড়ো ভূমিকম্প হইয়াছিল তখন এখানকার যন্ত্রে তাহা ধরা পড়িয়াছিল। কম্পনলিপি যন্ত্রের কাঠি একটা কাগজের উপর সাদা আঁচড় কাটিয়া চলে। যতক্ষণ ভূমিকম্পের গোলমাল না থাকে ততক্ষণ সে বরাবর সোজারকমের রেখা টানিয়া যায়, কিন্তু মাটির তলায় কোথাও যদি ভূমি-কম্পের ছোঁয়া লাগে, অমনি কলের কাঠি বিগড়াইয়া হিজিবিজি আঁচড় কাটিতে আরম্ভ করে।

বাহির হইতে এই মাটির দিকে চাহিয়া দেখ, মনে হয় তাহার মতো অটল স্থির আর কিছুই নাই। চারিদিকে সমুদ্রের অশান্ত ঢেউ খ্যাপার মতো লাফালাফি করিতেছে, মাথার উপরে চঞ্চল বাতাস দিনরাত ছুটিয়া মরিতেছে, কিন্তু পৃথিবী—সে ধীর গম্ভীর নিশ্চল। বড়ো-বড়ো গাছপালা হইতে সামান্য ঘাসটা পর্যন্ত তাহার গায়ে শিকড় বসাইয়া তাহার বুক ফুঁড়িয়া বাহির হইতেছে—পৃথিবী তাহাতে আপত্তিও করে না, বাধাও দেয় না। কিন্তু, কেবল বাহিরের মূর্তি না দেখিয়া যদি একবার গভীর মাটির নীচে ঢুকিতে পার তবে বুঝিবে তার ভিতরটায় কেমন তোলপাড় চলিতেছে। সেখানে গেলে মনে হইবে পৃথিবীর বুকের ভিতর যেন আগুন জ্বলিতেছে; যতই তার ভিতরে ঢুকি ততই গরম। সেই গরমে পাথর পর্যন্ত গলিয়া যায় তুমি আমি তো এক মুহূর্তেই ঝামা হইয়া পুড়িয়া যাইব।

পৃথিবীর এই মাটির খোলসটি আগাগোড়া সমান নয়। কত লক্ষ লক্ষ যুগ নানারকম পাথর স্তরের পর স্তর সাজাইয়া তবে এই খোলস গড়িয়া উঠিয়াছে। এই-সমস্ত কঠিন স্তর আগুনে গরম হইয়া, চাপে কঠিন হইয়া, দিনরাত ঠেলাঠেলি করিতেছে। কোথাও পাথর গলিয়াছে, জল ফুটিয়া বাষ্প হইয়াছে, তাহারা বাহির হইবার পথ চায়; কোথাও মাটির নীচে বড়ো-বড়ো ফাটল রহিয়াছে, পাশের মাটি উপরের চাপে তাহার মধ্যে ধ্বসিয়া পড়ে; কোথাও নীচেকার গরমের ঠেলায় উপরের মাটি ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠে। দিনরাত যুগের পর যুগ এইরকম চাপাচাপি ঠেলাঠেলি চলিয়াছে। গরমবাষ্প আর গলিত পাথর যদি বাহির হইবার সহজ পথ না পায় তবে তাহারা অনায়াসেই একটা ভূমিকম্প বাধাইয়া তুলিতে পারে। আগ্নেয়গিরির উৎপাতের কথা তোমরা শুনিয়াছ। এই-সব পাহাড়ের উৎপাত সকলের চাইতে সাংঘাতিক হয় সেই সময়ে যখন পাথর জমিয়া তাহার মুখ বন্ধ হইয়া যায়। তখন তাহাদের ভিতরের আগুন আর বাহির হইবার পথ পায় না, কেবল তাহার চাপ জমিয়া জমিয়া ভিতরে ভিতরে গুমরাইতে থাকে। ভিসুভিয়াসের অত্যাচারে পম্পিয়াই শহর ধ্বংস হইবার আগে এইরকম একটা কাণ্ড হইয়াছিল। সে সময়ে পাহাড় দেখিতে বেশ শান্ত ছিল, কিন্তু ক্রমাগত কয়েক বৎসর ধরিয়া গুম্‌গুম্ শব্দ শুনা যাইত। মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় মাটি কাঁপিয়া উঠিত, আর ঘন ঘন ভূমিকম্প হইত। কিন্তু সে সময়ে মানুষ বুঝিতে পারে নাই যে এই-সমস্তই পাহাড় ফাটাইবার আয়োজন। এইরূপে ভিতরের চাপ জমিয়া জমিয়া এমন ভয়ংকর হইয়া উঠে, যে পাহাড় আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না—জ্বলন্ত পাথর পাহাড় ভেদ করিয়া ফোয়ারার মতো ছুটিয়া বাহির হয়। এইরকম ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে কতবার ঘটিয়াছে তাহার আর সংখ্যা নাই।

এক-একটা আগুনের পাহাড়কে অনেকদিন চুপচাপ থাকিতে দেখিয়া কত সময়ে লোকে মনে করে তাহার ভিতরকার আগুন মরিয়াছে—কিন্তু আবার যখন সে কুম্ভকর্ণের মতো ভয়ংকর মূর্তিতে জাগিয়া উঠে, তখন মানুষের আতংকের আর সীমা থাকে না। এইরকম যত উৎপাতের কথা শুনা গিয়াছে, তাহার মধ্যে ক্রাকাতোয়ার অগ্নিকাণ্ডই সকলের চাইতে ভয়ানক। সুমাত্রা ও যবদ্বীপের মাঝামাঝি একটা দ্বীপ আছে তাহারই নাম ক্রাকাতোয়া। সেই দ্বীপের মধ্যখানে প্রকাণ্ড পাহাড় ছিল—এককালে তাহার মাথায় আগুন দেখা যাইত। দুইশত বৎসর ধরিয়া সেই পাহাড় একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া বিশ্রাম করিতেছিল, এই সুযোগে

তাহার চারিদিকে গাছপালা গজাইয়া রীতিমতো বনজঙ্গল দেখা দিয়াছিল। এমন সময়ে ১৮৮০ খৃস্টাব্দে ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। সে কম্প এক-একটি বড়ো সামান্য নয়, কারণ সমুদ্র পার হইয়া অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত মাঝে মাঝে তাহার ধাক্কা পৌঁছিত। তিন বৎসর ভূমিকম্পের পর সহস্র কামান গর্জনের মতো ভীষণ শব্দে পাহাড় ভেদ করিয়া আগুন আর গরম বাষ্পের প্রকাণ্ড স্তম্ভ বাহির হইল। সে-স্তম্ভ সাত মাইল উঁচু হইয়া চারিদিকে গরম ধুলা ছাই আর পাথর ছিটাইতে লাগিল। এইরূপে তিন মাস পাথর বৃষ্টি করিয়াও পাহাড়ের তেজ কমিল না। ১৮৮৩ খৃস্টাব্দের ২৬শে আগস্ট সন্ধ্যার পরে সমুদ্র হইতে জাহাজের নাবিকেরা দেখিয়াছিল, পাহাড়ের চারিদিকে লাল ধোঁয়ায় আকাশ ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে আগুনের গোলা ছুটিতেছে, বিদ্যুৎ চমকাইতেছে এবং ঘন ঘন বাজ পড়িতেছে। তাহার পরদিন ভোরবেলা একশত মাইল দূরে বাটাভিয়া শহরে গরম ধুলার বৃষ্টি হইল এবং তাহার কয়েক ঘণ্টা পরেই অসম্ভব ভয়ংকর শব্দে ক্রাকাতোয়ার প্রকাণ্ড পাহাড় আকাশে উড়িয়া গেল। আট মাইল ডাঙা বেমালুম শূন্যে মিলাইয়া গেল, গভীর সমুদ্র আসিয়া তাহার স্থান দখল করিল। সেই শব্দের ধাক্কা তিনহাজার মাইল দূর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, আকাশ তোলপাড় করিয়া সমস্ত পৃথিবীময় বাতাসের ঢেউ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; হাজার হাজার মণ পাথর চূর্ণ হইয়া ধুলার মতো আকাশের দিকদিগন্তে ভাসিয়া গিয়াছিল এবং পৃথিবীর সকল দেশে উদয়াস্তের সময় আশ্চর্য রঙের খেলা দেখাইয়াছিল।

এখানেও তাহার শেষ হয় নাই; পাহাড় ফাটিবার সময়ে সমুদ্রের ভিতর পর্যন্ত আগুন ঢুকিয়াছিল এবং ভীষণ ভূমিকম্পে গভীর সমুদ্রকে তোলপাড় করিয়া তুলিতেছিল। তাহার উপর যখন পাহাড় উড়িয়া দূরে সমুদ্রের মধ্যে গিয়া পড়িল তখন সমুদ্র একেবারে প্রলয়মূর্তি ধারণ করিয়া, ফুলিয়া পাহাড় সমান উঁচু হইয়া ডাঙার উপর ছুটিয়া পড়িল। শহর গ্রাম ঘরবাড়ি গাছপালা চক্ষের পলকে কোথায় ভাসিয়া গেল। এই দুর্ঘটনার ফলে প্রায় চল্লিশ হাজার লোক মারা পড়ে, অনেক জাহাজ ডুবিয়া যায়, আর সুণ্ডা প্রণালীর চেহারা একেবারে বদলাইয়া যায়। সমুদ্রের ঢেউ এমন বেগে আসিয়াছিল যে একটা জাহাজকে পাওয়া যায় সমুদ্র হইতে তিন মাইল দূরে শুকনা ডাঙার উপরে। ইহার তুলনায় আমাদের সেদিনকার ভূমিকম্পটাকে অবশ্য নিতান্তই সামান্য ব্যাপার বলিতে হইবে। তাহার সঙ্গে অগ্নিবৃষ্টি, পাহাড়বৃষ্টি বা সমুদ্রের ঢেউ এ-সব কোনো হাঙ্গামা ছিল না।

পৃথিবীর মাটি কোঁকড়াইয়া বড়ো-বড়ো পাহাড় পর্বতের সৃষ্টি হয়। সেই-সব পাহাড় উঠিবার সময়ে মাটির স্তরগুলোকে বাঁকাইয়া ফাটাইয়া ভাঙিয়া উলট-পালট করিয়া দেয়। যে মাটি সমানভাবে শোয়ানো ছিল তাহাকে খাড়া করিয়া ঝুলাইয়া দেয়। কঠিন পাথরকে ঠেলিয়া নরম মাটির মধ্যে বসাইয়া দেয়, নরম মাটিকে চাপ দিয়া পাথরের ফাটলে ফোকরে ঢুকাইয়া দেয়, পাথরের গায়ে পাথরকে পিষিয়া ভাঙিতে চায়। এইরূপে সমস্ত মিলিয়া এমন চাপাচাপি করিয়া থাকে যে কোথাও এতটুকু স্তর খসাইতে গেলে সমস্ত পাহাড়সুদ্ধ টলমল করিয়া উঠে। এই-সকল কাণ্ড প্রতি মুহূর্তেই চলিয়াছে। ধীরে ধীরে যুগের পর যুগ পাহাড়ের স্তর সরিয়া সরিয়া একদিন হয় তো একেবারেই বেসামাল হইয়া টলিয়া পড়িল; নরম মাটির ভিতর পাহাড় বসিতে বসিতে একদিন হঠাৎ পিছলাইয়া

ধ্বসিয়া গেল ; দুই দিকের উলটা চাপে ফুলিতে ফুলিতে একদিন পাহাড়ের দেমাক ফাটিয়া চৌচির হইল, এইরকমে বহুদিনের ঠাসাঠাসি ঠেলাঠেলি এক-একদিন হঠাৎ ভূমিকম্পের আকারে গা-ঝাড়া দিয়া বাহির হয়।

ভূমিকম্পের ধাক্কা মাটির ভিতর দিয়া ঢেউয়ের মতো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সেই ঢেউয়ের আঘাতে কেমন করিয়া পৃথিবী টল্‌মল্ করিতে থাকে, তাহার সামান্য একটু নমুনা তোমরা দেখিয়াছ। তাহাতে ঘরবাড়ি ভাঙিয়া পড়ে, পথঘাট ফাটিয়া যায়, রেলের লাইন মোচড়াইয়া বাঁকিয়া যায়। ১৭৯৭ খৃস্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকায় কুইটো শহরে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতে শহরের কোনো কোনো জায়গায় মানুষগুলিকে ফুটবলের মতো ছুঁড়িয়া দিয়াছিল। তাহার একশত বৎসর পূর্বে পোর্টরয়্যালের ভূমিকম্পে বাজারের ভীড়কে ছিটাইয়া নীচে বন্দরের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিল। লিসবনের ভূমিকম্পে নদীতে বান ডাকিয়া শহরের অসংখ্য লোককে ডুবাইয়া দিয়াছিল। কয়েক বৎসর আগে সানফ্রান্সিসকো শহরে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল সে কেবল বাড়ি ঘর ফেলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, গ্যাসের নল আর বিদ্যুতের তার ভাঙিয়া জড়াইয়া সে শহরে আগুন লাগাইয়া দেয়। সে এমন সর্বনেশে আগুন যে শহরের সমস্ত দমকল মিলিয়াও তাহাকে কিছুমাত্র জব্দ করিতে পারে নাই। তার পরে শহরের কর্তা বোমাবারুদ ফাটাইয়া আগুনের আশেপাশে অনেকগুলা বাড়ি উড়াইয়া দিয়া মনে করিলেন আগুন আর ছড়াইতে পারিবে না। কিন্তু আগুন প্রায় সিকি মাইল ফাঁকা জমি টপকাইয়া শহরের আর একদিকে ফুটিয়া বাহির হইল। যাহা হউক, খানিক বাদে বাতাসের মুখ ঘুরিয়া গেল তাই রক্ষা, তাহা না হইলে শহরের চিহ্নমাত্র থাকিত কি না সন্দেহ।

ভূমিকম্পে অনেক সময়ে পাখিরা ব্যস্ত হইয়া উড়িতে থাকে। ডাঙার জন্তু ভয়ে ছুটাছুটি আর চীৎকার করিতে থাকে। একটা হাতির কথা শুনিয়াছি, সে ১৭৯৭ খৃস্টাব্দের বড়ো ভূমিকম্পের সময়ে প্রথমটা অবাক হইয়া চারিদিকে তাকাইতেছিল, তার পর কাঁপুনি যখন বাড়িয়া উঠিল তখন সে প্রাণপণে চার পা ছড়াইয়া মাটি আঁকড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। গল্প শুনিয়াছি, একটা বাড়ির পাঁচিলের উপরে দুইটি বিড়াল মুখামুখি বসিয়া সুর ভাঁজিতেছিল, এমন সময়ে ভূমিকম্পের ধাক্কায় দুইজনকেই পাঁচিল হইতে ফেলিয়া দেয়। সংগীতচর্চায় হঠাৎ এরকম বাধা পাইয়া তাহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিবার জোগাড় করিতেছিল, এমন সময়ে পাঁচিল ভাঙিয়া দু-চারখানা ইঁট পড়িতেই তাহাদের যুদ্ধের উৎসাহ থামিয়া গেল। আর এক নাবিকের পোষা টিয়াপাখির গল্প শুনিয়াছি, সে আশ্চর্যরকম কথা বলিতে পারিত। একবার ভূমিকম্পে সে খাঁচাসুদ্ধ ঘরচাপা পড়িয়াছিল। পরে শুনা গেল ভাঙা ঘরের তলা হইতে কে যেন চীৎকার করিয়া গালাগালি করিতেছে। তখন ইঁট সরাইয়া দেখা গেল, পাখিটা খাঁচার মধ্যে এক জায়গায় কোণঠাসা হইয়া বসিয়া আছে, আর বলিতেছে "বড়ো গরম, বড়ো গরম"।

সন্দেশ—আষাঢ়, ১৩২৫

মানুষের কথা

জগতে কাহারও স্থির থাকিবার হুকুম নাই। জ্যোতির্বিদ বলেন, "চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র পৃথিবী সমস্তই চলিতেছে।" জড় বিজ্ঞানের পণ্ডিত বলেন, "প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে তাহার অতি সূক্ষ্ম অণুপরমাণু পর্যন্ত ছুটাছুটি করিতেছে।" ভূতত্ত্ববিদ বলেন, "এই পৃথিবীকে আজ যেমন দেখিতেছি, চিরদিন সে এমন ছিল না এবং পরেও এমন থাকিবে না—তাহার চেহারা পর্যন্ত যুগের পর যুগ বদলাইয়া চলিয়াছে।" সুতরাং মানুষ যে চিরকাল মানুষ ছিল না, সে যে ক্রমে এইরকম ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা কিছুই আশ্চর্য কথা নয়। কোন আদিম কালের কোন জন্তু কেমন করিয়া ক্রমে মানুষের মতো হইয়া উঠিল, তাহার সমস্ত ইতিহাস জানিবার কোনো উপায় নাই। যতটুকু জানা যায় তাহাতে মানুষের সঙ্গে বানরের, বিশেষত 'বনমানুষের' জ্ঞাতি সম্পর্কটাই স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

চোখে দেখিতে মানুষ ও বানরের চেহারার মধ্যে যেমন মিল দেখিতে পাই, তেমনি কতগুলা তফাতও বুঝতে পারি, যাহার দরুন বানরকে বানর বলিয়া বোঝা যায়। একটা মানুষের আর একটা গরিলার কংকাল পাশাপাশি লইয়া দেখিবে দুজনের শরীরের গড়ন মোটামুটি একইরকমের ; একইরকম ভাবে হাড়ের পরে হাড় সাজাইয়া কাঠামো দুটিকে দাঁড় করানো হইয়াছে। বাঘ সিংহ বা গোরু ঘোড়ার কংকাল যদি ইহার পাশে বসাও তবে কখনই এতটা মিল দেখিতে পাইবে না। কিন্তু এতটা মিল থাকিলেও দুয়ের মধ্যে তফাতটাও বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়। গরিলার হাত প্রকাণ্ড লম্বা এবং মজবুত, কারণ তাহাকে গাছে গাছে ফিরিতে হয়, চলিতে-ফিরিতে তাহাকে হাতের ব্যবহার করিতে হয়। গরিলার পায়ের পাতা ঠিক হাতেরই মতো অর্থাৎ বলিতে গেলে তাহার চারিটাই হাত। তাহার শরীরে যে অসাধারণ শক্তি, তাহার পাঁজরের হাড়গুলা দেখিলেই সেটা বেশ বোঝা যায়। তার পর মাথার খুলিটা—গরিলার দাঁত এবং চোয়াল খুবই মজবুত কিন্তু আসল মাথাটুকু অর্থাৎ মগজের জায়গাটুকু মানুষের তুলনায় খুব ছোটো। মানুষকে বুদ্ধি খাটাইয়া বাঁচিতে হয়, তাই তাহার মগজ বাড়িয়া মাথাটাকে বড়ো করিয়া তুলিয়াছে। আরো কতগুলা সূক্ষ্ম তফাত আছে পণ্ডিতেরা যাহাকে গুরুতর বলিয়া মনে করেন, যেমন হাঁটুর হাড়। মানুষ যে পায়ের পাতার উপর খাড়া হইয়া চলে এবং গরিলা যে সামনের হাত দুটিতে ভর রাখিয়া কুঁজা হইয়া চলে, হাঁটুর হাড় দেখিয়াই পণ্ডিতেরা তাহা বলিয়া দিতে পারেন।

মানুষ কতদিন হইল এ পৃথিবীতে আসিয়াছে অর্থাৎ কতদিন হইল সে 'মানুষ' হইয়াছে, তাহা পণ্ডিতেরা এখনো ঠিক করিতে পারেন নাই। সকলের চাইতে পুরাতন মানুষের চিহ্ন যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের চোয়ালের হাড় আর মুখের ভিতরকার গড়ন দেখিয়া মনে হয় তাহারা কথা বলিতে জানিত না। ১৮৯২ খৃস্টাব্দে ডাক্তার ডুবয় যবদ্বীপে প্রাচীন জন্তুর কংকাল খুঁজিতে গিয়া একটা মানুষের কয়েক টুকরা কংকাল খুঁড়িয়া তোলেন। সেটা মানুষের কংকাল কি বানরের কংকাল, সে বিষয়ে প্রথমে

একটু সন্দেহ ছিল—কারণ তাহার মগজকোষটি বানরের চাইতে অনেকটা বড়ো হইলেও আজকালকার সভ্য মানুষের তুলনায় খুবই ছোটো এবং কপালটাও বানরের মতো চ্যাপটা। তাহার দুইটা দাঁত পাওয়া গিয়াছিল, সে দুইটা দেখিলে গরিলার দাঁতের কথাই মনে হয়। কিন্তু তাহার উরুর হাড় দেখিয়া স্পষ্ট বোঝা গেল যে সে মানুষের মতো খাড়া হইয়া চলিত। এই প্রাচীন মানুষটির অর্থাৎ জন্তুটির নাম দেওয়া হইয়াছে বানর-মানুষ। ইহার চাইতে প্রাচীন কোনো মানুষের কংকাল আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

ইউরোপে সেকালের মানুষের যে-সকল চিহ্ন পাওয়া যায়, এই বানর-মানুষের তুলনায় তাহাদের খুব প্রাচীন বলা চলে না। কিন্তু তাহারাও এক-একজন প্রায় পাঁচলক্ষ বৎসর আগেকার মানুষ। ধনুকের মতো বাঁকা ছোটো-ছোটো পা, বানরের মতো উঁচু-উঁচু ভ্রূ, একটু-আধটু কথা বলিতে পারে সেই-সব মানুষ এখন পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে। এই-সব মানুষের চেহারা কেমন ছিল তাহা এই-সকল কংকাল হইতেই কতকটা বোঝা যায়।

মানুষ যখন সভ্য হয় নাই, যখন সে অস্ত্র গড়িতে বা আগুন জ্বালাইতে শিখে নাই, তাহারও অনেক আগে সে এমন একটি বিদ্যা শিখিয়াছিল যাহা মানুষ ছাড়া অন্য কোনো পশুর জানা নাই। সেই বিদ্যাটি খাড়া হইয়া চলিবার বিদ্যা। কেবলমাত্র পায়ের সাহায্যেই যখন সে চলিতে শিখিল তখন হইতে তাহার হাত দুইটা ছাড়া পাইল। সেই সময় হইতে সে হাত দুটাকে যে কতরকম কাজে লাগাইয়াছে এবং কত কৌশল শিখিয়াছে, তাহার আর অন্ত নাই।

সেই-সব মানুষেরা যে-সকল চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে পরিষ্কার দেখা যায় যে, হাতের ওস্তাদি কেমন করিয়া যুগের পর যুগ বাড়িয়া চলিয়াছে; প্রথম যে মানুষ অস্ত্রের ব্যবহার করিতে শিখে, তাহার অস্ত্র ছিল গাছপাথর জানোয়ারের শিং ও হাড়। এই অতি প্রাচীন মানুষটি যদি অস্ত্রশস্ত্রের আরো উন্নতি করিতে পারিত, তবে হয়তো সে আরো কিছুকাল টিঁকিয়া থাকিত। কিন্তু পাথরের অস্ত্রওয়ালা মানুষের সঙ্গে সে পাল্লা দিয়া পারে নাই। প্রাচীনকালের নানারকম পাথরের অস্ত্র পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই পাওয়া গিয়াছে। সবচাইতে পুরানো যেগুলি সেগুলিকে হঠাৎ দেখিয়া অস্ত্র বলিয়া বুঝা যায় না, কারণ সে সময়ে এক-এক টুকরা পাথরকে ঠুকিয়া ঠুকিয়া নিতান্তই মোটা রকমের উবড়োখাবড়ো অস্ত্র গড়া হইত। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এইরকম অস্ত্রের সাহায্যে তাহারা পৃথিবীতে শিকার করিয়া ফিরিয়াছিল। যে-সকল পর্বতে গুহায় তাহারা বাস করিত সেই গুহার মধ্যে পাথরে আঁচড় কাটিয়া তাহারা যে-সকল ছবি আঁকিত, তাহারও চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। সেই ছবিগুলি দেখিলে তোমরা হয়তো হাসিবে—কারণ আজকালকার পাঁচ-সাত বৎসরের শিশুও অমন ছবি আঁকিতে পারে। কিন্তু পণ্ডিতেরা এই-সমস্ত ছবি দেখিয়া সেই গুহাবাসী মানুষদের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য খবর জানিতে পারিয়াছেন। এই মানুষদের গায়ে লম্বা লম্বা লোম হইত, তাহাদের চেহারা ছিল কতকটা এস্কিমোদের মতো, তাহারা চাষবাস জানিত না, বেদে জাতির মতো নানা স্থানে ঘুরিত আর দল বাঁধিয়া শিকার করিত। সম্ভবত ইহাদের অনেকেই কাঁচা মাংস খাইত

এবং কেহ কেহ হয়তো মানুষ খাইতেও কোনো আপত্তি বোধ করিত না। ইহার পর আরো বুদ্ধিমান একরকম মানুষ দেখা দিল, যাহারা পাথর-কাটা বিদ্যায় রীতিমতো কারিকর হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের অস্ত্রগুলি খুব সমান ও ধারালো এবং রীতিমতো শান দিয়া পালিশ করা। তার উপর ইহারা মাটির বাসন গড়িতে, চাষবাস করিতে, কাপড় বুনিতে ও গোরু ছাগল প্রভৃতি জন্তু পুষিতেও শিখিয়াছিল। ইহারা যেখানে যাইত সেইখানেই সেই প্রাচীন যুগের আনাড়ি মানুষকে তাড়াইয়া মারিয়া শেষ করিত! বলিতে গেলে, পাথরের যুগের এই নূতন মানুষটি হইতেই সভ্যতার ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে।

সন্দেশ—আশ্বিন, ১৩২৫

মেঘবৃষ্টি

বর্ষাকালে রাস্তায় বাহির হইবার আগে আমরা আকাশের পানে তাকাইয়া দেখি তাহার ভাবগতিক কিরূপ - মেঘ আছে কিনা, বৃষ্টির সম্ভাবনা অথবা ঝড় দেখা যায় কিনা। কিন্তু মেঘ কিরূপে জন্মায়, আকাশে কিভাবে থাকে, মেঘের আকার-প্রকার এবং চালচলন কিরূপ সে কথা ভাবিবার অবসর তখন আমাদের থাকে না।

মেঘের জন্মের কথা বোধ হয় তোমরা সকলেই জান। পৃথিবীর খাল, বিল, পুকুর নদী, সমুদ্রের জল গরমে বাষ্প হইয়া আকাশে মিশিয়া যায়; সেই বাষ্প জমিয়া খুব ছোটো-ছোটো জলকণার সৃষ্টি হয়। এই-সকল জলকণার স্তূপকেই আমরা বলি মেঘ। মনে হইতে পারে যে জলকণা তো বাতাসের চেয়ে ভারী; তাহা হইলে মেঘ কেমন করিয়া শূন্যে থাকে? বাস্তবিক মেঘ সর্বদাই নীচে নামিতে চেষ্টা করে। কখনো বাতাসের ঠেলায় উপরে উঠিতেও পারে, কিন্তু নীচে নামাই তাহার স্বভাব। যে মেঘের জলকণার আকার যত বড়ো সে মেঘ তত তাড়াতাড়ি নীচে নামে। জলকণাগুলি আকারে বেশি বড়ো হইয়া গেলে বৃষ্টি আকারে মাটিতে পড়ে। খুব উঁচুতে যে মেঘ থাকে, তাহাতে অনেক সময়ে জলকণাগুলি জমিয়া বরফের কণা হইয়া থাকে। এই মেঘ আবার নীচে গরম বাতাসের মধ্যে নামিলে সেই বরফ গলিয়া জলকণা হইয়া যায়। ঠাণ্ডা দেশে এই বরফকণাই তুষার বৃষ্টি হইয়া মাটিতে পড়ে।

অনেক সময় উপরের মেঘ বৃষ্টি হইয়া মাটিতে পৌঁছাইবার আগেই বাষ্প হইয়া মিলিয়া যায়। কাজেই মেঘ আসিলেই যে বৃষ্টি পড়িবে, এ কথা বলা যায় না। শীতের দেশে মাঝে মাঝে একটা বড়ো মজার জিনিস দেখা যায়। মেঘের জলকণা খুব ঠাণ্ডা হইয়া নীচে নামিতে নামিতে হঠাৎ কোনো গাছপালা অথবা অন্য কোনো জিনিসের গায়ে বরফ হইয়া জমিয়া যায়।

মেঘবৃষ্টি ও ঝড় বাতাসের খবর রাখিবার জন্য সকল সভ্য দেশেই বড়ো-বড়ো সরকারি আফিস আছে। ইংরাজিতে তাহাকে বলে মিটিয়রলজিক্যাল (Meteorological) আফিস। এই-সমস্ত আফিসের কাজ কেবল মেঘ বাতাস ইত্যাদির নানারকম মাপ

জোখের হিসাব লওয়া। সে কিরকম হিসাব? কোনখানে কত গরম তাহার হিসাব, কোনখানের বাতাস কতখানি ভিজা বা শুকনা তাহার হিসাব; কোনখানে বাতাসের চাপ কিরূপ, বাতাস কতটা হাল্কা বা কতটা ভারী, তাহার হিসাব; বাতাস কতখানি জোরে কোনদিকে চলিতেছে, কোনখানে কতখানি বৃষ্টি পড়িল, কিরকম মেঘ দেখা দিল, তাহার হিসাব।

বাতাস যখন চলে তখন তাহাকে বলে 'হাওয়া', হাওয়া যখন ছোটে তখন তাহার নাম 'ঝড়'। বাতাস আবার চলাফিরা করে কেন? গরম লাগিলে বা জলের বাষ্প মিশিলে বাতাস ছড়াইয়া হালকা হইয়া উপর দিকে ভাসিয়া উঠে! তখন তাহার চাপ কমিয়া খানিকটা জায়গা যেন ফাঁকা হইয়া উঠিতে চায়। কিন্তু ফাঁকা হইবার জো নাই, চারিদিকের চাপে আশপাশ হইতে বাতাস ছুটিয়া সেই হালকা জায়গাটাকে দখল করিতে চায়, তাহাতেই বাতাসের চলাচল হয়। বাতাস যখন যেদিকে চলে, সে তখন মেঘগুলিকে সুদ্ধ সেদিকে টানিয়া লইতে থাকে। এইরকম টানাটানির মধ্যে পড়িয়া এক-একটা মেঘের এক একরকম চেহারা হইয়া ওঠে। যাঁহারা এ-বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন তাঁহারা মেঘের চেহারা দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে পারেন। খুব উঁচুতে পাঁচ-ছয় মাইল উপরে যে মেঘ থাকে তাহার চেহারা অতি হালকা সূক্ষ্ম চামরের মতো। সে মেঘে বৃষ্টি হয় না, সে মেঘ নীচে নামিতে গেলেই গরম বাতাসে শুকাইয়া মিলাইয়া যায়।

তার পর দু মাইল চার মাইল উঁচুতে ছিটানো তুলার মতো বা চষাক্ষেতের মতো যে-সব সাদা সাদা মেঘ দেখা যায়, তাহাতেও হঠাৎ বৃষ্টি পড়িবার কোনো আশঙ্কা নাই। এই-সমস্ত মেঘ যখন সূর্যাস্তের সময়ে লম্বা লম্বা স্তর বাঁধিয়া আকাশের গায়ে শুইয়া থাকে তখন তাহার উপর সূর্যের আলো পড়িয়া কি আশ্চর্য সুন্দর রঙের খেলা দেখা যায়, তাহা সকলেই দেখিয়াছ। বিদ্যুতের যে মেঘ তাহার চেহারাটা খুব গম্ভীর ও জমকাল হয়, সে যেন রাগে ফুলিয়া পাহাড়ের মতো উঁচু হইয়া উঠিতে থাকে কিন্তু বৃষ্টি নামিতে আরম্ভ করিলেই সে দেখিতে দেখিতে শান্ত হইয়া যায়। তখন সে বৃষ্টি মেঘ হইয়া ধোঁয়ার প্রলেপের মতো আকাশের গায়ে লেপিয়া যায়।

বিদ্যুৎ যখন চমকায় তখনই মনে হয় 'এইবার বাজ পড়ার শব্দ শুনিব'—এবং অনেক সময়ই সে শব্দ শোনা যায়। বিদ্যুৎ চমকাইলে বাতাসটা কিরকম তোলপাড় হইয়া উঠে ঐ আওয়াজটা হইতেই তাহা বঝিতে পার। বিদ্যুতের ঝলক ছুটিবামাত্র চারিদিকে গরম বাতাস ঠিকরাইয়া পড়ে, আবার সেই চোট সামলাইতে গিয়া চারিদিকের বাতাস ছুটিয়া কড়্‌কড়্ শব্দে টক্কর বাধাইয়া বসে। তাহার পরেও খানিকক্ষণ পর্যন্ত বার বার বহু দূরের মেঘ হইতে গুড়্‌গুড়্ করিয়া সেই শব্দের প্রতিধ্বনি আসিতে থাকে।

মিটিয়রলজিক্যাল আফিস থাকাতে বৃষ্টি-বাদল সম্বন্ধে নানারকম খবর আমরা আগে হইতে জানিতে পারি। 'ঝড় আসিতেছে' এই খবর সময়মতো জানিতে পারিলে মানুষে সাবধান হইয়া তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারে। মনে কর, খবর আসিল—এখান হইতে দুইশত মাইল দূরে একটা বড়ো ঝড় খুব বৃষ্টি লইয়া ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে এইদিকে আসিতেছে। সে যদি বরাবর ঐভাবে এই মুখেই আসে এবং আসিতে আসিতে তাহার বৃষ্টি

যদি ফুরাইয়া না যায়, অথবা যদি মাঝে কোথাও গরম শুকনা বাতাসে তাহার মেঘ শুকাইয়া না ফেলে, তবে চার ঘণ্টা পরে এখানে বৃষ্টি হইবে।

মিটিয়রলজিক্যাল আফিসে বড়ো-বড়ো মানচিত্রে সর্বদাই চারিদিকের খবর আঁকিয়া রাখা হয়। বাতাসের চাপ, বাতাসের গতি, বাতাসের বেগ, বাতাসের উত্তাপ, বাতাসের ভিজা ভাব ও মেঘবৃষ্টি, সব খবর সেই মানচিত্রের গায়ে স্পষ্ট রেখা টানিয়া দেখানো হয় এবং বাতাসের ভাবগতিক যেমন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলাইতে থাকে, মানচিত্রের উপরেও সেই-সমস্ত পরিবর্তনের হিসাব ক্রমাগত বদলাইয়া দেখানো হয়।

সন্দেশ—আশ্বিন, ১৩২৫

বেগের কথা

যে লোক শৌখিন, সামান্য কষ্টেই কাতর হইয়া পড়ে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় 'ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায়'। রঘুবংশে আছে যে দশরথের মা ইন্দুমতী সত্যসত্যই ফুলের ঘায়ে কেবল মূর্ছা নয়, একেবারে মারাই গিয়াছিলেন। ইন্দ্রের পারিজাতমালা আকাশ হইতে তাঁহার গায়ে পড়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রথম যখন এই বর্ণনাটা শুনিয়াছিলাম তখন ইহাকে অসম্ভব কল্পনা বলিয়া বোধ হইয়াছিল; কিন্তু এখন ভাবিয়া দেখিতেছি ইহা নিতান্ত অসম্ভব কিছু নয়।

তালগাছের উপর হইতে ভাদ্রমাসের তাল যদি ধুপ্ করিয়া পিঠে পড়ে তবে তার আঘাতটা খুবই সাংঘাতিক হয়; কিন্তু ঐ তালটাই যদি তালগাছ হইতে না পড়িয়া এ পেয়ারাগাছ হইতে এক হাত নীচে তোমার পিঠের উপর পড়িত, তাহা হইলে এতটা চোট লাগিত না। কেন লাগিত না? কারণ, তাহার বেগ কম হইত। কোনো জিনিস যখন উঁচু হইতে পড়িতে থাকে তখন সে যতই পড়ে ততই তার বেগ বাড়িয়া চলে। যে হাড়ের টুকরাটি দোতলা হইতে একতলায় মানুষের মাথায় পড়িলে বিশেষ কোনোই অনিষ্ট হয় না- সেইটিই যখন চিলের মুখ হইতে পড়িতে পড়িতে অনেক নীচে প্রবল বেগে আসিয়া নামে তখন তাহার আঘাতে মানুষ রীতিমতো জখম হইতে পারে। ফুলের মালাটিকেও যদি যথেষ্ট উঁচু হইতে ফেলিয়া দেওয়া যায় তবে তাহার আঘাতটি যে একেবারেই মোলায়েম হইবে না, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

ঘূর্ণী বায়ুর সময় সামান্য খড়কুটা পর্যন্ত যে ঝড়ের বেগে গাছের ছালে বিধিঁয়া যায়, ইহা অনেক সময়ই দেখা যায়। একটা নরম মোমবাতিকে বন্দুকের মধ্যে পুরিয়া গুলির মতো করিয়া ছুটাইলে সে যে পুরু তক্তা ফুটা করিয়া যায়, ইহাও মানুষে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে। বন্দুকের গুলি জিনিসটা আসলে খুব মারাত্মক নয়; হাতে ছুঁড়িয়া মারিলে তাহাতে চোট লাগিতে পারে, কিন্তু সে চোট খুব সাংঘাতিক হয় না। কিন্তু সেই জিনিস যখন বন্দুকের ভিতর হইতে বারুদের ধাক্কায় প্রচণ্ডবেগে ছুটিয়া বাহির হয় তখন আস্ত মানুষটাকে এপার-ওপার ফুঁড়িয়াও তাহার রোখ থামিতে চায় না।

জলের কল হইতে যে-জলধারা পড়িতে থাকে, তাহার মধ্যে আঙুল চালাইয়া দেখ—যেটুকু বাধা বোধ করিবে তাহা নিতান্তই সামান্য। কিন্তু ঐরকম সরু একটি জলের ধারা যখন খুব প্রবলবেগে ছুটিয়া বাহির হয় তখন মনে হয় সে যেন লোহার মতো শক্ত—তখন তাহাকে কুড়াল দিয়াও কাটা যায় না। ফ্রান্সের একটা কারখানায় চার-শত হাত উঁচু পাহাড় হইতে জলের স্রোত আনিয়া তাহার জোরে কল চালানো হয়। সেই জল যখন এক আঙুল মোটা একটি নলের ভিতর হইতে ভীষণ তোড়ে বাহির হয়—তখন তাহাতে তলোয়ার দিয়া কোপ মারিলে তলোয়ার ভাঙিয়া খান্ খান্ হইয়া যায়। এমন-কি, বন্দুকের গুলিও তাহাকে ভেদ করিতে পারে না—তাহাতে ঠেকিয়া ঠিক্‌রাইয়া পড়ে। আমেরিকার কোনো কোনো কারখানার নর্দমা দিয়া যে-জল পড়ে, তাহার উপর কুড়াল মারিয়া দেখা গিয়াছে, জলের মধ্যে কুড়াল বসে না—জলের এমন বেগ!

চলন্ত জিনিস মাত্রেরই এইরূপ একটা ধাক্কা দিবার ও বাধা দিবার শক্তি আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, জগতে যা কিছু তেজ দেখি, যে কোনো শক্তির পরিচয় পাই, সমস্তই এই চলার রকমারি মাত্র। বাতাসে ঢেউ উঠিল, অমনি শব্দ আসিয়া কানে আঘাত করিল—আকাশে তরঙ্গ ছুটিল, অমনি চোখের মধ্যে আলোর ঝিলিক্ জ্বলিল। কেবল তাহাই নয়, প্রত্যেক ধূলিকণার মধ্যে কোটি কোটি পরমাণু ছুটাছুটি করিতেছে। ভিতরের এই ছুটাছুটি বাড়িলেই সব জিনিস গরম হইয়া উঠে। যখন ঠাণ্ডা হয় তেজ কমিয়া আসে তখন বুঝিবে এই পরমাণুর ছুটাছুটি ঢিমাইয়া পড়িতেছে।

যে-জিনিসটা ছুটিতে চায় তাহাকে বাধা দিলে সে গরম হইয়া ওঠে। তাহার বাহিরের বেগ বন্ধ হইয়া তখন ভিতরে পরমাণুর বেগকে বাড়াইয়া তোলে। বন্দুকের গুলিটা লোহায় লাগিয়া থামিয়া গেল—হাত দিয়া দেখ, এত গরম যে হাতে ফোস্কা পড়িবে। একটা শক্ত জিনিসের উপর ক্রমাগত হাতুড়ি মার, হাতুড়ির বেগ যতবার বাধা পাইবে ততই দেখিবে হাতুড়িটা গরম হইয়া উঠিতেছে—আর যাহার উপর আঘাত করিতেছে, তাহাকেও গরম করিয়া তুলিতেছে। রেলগাড়ি যখন লোহার রেলের উপর দিয়া যায় তখন চাকার সঙ্গে রেলের ঘষা লাগিয়া সে ক্রমাগত বাধা পাইতে থাকে। ট্রেন চলিয়া যাইবার পর যদি রেলের উপর হাত দিয়া দেখ, দেখিবে লোহাগুলি বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছে। ট্রেন যখন স্টেশনে আসিয়া থামে, তখন তাহার চাকায় হাত দিলে দস্তুরমতো গরম বোধ হয়।

কেবল যে কঠিন জিনিসেই বাধা দেয় তাহা নয়, বাতাসের মতো হালকা জিনিসেরও বাধা দিবার শক্তি আছে। খুব বড়ো একটা পাখা লইয়া জোরে চালাইতে গেলে বেশ বোঝা যায় যে বাতাসের ঠেলা লাগিতেছে। তোমরা নিশ্চয়ই উল্কা দেখিয়াছ। মাঝে মাঝে আকাশে যে তারার মতো জিনিসগুলি হঠাৎ কোথা হইতে বোঁ করিয়া ছুট্ দিয়া পালায়, সেগুলিই উল্কা। উল্কাগুলি এই পৃথিবীরই মতো ভীষণভাবে ঘণ্টায় পঞ্চাশহাজার বা লক্ষ মাইল বেগে ছুটিতে থাকে! বাহিরের আকাশ তাহাকে বাধা দেয় না, কিন্তু দৈবাৎ যদি সে পৃথিবীর বাতাসের মধ্যে আসিয়া পড়ে অমনি বাতাস তাহাকে বাধা দিতে থাকে। এই বাধাতেই তাহার বেগ কমিয়া যায়, সে গরমে জ্বলিয়া আগুন হয়। সেই আগুনকে ছুটিতে দেখিয়া আমরা বলি 'ঐ উল্কা পড়িল'।

পৃথিবীর তুলনায় উল্কাগুলি নিতান্তই ছোটো। তাই তাহাদের ধাক্কায় পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হয় না, উল্কাগুলিই মরিয়া শেষ হয়। কিন্তু দুইটা বড়ো-বড়ো পৃথিবী যদি এইরকম ছুটাছুটি করিয়া ধাক্কা লাগায় তবে কাণ্ডটা কিরকম হয়। মানুষের কল্পনা তাহার ধারণাই করিতে পারে না। দুইটার মধ্যে যখন ধাক্কা লাগে তখন তাহাদের প্রচণ্ড বেগ বাধা পাইবামাত্র জ্বলিয়া আগুন হইয়া বাহির হয়। সেই আগুন হইতে পাহাড়প্রমাণ স্ফুলিঙ্গ চারিদিকে হাজারে হাজারে ছুটিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে দুই পৃথিবীর শেষ চিহ্ন ঘুচিয়া গিয়া কেবল লক্ষ লক্ষ মাইল জুড়িয়া আগুনের শিখা জ্বলিতে থাকে। এরূপ ঘটনা যে একেবারেই হয় না তাহা নয়; কিছুদিন আগে যে 'নূতন তারা' দেখা গিয়াছিল তাহাও এইরূপ একটা লুপ্তবেগের আগুনমাত্র। কবে ব্রহ্মাণ্ডের কোন কিনারে এই আগুন জ্বলিয়াছিল; তাহারই জ্বলন্ত কিরণ আকাশে তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিতে ছুটিতে এতদিনে আমাদের চোখে আসিয়া আঘাত করিয়া গেল। সেই যে আলোকের বেগ, তাহার কাছে আর সমস্ত বেগই হার মানিয়া যায়। কামানের গোলা এত যে প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া যায়, তাহার গতিও আলোকের গতির তুলনায় যেন রেলগাড়ির কাছে শামুকের চলার মতো।

সন্দেশ—কার্তিক, ১৩২৫

মজার খেলা

একবার একটা মজার দৌড়-খেলা দেখিয়াছিলাম। কতগুলা লোককে বড়ো-বড়ো ছালার মধ্যে গলা পর্যন্ত ভরিয়া মাঠের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে—কে আগে যাইতে পারে। কয়েকজন অত্যন্ত সন্তর্পণে অদ্ভুত ভঙ্গিতে পেঙ্গুইন পাখির মতো হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছে, আর কয়েকজন মাটিতে পড়িয়া একেবারে 'কুমড়ো গড়ান' গড়াইতেছে। মাঠসুদ্ধ লোক একেবারে হাসিয়া অস্থির। ফ্রান্সে একটি 'মোটা মানুষের সমিতি' আছে; অন্তত সাড়ে তিন মণ ওজন না হইলে তাহাতে ভর্তি হওয়া যায় না। তাহারা একবার মোটা লোকদের জন্য দৌড় খেলার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। যাহাদের ওজন পাঁচ-সাত মণের কম হইবে না—এমন অনেক লোকে তাহাতে দৌড়াইয়াছিল। সে দৌড় আমি দেখি নাই কিন্তু তাহার যে ফোটো দেখিয়াছি; সে অতি চমৎকার—দেখিলে না হাসিয়া থাকা যায় না।

বহুকাল আগে একটা বিলাতি পত্রিকায় এইরকম কতগুলি অদ্ভুত মজার খেলার কথা পড়িয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটা ছিল খাওয়ার পাল্লা। কতগুলি রেকাবি সম্মুখে লইয়া সকলে টেবিলের কাছে বসিয়াছে; 'এক-দুই-তিন' বলিতেই তাহাদের পাতে একেবারে উনান হইতে সাংঘাতিক গরম 'চপ্' ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কাঁটা চামচ নাই, খাবারে হাতও লাগাইতে পারিবে না—এখন যে আগে খাইতে পারিবে তাহারই জিত। যে লোকটা জিতিয়াছিল সে প্রথমেই মাথা দিয়া ঢুঁ মারিয়া চপ্‌টাকে চ্যাপ্টাইয়া জুড়াইবার সুবিধা করিয়া লইয়াছিল। মাথায় চুল আছে, তাই সহজে গরম লাগে না। আর-একটা খেলাতে কোনো ফল কিম্বা অন্য কোনো খাবার সুতায় বাঁধিয়া ঠিক নাকের সামনেই ঝুলাইয়া রাখা

হয়। যে হাত না দিয়া সকলের আগে পরিষ্কার করিয়া খাওয়া শেষ করিবে তাহার জিত। কাজটা শুনিতে বেশ সহজ, কিন্তু কাজে তেমন সহজ নয়। সুতাটা শূন্যে ঝুলিতেছে, মুখ ঠেকাইতে গেলে সেটা আরো দুলিতে থাকে।

একটা গল্প পড়িয়াছিলাম যে এক জায়গায় খেলা হইতেছিল, কে কত উৎকট মুখভঙ্গি করিতে পারে! একজনের উপর ভার ছিল, তিনি বিচার করিয়া বলিবেন, কাহার মুখের ভঙ্গি সকলের চাইতে বিশ্রী ও বিদ্ঘুটে। খেলার জায়গায় এক বেচারা তামাশা দেখিতেছিল, তাহার মুখখানা বাস্তবিকই কদাকার। বিচারক তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন, "আমাদের মধ্যে ইনি 'ফার্স্ট প্রাইজ' পাইবার যোগ্য!" সে লোক আশ্চর্য হইয়া বলিল, "আমি তো এ খেলায় যোগ দিই নাই।" বিচারক গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তাই নাকি? তা, আপনি কোনো চেষ্টা না করিয়াই ফার্স্ট হইয়াছেন। আপনি থাকিতে ও প্রাইজ আর কেউ পাইতে পারে না!" লোকটি প্রাইজ পাইয়া খুশি হইবে কি দুঃখিত হইবে, তাহা বুঝিতে পারিল না।

ঘরে বসিয়া অনেকজনে মিলিয়া খেলা যায় এমন দু-একটা খেলার কথা বলি। কতগুলা খেলা আছে তাহাতে বেশ চট্‌পটে এবং সতর্ক হওয়া দরকার। তার মধ্যে একটা খেলা এই—একজন লোক বেশ ধীরে ধীরে একটি গল্প বলিয়া বা পাঠ করিয়া যাইবে। সেই গল্পটি এমন হওয়া চাই যে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি বেখাপ্পা কথা থাকে। অর্থাৎ এক জায়গায় যেরকম বলা হইয়াছে, আর এক জায়গায় তার উলটারকম কথা থাকিবে। যেমন এক ভদ্রলোকের বর্ণনা দেওয়া গেল তার মাথা ভরা টাক, তার পরে আর-এক জায়গায় হয়তো বলা হইল যে তিনি আয়নার সামনে বাহার করিয়া টেরি ফিরাইতেছেন। এইরকম গল্পের একটি নমুনা দেওয়া গেল—

"রবিবার, শ্রাবণের কৃষ্ণা চতুর্থী। সন্ধ্যার আকাশ দেখিতে দেখিতে মেঘে ঢাকিয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। গৃহহীন পিতৃমাতৃহীন যোগেশচন্দ্র আফিসের বেশে বিনা ছাতায় ভিজিতে ভিজিতে নির্জন পথ দিয়া চলিতেছেন—সঙ্গে ট্রামের পয়সাটি পর্যন্ত নাই। স্কুল কলেজ হইতে ছুটি পাইয়া ছাত্রগণ কোলাহল করিয়া ছুটিতেছে—যোগেশচন্দ্রের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি ভিড় ঠেলিয়া চলিতেছেন, আর ভাবিতেছেন কতক্ষণে পৌঁছিব। একে শীতকাল, তার উপর গায়ে কেবল শতছিন্ন পাতলা ফুটবলের সার্ট, যোগেশচন্দ্র কাঁপিতে কাঁপিতে আপনার গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় কে যেন ডাকিয়া উঠিল, "অন্ধ নাচারকে ভিক্ষা দেও।" যোগেশচন্দ্র দেখিলেন এক হস্তপদহীন ভিখারী কাতরভাবে ভিক্ষা চাইতেছে। দেখিয়াই তাঁহার মনে দয়ার উদয় হইল। তিনি পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া ভিখারীর হস্তে গুঁজিয়া দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং ভিজা জুতা ও ছাতা বারান্দায় রাখিয়া গিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। পতন শব্দে তাঁহার বাপ-মা 'হায় হায়' করিয়া ছুটিয়া আসিলেন।"

ইহার মধ্যে কি কি ভুল আছে বাহির কর তো? খেলিবার সময় কতগুলা কাগজ পেনসিল দিয়া সকলকে বসাইয়া দিবে এবং ধীরে ধীরে দুইবার গল্পটি পাঠ করিয়া শুনাইবে। তার পর দু-তিন মিনিট সময় দিবে, তাহার মধ্যে যে সবচাইতে বেশি ভুল ধরিতে পারিবে, সেই বাহাদুর। অনেকটা এই ধরনের আর-একটা খেলা আছে, তাহাতে কথা মনে রাখার উপর

হারজিত নির্ভর করে। একটা কোনো জিনিসের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়া তার পর সকলকে বলিতে হয় সমস্ত বর্ণনাটা শুনিয়া আবার মন হইতে লিখিয়া দাও। যেমন একজন মানুষের কথা বলিলাম—তাহার বয়স পঁচিশ হইবে, চোখে কালো চশমা, মাথার সামনের দিকে টাক, খোঁচা খোঁচা ভুরু ও ঝাঁটার মতো গোঁফ, দাড়ি কামানো, মোটা বেঁটে চেহারা, হাতে একটা সবুজ ক্যাম্বিসের ব্যাগ, গলায় পশমের গলাবন্ধ, গায়ে কালো গরম কোট, তার পকেটে লাল রুমাল, হাতে একটা বাঁশের ছাতা, পায়ে প্রকাণ্ড বুট জুতা, কানে শোনেন কম, চলেন খোঁড়াইয়া—তার উপর গলার আওয়াজখানা ভিজা ঢাকের মতো! এখন এইটুকু ধীরে ধীরে দুবার পড়িয়া তার পর বেশ ভাবিয়া লিখ তো—দেখিবে এইটুকু বর্ণনার মধ্যে হয়তো কিছু কিছু ভুল হইয়া যাইবে।

এইবার অন্যরকমের আর-একটি খেলার কথা বলি যাহা শুনিতে খুব সহজ শোনায় কিন্তু কাজে ভারি শক্ত। একখানা আয়নার সামনে একটা কাগজ—আয়নার ছায়া দেখিয়া কাগজে কিছু আঁকিবার অথবা লিখিবার চেষ্টা করিয়া দেখ। ভারি একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়। হাতটা যেন কিছুতেই বাগ মানিতে চায় না। অনেক লোককে দেখাইতে হইলে একটা বোর্ডের উপর বেশ বড়ো করিয়া একটা সহজ 'V' আঁকিয়া, সকলকে বল বোর্ডের দিকে না তাকাইয়া কেবল আয়নার ছায়া দেখিয়া তাহার উপর দাগ বুলাইতে! বিশেষত যাঁহারা খুব ভালো 'ড্রয়িং' জানেন বলিয়া প্রশংসা পান তাঁহাদের ধরিয়া এই সামান্য কাজে লাগাইয়া বেশ জব্দ করিতে পার।

এবারে আর-একটা মজার কথা বলিয়া শেষ করিব। বারো আঙুল লম্বা দুখানি ঝাঁটার কাঠিকে মোড়াইয়া দুটি ইংরাজি V তৈয়ারি কর। তার পর আর-একটি লম্বা কাঠির উপর তাহাদের চড়াইয়া, একখানা সমান বুটিং বা অন্য কোনো খসখসে কাগজের উপর ধরিয়া রাখ। Λ-দুটি যেন ভিতরের দিকে হেলিয়া থাকে। হাতটাকে একেবারে আলগা রাখিও যেন কিছুর উপর ভর করিয়া না থাকে। তাহা হইলে দেখিবে আস্তে আস্তে ঝাঁটার কাঠি দুইটা কাছাকাছি আসিতেছে। তোমার হাত যতই কাঁপিবে, সে কাঁপুনি যতই সামান্য হোক-না কেন, কাঠিটা ততই কাগজের ঘষায় ঘষায় ভিতরদিকে সরিতে থাকিবে!

সন্দেশ —কার্তিক, ১৩২৫

আগুন

আজকালকার সভ্য মানুষ, যাহারা দিব্য আরামে ঘরে বসিয়া দিয়াশালাই ঠুকিয়া আগুন জ্বালায়, তাহারা ভাবিয়াই দেখে না যে এই আগুন মানুষের কত তপস্যার ধন। যে-আগুন বনে জঙ্গলে দাবানল হইয়া জ্বলে, যে আগুন আগ্নেয় পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় জিভ মেলিয়া ধুঁকিতে থাকে—সেই আগুনকে মানুষ যখন আপনার শক্তিতে জ্বালাইতে শিখিল, সেইদিন মানুষ এমন বিদ্যা শিখিল যাহা মানুষ ছাড়া আর কেহ জানে না। চক্‌মকি পাথর ঠুকিয়া বা কাঠে কাঠে ঘষিয়া সেই যে কোন কালের আদিম মানুষ আগুন

জ্বালাইবার উপায় বাহির করিয়াছিল, আজও পৃথিবীর কত অসভ্য জাতি ঠিক সেই উপায়ে প্রতিদিন আগুন জ্বালিতেছে। এই কাজ করিতে কৌশল ও পরিশ্রম দুয়েরই দরকার হয়। কাঠের মধ্যে কাঠ ঘুরাইয়া আগুন জ্বালিবার প্রথা আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল—বেদে এবং পুরাণে তার কথা অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকবার এইভাবে আগুন জ্বালানো বড়ো সহজ কথা নয়, সেইজন্য একবার আগুন জ্বালানো হইলে তাহাতে বার বার কাঠ-কুটা শুকনা পাতা ইত্যাদি দিয়া সেই আগুনকে বাঁচাইয়া রাখা দরকার হইত। কেবল আমাদের দেশে নয়, এইরকম আগুন রক্ষার আয়োজন রোম গ্রীস ইজিপ্ট প্রভৃতি সকল দেশেই ছিল। অনেক সময় রীতিমতো মন্দির গড়িয়া পুরোহিত রাখিয়া এই আগুনের তদ্বির করা হইত। লোকে সেই-সকল মন্দির হইতে প্রতিদিন আগুন লইয়া আসিত এবং সকলে মিলিয়া আগুনের সম্মান ও পূজা করিত।

আগুন না থাকিলে মানুষের অবস্থা কি হইত ? আগুন ছিল তাই মানুষ শীতের মধ্যেও টিঁকিতে পারিয়াছে, কত হিংস্র জন্তুর হাত হইতে আপনাকে বাঁচাইতে পারিয়াছে, রান্না করিতে শিখিয়াছে, মাটি পোড়াইয়া বাসন গড়িতে শিখিয়াছে, লোহা তামা প্রভৃতি ধাতুকে কাজে লাগাইতে শিখিয়াছে। শহরে গ্রামে ঘরের আশেপাশে সর্বদা যে-সব জিনিস কাজে লাগে, তাহার দিকে চাহিয়া দেখ, আগুন না হইলে তাহার কোনটা তৈয়ারি করা সম্ভব হইত ? মাটির হাঁড়ি, কাঁসার বাসন, সোনা রূপার অলংকার এ-সব তো ছাড়িয়াই দিলাম। জুতাটি যে পায়ে দিয়াছ, তাহার কাঁটাগুলি তো লোহার, ঐ জুতা সেলাইয়ের জন্য লোহার ছুঁচ দরকার হইয়াছিল তো ? আগুন না থাকিলে তাহা সম্ভব হইত কিরূপে ? ঘরে এত যে সাবান সুগন্ধি ওষুধপত্র ব্যবহার কর, তাহার মালমসলার জন্য কত কারখানায় কত চুল্লি জ্বালিতে হয় তাহা একবার ভাবিয়া দেখ তো। রাত্রে যে আলো জ্বালাইয়া পড়াশুনা কর, সেই আলোটুকু যদি না থাকিত তবে কেমন অসুবিধা হইত বল দেখি। আর ঐ যে কাঁচের চশমা পর, কাঁচের 'থার্মোমিটার' দিয়া জ্বর মাপ, আর অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ প্রভৃতি অসংখ্য কাঁচের যন্ত্র ব্যবহার কর, ক্ষার চূণ ও বালি আগুনে না গলাইলে সে কাঁচ আসিত কোথা হইতে ? আগুন ছাড়া পৃথিবী যদি কল্পনা করিতে চাও তো এই-সমস্ত জিনিস বাদ দিতে হয়—এই-সমস্ত জিনিসের সাহায্যে মানুষ জ্ঞানবিজ্ঞান ও সভ্যতায় যাহা কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছে সে-সমস্ত লোপ করিতে হয় ; আর মানুষকে কল্পনা করিতে হয় সেই আদিম-কালের অসভ্যের মতো—যাহারা ফলমূল ও কাঁচা মাংস খাইয়া, গাছের ছাল-বাকল ও জানোয়ারের চামড়া পরিয়া, গাছ পাথরের অস্ত্রে সাজিয়া, গাছে জঙ্গলে গুহা গহ্বরে লুকাইয়া ফিরিত। সে সময়ের পৃথিবীতেও কাঠ ছিল, কয়লা ছিল, আগুন জ্বালিবার মালমসলা সবই ছিল। ছিল না কেবল আগুন—ছিল না কেবল সেই জ্ঞানটুকু যাহাতে আগুন জ্বালিবার সংকেতটি জানা যায়। সেই মানুষ, আর এখনকার এই মানুষ! এ দুয়ের মধ্যে এত যে প্রকাণ্ড তফাত দেখিতেছ, তাহার প্রধান কারণ এই আগুনের আবিষ্কার।

আমাদের দেশে আগুনকে বলে, 'সর্বভুক'। একবার যদি সে জিভ মেলিয়া বাহির হইল, তবে তাহার ক্ষুধার আর শেষ নাই—সে তখন সব খাইয়া উজাড় করিতে পারে। আগুনকে যদি তুষ্ট করিতে চাও, কাজে লাগাইতে চাও, তবে তাহার ক্ষুধা মিটাইবার খোরাক দেওয়া

চাই। কাগজ দাও, খড় দাও, কাঠ দাও, কয়লা দাও, তেল ঘি কেরোসিন যাহা সে হজম করিতে পারে তাহাই দাও—একটা কোনো খোরাক না জোগাইলে সে জ্বলিতে পারে না। আগুন জ্বালিবার জন্য মানুষে প্রতি বৎসর কত বন জঙ্গল উজাড় করে, মাটির ভিতরে ঢুকিয়া কত লক্ষ লক্ষ মণ কয়লা খুঁড়িয়া তোলে, কত বড়ো-বড়ো ব্যবসা ফাঁদিয়া কেরোসিন প্রভৃতি খনির তেল দেশ-বিদেশে চালান দেয়, কত মোম চবি ঘি তেল খরচ করিয়া ঘরে ঘরে বাতি জ্বালায়, তাহার হিসাব লইতে গেলে অবাক হইতে হয়। আজকালকার নিতান্ত অসভ্য যে মানুষ—লঙ্কা দ্বীপের 'ভেদ্দা' বা আফ্রিকার 'বুশম্যান'—তাহারাও আগুনের ব্যবহার জানে। অতি প্রাচীন কালে আগুন ছাড়া মানুষ যাহারা ছিল তাহারা যে আগুনওয়ালা মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়া টিঁকিতে পারিত না, এ কথা সহজেই বোঝা যায়। শীতের অত্যাচারে, শত্রুর অত্যাচারে, হিংস্র জন্তুর অত্যাচারে—নানারকম বিপদে আপদে আগুনের সাহায্য না পাইলে আজকালকার এই মানুষেরা আজ কোথায় থাকিত, কে জানে? হয়তো মানুষ জাতিটাই পৃথিবী হইতে লোপ পাইবার জোগাড় হইত!

হিংস্র জন্তু পোষ মানিলেও তাহার হিংস্রতা একেবারে দূর হয় না। সেইজন্য সর্বদা সতর্ক থাকিতে হয়, কখন তাহার হিংসা বুদ্ধি জাগিয়া উঠে। আগুনকে বাগ মানাইতে গিয়াও মানুষকে পদে পদেই এইরকম বিপদে পড়িতে হইয়াছে। আমরা একবার শিলং পাহাড়ে গিয়াছিলাম; সেখানে পাহাড়ের গায়ে লম্বা লম্বা দাগ দেখিয়া দূর হইতে ভাবিয়াছিলাম, ওগুলি বুঝি পাহাড়ে উঠিবার রাস্তা। পরে কাছে গিয়া বুঝিলাম ওগুলি রাস্তা নয়, জঙ্গলের মাঝে মাঝে চওড়া ফিতার মতো ফাঁকা জমি—ঠিক যেন পাহাড়ের মাথার উপর ক্ষুর চালাইয়া খালের মতো করিয়া চাঁচিয়া রাখিয়াছে! শুনিলাম, আগুনের ভয়ে নাকি ওরকম করা হইয়াছে; কোথাও আগুন লাগিলে, ঐ ফাঁকা জায়গা পর্যন্ত আসিয়া আগুন আর ছড়াইতে পারে না। আমেরিকার বড়ো-বড়ো Prairie বা ঝোপজমিতে কেবল ঝোপজঙ্গল ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না—সেখানে আগুন লাগিলে এক-এক সময়ে ব্যাপার ভারি মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। সে আগুন এমন হু হু করিয়া ছড়াইয়া পড়ে যে মানুষে অনেক সময়ে ঘোড়া ছুটাইয়াও তাহার হাত এড়াইয়া পলাইতে পারে না।

এ-সব তো গেল বাহিরের আগুনের কথা। মানুষের ঘরে ঘরে সংসারের কাজের জন্য প্রতিদিন যে আগুনের দরকার হয়, সেই আগুন যখন এক-একবার ছাড়া পাইয়া ঘরবাড়ি শহর গ্রাম সব খাইয়া শেষ করে, তাহাও কি কম সাংঘাতিক! কখন কাহার অসাবধানতায় আগুন ছড়াইয়া সর্বনাশ উপস্থিত হয়, তাহার জন্য কতরকমে মানুষকে সতর্ক হইতে হয়। বড়ো-বড়ো শহরে দমকলের স্টেশন থাকে, আগুন নিভাইবার জন্য কত লোকলস্কর ও কত-রকম আয়োজন রাখিতে হয়। বড়ো-বড়ো দমকল, যাহা হইতে জলের ফোয়ারা ছুটিয়া আগুনের মধ্যে গিয়া পড়ে; তিনতলা চারতলার সমান লম্বা লম্বা মই, যাহাকে দুরবীনের মতো গুটাইয়া রাখা যায়; আর বড়ো-বড়ো মোটর বা ঘোড়ার গাড়ি, যাহাতে আগুনের জায়গায় চট্‌পট্‌ ছুটিয়া যাওয়া যায়; আর আগুন লাগিলে পর আগুনের আফিসে তাড়াতাড়ি খবর পৌঁছাইবার জন্য নানারকম ব্যবস্থা। টেলিফোনের আফিসে একটিবার 'ফায়ার!' (Fire) বলিয়া খবর দাও, অমনি মুহূর্তের মধ্যে আগুনস্টেশনের সাড়া শুনিবে—'কোথায় আগুন?'

বাস্! এক মিনিটের মধ্যে ঢং ঢং শব্দে দমকল ছুটিয়া বাহির হইবে। সে শব্দ শুনিলে রাস্তার গাড়ি ঘোড়া মোটর সাইকেল সব শশব্যস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দেয়। যাহারা আগুনের পল্টনে কাজ করে, তাহাদের শিক্ষা এবং সাহস দুই দরকার। ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহাদের বীরত্বের অনেক আশ্চর্য কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়।

বড়ো-বড়ো আগুনের দৃশ্য একদিকে যেমন ভয়ানক, আর একদিকে তেমনি সুন্দর। আগুনে শহর বাড়ি পুড়াইয়া কত মানুষের সর্বনাশ করে, তাহাতে মানুষ হাহাকার করে. আবার সেই আগুনেরই প্রচণ্ড গম্ভীর তেজ দেখিয়া বিস্ময়ে মানুষ অবাক হইয়া থাকে। এম্‌ডেন (Emden) নামে জার্মানদের একটা যুদ্ধ জাহাজ কয়েকদিন বঙ্গোপসাগরে ভারি উৎপাত করিয়াছিল। সেই জাহাজের একটা গোলা মান্দ্রাজের একটা প্রকাণ্ড কেরোসিনের চৌবাচ্চায় পড়িয়া সমুদ্রের ধারে যে অগ্নিকাণ্ড লাগাইয়াছিল 'তামাশা' হিসাবে সে দৃশ্য নাকি অতি চমৎকার হইয়াছিল! আর কেরোসিনের জন্ম যেখানে যেখানে ব্যবসার জন্য খনি খুঁড়িয়া, কুয়া বসাইয়া, কেরোসিনের হ্রদ বিল ও কেরোসিনের ফোয়ারার সৃষ্টি করা হয় সেখানে যখন আগুন ধরিয়া যায়, আর লক্ষ লক্ষ মণ কেরোসিন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে থাকে তখন ব্যাপারটি যে কেমন হয়, তাহার আর বর্ণনা হয় না। পেটুক আগুন তখন মনের মতো খোরাক পাইয়া উল্লাসে লক্ষ লক্ষ জিভ মেলিয়া ধোঁয়ার হুংকার ছাড়িয়া স্বর্গ মর্ত গ্রাস করিতে চায়। তাহার কাছে লঙ্কাকাণ্ডই-বা কি আর খাণ্ডব দাহনই-বা লাগে কোথায়।

সন্দেশ—অগ্রহায়ণ, ১৩২৫

লাইব্রেরি

লাইব্রেরি মানে পুস্তকাগার বা কেতাবখানা—অর্থাৎ যেখানে বই রাখা হয়। আজকাল আমাদের দেশে শহরে গ্রামে নানা জায়গায় ছোটো-বড়ো নানারকম লাইব্রেরি দেখা দিয়েছে, সুতরাং লাইব্রেরি জিনিসটা যে কিরকম সেটা আর কাউকে বুঝিয়ে দেবার দরকার নাই।

পৃথিবীর বড়ো-বড়ো লাইব্রেরির নাম করতে গেলে লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরির নামটা নিশ্চয় করা উচিত। এই লাইব্রেরিতে সকল দেশের সকল সময়ের এবং সকল-রকমের বই সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। আসিরিয়া বা অসুর দেশের রাজা অসুর-বানি-পালের আড়াইহাজার বছরের পুরানো লাইব্রেরি খুঁড়ে সেখান থেকে প্রায় বিশহাজার ইঁটের পুঁথি এখানে এনে রাখা হয়েছে। তাতে তীরের ফলকের মতো খোঁচা-খোঁচা সব অক্ষর; সেই অক্ষর বুঝবার জন্য কত বড়ো-বড়ো পণ্ডিতকে কত বছরের পর বছর ভাবতে হয়েছে। তাতে আসিরিয়া দেশের জ্যোতিষ পুরাণ ইতিহাস আইন আর ধর্মকর্মের কথা আছে, গল্পের বই কবিতার বই আছে, এমন-কি, লাইব্রেরির ক্যাটালগ বা বইয়ের ফর্দ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। তার চাইতেও অনেক পুরাতন পুঁথি কিছু কিছু আছে, সেগুলি বেবিলনিয়ার ভাষায় লেখা। তার মধ্যে একখানা পুঁথি প্রায় ছহাজার বছর আগেকার। পেপিরস গাছের নরম ছালের উপর ছবির অক্ষরে লেখা ইজিপ্টের পুঁথিও সেখানে অনেক আছে।

ভারতবর্ষের নানান ভাষার পুঁথি, যে-ভাষা এখন কেউ পড়তে পারে না সেই-সব অজানা ভাষার পুঁথি, চীনেদের হিজিবিজি অক্ষরের সেই আদ্যিকালের পুঁথি, আফ্রিকা আমেরিকার অদ্ভুত ভাষার পুঁথি, পাথরে খোদাই করা পুঁথি, তামা লোহা ইঁট কাঠের পুঁথি, কাগজ কাপড় রেশম পশম চামড়া বাকলের পুঁথি, হাতের লেখা হাজার হাজার পুঁথি, আর লক্ষ লক্ষ ছাপানো পুঁথি—ঐ এক লাইব্রেরির মধ্যে এই-সমস্ত জিনিস পাওয়া যায়। লাইব্রেরিতে যে বইয়ের ফর্দ রয়েছে সেই ফর্দ লিখবার জন্যই প্রায় দেড়হাজার প্রকাণ্ড বড়ো-বড়ো খাতার দরকার হয়েছে।

এই লাইব্রেরিতে পড়বার জন্য পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ থেকে বড়ো-বড়ো পণ্ডিতেরা পড়বার ঘরে প্রতিদিন আসা-যাওয়া করেন। তাঁদের দরকার মতো বই, বলবামাত্র চট্‌পট্‌ এনে দেবার জন্য দু-তিনশো কেরাণী কর্মচারী সমস্তক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি প্রায় দুশো বছরের পুরানো। অক্সফোর্ডের বডলিয়ান লাইব্রেরির বয়স প্রায় পাঁচশো বছর। তার আটলক্ষ ছাপানো বই আর একচল্লিশ হাজার হাতের লেখা পুঁথির মধ্যে এমন অনেক জিনিস আছে যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। বিশেষত প্রথম যখন মুদ্রাযন্ত্র হয়, সেই সময়কার ছাপানো বইয়ের এমন চমৎকার সংগ্রহ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। পারিসের জাতীয় লাইব্রেরি (Bibliotheque Nationale) কেবল যে বয়সে সাত-আটশো বৎসর তা নয়, তার আয়তনও লণ্ডনের লাইব্রেরির চাইতে বেশি ছাড়া কম নয়। এই লাইব্রেরিতে প্রায় ত্রিশলক্ষ ছাপানো বই, হাতের লেখা একলক্ষ পুঁথি, আড়াইলক্ষ মানচিত্র আর দশলক্ষ ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে। পূবদেশীয় প্রাচীন পুঁথির অর্থাৎ এশিয়ার নানা অঞ্চলের পুঁথির নানারকম দৃষ্টান্ত এখানে যেমন আছে, পৃথিবীর আর কোথাও তেমন নাই।

কিন্তু লাইব্রেরির চূড়ান্ত কাণ্ড যদি দেখতে হয় তবে আমেরিকায় যাওয়া দরকার। সেখানে ঠিক বৃটিশ মিউজিয়াম বা পারিস্‌ লাইব্রেরির মতো অত বড়ো লাইব্রেরি না থাকতে পারে কিন্তু যেগুলি আছে সেগুলিও বড়ো সামান্য নয়। আর তাদের বন্দোবস্ত এমন চমৎকার যে পৃথিবীর আর কোথাও তেমন সুন্দর ব্যবস্থা দেখা যায় না। লাইব্রেরি যত বড়োই হোক বইয়ের সংখ্যা দশলাখই হোক কি বিশলাখই হোক যে-কোনো বই চাইবামাত্র ঠিক দু-মিনিটের মধ্যে যদি হাজির না হয় তবেই লাইব্রেরির দুর্নামের কারণ হয়। বই পেতে হলে কেবল তার নাম কিংবা নম্বরটি জানাতে হয়; অমনি লাইব্রেরিতে টেলিফোন করে দেয় আর দেখতে দেখতে তারের গাড়ি চড়ে বই এসে পড়বার ঘরে হাজির হয়। আমেরিকা কুবেরের দেশ, লক্ষপতি ক্রোড়পতি মহাজনের দেশ। লাইব্রেরির জন্য সেদেশে টাকার অভাব হয় না। সাধারণ লোকের ব্যবহারের জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যে-সব বড়ো-বড়ো লাইব্রেরি আছে তেমন লাইব্রেরি পৃথিবীর আর কোথাও নাই। বস্টন পাবলিক লাইব্রেরিতে লোকে টাকা জমা দিয়ে বই পড়তে নেয়। এইরকমে প্রতিদিন কত বই আসছে যাচ্ছে বই-বিলির খাতায় তার হিসাব থাকে। সেই হিসাবে দেখা যায় যে এক বৎসরে পনেরোলক্ষ বার সেখানে বই বিলি করা হয়েছে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে জাঁকাল লাইব্রেরি হচ্ছে আমেরিকান কংগ্রেস লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরির বাড়িটার জন্যই সওয়া দুকোটি টাকা খরচ হয়েছে। লাইব্রেরিতে চল্লিশ

লক্ষ বই রাখার মতো জায়গা রয়েছে। লাইব্রেরির তদ্বিরের জন্য প্রতি বৎসর দশ-বিশ লাখ টাকা মঞ্জুর করা হয়। ঘর বাড়ি আলমারি আসবাবপত্র সব এমনভাবে তৈরি যে আগুনে ভূমিকম্পে ঝড় বিদ্যুতে তার কোনো অনিষ্ট করতে পারে না। এমন-কি, বই-গুলো যাতে পোকায় না কাটতে পারে তার জন্য মোটা মোটা মাইনে দিয়ে লোক রাখা হয়—তাদের কাজ হচ্ছে কেবল পোকা ধ্বংস করবার জন্য নানারকম ব্যবস্থা করা।

একালের মতো প্রাচীনকালেরও অনেক বড়ো লাইব্রেরির নাম শোনা যায়। অসুর-বানি-পালের লাইব্রেরি আর বেবিলনিয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। তার চাইতেও আধুনিক সময়ে অর্থাৎ প্রায় দুহাজার বছর আগে গ্রীকদের আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির নাম খুব শোনা যেত।

এই লাইব্রেরির উপর রাজাদের খুব অনুগ্রহ ছিল, তাঁরা নানারকমে তার সাহায্য করতেন। বিদেশী জাহাজে যদি কখনো পুঁথি পাওয়া যেত, তা হলে সেই পুঁথিগুলো রেখে তার নকল দিয়ে জাহাজকে বিদায় করা হত। ভয় দেখিয়ে বা লোভ দেখিয়ে নানা দেশ থেকে নানারকমের পুঁথি নিয়ে আসা হত। এথেন্সে দুর্ভিক্ষের সময়ে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে শস্য জোগানো হয়েছিল এবং তার দাম হিসাবে এথেন্সের ভালো ভালো সরকারি বই আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরিতে ভর্তি করা হয়েছিল। গ্রীকদের এই লাইব্রেরিটির সঙ্গে রোমানদের পার্গেমাম লাইব্রেরির ভারি রেষারেষি ছিল। রোমানরা তাদের লাইব্রেরি বাড়াবার জন্য লোকের উপর অত্যাচার করত, জবরদস্তি করে যার তার পুঁথি কেড়ে নিয়ে যেত, এমন-কি, গ্রীকদের লাইব্রেরি থেকে লোক ভাগিয়ে নেবার জন্য সর্বদাই চেষ্টা করত।

সে সময়ে কাগজের সৃষ্টি হয় নি, খালি পেপিরসের ছালকে পিটিয়ে লম্বা লম্বা 'রোল্' বা থান তৈরি হত। সেইগুলোতে লিখে লাটাইয়ের মতো গুটিয়ে লাইব্রেরিতে বই বলে জমা করা হত। রোমানদের জব্দ করবার জন্য গ্রীকেরা এই পেপিরসের চালান বন্ধ করে দেয়। রোমানরা তখন অনেক চেষ্টা করে চামড়া থেকে একরকম পাতলা কাগজের মতো জিনিস (পার্চমেণ্ট) তৈরি করে, তাই দিয়ে পুঁথি বানাতে শেখে।

সন্দেশ—ফাল্গুন, ১৩২৫

পৃথিবীর শেষদশা

সংসারের কোনো জিনিসই চিরকাল একভাবে থাকে না—তা সে ছোটোই হউক আর বড়োই হউক। এই যে প্রকাণ্ড পৃথিবীটা যাহার উপর তোমার আমার মতো কোটি কোটি জীব এমন নিশ্চিন্তে বসিয়া দিন কাটাইতেছি, এই পৃথিবীটাও চিরকাল এমন ছিল না। এক সময়ে—সে কত লক্ষ বৎসর আগেকার কথা তাহা জানি না—এই পৃথিবী এমন গরম ছিল যে, জীবজন্তু থাকা তো দূরের কথা, ইহার উপর বৃষ্টি পড়িবারও জো ছিল না। উপরের আকাশে বৃষ্টি জমিয়া নীচে পড়িতে না পড়িতে শূন্যেই বাষ্প হইয়া মিলাইয়া যাইত। যখন আরেকটু ঠাণ্ডা হইল তখন তেমন তেমন বৃষ্টি হইলে তাহা পৃথিবীতে আসিয়া পড়িত কিন্তু

জল দাঁড়াইবার উপায় ছিল না। বৃষ্টিধারা ডাঙায় নামিবামাত্র টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিত এবং চারিদিক গরম ধোঁয়ায় ঢাকিয়া আকাশের জিনিস আকাশেই ফিরিয়া যাইত। তখন দেখিবার কেহ ছিল না, শুনিবার কেহ ছিল না; ফুটন্ত বৃষ্টিধারার অবিশ্রাম গর্জনের মধ্যে ধোঁয়ায় ভরা আকাশ যখন পৃথিবীর উপর ঘনঘন বিদ্যুতের চাবুক মারিত তখনকার সে ভয়ংকর দৃশ্য কল্পনা করাও সহজ কথা নয়।

তাহারও পূর্বে এক সময়ে পৃথিবীটা প্রকাণ্ড আগুনের পিণ্ডমাত্র ছিল। তখন তাহার শরীরটি ছিল এখনকার চাইতে প্রায় লক্ষগুণ বড়ো। বেশ একটি ছোটোখাটো সূর্যের মতো সে আপনার প্রচণ্ড তেজে আপনি ধক্‌ধক্‌ করিয়া জ্বলিত। তাহারও পূর্বেকার অবস্থা কেমন ছিল, সে কথা পণ্ডিতেরা আলোচনা করিয়াছেন। যাহা হউক, মোট কথা এই যে, পৃথিবীর বয়স অনেক হইয়াছে। মানুষের বয়স বাড়িয়া যখন সে বৃদ্ধ হইতে চলে তখন তাহার শরীরের তেজ কমিয়া যায়, গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া আসে। পৃথিবীর এটা কোন বয়স? সে কি এখন প্রৌঢ় বয়স পার হইতেছে? ভাবিবার কথা বটে। পৃথিবীর শেষ বয়সটা কিরকম হইবে, তাহার পক্ষে বার্ধক্যই-বা কি আর মৃত্যুই-বা কি, তাহার বিচার করা দরকার।

মানুষের মরিবার নানারকম উপায় আছে। কেহ অল্পে অল্পে বৃদ্ধ হইয়া মরে কেহ-বা তাহার পূর্বেই মরে, কেহ বহুদিন রোগে ভুগিয়া মরে, কেহ দুর্ঘটনায় হঠাৎ মরে। পৃথিবীর বেলায় মৃত্যুটা কিরকমে ঘটিবে তাহা কে জানে? যদি বৃদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে অল্পে অল্পেই মরিতে হয় তবে কোন অবস্থাকে তাহার মৃত্যুর অবস্থা বলিব? যখন জীবজন্তু থাকিবে না, মেঘ বাতাস থাকিবে না, নদী সমুদ্র থাকিবে না, পৃথিবী শুকাইয়া চাঁদের মতো কংকালসার হইয়া পড়িবে তখন বলা যাইবে 'পৃথিবীটা মরিয়াছে'। সেরকম হইবার কোনো লক্ষণ দেখা যায় কি? যায় বৈকি! পৃথিবী যখন শূন্যে ছুটিয়া চলে তখন সে বাতাসটাকেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলে বটে, কিন্তু তবু কিছু বাতাস চারিদিকে ছিটাইয়া পড়ে; তাহা শূন্যে উড়িয়া যায় আর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে না। সেই বাতাসের মধ্যে যেটুকু জল বাষ্প হইয়া থাকে তাহাও এইরূপে আকাশে ছড়াইয়া পড়ে। এইভাবে যাহা নষ্ট হয় তাহার পরিমাণ খুবই সামান্য; কিন্তু সামান্য লোকসানও যদি ক্রমাগত লক্ষ লক্ষ বৎসর চলিতে থাকে তবে শেষে তাহার হিসাবটা খুবই মারাত্মক হইয়া পড়ে। নদী ও সমুদ্রের মধ্যে যে জল আছে ডাঙার মাটি তাহাকে প্রতিদিনই অল্পে অল্পে শুষিয়া লইতেছে এবং তাহাতেও জলটা দিন দিনই কমিয়া আসিতেছে; সুতরাং আজ না হউক, হাজার বছরে না হউক, জল বাতাস সব একদিন শেষ হইবেই। তখন মেঘ থাকিবে না, কুয়াশা থাকিবে না, রামধনুকের শোভা, উদয়াস্তের রঙের খেলা কিছুই থাকিবে না কেবল নিস্তব্ধ নির্জন শ্মশানের মতো পৃথিবীর মৃত কংকাল পড়িয়া থাকিবে।

কিন্তু দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, এই যে আলো আঁধারের অবিশ্রাম খেলা, ইহাও কি চিরকাল থাকিবে না? না, তাহাও থাকিবে না। মোটামুটি আমরা যে দিন-রাতের হিসাব ধরি সেই দিনরাতের হিসাবও ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। জোয়ার ভাঁটার আঘাত পৃথিবীকে প্রতিদিনই সহিতে হয়, জলের সঙ্গে ডাঙার ঘষাঘষি প্রতিদিনই বাধিয়া থাকে; তাহার ফলে, পৃথিবীর ঘোরপাকের বেগ ক্রমেই ঢিলা হইয়া পড়িতেছে। পাঁচলক্ষ

বৎসরে দিনরাতের পরিমাণ এক সেকেণ্ডে বাড়িয়া যাইবে এবং ক্রমেই আরো বেশি করিয়া বাড়িবে। শেষে এমন দিন আসিবে যখন একপাক ঘুরিতে তাহার এক বৎসর লাগিবে। চাঁদ যেমন তাহার একই মুখ পৃথিবীর দিকে রাখিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, তাহার উলটা পিঠ আমাদের দেখিতেই দেয় না, পৃথিবীও ঠিক তেমনি করিয়াই ক্রমাগত একইভাবে সূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহার চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে। বুধ ও শুক্রগ্রহের আজকালকার অবস্থা ঠিক এইরূপ। এ অবস্থায় যেখানে রাত সেখানে বারো মাসই রাত, যেখানে দিন সেখানে বারো মাস দিনের আর শেষ নাই। একদিক রোদে পুড়িয়া ঝলসিয়া ঝামা হইয়া যায়, আর-একদিক শীতে জমিয়া এমন কন্‌কনে ঠাণ্ডা যে বাতাস জমিয়া বরফ বাঁধিয়া যায়! শেষ বয়সে, যতদিন সূর্যের তেজ থাকিবে, ততদিন এইরকম করিয়াই পৃথিবীর দিন চলিবে। তার পর সূর্যও যখন নিভিয়া যাইবে তখনো অন্ধকারে আকাশের গায়ে কত লক্ষ লক্ষ তারার আলো এমনি করিয়াই চাহিয়া থাকিবে, কিন্তু বহুদূরের সেই জ্যোতিতে আলোহারা সূর্যকে আর খুঁজিয়াই পাওয়া যাইবে না, পৃথিবী তো কোন ছার।

পৃথিবীর মৃত্যুর কি আর কোনো উপায় নাই? হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়া তাহার জীবনটা কি নষ্ট হইতে পারে না? ধূমকেতুকে এক সময়ে লোকে বড়োই ভয় করিত। নয় বৎসর আগে এই পৃথিবীটা যখন 'হ্যালি'র ধূমকেতুর ল্যাজের ভিতর ঢুকিয়া গিয়াছিল তখন আগে হইতেই কত লোকে ভয় পাইয়াছিল, কত লোকে বলিয়াছিল যে এইবার পৃথিবীর আর রক্ষা নাই! কিন্তু তবু তো পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হয় নাই, বরং ধূমকেতুর ধোঁয়াটে ল্যাজটাই ছিঁড়িয়া শূন্যে উড়িয়া গিয়াছে। এইরূপে কত ধূমকেতু কত উল্কা বৃষ্টির হাত হইতে সে কতবার বাঁচিয়া আসিল, কিন্তু ধূমকেতুর চাইতে ভারি একটা কিছুর সহিত যদি তাহার ধাক্কা লাগে তাহা হইলে অবস্থাটা খুবই সাংঘাতিক হইতে পারে। সুতরাং সেই 'একটা কিছু' আসা সম্ভব কি না, আর আসিলে কি হইবে, তাহার একটু খবর লওয়া যাক।

পৃথিবীর দেহের বাঁধন ও চালচলন এমন হিসাব-মাফিক সুন্দর নিয়মে বাঁধা যে, হঠাৎ কিছু উলট-পালট হওয়া সম্ভব নয়। ভূমিকম্প ঝড় বৃষ্টি অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি যে-সব ব্যাপারকে আমরা খুব ভয়ানক মনে করি, পৃথিবীর গায়ে সেগুলি সামান্য আঁচড় বা ফোস্কার মতো। চন্দ্র সূর্য গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি সকলকেই অতি আশ্চর্য নিয়মের বাঁধনে নিরাপদ করিয়া বাঁধা হইয়াছে! সুতরাং বাহির হইতে একটা কোনো উপদ্রবকে হাজির না করিলে সূর্যের এই প্রকাণ্ড সংসারটির বাঁধন ভাঙা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। সূর্যদেব সপরিবারে শূন্যের ভিতর দিয়া ঘণ্টায় চল্লিশহাজার মাইল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন—কিন্তু আকাশের কূল কিনারা নাই; লক্ষ লক্ষ বৎসর ক্রমাগত ছুটিয়াও তিনি যে কোনোদিন কোনো তারার উপর গিয়া পড়িবেন, এমন আশংকার কোনো কারণ এ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। কিন্তু চোখে দেখা যায় না এমনও তো অনেক বিপদ থাকিতে পারে! আকাশে যত তারা আছে তাহাদের সকলেরই যে আলো আছে এমন নয়। যাহাদের আলো নিভিয়া গিয়াছে আমরা তাহাদের কোনো খবর পাই না। সেইরূপ কোনো তারা যদি অন্ধকার পথে চলিতে চলিতে সূর্যের উপর আসিয়া পড়ে, তবে অবস্থাটা কেমন হইবে? সেটা যে একেবারেই ভালো হইবে না, তাহা বঝিতেই পার।

তেমন একটা তারা যদি আসে তবে সে সূর্যের রাজ্যের সীমানায় আসিবার পূর্বেই নেপচুন প্রভৃতি বহু দূরের গ্রহগুলির চালচলন বিগড়াইতে আরম্ভ করিবে। পণ্ডিতেরা ব্যস্ত হইয়া হিসাব করিতে বসিবেন, উপদ্রবটা কত বড়ো, কত দূরে এবং কোনদিকে। সূর্যের আলোয় সেই অন্ধকার তারা ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে, ক্রমে সে সৌরজগতের ভিতরে আসিয়া পড়িবে। ততদিনে বড়ো-বড়ো গ্রহেরা পর্যন্ত তাহাদের বহুদিনের অভ্যস্ত চাল ভুলিয়া বেচাল চলিতে আরম্ভ করিবে। একদিকে সূর্য আর একদিকে নূতন অতিথি, এই দোটানায় পড়িয়া পৃথিবী টল্‌মল্ করিতে থাকিবে। জোয়ারের বিপুল টানে নদীর জল ফুলিয়া উঠিবে, সাগরের তরঙ্গ ভীষণ বেগে পৃথিবীর উপর ছুটিয়া পড়িবে, ভূমিকম্পে পাহাড় পর্বত ধ্বসিয়া পড়িবে, বহুদিনের ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি আবার জাগিয়া সহস্র মুখে আগুন ফুঁকিতে থাকিবে। আর জীবজন্তুর হাহাকার ডুবাইয়া ঝড়ের বাতাস পাগলের মতো ছুটিয়া ফিরিবে। তার পর যখন সূর্যে তারায় সংঘর্ষ বাধিবে তখনকার অবস্থা কল্পনা করাও অসম্ভব। মুহূর্তের মধ্যে এক সূর্য কোটি সূর্যের তেজ ধারণ করিবে, সূর্যের আগুন অসম্ভব বেগে সমস্ত গ্রহ চন্দ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। আবার সেই আদিকালের নীহারিকার মতো জ্বলন্ত বাষ্পের আগুন সমস্ত সৌরজগতের আকাশ জুড়িয়া জ্বলিতে থাকিবে। তার পর কত যুগ-যুগান্তর পরে তাহার ভিতর হইতে আবার নূতন সূর্য বাহির হইয়া নূতন উৎসাহে নূতন সংসার পাতিয়া বসিবে। এ পৃথিবী তখন না থাকুক, আবার নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি হওয়াই-বা বিচিত্র কি?

ইহার মধ্যে অসম্ভব কিছুই নাই। সেদিন যে হঠাৎ নূতন তারা দেখা গিয়াছিল, তাহাও সুদূর আকাশে এইরূপ কোনো দুর্ঘটনার সামান্য একটু নমুনা মাত্র। আমাদের এই ছোটো জগৎটুকুর মধ্যে যদি তেমন কোনো প্রলয় আসিয়া পড়ে, তবে বিপদের সম্ভাবনা বুঝিবার পর সমস্ত শেষ হইতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর সময় লাগিবে। সুতরাং অন্তত আরো চল্লিশটা বছর তোমরা সকলেই খুব নিশ্চিন্তে থাকিতে পার।

সন্দেশ—মাঘ, ১৩২৬

নৌকা

আমি একজন ছেলের কথা জানিতাম, সে কখনো নৌকা দেখে নাই। ইংরাজি বইয়ে সে ছবি দেখিয়াছিল এবং নৌকা যে জলে ভাসে এটুকুও তাহার জানা ছিল; কিন্তু সত্যিকারের নৌকা কখনো সে চোখে দেখে নাই। আশা করি সন্দেশের পাঠক-পাঠিকাদের এমন কেউ নাই যাহাকে, নৌকা জিনিসটা কিরূপ, তাহা বুঝাইয়া বলা দরকার। এই আমাদের দেশেই নদী নালায় খালে বিলে কত রকম-বেরকম নৌকা দেখা যায়। ভারী ভারী বজরা, ছোটো-ছোটো ডিঙি, লম্বা লম্বা ছিপ্—এক-একটা এক-এক রকম।

গাড়ি তৈয়ারি করিবার আগেই বোধ হয় মানুষ নৌকা তৈয়ারি করিতে শিখিয়াছিল। এখনো অনেক অসভ্য জাত দেখা যায়, তাহারা গাড়ি ঘোড়ার ব্যবহার জানে না কিন্তু নৌকা

বানাইতে জানে। তাহার কারণ, ডাঙায় মানুষ যেমন ইচ্ছা হাঁটিয়া যাইতে পারে, গাড়ি চড়িবার দরকার সে বোধ করে না, সে কথাটা তাহার মাথায়ও আসে না। কিন্তু নৌকা না হইলে জলের মধ্যে কতটুকুই-বা যাওয়া আসা চলে? সেইজন্য মানষের এমন একটি জিনিসের দরকার যাহা জলে ভাসে এবং যাহার উপর চড়িয়া এদিক ওদিক চলাফিরা করা যায়।

সবচাইতে সহজ নৌকা কলার ভেলা। তোমরা হয়তো তাহাকে নৌকা বলিতেই আপত্তি করিবে; কিন্তু তাহাতে নৌকার কাজ যে চমৎকার চলিয়া যায়, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। তবে যদি তুমি শৌখিন লোক হও আর কাপড়-চোপড় কিংবা হাত-পা ভিজাইতে তোমার আপত্তি থাকে, তাহা হইলে আট-দশটা ভেলার উপর মাচা বাঁধিয়া তুমি অনায়াসে একটু আরাম করিয়া বসিতে পার। আর ভেলারই-বা দরকার কি? চার কোণে চারটি কলসী বা জালা বাঁধিয়া লইলেই তো চমৎকার হয়। কিন্তু সাবধান! কোথাও গুঁতা লাগিয়া কলসী যদি ফুটা হইয়া যায়, তবেই কিন্তু বিপদ! একটা বড়োরকমের গামলা পাইলে তাহাতেও নৌকার কাজ বেশ ভালোরকমেই চলিতে পারে।

আমি এগুলি কিছুই কল্পনা করিয়া বলিতেছি না। যতরকমের বর্ণনা দিলাম সবরকমের নৌকারই রীতিমতো ব্যবহার হইতে দেখা যায়। পেরু প্রভৃতি অনেক দেশে অস্ট্রেলিয়ার দ্বীপপুঞ্জে ভেলার উপর লতাপাতা ও ডালপালা দিয়া মাচা খাটানো হয় অথবা খড়ের গদি বানাইয়া বসিবার চৌকি বানানো হয়। মেসোপটেমিয়ার লোকেরা এখনো গোল-গোল গামলায় চড়িয়া বড়ো-বড়ো নদী পার হইয়া যায়। জলের উপর মাচা ভাসাইবার জন্য বড়ো-বড়ো জালাও সেদেশে ব্যবহার করে।

অনেক দেশেই বড়ো-বড়ো গাছের গুঁড়ি লম্বালম্বি চিরিয়া তার মাঝখানটা ফাঁপা করিয়া নৌকা বানানো হয়। যাহারা অস্ত্রের ব্যবহার জানে তাহারা চেরা গাছের পেট কুরিয়া খোল বানায়। যাহাদের সে বিদ্যাও নাই তাহারা কাঠের মাঝখানটা পোড়াইয়া পোড়াইয়া গর্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু বোধ হয়, বেশির ভাগ নৌকাই আলগা তক্তা জোড়া দিয়া বানাইতে হয়।

পুরীর সমুদ্রে জেলেরা যে কাটামারণ ব্যবহার করে, কোনো সভ্যদেশের কোনো নাবিক তাহাতে চড়িয়া সমুদ্রে নামিতে সাহস পাইবে কিনা সন্দেহ। কতগুলি আলগা কাঠ নারকেলের দড়ি দিয়া বাঁধিয়া তাহারা নৌকা বানায়, আর সেই নৌকায় চড়িয়া এক মাইল দেড় মাইল পর্যন্ত সমুদ্রে অনায়াসে চলিয়া যায়।

সমুদ্রে ব্যবহারের জন্য অনেক জাহাজের সঙ্গে বড়ো-বড়ো নৌকা লওয়া হয়। হঠাৎ জাহাজের কোনো বিপদ হইলে লোকেরা জাহাজ ছাড়িয়া নৌকায় করিয়া সমুদ্রে নামে। এই সমস্ত নৌকাকে life boat অর্থাৎ 'প্রাণ-বাঁচানো নৌকা' বলে। জাহাজ বেশিরকম জখম হইলে অনেক সময় নৌকা নামানো অসম্ভব হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বার্থ সাহেব একরকম হালকা নৌকা বানাইয়াছেন, তাহাকে মুড়িয়া রাখা যায় এবং জলে ফেলিয়া দিলে আপনি ভাসিতে থাকে। নাবিকেরা তখন তাহার আশেপাশে সাঁতরাইয়া জলের মধ্যেই নৌকা খাটাইয়া ফেলে।

এইবার আমাদেরই দেশের একটা অত্যন্ত অদ্ভুত 'নৌকা'র কথা বলিয়া শেষ করি। ভিস্তি-

ওয়ালা আস্ত জন্তুর চামড়া দিয়া যে 'মশক' বানায় সেই যে যাহার মধ্যে সে জল পুরিয়া রাখে তাহা দেখিয়াছ তো? ঐরকম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মশকে বাতাস ভরিয়া ফুটবলের মতো ফুলাইয়া পঞ্জাব অঞ্চলের লোকে অনেক সময় নদী পার হইয়া থাকে। নৌকাটির চেহারা কিরকম বীভৎস হয়, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

সন্দেশ- বৈশাখ, ১৩২৬

ব্যস্ত মানুষ

অসভ্য মানুষ যে কাজ নিজের হাতে করে, সভ্য মানুষে তারই জন্যে কলকব্জার ব্যবহার করে। গ্রীষ্মকালের এই যে গরম যার জন্য কতকাল ধরে লোকে নানারকম হাত-পাখার ব্যবহার করে এসেছে, এই গরমে কলে-চালানো বিদ্যুতের পাখা না হলে আর আজকালকার মানুষের মন ওঠে না। যে মানুষ এক সময় পায়ে হেঁটে দেশ-দেশান্তর ঘুরে বেড়াত, সেই মানুষ এখনকার যুগে গাড়ি ঘোড়া চড়েও সন্তুষ্ট নয়, কত সাইকেল মোটর ট্রাম রেল, কত বাষ্প বিদ্যুতের কারখানা করে তবে তার চলাফেরা করতে হয়। এক সময় দিনে পঞ্চাশ মাইল গেলে সে ভাবত 'খুব এসেছি'। এখন এরোপ্লেনে চড়ে ঘণ্টায় একশো মাইল গিয়েও সে বলছে, 'এখনো যথেষ্ট হয় নি।'

এই-সকল কলকব্জার দৌলতে একদিকে মানুষের সুখ হয় আরাম হয়, সময় আর পরিশ্রম বাঁচে, আর একদিকে হাঙ্গামাও বাড়ে, নূতন নূতন বিপদের কারণ দেখা দেয়। কলকারখানার চিম্‌নির ধোঁয়ায় শহরের বাতাসকে বিষাক্ত করে মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট করে; রাস্তায় মোটরের উৎপাতে নিরীহ পথিক চাপা পড়ে; জলে স্থলে আকাশে নানারকম নূতন দুর্ঘটনায় নূতন নূতন ভয়ের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তবু লাভ-লোকসানের হিসাব করে মানুষ সর্বদাই বলে 'লাভের চেয়ে লোকসান অনেক কম'। একশো বছর আগে এখান থেকে বিলাত যেতে তিন মাস চার মাস, কখনো বা আরো বেশি সময় লাগত। এখন ষোলো-সতেরো দিনে যাওয়া যায়। এরোপ্লেনের বন্দোবস্ত হলে চার-পাঁচ দিনে যাওয়া যাবে। কিন্তু সে বন্দোবস্ত হতে না হতে এখনই ভাবতে বসেছে, তার চাইতেও ভালো ব্যবস্থা সম্ভব কি না অর্থাৎ আজকে কলকাতায় ভাত খেয়ে বেরুলাম, কাল রাত্রে লণ্ডনে গিয়ে ঘুমোলাম, এইরকম বন্দোবস্ত হয় কি না!

একখানা বাড়ি বানাতে কত সময় লাগে? এখন আমেরিকায় শুনতে পাই, সাত দিনের মধ্যে নাকি বাড়ি তৈরি হয়ে যায়! যারা তৈরি করে তাদের নমুনা-মতো নক্‌শা পছন্দ করে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বেড়াও—আট-দশ দিন বাদে ঘুরে এসে দেখবে, তোমার জন্যে দিব্যি দোতলা দালান তৈরি হয়ে আছে! ঢালাই-করা পাথর জমিয়ে এই-সব বাড়ি তৈরি হয়। ঢালাই করবার জন্যে নানারকম তৈরি-ছাঁচ মজুত রাখতে হয়! বাড়ি করতে হলে আগে ছাঁচগুলো খাটিয়ে এক-একটা ফাঁপারকমের কাঠামো তৈরি হয়! তার পর সেই ছাঁচের ভিতরে পাথুরে মসলা ঢেলে দেয়। দুই দিনের মধ্যে মসলা জমে পাথর হয়ে যায়।

এইরকমে এক-একখানা আস্ত দেয়াল, আস্ত ছাদ বা মেজে তৈরি করে তার পর সেগুলোকে কল দিয়ে তুলে খাটিয়ে বসালেই বাড়ি হয়ে গেল।

এমনি করে মানুষ একদিকে কাজের সময়টাকে খুব সংক্ষেপ করে আনছে আর এক-দিকে দূরের জিনিসকে সে আর দূরে থাকতে দিচ্ছে না। পৃথিবীর এ-পিঠে আমরা বসে আছি, আর বারোহাজার মাইল দূরে ও-পিঠের মানুষরা আমেরিকায় বসে কি করছে, প্রতিদিন তার খবর পাচ্ছি। কোথায় যুদ্ধ হল, কোথায় জাহাজ ডুবল, কোথায় মানুষের কি নূতন কীর্তির কথা জানা গেল, অমনি 'সাত সমুদ্র তেরো নদী' পার হয়ে দেশ-বিদেশে খবর ছুটল—আমরা সকালে উঠে দিব্যি আরামে নিশ্চিন্তে বসে খবরের কাগজে তার সংবাদ পড়লাম। কিন্তু তাতেও কি মানুষের মন ওঠে? মানুষে চেষ্টা করছে, খবরের সঙ্গে সঙ্গে তার ছবিসুদ্ধ টেলিগ্রামে পাঠাতে। 'চেষ্টা করছে'ই বা বলি কেন--সত্যি করেই টেলিগ্রামে ছবি পাঠাবার যন্ত্র তৈরি হয়েছে! এই যন্ত্রের এক মাথায় ছবি বসিয়ে তার উপর গ্রামোফোনের মতো ছুঁচের কলম বুলিয়ে যায়, আর দুশো-আড়াইশো মাইল দূরে আরেক মাথায় সেই ছবির অবিকল নকল উঠে যায়। কয়েক বৎসর আগে বিলাতের 'ডেইলি মিরার' কাগজের জন্য লণ্ডন থেকে ম্যানচেস্টার (প্রায় দুশো মাইল দূর) এইরকম করে ছবি পাঠানো হয়েছিল। সেই সময়ে এই ছবি পাঠাতে প্রায় পনেরো মিনিট লেগেছিল। আজকাল এর চাইতেও কম সময়ে আরো ভালো ছবি পাঠাবার যন্ত্র তৈরি হয়েছে। হয়তো আরো কয়েক বছর পরে বিলাত থেকে এদেশে ছবি পাঠাবার এইরকম বন্দোবস্ত হতে পারবে। ততদিনে হয়তো বিলাতের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলবারও ব্যবস্থা হবে। তোমরা যদি কেউ সে সময়ে বিলাত যাও, তা হলে এ দেশের বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা বলা তো চলবেই, তারা তোমার চেহারা দেখতে চাইলে অমনি ছবি তুলিয়ে টেলিগ্রাম করলেই তোমার সেই দিনকার টাটকা ছবি দেখতে দেখতে এসে পড়বে।

একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক একরকম দ্রুত ডাকের যন্ত্র বানিয়েছেন, তাতে চিঠি-বোঝাই গাড়িগুলো তার-বাঁধানো বিদ্যুতের পথের উপর উড়ে উড়ে চলে! এই উড়ুক্কু গাড়ি নাকি ঘণ্টায় তিনশো মাইল বেগে ছুটতে পারে! পঞ্চাশ মণ ওজনের একটা গাড়িকে অনায়াসেই শূন্যে ঝুলিয়ে পার করা যায়! আজকালকার ডাকের গাড়ি এখান থেকে বর্ধমন যেতে না যেতেই এই গাড়ি একেবারে কাশীতে গিয়ে হাজির হবে।

পরিশ্রমের কাজ কিংবা কুলিমজুরের হাতের কাজ, যার জন্যে খুব বেশি বুদ্ধি খরচ করতে হয় না, সেগুলো নাহয় কলে করা গেল। কিন্তু মাথা ঘামিয়ে বুদ্ধি খরচ করে পদে পদে হিসাব করতে হয়, তেমন কাজ কি কলে হতে পারে? হ্যাঁ, তাও পারে—যেমন, অঙ্কের কল বা পাটিগণিত-যন্ত্র। এই যন্ত্রে বড়ো-বড়ো অঙ্কের যোগফল আপনা থেকেই বলে দেয়। বড়ো-বড়ো কারখানার জমাখরচের হিসাব এই কলের সাহায্যে চট্‌পট্‌ বার করে ফেলা হয়। কলের মধ্যে কাগজ বসিয়ে ঠিক 'টাইপরাইটারে'র মতো চাবি টিপে টিপে অঙ্কগুলো লিখে যাও—তার পর ডানদিকের হাতলখানা চেপে দিলেই আপনা থেকেই তার যোগফল কাগজের উপর ছাপা হয়ে যাবে। মানুষে হিসেব করতে গিয়ে অনেক সময়ে ভুল করে, তাড়াতাড়িতে বড়ো-বড়ো পণ্ডিত লোকেরও গোল বেধে যায়—কিন্তু কলের কাজ একেবারে

নির্ভুল। অঙ্কটা যদি ঠিকমতো দেওয়া হয়, কলের জবাবও ঠিক হবেই। কারণ কল কখনো অন্যমনস্ক হয় না—তার হুঁশিয়ারির কোনো ত্রুটি হয় না। বড়ো-বড়ো ব্যাঙ্কের হিসাব রেখে রেখে যারা পাকা হয়ে গেছে, এই কলের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে তারা পর্যন্ত হার মেনে যায়। তাদের কাজ অর্ধেকটুকু বা সিকিটুকু হতে না হতেই কলের কাজ শেষ হয়ে যায়, আর সেটা ঠিক হল কিনা তাও দুবার করে মিলিয়ে দেখবারও দরকার হয় না।

সন্দেশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬

সমুদ্রবন্ধন

মানুষ টেলিগ্রাফের কৌশল যখন আবিষ্কার করল, সে প্রায় একশো বছরের কথা। সেই সময় থেকে এই পৃথিবীটার আষ্টেপৃষ্ঠে খুঁটি মেরে তার বসিয়ে মানুষ দেশ-বিদেশে খবর চালাচালি করবার ব্যবস্থা করে আসছে। তারের পথ দিয়ে বিদ্যুতের খবর চলে; সেই তার মানুষ যেখান দিয়েই নিতে পেরেছে—সেখান দিয়েই খবর চলবার পথ খুলে গিয়েছে। কেবল ডাঙায় নয়, গভীর সমুদ্রের ভিতর দিয়েও হাজার হাজার মাইল তার পৃথিবীর এপার-ওপার জুড়ে ফেলেছে। সমুদ্রের মধ্যে খোঁটা বসাবার জো নাই, এমন কিছু নাই যার সঙ্গে তার বেঁধে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়– কাজেই সেখানে টেলিগ্রাফের তার বসাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে তারের দুই মাথা ডাঙায় রেখে বাকি সমস্ত তারটিকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া।

সত্তর বৎসর আগে যখন এইরকমভাবে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের তারের যোগ করবার প্রস্তাব হয়েছিল তখন লোকে সেটাকে পাগলের প্রস্তাব বলে ঠাট্টা করেছিল। অথচ এখন তার চাইতে বড়ো-বড়ো, একটি নয়, দুটি নয়, অন্তত দুহাজার টেলিগ্রাফের লাইন সমুদ্রের নীচে বসানো হয়েছে। মানুষের যত বড়ো-বড়ো কীর্তি আছে তার মধ্যে এই সমুদ্রবন্ধনের কীর্তিটা বোধ হয় কারও চাইতে কম আশ্চর্য নয়। এর জন্য মানুষকে যে কতরকম বাধা-বিপদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে তা আর বলে শেষ করা যায় না। ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্সের মধ্যে পচিশ-ত্রিশ মাইল সমুদ্রের ফারাক; সে সমুদ্রও খুব গভীর নয়। ১৮৫০ খৃস্টাব্দে অনেক হাজার টাকা খরচ করে এইটুকু সমুদ্রের মধ্যে তার ফেলা হল আর সেই তার দিয়ে এপার-ওপার খবর চলাচল হল—তখন টেলিগ্রাফ কোম্পানির মনে খুবই উৎসাহ হয়েছিল। কিন্তু সে উৎসাহ চব্বিশ ঘণ্টার বেশি থাকে নি। কারণ, একটা দিন যেতে না যেতেই জেলে জাহাজের জালের টানেই তারের লাইন ছিঁড়ে গিয়ে খবর আসা বন্ধ হয়ে গেল। পরের বছর আবার দুইলক্ষ টাকা খরচ করে অনেক কষ্টে আরো মোটা আর মজবুত তার বানিয়ে নূতন লাইন বসানো হল। সেই তারে অনেকদিন বেশ কাজ চলবার পর লোকের মনে বিশ্বাস হল যে—হ্যাঁ, ছোটোখাটো সমুদ্রের মধ্যে তার বসানো চলতে পারে।

পরের বৎসর ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড থেকে আয়ার্ল্যাণ্ড পর্যন্ত টেলিগ্রাফের লাইন বসাবার জন্য তিনবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তিনবারই সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দুবার জোয়ার-

ভাঁটার বিষম টানে পাহাড়ের গায়ে আছাড় খেয়ে খেয়ে তারের লাইন ভেঙেচুরে ভেসে গেল। আর তৃতীয়বারে তারের জাহাজ সমুদ্রের ওপারে পৌঁছবার আগেই সব তার ফুরিয়ে গেল—তারের আগাটা সমুদ্রেই প'ড়ে গেল—আয়ার্ল্যাণ্ড পর্যন্ত আর পৌঁছলই না। যা হোক, চতুর্থবারের চেণ্টায় আইরিশ সমুদ্রের ভিতর দিয়ে নিরাপদে তারের লাইন বসানো হল। তার পর দেখতে দেখতে পাঁচ-দশ বছরের মধ্যে ইউরোপে আমেরিকায় অনেক দেশেই সমুদ্রের ভিতরে, পঁচিশ-পঞ্চাশ বা একশো মাইল পর্যন্ত লম্বা তার বসানো হয়ে গেল। তখন ইংল্যাণ্ডের এক টেলিগ্রাফ কোম্পানি সাহস করে বলল, "আমরা অতলান্তিক মহাসাগরের ভিতর দিয়ে ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকা পর্যন্ত টেলিগ্রাফের তার বসাব।"

লোকে বলল, "সে কি কথা! অতলান্তিকের ওপার যে দুহাজার মাইল দূর! সেখানকার সমুদ্র যে তিন মাইল গভীর! সমুদ্রের নীচটা উঁচুনিচু পাহাড়ের মতো, তাতেই যে হাজার মাইল তার খেয়ে যাবে! অসম্ভব লম্বা তার, অসম্ভবরকম ভারী, করাতে অসম্ভব খরচ—সবই অসম্ভব!" কিন্তু টেলিগ্রাফ কোম্পানির যাঁরা পাণ্ডা তাঁরা কোমর বেঁধে বসলেন, অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। কোম্পানির মূলধন হল পঞ্চাশ-লক্ষ টাকা। একুশহাজার মাইল লম্বা তামার তারকে দড়ির মতন পাকিয়ে পাকিয়ে, তার উপর আঙুলের মতো পুরু করে রবারের প্রলেপ দিয়ে, তার উপর সাড়ে তিনলক্ষ মাইল লোহার তার পেঁচিয়ে টেলিগ্রাফের লাইন তৈরি হল। এই সমস্ত তার যদি একটানা সোজা করে বসানো হত, তা হলে পৃথিবীটাকে প্রায় চোদ্দোবার পাক দিয়ে বেঁধে ফেলা যেত—কিংবা এখান থেকে চাঁদ পর্যন্ত পৌঁছানো যেত! লাইনের ভিতরকার তামার তারটুকু দিয়েই বিদ্যুৎ চলে; রবারের কাজ কেবল বিদ্যুৎটাকে তারের মধ্যে আটকে রাখা। লোহার প্যাঁচালো তারটুকু হল বর্ম। ওটা না থাকলে পাহাড়ের ঘষায় স্রোতের ধাক্কায় জলজন্তুর উৎপাতে দুদিনে তার নণ্ট হয়ে যায়—গভীর জলে লাইন বসাতে গিয়ে আপনার ভারে তার আপনি ছিঁড়ে যায়। সমস্ত লাইনটির ওজন হল সত্তরহাজার মণ।

১৮৫৭ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দুই জাহাজে বোঝাই তার আমেরিকার দিকে রওনা হল। তারের এক মাথা আয়ার্ল্যাণ্ডের তীরের উপর রেখে কোম্পানির জাহাজ পশ্চিম মুখে তার ফেলতে ফেলতে চলল। বড়ো-বড়ো চৌবাচ্চার মধ্যে তারের কুণ্ডলী জড়ানো রয়েছে। ক্রমাগত ঘষায় ঘষায় তারের লাইন গরম হয়ে ওঠে, তাই চৌবাচ্চায় জল ভরে রাখতে হয়। জাহাজের উপর 'ব্রেক' বসানো, তাতে তারটাকে ওজনমতো টেনে ধরে—পাছে হুড়্‌হুড়্ করে সব তার বেরিয়ে যায়। জাহাজ যদি ঘণ্টায় পাঁচ মাইল যায়, তা হলে সমুদ্রের উঁচুনিচু হিসাব বুঝে, ঘণ্টায় ছয় মাইল কি সাত মাইল তার ছাড়তে হয়। আবার বেশি টান পড়লে পাছে তার ছিঁড়ে যায় সেজন্যে তারের 'টান' মাপবার জন্য একটা যন্ত্র আছে। টান বেশি হলেই ব্রেক ঢিলা করে দেয়। তারের ভিতর দিয়ে দিনরাত ডাঙার সঙ্গে জাহাজের সংকেত চলতে থাকে। হঠাৎ কোথাও তার ছিঁড়ে গেলে বা জখম হলে অমনি সে সংকেত বন্ধ হয়ে যায়। তা হলেই জাহাজের লোকেরা বুঝতে পারে কোথাও কিছু গোলমাল হয়েছে। তখন আবার তার গুটিয়ে গুটিয়ে, সেই জখম জায়গা পর্যন্ত ফিরে গিয়ে, নণ্ট লাইন মেরামত করতে হয়।

এমনি সমস্ত আয়োজন করে কোম্পানির জাহাজ রওনা হল। কিন্তু পাঁচ মাইল যেতে না যেতেই হঠাৎ কোথায় টান লেগে তারের লাইন ছিঁড়ে গেল। তখন ফিরে এসে তীরের দিক থেকে সমস্ত তারটিকে টেনে টেনে, তার ভাঙা মুখ বার করে তার সঙ্গে নূতন তার জুড়ে জাহাজ আবার পশ্চিমে চলল। দু-তিন দিন নিরাপদে চলতে চলতে প্রায় চারশো মাইল তার বসাবার পর হঠাৎ ব্রেক কষাবার দোষে তার ছিঁড়ে আড়াই মাইল গভীর সমুদ্রে তলিয়ে গেল। জাহাজের লোকে হতাশ হয়ে বন্দরে ফিরে চলল, কোম্পানির সাড়ে তিনলক্ষ টাকার মাল (চারশো মাইল তার) সমুদ্রের নীচেই পড়ে রইল।

পরের বৎসর আবার নূতন করে চেষ্টা আরম্ভ হল। এবার স্থির হল এই যে, সমুদ্রের মাঝখানে দুই জাহাজের তারের মুখ একত্র করে তার পর দুই জাহাজ দুই দিকে তার বসিয়ে চলবে—একটা যাবে আমেরিকার দিকে, আরেকটা আয়ার্ল্যাণ্ডের দিকে। মাঝসমুদ্রে যাবার পথে এমন ঝড় উঠল যে তেমন ঝড় খুব কমই দেখা যায়। সপ্তাহ ভরে ঝড়ের আর বিরাম নাই। তারের ভারে বোঝাই জাহাজ ঝড়ের ধাক্কায় ডোবে-ডোবে অবস্থায় সমুদ্রের মধ্যে নিরুপায় হয়ে মাতালের মতো টলতে লাগল। অনেক কষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে ষোলো দিন পর তারা মাঝ সমুদ্রে হাজির হল। তার পর এর-লাইন ওর-লাইনে জুড়ে দিয়ে তারা দুইজনে দুই মুখে চলল। তারের ভিতর দিয়ে এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজ পর্যন্ত বিদ্যুতের সংকেত চলছে—কিন্তু চল্লিশ মাইল পার না হতেই হঠাৎ সংকেত বন্ধ হয়ে গেল, এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজের কোনো সাড়াই পাওয়া যায় না। আবার দুই জাহাজ মুখোমুখি হয়ে তারের সঙ্গে তার জুড়ে দুই দিকে ছুটল। এবারের দৌড় একশো মাইল। তার পরেই আর সাড়াশব্দ নাই—আবার কোথায় লাইন ফেঁসে গেছে! আরম্ভেই দুই-দুইবার ব্যাঘাত পেয়ে আর নানারকমে নাকাল হয়ে জাহাজ আবার নিরাশ হয়ে ফিরে এল। লাভের মধ্যে, 'কোম্পানিকা মাল, দরিয়ামে ঢাল।'

এইবার কোম্পানির উৎসাহ প্রায় নিভে এসেছিল। অনেকেই পরামর্শ দিলেন যে, এ অসম্ভব কাজের পিছনে আর অনর্থক টাকা নষ্ট করা উচিত নয়। কোম্পানির বড়ো-বড়ো পাণ্ডারা পর্যন্ত বলতে লাগলেন, এখন তারের লোহালক্কড় সব বিক্রি করে টেলিগ্রাফ কোম্পানির কারবার বন্ধ করে দেওয়াই ভালো। কেবল দু-একজন উৎসাহী লোক বলল যে, তারা এখনো হার মানতে প্রস্তুত নয়। শেষটায় সেই দু-একজনেরই বিশেষ চেষ্টায় সেই বছরেই আর একবার প্রাণপণ আয়োজন করে, অনেকরকম হাঙ্গামার পর আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে আমেরিকা পর্যন্ত নিরাপদে লাইন বসানো হল—টেলিগ্রাফ কোম্পানির জয়-জয়কার পড়ে গেল। তখন এদেশের সিপাহী বিদ্রোহ সবেমাত্র শেষ হয়েছে—কিন্তু সে খবর তখনও আমেরিকায় পৌঁছায় নি। বিদ্রোহের জন্য কানাডা থেকে দুই দল ইংরাজ সৈন্য এ দেশে আসবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। তারের লাইন বসানো হতেই ইংল্যাণ্ড থেকে খবর গেল, 'সৈন্য পাঠাবার দরকার নাই।' ঐ খবর যদি না যেত তা হলে মিছামিছি সৈন্য পাঠিয়ে, গভর্নমেণ্টের অন্তত সাতলক্ষ টাকা খামখা বাজে খরচ হয়ে যেত। এই কথাটা প্রচার হওয়াতে টেলিগ্রাফ কোম্পানির খুব বিজ্ঞাপন হয়ে গেল। সমুদ্র পার করে টেলিগ্রাফ

পাঠাবার সুবিধা যে কি, মানুষকে তা বোঝাবার জন্য আর বেশি ব্যাখ্যা বা বক্তৃতার দরকার হল না। তুমুল উৎসাহে টেলিগ্রাফ কোম্পানির ব্যবসার আরম্ভ হল।

কিন্তু হায়! কয়েক সপ্তাহ যেতে না যেতেই টেলিগ্রাফের সাড়া ক্ষীণ হতে হতে একদিন একেবারেই সব বন্ধ হয়ে গেল—এপারের বিদ্যুৎ আর ওপারে পৌঁছায়ই না। এত সাধের টেলিগ্রাফ-লাইন, তার কিনা এই অকাল মৃত্যু—তিন মাসও তার আয়ু হল না। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করে বললেন যে, তারের মধ্যে যে বিদ্যুৎ চালানো হয়েছে—সেই বিদ্যুতের তেজ খুব বেশি হওয়াতেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

তার পর সাত বৎসর গেল আবার নূতন করে লাইন বসাবার আয়োজন করতে। অনেকরকম আলোচনা আর পরীক্ষার পর, আরো মজবুত করে নূতন তার তৈরি হল। সেই তারের লাইন প্রকাণ্ড এক জাহাজে করে সমুদ্রে পাঠানো হল। জাহাজ চুয়াল্লিশ মাইল সমুদ্র পার হতেই বোঝা গেল, তারের মধ্যে কোথাও গলদ রয়ে গেছে। সেটা খুঁজে মেরামত করে তার পর সাতশো মাইল পর্যন্ত বিনা উৎপাতে গিয়ে আবার এক মারাত্মক গলদ। আবার অনেক মাইল তার গুটিয়ে নিয়ে তার পর এক জায়গায় প্রকাণ্ড জখম পাওয়া গেল। সেইটুকু দেখে মেরামত করতে প্রায় দশ ঘণ্টা সময় নষ্ট হল। প্রায় বারশো মাইল যাবার পর আবার সেইরকম বাধা। আবার সেই গভীর সমুদ্র থেকে তার টেনে তুলে, কোথায় দোষ আছে খুঁজে বার করে মেরামত করতে হবে। কিন্তু এবারে মাইলখানেক তার গুটিয়ে তুলতেই বাকি তারটুকু চোখের সামনেই পট্ করে ছিঁড়ে জলের মধ্যে ফস্কে পড়ল।

জাহাজের কর্তারা পরামর্শ করলেন, আঁকড়শি দিয়ে ঐ তার তুলতে হবে। প্রকাণ্ড লোহার শিকলের আগায় অদ্ভুত নখওয়ালা যন্ত্র ঝুলিয়ে, তাই দিয়ে নাবিকেরা সমুদ্রের তলায় হাতড়াতে লাগল। একবার মনে হল আঁকড়শিতে তার আঁক্‌ড়িয়েছে—অমনি টানাটানির ধুম পড়ে গেল। প্রায় আড়াই মাইল গভীর সমুদ্র, তার নীচ পর্যন্ত শিকল নেমেছে, সে শিকল গুটিয়ে তোলা কি সহজ কথা! এক হাত দু হাত, দশ হাত বিশ হাত, একশো হাত দুশো হাত, এমনি করে প্রায় মাইলখানেক শিকল তুলবার পর তারে-গাঁথা আঁকড়শিসুদ্ধ দেড়মাইল শিকল ছিঁড়ে জলের মধ্যে অন্তর্ধান! তখন মোটা শনের দড়ি দিয়ে আবার সমুদ্রের মধ্যে নূতন করে আঁকড়শি ফেলা হল। তিন-চারদিন ক্রমাগত চেষ্টার পর আবার তারের লাইন আঁকড়িয়ে পাওয়া গেল। কিন্তু এবারেও তুলবার সময় তারের ভারে দড়িদড়া সব ছিঁড়ে আঁকড়শিটা জলের ভিতর তলিয়ে গেল। তার পর আরো দুইখানা আঁকড়শি এইরকমে হারিয়ে জাহাজের শিকল দড়ি সব প্রায় শেষ করে ইংল্যাণ্ডের জাহাজ ইংল্যাণ্ডেই ফিরে চলল।

এতদিনের আশা ভরসার পর এইরকম দুঃসংবাদ! কিন্তু মানুষের প্রতিজ্ঞার কি জোর! পরের বৎসর (১৮৬৬) সেই জাহাজ আবার নূতন তার বোঝাই করে নূতন উৎসাহে সমুদ্রে বেরুল—দুই সপ্তাহের মধ্যে সে জাহাজ সারা সমুদ্র লাইন বসিয়ে আমেরিকার টেলিগ্রাফ স্টেশন পর্যন্ত তার জুড়ে ফেলল। তখনকার আনন্দের কথা বর্ণনায় শেষ করা যায় না। কোম্পানির একজন এঞ্জিনিয়ার সে সময়ে লিখেছিলেন, "যখন

তার বসানো শেষ হল, তোপের গর্জন আর মানুষের আনন্দধ্বনির মধ্যে জাহাজের নাবিকেরা পাগলের মতো চীৎকার করতে লাগল, তখন গৌরবে আমারও শরীরের রক্ত প্রবল বেগে আমার বুকের মধ্যে তোলপাড় করছিল। কতগুলো লোক লাইনের তার ধরে নেচে নেচে গাইতে লাগল। কেউ কেউ পাগলের মতো তারটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল। চোখের জলে আনন্দের কোলাহলে হাসিকান্না সব মিশিয়ে সকলে মিলে মহোৎসব লাগিয়ে দিল।"

এখানেও তাদের উৎসাহের শেষ হয় নি। সেই জাহাজ আবার ফিরে গিয়ে আঠারো দিন অজানা সমুদ্রের ভিতর হাতড়িয়ে, আগেরবারের সেই হারানো লাইন উদ্ধার করে, সেই লাইনকেও আমেরিকা পর্যন্ত পৌঁছে দিল। এতদিনে, প্রায় চারকোটি টাকা নষ্ট করবার পর, কোম্পানির কারবারের পাকা প্রতিষ্ঠা হল।

সন্দেশ—আষাঢ়, ১৩২৬

শনির দেশে

কেউ যদি বলে যে, এই পৃথিবীর বাইরে যেখানে বলবে, সেখানে নিয়ে তোমাদের তামাশা দেখিয়ে আনবে—তা হলে তোমরা কোথায় যেতে চাও? আমি জানি, সেরকম হলে আমি নিশ্চয় শনিগ্রহে যেতে চাইব। পৃথিবীর আকাশে আমরা শুধু চোখে যতটুকু দেখতে পাই, তাতে মনে হয় যে, সব চাইতে সুন্দর জিনিস হল চাঁদ। সেখানে একবার যেতে পারলে আর কিছু না হোক, এই পৃথিবীটাকে কেমন মস্ত আর জমকাল চাঁদের মতো দেখায়, সেটা নিশ্চয়ই একটা দেখবার মতো জিনিস। কিন্তু শনিগ্রহে যাবার পথে সেটা আমরা দেখে নিতে পারব।

যাক, মনে কর যেন শনিগ্রহে যাত্রা করাই স্থির হল। মনে কর এমন আশ্চর্য আকাশ-জাহাজ তৈরি হল যাতে পৃথিবী ছেড়ে, পৃথিবীর বাতাস ছেড়ে ফাঁকা শূন্যের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া যায়। তোমার বয়স কত? দশ বৎসর? বেশ তা হলে ১৯১৯ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে আমরা স্বপ্ন-জাহাজে রওনা হলাম শনিগ্রহে যাবার জন্য। আমাদের জাহাজটা মনে কর খুব দ্রুত এরোপ্লেনের মতো ঘণ্টায় একশো মাইল বা একশো পঁচিশ মাইল করে চলে।

আমরা আকাশের ভিতর দিয়ে হু হু করে চলেছি আর পৃথিবীর ঘরবাড়ি সব ছোটো হতে হতে একে একে মিলিয়ে যাচ্ছে। বড়ো-বড়ো শহর, বড়ো-বড়ো নদী, সব বিন্দুর মতো, রেখার মতো হয়ে আসছে। এই গোল পৃথিবীর গায়ে পাহাড় সমুদ্র, দেশ মহাদেশ ক্রমে সব অতি নিখুঁত মানচিত্রের মতো দেখা যাচ্ছে। ঐ ফ্যাকাশে হলদে মরুভূমি, ঐ ঘন সবুজ বন, ঐ ছেয়ে-নীল সমুদ্র, ঐ সাদা সাদা বরফের দেশ। নভেম্বর মাসে আমরা, এখান থেকে চাঁদ যতদূর, ততদূর চলে গিয়েছি। এক বছরে ১৯২০ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে আমরা প্রায় দশলক্ষ মাইল এসে পড়েছি। পৃথিবী থেকে চাঁদটাকে যেমন দেখি এখন পৃথিবীটাকে

ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে। হিমালয় পাহাড়কেও আর পাহাড় বলে ভালো বোঝাই যাচ্ছে না। চাঁদের যেমন অমাবস্যা পূর্ণিমা হয়, দিনে দিনে কলায় কলায় বাড়ে কমে, পৃথিবীরও ঠিক তেমনি। এমনি করে বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে, কিন্তু কই? শনিগ্রহ তো একটুও কাছে আসছে বলে মনে হয় না। শুনেছিলাম সে এক প্রকাণ্ড গ্রহ, তার চারিদিকে আংটি ঘেরা। কিন্তু তোমার তো বিশ বছর বয়স হল, গোঁফদাড়ি বেরিয়ে গেল, এখনো তো সে-সবের কিছুই দেখা গেল না! ঐ লাল রঙের মঙ্গলগ্রহটা যেন একটুখানি কাছে এসেছে, কিন্তু সেও তো খুব বেশি নয়। আমাদের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতটি বলছেন, মঙ্গল পর্যন্ত পৌঁছতে আরো চল্লিশ বৎসর লাগবে। ও হরি! তা হলে শনিতে পৌঁছব কবে? শনি পর্যন্ত যেতে লাগবে প্রায় আটশো বৎসর! তা হলে উপায়? একমাত্র উপায়, আরো বেগে যাওয়া। আরো পাঁচ গুণ দশ গুণ বিশ গুণ বেগে কামানের গোলার মতো বেগে ঘণ্টায় দুহাজার মাইল বেগে ছুটতে হবে। তাই ছোটা যাক।

আরো দুই বৎসরে মঙ্গল পর্যন্ত এসে পড়া গেল। ওখানে গিয়ে একবার নামলে মন্দ হত না। ঐ লম্বা-লম্বা আঁচড়গুলা সত্যিকারের খাল কিনা, ওখানে সত্যি সত্যি বুদ্ধিমান জীব কেউ আছে কিনা, একটিবার খবর নেওয়া যেত। কিন্তু আমাদের তো অত অবসর নেই, যেমনভাবে চলছি এমনি করে চললেও শনিতে পৌঁছতে আরো অন্তত চল্লিশ বৎসর লাগবে। সুতরাং সোজা চলতে থাকি।

মঙ্গলের পথ পার হয়ে এখন বৃহস্পতির দিকে চলেছি। মাঝে মাঝে ছোটো-বড়ো গোলার মতো ওগুলো কি সামনে দিয়ে হুস্ করে ছুটে পালাচ্ছে? কোনোটা দশ মাইল, বিশ মাইল, কোনোটা একশো মাইল বা দুশো মাইল চওড়া—আবার কোনোটা ছোটোখাটো টিপির মতন বড়ো, কোনো কোনোটা সামান্য গুলি-গোলার মতো। এরা সবাই গ্রহ। যে নিয়মে বড়ো-বড়ো গ্রহেরা সূর্যের চারিদিকে চক্র দিয়ে ঘোরে—এরাও প্রত্যেকেই, এমন-কি, যেগুলি ধূলিকণার মতো ছোটো সেগুলিও, ঠিক সেই নিয়মেই নিজের নিজের পথে নিজের নিজের তাল বজায় রেখে সূর্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়।

এমনি করে ছুটতে ছুটতে আরো দশ বৎসর কেটে গেল, ছোটো-ছোটো গ্রহগুলিকে আর যেন দেখাই যায় না। পৃথিবী সূর্যের আশেপাশে মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে। সূর্যও দেখতে অনেকখানি ছোট্টো হয়ে গেছে—সেই পৃথিবীর সূর্য আর এই সূর্য যেন ফুটবলটার কাছে একটি ক্রিকেট বল। ক্রমে আরো আট-দশ বছর ছুটে, গ্রহরাজ বৃহস্পতির চক্রপথের সীমানায় এসে হাজির হওয়া গেল। কোথায় পৃথিবী আর কোথায় বৃহস্পতি। তিনশো-পঁয়ষট্টি দিনে পৃথিবীর এক বৎসর—কিন্তু বৃহস্পতি যে প্রকাণ্ড পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেই পথে একবার পাড়ি দিতে তার প্রায় বারো বৎসর সময় লাগে। ধোঁয়ায় ঢাকা প্রকাণ্ড শরীর—তার মধ্যে হাজার খানেক পৃথিবীকে অনায়াসেই পুরে রাখা যায়। অথচ এই বিপুল দেহ নিয়ে গ্রহরাজকে লাটিমের মতো ঘোরপাক খেতে হচ্ছে। এ কাজটি করতে পৃথিবীর চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগে, কিন্তু বৃহস্পতির দশ ঘণ্টাও লাগে না। বৃহস্পতির চারিদিকে সাত-আটটি চাঁদ—তার মধ্যে চারটি বেশ বড়ো-বড়ো—তিনটি আমাদের চাঁদের চাইতেও বড়ো।

বৃহস্পতির এলাকা পার হয়েছি। শনির আলো ক্রমে আরো উজ্জ্বল হয়ে আসছে।

—ক্রমে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, তার চেহারাটা ঠিক অন্য গ্রহের মতো নয়। মনে হয় কেমন যেন লম্বাটে মতন—দুপাশে যেন কি বেরিয়ে আছে। আরো কাছে গিয়ে দেখ তার গায়ের চমৎকার আংটিটা ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠছে। পৃথিবী থেকে ছোটোখাটো দুরবীন দিয়ে যেমন দেখেছি এখন শুধু চোখেই সেইরকম দেখতে পাচ্ছি। আংটিটা বাসনের কানার মতো, উকিলের শাম্‌লার ঘেরের মতো—খুব পাতলা আর চওড়া। শনিগ্রহকে আমরা যে দেখি, সব সময়ে ঠিক একরকম দেখি না—কখনো একটু উঁচু থেকে, কখনো একটু নিচু থেকে, কখনো আংটির উপর দিকটা, কখনো তার তলাটা, কখনো সামনে ঝোঁকা, কখনো পিছন-হেলান। যখন ঠিক খাড়াভাবে আংটির কিনারা থেকে দেখি, তখন আংটিটাকে দেখি সরু একটি রেখার মতো—এত সরু যে খুব বড়ো দুরবীন না হলে দেখাই যায় না।

প্রায় চল্লিশ বৎসর হল আমরা পৃথিবী ছেড়েছি—এখন আর আট-দশ বৎসর গেলে আমরা শনিতে পৌঁছব। ততদিনে তোমার চুল দাড়ি গোঁফ সব পেকে যাবে—তুমি ষাট বছরের বুড়ো হয়ে যাবে! শনিকে অনেকখানি ডাইনে রেখে আমরা ছুটে চলেছি। শনিও ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে ঐ বাঁয়ের দিকে ছুটে আসছে, আর কয়েক বৎসর পরে সে ঠিক আমাদের সামনে এসে হাজির হবে। সেও কিনা সূর্যের প্রজা, কাজেই সূর্যের চারিদিকে তাকেও প্রদক্ষিণ করতে হয়। কিন্তু আমাদের উনত্রিশটা বছরেও তার একটা পাক পুরো হয় না।

যাক—এতদিনে পথের শেষ হয়েছে; আমরা শনিগ্রহের উপরে এসে পৌঁছেছি। 'আংটি'টার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, আকাশের উপর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত যেন আলোর খিলান গেঁথে দিয়েছে। খিলানের মধ্যে খিলান, তার মধ্যে ঝাপসা আলোর আরেকটি খিলান। তার উপর আবার শনিগ্রহের ছায়া পড়েছে। সূর্যের এই প্রকাণ্ড রাজত্বের মধ্যে যতদূর যাও, এমন দৃশ্য আর কোথাও দেখবে না—আমাদের পৃথিবীর দুরবীনের দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যায়, এমন জিনিস আর দ্বিতীয় কোথাও পাওয়া যায় নি।

আকাশে কত চাঁদ! একটি নয়, দুটি নয়, একেবারে আট-দশটা চাঁদ—ছোটো-বড়ো মাঝারি নানারকমের! সওয়া দশ ঘণ্টায় এখানকার দিনরাত—ঘুমের পক্ষে ভারি অসুবিধা। দিনটাও তেমনি—পৃথিবীর রোদ এখানকার চাইতে একশো গুণ কড়া। পৃথিবী থেকে সূর্যকে যদি চায়ের পিরিচের মতো বড়ো দেখায়, তবে এখান থেকে তাকে দেখায় যেন আধুলিটার মতো। যখন তখন চন্দ্রগ্রহণ আর সূর্যগ্রহণ তো লেগেই আছে; তার উপর আবার থেকে থেকে চাঁদে চাঁদেও গ্রহণ লেগে যায়, এক চাঁদ আর-এক চাঁদকে ঢেকে ফেলে। এখানকার জন্য যদি পঞ্জিকা তৈরি করতে হয়, তবে তার মধ্যে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কেবল গ্রহণের হিসাব লিখতেই কেটে যাবে।

আংটিগুলি যেন অসংখ্য চাঁদের ঝাঁক- ছোটো-ছোটো ঢিপির মতো, পাথরের ঢেলার মতো, কাঁকরের কুচির মতো, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি চাঁদ কেউ কারও গায়ে ঠেকে না, আশ্চর্য নিয়মে প্রত্যেকে নিজের পথে শনিকে প্রদক্ষিণ করছে। আর সমস্তে মিলে আশ্চর্য সুন্দর আংটির মতো চেহারা হয়েছে।

এখন অসুবিধার কথাটাও একটু ভাবা উচিত। গরম বাতাস আর ধোঁয়ার ঝড় তো

এখানে আছেই। তার উপর সবচাইতে অসুবিধা এখানে দাঁড়াবার মতো ডাঙা পাবার জো নাই—ডাঙা খুঁজতে গেলে অনেক হাজার মাইল গভীর গরম ধোঁয়াটে মেঘের সমুদ্রের মধ্যে ডুব দিতে হবে। সেই মেঘের মধ্যে জীবজন্তু কেউ বাঁচতে পারে কিনা খুবই সন্দেহ। সুতরাং এখন ফিরবার উপায় দেখতে হবে।

এসেছিলাম কামানের গোলার মতন বেগে—কিন্তু তার চাইতেও তাড়াতাড়ি চলা যায় কি? আলো চলে সবচাইতে তাড়াতাড়ি—প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় একলক্ষ নব্বইহাজার মাইল। তা হলে সেইরকম বেগে আলোর সওয়ার হয়ে ছোটা যাক। পৃথিবীতে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে? এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট।

সন্দেশ—শ্রাবণ, ১৩২৬

লোহা

যে-সমস্ত জিনিস মানুষে সর্বদা ব্যবহার করে, আজ যদি হঠাৎ তাহার কোনোটির অভাব পড়িয়া যায়, তাহা হইলে ঠিক বোঝা যায়, কোন জিনিসটার যথার্থ মূল্য কতখানি। সোনা রূপা মণি মুক্তা সব যদি হঠাৎ একদিন পৃথিবী হইতে লোপ পায়, তবে অনেক শৌখিন লোকে হা-হুতাশ করিবে মানুষের টাকা-পয়সার কারবারের বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইবে, রূপার অভাবে ফটোগ্রাফের ব্যবসা প্রায় বন্ধ হইয়া আসিবে এবং ছোটো-খাটো অনেকরকমের অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। কিন্তু তবু মানুষের জীবনযাত্রার কোনো ব্যাঘাত হইবে না। বড়ো-বড়ো ব্যবসা-বাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা যেমন চলিতেছিল, অনেকটা সেইরকমই চলিতে থাকিবে। কিন্তু তেমনিভাবে যদি লোহার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তবে অবস্থাটা আরো মারাত্মক হইবে। মানুষের কলকারখানা রেলপুল জাহাজ প্রভৃতি, সভ্যদেশে যাহা কিছু না হইলে চলে না, তাহার সমস্তই বন্ধ হইয়া আসিবে। মানুষের যে-কোনো অস্ত্র বা যে-কোনো যন্ত্র বল- বড়ো-বড়ো কামান, এঞ্জিন বা মোটর হইতে লাঙল কোদাল কাঁটা পেরেক পর্যন্ত- সবটাতেই লোহার দরকার হয়। যার মধ্যে লোহা নাই এমনও অসংখ্য জিনিস তৈয়ারি করিবার সময়ে লোহার যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। যে জিনিসে তাহারও দরকার হয় না, যেমন অনেক ডাক্তারি ওষুধ, সেখানেও অনেক সময়েই কয়লার চুল্লি জ্বালিতে হয় এবং সেই কয়লা ভাঙিয়া উঠাইবার জন্য খনিতে লোহার কোদাল আর অনেক কলকব্জার দরকার হয়। মানুষের সকলরকম কাজে যে-সমস্ত তৈজস বা বাসনপত্রের দরকার হয়, তাহার সমস্তই খনিজ জিনিসের তৈয়ারি। সেই-সমস্ত জিনিস সংগ্রহ করিয়া তাহাকে কাজের উপযোগী করিয়া গড়িতেও লোহার দরকার হয়। ঘরের দরজা জানলা, কড়ি বরগা, আসবাবপত্র, এ-সমস্ত কাঠের তৈয়ারি হইতে পারে, কিন্তু সেই কাঠকে কাটিয়া চিরিয়া চাঁচিয়া ঘষিয়া দরকারমতো গড়িয়া লইবার জন্য পদে পদেই লোহার কুড়াল করাত রঁ্যাদা বাটালি প্রভৃতি যন্ত্রের দরকার হয়।

পৃথিবীতে এমন দেশ নাই যেখানে লোহা পাওয়া যায় না। পথে ঘাটে, মাটিতে

জলেতে, খুঁজিতে গেলে সর্বত্রই লোহা পাওয়া যায়। অথচ এক সময়ে লোকে লোহার ব্যবহার জানিত না, লোহা তৈয়ারি করিতে পারিত না। জল লাগিলে লোহায় মরিচা ধরিয়া যায়; লোহাধাতু আর লোহার মরিচা, দুটা এক জিনিস নয়। কিন্তু মরিচা বা 'লৌহমল' নানারকমে 'শোধন' করিয়া তাহা হইতে আবার খাঁটি লোহা বাহির করা যায়। যে-সমস্ত খনিজ জিনিস হইতে লোহা তৈয়ারি করা হয়, সেগুলিও এইরকম মরিচা-জাতীয় জিনিস, অনেক হাঙ্গামা করিয়া তাহাদের শোধন না করিলে তাহা হইতে লোহা বাহির হয় না। সোনা রূপা ও তামা অনেক সময়ে খাঁটি ধাতুর আকারেও পাওয়া যায় এবং খনিজ অবস্থায় তাহাদের শোধনও লোহার চাইতে অনেক সহজ। সেইজন্য তামা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার শিখিবার পরেও মানুষে অনেকদিন পর্যন্ত লোহা বানাইবার কৌশল বাহির করিতে পারে নাই।

একবার যদি কোথাও কোনো লোহা বানাইবার কারখানায় যাও, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে লোহার মতো সামান্য জিনিসের জন্যও মানুষকে কতখানি চিন্তা পরিশ্রম ও হাঙ্গামা করিতে হয়। আমাদের দেশে সাক্‌চিতে টাটা কোম্পানির লোহার কারখানা আছে—সেখানে প্রতি বৎসর হাজার হাজার মণ লোহা আর ইস্পাত তৈয়ারি হয়। প্রকাণ্ড চিমনির মতো বড়ো-বড়ো পাথরের চুল্লি, তাহার মধ্যে সারাদিন সারারাত আগুনের আর বিশ্রাম নাই। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, রাবণের চিতার মতো সে আগুন জ্বলিতেই থাকে। একবার আগুন নিভিয়া গেলেই হাজার হাজার টাকার চুল্লি ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইবে। তাই দিনরাত সেখানে কাজ চলিতেছে, চিমনির মুখ দিয়া আগুনের লাল জিভ সারাক্ষণ আকাশকে রাঙাইয়া তুলিতেছে। মাঝে মাঝে চুল্লির ঢাকনি খুলিয়া, গাড়ি-বোঝাই কয়লা-মিশানো লৌহখনিজের মসলা চুল্লির মধ্যে ঢালিয়া দেয়—একেবারে বিশ-ত্রিশ বা একশো-দুশো মণ। চুল্লির মধ্যে সেই-সমস্ত মসলা গলিয়া পুড়িয়া তরল লোহা হইয়া জমিতে থাকে। মাঝে মাঝে চুল্লির নর্দমা দিয়া লোহার ময়লা 'গাদ' বাহির করিয়া দিতে হয়। দরকার মতো শোধন হইলে পর পাশের একটা নল খুলিয়া তরল লোহা ঢালিয়া ফেলিতে হয়।

পৃথিবীতে যত লোহার কারখানা আছে, তাহাতে প্রতি বৎসর তিনশো কোটি মণ লোহা তৈয়ার হয়। এবং বছর বছর ইহার পরিমাণ বাড়িয়াই চলিয়াছে। লোহা নানা-রকমের হয়। যে লোহা ঢালাই করিয়া সাধারণত কড়ি বরগা শিক প্রভৃতি তৈয়ারি হয় আর যে ইস্পাত লোহা ক্ষুর বা তলোয়ারের জন্য ব্যবহার হয়, এ দুয়ের মধ্যে অনেকখানি তফাত। সাধারণ চুল্লির মধ্যে যে লোহা তৈয়ারি হয়, তারা একেবারে খাঁটি লোহা নয়; আমরা যতরকম লোহা সর্বদা ব্যবহার করি, তাহার কোনোটাকেই ঠিক খাঁটি লোহা বলা যায় না। এই-সব লোহার সঙ্গে অল্প বা বেশি পরিমাণে অঙ্গার বা কয়লা, গন্ধক ফস্‌ফরাস প্রভৃতি নানারকম জিনিসের মিশাল থাকে এবং সেই মিশালের জন্য লোহার রূপ গুণ নানারকম হইয়া যায়। কোনোটা নরম, কোনোটা শক্ত, কোনোটা সহজে ঢালাই হয়, কোনোটা বেশ দাপিয়া পিটিয়া নানারকম করা যায়, কোনোটা স্প্রিং-এর মতো বাঁকানো যায়, কোনোটা বাঁকাইতে গেলে ভাঙিয়া যায়, কোনোটাকে নানারকমে তাতাইয়া এবং নানা কৌশলে ঠাণ্ডা

করিয়া ইচ্ছামতো মজবুত করা যায়, কোনোটাকে চমৎকার শান দেওয়া বা পালিশ করা যায়।

এক-একরকম কাজের জন্য এক-একরকম লোহা। আজকাল ভালো ইস্পাত ও উঁচুদরের লোহা করিতে হইলে আগে খাঁটি কাঁচা লোহা তৈয়ারি করা হয়। তার পর তাহার সঙ্গে ঠিক দরকারমতো অন্য কোনো ধাতু বা কয়লা প্রভৃতি মিশাইয়া আবার সমস্তটা গলাইয়া একসঙ্গে জ্বাল দিয়া লইতে হয়। প্রথম কাজটির জন্য বিশেষরকম চুল্লির দরকার হয়—তাহার গঠন এবং ভিতরকার বন্দোবস্ত সাধারণ চুল্লির মতো নয়। একটা প্রকাণ্ড পিপার মতো জিনিস—তাহার মধ্যে পাঁচশো বা হাজার মণ মসলা ধরে; সেই পিপার তলার দিকে আগুন জ্বালাইয়া, তাহার ভিতর দিয়া ঝড়ের মতো দম্‌কা বাতাস চালাইয়া দেওয়া হয়। বাতাসের ঝাপটায় আগুনের শিখা প্রকাণ্ড জিভ মেলিয়া পিপার মুখ হইতে ছুটিয়া বাহির হয়। লোহার মসলা আগুনের তেজে গলিয়া পুড়িয়া যতই বিশুদ্ধ হইয়া আসিতে থাকে, আগুনের রঙও সেই সঙ্গে বদলাইয়া আসিতে থাকে। প্রথমে বেগুনি, তার পর ক্রমে লাল হলদে সাদা হইয়া, শেষে যখন ঘোর নীল রঙ দেখা দেয় তখন আগুনের তেজ নিভাইয়া, প্রকাণ্ড পিপাটিকে কলে ঘুরাইয়া কাত করিয়া, তাহার ভিতর হইতে তরল কাঁচা লোহা ঢালিয়া ফেলা হয়। তার পর ওজনমতো নানা জিনিসের মিশাল দিয়া সেই লোহাকে নানা কাজের উপযুক্ত করিতে হয়।

এখানেও কি হাঙ্গামার শেষ আছে? সেই লোহাকে আরো কতবার অগ্নিপরীক্ষায় ফেলিয়া, কত দুরমুশ কলে সাংঘাতিকভাবে দলিয়া পিষিয়া, কতরকমের উৎপাত সহাইয়া তবে তাহাকে ভারি ভারি কঠিন কঠিন কাজে লাগানো চলে।

সন্দেশ—শ্রাবণ, ১৩২৬

কাঁচ

এক ছিল সওদাগর। সে গেল বাণিজ্য করতে। প্যালেস্টাইনের তীরের কাছে নদীর মুখে তার ছোট্টো জাহাজটি বেঁধে সে তার লোকজন নিয়ে ডাঙায় নামল, আর সেখানেই বালির উপর আগুন জ্বেলে রান্না করতে বসল। হাঁড়ি বসাবার জন্য পাথর পাওয়া গেল না, কাজেই তাদের সঙ্গে যে সোডা-ক্ষারের পাটালি ছিল (যে সোডা দিয়ে বাসন সাফ করে) তারই কয়েকটার উপর তারা হাঁড়ি চড়াল। রান্না খাওয়া সব যখন শেষ হয়েছে, তখন তাদের সোডা-পাথরের চাক্তিগুলো তুলতে গিয়ে দেখলে তার চিহ্নমাত্র নেই—আছে কেবল স্বচ্ছ পাথরের মতন কি একটা জিনিস যা তারা আর কখনো চোখে দেখে নি। এমনি করে নাকি কাঁচের আবিষ্কার হয়েছিল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত বালির সঙ্গে ক্ষার গলিয়ে লোকে কাঁচ তৈরি করে আসছে।

কলার 'বাসনা' পুড়িয়ে যে ছাই হয়, তার মধ্যে ক্ষার থাকে—তাকে বলে পটাশ ক্ষার। সোডা পটাশ চুন এই-সমস্তই নানারকমের ক্ষার। চুল্লির আঁচে শুধু বালি কখনো গলে না;

কিন্তু তার সঙ্গে চুন-পাথর আর ক্ষার মিশিয়ে জ্বাল দিলে সব গলে এক হয়ে যায়, আর ঠাণ্ডা হলে কাঁচ হয়ে জমে থাকে।

প্রথম প্রথম মানুষে যে কাঁচের ব্যবহার করত, সে কেবল শৌখিন জিনিস হিসাবে। কাঁচ তৈরি করবার সময় তার সঙ্গে নানারকম ধাতুর মসলা মিশিয়ে তাতে নানারকম রঙ ফলানো যায়। সেই-সমস্ত রঙিন কাঁচের পুঁথিমুক্তো এক সময়ে লোকে অসম্ভব দামে কিনে নিত। বহুমূল্য রত্ন বলে দেশ-বিদেশে তার আদর হত। সে সময়ে কাঁচ তৈরির সংকেত খুব অল্প লোকেই জানত ; আর তারা কাউকে সে-সব শেখাত না। কিন্তু তবু দুশো-পাঁচশো বা হাজার বছরে সে-সব গোপন কথাও অল্পে অল্পে ফাঁস হয়ে যেতে লাগল। ক্রমে এশিয়া থেকে ইউরোপের নানা স্থানে এ বিদ্যার চলন হতে লাগল। বুদ্ধিমান রোমানেরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কাঁচ তৈরিতে এমন উন্নতি করে ফেলল যে, কয়েকশো বছরের মধ্যেই কাঁচের শার্শী, বাসন, প্রদীপ-দান প্রভৃতি মানুষের- অত্যন্ত ধনী লোকদের-- নিত্য ব্যবহারের জিনিস হয়ে দাঁড়াল।

এখন আমরা সে-সমস্ত ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার কাঁচ সদা সর্বদা ব্যবহার করি, তিনশো বছর আগে সেরকম কাঁচ তৈরিই হত না। সে সময়কার কাঁচ হত ময়লাগোছের, তার মাঝে মাঝে ঘোলাটে দাগ থাকত। তার উপরেই রঙ ফলিয়ে, কৌশলে তার দাগের সঙ্গে দাগ মিলিয়ে ওস্তাদ কারিকরেরা আশ্চর্য সুন্দর সব জিনিস গড়ত। কিন্তু নিখুঁত সাদা কাঁচ যে কাকে বলে, সে তারা জানতই না। প্রায় তিনশো বছর আগে ইংলণ্ডের কয়েকজন উৎসাহী লোকের চেষ্টায় একরকম চমৎকার কাঁচ তৈরি হয়, সেই থেকেই কাঁচের ব্যবসার চূড়ান্ত উন্নতির আরম্ভ। তার আগে কাঠের চুল্লিতে কাঁচ তৈরি হত, এই ইংরাজেরাই সকলের আগে কয়লার চুল্লি ব্যবহার করলেন। এঁরা সমুদ্রের পানা পুড়িয়ে, তা থেকে পটাশ বার করে, সেই পটাশের মধ্যে খাঁটি চক্‌মকি পাথরের গুঁড়ো আর সীসা-ভস্ম মিশিয়ে জলের মতো স্বচ্ছ নূতনরকমের কাঁচ তৈরি করলেন। তখন হতে সেই কাঁচের শার্শী, সেই কাঁচের আর্শি, সেই কাঁচের যন্ত্র, বাসন, চশমা, দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। শৌখিন ধনীর শখের কাঁচ সাধারণ লোকের ঘরোয়া জিনিস হয়ে উঠল।

লোহা না থাকলে মানুষের সভ্যতার শক্তি যেমন খোঁড়া হয়ে যায়, কাঁচ না থাকলে বিজ্ঞানের বুদ্ধিও সেইরকম কানা হয়ে পড়ে। এই তিনশো বছরের মানুষ তার জ্ঞানের পথে যা কিছু উন্নতি ও আবিষ্কার করেছে, কাঁচ না থাকলে তার প্রায় বারো-আনাই অসম্ভব হত। কাঁচ ছিল তাই দুরবীন হতে পেরেছে ; কাঁচ ছিল তাই অণুবীক্ষণের জন্ম হয়েছে। আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের আশ্চর্য রহস্য, গাছপালা কীটপতঙ্গের গঠন কৌশল, অসংখ্য রোগবীজের সঙ্গে স্বাস্থ্যের নিত্য লড়াই, অতি বড়ো ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব আর অতি সূক্ষ্ম অণু-পরমাণুর ইতিহাস—এ সমস্তই মানুষ জানতে পারছে কেবল কাঁচের কৃপায়। গ্রহ নক্ষত্রের আলোক দেখে পণ্ডিতে তার মালমসলার বিচার করেন, তার ভূত-ভবিষ্যৎ কত কি বলেন— তার জন্যও কাঁচের বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র চাই। ফোটোগ্রাফার ছবি তোলেন, তার জন্য কাঁচের লেন্স চাই। বৈজ্ঞানিকের ঘরে ঘরে কাঁচের থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার, আরো নানারকম কত যন্ত্র আর কত 'মিটার'। মোট কথা, কাঁচের ব্যবহার যদি মানুষে না জানত তবে আজও তার সভ্যতার ইতিহাস অন্তত তিনশো বছর পেছিয়ে থাকত।

নানারকম কাজের জন্য নানারকম কাঁচ তৈরি হয়। তা থেকে কাজের জিনিস গড়বার উপায়ও নানারকম। সামান্য একটা গেলাস, বোতল, চিমনি বা কাঁচের নল বানাবার জন্য কত যে কায়দা কৌশলের দরকার হয়, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। একটি কারিকর একটা লোহার নলে করে খানিকটা গলা কাঁচ নিয়ে, তার মধ্যে ফুঁ দিয়ে, তাকে নেড়ে ঝেড়ে দুলিয়ে ঝুলিয়ে চট্‌পট্ কত যে আশ্চর্য জিনিস গড়তে পারে সে একটা দেখবার মতো ব্যাপার। নলের মুখটা চুল্লিতে-চড়ানো তরল কাঁচের মধ্যে ডুবিয়ে নলের আগায় খানিকটা গলা কাঁচ উঠে আসে। তখন সেই নলের মধ্যে ফুঁ দিলে কাঁচটা গোল বুদ্‌বুদের মতো হয়ে ফুলে ওঠে। নরম থাকতে থাকতে সেই বুদ্‌বুদটাকে লোহার টেবিলের উপর ইচ্ছামতন চাপ দিয়ে চ্যাপ্টা করা যায়; অথবা গড়িয়ে ডিমের মতন বা হুঁকোর মালার মতন লম্বাটে করে দেওয়া যায়। কোনো জিনিস গড়তে গড়তে, তার খানিকটা জায়গা আগুনে তাতিয়ে আবার যদি ফুঁ দেওয়া যায় তা হলে সেই তাতান জায়গাটুকু গম্বুজের মতো ফুলে উঠতে থাকে। কিংবা যদি সেটাকে নরম অবস্থায় ঝুলিয়ে ধরে আস্তে আস্তে ঘোল-মউনির মতন পাক দেওয়া যায়, তা হলে যেখানটা নরম সেটা চিমনির ডাঁটা বা নলের মতন লম্বা হয়ে ঝুলে পড়ে। গোল জিনিসের গোড়ায় একটু নল বানিয়ে, তার পর আগার দিকটা গরম করে ফুঁয়ের জোরে ফাটিয়ে দিলে খাসা একটি বোতলের মুখ বা কলকে তৈরি হয়। এই-সমস্ত নানারকম জিনিসের গায়ে আবার খানিক নরম কাঁচ লাগিয়ে ইচ্ছামতো হাতল বা পায়া গড়ে দেওয়া যায়। এ-সব শিখতে যা সময় লাগছে, গড়তে গেলে ওস্তাদ লোকের তার চাইতেও কম সময় লাগে।

এইরকম অনেক জিনিসই আজকাল কলে তৈরি হয়। তার কতক গড়ে ঢালাই করে, কতক বানায় কল দিয়ে বাতাস ফুঁকে, আবার কতকগুলো তৈরি হয় নরম কাঁচের উপর অস্ত্র চালিয়ে। সাধারণ সরাসরি কাঁচ সমস্তই আগে অনেক হাঙ্গাম করে হাতে গড়ে তৈরি হত। তার জন্য প্রথমে ঘাড়-কাটা বোতলের মতো মস্ত মস্ত চোঙা বানিয়ে, তার পর সেই-গুলোকে কেটে চিরে, নরম করে, চেপ্টিয়ে ছোটোবড়ো শার্শী তৈরি হয়। কিন্তু খুব বড়ো-বড়ো আরশি আর ভারী ভারী আসবাবী আয়নাগুলি প্রায় সমস্তই হয় ঢালাই করে। চুল্লির তরল কাঁচ গামলার মতো প্রকাণ্ড হাতায় করে তুলে একটা মস্ত টেবিলের উপর ঢেলে দিতে হয়। তার পর প্রকাণ্ড 'রোলার' দিয়ে সেই গরম কাঁচকে ক্রমাগত বেলে এবং দলে, শেষে পালিশ-করে ঘষে সমান করতে হয়।

সবচাইতে ভালো আর দামী যে কাঁচ সেগুলো দরকার হয় বিজ্ঞানের কাজে। তা দিয়ে দুরবীন হয়, ফোটো তুলবার 'লেন্স' হয়, হাজাররকম যন্ত্র তৈরি হয়। এই-সব কাজের জন্য যে কাঁচ লাগে, সে কাঁচ একেবারে নিখুঁত হওয়া দরকার। তার আগাগোড়া সমান স্বচ্ছ হওয়া চাই। জলের মধ্যে নুন ফেললে সে নুন যেমন গলে গিয়ে সমস্তটা জলের মধ্যে সমানভাবে ছড়িয়ে থাকে, ঠিক তেমনি করে কাঁচের সমস্ত মসলাগুলি সব জায়গায় ঠিক সমানভাবে সমান ওজনে মিশে যাওয়া চাই। তা যদি না হয়, কাঁচের মধ্যে কোথাও যদি অতি সামান্য একটুখানিও দাগী বা ঘোলা থেকে যায়, তা হলেই আর তা দিয়ে কোনো সূক্ষ্ম কাজ চলতে পারবে না। সুতরাং এই কাঁচ তৈরি করবার সময় খুব সাবধান হতে হয়।

কয়লা বা গ্যাসের চুল্লির উপর পাথুরে মাটির বাসনের মধ্যে অল্প আঁচে একটু একটু করে কাঁচের মসলা জ্বাল দিতে হয়। দশ-বারো ঘণ্টা জ্বাল দেবার পর, চুল্লির আঁচ বাড়িয়ে দিয়ে খুব কড়া আঁচের তাপে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা রাখতে হয়। তার পর 'asbestos' বা রেশমী পাথরের পোশাক-পরা মজুরেরা পাথরের ডাণ্ডা দিয়ে সেই তরল গরম কাঁচটাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রমাগত ঘুঁটতে থাকে। একে আগুনের মতো গরম, তার উপর এই ভীষণ পরিশ্রম—এক মিনিট থামবার জো নেই। মজুরের পর মজুর আসে, তারা ঘেমে হাঁপিয়ে হয়রান হয়ে পড়ে, তাদের ঘাড়ে পিঠে ব্যথা হয়ে যায়, আবার তাদের জায়গায় নতুন মজুর আসে। ক্রমে চুল্লির আগুনও আস্তে আস্তে কমে আসতে থাকে—কাঁচটাও অল্পে অল্পে ঠাণ্ডা হয়ে জমে আসতে থাকে। এই সময়ে খুব সাবধান হওয়া দরকার। তাড়াতাড়ি জুড়িয়ে গেলে সবটা কাঁচ ঠিক সমানভাবে জমতে পারে না—এলোমেলোভাবে জমাট বেধে কাঁচের মধ্যে নানারকম 'টান' ধরে যায়; সে দোষ চোখে দেখা না গেলেও কাজের সময় ধরা পড়ে। সাধারণ কাঁচের জিনিসও তৈরি করার সময়ে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করে ফেললে ঠুনকো হয়ে যায়, নাড়তে-চাড়তে সহজেই ভেঙে যায়। তাই, কাঁচ যখন জমে আসতে থাকে তখনই চুল্লির চারদিকে ইঁটের দেওয়াল দিয়ে সব বুজিয়ে দিতে হয়; তার মধ্যে চুল্লির আগুন আস্তে আস্তে নিভে যায়। কাঁচটাও পাঁচদিন-দশদিন বা পনেরোদিন ধরে অল্পে অল্পে জমাট বেধে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। তার পর দেওয়াল ভেঙে পাথুরে বাসন ভেঙে ভিতরকার কাঁচ বার করে আনে। সে কাঁচ যদি আস্ত থাকে তা হলে কাঁচওয়ালার খুব ভাগ্য [illegible] বলে। প্রায়ই সেগুলো আট-দশ টুকরো হয়ে ভাঙা অবস্থায় বেরোয়—তার মধ্যে [illegible]ভালো ভালো টুকরোগুলো বেছে নিতে হয়।

[illegible]-বড়ো দুরবীনের জন্য দু হাত-তিন হাত বা তার চাইতেও চওড়া নিখুঁত কাঁচের [illegible] হয়। [illegible]রকম কাঁচ করবার মতো কারিকর পৃথিবীতে খুব কমই আছে। [illegible] দুরবীন [illegible] প্রায় সমস্তগুলিরই কাঁচ ঢালাই হয় ফ্রান্সের একটিমাত্র কারখানায়। [illegible] সপ্তাহ আস্তে আস্তে চুল্লি জুড়িয়ে, নানারকম [illegible] কাঁচ [illegible] করা হয়। তবু প্রায়ই দেখা যায় কাঁচ ফেটে [illegible] ঢালাই করে বার বার ভেঙে যায়। হয়তো বিশ-ত্রিশ [illegible] নিখুঁত কাঁচ বেরোয়। এইজন্যেই সে কাঁচের এত দাম; [illegible] দশ-বিশ হাজার বা লাখ-দুই টাকা দাম লেগে যায়! [illegible]বীনের জন্য সাড়ে পাঁচ হাত চওড়া একখানি কাঁচের দরকার; [illegible] তারা তা দিতে প্রস্তুত। আজ তেরো বছর ধরে সেই [illegible]—কিন্তু এই এতদিন পরে সবে সেদিন মাত্র শোনা গেল যে, [illegible]। কাঁচখানির ওজন হবে একশো কুড়ি মণ আর [illegible] টাকা!

সন্দেশ—ভাদ্র, ১৩২৬

শরীরের মালমসলা

এখানে একটা বাক্স আছে। বাক্সটা কাঠের তৈরি। শুধু কাঠ? না, তাতে লোহার কব্‌জা আর তালা, আর চারধারে পিতলের কাজ আছে। আর কি আছে? আর তার গায়ে চক্‌চকে গালা বা বার্নিশ আছে। সামনে ঐ একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে? ইঁট কাঠ [illegible] জিনিস। এই সমস্ত হল তার মালমসলা। [illegible], এতে অমুক জিনিস এতখানি আন্দাজ [illegible] সামনে একটা মানুষ বসে আছে [illegible] একটু নমুনা শুনবে?

দু মণ ওজনের একটি মানুষের শরীরের [illegible] যাবে [illegible] বেশ বড়ো-বড়ো তিনটার [illegible] আছে তা যদি আলাদা করে বার করা [illegible] জন্য বারো হাত লম্বা বারো হাত চওড়া [illegible] অনেকখানি গ্যাস পাবে বাজারে [illegible] পাওয়া যায়।

ঐ ওজনের একজন সাধারণ মানুষের [illegible] ওজনের প্রায় গোটা ত্রিশেক মোমবাতি তৈরি হতে পারে। [illegible] পাওয়া যাবে যে তা দিয়ে দশহাজার পেন্সিলের শিস তৈরি হতে পারে। [illegible] কয়লার মধ্যেও অতখানি অঙ্গার থাকে না।

খোঁজ করলে একটা শরীরের মধ্যে থেকে প্রায় কুড়ি চামচ নুন আর দু-তিন [illegible] অনায়াসেই বার করা যেতে পারে।

যে-সমস্ত জিনিস না হলে শরীর টিঁকতে পারে না তার একটি হচ্ছে লোহা। এই যে রক্তের রঙ দেখছ, টক্‌টকে লাল, শরীরে লোহা কম পড়লেই সে রঙ ফ্যাকাসে হয়ে যায়, মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে, কঠিন ব্যারাম দেখা দেয়। তখন মানুষকে লোহা-মেশানো ওষুধ খাওয়াতে হয়। শরীরে যে লোহার মসলা থাকে, ইচ্ছা করলে তা থেকে লোহা ধাতু বার করে খাঁটি শক্ত লোহা বানানো যায়। একজন সুস্থ মানুষের শরীর থেকে যে পরিমাণ লোহা বেরোয় তা দিয়ে এরকম মোটা একটি পেরেক তৈরি হতে পারে যে, একটা আস্ত মানুষকে অনায়াসে সেই পেরেক থেকে টাঙিয়ে রাখা যায়।

মানুষের শরীরে যে হাড় থাকে তা থেকে দুটি জিনিস খুব বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়—চুন আর ফস্‌ফরাস্। চুন দিয়ে কত কাজ হয়, তা সকলেই জান। ফস্‌ফরাস দিয়ে দেশলাইয়ের জ্বালানি মসলা তৈরি হয়, আর ইঁদুর মারবার সাংঘাতিক বিষ তৈরি হয়। অনেক ওষুধেও ফস্‌ফরাসের ভাগ থাকে। হাড় পুড়িয়ে জমির সঙ্গে মেশালে যে চমৎকার সার হয় সেও ঐ ফসফরাসের গুণে। একটি মানুষের শরীর থেকে যে

পরিমাণ খাঁটি ফস্‌ফরাস্‌ বার করা যায় তা খাওয়ালে অন্তত পাঁচশো মানুষ মারা পড়বে। দেশলাই বানালে তাতে প্রায় আটলক্ষ দেশলাইয়ের মসলা হবে।

সন্দেশ—অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩২৬

অতিকায় জাহাজ

শৌখিন ধনীদের জন্য আর বড়ো-বড়ো ব্যবসায়ীদের জন্য যে-সমস্ত জাহাজ অতলান্তিক মহাসাগরের খেয়া পারাপার করে, তেমন বড়ো জাহাজ পৃথিবীর আর কোথাও নাই। কি করে খুব তাড়াতাড়ি সাগর পার করা যায় আর আরামে পার করা যায়, আর একসঙ্গে অনেক লোককে বিনা কষ্টে পার করা যায়, তার জন্য বড়ো-বড়ো জাহাজকোম্পানিদের মধ্যে রেষারেষি চলে। এক-একটা জাহাজ নয়, যেন এক-একটা শহর, রাজারাজড়ার থাকবার মতো শহর। তারই খুব বড়ো দু-একটির নমুনা দেওয়া হয়েছে।

জাহাজের সাঁতার-ঘরটি দেখা যাক। মধ্যেকার চৌবাচ্চাটি হচ্ছে বাইশ গজ লম্বা আর আঠারো গজ চওড়া। এ ছাড়া নানারকম স্নানের ঘর, তুর্কী হামাম, ফোয়ারা স্নান প্রভৃতির আলাদা বন্দোবস্ত আছে। বারো তলা জাহাজ, তার মাঝিমাল্লা যাত্রী সব নিয়ে লোকসংখ্যা পাঁচহাজার হবে। পাঁচটি জাহাজ লম্বালম্বি সার বেঁধে দাঁড়ালে, এক মাইল পথ জুড়ে বসবে।

একটি জাহাজের এক সপ্তাহের খোরাক হল বাইশটা ট্রেন বোঝাই কয়লা—এক-একটা ট্রেনে সাড়ে আটহাজার মণ। জাহাজের মানুষগুলোর খোরাকের হিসাবও বড়ো কম নয়। এক-এক যাত্রায় পশুমাংস ষাটহাজার মণ, পাখির মাংস দেড়শো মণ, মাছ একশো পঁচিশ মণ, ডিম আটচল্লিশ হাজার, আলু ষোলোশো মণ, তরিতরকারি চারশত মণ, টিনের সবজি ছয়হাজার টিন আর কফি ও চা নব্বই মণ লাগে। তা ছাড়া ফল দুধ কোকো চকোলেট ইত্যাদিও সেইরকম পরিমাণে।

জাহাজের মধ্যে বড়ো-বড়ো খানাঘর চা-ঘর ইত্যাদি তো আছেই, তা ছাড়া নানারকম হোটেল সরাই-এর অভাব নেই। ধোপা, নাপিত, ফুলের দোকান, ছবির দোকান, মিঠাই-এর দোকান, প্রকাণ্ড থিয়েটার ও নাচঘর এ-সবও জাহাজের মধ্যেই পাবে। উঠবার জন্য লিফ্‌ট্‌ বা চলতিঘর। ইচ্ছা করলে আর টাকা থাকলে, সেখানে আলগা বাড়ি ভাড়ার মতো করে থাকা যায়—একবারের (অর্থাৎ পাঁচদিনের) বাড়িভাড়া ধর পনরোহাজার টাকা। এক-একটি জাহাজ করতে খরচ হয় প্রায় দু-তিনকোটি টাকা।

সন্দেশ—মাঘ-ফাল্গুন, ১৩২৬

আকাশের বিপদ

'জলে কুমির ডাঙায় বাঘ'। মানুষের যখন পালাবার পথ থাকে না তখন লোকে এইরকম বলে। কিন্তু আজকালকার লোকে আকাশ দিয়েও পালাতে জানে। তা বলে

সেখানটাই কি মানুষের পক্ষে নিরাপদ ? যুদ্ধের সময়ে সেটা যে খুব সুবিধার জায়গা নয় তা তোমরা জান, কিন্তু অন্য সময়ে ? জলের জন্তু অনেক আছে যার ভয়ে মানুষ পালায়, ডাঙায়ও তেমনি শত্রুর অভাব নেই। কিন্তু আকাশের পাখিকেও কি মানুষের ভয় করে চলা দরকার ? মাঝে মাঝে দরকার বৈকি! বছর দুয়েক আগে আলপ্‌স্‌ পাহাড়ের কাছে এক সাহেব এরোপ্লেন করে অনেক উঁচুতে উড়ছিলেন। পরিষ্কার দিন, ঝড় বাতাসের চিহ্নও নেই, কোথাও ভয়ের কোনো কারণ দেখা যায় না। এর মধ্যে হঠাৎ কলের ভীষণ ভন্‌ভন্‌ শব্দের উপর চিলের চীৎকারের মতো একটা কর্কশ শব্দ শোনা গেল—আর সেই সঙ্গে প্রকাণ্ড এক ঈগলপাখি সাহেবের মুখের উপর ডানার ঝাপটা লাগিয়ে, দুই পায়ের নখ দিয়ে তার মাংস ছিঁড়ে নেবার জোগাড় করে তুলল! একবার নয়, দুবার নয়, পাঁচ-সাত বার ঘুরে ঘুরে সে সাহেবকে তার রাগখানা জানিয়ে গিয়েছিল। সাহেবের গায়ের জামা থেকে সে বেশ দুই-এক খাবল কাপড়ও তুলে নিয়েছিল, গায়েও দু-চারটা আঁচড় লাগায় নি, এমন নয়।

তারা আলপ্‌স্‌ পাহাড়ের রাজবংশী ঈগল, যুগের পর যুগ আকাশের মেঘের উপর সকলের চাইতে উঁচু নীল ময়দানের হাওয়া এতদিন তারাই কেবল খেয়ে আসছে। সেখানে আর কোনো পাখিরও যাওয়ার সাধ্য নেই। কাজেই পৃথিবীর মানুষকে অতটা দূর স্পর্ধা করতে দেখে তার তো রাগ হবারই কথা।

যুদ্ধের সময়ে কেউ কেউ প্রস্তাব করেছিলেন যে দলে দলে ঈগলপাখি পুষে শত্রুর এরোপ্লেনের উপর ছেড়ে দিলে মন্দ হয় না। সেরকমের পরীক্ষাও নাকি করা হয়েছিল। যারা এরোপ্লেন চালায় তাদের চোখে মস্ত গোল চশমা থাকে। ঐরকম চশমাধারী মূর্তি গড়ে, যদি তার উপর ঈগলপাখিকে রোখ্‌ করতে শেখানো যায়, তা হলেই সময় বুঝে তাকে কোনো এরোপ্লেনের উপর লেলিয়ে দিলেই চলবে। কিন্তু একবার ছাড়া পেলে পর সে শত্রু মিত্র চিনবে কি করে, সেটাই হচ্ছে ভাববার কথা।

আকাশের পথে কোনো বিপদ উপস্থিত হলে সবচাইতে মুশকিল এই যে, চট্‌ করে কোথাও পালাবার পথ থাকে না। শূন্যে উঠে দু-তিন মাইল উঁচুতে উড়তে উড়তে হঠাৎ যদি বেলুন বা এরোপ্লেনে আগুন ধরে যায় তখন চট্‌ করে ডাঙায় নামবে তার আর উপায় থাকে না। জাহাজ হলেও নাহয় জলে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়, হালকা শোলার কোমরবন্ধ এঁটে কোনোরকমে সাঁতার কেটে পালানো যায়। জাহাজ ডুবলেও 'লাইফ্‌বোট' ভাসিয়ে প্রাণরক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু আকাশযাত্রীর উপায় কি ?

বড়ো-বড়ো বেলুন যখন আকাশে ওঠে তখন অনেক সময় তার গায়ে গোটানো ছাতার মতো একটা প্রকাণ্ড জিনিস ঝোলানো থাকে—সেটাকে বলে প্যারাসুট্‌। হঠাৎ বিপদে পড়লে, বা চট্‌ করে নামবার দরকার হলে বেলুনবাজ তার কোমরে প্যারাসুটের দড়ি জড়িয়ে বেলুন থেকে লাফ দিয়ে পড়বে। অমনি ছাতাটা খুলে গিয়ে প্রকাণ্ড গোল হয়ে ফুলে উঠবে, আর তাতেই পড়বার চোট সামলিয়ে যাবে। কিন্তু এরোপ্লেন থেকে সেরকম ছাতা ঝুলানো সম্ভব নয়; তাতে চলবার বাধা হয় আর ছাতার দড়িদড়া কোথাও কলকব্‌জায় আটকে গেলে সেও এক সাংঘাতিক বিপদ। তাই আজকাল এরোপ্লেনে ব্যবহারের জন্যে নতুনরকম প্যারাসুট্‌ তৈরি হয়েছে। সেটাকে পোশাকের মতো করে পরতে হয়। ছাতাটাকে চমৎকার

ভাবে কলে পাট করে ফিতে দিয়ে কোমরের সঙ্গে বাঁধে। ফিতেগুলো আবার কতরকম কায়দামাফিক ভাঁজ করে গুটিয়ে রাখতে হয়। তার পর দরকারের সময় হাত-পা মেলে লাফ দিলেই হল।

সন্দেশ—মাঘ-ফাল্গুন, ১৩২৬

সেকালের কীর্তি

পঞ্চাশ বছর আগেকার লোকের যেরকম চালচলন ছিল তার কথা বলতে গেলে আমরা বলি 'সেকেলে ধরন'। একালের মানুষ আমরা, এইটুকু সময়ের তফাত দেখলেই বলি 'একাল আর সেকাল'।—আর সেকালের মানুষদের ভারি একটা কৃপার চক্ষে দেখবার চেষ্টা করি। আহা! সেকালের মানুস, তারা কিছুই দেখল না; তারা না চড়ল এরোপ্লেন, না দেখল বায়োস্কোপ, না শুনল গ্রামোফোনের গান, না খেল বিদ্যুৎ-পাখার হাওয়া, টেলিফোনের কথাবার্তা আর বিলাতের টেলিগ্রাফ এ-সব আশ্চর্য ব্যাপার কিছুই তারা জানল না; আরো আগেকার কথা ভাব, একশো দেড়শো বা দুশো বছরের কথা—তখন কোথায়-বা কলের জাহাজ কোথায়-বা রেলের গাড়ি আর কোথায়-বা সাগরজোড়া টেলিগ্রাফের তার? তখনকার মানুষ ফোটোও তোলে না, ডাকটিকিটের ব্যবহারও জানে না, এমন-কি, সাইকেলও চড়ে না। আরো খানিক পেছিয়ে দেখবে, ছাপাখানা বা খবরের কাগজেরও নাম-গন্ধ পর্যন্ত পাবে না।

দুশো বা পাঁচশো বছরে যদি এতখানি তফাত হয়, তা হলে দশ-বিশ বা পঞ্চাশ হাজার বছর আগে না জানি কেমন ছিল! সেই বুনো গোছের মানুষ, যার ঘর নাই, বাড়ি নাই, গুহার মধ্যে থাকে; যে লিখতে জানে না, পড়তে জানে না, হয়তো খালি অল্পস্বল্প কথা বলতে শিখেছে; কাপড় জামা পর্যন্ত তৈরি করতে পারে না, বড়ো জোর জানোয়ারের চামড়া বা গাছের বাকল জড়িয়ে থাকে। এমন যে মানুষ, তাকে কি আর পূর্বপুরুষ বলে কেউ খাতির করতে চায়? বল দেখি?

কিন্তু যখন ভেবে দেখি যে, ঐরকম বেচারা মানুষ, গাছ পাথর ছাড়া কোনো অস্ত্র যার সম্বল নাই, সে কি করে সেই সময়কার বড়ো-বড়ো দুর্দান্ত জন্তুগুলোকে ঠেকিয়ে রাখল, তখন ভারি আশ্চর্য বোধ হয়, আর মানুষটার সম্বন্ধেও মনে একটু একটু সম্ভ্রম আসে।

ইউরোপের নানাদেশে পাহাড়ের গহ্বরের মধ্যে প্রাচীন গুহাবাসীদের নানারকম চিহ্ন পাওয়া যায়; তা থেকে সেই-সব মানুষের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য খবর পাওয়া যায়। এক-একটা গুহার মধ্যে মানুষের হাড়ের সঙ্গে আরো অনেকরকম জন্তুর হাড় পাওয়া যায়। তা দেখে বোঝা যায় যে, ঐ-সব গুহার মধ্যে মানুষ ছাড়া অন্য অন্য জন্তুরাও থাকত, মানুষ এসে তাদের তাড়িয়ে গুহা দখল করেছে; আবার অনেক সময়ে হয়তো এমনও হয়েছে যে, তাদেরই অত্যাচারে মানুষকে গুহা ছেড়ে পালাতে হয়েছে।

সেকালের গুহা-ভল্লুক, খড়্গদন্ত বাঘ, লোমশ গণ্ডার, মহাশৃঙ্গী হরিণ, অতিকায় হস্তী এরাই ছিল মানুষের প্রধান সঙ্গী, শিকার ও শত্রু। পণ্ডিতেরা গুহার ভিত্ খুঁড়ে স্তরের পর

স্তর মাটি পরীক্ষা করে দেখেছেন। এক-এক স্তরের এক-এক রকম ইতিহাস। খুঁড়তে খুঁড়তে কোথাও হয়তো দেখবে, এক জাগায় খালি গণ্ডারের হাড়, তার নীচের স্তরেই মানুষের তৈরি অস্ত্রশস্ত্রের চিহ্ন—অর্থাৎ সেখানে আগে মানুষ ছিল, তার পর তারা গণ্ডারের অত্যাচারে পালিয়েছে। পোল্যাণ্ডের এক গুহার মধ্যে প্রায় হাজারখানেক অতি প্রকাণ্ড ভালুকের হাড় পাওয়া গিয়েছে—তার.মধ্যে অনেক জন্তুই আজকাল পাওয়া যায় না।

মানুষের চিহ্নের মধ্যে কংকাল আর অস্ত্রশস্ত্রই বেশি। খুব শক্ত চক্‌মকি পাথরকে নানারকমে ঠুকে আর শান দিয়ে সে-সমস্ত অস্ত্র তৈরি হত। খুঁটিনাটি ঘরোয়া কাজের জন্য হাড়ের অস্ত্রও ব্যবহার করা হত। আর তা ছাড়া ভালোরকম একটা গাছের ডাল, কিম্বা অতিকায় হস্তীর পায়ের হাড় পেলেও তো বেশ একটি উঁচুদরের মুগুর তৈরি হতে পারে। ঐ সময়কার মানুষে তীর-ধনুকের ব্যবহার জানত কিনা সন্দেহ; কারণ আজ পর্যন্ত ধনুকের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নি; কাঠের জিনিস কিনা, বেশি দিন টেঁকে না। দু-একটা অস্ত্র দেখে মনে হয় যেন তীরের ফলক, কিন্তু সেগুলো বর্শার মুখও হতে পারে। আজকালকার বড়ো-বড়ো শিকারীদের যদি এইরকমের অস্ত্র নিয়ে সুন্দরবনে বাঘ শিকার করতে বলা হয় তবে তারা যে খুব উৎসাহ প্রকাশ করবে, এমন তো বোধ হয় না; অথচ কেবল এই-সবের জোরেই গুহাবাসীরা সকলরকম সাংঘাতিক জন্তুকে শিকার করত।

সে যে মানুষ, অর্থাৎ বুদ্ধিমান জীব, ঐ অস্ত্রগুলোই তার প্রমাণ। তা ছাড়া সে যে আগুনের ব্যবহার জানত, তার প্রমাণ, গুহার মধ্যে কাঠ-কয়লা আর ছাইয়ের চিহ্ন। তাই নয়, তার আসবাবের সঙ্গে মোটা-মোটা হাড়ের ছুঁচ পাওয়া গিয়েছে, সুতরাং গুহাবাসীদের মেয়েরা তাদের চামড়ার কাপড় সেলাই করতে জানত। কি দিয়ে সেলাই করত? বোধ হয় চামড়ার কিম্বা তাঁতের ফিতে, নাহয় গাছের তন্তু দিয়ে। কে জানে, হয়তো তাদের মধ্যেও নানারকম বাহার দেওয়া পোশাকের ফ্যাশান ছিল। কিন্তু তাদের সবচাইতে বড়ো কীর্তি হচ্ছে এই যে, তারা ছবি আঁকতে পারত। সেগুলো হচ্ছে পৃথিবীর আদিম ছবি, গুহার দেওয়ালের উপর লাল মাটি আর ভুষা কালি দিয়ে আঁকা। মাঝে মাঝে দু-একটা মাটির মূর্তি আর হাড়ে পাথরে বা হাতির দাঁতের উপর নানারকম চেহারার নক্‌শা। প্রায় সমস্তই জানোয়ারের ছবি; হরিণ, ঘোড়া, বাইসন, হাতি এই-সব।

সন্দেশ—চৈত্র, ১৩২৬

চীনের পাঁচিল

চীনদেশের রাজা ছিলেন চীন্-শিঃ-হোয়াংতি। 'চীন্' মানে আদি রাজা—যার আগে আর কেউ রাজা ছিল না। আসলে কিন্তু তাঁর আগে অনেক রাজা ঐ চীনদেশেই রাজত্ব করে গিয়েছেন; কারণ হোয়াংতি যে সময়ে রাজা ছিলেন, সে হল মোটে দুহাজার বছর আগেকার কথা। তার আগে যাঁরা রাজা ছিলেন তাঁদের নামধাম, রাজত্বের তারিখ, বংশ পরিচয়, আর বড়ো-বড়ো কীর্তির কথা সমস্তই ইতিহাসের পুঁথিতে লেখা ছিল। কিন্তু হোয়াংতি

বললেন, "তা হলে চলবে না। আমি হলাম আদি রাজা 'চীন্'—আমার আগে আর কোনো রাজা-টাজার নাম থাকলে চলবে না। এখন থেকে নতুন করে আবার সব ইতিহাস আরম্ভ হবে।"

এই বলে তিনি হুকুম দিলেন, সেকালের ইতিহাসের যত পুঁথি যেখানে পাও সব খুঁজে এনে পুড়িয়ে ফেল। রাজার হুকুমে চারিদিক থেকে রাশি রাশি হাতের লেখা পুরানো বই জড়ো করে পোড়ানো হল।

কিন্তু শুধু বই পোড়ালে কি হবে? দেশের যাঁরা পণ্ডিত লোক, তাঁরা তো সে-সব বই পড়েছেন; এতদিন কিরকমভাবে দেশের কাজকর্ম হয়ে এসেছে তাও তাঁরা সব জানেন। রাজার এ-সব খামখেয়াল তাঁরা পছন্দ করবেন কেন? কাজেই আবার হুকুম হল, মারো সব সেকেলে পণ্ডিতদের! অমনি খুঁজে খুঁজে বড়ো-বড়ো পণ্ডিতদের ধরে এনে মেরে ফেলা হল।

কিন্তু এত কাণ্ড করেও রাজা যেরকম চেয়েছিলেন তেমনটি হল না। রাজা যখন মারা গেলেন তখন দেখা গেল এখানে সেখানে দু-চারটি বুড়ো-বুড়ো পণ্ডিত তখনো বেঁচে আছেন, প্রাচীনকালের কীর্তিকথা আইনকানুন সব তাঁদের মুখস্থ! তার পর সেকালের পুঁথিপত্র যা ছিল তাও দেখা গেল সব পোড়ানো হয় নি। এমন-কি, পুরানো একটা বাড়ির ভেতর থেকে আস্ত একটা লাইব্রেরিই বেরিয়ে গেল যার মধ্যে আগেকার রাজারাজড়াদের অনেক কথাই লেখা রয়েছে। সুতরাং, রাজা হোয়াংতি কেবল নামেই আদি রাজা হয়ে রইলেন; মাঝ থেকে খালি কতগুলো বই নষ্ট করাই সার হল, আর কয়েকশো নিরীহ পণ্ডিত মিছামিছি প্রাণ হারালেন। আর হোয়াংতি রাজার দুর্বুদ্ধির জন্য ইতিহাসে তাঁর দুর্নাম থেকে গেল।

জবরদস্তি করে রাজামশাই নাম কিনতে গিয়ে ঠকে গেলেন, কিন্তু আর-একদিকে সত্যি সত্যি তিনি এমন একটা কীর্তি রেখে গিয়েছেন যার জন্য আজও তাঁর নাম লোকে মনে করে রেখেছে। সেই কীর্তিটি হচ্ছে চীনদেশের রাজ্য-ঘেরা পাঁচিল। মানুষ যেমন করে তার দালানদুর্গ বা ক্ষেতবাগান দেয়াল দিয়ে আর বেড়া দিয়ে ঘেরে ঠিক তেমনি করে তিনি তাঁর রাজ্যের উত্তর আর পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড পাঁচিলের ঘেরাও দিয়েছিলেন। পুব সীমানার সমুদ্র থেকে উত্তরের পাহাড় পর্যন্ত, পাহাড়ের উপর দিয়ে পশ্চিমের মরুভূমি পর্যন্ত, উঁচুনিচু আঁকাবাঁকা, দেড়হাজার মাইল লম্বা প্রকাণ্ড দেয়াল। এমন আশ্চর্য বড়ো দেয়াল পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

চীন সাম্রাজ্যের মধ্যে যে জায়গাটুকুকে ইংরাজিতে 'চায়না' বলা হয়, সেইটুকু হচ্ছে আসল চীনদেশ। মাঞ্চু আর তাতার জাতীয় দস্যুরা এই চীনদেশের লোকেদের উপর ভারি অত্যাচার করত। থেকে থেকে হঠাৎ দল বেঁধে এসে লোকের টাকাকড়ি ফল শস্য সব লুঠপাট করে তারা পালিয়ে যেত। তাদের ঠেকাবার জন্যই এই প্রকাণ্ড পাঁচিল। ভিতরে মাটির বাঁধ, বাইরে ইঁট-পাথরের গাঁথুনি, তার মাথার উপর টালিবাঁধানো রাস্তা, পাঁচিলের উপর দিয়ে লোকজন গাড়িঘোড়া সব যাতায়াত করে। এক-এক জায়গায় এমন চওড়া যে পাঁচ-সাতটা উটের গাড়ি অনায়াসে পাশাপাশি চলতে পারে। কোথাও দেয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড ফটক, কোথাও সিঁড়ির মতো ধাপকাটা, কোথাও প্রহরীদের প্রকাণ্ড উঁচু পাহারা-ঘর। এমনি

করে পাঁচিলের পথ চলেছে। পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠানামা করতে করতে, কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্বতের চুড়োয় ওঠে, আবার কত নদীর ধারে সমান জমিতে নেমে এসেছে।

দুহাজার দুশো বছর তার বয়স। সে যদি কথা বলতে পারত, তা হলে তার এই বুড়ো বয়সে কত আশ্চর্য কথাই শুনতে পেতাম। কত যুগের পর যুগ এই দেয়ালের বুকের উপর দিয়ে কত দেশ-বিদেশের লোক আসা যাওয়া করেছে—কেউ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য, কেউ চুরি ডাকাতির জন্য, কেউ দলে-বলে রাজ্যজয়ের জন্য। তুর্কি, তাতার, মোঙ্গল, মাঞ্চু, চীন কার অস্ত্রের কত বিক্রম ঐ দেয়াল তার সাক্ষী। কত রাজার কত রাজবংশের কত অদ্ভুত কাহিনী, কত সুখ-দুঃখের ইতিহাস। হোয়াংতি রাজার বংশের বা 'হান্' বংশের প্রতাপের কথা—যার ভয়ে তুর্কি তাতার জব্দ হয়েছিল। তার পর অরাজক দেশে অশান্তির যুগ—যখন ঘরে শত্রু বাইরে শত্রু, তার মধ্যে রাজায় রাজায় লড়াই। তার পর 'তাং' রাজাদের দিগ্বিজয়ের কথা—তাঁরা যুদ্ধ জয় করতে করতে পারস্য আর কাস্পিয়ান থেকে কোরিয়ার শেষ পর্যন্ত রাজ্য দখল করে বসেছিলেন। তার পর ছোটোখাটো রাজাদের ইতিহাস পার হয়ে 'সুং' বংশের কত কীর্তির কথা—কত বড়ো-বড়ো কবি, কত বড়ো-বড়ো পণ্ডিত, আর চারিদিকে জ্ঞান বিজ্ঞানের কত আলোচনা!—সে সময়ে প্রথম ছাপার কল তৈরি করে মানুষে সকলের প্রথম পুঁথির লেখা ছাপতে শুরু করেছে। তার পর কেবলই যুদ্ধবিগ্রহ—মোঙ্গল সেনাপতি চেঙ্গিস খাঁ-র কাছে চীনেদের বার বার লাঞ্ছনা—আর শেষে কুবলাই খাঁ-র আমল থেকে একশো বছর ধরে চীনদেশে মোঙ্গলদের রাজত্ব। শুধু চীনদেশ কেন, এশিয়ার পর্বকূল থেকে

ইউরোপে হাঙ্গারি রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত তাঁদের প্রচণ্ড শাসন ! তার পর 'মিং' বংশের শৌখিন চীন রাজাদের রাজত্ব আর শিল্প বাণিজ্যের কাহিনী। আজও পাঁচিলের কাছে কাছে তাঁদের সমাধি দেখতে পাওয়া যায়—তার চারিদিকে বড়ো-বড়ো পাথরের মূর্তি কবর পাহারা দিচ্ছে। তার পর ক্রমে মাঞ্চুদের হাতে চীনের দুর্দশা—আর মাঞ্চু রাজাদের হুকুমে চীনাদের টিকি রাখার নিয়ম আরম্ভ। সেই থেকে এই বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মাঞ্চু বংশের তা-ৎচিং বা 'অতি শুদ্ধ' রাজাদের রাজত্ব চলে এসেছে।

বুড়ো পাঁচিল এখন মরতে বসেছে। এত যুগ যুগ ধরে তার উপর কত যে চোট গিয়েছে, কত ভাঙা গড়া মেরামত, কত তালির উপর তালি, আর হাজার-দুহাজার বছর পরে হয়তো তার চিহ্ন খুঁজে বার করতে হবে। এখনই কত জায়গায় ইঁট পাথর সব ধ্বসে পড়ছে—মস্ত-মস্ত ফাটল দিয়ে আগাছা আর জংলি ফুল গজিয়ে উঠছে। আগেকার যুগে শত্রু ছিল যারা তাদের হয়তো-বা দেওয়াল দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যেত, কিন্তু এখনকার শত্রু যারা তাদের কামান গোলার সামনে দেয়ালের বাঁধ করবে কি ? তাই দেয়ালের আর তেমন যত্নও নেই, চিকিৎসাও নেই। অনেক জায়গায় দেয়ালের পথ দিয়ে চলাফেরার সুবিধা হয় তাই সেই-সব জায়গায় এখনো লোকে দেয়ালের যত্ন করে, বছর বছর মেরামত করে। এত ভেঙেচুরে তবুও যা রয়েছে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এক ইজিপ্টের পিরামিড ছাড়া সেকালের মানুষের তৈরি এত বড়ো কীর্তি আর পৃথিবীর কোথাও নেই।

সন্দেশ—আষাঢ়, ১৩২৭

চাঁদমারি

সৈন্যেরা যেখানে বন্দুক ছুঁড়তে শেখে, সেখানে একটা তক্তার উপরে মস্ত চাঁদের মতো একটা গোল চক্র আঁকা থাকে, তার উপর নিশান করে সৈন্যেরা গুলি চালায়। লোকেরা তাকে 'চাঁদমারি' বলে। কেন বলে তা ঠিক জানি না, বোধ হয় ওখানে 'চাঁদ'কে মারে বলে তার নাম চাঁদমারি।

আমেরিকার এক মাতাল গোলন্দাজের গল্প শুনেছিলাম, সে বনের মধ্যে গাছের আড়ালে আলো জ্বলতে দেখে সেই আলোর উপর তাক করে কামানের গোলা চালাচ্ছিল। এমন সময় তার কাপ্তান এসে বললেন "ব্যাপার কি? কামান দাগছ কিসের জন্য?" গোলন্দাজ বললে, "ঐ যে সামনে বনের মধ্যে কারা আলো জ্বালিয়েছে, ওদের আলো ফুটো করে দিচ্ছি।" কাপ্তান বললেন, "ওরে হতভাগা! ওটা যে চাঁদ উঠছে, দেখতে পাস নে?" তখন গোলন্দাজের হুঁস হল, সে তাকিয়ে দেখল যে এতক্ষণ সে চাঁদকে ফুটো করবার আশায় গুলি চালাচ্ছিল!

পৃথিবীর বাইরে আকাশের গায়ে যে-সমস্ত আলো আমরা দেখতে পাই, যাদের চন্দ্রসূর্য গ্রহনক্ষত্র বলি তাদের মধ্যে চাঁদটাই আমাদের সবচেয়ে কাছে। কিন্তু হিসাব করলে দেখি, সেও বড়ো কম নয়—প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল। মানুষের সবচাইতে ভয়ানক যে কামান, তার গোলা গিয়ে পড়ে ষাট মাইল দূরে। বড়ো-বড়ো কামানের মুখ থেকে অসম্ভব বেগে গোলা ছুটে বেড়ায়, কিন্তু তবুও সে পৃথিবীর টান ছাড়িয়ে যেতে পারে না। প্রথমে তার যতই তেজ থাকুক, শেষটায় ক্রমে নিস্তেজ হয়ে সেই পৃথিবীতেই ফিরে আসে। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন, একটা সাধারণ বড়ো কামানের গোলাকে যদি আর পাঁচ-দশ গুণ বেগে খাড়া আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া যায়, তা হলে সে আর কোনোদিন ফিরে আসবে না—একেবারে পৃথিবীর এলাকার বাইরে শূন্যের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে যাবে। গোলাটাকে যদি হিসাবমতো চাঁদের দিকে তাক করে ছেড়ে দেওয়া যায়, তা হলে সে একেবারে চাঁদের গায়ে গিয়ে ঢুঁ মেরে পড়বে। কতখানি জোরে, কিরকমভাবে গোলা ছুঁড়লে সে ঠিক চাঁদে গিয়ে পড়বে, তাও হিসাব করে বলে দেওয়া যায়।

এক ফরাসী লেখক চাঁদে যাওয়ার সম্বন্ধে একটা চমৎকার গল্প লিখেছিলেন। তাতে কয়েকজন লোককে একটা প্রকাণ্ড গোলার মধ্যে পুরে চাঁদের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল। একটা পাহাড়ের মধ্যে প্রকাণ্ড কামান গেঁথে গোলা ছুঁড়বার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গল্পের আর সব মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু গোলা যখন ছুটে বেরোল তখনো যে ভিতরের মানুষগুলো বেঁচে রইল, এটা কিছুতেই সম্ভব হয় না।

আজকাল শুনতে পাচ্ছি, কামানের গোলার চাইতে চাঁদে হাউই ছুঁড়ে মারা নাকি অনেক বেশি সহজ! আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত অধ্যাপক গডার্ড সাহেব একরকম আশ্চর্য নূতন ধরনের হাউই বানিয়েছেন! তার ভিতরে এমন অদ্ভুত নূতন কৌশলে বারুদ-মসলা পোরা থাকে যে, সে বারুদ একবারে সমস্তটা ফাটে না—থেকে থেকে এক-একবার

বারুদ ফুটে ওঠে আর তার ধাক্কায় হাউই ক্রমাগত এগিয়ে চলে। প্রথম ধাক্কাতেই হাউই অনেক দূর পর্যন্ত যায়, তার পর যেই তেজ থেমে আসতে থাকে, অমনি আবার দ্বিতীয় ধাক্কা এসে লাগে। সেটার বেগ কমতে না কমতেই আবার তৃতীয় ধাক্কা। এমনি করে নিজের ভিতরকার বারুদের কাছে বার বার ধাক্কা খেয়ে খেয়ে সে হাউই অসম্ভব উঁচুতে উঠে যায়।

গডার্ড সাহেবের তৈরি চার সের ওজনের একটা হাউই অনায়াসে দুশো মাইল উঁচুতে উঠতে পারে। আর বারুদসুদ্ধ ষোলো মণ ওজনের ঐরকম একটা হাউই বানিয়ে যদি আকাশের দিকে ছেড়ে দেওয়া যায়, তা হলে সে হাউই আর ফিরে, আসবে না। বারুদ ফুরাবার আগেই সে এতদূর গিয়ে পড়বে যে পৃথিবী তাকে আর কিছুতেই ফিরিয়ে আনতে পারবে না। তখন তার বেগ আর কমবে না; সে নিজের বেগে সোজা নিজের পথে যুগের পর যুগ ছুটে চলতে থাকবে---যদি পথের মধ্যে চাঁদ কিম্বা অন্য কোনো গ্রহ কিম্বা আর কিছুতে তাকে টেনে না নেয়। গডার্ড সাহেব বলেন, এইরকমের একটা হাউইকে চাঁদের দিকে ছেড়ে দিলে সে নিশ্চয়ই চাঁদে গিয়ে পৌঁছাবে। হাজার পাঁচেক টাকা হলেই নাকি এইরকম একটা হাউই বানানো যেতে পারে। চাঁদের অন্ধকার দিকটায় যদি হিসেব করে হাউই ফেলা যায়, আর হাউয়ের মধ্যে যদি এমন মসলা দেওয়া থাকে যে চাঁদের গায়ে ঠেকবামাত্র তাতে বিদ্যুতের আলোর মতো চোখ-ঝলসান আগুন জ্বলে ওঠে, তা হলে পৃথিবীতে বসে দুরবীন দিয়ে সেই আলোর ঝিলিক্ দেখে পণ্ডিতেরা বলতে পারবেন--'ঐ হাউই গিয়ে চাঁদের গায়ে পড়ল।'

আরো অনেকখানি বড়ো করে যদি চাঁদমারি হাউই বানানো যায়, আর তার মধ্যে দু-চারজন মানুষ থাকবার মতো ঘরের ব্যবস্থা করা যায় আর বড়ো-বড়ো চোঙায় ভরা বাতাস আর কিছু-দিনের মতো খাবার খোরাক যদি সঙ্গে দেওয়া যায়, তা হলে মানুষও চাঁদে বেড়াতে যেতে পারবে না কেন? চাঁদে লেগে হাউই যাতে চুরমার হয়ে না যায়, তার জন্য নানারকম বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। ফিরে আসবার সময় পৃথিবীমুখো করে হাউই ছাড়বার মতন ব্যবস্থাও সহজেই করা যায়। এর মধ্যেই নাকি কোনো কোনো উৎসাহী লোকে খুব সাহস করে গডার্ড সাহেবকে লিখেছেন যে, চাঁদে যাওয়ার জন্য যদি লোকের দরকার হয়, তা হলে তাঁরা যেতে রাজি আছেন। কেউ কেউ নাকি তার জন্য টাকাও দিতে চেয়েছেন! কিন্তু গডার্ড সাহেবের সেরকম কোনো মতলবই নেই।

যাহোক মানুষের খেয়াল চাপলে মানুষ সবই করতে পারে। হয়তো তোমরা সব বুড়ো হবার আগেই শুনতে পাবে যে চাঁদের দেশের প্রথম যাত্রীরা চাঁদে যাবার জন্য রওনা হয়েছে। তারা যদি গিয়ে ফিরে আসতে পারে, তা হলে কত যে আশ্চর্য অদ্ভুত কাহিনী তাদের কাছে শুনতে পাবে, তা এখন কল্পনা করাও কঠিন!

সন্দেশ—আষাঢ়, ১৩২৭

বায়োস্কোপ

ঘরের বাইরে ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি হচ্ছে। চেয়ে দেখ, খাড়া খাড়া রেখার মতো বৃষ্টির ধারা পড়ছে। এক-একটি ধারা এক-একটি বৃষ্টির ফোঁটা ; কিন্তু ফোঁটাগুলো মোটেই ফোঁটার মতো দেখাচ্ছে না- দেখাচ্ছে ঠিক লম্বা লম্বা আঁচড়ের মতো। একটা দড়ির আগায় একটা পাথর বেঁধে যদি খুব তাড়াতাড়ি ঘোরাতে পার তা হলে দেখতে মনে হবে, যেন আস্ত একটা চাকা ঘুরছে। কিন্তু তা বলে পাথরটা ঘুরবার সময় তো আর সত্যি করে চাকার মতো হয়ে যায় না। তবে এরকম দেখায় কেন ?

অন্ধকার রাত্রে আকাশের গা দিয়ে যখন উল্কা ছুটে যায় তখন তাদেরও দেখায় ঠিক ঐরকম একটানা লম্বা দাগের মতো। উল্কাটা জ্বলতে জ্বলতে যে পথ দিয়ে ছুটে গেল, মনে হয় যেন সেই পথের সমস্তটা বা অনেকখানি এক সঙ্গে জ্বলতে দেখলাম। কিন্তু আমরা জানি, উল্কাটা সত্যি সত্যি একই সময়ে ততখানি লম্বা জায়গা জুড়ে ছিল না। সেটা আগে এখানে, পরে ওখানে, তার পর সেখানে, এমনি করে ক্রমাগত ছুটে চলেছে—কিন্তু সে খুব তাড়াতাড়ি চলছে বলে মনে হয় যেন একই সময়ে তাকে এখানে ওখানে সেখানে দেখতে পাচ্ছি। বৃষ্টির ফোঁটার বেলাও তেমনি হয়। এইমাত্র তাকে দেখছি মাটির থেকে বিশ হাত উঁচুতে ; কিন্তু এই দেখাটুকু মন থেকে মুছতে না মুছতে সেই ফোঁটাটা একেবারে মাটি পর্যন্ত নেমে পড়েছে। তাই মনে হচ্ছে যেন একই সময়ে বিশ হাত উঁচু থেকে মাটি পর্যন্ত সমস্তটা জায়গা জুড়েই ফোঁটাটাকে দেখতে পাচ্ছি।

এইরকম পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, চোখ দিয়ে আমরা যা দেখি, চোখের দেখা শেষ হলেও তাকে আমাদের মন খানিকক্ষণ পর্যন্ত ধরে রাখে। সে অতি অল্প সময়—এক সেকেণ্ডের পাঁচ ভাগের এক ভাগ, অথবা তার চাইতেও কম।

মনে কর, একটা ছবির দিকে তুমি তাকিয়ে আছ। আমি মাঝে থেকে তোমার চোখের সামনে আড়াল দিলাম, তুমি আর সে ছবি দেখতে পারছ না। যদি আড়াল সরিয়ে নেই, অমনি আবার দেখতে পাবে। যদি বার বার আড়াল দেই আর বার বার সরাই, তা হলে মনে হবে, ছবিটা বার বার দেখা যাচ্ছে আর বার বার অদৃশ্য হচ্ছে। কিন্তু এই কাজটি যদি খুব তাড়াতাড়ি করতে পারি; অর্থাৎ মনে কর প্রতি সেকেণ্ডে যদি দশবার আড়াল পড়ে আর দশবার দেখতে পাও, তা হলে আর আড়াল-দেওয়া টের পাবে না। মনে হবে আগাগোড়াই স্থিরভাবে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ! প্রথম যে ছবি দেখছ, তার জের ফুরোতে না ফুরোতে দ্বিতীয়বারের ছবিটা এসে পড়ছে ; এই দ্বিতীয়বারের 'রেশটুকু' থাকতে থাকতেই আবার তৃতীয়বারের ছবিটা চোখে পড়ছে। তাই মনে হয়, আগাগোড়াই সমান দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু ছবিটা যদি আগাগোড়া একইরকম না থেকে ক্রমাগত বদলিয়ে যেতে থাকে ? মনে কর, একটা সঙ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পর ক্রমে সে কাত হয়ে শুয়ে পড়ছে, তার পর মাথা নিচু করে ঠ্যাং দুটোকে ঘুরিয়ে, কেমন ডিগবাজি খেয়ে, শেষটায় আবার

সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে ! এই ছবিগুলো যদি খুব তাড়াতাড়ি একটার পর একটা ঠিকমত তোমার চোখের সামনে ধরে দেওয়া যায়, তা হলে তোমার মনে হবে সত্যি সত্যি যেন ছবিতে সওটা ডিগবাজি খাচ্ছে ।

আজকাল যে শহরে শহরে, এমন-কি, পাড়াগাঁয়ে পর্যন্ত লোকেরা বায়োস্কোপ দেখে তার সংকেতও এইরকম। খুব চট্‌পট্ করে যদি কোনো চলতি জিনিসের অনেকগুলো ফোটো নেওয়া হয়—আর তার পর যদি সেই ফোটোগুলোকে তেমনি তাড়াতাড়ি, সেকেণ্ডে দশ-বারোটা করে পরপর চোখের সামনে ধরে দেখানো হয়, তা হলেই বায়োস্কোপ দেখানো হল। মনে কর, বায়োস্কোপে তোমার, ভাত-খাওয়ার ছবি নেওয়া হচ্ছে। তা হলে কিরকম হবে ?—প্রথম ছবিতে হয়তো তুমি ভাতের গ্রাস ধরেছ, তোমার মুখটা তখনো বোজা আছে ! দ্বিতীয় ছবিতে থালা থেকে তোমার হাত উঠছে, মুখটাও একটু খুলতে চাচ্ছে। তৃতীয় ছবিতে হাতখানা আরো উঠেছে, মুখেও বেশ ফাঁক দেখা দিয়েছে। তার পর হাতটা ক্রমেই মুখের কাছে এগিয়ে আসছে আর মুখের হাঁ-টাও বেশ বড়ো হয়ে আসছে। তার পর হাত গিয়ে মুখে ঠেকেছে, তার পর মুখের মধ্যে গ্রাস ঢুকছে ইত্যাদি ।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে প্রথম যে বায়োস্কোপের ছবি তোলা হয়েছিল, সেই ছবি তুলবার জন্য চব্বিশটা ফোটোগ্রাফের কল পর পর সাজানো হয়েছিল আর প্রত্যেকটা কলের সামনে এক-একটা সুতো এমনভাবে টেনে বাঁধা হয়েছিল যে ঘোড়াটা কলের সামনে দিয়ে যেতে গেলেই সুতো ছিঁড়ে যাবে, আর ক্যামেরাতে ঘোড়ার ফোটো উঠে যাবে। আজকালকার বায়োস্কোপ-কলের বন্দোবস্ত এরকম নয়। তাতে একটা লম্বা ফিতের উপর পর পর হাজার হাজার ছোটো-ছোটো ফোটো তোলা হয়। এক-একটা ছবি ওঠে আর ফিতেটা এক-এক ঘর সরে যায়। এমনি করে প্রত্যেক সেকেণ্ডে দশ-বারোটা করে ফোটো তোলা হয়—ঘণ্টায় প্রায় চল্লিশহাজার !

এমন কলও তৈরি হয়েছে যাতে প্রতি সেকেণ্ডে পাঁচহাজার ফোটো তোলা যায়। এই-রকম তাড়াতাড়ি ফোটো তুলে তার পর যদি দেখাবার সময়ে বেশ ধীরে ধীরে সাধারণ বায়োস্কোপের ছবির মতো দেখানো হয় তা হলে খুব দ্রুত ঘটনার ছবিও বেশ স্পষ্ট করে সহজভাবে দেখবার সুবিধা হয়। একটা সাবানের বুদ্বুদের ভিতর দিয়ে বন্দুকের গুলি ছুটে গেলে বুদ্বুদটা কিরকম করে ফেটে যায় তাও দেখানো যায়। চোখে দেখলে এই ব্যাপারটা হঠাৎ এক মুহূর্তে শেষ হয়ে যায়—বন্দুক ছুটল আর বুদ্বুদ ফাটল এইটুকুই খালি বোঝা যায়। কিন্তু ছবিতে স্পষ্ট করে দেখা যায় কেমন করে গুলিটা বুদ্বুদটাকে ফুটো করে ঢোকে, আবার ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়, আর বুদ্বুটাও ফেটে চুপসে একেবারে মিলিয়ে যায়। আবার যে-ব্যাপারটা ঘটতে অনেক সময় লাগে তাকেও বায়োস্কোপের ছবিতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে চট্‌পট্ ঘটিয়ে দেখানো যায়। ফুলগাছের টবে সবেমাত্র অঙ্কুর গজাচ্ছে, সেই অঙ্কুর থেকে গাছ হবে, সেই গাছ বাড়বে, তাতে কুঁড়ি ধরবে, তার পর ফুল ফুটবে—বসে বসে দেখতে গেলে কতদিন সময় লাগে ! বায়োস্কোপে যদি তার ছবি তোল, এক-এক দিনে দশ-বারোটা বা পঁচিশ-ত্রিশটা করে—আর দেখবার সময় চট্‌পট্ দেখিয়ে যাও—তা হলে দেখবে যেন চোখের সামনেই দেখতে দেখতে গাছ গজিয়ে বেড়ে উঠছে আর ফুল ফুটছে !

সন্দেশ—ভাদ্র, ১৩২৭

ভুঁইফোঁড়

কেঁচোরা যে মাটি ফুঁড়ে চলে তা তোমরা সকলেই জান, কিন্তু কেমন করে চলে জান কি? কেঁচোর শরীরটা একটা লম্বা ফাঁপা চোঙার মতো, তার দুইদিকেই ফুটো। একদিক দিয়ে কেঁচো মাটি গিলতে থাকে, আর-একদিক দিয়ে সেই মাটি সরু সুতোর মতো হয়ে ক্রমাগতই বেরিয়ে যায়। এমনি অদ্ভুতরকম করে মাটি খেয়ে খেয়ে আর সরিয়ে সরিয়ে কেঁচোরা মাটির মধ্যে ঢোকে।

কেঁচোর বিদ্যেটাকে আজকাল মানুষও শিখে নিয়েছে! মানুষে ভারি ভারি কেঁচো-কল বানিয়ে, তা দিয়ে মাটির মধ্যে বড়ো বড়ো সুড়ঙ্গ কেটে ফেলে। ইউরোপ আমেরিকার অনেক শহরের তলায় মাটির নীচে যে-সমস্ত রেল রাস্তার সুড়ঙ্গ থাকে, সেগুলোর অধিকাংশই কেঁচো-কল দিয়ে কাটানো হয়।

কেঁচো-কল কিরকম জানো? প্রকাণ্ড মজবুত লোহা-বাঁধানো নলের মতো জিনিস, তার মধ্যে ভারী কলকব্জা। নলের মাথাটা কলের ধাক্কায় ক্রমাগত জমাট মাটির মধ্যে ঢুঁ মেরে এগিয়ে চলতে চায়। মাটি আর সরবার পথ পায় না, কাজেই সে হাঁ-করা চোঙার ভিতর দিয়ে নলের মধ্যে ঢুকে কলের পিছন দিকে বেরিয়ে এসে জমতে থাকে। এমনি করে কেঁচো-কল এগিয়ে চলে আর আপনি আপনি সুড়ঙ্গ কাটা হয়ে যায়। কলের সঙ্গে সঙ্গে লোকজন সব চলতে থাকে, তারা ক্রমাগতই মাটি সরায়, রেল বসায়, আর সুড়ঙ্গের ভিতর-টাকে মজবুত লোহায় মোড়া পাকা গাঁথনি দিয়ে বাঁধিয়ে দেয়। বড়ো-বড়ো এক-একটা কেঁচো কল এক-এক দমে পাঁচ-ছয় হাত এগিয়ে যায়; তার পর আবার কলকব্জা গুটিয়ে দম নিতে থাকে। এমনি করে নরম মাটিতে সারাদিনে হয়তো একশো হাত সুড়ঙ্গ কাটে।

লণ্ডন শহরের পঁচিশ-ত্রিশ বা চল্লিশ হাত নীচেকার মাটি খুব নরম। কেঁচোকলের ঠেলায় পড়লে সে মাটি কচ্‌কচ্‌ করে কেটে যায়। কিন্তু মাটি যদি ইঁটের মতন শক্ত হয়—যদি পাথরের মধ্যে সুড়ঙ্গ কাটা দরকার হয়—তা হলে আর কেঁচোকলের শক্তিতে কুলায় না। তখন অন্যরকম ভুঁইফোঁড় কলের ব্যবস্থা করতে হয়। মাটি কাটার চাইতে পাথর কাটার হাঙ্গামা অনেক বেশি। কতরকম সাংঘাতিক কল দিয়ে পাথরকে কেটেকুটে খুঁড়েফুঁড়ে খুঁচিয়ে পিটিয়ে তবুও যখন পারা যায় না—যখন যন্ত্রের মুখ ক্রমাগতই ভোঁতা হয়ে যায়, কলের ফলা বারেবারেই ভাঙতে থাকে, সারাদিন পরিশ্রমের পর সুড়ঙ্গ পাঁচ হাত এগোয় কিনা সন্দেহ—তখন বোমাবারুদ ফুটিয়ে, পাথর উড়িয়ে পথ করতে হয়। এমন পরিশ্রমের কাজ খুব কমই আছে। এক-একটা ছোটোখাটো পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ বসাতে কত সময়ে বছরের পর বছর কেটে যায়।

লণ্ডনের যে সুড়ঙ্গ-রেল, তাকে সেদেশে 'টিউব' (Tube) বলে। শহরের মাঝে মাঝে টিউব স্টেশন থাকে, সেখানে ঢুকে টিকিট্‌ঘরের জানালা দিয়ে টিকিট কিনতে হয়, অথবা

টিকিট-কলে এক পেনি বা দু পেনি ফেলে দিয়েও টিকিট নেওয়া যায়। তার পর একটা লিফট বা চল্‌তিঘরে ঢুকতে হয়, সেখানে টিকিট দেখে। চল্‌তিঘর বোঝাই হলেই লোহার দরজা বন্ধ করে দেয় আর ঘরসুদ্ধ সবাই একটা খাড়া পাতকুয়ার মতো সুড়ঙ্গ বেয়ে মাটির মধ্যে অন্ধকারে নামতে থাকে। পাঁচতলা বা সাততলা বাড়ির সমান নীচে নামলে পর পাতকুয়ার তলায় স্টেশনের প্লাটফরম পাওয়া যায়। সেখানে চারিদিকে বিদ্যুতের আলো। দুমিনিট পরে পরে একটা করে ট্রেন আসে আর আধ মিনিট করে থামে। এক-একটা ট্রেনে লম্বা-লম্বা পাঁচ-সাতটা গাড়ি, প্রত্যেক গাড়ির সামনে পিছনে লোহার ফটক। ফটকের পাশে লোক বসে থাকে, তারা 'আর্লস্ কোর্ট' 'পিক্যাডিলি' 'হোবর্ণ' বলে সব স্টেশনের নাম ডাকে আর ফটক খুলে দেয় আর লোকেরা সব হুড়্ হুড়্ করে ওঠে আর নামে।

ট্রেনের বন্দোবস্ত এমন আশ্চর্য কোথাও বিপদের ভয় নেই। সামনে যদি কোথাও ট্রেন আটকিয়ে থাকে, তা হলে পিছনের ট্রেন আপনা থেকেই থেমে পড়বে। ট্রেনের ড্রাইভার বা চালক যদি হঠাৎ মরেও যায়, তবুও ট্রেন স্টেশনের ধারে এসেই দাঁড়িয়ে যাবে। পাতাল-পুরীর ট্রেন, সেখানে বাতাস চলবার ব্যবস্থা খুব ভালো করেই করতে হয়। বড়ো বড়ো দম-কলের হাওয়া দিয়ে সমস্ত টিউবটাকে সারাক্ষণ ভরিয়ে রাখতে হয়। ট্রেনগুলি সব বিদ্যুতে চলে, তাতে আগুনও জ্বলে না, ধোঁয়াও ছাড়ে না।

অনেক সময় নদীর তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ বসাবার দরকার হয়। নদী যদি খুব বড়ো আর খুব গভীর হয়, তা হলে তার তলা দিয়ে মাটির মধ্যে সুড়ঙ্গ নেওয়া এক ভীষণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় এ কাজটিকে সহজ করার জন্য এক চমৎকার কৌশল খাটানো হয়। আগে ডাঙার উপর সুড়ঙ্গ বানিয়ে, তার পর সেই সুড়ঙ্গ ভাসিয়ে নদীর মধ্যে ঠিক জায়গায় নিয়ে ডুবিয়ে দেয়। তাতে হাঙ্গামও কমে, খরচও বাঁচে, কাজও হয় খুব তাড়াতাড়ি।

বড়ো-বড়ো শহরের বড়ো-বড়ো কাণ্ড। ঘোড়া মোটর রেল ট্রাম তো সারাদিনই লোকে ভর্তি, তার উপর ডাক পার্শেল মাল মোটেরও অন্ত নাই। রাস্তার উপরেও যেমন, নীচেও তেমন— উপরেই বরং হৈচৈ, মাটির নীচে সব ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়ম বাঁধা। এক আমেরিকার শিকাগো শহরেই সুড়ঙ্গের রেলগাড়িতে প্রতিদিন সাড়ে সাতলক্ষ মণ মাল পারাপার করে। সেখানকার বড়ো-বড়ো দোকানের আর গুদামখানার নীচের তলায় সুড়ঙ্গ থাকে, একেবারে মাটির নীচে রেলের লাইন পর্যন্ত। তারা মালপত্র সব সেখান দিয়ে শহরের তলায় তলায় চালান করে।

কথা হচ্ছে, কলকাতায় এইরকম ভুঁইফোঁড় সুড়ঙ্গের রেল বসানো হবে। তা যদি হয়, তখন আর বর্ণনা করে বোঝাবার দরকার হবে না, টিকিট কিনে চড়ে দেখলেই পারবে, আর মনে করবে, এ আর একটা আশ্চর্য কি? এখন কলকাতার শহরে মোটর গাড়ি দেখলে কেউ ফিরেও তাকায় না; কিন্তু আমার বেশ মনে পড়ছে, এক সময়ে সামান্য একটা বাইসাইকেল দেখবার জন্য আমরা কিরকম উৎসাহ করে দৌড়ে আসতাম।

সন্দেশ—আশ্বিন, ১৩২৭

মামার খেলা

মামা বললেন, "আয়, একটা নূতন খেলা খেলবি আয়।" শুনে সবাই দৌড়ে এসে বসল, "কি খেলা, মামা?"

মামা বললেন, "এ খেলার নিয়ম খুব সহজ, কিন্তু খেলতে হলে খুব হুঁশিয়ার হওয়া চাই। নিয়ম হচ্ছে এই যে, সবাই যেমন ইচ্ছা কথা বলতে পারবে, কিন্তু এক-একটা অক্ষর বাদ দিয়ে।" সবাই বললে, "সে আবার কিরকম?"

মামা—এই মনে কর, যেন 'ক' বলব না—এমন কোনো কথাই বলব না, যার মধ্যে কোথাও 'ক' আছে। যেমন—কলা, কৃপণ, হাল্‌কা, বাক্স এ-সব কিছুই বলতে পারব না। পটলা অমনি চট্ করে বলে উঠল, "এ আর মুস্কিল কিসের? ও-সব না বললেই হল।"

মামা বললেন, "না বললে তো হলই, কিন্তু না বলে পারিস কিনা একবার দেখ তো।"

পটলা—আচ্ছা বেশ—এই দেখ, আমি 'ক' বলব না—

মামা—আচ্ছা আয় দেখি, আমার সঙ্গে গল্প কর, আমিও 'ক' বলব না। এই খেলা আরম্ভ হচ্ছে—ওয়ান টু থ্রি। —হ্যাঁরে পটলা, তুই এখন বোধোদয় পড়িস?

পটলা—বোধোদয়! সে তো কোনো কালে—ঐ যা! 'ক' হয়ে গেল। আচ্ছা দাঁড়াও, আবার বলছি। বোধোদয় আমি অনেকদিন হল—

হারু, বিশু, কালু—অ্যাঁ! 'অনেক' বললে যে!

পটলা—ও তাই তো! আচ্ছা বলছি—বোধোদয় আমার বহুত দিন হল শেষ হয়েছে—এখন চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ পড়ছি।

মামা—বেশ বেশ, খুব বলেছিস। পড়াশুনো বেশ চলছে তো? না রোজ মাস্টারমশাই মার লাগান?

পটলা—ইস্! তা বৈ—বাস্ রে, বড্ডো সামলে গেছি। না মারবেন কেন?—দুত্তরি এ ছাই খেলা।

হারু—আমি খেলব মামা—আমি 'ল' বলব না।

মামা—বলবি নে? আচ্ছা আমি এক্ষুনি বলাচ্ছি তোকে। আমিও 'ল' বাদ দিলাম—ওয়ান টু থ্রি। হ্যাঁরে হারু, তুই মাথা মুড়িয়েছিস কেন?

হারু—ওটা—ওটা নাপিতে কামিয়ে দিয়েছে।

মামা—নাপিতে কামড়িয়ে দিয়েছে কেন?

হারু—না, কামড়িয়ে নয়—কামিয়ে।

মামা—ও, কামিয়ে? কি দিয়ে? কাস্তে দিয়ে?

হারু—না, ক্ষুর দিয়ে—

মামা—বেশ বেশ। তা কিরকম করে কামায় একটু বুঝিয়ে দে তো, সবাই শুনুক।

হারু—এই একটা বাটির মধ্যে খ্যানিকটা—ঐ যা! দাঁড়াও বলছি—খানিকটা Water

দিয়ে তার পর একটা চামড়ার উপর ক্ষুর ঘষে ঘষে ধার দিয়ে, কচ্‌কচ্‌ করে—হ্—কচ্‌কচ্‌ করে—

পটলা—কচ্‌কচ্‌ করে চালিয়ে দিল।

বিশু—বুলিয়ে গেল। না, তা হলেও হয় না—

হারু—কচ্‌কচ্‌ করে সব সাবাড় করে দেয়।

মামা বেশ, বেশ, এই তো চমৎকার হচ্ছে। হুঁশিয়ার থাকা চাই আর চট্‌পট্‌ কথা জোগানো চাই। আচ্ছা, তোর বড়দা আসবে কবে ?

হারু -(মাথা চুলকাইয়া) এই—আজকের দিনের পরের দিন।

মামা- দুপুরের ট্রেনে বুঝি ?

হারু না, বিকেল—ঐ যা। 'ল' হয়ে গেল।

কালু- আমি খেলব। আমি 'য' বলব না।

মামা তার চেয়ে বল না, হয়ে ময়ে 'ক্ষ' বলব না ? সব গোলমাল চুকে যায়।

কালু তা হলে কোনটা বলব না বলে দাও।

মামা—আচ্ছা, 'ন' বলিস নে। আয় দেখি—ওয়ান টু থ্রি—খেলাটা বুঝতে পেরেছিস তো ?

কালু -হ্যাঁ।

মামা -কিরকম বুঝেছিস বল তো—

কালু—খুব ভালো।

মামা—(ভ্যাংচাইয়া) খুব ভালো। তুই কথা বলতে শিখেছিস কবে থেকে ?

কালু -ছেলেবেলা।

মামা—আর এই বুড়োবেলায় বুঝি বোবামি শিখেছিস ?

কালু—দ্যুৎ !

মামা এটা দেখি আচ্ছা ট্যাঁটা মুখ বুজেই থাকবে! ওরে, একটু কথা-টথা বল, চুপ করে থাকলে কি খেলা হয় ?

কালু—(অনেক ভাবিয়া) মামা, তুমি কি খাও ?

মামা—তোমার মাথা খাই। গাধা কোথাকার। বলি ঝগড়ার সময় কি তুই ঘাড় গুঁজে চুপ করে থাকিস্‌ ?

কালু -উঁহু।

মামা- কি করিস তা হলে ?

কালু—ঝগড়া করি!

মামা -(চটিয়া) ঝগড়াটা কিরকম শুনি—(জিভ কাটিয়া) হ্যাঁ, কিরকম বল তো।

অমনি সকলের তুমুল চীৎকার—"ন' বলেছে—মামা 'ন' বলেছে—মামা কালুর সঙ্গে হেরে গিয়েছে।"

মামা বললেন, "যা! তোদের আর খেলাটেলা কিছু শেখাব না—তোরা বেজায় ফচ্‌কে হয়েছিস।"

সন্দেশ—আশ্বিন, ১৩২৭

ডাকের কথা

মাস্টারমশাই ইতিহাস পড়াতে পড়াতে বললেন, "শের শা ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি করেছিলেন।" একটি ছেলে অমনি জিজ্ঞাসা করল, "তার আগে কি ঘোড়ায় ডাকত না?" মাস্টারমশাই হো হো করে হেসে উঠলেন আর বললেন, "ঘোড়ায় ডাকত বটে, কিন্তু ডাক বইত না।" তখন ছেলেটি বুঝতে পারলে যে 'ডাক' মানে এখানে গলার 'ডাক' নয়—এ হচ্ছে চিঠির ডাকের কথা। এখনো অনেক দেশে ঘোড়ার ডাক চলছে; কিন্তু প্রায় সব দেশেই তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি ডাক পাঠাবার বন্দোবস্ত হয়েছে।

মানুষের স্বভাবই এই যে, সে যত পায় তত চায়। রেলের সৃষ্টি হওয়ার পর আমরা শত শত মাইল দূরের চিঠিও একদিনেই পেয়ে যাই; কিন্তু সেখানে যদি একদিনের দেরি হয়, তা হলেই আমরা অনেক সময় বিরক্ত হই।

শুধু যদি রেল আর জাহাজে করেই ডাক নেওয়া হত তা হলে তো আর কোনো ভাবনাই ছিল না। কিন্তু, তা তো আর হবার জো নাই। সব জায়গায় রেলও চলে না; জাহাজও সব জায়গায় যায় না। সে-সব জায়গায় যে কতরকমে ডাক যায়, তা আর কি বলব! মানুষে তো পিঠে করে ডাক নিয়ে যায়ই—তাকে 'রানার' বলে তা ছাড়া,ঘোড়ার পিঠেও ডাক যায়। এ ছাড়া কতরকমের গাড়ি করে যে ডাক যায় তাই-বা কি বলব। ঘোড়ার গাড়ি, গোরুর গাড়ি, উটের গাড়ি, মানুষে-টানা গাড়ি, ঠেলা গাড়ি আরো কতরকমের গাড়ি! মোটর গাড়িও হয়েছে আজকাল। গাড়ি ছাড়া নৌকা করেও ডাক যায়—ডিঙি, ডোঙা, পানসি, সাম্পান, বজরা—আরো কতরকমের। যেখানে নৌকা চলে না অথচ জল পার হতে হয়, কিম্বা এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যেতে হয়, সেখানে অনেক সময় দড়ি কিম্বা তারে ডাকের থলি ঝুলিয়ে পার করে। যে-পারে থলিটা পাঠাতে হবে, সে-পারে একটু নিচু জায়গায় দড়ি কিম্বা তার বাঁধে; এপারে বেশ উঁচু জায়গায় বাঁধে। থলিটাতে একটা বড়ো কড়া লাগিয়ে দিয়ে দড়ির ভিতরে সেই কড়া পরিয়ে দেয়। তার পর, দড়িটা টান করে ধরলে থলিটা আপনা থেকেই সড়্‌সড়্‌ করে গড়িয়ে ও-পারে চলে যায়।

যে-সব দেশে মোটেই রেলগাড়ি চলে না, সেখানেই বড়ো মুস্কিল। তুর্কিস্থানে রেল নাই; সেখানে শত শত মাইল পথে কেবল ঘোড়ার ডাকই চলে। দেশের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় যদি কোনো চিঠি পাঠাতে হয়, তা হলে প্রায় দেড় মাস সময় লাগে! তোমরা হয়তো ভাবছ, 'এমন দেশও আছে এখন?' কিন্তু এ কথা একবার ভেবে দেখ-না কেন যে, এর চেয়েও খারাপ অবস্থা আছে অনেক দেশের—ডাকের বন্দোবস্তই নাই সে-সব জায়গায়।

এ তো গেল একদিকের কথা। আরেকদিকে দেখ, কত তাড়াতাড়ি ডাক পাঠাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে আজকাল। রেলে ডাক পাঠিয়েও সন্তুষ্ট নয়—এখন এরোপ্লেনে পাঠাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে অনেক দেশে। তাতে এত তাড়াতাড়ি ডাক যাবে যে এখনকার সঙ্গে তুলনাই হয় না। রেলগাড়ি খুব তাড়াতাড়ি চললেও গড়পড়তা পঞ্চাশ-ষাট মাইলের বেশি প্রায় যায় না। কিন্তু

এরোপ্লেন অনায়াসেই ঘণ্টায় একশো মাইলের বেশি যায়। তা ছাড়া, এরোপ্লেন একেবারে সোজা রাস্তা ধরে চলে--তার জন্য আর রাস্তা তৈরি করতে হয় না—কোনো বাধাই নাই তার। আমেরিকাতে আজকাল নিয়মমতো এরোপ্লেনে ডাক যায়। ভারতবর্ষের এক কোনা থেকে আরেক কোনায় ডাক যেতে যত সময় লাগে কয়েক বৎসর পর হয়তো সেই সময়ের মধ্যেই বিলাতের ডাক এদেশে এরোপ্লেনে পৌঁছে যাবে।

সন্দেশ—কার্তিক, ১৩২৭

কাঠের কথা

কেউ কেউ হয়তো বলবে, "দূর ছাই! কাঠের কথা আবার শুনব কি? ভারি তো জিনিস তাই নিয়ে আবার কথা!" তা বলতে পার কিন্তু কাঠ যে মানুষের কাজের পক্ষে কত বড়ো দরকারি জিনিস, তা একবার ভেবে দেখেছ কি? এখন নাহয় সভ্য মানুষে কয়লা, কেরোসিন, গ্যাস বা ইলেকট্রিক চুল্লির ব্যবহার শিখেছে; কিন্তু তার আগে তো জ্বালানি কাঠ না হলে মানুষের রান্নাবান্না কলকারখানা কিচ্ছুই চলত না, শীতের দেশে মানুষের বেঁচে থাকাই দায় হত। এই তো কিছুকাল আগেও কাঠের জাহাজ না হলে মানুষে সমুদ্রে যেতে পারত না, কাঠের কড়ি বরগা থাম না হলে তার ঘর বাড়ি তৈরি হত না।

বলতে পার, এখন তো এ-সবের জন্য কাঠের ব্যবহার কমে আসছে। তা সত্যি! এমন-কি, ঘরের দরজা জানালা আসবাবপত্র পর্যন্ত ক্রমে কাঠের বদলে অন্য জিনিস দিয়ে তৈরি হতে থাকবে তাতেও কোনো সন্দেহ নাই! আর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই হয়তো দেখবে, ঘরে ঘরে নানারকম ঢালাই-করা মেটে পাথরের আসবাবপত্র। কিন্তু তবুও দেখা যায় যে খুব 'সভ্য' জাতিদের মধ্যেও কাঠের ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে চলছে, কমবার লক্ষণ একটুও দেখা যায় না। প্রতি বৎসরে এত কোটি মণ কাঠ মানুষে খরচ করে এবং তার জন্য এত অসংখ্য গাছ কাটতে হয় যে অনেকে আশঙ্কা করেন, হয়তো বেহিসাবী যথেচ্ছ গাছ কাটতে কাটতে কোনো দিন পৃথিবীতে কাঠের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হবে। এরকম যে সত্যি সত্যিই হতে পারে, তার প্রমাণ নানা দেশে পাওয়া গিয়েছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এক সময় এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন ছিল আর তাতে এত অসংখ্য গাছ ছিল যে লোকে বলত এ দেশের কাঠ অফুরন্ত---এরা সমস্ত পৃথিবীময় কাঠ চালান দিয়েও কোনোদিন এত গাছ কেটে শেষ করতে পারবে না। কিন্তু সে দেশের লোকে এমন বে-আন্দাজ ভাবে এর মধ্যে বন জঙ্গল সব কেটে প্রায় উজাড় করে ফেলেছে যে এখন তারা নিজেরাই অন্য দেশ থেকে কাঠ আমদানী করতে বাধ্য হচ্ছে।

প্রতিদিন জাহাজ বোঝাই করা লক্ষ লক্ষ মণ কাঠ সাগর পার হয়ে নানা দেশ হতে নানা দেশে চলেছে। এত কাঠ লাগেই-বা কিসে, আর আসেই-বা কোথা থেকে? কানাডা রুশিয়া নরওয়ে ভারতবর্ষ অস্ট্রেলিয়া—কত জায়গা থেকে কাঠ চলেছে ইউরোপ আমেরিকার বড়ো-বড়ো বন্দরের দিকে। যেখানেই নতুন রেলের লাইন হচ্ছে সেখানেই লাইনের নীচে

দিবার জন্য ভারি ভারি কাঠের 'স্লিপার' চাই—যেখানেই মাটির নীচে খনি খোঁড়ার কাজ চলছে সেখানেই খনির দেয়ালে ছাদে ঠেকা দিবার জন্য বড়ো-বড়ো কাঠের গুঁড়ি কাঠের থাম দরকার হচ্ছে। ইউরোপের বড়ো-বড়ো শহরে রাস্তা বাঁধাবার জন্য কত অসংখ্য কাঠ ইঁটের মতো চৌকো করে কেটে বসানো হচ্ছে।

কিন্তু কাঠকে কাজে লাগাবার জন্য আজকাল এর চাইতেও অনেক অদ্ভুত উপায় বের করা হয়েছে। কাঠ থেকে যে কাগজ তৈরি হয়, তা বোধ হয় তোমরা সকলেই জান। যত খবরের কাগজ দেখ, সে-সমস্তই কাঠের কাগজে ছাপা। কেবল কাগজ তৈরির জন্যই প্রতি বৎসর প্রায় দশকোটি মণ কাঠের দরকার হয়। কাঠওয়ালারা কাঠকে পিটিয়ে থেঁৎলিয়ে সিদ্ধ করে একটা অদ্ভুত জিনিস বানায়, তার নাম 'উড্‌পাল্প্' (Wood-Pulp)। বাংলায় 'কাঠের আমসত্ত' বললে বর্ণনাটা নেহাত মন্দ হয় না। কাগজওয়ালারা নানা দেশ থেকে এই অপরূপ আমসত্ত কিনে এনে তা দিয়ে কাগজ বানায়। আগে এইরকমে কেবল সাধারণ সস্তা এবং খেলো কাগজই তৈরি হত কিন্তু আজকাল কাঠকে নানারকম প্রক্রিয়ায় ধুয়ে এমন পরিষ্কার এবং বিশুদ্ধ করা হচ্ছে যে তা থেকে খুব উঁচু দরের ভালো কাগজ পর্যন্ত তৈরি হতে পারে।

কাঠের মধ্যে প্রধান জিনিসটি হচ্ছে সেলুলোস্ (Cellulose); কাঠকে বিশুদ্ধ করা মানে এই জিনিসটিকে খাঁটি অবস্থায় বের করা। পরিষ্কার সাদা তুলো দেখেছ ত? সেই তুলোও সেলুলোস্ ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমি যে ধুতি পরে আছ সেও হচ্ছে সেলুলোসেরই ধুতি। কাঠ থেকে যে সেলুলোস্ বেরোয় তাতে তুলোর মতো আঁশ থাকে না কিন্তু তা থেকে খুব সস্তায় অনেক আশ্চর্য জিনিস তৈরি হচ্ছে। সেলুলোস্‌কে রাসায়নিক উপায়ে বগলিয়ে একরকম আঠালো জিনিস তৈরি হয় তা থেকে টেনে সুতোর মতো সেলুলোসের আঁশ বার করা যায়। এই উপায়ে ইউরোপে প্রতি বৎসর কুড়ি লক্ষ মণ 'নকল রেশম' তৈরি হয়। তার চেহারা অনেক সময়ে আসল রেশমের চাইতেও সুন্দর হয়। এই 'রেশম' দেশ-বিদেশে চালান দেওয়া হয়—আর কত শৌখিন লোকে সেই রেশমের পোশাক পরে বেড়ায়। তারা জানেও না যে তারা কাঠের পোশাক পরেছে!

এই সেলুলোস্ থেকে নাকি খুব সস্তায় খাঁটি 'স্পিরিট্', অর্থাৎ আল্‌কোহল (Alcohol) বা সুরাসার প্রভৃতি অনেক জিনিস তৈরি হতে পারবে। তখন মানুষের কলকারখানা এঞ্জিন মোটর জাহাজ সব নাকি কাঠের স্পিরিট জ্বালিয়ে চালানো হবে। অনেক হাজাররকম ওষুধ-পত্র আরক প্রভৃতি তৈরি করবার কাজে এই সুরাসার না হলে চলে না; রাসায়নিক কার-খানায় এমন দরকারি জিনিস খুব কমই আছে। সুতরাং কাঠের কুচি আর করাতের গুঁড়ো থেকে যদি এমন জিনিসটাকে সস্তায় পাওয়া যায় তবে তাতে যে কতদিকে মানুষের কতরকম সুবিধা হবে সে আর বলে শেষ করা যায় না। শোনা যায়, শীঘ্র নাকি বাজারে কাঠের চিনি বেরোবার সম্ভাবনা আছে। নকল চিনি নয়, সত্যিকারের চিনি!

এতক্ষণ আমরা কাঠের গুণ ব্যাখ্যা করেছি, এখন তার জীবনচরিতের একটু পরিচয় নেওয়া যাক। পৃথিবীর নানা দেশে যত কাঠ আমদানী হয় তার মধ্যে কানাডার কাঠই সবচাইতে বেশি। সেদেশে শীতকালের গোড়াতেই গাছ কাটা আরম্ভ হয়। তার পর

যখন বরফ পড়ে পথঘাট সব পিছল হয় তখন সেই পিছল পথের উপর দিয়ে গাছের গুঁড়িগুলোকে টেনে নিয়ে নদীর ধারে কিম্বা রেলের লাইনে নিয়ে হাজির করে। যে বৎসর খুব তাড়াতাড়ি শীত পড়ে যায় কিম্বা খুব অতিরিক্ত বরফ পড়ে সে বৎসর তাদের ভারি কষ্ট। একে শীতের কষ্ট, তার উপর আবার নরম বরফের মধ্যে দিয়ে কাঠ টানবার কষ্ট। কাঠ নেবার বন্দোবস্ত এক-এক জায়গায় এক-একরকম, পথ ঘাটের অবস্থা বুঝে কোথাও ঘোড়ায়-টানা বা গোরুতে-টানা গাড়িতে করে কাঠ নেয়; কোথাও গাছের গুঁড়িগুলো ভারি ভারি মজবুত তক্তার উপর চাপিয়ে সেই তক্তা হিড়্হিড়্ করে টেনে নিয়ে যায়; কোথাও গুঁড়িগুলোকে একটার পর একটা মালার মতো সাজিয়ে বেঁধে, সেই কাঠের মালা টেনে নেওয়া হয়। সঙ্গে লোক থাকে, তারা কেবল দেখে, যেন কোনোটা কিছুতে আটকিয়ে না যায়। অনেক জায়গায় কাঠ নেবার জন্য রীতিমতো রেলের লাইন পাতা হয়; আবার কোনো কোনো জায়গায় পিছল বরফের উপর বিনা লাইনেই এঞ্জিন চলে। সে এঞ্জিনের সামনে চাকা নাই, 'স্লেজ্' গাড়ির মতো দুদিকে দুটো বাঁকানো লোহার ধনুক-দণ্ড।

এমনি করে তারা জঙ্গলের গাছ কেটে এনে রেলের লাইন বা নদীর ধারে এসে হাজির হয়। তার পর গাছের গুঁড়িগুলোকে কারখানায় নিয়ে কেটে চিরে তক্তা বানিয়ে চালান দিতে হবে। নদীতে যদি বেশ স্রোত থাকে তা হলে এমন জায়গায় কারখানা বসানো হয় যে, কাঠগুলোকে ভাসিয়ে দিলে তারা আপনা-আপনি গিয়ে কারখানায় হাজির হবে। সেখানে কারখানার লোকেরা তাদের ঠেকিয়ে বড়ো-বড়ো লগি দিয়ে কারখানার ভিতরে নিয়ে পুরবে। কিন্তু সব জায়গায় সেরকম সুবিধামতো নদী পাওয়া যায় না। হয়তো কোনো নদীতে তেমন স্রোত নেই, কিম্বা তাতে ওরকম কাঠ ছেড়ে দেবার হুকুম নেই; সেখানে মস্ত মস্ত কাঠের ভেলা বানিয়ে সেই ভেলাগুলোকে জাহাজে টেনে কারখানায় নিতে হয়।

স্রোতে কাঠ ভাসিয়ে দেওয়া যে-সব সময়ে বড়ো সহজ কাজ, তা মনে কর না। অনেক সময়ে মাঝ পথে নদীর বাঁকে কাঠে কাঠে লেগে এমন জমাট বেঁধে যায় যে আবার রীতিমতো হাঙ্গামা করে তাদের জট ছাড়িয়ে না দিলে কাঠ আর চলতে পারে না। এ কাজে বিপদ খুবই; অনেক সময়ে হঠাৎ কাঠের জমাট খুলে গিয়ে কাঠগুলো এমন হুড়্হুড়্ করে ভেসে আসে যে তার সামনে পড়ে অনেক মানুষের প্রাণ যায়। কারখানায় এলে পর সেখানকার লোকেরা কাঠগুলোকে এক-এক করে কারখানার মুখের মধ্যে পুরে দেয়, আর সেখানে করাতকলে কাঠগুলো আপনা-আপনি কেটে চিরে তক্তা হয়ে বেরিয়ে আসে। একদিকে ক্রমাগত গাছের গুঁড়ি ঢুকছে, আর-একদিকে ক্রমাগত কাটা তক্তা বেরিয়ে আসছে।

সন্দেশ—ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৭

হাওয়ার ডাক

একটা সরু চোঙার মধ্যে ঢিলাভাবে একটা ছিপি বসাইয়া চোঙার মধ্যে ফুঁ দিলে ছিপিটা হাওয়ার ঠেলায় ছুটিয়া বাহির হয়। যদি মুখে ফুঁ না দিয়া পাম্প-কলের দম্‌কা হাওয়া

দেওয়া যায় তাহা হইলে বেশ একটু ভারি জিনিসকেও অনেক দূর পর্যন্ত ঠেলিয়া নিয়া যায়। বিলাতের কোনো কোনো বড়ো দোকানে এই উপায়ে ছোটোখাটো জিনিস দোকানের নানা-স্থানে পাঠানো হয়। খুচরা টাকাপয়সা দোকান বিভাগ হইতে অফিস বিভাগে পাঠাইতে হইলে একটি সরু চোঙার মধ্যে ভরিয়া, সেই চোঙাটিকে একটা লম্বা নলের মুখে পুরিয়া দেয়। তার পর একটা হাতল চাপিয়া দিলেই নলের মধ্যে দমকা বাতাস ঢুকিয়া চোঙাটাকে একেবারে অফিস পর্যন্ত ঠেলিয়া দেয়। অফিস হইতে দোকানের প্রত্যেক বিভাগের সঙ্গে এইরকম নলের যোগ থাকে। কোনো গোলমাল হাঙ্গামা নাই, লোকজনের ছুটাছুটি নাই,—মুহূর্তের মধ্যে কাজ শেষ।

প্রায় কুড়ি বৎসর আগে একজন ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার বলিয়াছিলেন যে, এইরকমে নলের সাহায্যে বড়ো-বড়ো শহরের নানা স্থানে ডাক চালাচালি করিতে পারিলে খুব সুবিধা হয় এবং তাহাতে টেলিগ্রাফের মতো তাড়াতাড়ি কাজ হওয়া সম্ভব! আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক বড়ো-বড়ো শহরে এইরূপ হাওয়ার ডাকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে! শহরের মধ্যখানে একটা বড়ো অফিস, তাহার চারিদিকে শহরের নানাস্থান পর্যন্ত নলের শাখা, কোনো কোনো নল তিন-চার মাইল পর্যন্ত লম্বা হয়। মনে কর, আমরা প্যারিস শহরে আছি; তোমার যদি আমার কাছে কোনো জরুরি চিঠি পাঠাইবার দরকার হয় তাহা হইলে প্রথমে তোমাকে ডাকঘরে গিয়া একরকম পাতলা পোস্টকার্ড কিনিতে হইবে। এই কার্ডের দাম অবশ্য সাধারণ পোস্টকার্ডের চাইতে কিছু বেশি; কিন্তু টেলিগ্রাফ করিতে যে মাশুল লাগে, সে হিসাবে নিতান্তই সামান্য। সেই কার্ডে চিঠি লিখিয়া নলঘরের বাক্সের মধ্যে চিঠি পোস্ট করিতে হয়। অধিকাংশ স্থানে মেয়েরাই সেখানকার কাজ করে। তাহাদের একজন আসিয়া তোমার চিঠিখানা লইয়া সেটিকে একটি চোঙার মধ্যে পুরিয়া দিবে। চোঙাটি রবার ও বনাত দিয়া মোড়া এবং এমনভাবে তৈরি যে সেটাকে হাওয়ার নলের ভিতর ঢুকাইয়া দিলে চোঙার মুখ ও নলের মাঝে একটুকুও ফাঁক থাকে না—ফাঁক থাকিলে হাওয়া বাহির হইয়া যায় এবং তাহাতে হাওয়ার জোর কমিয়া যায়। চোঙাটিকে নলের মধ্যে ভরিয়া নলের মুখ বন্ধ করিয়া একটা হাতল ঘুরাইয়া দিলেই পাম্পকলের হাওয়ায় তাহাকে বড়ো আফিসে পৌঁছাইয়া দিবে। সেখানকার লোকেরা আবার সেটাকে অন্য একটা নলের মধ্যে পুরিয়া, আমার বাড়ি যে পোস্টাফিসের এলাকায় সেই পোস্টাফিসে চালান করিয়া দিবে। তার পর যেমন করিয়া টেলিগ্রাফ বিলি হয় তেমনি করিয়া সেই চিঠি আমার বাড়িতে বিলি করা হইবে। তোমার নিজের হাতের চিঠি টেলিগ্রাফের মতন তাড়াতাড়ি এবং তাহার চাইতে অনেক সস্তায় আমার বাড়িতে আসিয়া হাজির হইবে।

কলকব্জা থাকিলেই তাহা বিগড়াইবার সম্ভাবনা থাকে; নলের মধ্যে দৈবাৎ যদি কোথাও চোঙা আটকাইয়া যায় তাহা হইলে কি হইবে? সেইরূপ অবস্থায় মাটি খুঁড়িয়া নল পরীক্ষা করিতে হয় এবং দরকার হইলে নল মেরামত করিয়া দোষ সারাইতে হয়। কিন্তু দুই মাইল বা চার মাইল লম্বা নল, তাহার কোন জায়গাটিতে মাটি খুঁড়িতে হইবে তাহা বুঝিবে কিরূপে? তাহা বাহির করিবার একটা চমৎকার উপায় আছে। এ-সকল ডাকঘরে এমন বন্দোবস্ত থাকে যে, চোঙা চলিতে চলিতে কোথাও আটকাইয়া গেলে তাহা তৎক্ষণাৎ টের

পাওয়া যায়—কোথাও কোথাও তখনই একটা ঘণ্টা বাজিয়া ওঠে। তখন পাম্প্‌কলের হাওয়া বন্ধ করিয়া নলের মুখের কাছে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করা হয়। খানিকক্ষণ পরে সেই আওয়াজ যখন চোঙায় লাগিয়া ফিরিয়া আসে তখন নলের মুখে একটা প্রতিধ্বনি শোনা যায়। চোঙা যত দূরে থাকে, প্রতিধ্বনি আসিতে ততই বেশি দেরি হয়। বন্দুকের শব্দ ও তাহার প্রতিধ্বনি, এই দুয়ের মধ্যে কতটুকু সময়ের তফাত হইতেছে, তাহা দেখিলেই হিসাব করিয়া বলা যায় যে কতখানি দূরে চোঙা আটকাইয়াছে। তা বলিয়া মনে করিও না যে যখন-তখন বুঝি এরূপভাবে চোঙা আটকাইয়া যায়। ফিলাডেলফিয়া শহরে প্রথম দু-তিন বৎসরের মধ্যে কেবল একবারমাত্র এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। তখন ঐরূপ প্রতিধ্বনির সাহায্যে হিসাব করিয়া যে জায়গায় খুঁড়িতে বলা হয়, তাহার দু-এক হাতের মধ্যেই চোঙাটাকে পাওয়া যায়। দেখা গেল যে, মাটি বসিয়া যাওয়াতে নলটা এক জায়গায় জখম হইয়াছে এবং সেইখানে চোঙা আটকাইয়া রহিয়াছে।

চিঠি যখন নলের ভিতর দিয়া ভীষণ বেগে ছুটিয়া যায় তখন কেবল যে তাহার পিছন হইতে হাওয়ার ধাক্কা দেওয়া হয় তাহা নহে। কোনো জিনিস ছুটিতে গেলেই সম্মুখের বাতাস তাহাকে বাধা দিয়া তাহার বেগ কমাইয়া দেয়। এইজন্যে নলের সম্মুখ দিকেও একরকম পাম্পকল যোগ করিয়া দেওয়া হয়; তাহাতে সম্মুখের বাতাসকে টানিয়া বাহির করিয়া দেয় এবং সেই টানে চলন্ত চোঙা আরো জোরে চলিতে থাকে। আজকাল আমেরিকার কোনো কোনো শহরে এই উপায়ে কেবল চিঠি নয়, ছোটোখাটো পার্সেল পর্যন্ত চালান দেওয়া হইতেছে। সেখানে শহরের রাস্তার নীচে খুব বড়ো-বড়ো নল বসানো থাকে, তাহার ভিতর প্রায় একমণ ওজনের একটি লোহার চোঙাকে খুব দ্রুত ডাকগাড়ির চাইতেও অনেক বেশি বেগে ছুটাইয়া দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত এই-সকল হাওয়ার ডাক কেবল শহরের মধ্যেই কাজ করিতেছে, কিন্তু কালে এই উপায়ে এক শহর হইতে দূরের অন্য শহর পর্যন্ত ডাক পাঠাইবার ব্যবস্থা হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। কয়েক মাইল পর পর এক একটি পাম্প-কলের স্টেশন বসাইয়া হাওয়ার নলে অনেক দূর পর্যন্ত খুব তাড়াতাড়ি ডাক পাঠানো যাইতে পারে।

সন্দেশ—চৈত্র, ১৩২৭

হেঁয়ালি-নাট্য

ইংরাজিতে একরকম খেলা আছে, তাকে বলে, 'শ্যারাড্' (Charade)। এ খেলা দেখতে হলে এমন কয়েকটি লোক দরকার যারা অন্তত একটু-আধটু অভিনয় করতে পারে। তার পর এমন একটি কথা নিয়ে অভিনয় করতে হবে যাকে ভাগ করলে দু-তিনটা কথা হয়, যেমন Handsome (Hand ও Some বা sum) অথবা Carpet (Car বা cur ও pet)! অভিনয়ের প্রথম দৃশ্যে কথার প্রথম অংশটি, দ্বিতীয় দৃশ্যে দ্বিতীয় অংশটি, তৃতীয় দৃশ্যে সমস্ত কথাটি বুঝিয়ে দিতে হবে; যাঁরা দর্শক থাকবেন তাঁরা সব দেখেশুনে বলবেন, কোন কথাটি নিয়ে অভিনয় করা হল। যদি কোনো কথার তিনটি অংশ থাকে—

যেমন হাঁস পা-তাল, তা হলে অবশ্য চারটি দৃশ্যে অভিনয় করতে হবে। বাংলাতেও 'শ্যারাড্' বা 'হেঁয়ালি নাট্য' হতে পারে ; একটা বাংলা দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয় কথাটা পরিষ্কার হয়। মনে করো 'বৈঠক' কথাটা নিয়ে অভিনয় হচ্ছে।

প্রথম দৃশ্য - 'বই'। একজন লোক দিনরাত খালি বই নিয়ে ব্যস্ত, কেবলই বই পড়ছে। তার চারিদিকে রাশি রাশি বই ছড়ানো রয়েছে দেখে বন্ধুরা বিরক্ত হয়ে বলছে, "তোমার ও পোড়া বইগুলো একটু রাখ দেখি। চল একটু হাওয়া খেয়ে একবার নরুবাবুর বৈঠকে যাই।" লোকটি অগত্যা রাজি হয়ে বলল, "আচ্ছা, তোমরা এগোও, আমি এইটা শেষ করেই আসছি।"

দ্বিতীয় দৃশ্য - 'ঠক্'। একটি ছোট্টো বইয়ের দোকান, তার সামনে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক বইওয়ালাকে ভীষণ গালাগালি দিচ্ছেন। বলছেন, "চোর বাট্‌পাড় ঠক্ জোচ্চোর আগাম টাকাটা নিয়ে এখন বই দেবার বেলায় ফাঁকি দিচ্ছ।" বইওয়ালা বলে, "সে কি মশাই! কার কাছে টাকা দিলেন ?" ভদ্রলোক চটেমটে খুব খানিক শাসিয়ে চলে গেলেন। এমন সময়ে সেই বই-পড়া লোকটি এসেছে ; বইওয়ালা তাকে একটা বহুকালের পুরনো পুঁথি দেখাল—তার অনেক দাম! লোকটি বইখানা কিনে বলল, বইটা একটু কাগজে জড়িয়ে বেঁধে দাও তো।" বইওয়ালা "দিচ্ছি" বলে বইখানা নিয়ে তার বদলে কতগুলো বাজে বট-তলার বই বেঁধে দিয়ে বলল, "এই নিন মশাই।" বই-পড়া লোকটি তখন হাঁ করে অন্য বই দেখছিল, সে কিছুই টের পেল না, বইয়ের প্যাকেট নিয়ে চলে গেল।

তৃতীয় দৃশ্য - 'বৈঠক'। নরুবাবুর বৈঠকে বসে বন্ধুরা বলাবলি করছে, "আরে, অমুক কি আমাদের বৈঠক একেবারে ছেড়ে দিল নাকি ?" একজন বললে, "না, সে আজ আসবে বলেছে।" এমন সময় বই হাতে সেই লোকটির প্রবেশ। সকলের মহা উৎসাহ! একজন বললে, "এত দেরি হল যে ?" "আর ভাই, পথে একটা কেতাব কিনতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল"—বলেই বইয়ের ব্যাখ্যা আর প্রশংসা। সকলে দেখতে চাইল, আর কাগজের মোড়ক খুলতেই বেরোল কতগুলো ছেঁড়া নোংরা বটতলার বই। ভদ্রলোক অপ্রস্তুত—সকলের হাস্যকৌতুক—ইত্যাদি।

হেঁয়ালি অভিনয় করতে হলে কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হয়।

১. যে দৃশ্যে যে কথার অভিনয় হচ্ছে তাতে অন্তত একবার সেই কথাটা বলা দরকার! তা বলে বার বার বেশি স্পষ্ট করে বলাটাও ঠিক নয়।

২. যে কথাটার অভিনয় হচ্ছে তার সঙ্গে কিছু অন্য কথা আর অবান্তর অভিনয়ও কিছু কিছু থাকা দরকার। না হলে কথাটা নেহাত সহজে ধরা পড়ে যেতে পারে।

৩. দৃশ্যগুলি বেশি বড়ো না হয়। ছোটো-ছোটো তিনটি দৃশ্য হলেই ভালো।

হেঁয়ালি নাট্যের উপযোগী কথা বাংলায় অনেক আছে ; যেমন—'জলপান' 'বন্ধন' (বন + ধন) 'কারখানা' 'আকবর' (আক + বর) 'বৈকাল' 'যমালয় (জমা + লয়) ইত্যাদি।

আর-একরকমের হেঁয়ালি অভিনয় আছে, তাকে বলে Dumb charade অর্থাৎ বোবা শ্যারাড্। সে খেলায় কথা বলে না, শুধু বায়োস্কোপের মতো হাত-পা নেড়ে কথাগুলোর অভিনয় করে।

সন্দেশ—বৈশাখ, ১৩২৮

আহ্লাদী মিনার

মানুষ যখন ঘরবাড়ি তৈরি করে, তখন যত্ন করে মাটাম ধরে দেখে, বাড়ির দেয়াল-টেয়াল সব ঠিক খাড়াভাবে গাঁথা হচ্ছে কিনা। তুমি যদি কাত করে তোমার বাড়ি বানাও তবে লোকে হয় তোমাকে পাগল বলবে, নাহয় ভাববে লোকটা আনাড়ি। অনেক পুরানো বাড়ি আছে যার দেয়ালগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে, বাড়ি আর এখন খাড়া নেই,—একদিকে হেলে পড়েছে। বেশি কাত হয়ে গেলে সে বাড়ি ভেঙে ফেলতে হয়; তা না হলে সেটা কোনো দিন আপনা থেকে ঘাড়ের উপর ভেঙে পড়তে পারে।

কিন্তু ইটালির পিসা শহরে একটি প্রকাণ্ড মিনার বা স্তম্ভ আছে, সেটা এমন কাতভাবে তৈরি যে দেখলে মনে হয়,—এই বুঝি হুড়্‌মুড়্‌ করে সব আছাড় খেয়ে পড়ল। অথচ আটশো বৎসর ধরে সে এইরকম আহ্লাদীর মতো হেলেই আছে—তার পড়বার কোনো মতলব আছে বলে মনে হয় না। মিনারের আশেপাশে তার সমবয়সী কত যে বাড়ি ভেঙেচুরে লোপ পেয়ে গেছে, তার আর সংখ্যা নাই। ভেনিস শহরের লোকেরা একটা চমৎকার স্তম্ভ বানিয়েছিল; তাই দেখে তাদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যই পিসার লোকেরা এই স্তম্ভটি বানায়। ভেনিসের স্তম্ভটি কয়েক বৎসর হল ভেঙে পড়ে গেছে কিন্তু এটি এখনো বেশ চমৎকার অবস্থায় আছে—ভাঙবার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। এই হেলানো মিনারটির উপর থেকে মাটাম ঝোলালে দেখা যায় যে, তার চূড়োটা প্রায় তেরো ফুট হেলে পড়েছে। এমন অদ্ভুত বাঁকা স্তম্ভ বা দালান পৃথিবীর আর কোথাও নাই।

মিনারটি যখন তৈরি করতে আরম্ভ করা হয়, তখন অবশ্য তাকে খাড়া করে বানাবারই কথা ছিল; কিন্তু খানিকটা তৈরি হবার পর একদিকের মাটি বসে যাওয়ায় খাড়া দালান কাত হয়ে পড়ল। তখন কেউ কেউ বললেন, "এখানে দালান তোলা চলবে না—ভালো জমি দেখে আবার নতুন করে তৈরি করতে হবে।" কিন্তু অনেক আলোচনার পর শেষটায় স্থির হল যে, ঐরকম ট্যারচা ভাবেই স্তম্ভ তৈরি করা হবে। হরেকরকম খাড়া মিনার তো সব দেশেই আছে; কিন্তু পিসার এমন একটি স্তম্ভ হবে যেমনটি আর কোথাও নাই।" বড়ো-বড়ো রাজ-মিস্ত্রী সর্দারেরা বলল, "হাঁ ঐরকম কাত করেই আমরা মিনার স্তম্ভ বানিয়ে দেব।" এমন কায়দায় আগাগোড়া হিসাব করে মিনার গাঁথা হয়েছে যে তার সমস্তটা ভার স্তম্ভের ভিতর দিকেই পড়েছে। মিনারটা দেখতে যতই পড়ো পড়ো গোছের মনে হোক না কেন, বাস্তবিক পড়বার দিকে তার কোনো ঝুঁকি নাই।

মিনারটি দেখতেও অতি সুন্দর,—তার আগাগোড়া মার্বেল পাথরে ঢাকা। প্রতি বৎসর নানা দূর দেশ থেকে বহু লোকে এই স্তম্ভ দেখবার জন্য পিসা শহরে যায়। পিসা শহরটি আরো নানা কারণে প্রসিদ্ধ। এই শহরে বিজ্ঞানবীর মহাপণ্ডিত গ্যালিলিওর জন্ম হয়। সে প্রায় তিনশো বৎসর আগেকার কথা। এই গ্যালিলিওই বলেছিলেন যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে এবং তার জন্য সেকালের মূর্খ পাদরিদের হাতে তাঁকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল।

এই হেলানো মিনারের উপর থেকে গ্যালিলিও 'ভারি জিনিসের পতন' সম্বন্ধে কতগুলি পরীক্ষা করেন। এখনও বিজ্ঞানের বইয়ে সেই-সমস্ত পরীক্ষার কথা আলোচনা করা হয়। সে সময়ে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, যে জিনিস যত ভারী, শূন্যে ছেড়ে দিলে সে জিনিস তত তাড়াতাড়ি মাটিতে পড়ে। দুহাজার বৎসর আগে মহাপণ্ডিত আরিস্টট্‌ল্ এ কথা বলে গিয়েছিলেন সুতরাং সকলেই তা বিশ্বাস করত। তিনি বলেছিলেন যে একটা লোহার গোলা যদি আর একটার চাইতে দশ গুণ ভারী হয়, তা হলে দুটোকে একসঙ্গে ছেড়ে দিলে একটা আর একটার চাইতে দশ গুণ তাড়াতাড়ি মাটিতে পড়বে। গ্যালিলিও বললেন, "তা কখনোই হতে পারে না! দুটোই একসঙ্গে সমান বেগে পড়বে।" গ্যালিলিওর কথা শুনে পণ্ডিতেরা ক্ষেপে গেলেন। তাঁরা বললেন, "লোকটার আস্পর্ধা দেখ! আরিস্টট্‌লের মতো অত বড়ো পণ্ডিতের উপর আবার টিপ্পনী করতে চায়!" গ্যালিলিও বললেন, "অত রাগারাগিতে দরকার কি? এসো, আমি পরীক্ষা করে দেখাচ্ছি। আমার কথা হাতে-কলমে প্রমাণ করতে না পারলে তখন তোমরা যা ইচ্ছা তাই বোলো।"

তার পর একদিন গ্যালিলিও পরীক্ষা দেখাবার জন্য পিসা বিদ্যালয়ের যত অধ্যাপক আর যত ছাত্র সকলের সাক্ষাতে এই আহ্লাদী মিনারের সাততলার উপর উঠলেন। সেখানে উঠে তিনি দু হাতে দুটো লোহার গোলা নিলেন—একটার ওজন আধ সের আর একটার পাঁচ সের। গোলা দুটিকে তিনি ঠিক একসঙ্গে ছেড়ে দিলেন আর সকলের সামনে ঠিক একসঙ্গে তারা মাটিতে পড়ল! গ্যালিলিও আবার বললেন, "তোমরা যে কেউ এসে পরীক্ষা করে দেখতে পার—দুটো গোলা দুরকম ওজনের হলেও ঠিক একসঙ্গে মাটিতে পড়বে।" কিন্তু মানুষের কতরকমই দুর্বুদ্ধি হয়। পণ্ডিতেরা বললেন, "এ হতভাগার কথা আমরা কেউ শুনব না! মহাপণ্ডিত আরিস্টট্‌ল্ যা বলেছেন তার উপর আর কথা নেই।" পিসা শহরময় ঘোর আন্দোলন আরম্ভ হল। গ্যালিলিওর বক্তৃতায় আর তেমন ছাত্রই হয় না; যারা যায় তারাও খালি গোলমাল বাধায়, দুয়ো দুয়ো করে, আর ঠাট্টা করে হাততালি দেয়!

লোকের উৎপাতে শেষটায় গ্যালিলিওকে তাঁর জন্মস্থান ছাড়তে হল! একটা সত্য কথা বলবার জন্য মানুষের কি শাস্তি! যা হোক, পরে তার জন্য গ্যালিলিওর সম্মান তো বাড়লই সঙ্গে সঙ্গে পিসার প্রসিদ্ধ মিনারটিও আরো প্রসিদ্ধ হয়ে উঠল।

সন্দেশ—বৈশাখ, ১৩২৮

আদ্যিকালের গাড়ি

আমার বেশ মনে আছে, ছেলেবেলায় রাস্তায় কেউ সাইকেল চড়ে গেলে, আমরা ছুটোছুটি করে দেখতে যেতাম, আর মনে করতাম ভারি একটা অদ্ভুত জিনিস দেখছি। এখন কলকাতার রাস্তা দিয়ে সাইকেল, মোটর-সাইকেল, নানারকম মোটর গাড়ি, ইলেকট্রিক ট্রাম এই-সব কত যে যাচ্ছে তার ঠিকানাই নাই। এই-সব দেখে দেখে এখন পুরানো হয়ে

গিয়েছে ; এমন-কি, মাথার উপর দিয়ে এরোপ্লেন উড়ে গেলেও লোকে আর তেমন ব্যস্ত হয়ে ফিরে তাকায় না।

দু-চারশো বছর আগেকার একটা মানুষকে যদি হঠাৎ আজকালকার কোনো বড়ো শহরের রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া যায়, তা হলে সে যে কিরকম আশ্চর্য হয়ে যাবে, তা সহজেই বুঝতে পার ; কিন্তু আমাদের মতো একালের কোনো শহরে মানুষ যদি হঠাৎ সেই সময়কার শহরের মধ্যে গিয়ে পড়ে তা হলে তার কাছেও সেটা কম অদ্ভুত ঠেকবে না। অন্য শহরের কথা ছেড়েই দিলাম, এত যে বড়ো লণ্ডন শহর, কয়েকশত বছর আগে তার যেরকম দুরবস্থা ছিল তা শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। শহরের রাস্তাগুলো ছিল উঁচু নিচু, রাত্রে বাতি জ্বলে না, গাড়ি ঘোড়ার চল নাই, চোর ডাকাতের ভয়ে লোকে সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বেরোতে সাহস পায় না। সে সময় শহরে দু-দশ জন বড়োলোক ছাড়া কারও গাড়ি চড়বার উপায় ছিল না।

প্রথম যারা কতগুলো ভাঙাচোরা গাড়ি জোগাড় করে সাধারণ লোকেদের জন্য ঠিকে গাড়ির ব্যবসা চালাবার চেষ্টা করেছিল, শহরের লোকেরা তো তাদের উপর চটেই গেল। টেমস নদীর মাঝিরা পর্যন্ত বলতে লাগল যে সাধারণ লোকেরা যদি গাড়ি চড়বার সুবিধা পায়, তা হলে সবাই গাড়ি চড়তে চাইবে– কেউ আর নদী দিয়ে নৌকো করে যাতায়াত করতে চাইবে না, মাঝিদের ব্যবসা মাটি হবে। এমন কি, ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস স্বয়ং হুকুম দিলেন যে এরকম গাড়ি যেন আর বেশি তৈরি না হয়, কারণ তা হলে শহরের রাস্তাগুলো একেবারে মাটি হবে। রাস্তাটা যে মেরামত করে ভালো করা উচিত, সে খেয়াল কারো মাথায় এল না। যা হোক, রাজার নিষেধ এবং মূর্খদের গোলমাল সত্ত্বেও ঠিকে গাড়ির সুবিধা বুঝতে লোকের খুব বেশি দিন সময় লাগে নি।

'ঠিকে গাড়ি' বলতে যদি আজকালকার গাড়ির মতো কিছু একটা বুঝে নাও, তা হলে নিতান্তই ভুল বুঝবে! কত অদ্ভুতরকমের গাড়ি যে সে সময় দেখা যেত তা চোখে না দেখলে বর্ণনা করে বোঝানো শক্ত। গাড়ির ভিতরে, বাইরে, ছাতে এবং পিছনে যত লোক ঠাসা যায় এক-একটা গাড়িতে তত লোক চড়ত। গাড়িতে চড়বার জন্য রীতিমত মই লাগাতে হত। গাড়িতে স্প্রিং-ট্রিং কিছুই থাকত না, খালি একটা কাঠের ফ্রেমের উপর কয়েকটা কাঠের খোপ বসিয়ে পেরেক আর চামড়া দিয়ে এঁটে দেওয়া হত। নিতান্ত গরিব যারা, অথবা যারা শহরের বাইরে থাকত তাদের পক্ষে এরকম গাড়িও অনেক সময় জুটত না, তাদের জন্য আজকালকার গোরুর গাড়ির মতো একরকম গাড়ি তৈরি হত তার উপরে তাঁবুর মতো ছাউনী দেওয়া ; আর ভিতরে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন লোককে পুরে দেওয়া যায়, এইরকম বড়ো করে গাড়ি তৈরি হত। আট-দশটা ঘোড়ায় অত্যন্ত ঢিমে তেতালা চালে সেই গাড়ি শহর থেকে শহরে টেনে নিয়ে যেত। আজকাল যেরকমের গাড়িকে বাস্ (Bus) বলে, একশো বছর আগে তার সৃষ্টিই হয়নি।

বাইসাইকেল জিনিসটা নিতান্তই আজকালকার। প্রথম যারা বাইসাইকেল তৈরি করেছিল, তাদের এক-একটা গাড়ির যে কি অদ্ভুত চেহারা হত যে দেখলে আমাদের হাসি পায়। কোনোটা অসম্ভবরকম উঁচু, কোনোটায় চড়তে হলে সোয়ারকে হাতল ধরে ঝুলে থাকতে হয় ; কোনোটার আবার এমনি বন্দোবস্ত যে কল চালাতে হলে সোয়ারকেও সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে হয় ;

এইরকম খানিকক্ষণ দৌড়লে গাড়ি যখন বেশ জোরে চলতে থাকে তখন সে তার পা দুটো গুটিয়ে নেয় আর সাইকেলটা আপনি আপনি খানিক দূর পর্যন্ত গড়গড় করে চলে যায়। গাড়ির বেগ যেই কমে আসে, অমনি আবার পা ঝুলিয়ে ছুটতে হয়। এই-সমস্ত অদ্ভুত সাইকেলের কোনোটারই বিশেষ চল হয় নি। চল হবেই-বা কেন ? যদি একটু আরাম করে বসে গাড়ি চড়তে না পারলাম, তা হলে গাড়ি চড়ে লাভ কি ?

প্রথম যখন রেলগাড়ি চলতে আরম্ভ করে তখন নিয়ম ছিল যে গাড়ির আগে আগে এক-জন ঘোড়সোয়ার নিশান নিয়ে ছুটবে আর চেঁচিয়ে সকলকে সাবধান করে দেবে। সে রেল-গাড়ি যে কেমন চলত তা এর থেকেই বুঝতে পারছ। সে সময় থার্ডক্লাস গাড়িগুলোর চালচুলো কিছুই থাকত না। একটা মস্ত কাঠের তক্তাকে বাক্সের মতো চারিদিকে ঘেরাও করে, তার মধ্যে কতগুলো বেঞ্চি রেখে দেওয়া হত ; লোকেরা তার মধ্যেই ঠাসাঠাসি করে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে বসে জায়গা করে নিতো।

খুব শৌখিন লোকেরা একেবারে নিজেদের গাড়িসুদ্ধ ট্রেনে গিয়ে চাপতেন। ষাট বৎসর আগে ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপ যখন ইংলণ্ডে যান তখন তাঁর জন্যও এইরকম ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একখানা চমৎকার ল্যাণ্ডো গাড়ি একটা খোলা রেলগাড়ির উপর চাপিয়ে সেই ল্যাণ্ডোতে করে তাঁকে লণ্ডনে আনা হয়েছিল।

রেলগাড়ি চলবার সঙ্গে সঙ্গেই মোটর গাড়ি চালাবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। সে-সব গাড়ি স্টীমে চালানো হত, আর তার চেহারা আজকালকার কোনোরকম মোটর গাড়ির মতো একেবারেই নয়।

সন্দেশ—ফাল্গুন, ১৩২৮

নকল আওয়াজ

তোমরা অনেকে 'হরবোলা' দেখেছ। হরবোলা নানারকম শব্দের নকল করে—পাখির ডাক, গোরু, ছাগল, ভেড়ার ডাক, বাঘের ডাক, ঘোড়ার ডাক ; এরকম নানা আওয়াজের অবিকল নকল করে দেখিয়ে তারা পয়সা উপার্জন করে। হরবোলা নামে একরকম পাখি আছে, সেও নানারকম আওয়াজের নকল করতে অতি সহজেই শেখে।

'হরবোলা' ছাড়াও একদল লোক আছে যারা নানারকম শব্দের নকল করে। তারা কিন্তু মুখে আওয়াজ করে না, কোনো জন্তু কিম্বা পাখির শব্দও নকল করে না, তাদের কাজই হচ্ছে অভিনয়ের সময় আড়াল থেকে নানারকম শব্দের নকল করে অভিনয়টাকে সত্যি ঘটনার মতো দেখাতে চেষ্টা করা। ঝড়-বৃষ্টির শব্দ, বাজ-পড়ার শব্দ, রেলের শব্দ, জাহাজের শব্দ, ঘোড়ার শব্দ, পায়ের শব্দ, বন্দুকের আওয়াজ, বাঘ সিংহের ডাক—এই-সবের আশ্চর্য-রকম নকল এরা করতে পারে। অনেক মাথা খাটিয়ে সামান্য যন্ত্রের সাহায্যে এরা কত-রকমের শব্দ নকল করে।

দূরে হুড়্‌মুড়্‌ করে একটা গাছ ভেঙে পড়ল !—শব্দটা এল আড়াল থেকে। অভিনয়ের

মঞ্চের পেছন থেকে একটি লোক সেই আওয়াজটা করছে। তার যন্ত্রে একটা হাতল ঘোরাচ্ছে আর কতগুলো কাঠের ডাণ্ডা খট্‌খট্ করে একটা বড়ো কাঠের গায়ে গিয়ে লাগছে ; তাতেই মড়্‌মড়্ গাছ ভাঙার শব্দের অবিকল নকল হচ্ছে।

উঃ, কি জোরে বৃষ্টি হচ্ছে! ঐ শোন তার শব্দ! পট্—পট্—পট্—পট্—জলের ফোঁটা পড়ছে! কেমন করে ঐ শব্দ হচ্ছে জান?—প্রকাণ্ড একটা ঢাকের মতো জিনিসের মধ্যে কয়েকটা মটরদানা ভরে সেটাকে একটি লোক আস্তে আস্তে ঘোরাচ্ছে। মধ্যে একটি পর্দা দেওয়া আছে, ঢাকটা ঘোরালেই সেই পর্দার উপর মটরদানাগুলো পট্ পট্ করে ঠিক্‌রে গিয়ে লাগে আর বৃষ্টির ফোঁটার আওয়াজের মতো শোনায়।

কড়্‌কড়্ শব্দে বাজ পড়ছে! উঃ, কি ভয়ানক শব্দ! প্রাণটা হাতে নিয়ে যেতে হবে! কিন্তু গোড়ায়ই গোলমাল আওয়াজটাই নকল। দুটি লোক আড়াল থেকে একটা প্রকাণ্ড চৌকোনা ঢাকের উপর মস্ত বড়ো দুটো কাঠের হাতুড়ি পিটছে আর ঐরকম বাজ-পড়া আওয়াজ শোনা যাচ্ছে!

দুম্ করে বন্দুকের আওয়াজ হল—ঝুপ্ করে একজন লোক পড়ে গেল আর দুজন লোকে ধরাধরি করে তাকে নিয়ে এল। যে গুলি করেছে সে কি নিষ্ঠুর! মানুষ খুন করতে কি তার একটুও বাধে না? আসলে কিন্তু ব্যাপারটা কিছুই নয়। বন্দুকও নাই, গুলিও করে নি কেউ, চোটও লাগে নি কারও! আওয়াজটা যে শোনা গিয়েছিল সেটা আড়াল থেকেই এসেছিল। একজন লোক একটা চামড়ার গদির উপর জোরে একটা মোটা বেতের বাড়ি মারতেই ঠিক বন্দুকের আওয়াজ বেরিয়েছিল, আসলে সব ফাঁকি।

বন্দুকের গুলিতে একজন তো চিৎপটাং! যিনি গুলি মারলেন তিনিও বেগতিক দেখে ঘোড়ায় চড়ে চম্পট দিলেন। কি করে জানলে ঘোড়ায় চড়ে পালালেন তিনি?—ঐ শোন ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। এ-ও কি ভুল হতে পারে কখনো? কিন্তু, এ-ও যে ভুল! ঘোড়া-টোড়া কিছুই নাই ; শুধু একটি লোক আড়াল থেকে ঐরকম আওয়াজ করছে। তার যন্ত্রপাতিও কিছুই নাই ; কেবল দুখানা খুরের আকারের কাঠে দুখানা নাল লাগিয়ে নিয়ে সে দুটোকে একটা পাথরের উপর ঠক্ ঠক্ করে তালে তালে ঠুকছে!

এইরকমের আরো কত আওয়াজ যে কতরকমে এরা নকল করে, তা আর কি বলব! যে ঘরে এই-সব আওয়াজের যন্ত্রপাতি থাকে, সেটাকে রীতিমতো একটা কারখানাঘরের মতো দেখায়। চারিদিকেই নানারকম কল-কব্‌জা—কোনোটা হাতে চালায়, কোনোটা বিদ্যুতের সাহায্যে চলে, কোনোটা আবার চাবিতেও চলে। যারা এ-সব যন্ত্র ভেবে ভেবে বার করে, তারা বেশ রোজগার করে থাকে।

সন্দেশ—চৈত্র, ১৩২৮

আশ্চর্য প্রহরী

বড়ো-বড়ো রাজারাজড়া বা লাট-বেলাট যখন সমারোহ করে বেড়াতে বেরোন তখন তাঁদের সঙ্গে কতগুলি 'বডি-গার্ড' বা 'শরীর-রক্ষক' ঘোড়ায় চড়ে যায়। তারা যখন নিশান উড়িয়ে বাহার দিয়ে চলে, তখন দেখতে বেশ জমকাল দেখায়; কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায়, এ ছাড়া তাদের আর বিশেষ কিছু কাজ করবার থাকে না। বছরের পর বছর কেটে যায় কিন্তু কারও শরীর রক্ষা করবার জন্য তাদের কোনো ডাক পড়ে না।

আমাদের শরীরে কোথায় কি হচ্ছে তাই নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরা বলেন, তুমি আমি রাম শ্যাম সকলের সঙ্গেই—এরকম দু-দশটা নয়, একেবারে লাখে লাখে—'বডি-গার্ড' ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিনরাত তারা সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে, দিনরাত ছুটোছুটি করে পাহারা দিচ্ছে, শত্রুর সঙ্গে লড়াই করবার জন্য দিনরাত প্রস্তুত হয়ে রয়েছে! শত্রু ধরবার জন্য এত ব্যস্ততা কেন? এত শত্রুই-বা কোথায়? শত্রু চারিদিকেই। আকাশে বাতাসে রোগের বীজ সব কিল্‌বিল্‌ করে উড়ে বেড়াচ্ছে। তারা নিশ্বাসের সঙ্গে নাক দিয়ে, গলা দিয়ে একেবারে ফুস্‌ফুসের ভিতর পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছে, আর কতরকম জ্বরজারি সর্দিকাশির হাঙ্গামা বাধাচ্ছে। জলের সঙ্গে, দুধের সঙ্গে, নানারকম খাবারের সঙ্গে প্রতিদিন হাজার হাজার রোগের বীজ শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। কোথায় একটু ঘা হলে বা কেটে গেলে সেই ফাঁক দিয়ে কত সাংঘাতিক ব্যারামের বীজ অনায়াসে ভিতরে ঢুকে অনর্থ বাধাবার চেষ্টা করছে। যদি বাঁচতে হয় তা হলে এই-সমস্ত শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখা দরকার। তাই, ধূলিকণার চাইতে সূক্ষ্ম যে শত্রু, যাকে দেখতে হলে অণুবীক্ষণ লাগাতে হয়, তার সঙ্গে সারাদিন লড়াই করবার জন্য শরীরের মধ্যে আশ্চর্যরকম সূক্ষ্ম ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমাদের শরীরটা এমনভাবে তৈরি যে তার যেখানেই কাটো সেখানেই রক্ত বেরোয়। কোথাও একটা ছুঁচের সমান সরু জায়গা খুঁজে পাবে না যার মধ্যে খোঁচা দিলে রক্ত গড়ায় না। শরীরে যতক্ষণ প্রাণ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত রক্তটা ক্রমাগত শরীরময় ছুটোছুটি করে বেড়ায়। তাও এলোমেলোভাবে ছুটবার হুকুম নাই; ঠিক তালে তালে, সারাদিন সারা বছর সারা জীবন তাকে পথ ধরে ধরে চলতে হয়—এক মুহূর্ত বিশ্রাম করবার উপায় নাই। এইভাবে সর্বদা তাকে চালাবার জন্য শরীরের মধ্যে আশ্চর্য 'পাম্পকল' বসানো আছে। বুকের মাঝখানে যে জায়গাটা সর্বদা ধুক্‌ধুক্‌ করে, যাকে আমরা 'হার্ট' বা হৃৎপিণ্ড বলি, সেইটে হচ্ছে আমাদের পাম্পকল।

ঘরে ঘরে কলের জল পেতে হলে তার জন্য শহরের এক-এক জায়গায় স্টেশন করে প্রকাণ্ড কলকারখানা বসাতে হয়; সেই স্টেশনের সঙ্গে বড়ো-বড়ো 'পাইপ' জুড়ে শহরময় জল চালাবার ব্যবস্থা করতে হয়; তার পর সেই মোটা পাইপের গায়ে সরু মোটা মাঝারি নানা-রকম নল লাগিয়ে ঘরে ঘরে জল আনিতে হয়। শরীরের রক্ত চলবার ব্যবস্থাটাও অনেকটা এইরকমের। হৃৎপিণ্ডটা হল আমাদের কলের স্টেশন। শরীরের মোটা মোটা শিরাগুলি

সেই স্টেশন থেকে বেরিয়ে চারিদিক ছড়িয়ে পড়েছে—ঠিক যেন রাস্তার নীচে জলের পাইপ। তাদের গা থেকে আবার সরু সরু নলের মতো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা বেরিয়ে সমস্ত শরীর ছেয়ে ফেলেছে—সুতোর মতো সরু, চুলের মতো সরু, তার চাইতেও আরো অনেক সরু। বুকের ধুক্‌ধুকানির তালে তালে শরীরের রক্ত শিরার ভিতর দিয়ে চলতে থাকে। চলতে চলতে যায় কোথায়? আর কোথাও যাবার জো নাই, বার বার সেই হৃৎপিণ্ডের মধ্যেই ফিরে আসতে হয়।

আমরা যতক্ষণ বেঁচে থাকি ততক্ষণ শরীরটা ক্রমাগত ক্ষয় হতে থাকে। যত বেশি কাজ করি, যত বেশি চিন্তা করি, যত বেশি কথা বলি, যতই নড়িচড়ি, চলি, ফিরি, শরীর ততই বেশি বেশি ক্ষয় হতে থাকে। কয়লা না পোড়ালে যেমন ইঞ্জিন চলে না তেমনি শরীরকে ক্ষয় না করলে শরীরের কাজ হয় না। কিন্তু কেবলই যদি ক্ষয় হতে থাকে তা হলে শরীর টিঁকবে কি করে? সেজন্য শরীরকে রোজ নিয়ম মতো খাবার জোগাতে হয়। সেই খাওয়া হজম হলে শরীরের রক্ত তাকে নানা কৌশলে চারিদিকে বয়ে নিয়ে সবরকমের ক্ষয় দূর করে। শরীর যে শুধু ক্ষয় হয় তা নয়; কয়লা পুড়লে যেমন ধোঁয়া বেরোয়, ঝুল জমে আর ছাই পড়ে থাকে তেমনি শরীরের ক্ষয়ের দরুন নানারকমের দূষিত আবর্জনা শরীরের সর্বত্র জমে উঠতে থাকে। সেই আবর্জনা দূর করাও রক্তের কাজ। হৃৎপিণ্ডের ভিতর থেকে যে পরিষ্কার টাট্‌কা লাল রক্ত বেরিয়ে আসে সেই রক্ত যেখানে যায় সেখানকার ময়লা সাফ করতে করতে শেষটায় নিজেই ক্রমে ময়লা হয়ে পড়ে। সেই ময়লা দূষিত রক্ত আবার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ফিরে এসে ফুস্‌ফুসের তাজা বাতাস খেয়ে টক্‌টকে তাজা হয়ে ওঠে।

এক ফোঁটা রক্ত যদি অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখ তা হলে দেখতে দেখাবে কালো কালো চ্যাপ্টা মতো। ঐ গোল গোল জিনিসগুলির আসল রঙ লাল। ঐগুলির জন্য রক্তের রঙ লাল দেখায়—তা না হলে রক্তের কোনো রঙ নাই। এই লাল দানা বা 'কণিকা'গুলি এক-একটা এত ছোটো যে এক ফোঁটা রক্তের মধ্যে ওরকম লাখে লাখে কণিকা ভেসে বেড়ায়। এই লাল জিনিসগুলোর ফাঁকে ফাঁকে সাদা মতন কি দেখা যাচ্ছে; সেইগুলিই হচ্ছে শরীরের প্রহরী বা 'বডি-গার্ড'। লাল দানাগুলি কেবল কুলি আর ধাঙড়ের কাজ করে বেড়ায়। শরীরের ময়লা সাফ করা, শরীরকে ধুয়ে মুছে বাতাস খাইয়ে তাজা রাখা, এ-সবই হচ্ছে ঐ লাল কণিকাদের কাজ। কিন্তু শত্রুর সঙ্গে যখন লড়াই করতে হয় তখন ডাক পড়ে ঐ সাদা প্রহরীদের।

যেমনি শরীরে রোগের বীজ ঢোকে অমনি চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। আর প্রহরীরা দলে দলে রক্তের স্রোতে ভেসে এসে রোগের সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে দেয়। টপাটপ্ রোগের বীজ খেয়ে ফেলতে থাকে। লড়াই যখন সঙ্গীন হয় তখন দলে দলে প্রহরী মরতে থাকে, আবার নূতন প্রহরীর দল দ্বিগুণ উৎসাহে লড়তে আসে। এরকম [illegible] লড়াই শরীরের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই চলছে। মানুষের রোগ যখন সাংঘাতিক হয়, যখন প্রহরীরা কিছুতেই আর রোগের বীজগুলোর সঙ্গে লড়াই করে পেরে ওঠে না তখন মানুষের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়। যখন রোগের বীজ ক্রমশই শরীরটাকে দখল করতে থাকে তখন শরীরময় হৈচৈ পড়ে

যায়, 'আরো প্রহরী পাঠাও, আরো প্রহরী পাঠাও।' শরীরের কারখানায় তখন লাখে লাখে শ্বেত-কণিকা তৈরি হতে থাকে। শরীরের মরণ-বাঁচন অনেকটা তাদেরই হাতে।

মনে কর তোমার হাতে এক জায়গায় একটুখানি কেটে গেছে; যেখানে কাটে সেখান দিয়ে তো রক্ত বেরোবেই কিন্তু ক্রমাগতই যদি রক্ত বের হতে থাকে, তা হলে সে তো বড়ো মারাত্মক কথা—তাই শরীর প্রথমেই চেষ্টা করে রক্ত থামাতে। রক্ত থামাবার উপায়টিও বড়ো চমৎকার; রক্তটা বাইরে এসে আপনা থেকেই কাটা ঘায়ের মুখে ছিপির মতো জমাট বেঁধে যায়। তখন সেই জায়গাটা যদি অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখ তা হলে দেখবে হাজার হাজার লাল কণিকা তার মধ্যে তাল পাকিয়ে মরে আছে। সাদা প্রহরীরাও ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে না; তারা সব ছুটে এসে মরা লাল কণিকাগুলিকে খেয়ে খেয়ে সাফ করতে থাকে, আর কাটা চামড়ার জায়গায় নূতন চামড়া গজাবার ব্যবস্থা করতে থাকে। কাটা ঘায়ের মুখটি হচ্ছে রোগের বীজ ঢুকবার খোলাপথ; যদি তেমন তেমন বীজ সেখান দিয়ে ঢুকতে পারে, তা হলেই শীঘ্র শীঘ্র ঘা শুকাবার পক্ষে মুস্কিল হয়, সামান্য একটা ঘা পেকে বা পচে উঠে বিষম কাণ্ড বাধিয়ে তোলে। তখন প্রহরীদের খাটুনিও খুব বেড়ে যায়। ঘা পাকলে তা থেকে যে পুঁজ বেরোয় তার মধ্যে দেখা যায় অসংখ্য শ্বেত-কণিকা মরে আছে, আর তার মধ্যে রোগের বীজাণু কিল্‌বিল্‌ করছে।

সন্দেশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯

আকাশবাণীর কল

একজন বক্তা, তার তিনলক্ষ শ্রোতা! একজন কথা বলছে, বক্তৃতা করছে, গান গাইছে, বাজনা বাজাচ্ছে আর তিনলক্ষ লোক তার প্রত্যেকটি সুর পরিষ্কার করে শুনতে পাচ্ছে! কথাটা শুনতে কেমন অসম্ভব শোনায় না? কিন্তু আমেরিকার বড়ো-বড়ো শহরে এরকম আজকাল প্রতিদিনই ঘটছে। আরো আশ্চর্য এই যে, এই তিনলক্ষ লোক, যারা সকলে মিলে বক্তৃতা শুনছে তারা সব এক জায়গায় বসে থাকে না; কেউ দুই মাইল চার মাইল, কেউ বিশ মাইল পঁচিশ মাইল দূরে, যে যার ঘরে আরাম করে বসে বসে বক্তৃতা শোনে। এমন-কি, দেড়শো-দুশো মাইল দূর থেকেও লোকের বক্তৃতা শুনবার কোনো বাধা হয় না। দুবছর আগেও এরকম হওয়া সম্ভব বলে লোকে মনে করতে পারত না। কিন্তু আজকাল বিনা তারের টেলিফোন হওয়াতে এ-সব সম্ভব এবং সহজ হয়েছে।

তুমি যখন কথা বল তখন তোমার গলার আওয়াজ চারিদিকে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। যতদূর পর্যন্ত সে আওয়াজ যায় ততদূর পর্যন্ত বাতাসে নানারকম ঢেউ খেলিয়ে যায়। মোটা গলার বড়ো-বড়ো ঢেউ সরু গলার ছোটো-ছোটো ঢেউ। চেঁচিয়ে বললে বাতাসে জোরে জোরে ঢেউয়ের ধাক্কা লাগে, আস্তে বললে সে ঢেউ বাতাস ঠেলে বেশি দূর এগোতেই পারে না। কিন্তু যেমন করেই কথা বল আর যত জোরেই বল, খানিক দূর পর্যন্ত গিয়ে সে ঢেউ আপনি মিলিয়ে যাবে। তার পরে আর তোমার আওয়াজ পেঁৗছবে না।

যে কলের সাহায্যে গলার আওয়াজকে, অথবা অন্য যে কোনোরকম শব্দকে অনেক দূর পর্যন্ত পাঠিয়ে দেওয়া যায় তার নাম 'টেলিফোন'। আজকাল অনেক বড়ো-বড়ো শহরে টেলিফোনের কল দেখতে পাওয়া যায়। লোকে একটা হাতলের মতন জিনিস কানে লাগিয়ে তার চোঙার ভিতর কথা বলে, আর অনেক দূরের লোক সেইরকম আর-একটা কল কানে দিয়ে সে কথা শুনতে পায়। দুজনের মধ্যে খালি সরু তারের যোগ। সেই তারের ভিতর দিয়ে সারাক্ষণ বিদ্যুৎ চলে, আর সেই বিদ্যুতের স্রোত শব্দের ঢেউগুলোকে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় পৌঁছে দেয়, এই উপায়ে অনেক মাইল পর্যন্ত শব্দ পাঠানো সম্ভব হয়।

কিন্তু গোড়ায় যে টেলিফোনের কথা বলা হয়েছে, যাতে তিনলক্ষ লোক একসঙ্গে টেলিফোনের আওয়াজ শুনতে পায়, তাতে তার-টার কিছুরই দরকার হয় না। তা যদি দরকার হত, তা হলে ভেবে দেখ কত লক্ষ মাইল তার বসাতে হত আর তার জন্য কত হাজার লক্ষ টাকা খরচ করতে হত। তার বদলে এখন কেবল ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা খরচ করলেই তুমি তোমার ঘরে বসে বহু দূরের কথা ও গান-বাজনা অনায়াসে শুনতে পার।

আমেরিকায় এই-সমস্ত টেলিফোনের কল তৈরি করা আজকাল একটা মস্ত ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা কল তৈরি করে তারা শহরের একটা কোনো জায়গায় গান বাজনা ও বক্তৃতার স্টেশন বসায়। সেখানে বড়ো-বড়ো কল থাকে, সেই কলে চোঙার সামনে দাঁড়িয়ে বক্তারা বক্তৃতা করে, গায়কেরা গান গায়। বাতাসে যেমন সর্বদাই শব্দের ঢেউ খেলছে; আকাশেও তেমনি আলোর তরঙ্গ, বিদ্যুতের তরঙ্গ সর্বদাই খেলে বেড়াচ্ছে। স্টেশনের কলগুলির কাজ হচ্ছে সমস্ত কথা ও সুরগুলিকে ধরে তা থেকে বিদ্যুতের তরঙ্গ সৃষ্টি করে তাকে আকাশময় ছড়িয়ে দেওয়া। বিদ্যুতের ঢেউগুলি শব্দের বাহন হয়ে চারিদিকে হাজার হাজার মাইল ছড়িয়ে পড়ে। সে শব্দ কানে শোনা যায় না, কারণ সে আর বাতাসের ঢেউ নয়, সে এখন বিদ্যুতের তরঙ্গ। সেই বিদ্যুতের তরঙ্গ যখন তোমার বাড়িতে তোমার টেলিফোনের যন্ত্রে এসে আঘাত করে তখন সে আবার শব্দের ঢেউ হয়ে তোমার কানের ভিতরে কথা ও সুরের সৃষ্টি করে। স্টেশনের যন্ত্রের সামনে যে কথা ও যেমন সুর শোনানো হয় ঠিক সেই কথা তেমনি সুরে অতি পরিষ্কারভাবে তুমি ঘরে বসেই শুনতে পারবে।

প্রতিদিন কোন সময়ে কি হবে তা সব আগে থেকে ঠিক করে দেওয়া থাকে। যেমন মনে কর বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে, সকাল বেলা আটটা থেকে নটা পর্যন্ত খবর শোনানো হবে। সেই সময়ে যদি টেলিফোনে কান দিয়ে থাক তা হলে শুনতে পাবে যে একজন লোক পরিষ্কার গলায় সেদিনকার সব খবর শোনাচ্ছে। তার আগের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যত দেশ থেকে যতরকমের খবর এসেছে, একে একে সব বলে যাচ্ছে। কোথায় যুদ্ধবিগ্রহ হল, কোথায় বড়ো-বড়ো মন্ত্রিসভায় কি কি পরামর্শ স্থির হল, কোথায় কতরকমের কি দুর্ঘটনা ঘটল, এই-সমস্ত খবর বলছে; তার পর ক্রিকেট, ফুটবল, ঘোড়দৌড় আর নানারকম খেলা ও আমোদের কথা বলছে; তার পর হয়তো নানারকম জিনিসের বাজার দর আর নানারকম ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলছে। সকলের শেষে সেদিন কখন্ কি হবে জানিয়ে দিচ্ছে—যেমন "আজ তিনটের সময় ঘোড়দৌড়ের ফল বলা হবে," "পাঁচটার সময় অমুক বিষয়ে অমুক বক্তৃতা করবেন," "সাতটা থেকে আটটা অমুক অমুক গাইয়ের গান শোনানো হবে, তার পর

এক ঘণ্টা নাচের বাজনা হবে,' "নটার সময় ছোটো ছেলেদের জন্য গল্প শোনানো হবে।" আমেরিকায় এরই মধ্যে নানা শহরে সবসুদ্ধ কয়েক হাজার স্টেশন বসান হয়েছে। সেই-সব স্টেশনের শ্রোতাদের সংখ্যা যে কত, তা এ থেকেই বুঝতে পারবে যে এক নিউইয়র্ক শহরেই তিনলক্ষের বেশি শ্রোতা প্রতিদিন বিনা তারে টেলিফোন শোনে।

অনেকগুলো স্টেশন মিলে যখন একসঙ্গে আকাশে ঢেউ ছড়াতে থাকে তখন অনেক লোকের একসঙ্গে কথা বলার মতো একটা ভয়ানক গোলমালের সৃষ্টি হতে পারে ; সেইজন্য স্টেশন-ওয়ালারা নিজেদের মধ্যে এরকম বন্দোবস্ত করে নিয়েছে যে এক-এক স্টেশন থেকে খালি এক-এক রকমের ঢেউ ছাড়া হবে। আকাশে যে বিদ্যুতের তরঙ্গ ওঠে তাকে স্টেশনওয়ালাদের ইচ্ছামতো ছোটো বা বড়ো করা যায়। যেমন একটা স্টেশন থেকে যদি একশো হাত লম্বা ঢেউ ছাড়া হয় তা হলে তার পাশের স্টেশন থেকে নব্বুই হাত কি একশো দশ হাত লম্বা ঢেউ ছাড়তে পারে, কিন্তু একশো হাত ঢেউ ছাড়বার হুকুম তাদের নেই। শ্রোতারা যে টেলিফোনের কল ব্যবহার করে তাতে এমন বন্দোবস্ত থাকে যে সে কল খালি একরকম বিদ্যুতের ঢেউয়েতেই সাড়া দিবে। তার চেয়ে ছোটো বা বড়ো ঢেউ এলে কলে কোনোরকম স্পষ্ট আওয়াজ শোনা যাবে না। বেহালার কানে মোচড় দিয়ে যেমন তারের সুর অনেকটা নামানো বা চড়ানো যায় তেমনি টেলিফোনের শব্দ ধরবার যন্ত্রটিকেও নানারকম ঢেউয়ের তালে চড়িয়ে বা নামিয়ে বাঁধা যায়। মনে কর তোমার টেলিফোনের কল এখন যেভাবে বাঁধা আছে তাতে একশো হাত ঢেউওয়ালা স্টেশনের শব্দ শোনা যেতে পারে। কিন্তু তুমি বিজ্ঞাপনে দেখলে, আজ সন্ধ্যার সময় নব্বুই হাত ঢেউয়ের স্টেশনেতে খুব বড়ো কোনোও ওস্তাদ গান করবে ; তুমি ইচ্ছা করলে তোমার কলের বাঁধন বদলিয়ে তাতে নব্বুই হাত তরঙ্গ ধরে সেই স্টেশনের গান শুনতে পার। যারা এই-সব টেলিফোনের কল ব্যবহার করে কেবল তাদের জন্য এর মধ্যেই নানা-রকম খবরের কাগজ আর মাসিকপত্র বের হতে আরম্ভ করেছে। তাতে কোথায় কোন নূতন স্টেশন হচ্ছে, কখন কোথায় কি হবে, টেলিফোন কলের কি কি নতুন উন্নতি হচ্ছে, এই-সমস্ত খবর থাকে। তা ছাড়া কলওয়ালাদের নানারকম বিজ্ঞাপন থাকে ; আর টেলি-ফোনের কল সম্বন্ধে আর তার ব্যবহার সম্বন্ধে নানারকম উপদেশ থাকে।

সাধারণত যে-সব টেলিফোনের কল ব্যবহার হয়, তাতে কানের উপর চাক্‌তির মতো বা চোঙার মতো টেলিফোনের মুখ বসিয়ে আওয়াজ শুনতে হয়। যতজন শ্রোতা ততগুলো চোঙা বা চাক্‌তি দরকার। কিন্তু আর একটু বেশি টাকা খরচ করলে আর একরকমের টেলিফোনের কল পাওয়া যায় যাতে গ্রামোফোনের চোঙার মতো একটা মস্ত চোঙার ভিতর দিয়ে পরিষ্কার আওয়াজ বেরোতে থাকে। পাঁচ-সাতজন বা বিশ-পঞ্চাশজন লোকে একসঙ্গে বসে সেই আওয়াজ শুনতে পার।

বিনা তারের টেলিফোন হওয়াতে মানুষের যে কতদিকে কতরকম সুবিধা হচ্ছে তা আর বলে শেষ করা যায় না। ছোট্টোখাট্টো টেলিফোনের কলটি তোমার পকেটে করে সঙ্গে নিয়ে যাও, পথের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা একটা বাতি বা থাম কিম্বা টেলিগ্রাফ-পোস্টের গায়ে কলের তার ঠেকিয়ে নিলেই কতরকম আওয়াজ শুনতে পারবে। যদি নিজের বাড়িতে কিম্বা আফিসে একটি ছোটোখাটো ঢেউ পাঠাবার স্টেশন বসাও তা হলে বাড়ির লোকে বা আফিসের লোকে

যখন ইচ্ছা তোমায় খবর পাঠাতে পারবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার যে, যেখানেই তুমি থাক-না কেন, হঠাৎ বিশেষ কোনোও দরকার পড়লে কিম্বা কোনোও বিপদ-আপদ ঘটলে তখনি তোমার কাছে তার খবর পৌঁছাতে পারবে।

এমনি করে 'যে গান কানে যায় না শোনা,' যে গান আকাশের তরঙ্গে চড়ে বিদ্যুতের মতো বেগে চারিদিকে ছুটে বেড়ায়, সেই অশব্দ গানকে আকাশময় ছড়িয়ে দিয়ে মানুষ আবার তাকে কলের মধ্যে ধরে আকাশের ভাষা ও আকাশের সুর শুনছে। আমাদের দেশে গল্পে ও পুরাণে যে আকাশবাণীর কথা শুনতে পাই—এও যেন সেই আকাশবাণীর মতো কোথাও কোনো আওয়াজ নাই, জনমানুষের সাড়া নাই, অথচ কলের মধ্যে কান দিলেই শুনি আকাশময় কত কণ্ঠের কত ভাষা, কত বিচিত্র গান আর কত যন্ত্রের সুর!

সন্দেশ—ভাদ্র, ১৩২৯

যদি অন্যরকম হত

এই পৃথিবীটাকে জন্মে অবধি আমরা যেমন দেখে আসছি সে যে বরাবর ঠিক সেরকম ছিল না তা তোমরা সবাই জান। এখন সে যেমনটি আছে চিরকাল তেমনটিও থাকবে না। আমরা এখন তার যেরকম চেহারা দেখছি সেরকম না হয়ে যদি সে অন্যরকম হত, যদি তার শনির মতো আংটি থাকত কিম্বা বৃহস্পতির মতো দশ-বারোটা চাঁদ থাকত তা হলে আরো কত অদ্ভুত কাণ্ড দেখতে পেতাম। চাঁদ যেমন বারো মাসে তার একই পিঠ পৃথিবীর দিকে ফিরিয়ে থাকে, ও পিঠে কি আছে তা আমাদের দেখতে দেয় না বুধগ্রহ ঠিক তেমনি করে সারা বছর সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। পৃথিবী যদি তেমনি করে কেবল একটা দিকই সূর্যের দিকে ঘুরিয়ে রাখত—তা হলে ব্যাপারটা কি হত একবার ভাব দেখি। একদিকে চিরকালই রোদ, চিরকালই গরম, একটু জুড়োবার অবসর নাই, সব মরুভূমি, সব ফেটে চৌচির। আর-একদিকে কেবলই রাত, কেবলই ঠাণ্ডা আর কেবলই বরফ। জীবজন্তুর সাধ্য কি যে তেমন ঠাণ্ডায় বা তেমন গরমে পাচ মিনিটও বেঁচে থাকে। এই দুইয়ের মাঝখানে যেখানে বারো মাস কেবলই সন্ধ্যা, যেখানে সূর্য অস্তও যায় না, উদয়ও হতে চায় না, কেবল আকাশের সীমান্তের কাছে উঁকিঝুঁকি মারে সেখানে হয়তো কষ্টেসৃষ্টে জীবজন্তুরা টিঁকে থাকতে পারে, গাছপালা যদি থাকে তবে তাও ঐ সন্ধের দেশটুকুতেই থাকবে।

এক জায়গায় মাটি যদি গরম হয় আর তার কাছেই আশেপাশে যদি তার চাইতেও ঠাণ্ডা জায়গা কোথাও থাকে তা হলে গরম জায়গার হাওয়া হালকা হয়ে উপরদিকে উঠতে থাকে, আর চারিদিকের ঠাণ্ডা বাতাস এসে সেই জায়গা দখল করতে থাকে। এমনি করে ছোটো-বড়ো ঝড়ের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর একটা দিক যদি আগুনের মতো গরম আর একদিক বরফের চাইতেও ঠাণ্ডা হত তা হলে সারা বছর ধরে যে ভীষণঝড়ের সৃষ্টি হত, তার কাছে এই পৃথিবীর বড়ো-বড়ো তুফানগুলো নিতান্তই ছেলেখেলা। সুতরাং পৃথিবীর যে এখনো চাঁদের মতো বা বুধগ্রহের মতো দশা হয় নি সেটা আমাদের পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের কথা বলতে

হবে। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন যে পৃথিবীর দিনগুলো ক্রমেই লম্বা হয়ে আসছে। এখন প্রায় চব্বিশ ঘণ্টায় একদিন হয় কিন্তু লক্ষ লক্ষ বছর পরে দিনগুলো বাড়তে বাড়তে ক্রমে ক্রমে ৩৬৫ গুণ লম্বা হয়ে আসবে অর্থাৎ এক বছরে পৃথিবীর একদিন হবে তখন উপরে যেরকম বর্ণনা করা হয়েছে পৃথিবীর ঠিক সেইরকম দশা হয়ে আসবে।

যদি বাতাস না থাকত তা হলে পৃথিবীর কি অবস্থা হত? জীবজন্তু সব যে মরে যেত সে তো সহজেই বোঝা যায় কিন্তু পৃথিবীর চেহারাটা হত কিরকম? গাছপালা না হওয়ার দরুন চেহারার যে পরিবর্তন হত সেটা একরকম কল্পনা করে নেওয়া যায়—কিন্তু তা ছাড়াও আরো অনেক অদ্ভুত পরিবর্তন হত। বাতাস না থাকলে মেঘ, বৃষ্টি, ঝড় বা হাওয়ার চলাচল এ-সব কিছুই থাকত না। পাহাড় ধ্বসে পড়লেও তার শব্দ শোনা যেত না। যে জলের উপর সর্বদা চঞ্চল ঢেউ খেলতে থাকে সেই জল আশ্চর্যরকম স্থির হয়ে থাকত আর তার মধ্যে সব জিনিসের ছায়া পড়ত একেবারে আয়নার মতো পরিষ্কার। কিন্তু তাও বেশি দিন হবার জো থাকত না. বাতাসের চাপ না থাকলে জল খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই পৃথিবীর সব জল বাষ্প হয়ে উড়ে আকাশময় ছড়িয়ে পড়ত পৃথিবীর সাধ্য থাকত না যে সেই জলকে মেঘের আকারে বা কুয়াশার আকারে আটকিয়ে রাখে! সেই বাতাসহীন পৃথিবীর উপর যখন রোদ এসে পড়ত তখন দেখতে দেখতে পৃথিবী গরম হয়ে উঠত, আবার রোদ পড়লেই গরম মাটি চট্‌পট্‌ জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যেত!

আর-একটা কাণ্ড হত এই যে, পৃথিবীর চারিদিকের সমস্ত ধুলো আর বাতাসে ভেসে ভেসে বেড়াতে পারত না; সব এসে পৃথিবীর গায়ের উপর জমে থাকত। ধুলো অতি সামান্য জিনিস। কিন্তু ঐ ধুলোটুকু না থাকার দরুন সমস্ত আকাশের চেহারা একেবারে বদলিয়ে যেত। আমাদের এই আকাশে যখন সূয ওঠে তখন সমস্ত আকাশ আলো হয়ে যায়। আকাশের যেখানেই তাকাও সেখানেই আলো। রাত্তিরের তারাগুলো সে আলোয় কোথায় যে চাপা পড়ে যায় তাদের আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। অমন যে ঝক্‌ঝকে চাঁদ সেও আলোর তেজে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কিন্তু ধুলো যদি না থাকত তা হলে এ-সব কিছুই হওয়া সম্ভব হত না! যেখানে সূর্য থাকত শুধু সেইটুকুই ঝক্‌ঝকে আলো আর তার চারিদিকেই ঘুট্‌ঘুটে কালো আকাশ, সেই আকাশের গায়ে দিন দুপুরে তারাগুলো সব ফুটে থাকত। আর সূর্যের চেহারাও আশ্চর্যরকম বদলিয়ে যেত। সূর্যের চারিদিকে যে আগুনের খোলস আর আলোর কিরীট থাকে, পূর্ণগ্রহণের সময় ছাড়া যা এখন চোখে দেখবার উপায় নাই, সে-সব তখন শুধু চোখেই যখন-তখন দেখা যেত। একটা ঝক্‌ঝকে গোল পিণ্ড, তার গা থেকে আগুনের শিখাগুলো লক্‌লকে জিব বার করে লাফাচ্ছে আর তার চারিদিকে অতি সুন্দর স্নিগ্ধ সবুজ আলো রঙের খেলা দেখিয়ে বহু দূর পর্যন্ত চঞ্চল হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

যা হোক, এ-সমস্তই কল্পনার কথা। আসল কথা এই যে, পৃথিবী যেমন আছে আরো বহুকাল সে তেমনি থাকবে এবং সেটা তোমার পক্ষেও ভালো, আমার পক্ষেও ভালো—আমাদের হাজার হাজার বছর পরে যারা জন্মাবে তাদের পক্ষেও ভালো!

সন্দেশ—আশ্বিন, ১৩২৯

স্রোতের জলে যে-জিনিস ভাসে, স্রোত যেদিকে যায় সে-ও সেইদিকে ভেসে চলে। জলের মধ্যে যদি দুটো স্রোত পাশাপাশি দুই দিকে চলতে থাকে তা হলে দুটো উলটো টানের মাঝে পড়ে একটি ঘূর্ণীপাকের সৃষ্টি হয়। ঘূর্ণীপাকের মধ্যে যা-কিছু এসে পড়ে সবই পাকের সঙ্গে চক্রের মতো ঘুরতে থাকে।

জলে যেমন, বাতাসেও তেমনি। যদি একসঙ্গে দুটো বাতাসের স্রোত পাশাপাশি দুই মুখে চলতে থাকে তা হলেই বাতাসের মধ্যে একটি ঘোরপাক তৈরি হয়। খড়কুটো ধুলো-বালি ধোঁয়া, যা কিছু সেই ঘোরপাকের মধ্যে পড়ে সব চর্কিবাজির মতো ঘুরতে থাকে। যদি দুই মুখেই বাতাসের বেশ জোর থাকে তা হলে সেই ঘোরপাক থেকে সাংঘাতিক ঘূর্ণীবায়ুর জন্ম হতে পারে। যেদিকে বাতাসের জোর বেশি, ঘূর্ণীবায়ু ঘোরপাক খেতে খেতে সেইদিকে ছুটে চলে। ছোটোখাটো ঘূর্ণীবায়ু তোমরা বোধ হয় সকলেই দেখেছ। হঠাৎ কোথা থেকে বাতাস উঠল আর সেই সঙ্গে খানিকটা ধুলো আর কাগজ আর শুকনো পাতা ঘুরতে ঘুরতে উড়তে লাগল। এইরকম তামাশা অনেক সময়েই দেখা যায়। কিন্তু এই ঘূর্ণীবায়ুই যখন আবার খুব বড়ো আকার নিয়ে দেখা দেয় তখন তার চেহারা অতি সাংঘাতিক হয়।

ঘূর্ণীপাকের চক্র যখন নীচের দিকে নামতে থাকে তখন যদি সেই ঘুরন্ত বাতাসের চেহারাটা দেখতে পেতাম তা হলে দেখতাম ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড চুড়োওয়ালা টুপি উলটো করে ঝুলিয়ে রেখেছে। জলে যে ঘূর্ণীপাক হয় তার মাঝখানটায় যেরকম গর্ত হয় তেমনি এরও মাঝখানটা ফাঁপা। টুপির চুড়োটা যতই লম্বা হতে হতে মাটির কাছ পর্যন্ত নামে ততই নীচের সমস্ত হালকা জিনিসকে ঐ ফাঁপা জায়গাটুকুর মধ্যে শুষে নিতে থাকে।

'হালকা জিনিস' বললাম বটে, কিন্তু তেমন তেমন ঘূর্ণীবায়ু হলে তার কাছে প্রায় সব জিনিসই হালকা হয়ে যায়। খাটবিছানা, বাড়ির চালা, এ-সব তো উড়ে যায়ই, পাঁচ-সাতজন মানুষসুদ্ধ আস্ত মোটর গাড়ি পর্যন্ত শুকনো পাতার মতো ঘোরপাক খেয়ে শূন্যে উঠে পড়ে।

অনেক সময়ে বাতাসের জল জমে ঘূর্ণীবায়ুর থলিটির মধ্যে জড় হতে থাকে। কিন্তু সে জল বৃষ্টি হয়ে নামতে পারে না, একেবারে হাজার হাজার মণ জল অন্ধকার মেঘের মতো আকাশে ঝুলে ঘুরপাক খেতে থাকে। বড়ো-বড়ো বিল বা নদী কিম্বা সমুদ্রের উপরেই সাধারণত এইরকম হয়। তখন কেবল যে উপরের বাতাস কালো থলির মতো হয়ে নীচের দিকে নামতে থাকে তা নয়; নীচের জলও চুড়োর মতো উঁচু হয়ে ঘরতে ঘুরতে উপরদিকে উড়তে থাকে। নীচেকার চুড়োটি যখন উপরের ঘুরন্ত মেঘের সঙ্গে মিলে যায় তখনই বড়ো-বড়ো থামের মতো জলস্তম্ভের সৃষ্টি হয়। তখন দেখতে মনে হয়, যেন জল থেকে আকাশ পর্যন্ত এক-একটা প্রকাণ্ড থাম জলের উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

নৌকোই বল আর জাহাজই বল, সে যত বড়ো আর যত মজবুতই হোক-না কেন, জলস্তম্ভের মধ্যে পড়লে তার আর রক্ষা নাই। জাহাজের কাছে জলস্তম্ভ উপস্থিত হলে তার

ঘূর্ণীটান এড়িয়ে চলা জাহাজের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে ঘূর্ণীজলের স্তম্ভ তেমনি করে জাহাজকে টেনে নেয়। স্তম্ভের ভিতরে ঢুকলে জাহাজের লোকদের আর কিছু করবার উপায় থাকে না। জাহাজ বন্‌বন্‌ করে ঘুরতে থাকে– অনেক সময় জল ছেড়ে শূন্যে উঠে যায়—চারিদিক ভোঁ-ভোঁ শব্দে কানে তালা লেগে যায়, অন্ধকারে আর জলের ঝাপটায় কিছু দেখবার সাধ্য থাকে না।

তার পর স্তম্ভ যখন ভীষণ শব্দে ফেটে যায় তখন হচ্ছে আসল বিপদ। একেবারে হাজার মণ জল বাজ-পড়ার মতো আওয়াজ করে মাথার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জাহাজ-টাহাজ সব চুরমার করে দেয়। সমুদ্রের জল তার ধাক্কায় বহুদূর অবধি তোলপাড় হয়ে ওঠে। বহুদূরের জাহাজ পর্যন্ত তার সাংঘাতিক ঢেউয়ে টল্‌মল্‌ করতে থাকে।

কিছুদিন আগে আমেরিকার এক সাহেব কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে এক প্রকাণ্ড মোটরে চড়ে একটা বিলের ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন আকাশ থেকে একটা কালো মেঘের মতো কি যেন ঘুরতে ঘুরতে নীচের দিকে নেমে আসল, আর বিলের উপর থেকে খানিকটা জল ছিট্‌কে উঠে তার সঙ্গে মিলে একটা স্তম্ভের মতো হয়ে গেল। দেখতে দেখতে স্তম্ভটা বিলের উপর দিয়ে তেড়ে এসে মোটর গাড়ির উপর পড়ে, গাড়িটাকে সোঁ করে শূন্যে তুলে পাহাড়ের উপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। গাড়ির আরোহীরা কেউ মরল, কেউ সাংঘাতিক জখম হল আর প্রকাণ্ড গাড়িখানা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

যদি সর্বদাই যখন তখন এরকম বড়ো-বড়ো জলস্তম্ভ দেখা দিত তা হলে সেটা খুবই ভয়ের কথা হত ; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এরকম সচরাচর দেখা যায় না। তেমন বড়ো জলস্তম্ভ অতি অল্পই দেখা যায় আর তাও থাকে অতি অল্প সময়।

সন্দেশ—কার্তিক, ১৩২৯

আজব জীব

কি ভাই সন্দেশ, বড়ো যে দেখেও দেখছ না? আমায় চেন না বুঝি? তোমার ঘরের কাছেই আমায় কত দেখেছ তবু পরিচয় জান না? আচ্ছা তা হলে পরিচয় দেই।

আমায় এখন যেরকম দেখছ আগে কিন্তু সেরকম ছিলাম না। এখন কেমন দুপায়ে ভর দিয়ে চলে বেড়াই ; তখন অন্য অন্য জন্তুরা যেমন চার পায়ে চলে আমিও তেমনি করে চলতাম। তোমাদের এই ডাল ভাত মাছ মাংস এ-সব কিছুই খেতে পারতাম না। তখন আমার পায়ে একরকম ধাতুর তৈরি বেড়ি আটকানো ছিল, হাতেও সেইরকম ছিল।

আমাদের বাসা তুমি দেখেছ—কেমন অদ্ভুত বল দেখি? খানিকটা কাঠ আর পোড়া-মাটি, লোহা বালি আর মাটির গুঁড়ো, এইরকম সব জিনিস দিয়ে আমরা বাসা বানাই। বাসায় ঢুকবার আর বের হবার জন্যে, আলো আর বাতাস আসবার জন্যে বাড়ির গায়ে নানা জায়গায় ফাঁক থাকে, ইচ্ছা করলে সে ফাঁকগুলো বন্ধ করে দেওয়া যায়।

আমরা অনেকরকম জিনিস খাই। নানারকম ফলমূল শিকড়, এ-সব তো খাই-ই, তার

উপর আমাদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে নানারকমের ঘাসের বীজ। আমরা সেই-সব যত্ন করে সংগ্রহ করে তা থেকে কতরকমের যে খাদ্য বানাই, শুনলে অবাক হবে। একরকম জন্তু আছে, আমরা তার দুধ খেতে খুব ভালোবাসি। তাই অনেক সময়ে সেইরকম জন্তু ধরে এনে আমাদের বাড়িতে বেঁধে রাখি। একরকম গাছ হয় দেখতে অনেকটা বাঁশের মতো, আমরা তার থেকে রস বার করে সেই রস জমিয়ে খেতে খুব ভালোবাসি।

আমরা কি পারি জান? কোনো কোনো ফলে লম্বা-লম্বা আঁশ থাকে, সেই আঁশের জট ছাড়িয়ে আঁশগুলোকে পাকিয়ে তা থেকে আমরা নানারকম জাল বুনি। অন্যান্য আঁশাল জিনিস থেকেও এরকম জাল বোনা যায়। পোকার বাসা, জানোয়ারের লোম, কতরকম জিনিস থেকে যে আঁশ সংগ্রহ হয়, আমিও তার সব খবর জানি না। এই আমার গায়ে দেখ-না কতরকম জালের টুকরা জোড়া দিয়া আমার মা কেমন সুন্দর গা-ঢাকনি বানিয়েছেন। এইরকম জালের মধ্যে চাপ চাপ আঁশ ভরে তার উপর শুতে যা আরাম!

আমাদের মধ্যে নানারকম অদ্ভুত প্রথা দেখতে পাওয়া যায়। যারা আমাদের চাইতে বড়ো তাদের সঙ্গে দেখা হলে আমরা সামনের দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে দুটো হাত একসঙ্গে ওঠাই ও নামাই—নাহয় মাটি পর্যন্ত হাত নামিয়ে একেবারে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ি। কেন করি তা আমি বলতে পারি না।

কি বললে? তবু চিনতে পারছ না? ভাবছ আমি কোথাকার অদ্ভুত জীব? তা নয় গো তা নয়। আমি আফ্রিকার হটেন্‌টট্‌ও নই, মালয় দেশের বনমানুষও নই, আমি নিতান্তই তোমাদের বাঙালির ঘরের ছেলে—সন্দেশের পাঠক। পরিচয়টা ভুল হয়েছে বলছ? আর একটিবার মন দিয়ে পড়ে দেখ, আগাগোড়া সমস্তই ঠিক বলা হয়েছে দেখতে পাবে।

সন্দেশ—বৈশাখ, ১৩৩০

বুমেরাং

এই পৃথিবীতে যারা সভ্য জাতি বলে পরিচিত তাদের সভ্যতার মোটামুটি পরিচয় হচ্ছে এই যে, তারা চাষবাস করতে জানে, আগুনের এবং নানারকম ধাতুর ব্যবহার জানে, নানা-রকম জিনিসকে নিজের কাজে লাগাতে জানে, পাকা ঘর দালান গড়তে জানে, আর মনটাকে নানারকম জ্ঞানের সন্ধানে নিযুক্ত করতে জানে। এ-সব যারা জানে না তাদের আমরা বলি অসভ্য জাত। এই হিসাবে, পৃথিবীর সবচাইতে অসভ্য জাতিদের নাম করতে হলে অস্ট্রে-লিয়ার আদিম বর্বর জাতির কথা উল্লেখ করতে হয়। তারা কাপড় বানাতে জানে না, ধাতুর ব্যবহার তো দূরের কথা, সামান্য মেটে বাসন পর্যন্ত তৈরি করতে জানে না, চাষবাসের কোনো খবরই রাখে না; কাঁচা মাংস আর বুনো গাছের ফল বা শিকড় খেয়ে ঘুরে বেড়ায়। সামান্য লতাপাতার ছাউনি ছাড়া আর কোনোরকম ঘরবাড়ির খবর রাখে না; এক থেকে দশ পর্যন্ত গুণতে বললে মাথায় তাদের গোল বেধে যায়।

এমন যে অসভ্য জাত, তারাও কিন্তু একটি বিদ্যায় এমন ওস্তাদ যে, সে বিদ্যা পৃথিবীর

অতিবড়ো সভ্য জাতিরাও আজ পর্যন্ত শিখে উঠতে পারে নি। সে বিদ্যাটি হচ্ছে বুমেরাং অস্ত্রের ব্যবহার। অস্ত্র বললাম বটে, কিন্তু তা বলে খুব একটা জটিল বা মারাত্মক কিছু মনে করে বসো না। বুমেরাং জিনিসটি হচ্ছে এক টুকরা বাঁকানো কাঠ মাত্র। সেই কাঠের এক পিঠ সমান আর-এক পিঠ গোল মতো উঁচু করা, অনেকটা হকি খেলার লাঠির মতো। যে পিঠটাকে সমান বললাম তাও একেবারে সমান নয়। ভালো করে দেখলে দেখা যায়, সেটাও কেমন একটু ঢেউ খেলানো মতন, কোথাও সামান্য উঁচু কোথাও সামান্য নিচু। বুমেরাঙের চেহারা নানারকম হয়।

এখন বুমেরাঙের ব্যবহারের কথা বলি। এই অস্ত্রের সাহায্যে সে-দেশী লোকেরা তাদের প্রতিদিনের শিকার সংগ্রহ করে। লড়াইয়ের সময়েও এই অস্ত্রই তাদের প্রধান সম্বল। ওস্তাদ লোকেরা যখন এই অস্ত্র ছুঁড়ে মারে তখন অস্ত্রের চালচলন এমন অদ্ভুতরকমের হয় যে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। অস্ত্র ছুঁড়ে মারলে তা কখনো সোজাসুজি সামনের দিকে ছুটে যায় না। খানিক দূর গিয়েই নানারকম উলটোবাজি খেতে থাকে, গোঁৎ খেতে খেতে আকাশে উঠে যায়, আবার অনেক সময়ে সোঁ করে ওস্তাদের কাছেই পালটে ফিরে আসে। প্রকাণ্ড গাছের আড়ালে শত্রু বা শিকার লুকিয়ে আছে, ওস্তাদ শিকারী গাছের আরেক দিকে থেকেই এমন কায়দায় বুমেরাং ছুঁড়ল যে, সে অস্ত্র গাছ এড়িয়ে প্রকাণ্ড চক্র দিয়ে ঘুরে শত্রু বা শিকারের গায়ে গিয়ে পড়ল।

যুদ্ধের জন্য, শিকারের জন্য বা তামাশার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের বুমেরাং তৈরি হয়। যুদ্ধে যে-সব অস্ত্রের ব্যবহার হয় সেগুলি ছুঁড়ে মারলে আর ফিরে আসে না। শিকারের বুমেরাংগুলি এমনভাবে তৈরি যে দৈবাৎ যদি শিকার ফস্‌কে যায় তা হলে অস্ত্র আপনি শিকারীর কাছে ফিরে আসে। তামাশার বুমেরাংগুলি এমনভাবে বানায় যে ছুঁড়লে পর খুব সুন্দর বা খুব অদ্ভুতভাবে নানারকম কায়দা খেলিয়ে অস্ত্র আপনার ও ওস্তাদের বাহাদুরী দেখায়।

আশ্চর্য এই যে, এই-সব অস্ত্র কেন যে ঐরকমভাবে চলে, তার সঠিক হিসাব আর নিয়মকানুন বার করতে গিয়ে মহা মহা পণ্ডিতেরাও অনেক সময় হার মেনে যান; অথচ পৃথিবীর অসভ্যতম জাতির কারিকরেরা সারা বছর ধরে এই-সব অস্ত্র নিখুঁতভাবে গণ্ডায় গণ্ডায় তৈরি করছে আর অসভ্য ওস্তাদেরা তার অব্যর্থ ব্যবহার দেখিয়ে সভ্য মানুষকে তাক্ লাগিয়ে দিচ্ছে। কেমন করে তাদের মগজে এমন বিদ্যা প্রবেশ করল, কোথা থেকে এমন অস্ত্রের সন্ধান পেয়ে এমন করে শিখল, তার উত্তর কেউ জানে না।

সন্দেশ—শ্রাবণ, ১৩৩০

সূর্যের রাজ্য

সূর্য নানারকমে আমাদের পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করে। পৃথিবীর গতির একটা কেমন ঝোঁক আছে, সে যদি কোনোরকম সুবিধা পাইত তবে নিশ্চয়ই ছুটিয়া পথছাড়া হইয়া কোথায়

সরিয়া পড়িত। কিন্তু তাহা হইবার জো নাই ; সূর্যের আকর্ষণীশক্তি তাহাকে বেশ মজবুত করিয়া টানিয়া রাখিয়াছে এবং পৃথিবীও অগত্যা বাধ্য হইয়া সূর্যের চারিদিকে ঘোরপাক খাইতেছে। পৃথিবী ছাড়া আরো কতকগুলি প্রকাণ্ড গোলক সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। এইগুলিকে গ্রহ বলে। এই গ্রহগুলির মধ্যে আবার কয়েকটির সঙ্গী বা উপগ্রহ আছে। এই উপগ্রহগুলির কাজ গ্রহের চারিদিকে ঘোরা। যেমন পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ। এই-সকল গ্রহ, উপগ্রহ এবং অনেক উল্কা ও ধূমকেতু ইত্যাদি লইয়া সূর্যের রাজ্য।

রাজ্যের কর্তা সূর্য ; সুতরাং তাহার খবরটা আগে লওয়া আবশ্যক। আমরা এখান হইতে সূর্যকে একটা উজ্জ্বল গোলার মতো দেখি। আর সেটা যে নিতান্ত ঠাণ্ডা নয়, তাহাও বেশ বুঝিতে পারি। সূর্য এখান হইতে নয় কোটি মাইলেরও বেশি দূরে ; কিন্তু এত বড়ো সংখ্যা আমাদের কল্পনায় আসে না। আলো এত দ্রুত চলে যে, এক সেকেণ্ডে সাতবার পৃথিবীর চারিদিকে পাক দিয়া আসিতে পারে। কিন্তু তবু সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসিতে সাড়ে সাত মিনিট সময় লাগে। সূর্যটা যে খুবই মস্ত, তাহা না বলিলেও চলে। তেরো লক্ষটা পৃথিবী একত্র করিলে তবে সূর্যের সমান বড়ো একটা গোলক তৈয়ারি হইতে পারে।

আমরা সূর্যের যতটুকু দেখি, উহাই তাহার সমস্ত নহে। উহা ছাড়া তাহার চতুর্দিকে জ্বলন্ত বাষ্পের একটা আবরণ বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে ; কিন্তু সেটা তত উজ্জ্বল নহে বলিয়া সূর্যের প্রখর তেজে আমরা তাহার কিছুই দেখিতে পাই না। সূর্যের যখন পূর্ণ গ্রহণ হয়, অর্থাৎ চন্দ্র যখন সূর্যের ও আমাদের পৃথিবীর মাঝে আসিয়া সূর্যকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলে, তখন এই বাষ্পীয় আবরণ অতি চমৎকার দেখায়। এইজন্যে জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতেরা পূর্ণগ্রহণ দেখিবার সুযোগ ছাড়েন না। আজকাল বর্ণবীক্ষণ যন্ত্রের (Specto-scope) সাহায্যে দিবালোকেই এ-সকল বিষয়ের চর্চা করা সম্ভব হইয়াছে। সূর্য যেরূপ প্রচণ্ড তেজে জ্বলিতেছে, তাহা আমাদের কল্পনা করা অসম্ভব। তাহার গরমের তুলনায় আমাদের কয়লার আগুন তো ঠাণ্ডা! সেখানে আগুনের ঝড় ঘূর্ণীপাকের মতো অনবরত ঘুরিতেছে। সেই ফুটন্ত সমুদ্র তোলপাড় করিয়া অবিশ্রান্ত অগ্নিপ্রবাহ চলিতেছে। জ্বলন্ত শিখা চারিদিকে রক্তজিহ্বার ন্যায় লাফাইয়া উঠিতেছে এবং দেখিতে দেখিতে শতসহস্র মাইল ছড়াইয়া পড়িতেছে।

প্রধান গ্রহের সংখ্যা আটটি ; চারিটি বড়ো, আর চারিটি ছোটো। আমাদের পৃথিবী কনিষ্ঠ গ্রহের মধ্যে গণ্য। সূর্যের নিকটতম গ্রহের নাম বুধ, তাহার পর শুক্র, তাহার পরে পৃথিবী, তাহার পরে মঙ্গল—এই চারিটিই ছোটো গ্রহ। ইহার মধ্যে পৃথিবীই সর্বাপেক্ষা বড়ো ; শুক্র প্রায় পৃথিবীর সমান, মঙ্গল পৃথিবীর আট ভাগের এক ভাগ এবং বুধ পৃথিবী ও চন্দ্রের মাঝামাঝি। মঙ্গল সকল সময় সূর্যের কাছে কাছেই ফিরে সুতরাং তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া সচরাচর ঘটে না। শুক্র অথবা 'শুকতারা' যখন সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্বদিকে অথবা সূর্যাস্তের পর পশ্চিমদিকে ঝলমল করিতে থাকে তখন তাহার উজ্জ্বল জ্যোতির কাছে সকল গ্রহ নক্ষত্রই ম্লান বোধ হয়। শুধু চোখে মঙ্গল গ্রহকে একটা লালচে রঙের তারার মতো বোধ হয়। এই গ্রহের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য কথা জানিবার আছে! ইহার উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর কাছে সাদা বরফ দেখা যায় এবং সেই বরফ গ্রীষ্মকালে কমে ও শীতকালে বাড়ে

সুতরাং মঙ্গলে জল আছে, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া এই গ্রহের গায়ে খুব সরু সোজা সোজা লম্বা লম্বা অনেক দাগ দেখা যায়। এই দাগগুলি এলোমেলোভাবে ছড়ান নাই ; বরং ইহা দেখিয়া স্বভাবতই মনে হয়, ঐ লম্বা রাস্তার মতো জিনিসগুলি ইচ্ছা-পূর্বক বুদ্ধি খাটাইয়া নির্মাণ করা হইয়াছে। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করিতেছেন যে, মঙ্গলে বুদ্ধিমান জীব থাকা সম্ভব, হয়তো তাঁহারা জলের সুবন্দোবস্তের জন্য বড়ো-বড়ো খাল কাটিয়াছেন, সেই খালের দুধারে গাছপালা হওয়ায় আমরা সেগুলিকে লম্বা লম্বা রেখার মতো দেখি। মঙ্গলের দুটি চাঁদ আছে, সেগুলি এতই ছোটো যে, খুব বড়ো দূরবীক্ষণ ছাড়া তাহাদের দেখাই যায় না। ইহার একটি এত তাড়াতাড়ি মঙ্গলের চারিদিকে ঘুরিয়া আসে যে, মঙ্গলের এক দিনে (সাড়ে চব্বিশ ঘণ্টায়) তাহার দুইবার উদয় ও দুইবার অস্ত হয়। মঙ্গলের পর অনেকগুলি খুব ছোটো-ছোটো গ্রহ আছে, সেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। এই গ্রহগুলির পরেই বৃহস্পতি।

বৃহস্পতি ইহাদের মধ্যে প্রধান। ইহার আয়তন প্রায় সাড়ে বারোশত পৃথিবীর সমান। এ পর্যন্ত ইহার সাতটি চাঁদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে ; কিন্তু সাধারণ দূরবীক্ষণে চারিটির বেশি দেখা যায় না। এই চারিটি চন্দ্রই আমাদের চাঁদের চাইতে বড়ো। বৃহস্পতি খুব বড়ো হইলেও এত তাড়াতাড়ি ঘুরে যে, প্রায় দশ ঘণ্টায় তাহার একদিন হয়। এত তাড়াতাড়ি ঘোরার দরুন তাহার মাঝখানটা বেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে, সুতরাং বৃহস্পতিকে গোল না দেখাইয়া কতকটা বাদামী ধরনের দেখায়। বৃহস্পতির গায়ে সকল সময়েই কালো মেঘের মতো টান দেখা যায়।

বৃহস্পতির পরেই শনি। ইহা আয়তনে বৃহস্পতির অর্ধেক। এই গ্রহের একটা আশ্চর্য বিশেষত্ব এই যে, ইহার চারিদিকে একটা আংটির মতো কি দেখা যায়। 'আংটি'টা বেশি পুরু নয়, কিন্তু খুব চওড়া। ভালো দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে দেখা যায়, আংটিটার মাঝে মাঝে ফাঁক আছে, যেন কয়েকটা আংটি পর পর একটার ভিতর আরেকটা সাজানো রহিয়াছে। এ পর্যন্ত ইহার দশটি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কয়েকটি আমাদের চন্দ্রের অপেক্ষাও বড়ো।

এ পর্যন্ত যে গ্রহগুলির কথা বলা হইল, ইহার সকলগুলিই শুধু চোখে বেশ উজ্জ্বল দেখায়। সেইজন্য অতি পুরাতন কাল হইতেই মানুষ ইহাদের কথা জানে। ১৭৮১ খৃস্টাব্দে সার্ উইলিয়াম হার্শেল তাঁহার স্বহস্তনির্মিত দূরবীক্ষণের সাহায্যে এক নূতন গ্রহ আবিষ্কার করেন। তাহার নাম রাখা হইল ইউরেনাস্। ইউরেনাস্ আয়তনে শনি অপেক্ষা ছোটো এবং এ পর্যন্ত ইহার চারটি চন্দ্র আছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ইউরেনাসের আবিষ্কারের পর দেখা গেল যে, তাহার গতিবিধির মধ্যে একটা কেমন গোলমাল আছে। গণনার যে সময়ে ইউরেনাসের যে স্থানে থাকিবার কথা, উহা ঠিক স্থানে থাকে না। ইহা হইতেই গণনা করিয়া দুইজন পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ইউরেনাসের বাহিরে এক গ্রহ আছে, তাহারই আকর্ষণে ইহার চলাফিরার এরূপ ব্যতিক্রম হয়। তাঁহারা গণিতের সাহায্যে নির্দেশ করিলেন যে, অমুক দিন, অমক স্থানে দূরবীক্ষণ দিয়া খুঁজিলে গ্রহটিকে পাওয়া যাইবে। এইরূপে নেপচুনের আবিষ্কার হইল। নেপচুনের আয়তন ইউরে-নাসের মতো। ইহার একটি চাঁদ আছে।

এই-সকল গ্রহ উপগ্রহ ছাড়া সূর্যরাজ্যে কতকগুলি ধূমকেতু ও উল্কারাশি আছে। এই ধূমকেতুগুলির চালচলন দেখিয়া বোধ হয় যে, ইহারা বাস্তবিক এ রাজ্যের লোক নয়। বাহির হইতে আসিয়াছিল, এই রাজ্যের ভিতর দিয়া যাইতে গিয়া কি করিয়া সূর্যের টানে ধরা পড়িয়াছে। প্রতি বৎসরই কত ধূমকেতু সূর্যের রাজ্যের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়, তাহারা অধিকাংশ সহজেই সূর্যের হাত এড়াইয়া যায়, খালি কখনো দু-এক বেচারা নিতান্ত বেগতিকে কোনো গ্রহের কাছে গিয়া পড়ায় আর সামলাইয়া উঠিতে পারে না। তখন তাহারা বাধ্য হইয়া সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে।

সূর্য হইতে নেপচুনের দূরত্ব পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্বের একত্রিশ গুণ এবং সেই সুদূর প্রদেশেই এ রাজ্যের সীমা।

মুকুল—আশ্বিন, ১৩১৩

জীবজন্তুর কথা

এই পর্যায়ের মোট ৩৭টি প্রবন্ধের রচনাকাল কার্তিক ১৩২১ থেকে শ্রাবণ ১৩৩০—এই প্রায় ন' বছর ধরে সন্দেশ পত্রিকায় এগুলি প্রকাশিত। প্রথম তিনটি রচনা বাদ দিলে বাকিগুলি প্রকাশের সময় সুকুমারই ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক। তখনকার সন্দেশে প্রমদারঞ্জনের 'বনের খবর' ছাড়াও গোড়া থেকেই জীব-জন্তু, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ এই-সব বিষয়ে বহু রচনা নানা জনে লিখেছিলেন। তবে প্রথম দিকে অধিকাংশই উপেন্দ্রকিশোরের লেখা আর পরবর্তীকালে সুকুমারই ছিলেন এর অধিকাংশ রচনার লেখক।

প্রবন্ধগুলি পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে পত্রিকার প্রয়োজনে রচিত হলেও আজও তা কিশোর-পাঠকদের সমানভাবে আকর্ষণ করবে। এই রচনাগুলির বিন্যাসে সন্দেশ-এ প্রকাশিত কালানুক্রমই অনুসৃত হয়েছে। প্রায় অবিকৃতভাবে সন্দেশ-এর 'পাঠ'ই বজায় রাখা হয়েছে। শুধু মাত্র যে-সব জায়গায় রচনার সঙ্গে ছবি ছিল অথচ পত্রিকার বিবর্ণ পৃষ্ঠা থেকে তা উদ্ধার করে দেওয়া সম্ভব হয় নি, সেক্ষেত্রে চিত্র-প্রসঙ্গে যে কথাটুকু ছিল তা সতর্কভাবে ন্যূনতম সম্পাদনা করে পাঠের সামঞ্জস্য বজায় রাখা হয়েছে। প্রতিটি রচনাতেই সন্দেশে প্রকাশের তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। এই পর্যায়ের 'মানুষমুখো' রচনাটি সন্দেশে উহ্যনাম পণ্ডিত এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল।

সূচীপত্র

গরিলা

গরিলা থাকে আফ্রিকার জঙ্গলে। গাছের ডালপালার ছায়ায় সে জঙ্গল দিনদুপুরেও অন্ধকার হয়ে থাকে; সেখানে ভালো করে বাতাস চলে না, জীবজন্তুর সাড়াশব্দ নাই। পাখির গান হয়তো কৃচিৎ কখন শোনা যায়। তারই মধ্যে গাছের ডালে বা গাছের তলায় লতাপাতার মাচা বেঁধে গরিলা ফল-মূল খেয়ে দিন কাটায়। সেদেশের লোকে পারতপক্ষে সে জঙ্গলে ঢোকে না—কারণ গরিলার মেজাজের তো ঠিক নেই, সে যদি একবার ক্ষেপে দাঁড়ায়, তবে বাঘ ভালুক হাতি তার কাছে কেউই লাগে না। বড়ো-বড়ো শিকারী, সিংহ বা গণ্ডার ধরা যাদের ব্যবসা, তারা পর্যন্ত গরিলার নাম শুনলে এগোতে চায় না।

পৃথিবীর প্রায় সবরকম জানোয়ারকেই মানুষে ধরে খাঁচায় পুরে চিড়িয়াখানায় আটকাতে পেরেছে—কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো বড়ো গরিলাকে মানুষে ধরতে পারে নি। মাঝে মাঝে দুটো-একটা গরিলার ছানা ধরা পড়েছে কিন্তু তার কোনোটাই বেশিদিন বাঁচে নি।

একবার এক সাহেব একটা গরিলার ছানা পুষবার চেষ্টা করেছিলেন, সেটার বয়স ছিল দু-তিন বৎসর মাত্র। তিনি বলেন, তার চাল-চলন মেজাজ দুষ্টুমি বুদ্ধি ঠিক মানুষের খোকার মতো। তাকে যখন ধরে খাঁচায় বন্ধ করে রাখা হত, তখন সে মুখ বেজার করে পিছন ফিরে বসে থাকত। যে জিনিস সে খেতে চায় না সেই জিনিস যদি তাকে খাওয়াতে যাও, তবে সে চীৎকার করে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে হাত-পা ছুঁড়ে অনর্থ বাধিয়ে বসবে। একদিন তাকে জোর করে ওষুধ খাওয়াবার জন্য চারজন লোকের দরকার হয়েছিল। তাকে যখন জাহাজে করে আফ্রিকা থেকে ইউরোপে আনানো হয়, তখন তাকে প্রায়ই জাহাজের উপর ছেড়ে দেওয়া হত কিন্তু সে কোনোদিন কারও অনিষ্ট করে নি। তবে জাহাজের খাবার ঘরের পাশে যে একটা আলমারি ছিল, যার মধ্যে চিনি থাকত আর নানারকম মিষ্টি আচার ইত্যাদি রাখা হত সেই আলমারিটার উপর তার ভারি লোভ ছিল। কিন্তু সে জানত যে ওটাতে হাত দেওয়া তার নিষেধ, কারণ দু-একবার ধরা পড়ে সে বেশ শাস্তি পেয়েছিল। তার পর থেকে যখন তার মিষ্টি খেতে ইচ্ছা হত তখন সে কখনো সোজাসুজি আলমারির দিকে যেত না; প্রথমটা যেত ঠিক তার উল্টোদিকে, যেন কেউ কোনোরকম সন্দেহ না করে। তার পর একটু আড়ালে গিয়েই এক দৌড়ে বারান্দা ঘুরে একেবারে আলমারির কাছে উপস্থিত।

একবার একটা গরিলার ছানাকে চিড়িয়াখানায় রাখা হয়েছিল। চিড়িয়াখানায় নানা-রকম অদ্ভুত জন্তু দেখতে তার খুব মজা লাগত—কোনো কোনোটার খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে সে খুব মন দিয়ে তাদের চাল-চলন দেখত। একটা শিম্পাঞ্জির বাচ্চা ছিল, সে নানারকম কসরৎ জানত—সে যখন ডিগবাজি খেয়ে বা হুটোপাটি করে নানারকম তামাশা দেখাত, গরিলাটা ভারি খুশি হয়ে তার কাছে এসে বসত।

গরিলার চেহারাটা মোটেও শান্তশিষ্ট গোছের নয়—মানুষের মতো লম্বা, চওড়ায় তার দ্বিগুণ, গায়ের জোর তার দশটার মতো—তার উপর সে যখন রাগের চোটে চীৎকার করে নিজের বুকে কিল মারতে মারতে এগুতে থাকে তখন তার সেই শব্দ আর মুখভঙ্গি আর রকম-সকম দেখে খুব সাহসী লোক পর্যন্ত ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ দেখলেই গরিলা তেড়ে মারতে আসে না—বরং সে অনেক সময়ে মানুষকে এড়িয়েই চলতে চায়। কিন্তু তুমি যদি একেবারে তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হও তো সে কি করে বুঝতে পারে যে তোমার কোনোও দুষ্ট মতলব নাই? বিশেষত লোকে যখন লাঠিসোটা নিয়ে হৈ হৈ করে জঙ্গলে হাজির হয়, তাতে যদি গরিলা খুশি না হয়, তবেই কি তাকে হিংস্র বলতে হবে?

সন্দেশ—কার্তিক, ১৩২১

সেকালের লড়াই

'সন্দেশে' তোমরা নানারকম জানোয়ারের লড়াইয়ের কথা পড়েছ। কিন্তু বাস্তবিক লড়াইয়ের মতো লড়াই কাকে বলে যদি জানতে চাও তবে সেকালের জানোয়ারদের খোঁজ নিতে হয়। যে কালের কথা বলছি সে সময়ে মানুষের জন্ম হয় নি—সে প্রায় লাখ লাখ বছরের কথা। সে সময়কার জন্তুরা তো এখন বেঁচে নেই, তাদের খোঁজ নেবে কি করে? খোঁজ নেবার উপায় আছে।

যে-সকল পণ্ডিতেরা নানারকম জানোয়ারের শরীর পরীক্ষা করে থাকেন, তাঁরা এক-একটা জানোয়ারের সামান্য দু-একটা হাড়, দাঁত বা শরীরের কোনো টুকরা দেখে সেই জানোয়ার সম্বন্ধে এমন অনেক কথা বলে দিতে পারেন যে শুনলে অবাক হতে হয়। সে আমিষ খায় কি নিরামিষ খায়, জলে থাকে কি ডাঙায় থাকে, দু পায়ে চলে না চার পায়ে চলে, সে কোন জাতীয় জন্তু, এ-সব কথা শুধু খানিকটা কংকাল পরীক্ষা করে চট্ করে বলা যেতে পারে। কিন্তু অনেক সময়ে পাহাড় কাটতে বা মাটি খুঁড়তে গিয়ে এমন সব হাড় পাওয়া যায় যেটা আমাদের জানা কোনো জন্তুর হাড় হতেই পারে না। মনে কর, একটা পায়ের টুকরা পাওয়া গেল প্রায় পাঁচ হাত লম্বা আর একটা হাতির পায়ের চেয়েও মোটা। সে হাড় আর এখন হাড় নেই, সে কোনকালে পাথর হয়ে গিয়েছে কিন্তু তার চেহারাটা সেইরকমই আছে। এই-সব হাড় পরীক্ষা করে সেকালের অদ্ভুত জন্তু সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য কথা জানা গিয়েছে।

মনে করো একটা পাথর কাটতে গিয়ে তার মধ্যে একটা জানোয়ারের কংকাল পাওয়া গেল—সে পাথর এক সময়ে নরম মাটি ছিল—জানোয়ারটা তার মধ্যে মারা যায়। ক্রমে

সেই নরম মাটি জমে সেই হাড়গোড়সুদ্ধ পাথর হয়ে গেছে। মাটি জমে পাথর হতে হয়তো কত লাখ বৎসর লেগেছে, তার পরে কত হাজার বৎসর কেউ তার কথা জানতে পারে নি। এতদিন পরে মানুষ আবার সেই জানোয়ারের সন্ধান পেল। পণ্ডিতেরা সেই পাথর পরীক্ষা করে হয়তো বলবেন এটা অমুক যুগের পাথর। তার পর হাড় পরীক্ষা করে জানোয়ারটার সম্বন্ধেও নানা কথা বলবেন। যদি অনেকগুলো হাড় পাওয়া যায় তবে হয়তো জানোয়ারটার একটা মোটামুটি চেহারাও খাড়া করতে পারবেন।

এইরকম করে কত অদ্ভুত জানোয়ারের যে খবর পাওয়া গেছে সে কথা ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়। প্লীসিওসরাস (অর্থাৎ 'প্রায় কুমির জাতীয়') জানোয়ারটির গলা সরু আর লম্বা ছিল আর লম্বায় প্রায় পঁচিশ-ত্রিশহাত হলেও মোটের উপর নিরীহ ছিল। আরেকটা ছিল ইকথিয়োসরাস ('মাছ কুমির')। আর দুটো জানোয়ার ছিল মেগালোসরাস আর ইগুয়া নোডন দেখতে ভয়ানক বটে, কিন্তু নিরামিষভোজী, মেগালোসরাস আমিষভোজী। এরা দুজনেই হাতির চেয়ে বড়ো ছিল।

সেকালের কুমিরদের পিছনের পা দুটার গড়ন সাংঘাতিকরকম মজবুত—লড়ায়ের সময় পিছনের পা দুটাই আক্রমণ কিম্বা আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করত। এদের নাম টিরানোসরাস অর্থাৎ অত্যাচারী কুমির। এরাও হাতির চেয়ে বড়ো ছিল।

এরকম আরো কত জানোয়ার সেকালে ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। আমরা যদি তখন বেঁচে থাকতাম তা হলে কি মুশকিল হত বল দেখি? এতগুলো হাতির চেয়ে বড়ো হিংস্র জানোয়ারের মধ্যে আমাদের দশাটা কেমন হত একবার ভেবে দেখো। কয়েক বৎসর আগে, অনেকের বিশ্বাস ছিল যে দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগোনিয়ার জঙ্গলে সেকালের জন্তু এখনো আছে। একজন সাহেব অনেক লোকজন নিয়ে খুঁজতে গিয়েছিলেন; কিন্তু তাদের দেখা পেলেন না।

সন্দেশ—পৌষ, ১৩২১

রাক্ষুসে মাছ

বড়ো-বড়ো কুমির হাঙর, তারাই জ্যান্ত মানুষ খায় আমরা তো এই জানি! এক হাত লম্বা নদীর মাছ, তারা যে আবার জানোয়ার দেখলে কামড়ে ধরে এমন কথা তো শুনি নি। আমাদের দেশের নদীতে তো এমন রাক্ষুসে মাছ দেখা যায় না। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার এমাজন নদীর আশেপাশে এরকম মাছ দেখতে পাওয়া যায়। সে জায়গায় মানুষ যদি জলে নামে, তবে তাকে আধ মিনিটও জলে থাকতে হয় না, তার মধ্যেই মাছেরা তাকে কামড়িয়ে এমন রক্তারক্তি করে দেয় যে তাকে প্রাণের দায়ে জল ছেড়ে উঠে আসতে হয়। সেদেশের লোকে একে 'পিরাই' বলে।

বুলডগের মতো মুখ মাছটার, তার মধ্যে ছোটো-ছোটো ছুঁচলো দাঁত; একেবারে ক্ষুরের মতো ধারালো। তার উপর মেজাজখানাও চেহারারই উপযুক্ত—জলের মধ্যে থেকে এক হাত

লাফিয়ে ডাঙার মানুষকে কামড়ে দেওয়া তার পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়। আর যেখানে কামড়ে ধরে, সেখানের খানিকটা ছিঁড়ে না আসা পর্যন্ত সে কামড় ছাড়ে না। তার উপর এরা সব সময় দল বেঁধে ফেরে। হাঙর কুমির যেখানে থাকে সেখানেও নাকি মাছ থাকে, নানা-রকম জলজন্তু থাকে; কিন্তু 'পিরাই'-এর আড্ডা যেখানে তার ত্রিসীমানার মধ্যে কোনো প্রাণীর থাকবার জো নেই। সেখানকার জলে যদি গোরু ঘোড়া নামে তবে তারা আর আস্ত ফেরে না। একবার একটা ষাঁড় কুড়ি-পঁচিশ হাত চওড়া একটা নদী পার হতে গিয়েছিল—কিন্তু বেচারার আর পার হওয়া হল না। তার আগেই রাক্ষুসে মাছেরা তাকে খেয়ে শেষ করে দিল। এরকম দুর্ঘটনা অনেক জানোয়ারের ভাগ্যেই ঘটে থাকে—তার মধ্যে মানুষও বাদ পড়ে নি। হাজার মাছে একসঙ্গে কামড় দেয় আর এক-এক কামড়ে এক-এক খাবল মাংস উঠিয়ে আনে। দু-চার মিনিটের মধ্যে এক-একটা জানোয়ারকে খেয়ে শেষ করে দেয়।

কত সময় এমন হয় যে, লোকে নদীতে জল আনতে গেছে হঠাৎ কে তার হাত কেটে নিল! জানোয়ারেরা জল খেতে এসেছে—কট্ করে তার নাক কেটে গেল। সেদেশের লোকে জানে এ পিরাই মাছের কাণ্ড!

সন্দেশ—আষাঢ়, ১৩২২

ফড়িং পাওয়া যায় না, এমন দেশ খুব কমই আছে। যেদেশে লতাপাতা আছে আর সবুজ মাঠ আছে, সেদেশেই ফড়িং পাওয়া যাবে। নানান দেশে নানানরকমের ফড়িং তাদের রঙ এবং চেহারাও নানানরকমের, কিন্তু একটি বিষয়ে সবারই মধ্যে খুব মিল দেখা যায়; সেটি হচ্ছে লাফ দিয়ে চলা। এই বিদ্যায় ফড়িঙের একটু বিশেষরকম বাহাদুরি দেখা যায়, কারণ অন্যান্য অনেক পোকার তুলনায় ফড়িঙের চেহারাটি বেশ বড়োই বলতে হবে। আরো অনেক বড়ো পোকা আছে, যেমন আরশুলা, যারা একটু-আধটু লাফাতে পারে; কিন্তু তাদের লাফানির চাইতে উড়বার ঝোঁকটাই বেশি। ফড়িঙের যদিও ডানা আছে, কিন্তু সেটা সে ঠিক উড়বার জন্য—অর্থাৎ বাতাস ঠেলে উঠবার জন্য—ব্যবহার করে না। তাতে কেবল লাফ দিবার সময় বাতাসে ভর করে শরীরটাকে কিছু হালকা করার সুবিধা হয় মাত্র। ফড়িঙের শরীরটা দেখলেই বোঝা যায় যে, ঐরকম লাফ দিবার আয়োজন করেই তাকে গড়া হয়েছে। তার শরীরের ভিতরটা বাতাসে পোরা বললেও হয়—অন্য কোনো পোকার মধ্যে এতগুলা ফাঁপা নল প্রায়ই দেখা যায় না। শরীরটা হালকা হওয়ায় যে লাফাবার সুবিধা হয় তা সহজেই বুঝতে পার। তার উপর ফড়িঙের পা দুটিতেও একটু বিশেষরকমের কেরামতি আছে। পায়ের আগাটি যেন বঁড়শির মতো বাঁকানো। লাফাবার সময় সে ঐ বঁড়শি দিয়ে সুবিধামতো গাছের ডালপালা কিছু একটা বেশ করে আঁকড়িয়ে ধরে। তার পর পা-টাকে জোর করে গুটিয়ে হঠাৎ টান ছেড়ে দেয়, আর সেইসঙ্গে সমস্ত শরীরটা ধনুকের ছিলার মতো ছিটকিয়ে যায়। এরকম সাংঘাতিকভাবে লাফাতে গিয়ে যাতে হাত-

পা জখম না হয়, তার জন্যও ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম ব্যবস্থা, তার ডানা দুটি। লাফ দিয়ে পড়বার সময় ঐ ডানার উপর ভর দিয়ে সে লাফানির ঝুঁকিটা সামলিয়ে নেয়। তার পর সামনের পাগুলোর আগায় যে পুঁটুলি রয়েছে ঐগুলোতে পড়বার চোট্ কমিয়ে দেয়। ফড়িঙের ইংরাজি নামটিতেও তার ঐ লাফানির পরিচয় পাওয়া যায়। (Grass hopper অর্থাৎ 'যিনি ঘাসের উপর লাফিয়ে বেড়ান')।

মাঠের মধ্যে ফড়িঙের 'চির্-চির্' শব্দ অনেক সময়ে খুব স্পষ্ট শোনা যায়। এই আওয়াজটি কিন্তু তার গলা থেকে বোরোয় না—তার যন্ত্রটি থাকে ডানার মধ্যে। ডানা দুটির গোড়া 'উকা'র মতো খড়্‌খড়ে দুটি সরু তাঁতের উপর একটি পাতলা 'চামড়া'র ছাউনি। ঐ তাঁতের ঘষাঘষিতে আওয়াজ হয় আর ঐ পাতলা চামড়াটিতে সেই আওয়াজটাকে বাড়িয়ে তোলে। এইরকম আওয়াজ করে তাদের কি লাভ হয় ? একটা লাভ হয় এই যে তারা এমনি করে পরস্পরকে ডাকতে পারে। ভালো খাবার পেলে বা মনে খুব ফর্তি হলেও তারা এইরকম করে ডাকে ; ভয় পেলে চুপ করে থাকে। আশ্চর্য এই যে, স্ত্রী ফড়িংদের আওয়াজ নাই ; কিন্তু তাদের 'কান' খুব ভালো।

'কান' বললাম বটে, কিন্তু একটা ফড়িং ধরে যদি তার কান খুঁজতে যাও, হয়তো খুঁজেই পাবে না ; কারণ কানটি থাকে তার হাঁটুর কাছে না হয় পিঠের উপর। কানেরও আবার নামান রকম-বেরকম আছে। কোনোটা একেবারে খোলা দুটো পাতলা চামড়ার খোলা, কোনোটা গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে বসানো—কোনোটার মুখে রীতিমতো ঢাকনি দেওয়া।

সন্দেশ—শ্রাবণ, ১৩২৩

পেকারি

'পেকারি' কি জান ? দক্ষিণ আমেরিকায় একরকম শুয়োর আছে তার নাম পেকারি। আমাদের দেশী এক-একটা বড়ো-বড়ো বরাহের কাছে পেকারি যেন কুকুরের পাশে ইঁদুরটা। বেশ বড়ো একটি পেকারি হয়তো একটি সাধারণ ছাগলের চাইতে বড়ো হবে না। কিন্তু পেকারিকে ভয় করে না, এমন জানোয়ার সেদেশে কম আছে ! তার কারণ পেকারিরা সব সময় বড়ো-বড়ো দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। এক-একটা দলে এক-এক সময় চল্লিশ-পঞ্চাশটা পর্যন্ত পেকারি থাকতে দেখা যায়।

পেকারির প্রধান শত্রু 'জাগুয়ার'। যতরকম চিতে বাঘ আছে তার মধ্যে এই জাগুয়ারই সবচাইতে বড়ো আর ভয়ানক। কিন্তু পেকারির দল সামনে পড়লে জাগুয়ার পর্যন্ত মানে মানে পথ ছেড়ে পালায়। একবার একদল সাহেব দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড ঝোপের মধ্যে থেকে এমনি ভয়ানক ফোঁস্ ফোঁস্ ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ আসতে লাগল যে, তাঁরা ব্যস্ত হয়ে চট্‌পট্ গাছে উঠে পড়লেন। উঁচুতে উঠে তাঁরা দেখেন, একটা ভাঙা গাছের ডালের উপর এক জাগুয়ার চড়ে বসেছে—আর তার চারিদিকে পেকারির দল ভয়ানক গোল বাধিয়ে তুলেছে ! জাগুয়ারটা যেখানে বসেছে, ততদূর পর্যন্ত

ওদের নাগাল পৌঁছায় না, তাই তারা কেবল রাগের মাথায় ফোঁস্ ফোঁস্ করছে। আর গাছের গোড়ায় ঢুঁ মারছে। মাঝে মাঝে এক-একটা লাফ দিয়ে জাগুয়ারটাকে গুঁতো লাগাবার চেষ্টা করছে। কয়েকটা গাছে উঠতে গিয়ে বার বার পড়ে যাচ্ছে, তবু ছাড়ছে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইরকম থেকে জাগুয়ারটার বোধ হয় একটু পরিশ্রম হয়েছিল। সে যেই একটু নড়ে বসতে গেছে, অমনি তার একটা পা হড়্‌কিয়ে ঝুলে পড়েছে। যেমন ঝোলা অমনি একটা পেকারি গিয়ে তার দাঁত দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিয়েছে। জাগুয়ারটাও একেবারে ক্ষেপে গিয়ে, এক লাফে পেকারিগুলোকে ডিঙিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু পড়ে আর তাকে উঠতে হল না, মাটিতে ঠেকার সঙ্গে সঙ্গে পেকারির পাল তার উপর পড়ে, তাকে মাড়িয়ে থেঁৎলিয়ে গুঁতিয়ে আঁচড়িয়ে কামড়িয়ে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলল। জাগুয়ারটা যতক্ষণ বেঁচেছিল, ততক্ষণ সে ধস্তাধস্তি করতে ছাড়ে নি। কিন্তু তার উপরে এতগুলো শুয়োর চেপেছিল যে, মাটিতে পড়বার পর আর তাকে চোখেই দেখা যায় নি। শুয়োরগুলি যদি তাকে আর কিছু নাও করত, তবু শুধু চাপের চোটেই মেরে ফেলতে পারত। জাগুয়ারটা মরে যাবার পরেও পেকারিদের রাগ থামে নি। তারা প্রায় আধঘণ্টা পর্যন্ত, থেকে থেকে পাগলের মতো তার উপর তেড়ে যাচ্ছিল। তার পর যখন পেকারির দল চলে গেল তখন দেখা গেল এগারোটা পেকারি মরে পড়ে আছে, আর জাগুয়ারের রক্ত চামড়া মাংস আর হাড় চারিদিক ছড়িয়ে পড়েছে।

পেকারিরা যখন শত্রুর সামনে পড়ে, তখন তারা ধনুকের মতো গোল হয়ে তার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। যদি শত্রু আপনা থেকে সরে পড়ে তবে ভালোই ; কিন্তু সে যদি একটুও তেজ দেখাতে চেষ্টা করে, তবে আর রক্ষা নেই। দলকে দল তার উপর পড়ে তাকে আর আস্ত রাখবে না। সেইজন্যে জাগুয়ারেরা কখনো ইচ্ছা করে পেকারির দলকে ঘাঁটাতে চায় না ; অথচ পেকারির মাংস তার অতি প্রিয় খাদ্য। জাগুয়ার সাধারণত গাছের উপর পাতার আড়ালে চুপচাপ লুকিয়ে থাকে। যদি দৈবাৎ এক-আধটা পেকারি দল থেকে একটু এদিকে ওদিকে গিয়ে পড়ে সে এক লাফে তার ঘাড় ভেঙে আবার দৌড়ে গাছের উপর উঠে বসে; সেই সঙ্গে পেকারির দলও একেবারে চীৎকার করতে করতে সেই গাছের চারিদিকে এসে জড়ো হয়। জাগুয়ার ততক্ষণে বেশ একটি উঁচু ডালের উপর হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করতে থাকে। পেকারির দল সারাদিন কেবল চীৎকার আর দাপাদাপি করুক, তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। যখন তারা চলে যাবে, তখন সেও সুযোগ বুঝে সেই আগের মারা পেকারিটাকে খেতে নামবে।

অনেক সময়ে নদীর ধারে কাদার মধ্যে গাছের গুঁড়ির উপর পেকারির দল হুড়াহুড়ি করে খেলে বেড়ায়। সেইখানে কাদামাখা কাঠের চেলার মতো কুমির হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে থাকে। সে আবার আমাদের দেশের কুমিরের চাইতেও চট্‌পটে—এই দেখছ মড়ার মতো, এর পরেই হয়তো দেখবে পাঁচ হাত লাফ দিয়ে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। পেকারির দল এদিক-ওদিক ঘুরেটুরে যখন সেইদিকে আসে, কুমিরও ল্যাজটিকে টান করে ভাবে 'এইবার সময় এসেছে'। যদি দৈবাৎ এক-আধটা পেকারি খেলতে খেলতে সেই ল্যাজের উপর উঠে পড়ে, তবে আর রক্ষা নেই। নিশ্চয় দেখবে, তার পরের মুহূর্তেই ল্যাজের এক ঝাপটায় পেকারিভায়া ডিগবাজি খেয়ে শূন্যে উঠেছেন, তার পর শূন্যে থাকতে থাকতেই

সেই সাংঘাতিক ল্যাজ চাবুকের মতো ছুটে এসে, আবার এক বাড়িতে তাকে কাদার মধ্যে আছাড় মেরে ফেলেছে।

ব্যাপারটা কি হল, দলের সবাই সেটা ভালো করে বুঝবার আগেই, কুমির তার শিকার মুখে নিয়ে আচ্ছা করে ঝাঁকানি দিয়ে জলের মধ্যে নেমেছে। এদিকে পেকারির দল তেড়ে এসে দাঁত উঁচিয়ে তীরের কাছে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে একটিবার কুমিরের চেহারাটি দেখেই একেবারে চার পা তুলে দে দৌড়। ঐ একমাত্র জানোয়ার যার কাছে পেকারির দল ঘেঁষতে সাহস পায় না।

সেদেশের লোকেরা যে পেকারিকে খুব হিসাব করে চলে, তা সহজেই বুঝতে পার। একলা পেলেও কেউ তাকে সহজে ঘাটাতে চায় না; কারণ কাছেই তার দলটি আছে কিনা জানবে কি করে? সুতরাং পেকারির সামনে যদি কখনো পড়, তবে আর কিছু করবার আগে সুবিধা মতো একটি গাছের উপর চড়ে বসাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

সন্দেশ—শ্রাবণ, ১৩২৩

সেকালেরবাঘ

সেকালে এমন সব জন্তু ছিল যা আজকাল আর দেখা যায় না—এ কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। সেকালের চার দাঁতওয়ালা হাতি, ত্রিশ হাত লম্বা কুমির বা হাঁসুলি-পরা তিন শিঙা গণ্ডার, এর কোনোটাই আজকাল পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে গুহা-গহ্বরে পাহাড়ের গায়ে বা বরফের নীচে তাদের কংকালের কিছু কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়—তা থেকেই পণ্ডিত লোকে বুঝতে পারেন যে, এক সময়ে এই-এইরকম জানোয়ার পৃথিবীতে ছিল। যাঁরা এই-সকল জিনিসের চর্চা করেন, তাঁরা সামান্য এক টুকরা দাঁত দেখে বলতে পারেন—এটা কিরকম জন্তুর দাঁত, সে আমিষ খায় কি নিরামিষ খায়, ইত্যাদি।

এবার যে জানোয়ারের কথা বলছি ইংরাজিতে তাকে বলে Sabre-toothed Tiger (অর্থাৎ খড়্গদন্ত বাঘ)। এর কংকাল ইউরোপে, আমেরিকায়, আমাদের দেশে এবং আরো নানা জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। এই খড়্গের মতো দাঁত দুটিতে তার কি কাজ হত, সে কথা বলা বড়ো শক্ত। অত লম্বা দাঁত দিয়ে কামড়াবার সুবিধা হয় না; তা ছাড়া এই বাঘের চোয়ালের হাড় আজকালকার বাঘের মতো মজবুত নয়, সুতরাং তার কামড়ের জোরও কম ছিল। দাঁত দুটি প্রায় ছয় ইঞ্চি করে লম্বা, তার গায়ে ছুরির মতো ধার—হয়তো তা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শিকারের মাংস ছাড়াবার সুবিধা হত। যে জন্তু যেরকম স্থানে যেরকম অবস্থায় বাস করে সে অনুসারে তার চেহারা ও গায়ের রঙ কিছু-না-কিছু বদলিয়ে আসে। বাঘের গায়ে যে কালো কালো দাগ দেখতে পাও তাতেই বুঝতে পারা যায় যে, ঝোপ-জঙ্গলে চলাফিরা তার অভ্যাস আছে। সেখানে বড়ো-বড়ো ঘাসের ঝোপে যখন বাঘমশাই লুকিয়ে থাকেন, তখন সেই খাড়া ঘাসের আলো-ছায়ার সঙ্গে বাঘের হলদে-কালোর ডোরাগুলি এমনি-ভাবে মিশিয়ে যায় যে হঠাৎ দেখলে বুঝবার জো নেই যে ওখানে ঝোপ ছাড়া আর কিছু

আছে। কিন্তু যত দূর বোঝা যায়, তাতে মনে হয় আমাদের খড়্গদন্ত মহাশয় সিংহের মতো খোলা জায়গাতেই সাধারণত বাস করতেন—সুতরাং তাঁর গায়ে একালের বাঘের মতো দাগ না থাকাই সম্ভব বোধ হয়।

একালের বাঘের চাইতে খড়্গদন্তের মুখখানা অনেকটা লম্বাটে গোছের ছিল। তার লেজটিও সাধারণত একটু বেঁটে হত। শরীরের গড়নটা মোটের উপর আজকালকার বাঘেরই মতো, কিন্তু একটু ভারী গোছের— বিশেষত সামনের পায়ের দিকটা। সুতরাং তার পক্ষে খুব দৌড়ানো বা লাফানো বা চট্‌পট্‌ হাত-পা-নাড়া বড়ো সহজ ছিল না। নানান যুগের নানানরকম পাথরে এই বাঘের কংকাল পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় যে, এরা বহুকাল ধরে পৃথিবীতে নানা দেশে দৌরাত্ম্য করে তার পর কেন জানি না একেবারে লোপ পেয়েছে।

সন্দেশ—ভাদ্র, ১৩২৩

অদ্ভুত কাঁকড়া

রাক্ষুসে কাঁকড়ার চেহারাটি তেমন কিছু ভীষণ নয়, গায়ের রঙটিও বেশ সুন্দরই বলতে হবে— তবে একে রাক্ষুসে বলা হচ্ছে কেন? 'রাক্ষুসে' বলার একমাত্র কারণ হচ্ছে তার দেহের আয়তনটি। খুব বড়ো একটি রাক্ষুসে কাঁকড়ার বড়ো দুটি দাঁড়া ফাঁক করিয়ে তার এক আগা থেকে আর-এক আগা পর্যন্ত মাপ নিয়ে দেখা গেছে, দশ-বারো হাত লম্বা! এটা হল কর্তা-কাঁকড়ার কথা—তাঁর গিন্নী যে কাঁকড়ি, তাঁকে তো আর যখন-তখন লড়াই করতে হয় না, কাজেই তাঁর অত বড়ো দাঁড়াও নেই।

এই কাঁকড়া থাকে জাপান দেশে সমুদ্রের জলে। সেইখানে কূলের কাছে সমুদ্রের শ্যাওলা-ধরা পাথরের মধ্যে রাক্ষসে কাঁকড়া গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকে। নামটি রাক্ষুসে হলেও এদের স্বভাবটি মোটেও রাক্ষসের মতো নয়—সেইজন্য নানা জাতীয় মাছ, আর অক্টোপাস প্রভৃতি জলজন্তু এদের দেখতে পেলেই তেড়ে খেতে আসে। নানারকম শ্যাওলা প্রবাল আর 'স্পঞ্জ' তার গায়ের উপর বাসা করে তার আসল চেহারাটিকে এমন বেমালুম ঢেকে রাখে যে, খুব কাছে গেলেও অনেক সময় তাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়।

আরো কতগুলি কাঁকড়া রয়েছে, যেগুলিকে গেছো কাঁকড়া বলা যায়। এরা সত্যি সত্যি গাছে চড়ে কিনা তা নিয়ে আগে নানারকম তর্ক শোনা যেত, কিন্তু এখন এটা একেবারে সত্য বলে প্রমাণ হয়েছে। তবে এরা যে নারকেল গাছের আগায় চড়ে ডাব পেড়ে আনে, এ কথাটা অনেক সময় শোনা গেলেও এর কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাহোক, অল্পই উঠুক আর বেশিই উঠুক, ডাব পাড়ুক আর নাই পাড়ুক গাছে চড়া আর নারকেল খাওয়া এই দুই বিদ্যাতেই এর বেশ বাহাদুরি আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের কতগুলি ছোটো-ছোটো দ্বীপে এই কাঁকড়ার বাড়ি। সেখানে নারকেল গাছের অভাব নেই, নারকেল মাটিতে পড়লেই গেছো কাঁকড়া তাকে আক্রমণ করে। প্রথমত সে নারকেলটার ছোবড়া ছাড়িয়ে নেয়—এই ছোবড়া তাদের গর্তে বিছাবার জন্য দরকার হয়। তার পর যে দিকে নারকেলের

'চোখ' থাকে, সেই দিকে দাঁড়া দিয়ে বুকে গর্ত করে সেই গর্তের মধ্যে দাঁড়া ঢুকিয়ে খুব মজা করে খায়। আস্ত নারকেলটিকে যে দাঁড়া দিয়ে ভাঙতে পারে—তার দাঁড়ার একটি চাপটে যে মানুষের হাড় পর্যন্ত ভেঙে দেয় সেটা কিছুই আশ্চর্য নয়। কিন্তু তবু মানুষ তাকে ধরতে ছাড়ে না—কারণ এ কাঁকড়া খেতে নাকি অতি চমৎকার। তার পায়ে এত চর্বি যে সেই চর্বি গলিয়ে সেদেশের লোকেরা তেল বার করে রাখে। তার উপর সেদেশের বুনো শুয়োরগুলোরও কেমন বদভ্যাস—তারা গর্ত খুঁড়ে এই কাঁকড়াদের বার করে খেয়ে ফেলে।

রাক্ষুসে কাঁকড়ার মতো বড়ো না হলেও, এগুলিও নেহাত ছোটো নয়। একবার এইরকম একটা কাঁকড়াকে একটা মজবুত টিনের বাক্সে বন্ধ করে বাক্সটাকে তার দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। কিন্তু পরেরদিন দেখা গেল যে, কাঁকড়াটা বাক্সের ধার মুচড়িয়ে ফাঁক করে তা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

সন্দেশ—আশ্বিন, ১৩২৩

জানোয়ারওয়ালা

এক সার্কাসওয়ালার ছেলে—বয়স তার ষোলো বৎসর—সে স্কুলের ছুটিতে বাড়ি এসেছিল। সেখানে সে রোজ সিংহের খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে থাকত আর দেখত সিংহকে কেমন করে খেলা শেখায়। যে লোকটা সিংহের খেলা দেখাত, সে একটা সিংহের উপরে ভারি অত্যাচার করত—সিংহটাকে না খাইয়ে, মারধোর করে, গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে সে নানারকমে কষ্ট দিত। দেখে ছেলেটির ভয়ানক রাগ হল ; সে তার বাবার কাছে গিয়ে সেই লোকটার নামে নালিশ করল। কিন্তু তার বাবা সে কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন ; বললেন, "ওরকম না করলে সিংহ কি পোষ মানে ?" তার পর, অনেকদিন এই অত্যাচার সয়ে সয়ে একদিন সিংহটা সত্যি সত্যিই ক্ষেপে গিয়ে সেই দুষ্টু খেলোয়াড়কে সাংঘাতিকরকম জখম করে দিল।

তখন সেই ছেলে তার বাবাকে বলল, "কাল থেকে আমি সিংহের খেলা দেখাব।" তার বাবা এ কথা শুনে তাকে দুই ধমক দিয়ে দিলেন। কিন্তু ছেলেরও জেদ কম নয়, পরদিন সকালে দেখা গেল সে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে সিংহের খাঁচায় ঢুকে বসে আছে। প্রথমটা সকলে খুবই ভয় পেয়েছিল, কিন্তু ক্রমে দেখা গেল যে, সিংহের সঙ্গে তার এমন ভাব হয়ে গেছে যে ভয়ের কোনো কারণ নেই। এই ছেলে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো 'জানোয়ারওয়ালা'। এঁর নাম ফ্র্যাঙ্ক বোস্টক।

একটি সিংহ নিয়ে আরম্ভ করে এখন প্রায় চল্লিশটিতে দাঁড়িয়েছে। এক-এক সময়ে পঁচিশ-ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশটা সিংহকে একসঙ্গে জড়ো করে তামাশা দেখানো হয়। অবশ্য সিংহগুলি সবই পোষা, কিন্তু তা হলে কি হবে—তবু তো সিংহ। সিংহ কি বাঘ হাজার পোষ মানলেও তাকে ভয় করে চলতে হয়। সামান্য একটু কারণে হঠাৎ একটু ভয় পেলে বা চমকে উঠলে তারা হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে সাংঘাতিক কাণ্ড করে ফেলতে পারে। একবার একজন খেলোয়াড় একটা নতুনরকমের পোশাক পরে খাঁচায় ঢুকেছিল বলে তার সিংহটা

তাকে তেড়ে কামড়াতে গিয়েছিল- খেলোয়াড় তখন পোশাক বদলিয়ে পুরানো পোশাক পরে এসে তার পর খাঁচায় ঢুকতে পেল। আর-একবার এক মেমসাহেব একসঙ্গে পাঁচ-সাতটা সিংহের খেলা দেখাতে গিয়ে এইরকম বিপদে পড়েছিলেন। সেদিন তাঁর হাতে একটা ফুলের তোড়া ছিল, একটা সিংহ তাই দেখে বোধ হয় মাংস না কি মনে করে হঠাৎ তার উপর এক থাবা মেরে বসেছে। ঐ একটি থাবায় মেমসাহেবের গালের আর হাতের মাংসসুদ্ধ উঠিয়ে নিয়েছে আর অমনি চক্ষের নিমেষে সবক'টা সিংহ একেবারে হাঁ হাঁ করে ফুলের তোড়াটার দিকে তেড়ে এসেছে। মেমসাহেবটি তখন বুদ্ধি করে তোড়াটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, তাই রক্ষা, তা নইলে অতগুলো সিংহের হুড়াহুড়ির মধ্যে পড়ে তাঁকে আর বাঁচতে হত না। যা-হোক, ফুলটা মাটিতে পড়তেই সিংহগুলো তাকে নেড়ে শুঁকে নাক সিঁটকিয়ে আবার যে যার জায়গায় ফিরে গেল।

একবার বার্মিংহাম শহরে বোস্টক সাহেবের একটা সিংহ খাঁচা থেকে পালিয়ে শহরের রাস্তায় এসে হাজির হয়েছিল। শহরের মধ্যে হুলুস্থুল পড়ে গেল, রাস্তায় লোকজনের চলা-ফেরা বন্ধ হয়ে গেল। দোকানীরাও তাদের দোকানপাট খুলতে চায় না। সিংহটা এদিক-ওদিক ঘুরে শেষটায় একটা প্রকাণ্ড ড্রেনের নর্দমায় গিয়ে ঢুকে বসল, আর সেখান থেকে সে বেরোতে চায় না। সেই নর্দমার ভিতর দিয়ে সেই রাস্তার নীচে চলাফিরা করে আর মাঝে মাঝে ডাক ছাড়ে। রাত দুপুরে মাটির নীচ থেকে ঐরকম গুরুগম্ভীর আওয়াজ—অবস্থাখানা কিরকম বুঝতেই পার। শেষটা নর্দমার মুখে একটা খাঁচা বসিয়ে সিংহটাকে তাড়িয়ে সেটার মধ্যে নেবার কথা হল। কিন্তু অনেক তাড়া করেও সিংহটাকে নড়ানো গেল না। সকলের চীৎকার, বড়ো-বড়ো পাথরের আঘাত আর লম্বা-লম্বা বাঁশের খোঁচা সে-সব সহ্য করে সে চুপচাপ বসে রইল। তার পর কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হল, বোস্টক সাহেব নিজে তার নাকের আগায় এক ঘা জুতো মেরে আসলেন কিন্তু সিংহ সেখান থেকে নড়ে না। সকলে যখন হয়রান হয়ে পড়েছে এমন সময় একজন লোকের হাত থেকে একটা বালতি কেমন করে ফস্‌কে গিয়ে গড়্‌গড়্ শব্দ করে নর্দমার মধ্যে গড়িয়ে গিয়েছে। সেই আওয়াজ শুনে সিংহ-মশাই এক দৌড়ে ল্যাজ গুটিয়ে একেবারে খাঁচার মধ্যে।

আর-একবার একটা পলাতক সিংহকে পটকা ছুঁড়ে ভয় দেখিয়ে খাঁচার মধ্যে ঢোকানো হয়েছিল। সুতরাং সিংহের যেমন একদিকে খুব সাহস, আর একদিকে তেমনি ভয়ও আছে বলতে হবে। বোস্টক সাহেব বলেন, মানুষের যেমন নানারকমের মেজাজ থাকে—কেউ ঠাণ্ডা কেউ চটা, কেউ হাবাগোছের কেউ চট্‌পটে—এই-সব জানোয়ারদেরও তেমনি। এক-একটা সিংহের চাল-চলন বুদ্ধিশুদ্ধি এক-একরকমের। কোনোটা পোষ মানে একেবারে কুকুরের মতো—কোনোটা হয়তো কোনোকালেই ঠিকমতো পোষ মানে না—তাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখতে হয়। সিংহ পশুরাজ, তাই তার কথাই বেশি করে বললাম, কিন্তু জানোয়ারের মধ্যে হাতির সম্মানও বড়ো কম নয়। বিশেষত বিলাতে ও আমেরিকায়—যেখানে হাতি সর্বদা দেখা যায় না—সেখানে হাতিকে লোকে খুবই খাতির করে। বোস্টক সাহেবের কতগুলো হাতি আছে, তাদের তোয়াজ করবার জন্য অনেকগুলি চাকর সর্বদা লেগে আছে। আমাদের দেশে হাতিগুলো রোজ স্নান করবার সময় অনেকক্ষণ জলে কাদায়

মাটিতে গড়াগড়ি করতে ভালোবাসে তাতে নাকি তাদের গায়ের চমড়া খুব ভালো থাকে। কিন্তু ঠাণ্ডা দেশে সব সময় সেরকম স্নানের সুবিধা না থাকায় তাদের চামড়া শুকিয়ে কড়া হয়ে ফেটে যায়। সেইজন্য মাঝে মাঝে তাদের রীতিমতো ভালোরকম স্নানের বন্দোবস্ত করে দিতে হয়। হাতির পক্ষে 'রীতিমতো স্নান' কাকে বলে, তার একটু নমুনা শোনো। প্রথমত কোনো পুকুর বা বড়ো চৌবাচ্চার জলে হাতিটাকে নামিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে কয়েক ঘণ্টা থাকলে পর তাকে ডাঙায় এনে কড়া বুরুশ দিয়ে তার গায়ে কয়েক ঘণ্টা খুব করে সাবান ঘষে তাকে আবার জলে নামানো হয়। তার পর আবার সাবান ঘষা, আবার জলে নামানো। এইরকম তিন-চার বার করা হয়—তাতে প্রায়ই দু-চার দিন সময় লাগে, আর সাবান খরচ হয় প্রায় পঁচিশ সের। তার পর চামড়াটাকে আগাগোড়া একরকম ঝামা দিয়ে ঘষে কয়েকদিন ধরে তাতে বেশ করে তেল লাগানো হয়—এক পিপে জলপাইয়ের তেল। এতেও তার শখ মেটে না—এর পরে তার নখগুলি একটি একটি করে উকো দিয়ে ঘষে পালিশ করে তাকে ফিটফাট করে দিতে হয়। এইরকমে একটি হাতির পিছনে এক সপ্তাহ ধরে পাঁচ-সাতটি লোককে রীতিমতো পরিশ্রম করতে হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, এরকম সাংঘাতিক স্নান সব সময় দরকার হয় না—বছরে দু-চারবার করলে যথেষ্ট।

বোস্টক সাহেবের লোক পৃথিবীর চারিদিকে জানোয়ারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। একবার একটা গরিলার ছানা বিলাতে আনা হয়েছিল বোস্টক সাহেব অনেক দরদস্তুরের পর প্রায় ষোলোহাজার টাকায় সেটাকে কিনে নিয়েছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাকে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি। তার চালাক শিম্পাঞ্জির খেলা দেখিয়ে তিনি অনেক বেশি নাম করেছেন। তারই পোষা শিম্পাঞ্জি 'কনসাল' বিলাতের বড়ো-বড়ো থিয়েটারে তামাশা দেখিয়ে লোকের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। 'কনসাল'কে বোস্টকের লোকেরা ঠিক মানুষের মতো খাতির করত। তার নিজের চাকর, নিজের থাকবার ঘর, টেবিল চেয়ার, কাপড়চোপড়, আসবাবপত্র সব ছিল। তাকে যখন তামাশা দেখাবার জন্যে বড়ো শহরে নেওয়া হত তখন তার জন্য রীতিমতো হোটেলের ঘর ভাড়া করা হত—আলাদা শোবার ঘর, বসবার ঘর, স্নানের ঘর ইত্যাদি। তার আদবকায়দা খুব দুরস্ত। তার বাড়িতে যদি তার সঙ্গে দেখা করতে যাও, সে রীতিমতো চেয়ার থেকে উঠে তোমার সঙ্গে 'হ্যাণ্ডশেক' করবে, তোমাকে টুপি রাখবার জায়গা দেখিয়ে দেবে—তার পর চাকর পেয়ালা এনে তোমার জন্যে গম্ভীরভাবে চা ঢালতে বসবে। প্রথম যে শিম্পাঞ্জিকে বোস্টক সাহেব এই-সব শিখিয়েছিলেন তারই নাম ছিল কন্‌সাল, সে অনেকদিন হল মারা গেছে কিন্তু তার জায়গায় অন্য শিম্পাঞ্জিকে শিখিয়ে নেওয়া হয়েছে—তারও নাম দেওয়া হয়েছে কন্‌সাল।

সন্দেশ- কার্তিক, ১৩২৩

সেকালের বাদুড়

সেকালের জন্তুর কথা বলিলেই একটা কোনো কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ারের চেহারা মনে আসে। যে-সকল জন্তু এখন দেখিতে পাই না, অথচ যাহার কংকালচিহ্ন দেখিয়া বুঝিতে পারি যে সে এককালে পৃথিবীতে ছিল, তাহার চেহারা ও চাল-চলন সম্বন্ধে স্বভাবতই কেমন একটা কৌতূহল জাগে। তাহার উপর যদি তাহার মধ্যে কোনো অদ্ভুত বিশেষত্বের পরিচয় পাই, তবে তো কথাই নাই।

সেকালের 'বাদুড়' লিখিলাম বটে, কিন্তু তাহার চেহারা দেখিলে সবসময় বাদুড় বলিয়া চিনিবে কিনা সন্দেহ। কারণ, সে সময়ের এক-একটা জন্তুকে আজকালকার কোনো নামে পরিচিত করা অনেক সময়েই অসম্ভব। মনে করো একটা জন্তু, তার সাপের মতো গলা, কচ্ছপের মতো পিঠ, কুমিরের মতো দাঁত, তিমির মতো ডানা আর গিরগিটির মতো মাথা—তখন তাহাকে কি নাম দিবে? সেইজন্য বাদুড় বলিতে খুব সাবধানে বলা দরকার—যেন আজকালকার নিরীহ চামচিকা গোছের কিছু একটা মনে করিয়া না বসো।

আজকাল যে-সকল বাদুড় দেখিতে পাও তাহাদের চেহারা ও চাল-চলনের মধ্যে কত তফাত। কোনোটার কান খরগোশের মতো লম্বা, কোনোটার কান ইঁদুরের মতো গোলপানা, কোনোটার মুখ শেয়ালের মতো, কোনোটার মুখ ভেংচিকাটা সঙের মতো, কারও নাক পদ্মফুলের মতো ছড়ানো, কারও নাক নাই বলিলেও হয়। কিন্তু সেকালের যে জানোয়ারগুলাকে বাদুড় বলিতেছি তাহাদের মধ্যে আরো অদ্ভুত রকমারি দেখা যাইত। এক-একটাকে দেখিয়া মনে হয় যেন বাদুড় পাখি আর কুমিরে মিলিয়া খিচুড়ি পাকাইয়াছে। এগুলিকে সাধারণভাবে বলা হয় টেরোড্যাক্টাইল (pterodactyl) অর্থাৎ যাহার আঙুলে পাখা।

পাহাড়ের গায়ে যে-সব পাথরের স্তর থাকে তাহারা চিরকালই পাথর ছিল না। অনেক পাথর এক সময় মাটির মতন নরম ছিল। সেই নরম মাটিতে জানোয়ারের কংকাল জমিয়া অনেক সময়ে একেবারে পাথর হইয়া থাকে—এইরকম পাথরকে এক কথায় জীবশিলা বলা যাইতে পারে। এক সময় ছিল যখন পৃথিবীতে পাখি বা বাদুড় কিছুই দেখা যায় নাই—তখন সরীসৃপের যুগ ছিল। অদ্ভুত কুমির বা গোসাপ তখন ভয়ংকর মূর্তি ধরিয়া পৃথিবীতে রাজত্ব করিত। সেই অতি প্রাচীন যুগের পাথরে এ-সকল বাদুড়ের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না—যা কিছু পাওয়া যায় সবই আরো আধুনিক যুগের। 'আধুনিক' বলাতে মনে করিও না যে মাত্র কয়েক শত বা সহস্র বৎসরের কথা বলিতেছি—সে 'আধুনিক' যুগ কয় লক্ষ বৎসর আগেকার তাহা আমি জানি না।

যতরকম 'বাদুড়' পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে সবচাইতে পুরাতনটি যে মাংসাশী ছিলেন, ইঁহার দাঁতের মধ্যে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার নাম রাখা হইয়াছে 'ডাই-মর্ফোডন' (Dimorphodon) অর্থাৎ দ্বিমূর্তিদন্তী।

সবগুলি বাদুড়ই যে প্রকাণ্ড বড়ো হইত তাহা নহে, কিন্তু সবচাইতে বড়োগুলি যে খুবই

বড়ো তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষিণ আমেরিকায় যে-সকল বাদুড়ের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে তাহার এক-একটি ডানা মেলিলে পঁচিশ ফুট চওড়া হয়। ইহাদের মাথার উপরে অদ্ভুত এক প্রকাণ্ড শিং ছিল। এই শিংটা তাহার কি কাজে লাগিত তাহা জানি না, কিন্তু ইহাতে তাহার বিদ্ঘুটে চেহারার কোনো উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। এত বড়ো জন্তুটা উড়িলে পরে তাহার ডানা ঝাপটাইবার শব্দ নিশ্চয়ই বহু দূর হইতে শোনা যাইত। ইহারা কোনোরূপ শব্দ করিত কিনা বলিতে পারি না কিন্তু আওয়াজ করিলে সেটা খুব সুমিষ্ট হইত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইহাদের মুখে নাকি দাঁত থাকিত না, কিন্তু তাহাতেও আশ্বস্ত হইবার বিশেষ কোনো কারণ দেখি না, কারণ ইহার যে ঠোঁট ছিল তাহাতে সাংঘাতিক ধার! সুতরাং তাহার ঠোকর দু-একটা খাইলে আর বেশি খাইবার দরকার হইত না। মোট কথা, এ জন্তুটা যে সেকালেই লোপ পাইয়াছে এটা আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে।

সন্দেশ—ফাল্গুন, ১৩২৩

সিন্ধু ঈগল

সমুদ্রের ধারে যেখানে ঢেউয়ের ভিতর থেকে পাহাড়গুলো দেয়ালের মতো খাড়া হয়ে বেরোয়, আর সারা বছর তার সঙ্গে লড়াই করে সমুদ্রের জল ফেনিয়ে ওঠে, তারই উপরে অনেক উঁচুতে পাহাড়ের চূড়ায় সিন্ধু ঈগলের বাসা। সেখানে আর কোনো পাখি যেতে সাহস পায় না—তারা সবাই নীচে পাহাড়ের গায়ে ফাটলে ফোকরে বসবাস করে। পাহাড়ের উপরে কেবল সিন্ধু ঈগল—তারা স্বামী-স্ত্রীতে বাসা বেঁধে থাকে।

ঈগলবংশ রাজবংশ—পাখির মধ্যে সেরা। সিন্ধু ঈগলের চেহারাটি তার বংশেরই উপযুক্ত—মেজাজটিও রাজারই মতো। সিংহকে আমরা পশুরাজ বলি—সুতরাং ঈগলকেও পক্ষীরাজ বলা উচিত; কিন্তু তা আর বলবার জো নেই কারণ রূপকথার আজগুবি গল্পে লেখে, পক্ষীরাজ নাকি একরকম ঘোড়া! যাহোক—শুনতে পাই রাজারা নাকি মৃগয়া করতে ভালোবাসেন। তা হলে সে হিসাবেও সিন্ধু ঈগলের চালের কোনো অভাব নেই। চিল কাক সাঁচান শকুন সবাই মরা মাংস খায়—কাজেই সেরকম খাওয়া যতক্ষণ জোটে ততক্ষণ তাদের আর শিকার করা দরকার হয় না। সিন্ধু ঈগলের স্বভাবটি ঠিক তার উলটো—যতক্ষণ শিকার জোটে ততক্ষণ সে মরা জানোয়ার পেলেও তা ছোঁয় না। কিন্তু একটি তার বদভ্যাস আছে, সেটাকে ঠিক রাজার মতো বলা যায় না; সেটি হচ্ছে অন্যের শিকার কেড়ে খাওয়া।

সমুদ্রের ধারে ছোটো-বড়ো কতরকম পাখি—তারা সবাই মাছ ধরে খায়। নিতান্ত ছোটো যারা তারা ধরে ছোটো-ছোটো মাছ—সে-সব মাছের উপর সিন্ধু ঈগলের কোনো লোভ নাই। কিন্তু বড়ো-বড়ো গাংচিল আর মেছো চিলগুলো যে-সব বড়ো-বড়ো মাছ জল থেকে টেনে তোলে তার দু-চারটা যে মাঝে মাঝে সিন্ধু ঈগলের পেটে যায় না, এমন নয়। সমুদ্রের ধারে

শিকারের অভাব কি ? মাছ খেয়ে যদি অরুচি ধরে, তবে এক-আধটা পাখি মেরে নিলেই হয়। তা ছাড়া একটু ডাঙার দিকে ইঁদুর খরগোস এমন-কি, ছাগলছানাটা পর্যন্ত মিলতে পারে। কিন্তু তবু সে অন্যের শিকারে জবরদখল জাহির করতে ছাড়ে না। এই-যে ডাকাতি করে কেড়ে খাওয়া, এ বিদ্যায় সিন্ধু ঈগলের বেশ একটু কেরামতি আছে। তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে ডাকাতি করে। সারাদিন তারা আকাশে উড়ে উড়ে বেড়ায়। উড়তে উড়তে কোথায় গিয়ে ওঠে, মনে হয় যেন সে মেঘের রাজ্যে চলে গিয়েছে, পৃথিবীর উপর বুঝি তার কোনো দৃষ্টি নেই। কিন্তু ঈগলের চোখ বড়ো ভয়ানক চোখ। ঐ উঁচুতে থেকেই সে সমস্ত দেখছে কিছুই তার চোখ এড়াবার জো নাই। ঐ যে বকপাখি জলের ধারে খেলছে আর মাছ ধরছে, তার মধ্যে একটা মেছো-চিল ঘুরে ঘুরে শিকার খুঁজছে- ঈগল পাখির চোখ রয়েছে তারই উপর।

জলের নীচে একটা মাছ বার বার উঠছে আর নামছে, চিল কেবল তাই দেখছে—মাথার উপরে যে ঈগলরাজ টহল ফিরছেন সেদিকে তার খেয়ালই নাই। একবার মাছটা যেই ভেসে উঠেছে, আর অমনি ছোঁ করে মেছো-চিল জলের উপর পড়েছে। তার পর মাছ-সুদ্ধ টেনে তুলতে কতক্ষণ লাগে! চিল ভাবছে এখন একটু নিরিবিলি জায়গা দেখে ভোজনে বসবে, এমন সময় চিঁ হিঁ হি হিঁ হিঁ—ভূতের হাসির মতো বিকট চীৎকার করে কি একটা প্রকাণ্ড ছায়া তার ঘাড়ের উপর ঝড়ের মতো তেড়ে নামল। সে আর কিছু নয়, সিন্ধু ঈগল ; ঐ মাছটার উপর তার নিতান্তই লোভ পড়েছে। তাড়া খেয়ে চিলের বাছা পালাতে পারলে বাঁচে, কিন্তু পালাবে কোথায় ? দুদিক থেকে দুইটা ঈগল ক্রমাগত তেড়ে তেড়ে ছোবল মারছে, তার একটি ছোবল গায়ে লাগলে হাড়ে মাংসে আলগা হয়ে যায়। তার উপর সেই বিকট আওয়াজ যখন কানের কাছ দিয়ে হেঁকে যায় তখন বুদ্ধিশুদ্ধি আপনা হতেই ঘুলিয়ে আসে। কাজেই মেছো-চিলের মাছ খাওয়া এবারে আর হল না। সে বারকয়েক ঈগলের ঝাপটা এড়িয়ে তার পর প্রাণের ভয়ে মাছটাছ ফেলে পালালো।

সিন্ধু ঈগল অনেক সময় সমুদ্র ছেড়ে বড়ো-বড়ো নদীর ধারে গাছের উপর বাসা বাঁধে। সে বাসাও একটি দেখবার মতো জিনিস। এক-একটা বাসা পাঁচ-সাত হাত চওড়া ; বছরের পর বছর সেটাকে তারা ক্রমাগতই উঁচু করে একটা রীতিমতো সিংহাসন বানিয়ে তোলে। এই বাসা বানানো ব্যাপারটা নাকি দেখতে ভারি মজার। একটা ঈগল অনেক কষ্ট করে কত-গুলো ডাল সংগ্রহ করে আনল—আর-একটা হয়তো সেগুলো পছন্দই করল না। এমনি করে যত ডালপালা জোগাড় হয় তার অধিকাংশই খামখা নেড়ে-চেড়ে ফেলে দেওয়া হয়। তখন তা নিয়ে তাদের মধ্যে ভারি একটা ঝগড়া লেগে যায় ; তারা বাসা বানানো বন্ধ রেখে মুখ ভার করে বসে থাকে। আবার হঠাৎ খানিক বাদেই তারা আপসে ভাব করে বাসা বানাতে লেগে যাবে।

এরা সাধারণত মানুষকে কিছু বলে না বরং তাড়া করলে বাসাটাসা ফেলে পালায়। তবে, বাসায় যদি ছানা থাকে, তা হলে তাড়াতে গেলে অনেক সময়ে উলটে তেড়ে আসে। তখন দেখা যায় তাদের তেজ কেমন সাংঘাতিক। একবার এক সাহেবের চাকর তামাশা দেখবার জন্য গাছে উঠে ঈগলের বাসায় উঁকি মারতে গিয়েছিল। তাতে ঈগলেরা তাকে

তেড়ে এসে এমনি সাজা দিয়েছিল যে সাহেব বন্দুক নিয়ে ছুটে না আসলে সেদিন তার তামাশা দেখবার শখ একেবারে জন্মের মতো ঘুচে যেত।

সন্দেশ—চৈত্র, ১৩২৩

জানোয়ারের প্রবাস যাত্রা

গ্রীষ্ম আসিতেছে—তোমরা কতজনে হয়তো এখন হইতেই তাহার কথা ভাবিতেছ। কবে ছুটি হইবে, তার পর কে কোথায় যাইবে, কেমন করিয়া সময় কাটাইবে ইত্যাদি কত কথা। গ্রীষ্মের সময়ে যেদেশে গরম কম সেই দেশে যাইতে ইচ্ছে করে, তাই লোকে সিমলা যায় দার্জিলিং যায় শিলং যায়। এরকমে দেশ ছাড়িয়া পলাইবার ইচ্ছা কেবল যে আমাদেরই হয় তাহা নয়, পশুপক্ষী সকলেরই মধ্যে কিছু কিছু দেখা যায়।

শীতের দেশের পাখি যাহারা হিমালয়ের উত্তরে সারা বছর কাটায়, তাহারা প্রতি বছর শীতকালে আমাদেরই গরম দেশে হাওয়া খাইতে আসে। কোথায় হিমালয় আর কোথায় এই বাংলা দেশের দক্ষিণ; অথচ বছরের পর বছর কত হাঁস কত বক এই লম্বা পথ পার হইয়া আসে, আবার শীতের শেষে ঠিক নিয়মমতো সময়ে হিমালয় ডিঙাইয়া দেশে ফিরিয়া যায়। কোথা হইতে যে তাহারা এদেশের সন্ধান পায়, আর কেমন করিয়াই-বা এতখানি পথ চিনিয়া আসে, তাহা কে বলিতে পারে? এরকম যাওয়া-আসা পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়। গরম দেশের পাখি গ্রীষ্মের ভয়ে ঠাণ্ডা দেশে চলিয়াছে; আবার ঠাণ্ডা দেশের পাখি শীতের তাড়ায় গরম দেশে শীতকাল কাটাইতেছে! আশ্চর্য এই যে, এ-সকল পাখি এমন ভরসার সঙ্গে হিসাবমতো চলাফিরা করে যে, মনে হয় যেন পথঘাট সবই তার জানা আছে। যেখানে পথঘাটের কোনো চিহ্ন নাই, রাস্তা চিনিবার কোনো উপায়ও নাই, সেই অকূল সমুদ্রের মধ্যে দিয়াও তাহারা নির্ভয়ে পথ বুঝিয়া চলে। মেঘ বৃষ্টি কুয়াশায় অন্ধকারে কিছুতেই তাহারা পথ ভুলে না। এইরূপে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পাখি মাস ঋতুর হিসাব রাখিয়া আকাশে পাড়ি দিয়া ফিরে।

এ তো গেল পাখির কথা। বড়ো-বড়ো ডাঙার জন্তুও যে এইরূপে দল বাঁধিয়া প্রবাস যাত্রা করে, এরকম তো কত সময়েই দেখা যায়! জেব্রা জিরাফ হাতি হরিণ বুনো মহিষ ইহারা সকলেই সময়মতো এ-বন ও-বন ঘুরিয়া বেড়ায়। আমেরিকার বাইসনগুলি যখন শীতের সময় বড়ো-বড়ো দেশ পার হইয়া সবুজ বন আর তাজা ঘাসের সন্ধানে যাত্রা করে, তখন তাহারা একেবারে মাইলকে মাইল পথ জুড়িয়া চলে। এক সময়ে এই বাইসনের চলাফিরা আমেরিকায় সহজেই দেখা যাইত; কিন্তু নানা কারণে এখন বাইসনের সংখ্যা খুব কমিয়া আসিয়াছে। তাহার মধ্যে মানুষের অত্যাচার খুব একটা বড়ো কারণ বলিতে হইবে। যখন বড়ো-বড়ো দল গোঁ-ভরে নদীজল ভাঙিয়া মাঠ ঘাট পার হইতে থাকে তখন যাহারা দুর্বল, যাহারা চলিতে পারে না, তাহাদের অনেকে পিছে পড়িয়া যায়। সেই সময়ে নানারকম মাংসাশী জন্তু আসিয়া তাহাদের মারিয়া শেষ করে। কিন্তু তবু মানুষে অত্যাচার

না করিলে এখনো তাহারা লাখে লাখে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইত। মানুষ কয় বৎসর সেখানে বসবাস না করিতেই পঞ্চাশ লক্ষ বাইসন খাইয়া হজম করিয়াছে। এক-এক দল লোক এক-এক বারে দশ-বিশ হাজার বাইসন মারিয়া তবে ছাড়ে।

হাতিরা দল বাঁধিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায় এরূপ অনেক সময়েই দেখা যায় কিন্তু সেটা কেবল খাবার সংগ্রহের চেষ্টা মাত্র। দেশ ছাড়িয়া লম্বা দৌড় দেওয়ার অভ্যাসটা তাহার নাই। অর্থাৎ আজকাল নাই। হাতির যাহারা পূর্বপুরুষ, তাহারা যে দেশ-বিদেশ বিচরণ করিতে কিছুমাত্র ক্রুটি করে নাই, তাহার ঢের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংলণ্ড বলো, আমেরিকা বলো, গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকা বলো আর শীতপ্রধান সাইবেরিয়া বলো, সকল স্থানেই জীবন্ত হাতি না পাও, হস্তীজাতীয় জন্তুর কংকালচিহ্ন পাইবে। আফ্রিকার উত্তর দিকে ইজিপ্টের মধ্যে বহু পুরাতন একটা শূকরের মতো জানোয়ারের কংকাল পাওয়া গিয়াছে, পণ্ডিতেরা বলেন যে সেই নাকি হাতির একজন পূর্বপুরুষ। বিদেশ ভ্রমণ কাহাকে বলে তাহা এই জানোয়ারের বংশধরেরা খুব ভালো করিয়া দেখাইয়া গিয়াছে। হাতির কথা বলিতে গেলে আপনা হইতেই ঘোড়ার কথা মনে আসে। হাতির মতো ঘোড়াও, অর্থাৎ তাহার পূর্বপুরুষও এক সময়ে পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু সে ঘোড়া আর আজকালকার মানুষের পোষা ঘোড়ায় আকাশ-পাতাল তফাত—ঠিক যেমন নেকড়ে বাঘ আর শৌখিন কুকুরের প্রভেদ।

হরিণের দল বাঁধিয়া চলার কথা বোধ হয় সকলেই জান। বড়ো-বড়ো শিংওয়ালা হরিণগুলি যখন প্রকাণ্ড দল বাঁধিয়া নদী পার হইতে থাকে, সে নাকি এক চমৎকার দৃশ্য। নদীর এপার হইতে ওপার পর্যন্ত কেবল হরিণের মাথা আর হরিণের শিং। মনে হয় যেন জীবন্ত সাঁকো ফেলিয়া নদীর জলে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। পাঁচ-দশ হাজার হরিণ এইরূপে একসঙ্গে বাহির হয়। প্রায়ই দেখা যায় তাহারা এমন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পথে যাতায়াত করে যে, শিকারীরা আগে হইতে আন্দাজ করিয়া সময়মতো ঠিক জায়গায় খাপ পাতিয়া বসিয়া থাকে।

কিন্তু জানোয়ারের বিদেশযাত্রার কথা বলিতে গিয়া যদি কেবল বড়ো-বড়ো জানোয়ারের কথাই বলি, তবে আসল কথাটাই বাদ থাকিয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে যত আশ্চর্য কথা শুনিয়াছি, তাহার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে লেমিঙের কথা।

পাহাড়ের ধারে যেখানে সবুজ গাছ আর কচি পাতার অভাব নাই, সেইখানে গর্ত করিয়া লেমিং বাস করে। দেখিতে তাহারা ইঁদুরের চাইতে বড়ো নয়, চেহারাও সেইরকম—কেবল লেজ নাই বলিলেই হয়। আর বিশেষ আশ্চর্য তাহাদের বংশবৃদ্ধি। যেখানে আজ দেখিবে কৃচিৎ দু-দশটা লেমিং দেখা যায়, বৎসরেক বাদে গিয়া দেখিবে লেমিঙের বংশে পাহাড় ছাইয়া ফেলিয়াছে। সংখ্যায় যত বাড়ে, তত তাহারা গাছপালা খাইয়া শেষ করে। শেষে এমন অবস্থা হয় যে, আর সবজি জোটে না। পাহাড়কে পাহাড় একেবারে নেড়া হইয়া যায়। তখন ঘোর দুর্ভিক্ষের মধ্যে ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তাহারা ব্যস্ত হইয়া বেড়ায়। মনে হয়, যেন তাহাদের মধ্যে খুব একটা আন্দোলন চলিয়াছে, যেন তাহারা কোনোরূপে পরামর্শ স্থির করিতে পারিতেছে না। তার পর একদিন কি ভাবিয়া তাহারা একেবারে দলে-দলে পাগলের মতো দেশ ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করে।

সে এক দেখিবার মতো জিনিস। লক্ষ লক্ষ ইঁদুর একেবারে পাহাড় কালো করিয়া নামিতে থাকে। কোথায় যাইবে, কোথায় খাবার মিলিবে সে খবর কেহ জানে না অথচ একেবারে নিরুদ্দেশ অন্ধের মতো সকলে হুড়াহুড়ি করিয়া বাহির হয়। বাধা মানে না, বিপদ মানে না, সব হুড়্‌হুড়্‌ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। ঠেলাঠেলিতে পায়ের চাপে কত হাজার হাজার মারা পড়ে, অনাহারে পথের ধারে আরো কত হাজার মরিয়া থাকে। আর নদীর স্রোতে, সমুদ্রের ঢেউয়ে কত যে প্রাণ হারায়, বুঝি তাহার আর সংখ্যা হয় না। যত রাজ্যের মাংসাশী শিকারী পাখি তখন চারিদিক হইতে আকাশ অন্ধকার করিয়া আসিতে থাকে। এমনি করিয়া অজস্র লেমিং বিনষ্ট হইবার পর যে কয়টি অবশিষ্ট থাকে, তাহারাই আবার আর কোনোখানে নূতন করিয়া বংশসৃষ্টির সূত্রপাত করে। ক্রমে আবার সেই সংখ্যাবৃদ্ধি, সেই দুর্ভিক্ষ আর সেই প্রলয়কাণ্ড।

ছোটোর কথা বলিলাম, এখন আরো ছোটোর কথা বলিয়া শেষ করি। পিঁপড়ারা যে বাসা ছাড়িয়া নূতন দেশের সন্ধানে বাহির হয়, ইহা সকল দেশেই দেখা যায়। এ বিষয়ে সকলের চাইতে ওস্তাদ যে পিঁপড়া তাহার নাম ড্রাইভার পিঁপড়া। আফ্রিকার জঙ্গলে ইহারা যখন ঠিক সৈন্যদলের মতো পরিষ্কার সার বাঁধিয়া চলিতে থাকে, তখন জানোয়ার মাত্রেই তাহাকে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া পালায়।

আর পঙ্গপালের কথা কে না জানে? যেদেশের উপর দিয়া পঙ্গপাল যায়, সেদেশের চাষারা মাথায় হাত দিয়া হায় হায় করিতে থাকে। সেদেশে শস্য আর গাছের পাতা বড়ো বেশি অবশিষ্ট থাকে না। দশ-বিশ মাইল লম্বা পঙ্গপালের দল তো সচরাচরই দেখা যায়; এক-একটা দল এত বড়ো থাকে যে মাথার উপর দিয়া সপ্তাহখানেক উড়িয়াও তাহার শেষ হয় না। আফ্রিকায় এইরকম বড়ো-বড়ো কাণ্ড প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। সেখানে পঙ্গপালের চাপে পড়িয়া টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়া পড়ে, পুকুর বুজিয়া যায়, ড্রেন আটকাইয়া যায়, এমন-কি, রেলগাড়ি বন্ধ হইয়া যায়, এমনও দেখা গিয়াছে।

সন্দেশ—চৈত্র, ১৩২৩

ঘোড়ার জন্ম

তোমরা সকলেই জান যে এমন সময় ছিল যখন এই পৃথিবীতে মানুষ ছিল না। শুধু মানুষ কেন, জীবজন্তু গাছপালা কোথাও কিছু ছিল না। তখন এই পৃথিবী তপ্ত কড়ার মতো গরম ছিল—বৃষ্টির জল তাহার উপর পড়িবামাত্র টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিত। তার পর যখন পৃথিবী ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, তখন তাহাতে অল্পে অল্পে গাছপালা জীবজন্তু দেখা দিতে লাগিল।

জীবজন্তু আসিবার অনেক হাজার হাজার বৎসর পরেও মানুষের কোনো অস্তিত্ব দেখা যায় নাই। আজকাল আমরা যে-সকল জানোয়ার সচরাচর দেখিতে পাই—এগুলিও সব 'আধুনিক' কালের—অর্থাৎ সেই অতি প্রাচীন কালের জানোয়ারেরা সকলেই এখন লোপ

পাইয়াছে। সকলে কিন্তু একেবারে লোপ পায় নাই; যদি পাইত তবে এখন পৃথিবীতে এ-সব জীবজন্তুর কিছুই দেখিতাম না। এখনকার এই-সকল জানোয়ারগুলি সকলেই প্রাচীনকালের কোনো-না-কোনো জানোয়ারের বংশধর। এই যে অতি সভ্য অতি বুদ্ধিমান মানুষ, ইহার বংশের ইতিহাস যদি খুঁজিতে যাই তবে এমন জায়গায় গিয়া পড়িব যেখানে মানুষকে আর মানুষ বলিয়া চিনিবার জো থাকিবে না।

এমনিভাবে প্রত্যেক জানোয়ারের ইতিহাস যদি খুঁজিতে যাই—প্রাচীনকালের পাহাড়ের স্তরে তাহাদের যে-সকল কংকালচিহ্ন পাওয়া যায়, সে-সকল যদি পরীক্ষা করিয়া দেখি--তবে প্রত্যেকের বেলায় এই কথারই প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কিন্তু যে-সকল জানোয়ার ছিল, তাহারা সকলেই তো আর আপন আপন কংকালচিহ্ন রাখিয়া যায় নাই- যে-সকল কংকাল পাহাড়ের মধ্যে আজও জমিয়া আছে, তাহারও অতি অল্পই মানুষের চোখে পড়িয়াছে! সেই-জন্য সকল জন্তুর পূর্বপুরুষের হিসাব এখনো ভালো করিয়া পাওয়া যায় নাই। দুটা-একটা যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতেই কতকটা স্পষ্ট দেখা যায়, কতকটা অনুমান করিয়া বুঝিতে হয়, কেমন করিয়া অল্পে অল্পে সেই যুগের এক-একটা জানোয়ার এই যুগের কুকুর বেড়াল গোরু হরিণে পরিণত হইয়াছে। পুরাতন কংকাল হইতে যত জানোয়ার-বংশের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে ঘোড়ার ইতিহাস আমরা যেমন জানি এমন আর কাহারও নহে। আমেরিকার 'রকি' পাহাড়ে অনেক জানোয়ারের কংকালচিহ্ন পাওয়া যায়। কয়েকজন পণ্ডিত চৌদ্দ বৎসর ক্রমাগত সন্ধান করিয়া সেখানে নানা প্রাচীন যুগের প্রায় আটশত ঘোড়ার কংকাল বাহির করিয়াছেন। 'ঘোড়া' বলিলাম বটে কিন্তু তাহার অনেক-গুলিকেই সহজে ঘোড়া বলিয়া চিনিবার জো নাই।

সবচাইতে পুরাতন যেটি, তাহার নাম 'ইয়োহিপপাস' (Eohippus) বা 'আদি অশ্ব'। দেখিতে একটি ছোটো ছাগলছানার চাইতে বড়ো হইবে না--পায়ে তার চারটি করিয়া আঙুল বা খুর—আর একটা পঞ্চম আঙুলের চিহ্নপ্রায় লোপ পাইয়া আসিয়াছে। দেখিলে কে বলিবে যে এই জন্তুই ঘোড়ার পূর্বপুরুষ? কিন্তু সবগুলি কংকাল মিলাইয়া যুগ হিসাবে পর পর সাজাইয়া দেখ, ঘোড়ার জন্মের ইতিহাস যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। ছাগল-ছানার মতো ছোটো জন্তুটি কেমন করিয়া যুগের পর যুগ ক্রমে বড়ো হইল, কেমন করিয়া ক্রমে তাহার চেহারা অল্পে অল্পে বদলাইয়া আসিল, কেমন করিয়া নিত্য নূতন অবস্থার মধ্যে তাহার শরীরের নিত্য নূতন পরিবর্তন ঘটিতে ঘটিতে সেই যুগের 'আদি অশ্ব' এই যুগের আধুনিক ঘোড়ায় পরিণত হইল, তাহার জীবন্ত চিত্র পাথরের গায়ে কংকালের লেখায় লিখিত রহিয়াছে।

বড়ো হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পায়ের গড়ন মজবুত হইয়া আসিয়াছে—তাহার সমস্ত শরীরটা দ্রুত দৌড়িবার উপযোগী হইয়াছে। যে দৌড়াদৌড়ি করে, যাহাকে পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার পক্ষে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। সুতরাং দেহের শক্তি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিমাণ খাদ্য চিবাইবার উপযোগী দাঁত তাহার থাকা চাই। তাহার চোয়ালের হাড়ও ক্রমে সেইরূপ মজবুত হওয়া দরকার। এই-সকল কংকালের দাঁত ও মাথার হাড় পরীক্ষা করিলেও ঠিক এই কথারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিন্তু সকলের চাইতে চমৎকার তাহার খুরের ইতিহাস। আদিকালের সেই পাঁচটি আঙুল কেমন করিয়া এই যুগে একটা ভোঁতা খুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার ইতিহাস অতি সুন্দরভাবে ও স্পষ্টভাবে এই-সকল কংকালের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। 'আদি অশ্বের' সময়েই পাঁচ আঙুলের একটি প্রায় লোপ পাইয়া আসিয়াছিল; তার পর ক্রমে আর-একটি আঙুলও লোপ পাইল—বাকি রহিল মাত্র তিনটি। সংখ্যায় কমিল বটে, কিন্তু মাঝের আঙুলটি ক্রমে মোটা হইয়া লুপ্ত আঙুলগুলির অভাব দূর করিয়াছে। পাশের আঙুল দুটা ক্রমেই ছোটো হইয়া অনেকদিন পর্যন্ত হাড়ের টুকরার মতো পায়ের দু পাশে লাগিয়া ছিল। তার পর এখনকার ঘোড়ার পায়ে ঐ একটা আঙুলই সবটুকু স্থান দখল করিয়াছে - তাহাকে আর এখন আঙুল বলা চলে না।

কোন সময় হইতে মানুষ ঘোড়াকে বশ মানিতে শিখাইয়াছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না। অতি প্রাচীন যুগের আদিম মানুষ যাহারা বনে-জঙ্গলে গুহা-গহ্বরে বাস করিত, তাহাদের শেষ চিহ্নের আশেপাশে লোমশগণ্ডার, অতিকায় হস্তী, খড়্গদন্ত ব্যাঘ্র ও গুহা ভল্লুক প্রভৃতি জানোয়ারের কংকালচিহ্ন আজও পাওয়া যায়। ঘোড়ার ঐ তিন আঙুলওয়ালা পূর্বপুরুষদের কেহ যে মানুষের কাজে লাগে নাই, তাহাই-বা কে বলিতে পারে?

সন্দেশ—বৈশাখ, ১৩২৪

প্রাচীন কালের শিকার

মানুষকে যদি কেবল জন্তু হিসাবে শরীরের গঠন দেখিয়ে বিচার করা যায়, তবে তাহাকে নিতান্তই আনাড়ি জানোয়ার বলিতে হয়। সে না পারে ঘোড়ার মতো দৌড়াইতে, না জানে ক্যাঙারুর মতো লাফাইতে; দেহের শক্তি বলো অথবা নখ দাঁত প্রভৃতি যে-কোনো অস্ত্রের কথা বলো, সব বিষয়েই সে অন্যান্য অনেক জানোয়ারের কাছে হার মানিতে বাধ্য। অথচ এই মানুষই এখন আর-সব জানোয়ারের উপর টেক্কা দিয়া এই পৃথিবীতে রাজত্ব করিতেছে। এখনকার যুগের মানুষ তো আত্মরক্ষার জন্য সহস্ররকম উপায় করিয়া রাখিয়াছে—শহর বাড়ি লোকালয় বানাইয়া সে বনের জন্তুর কাছ হইতে আশ্রয় পাইবার নানাপ্রকার ব্যবস্থাও করিয়াছে। কিন্তু সেই আদিমকালের মানুষ, যার ঘরও ছিল না বাড়িও ছিল না—সে বন্দুক চালাইতে শিখে নাই, এমন-কি, তলোয়ার বল্লম পর্যন্ত বানাইতে পারিত না—সে কেমন করিয়া এতরকম হিংস্র জন্তুর সঙ্গে রেষারেষি করিয়া টিঁকিয়া রহিল, ভাবিতে আশ্চর্য লাগে।

সে যুগের মানুষ পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত। কেহ গুহা-গহ্বরে, কেহ গাছের ডালে বাসা লইয়া বনের পশুর হাত হইতে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিত। চলিতে ফিরিতে কত-রকম হিংস্র জন্তু আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইত—তাহাদের কোনো-কোনোটা এ যুগের জানোয়ার-গুলির চাইতেও ভয়ানক। যেখানেই সেই প্রাচীন মানুষের কংকাল পাও—তাহারই আশে-পাশে সেই-সব পাথরের স্তরের মধ্যেই দেখিবে আরো কতরকম জানোয়ারের কংকালচিহ্ন

এমন অবস্থায় সেকালের মানুষ যে আত্মরক্ষার জন্য দল বাঁধিতে আরম্ভ করিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক।

সেকাল কথাটা খুবই অস্পষ্ট। প্রবীণ লোকেরা নিজেদের বাল্যকালের কথা বলিবার সময় বলেন 'সেকালে' এইরূপ হইত। কোনো প্রাচীন যুগের উল্লেখ করিবার সময় ইতিহাসে বলে—'সেকালে' এইরূপ হইত। কিন্তু যাঁহারা পৃথিবীর লপ্ত ইতিহাস লইয়া চর্চা করেন, তাঁহাদের কাছে এ-সমস্ত নিতান্তই 'একাল'। ইতিহাস যাহার কথা লেখে না—যে সময়ে ইতিহাস তো দূরের কথা, লিখিত ভাষারই সৃষ্টি হয় নাই, সেই কালই যথার্থ 'সেকাল'। কত লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া সেকালের মানুষ ক্রমাগত সংগ্রাম করিয়াছে, কে তাহার হিসাব রাখে? কবে কেমন করিয়া সে অস্ত্র গড়িতে শিখিল, কত ঝগড়া কত লড়াইয়ের মধ্যে কেমন করিয়া অল্পে অল্পে তাহার বুদ্ধি খুলিতে লাগিল, তাহার একটু-আধটু সাক্ষ্য যাহা পাওয়া যায়, তাহারই পরিচয় সংগ্রহ করিতে আজও কত পণ্ডিতের সারাটা জীবন কাটিয়া যায়।

কত যুগের কত দেশের কতরকম মানুষ। তাহারা পৃথিবীর কতদিকে চলাফিরা করিয়াছে, আর নদীর গর্ভে পাহাড়ের স্তরে তাহাদের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের গুহার মধ্যে বাস করিয়া যে-মানুষ কাঁচা মাংস খাইত; ভ্রূকুটি-কপাল চ্যাটাল-চোয়াল যে-মানুষ দল বাঁধিয়া নরমাংস ভোজন করিত; গাছের ডালে বাসা বাঁধিয়া যে-মানুষ আপন পরিবার লইয়া লুকাইয়া থাকিত; চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া তাহার মধ্যে যে-মানুষ দলেবলে রাত কাটাইত; পাথরে পাথর শানাইয়া যে-মানুষ অস্ত্রশস্ত্রে পোশাকে-পরিচ্ছদে সভ্য হইয়া উঠিতেছিল; বড়ো-বড়ো পাথরের স্তূপচক্র গড়িয়া যে-মানুষ না জানি কোন দেবতার পূজা করিত; তাহাদের কেহই এখন বাঁচিয়া নাই—কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু সংবাদ এই যুগের পণ্ডিতেরা তিল তিল করিয়া সংগ্রহ করিতেছেন।

একবার ভাবিয়া দেখ সেই গুহাবাসীদের কথা; যাহাদের ঘরের পাশে সেকালের প্রকাণ্ড ভালুকগুলি অহরহই ঘুরিয়া বেড়াইত—প্রতিদিন চলিতে ফিরিতে যাহারা নানা জানোয়ারের প্রচণ্ড তাড়ায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিত, অস্ত্র বলিতে পাথর ছাড়া যাহাদের আর কিছুই ছিল না, তাহারা যে নিতান্ত শখ করিয়া শিকার করিত না, তাহা সহজেই বুঝিতে পার। হয় শত্রুকে মারা না হয় শত্রুর হাতে মরা, ইহা ছাড়া তাহার কাছে আর তৃতীয় কোনো পথ ছিল না। 'ম্যামথ্' বা অতিকায় হস্তীর মতো অত বড়ো একটা জানোয়ারকে কাবু করা অথবা গুহা-ভল্লুক প্রভৃতি সাংঘাতিক জন্তুগুলির সহিত লড়াই করা একলা মানুষের সাধ্য নয়—সুতরাং শিকার কাজটা তাহাদের দল বাঁধিয়াই করিতে হইত। এই শিকার ব্যাপারের মধ্যে মানুষের প্রধান সম্বল যেটি ছিল, সেটি অস্ত্রও নয় শস্ত্রও নয়—সেটি তার বুদ্ধি। দশজনে মিলিয়া আগে হইতে পরামর্শ করিয়া শত্রুকে বেকায়দায় মারিবার চেষ্টাতেই মানুষের বুদ্ধিটা খুলিত ভালো।

প্রথমত যেমন-তেমন একটা পাথর পাইলেই সে মনে করিত ভারি একটা অস্ত্র পাইলাম। ক্রমে পাথর ছুঁড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সে হয়তো এটা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, হাতের কাছে ছোটো পাথর না থাকিলে বড়ো পাথর ভাঙিয়া তাহাকে ছুঁড়িবার উপযোগী করিয়া লওয়া যায়। তার পর যখন হইতে সে বিবেচনাপূর্বক পাথর ভাঙিতে অভ্যাস করিল তখন হইতেই ক্রমে অস্ত্র

গড়িবার নানারকম কায়দা দেখা দিল—ঠ্যাঙাইবার অস্ত্র, গুঁতাইবার অস্ত্র, ছুঁড়িয়া বিঁধাইবার অস্ত্র, কোপাইয়া কাটিবার অস্ত্র, ভারী ভারী ভোঁতা অস্ত্র, পাথরে-খোদাই ধারালো অস্ত্র। যেদিন মানুষ আগুনকে কাজে লাগাইতে শিখিল, আর যেদিন সে নানারকম ধাতুর ব্যবহার শিখিল সেইদিন মানুষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় দিন। সেইদিন হইতে মানুষ যথার্থরূপে বুঝিতে পারিয়াছে যে, জগতে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ নাই।

সন্দেশ--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪

বিদ্যুৎ মৎস্য

এক-একরকম জানোয়ারের এক-একরকম অস্ত্র। কেউ শিং দিয়ে গুঁতায়, কেউ নখ দিয়ে আঁচড়ায়, কেউ দেয় দাঁতের কামড়, কেউ মারে হুলের খোঁচা। ক্যাঙারুর ল্যাজের ঝাপ্‌টা, ঈগলের ধারালো ঠোঁট, অস্ত্র হিসাবে এগুলিও বড়ো কম নয়। কিন্তু তার চাইতেও আশ্চর্য অস্ত্র আছে একরকম বান মাছের গায়ে। তোমরা কেউ 'ব্যাটারির' 'শক্' খেয়েছ কি? কিম্বা খোলা বিদ্যুতের তারে ভুলে হাত দিয়েছ কি? এই মাছকে ধরতে গেলে গায়ের মধ্যে ঠিক তেমনি ধাক্কা লাগে।

এই অদ্ভুত মাছকে ইংরাজিতে বলে Electric Eel অর্থাৎ 'বৈদ্যুতিক ঈল'। বান মাছের মতো চেহারা, সাপের মতো লম্বা, মুখে ধারাল দাঁত—এক-একটি ঈল পাঁচ-ছয় হাত পর্যন্ত বড়ো হয়। এই জাতীয় মাছ পৃথিবীর নানা স্থানে পাওয়া যায়, কিন্তু যেগুলিতে বিদ্যুতের তেজ দেখা যায় সেগুলি থাকে কেবল আমেরিকার বড়ো-বড়ো নদীর ধারে-কাছে। এক-একটা ঈলের এমন আশ্চর্য তেজ, তারা বিদ্যুৎ চালিয়ে অন্য মাছদের তো মেরে ফেলেই, এমন-কি, বড়ো-বড়ো জানোয়ারগুলোকেও এক-এক সময় তারা অস্থির করে তোলে। গোরু, ঘোড়া পর্যন্ত কত সময়ে জল খেতে নেমে ঈলের পাল্লায় পড়ে যন্ত্রণায় লাফালাফি করতে থাকে। সেদেশের লোকেরা রীতিমতো বর্শা বল্লম নিয়ে এই মাছ শিকার করে, কারণ, কোনোরকমে তার গায়ে গা ঠেকলেই বড়ো-বড়ো জোয়ান মানুষকেও বাপ্ রে মা রে করে চেঁচাতে হয়। একবার কতগুলো ঘোড়া একটা বিলের মধ্যে জল খেতে গিয়েছিল। সেখানে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটা বড়ো-বড়ো ঈল এক জায়গায় জড়ো হয়েছিল। ঘোড়াগুলো তার মাঝখানে পড়েই চীৎকার করে লাথি ছুঁড়ে ডাঙায় পালিয়ে আসল। কিন্তু একটা ঘোড়া তার মধ্যে একটু বেশি কাহিল হয়েছিল, সেটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত জলের ধারে আধমরা অবস্থায় পড়েছিল। ঈলগুলোও অবশ্য লাথির চোটে সেখানে বেশিক্ষণ টিকতে পারে নি।

এই সাংঘাতিক অস্ত্র এরা কেমন করে ব্যবহার করে, আর কেমন করে তাদের শরীরের মধ্যে এতখানি বিদ্যুৎ সঞ্চিত হয়, তা এখনো পণ্ডিতেরা খুব স্পষ্ট করে বলতে পারেন নি। মাছটাকে ধরে চিরলে পরে দেখা যায়, তার শিরদাঁড়ার দুই পাশে পিঠ থেকে ল্যাজ পর্যন্ত ছোটো-ছোটো কোষ, তার মধ্যে একরকম আঠালো রস; এইটিই তার বৈদ্যুতিক অস্ত্র। অস্ত্রের ব্যবহার করতে হলে সে কেবল তার শরীরটাকে বাঁকিয়ে ল্যাজ আর মাথা শত্রুর গায়ে ঠেকিয়ে দেয়।

কয়েকবার ক্রমাগত অস্ত্রের ব্যবহার করলে মাছটা আপনা থেকেই কেমন নির্জীব হয়ে পড়ে—তখন আর তার বিদ্যুতের তেজ থাকে না। কিন্তু খানিকক্ষণ বিশ্রাম করলে আবার তার তেজ ফিরে আসে। সব সময়ে যে ইচ্ছা করে সে খামকা অস্ত্র ব্যবহার করে, তা নয়; কোনোরকমে ভয় পেলে বা চমকালেও তার গায়ে বিদ্যুৎ খেলে।

এরকম বৈদ্যুতিক শক্তি আরো কোনো কোনো মাছের ও অন্য জলজন্তুর মধ্যেও দেখা যায়। আফ্রিকায় মাগুর জাতীয় একরকম মাছ আছে, তারও তেজ বড়ো কম নয়।—

তার সমস্ত শরীরটাই যেন বিদ্যুতের কোষে ঢাকা। একটা চৌবাচ্চায় অন্যান্য মাছের সঙ্গে একে রাখলে তবে এর মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায়। দুদিন না যেতেই দেখবে যে আর সব মাছকে মেরে সে সাবাড় করেছে। আফ্রিকার আরবেরা এর নাম বলে 'রাদ্' অর্থাৎ বজ্র মাছ।

সন্দেশ—আষাঢ়, ১৩২৪

তিমির খেয়াল

রুশিয়ার দুরন্ত শীতে মানুষ যখন নির্জন পথে চলাফিরা করে তখন অনেক সময় নেকড়ে বাঘের পাল তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। তাহারা যে বন্ধুভাবে চলে না, তা অবশ্য বুঝিতেই পার। তাহাদের দূরে রাখিবার জন্য মানুষে অস্ত্রশস্ত্র বন্দুক লইয়া পথে বাহির হয় এবং পারতপক্ষে একলা কেহ সে-সকল পথে যাওয়া আসা করিতে চায় না।

সমুদ্রের পথে যখন বড়ো-বড়ো জাহাজ চলাফিরা করে তখনো অনেক সময় দেখা যায়, তাহাদের আশেপাশে নানা জাতীয় মাছ ও হাঙর ঘুরিয়া বেড়ায়। জাহাজ হইতে কত জিনিস কত সময়ে জলে ফেলা হয়, তাহার মধ্যে তরকারির খোসা মাংসের বা হাড়ের টুকরা, নষ্ট খাবার প্রভৃতি কিছু জলে পড়িবামাত্র তাহারা কাড়াকাড়ি করিয়া সব খাইয়া ফেলে। ঐ খাবারের লোভেই তাহারা জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে চলে।

কেবল মাছ কেন, কত পাখিকেও অনেক সময় দেখা যায় মাঝসমুদ্রে জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে শত শত মাইল উড়িয়া চলিতেছে। তাহাদের অনেকে আসে কেবল কৌতূহল মিটাই-বার জন্য, অনেকে আসে খাইবার লোভে অথবা বিশ্রামের আশায়। কিন্তু খামকা বিনা কারণে কেহ জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে চলে না।

কিন্তু নিউজিল্যাণ্ডের উপকূলের কাছে এক জায়গায় ছোটোখাটো—অর্থাৎ মোটে বারো হাত লম্বা একটি তিমি আছে, তাহার বাড়ির কাছ দিয়া যত জাহাজ চলাফিরা করে সকলের সঙ্গেই সে আত্মীয়তা করিতে আসে। এইরকম সে কত বছর করিয়া আসিতেছে, কেন করে তাহা কেহ জানে না। জাহাজ হইতে যে-সকল খাবার জিনিস জলে ফেলা হয় তাহার কোনোটাই তাহার খাদ্য নয়—জাহাজের লোকেদের দ্বারা তাহার কোনোরকম উপকার হওয়াও সম্ভব নয়—অথচ সে প্রত্যেক জাহাজের সঙ্গে একবার খানিক দেখা না করিয়া ছাড়ে না। শুধু দেখা নয়, আধ ঘণ্টাখানেক অনায়াসে জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে সে এমনভাবে চলে যেন

সে জাহাজকে পথ দেখাইয়া লইতে চায়। মাঝে মাঝে জাহাজের গায়ে গা ঘষিয়া আর ঢেউয়ের ফেনায় ডিগবাজি খাইয়া সে নানারকমে মনের আহ্লাদ প্রকাশ করে।

সেখানকার নাবিকেরা সকলেই এই অদ্ভুত তিমির কথা জানে। তাহারা আদর করিয়া তাহার নাম দিয়াছে 'পেলোরাস্ জ্যাক্'—'পেলোরাস্' ঐ জায়গাটার নাম। এই তিমির সম্বন্ধে সেদেশে অনেকরকম অদ্ভুত গল্প শোনা যায়। একবার নাকি কোন জাহাজ হইতে কে একজন লোক 'জ্যাক্'কে গুলি করিয়াছিল—তার পর অনেকদিন তাহাকে দেখা যায় নাই। আবার সে ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু সেই জাহাজটার কাছে আর কখনো আসে নাই। নিউজিল্যাণ্ড মাওরিদের দেশ—তাহারা এই তিমিকে দেবতার মতো ভক্তি করে। এমন-কি, সেদেশের গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত ইস্তাহার দিয়া সকলকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, কেহ যেন 'জ্যাকে'র কোনোরকম অনিষ্ট না করে।

সন্দেশ—শ্রাবণ, ১৩২৪

গোখুরো শিকার

এক সাহেবের আস্তাবলে ইঁদুরে বাসা বেঁধেছিল। তারা আস্তাবলের মেজের নীচে গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে একেবারে ঝাঁঝরার মতো করে ফেলেছিল। ইঁদুরের উৎপাতে সবাই ব্যতিব্যস্ত, কতদিন কল পেতে কত ইঁদুর ধরা পড়ল, তবু ইঁদুর আর ফুরায় না। তখন সাহেব ভাবলেন ইঁদুর মারবার বিষবড়ি না বানালে আর চলছে না। কিন্তু তার পরেই হঠাৎ একদিন দেখা গেল, আস্তাবলের সব ইঁদুর কোথায় পালিয়েছে। সবাই বলল, "ব্যাপারখানা কি?" দুদিন না যেতেই বোঝা গেল, ব্যাপার বড়ো গুরুতর—ইঁদুরের গর্তে প্রকাণ্ড দুই গোখুরো সাপ এসে আশ্রয় নিয়েছে। আস্তাবলে মহা হুলুস্থুল পড়ে গেল, সহিস কোচম্যান সব চলতে-ফিরতে সাবধানে থাকে, রাত্রে গাড়ি জুততে হলে লোকজন, লাঠি, মশাল নানারকম হাঙ্গামার দরকার হয়, তা নইলে কেউ ঘরে ঢুকতেই চায় না। সাহেব দেখলেন মহা মুশকিল, এর চাইতে ইঁদুরই ছিল ভালো।

সাহেবের যে চাপরাসী, সে লোকটি ভারি সেয়ানা—সে বললে, "হুজুর, আমি সাপ তাড়াবার ফন্দি জানি। আমায় চার-আনা পয়সা দিন, আমি এখুনি তার সরঞ্জাম কিনে আনছি।" পরের দিন চাপরাসী সেই চার-আনার সরঞ্জাম নিয়ে হাজির—একটা বঁড়শি আর ছিপ আর একটা ঠোঙার মধ্যে জ্যান্ত ব্যাঙ। দেখে সবাই হাসতে লাগল আর চাপরাসীকে ঠাট্টা করতে লাগল। সাহেব বললেন, "বেয়াকুফ! তোকে সাপ মারতে বললাম, আর তুই মাছ ধরবার সরঞ্জাম এনে হাজির করলি!" চাপরাসী সে-সব কথায় কান না দিয়ে ব্যাঙটাকে বঁড়শিতে গেঁথে আস্তাবলের দিকে চলল; তামাশা দেখবার জন্য সবাই তার পিছন পিছন চলল। তার পর সেই ছিপে-গাঁথা ব্যাঙটাকে গর্তের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে চাপরাসী শক্ত করে ছিপের গোড়ায় ধরে বসে রইল। খানিক পরে ছিপে টান পড়তেই অমনি সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। আর চাপরাসী সেই আধ-গেলা ব্যাঙসুদ্ধ একটা প্রকাণ্ড সাপকে গর্তের মধ্যে থেকে

ছিড়্‌ছিড়্‌ করে টেনে বার করল। সাপেরা যখন খায় তখন ক্রমাগত গিলতেই থাকে, যা একবার গলায় ঢোকে তাকে আর ঠেলে বার করতে পারে না। কাজেই ছিপের আগায় বঁড়শি, বঁড়শিতে গাঁথা ব্যাঙ আর ব্যাঙের সঙ্গে সাপ; এমনি করে গোখুরোমশাই চার-আনার সরঞ্জামে ধরা পড়লেন। তার পর লাঠিপেটা করে তাকে সাবাড় করতে কতক্ষণ?

একটা সাপ মারা পড়তেই আরেকটাকে ধরবার জন্য সকলের ভারি উৎসাহ দেখা গেল। কিন্তু একদিন দুদিন করে এক সপ্তাহ গেল, তবু সাপ আর ধরা দেয় না। সবাই হয়রান হয়ে পড়ল। সাহেব যখন হতাশ হয়ে পড়েছেন, এমন সময় একটা চাকর দৌড়ে এসে খবর দিল সাপ ধরা পড়েছে। সাহেব ছুটে দেখতে গেলেন, গিয়ে দেখেন সাপ তখনো গর্ত থেকে বেরোয় নি। চাপরাসী ছিপ নিয়ে টানাটানি করছে। তার পর টানতে টানতে ক্রমে সাপের খানিকটা গর্তের বাইরে এসেছে, এমন সময় চাপরাসীর টানে ব্যাঙটা তার গলা থেকে পিছলিয়ে বেরিয়ে এল। আর সাপটাও ফোঁস্‌ ফোঁস করতে করতে ছুটে আস্তাবলের বাইরে চলল। তখন সবাই তার পিছনে ছুটে লাঠি দিয়ে তাকে আচ্ছা করে পিটিয়ে শেষ করল। কিন্তু কি আশ্চর্য লাঠিপেটা করতেই তার পেটের মধ্যে থেকে কতগুলো ব্যাঙ বেরিয়ে পড়ল। তার মধ্যে দু-একটা তখনো বেঁচে ছিল—একটা তো একটু বাদেই লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল। সাহেব তো এ কাণ্ড দেখে একেবারে অবাক। সাপের পেটে গিয়েও যে কোনো জন্তু বেঁচে থাকতে পারে, এটা তাঁর জানাই ছিল না। কিন্তু সাহেবের জানা না থাকলেও এটা কিছু নতুন খবর নয়। আমেরিকার 'শিংওয়ালা' সাপের সম্বন্ধেও এইরকম গল্প শোনা যায়। সেই সাপগুলো এমন পেটুকের মতো খায় যে খাবার পরে আর তাদের নড়বার শক্তি থাকে না, তখন তারা যেখানে সেখানে মড়ার মতো পড়ে থাকে। সেখানকার প্রাচীন 'রেড ইণ্ডিয়ান' জাতির লোক এই সময়ে তাকে দেখতে পেলে তার মাথায় ডাণ্ডা-পেটা করতে থাকে। তার ফলে অনেক সময়েই তার পেট থেকে আস্ত-গেলা জন্তুগুলো সব বেরিয়ে আসে। তার মধ্যে প্রায়ই দু-একটাকে জ্যান্ত পাওয়া যায়।

যাহোক, সাহেব তো সাপ মারলেন। কিন্তু তখন আবার দেখা গেল যে, আস্তাবলের মেজের নীচে সাপের ছোটো-ছোটো বাচ্চায় একেবারে ভরতি হয়ে গেছে। এখন উপায় কি? দুটো সাপ মারতেই এত হাঙ্গাম, তবে এতগুলো যখন বড়ো হবে তখন কি হবে। আবার চাপরাসীর ডাক পড়ল। চাপরাসী বলল, "হুজুর, আমি এরও উপায় জানি।" এবারের উপায়টি আরো আশ্চর্য। এবার প্রকাণ্ড বড়ো-বড়ো কোলা ব্যাঙ এনে আস্তাবলে ছেড়ে দেওয়া হল। তারা মহা ফুর্তি করে পেট ভরে খেয়ে খেয়ে সাপের বংশ সাবাড় করে দিল। সাপকে দিয়ে ব্যাঙ খাইয়ে, তার পর ব্যাঙকে দিয়ে সাপ গেলানো। চমৎকার শিকার না?

সন্দেশ—আশ্বিন, ১৩২৪

পাখির বাসা

মানুষ যেমন নানারকম জিনিস দিয়ে নানা কায়দায় নিজেদের বাড়ি বানায়—কেউ ইঁট, কেউ পাথর, কেউ বাঁশ-কাদা, কেউ মাটি ; কারও এক-চালা, কারও দো-চালা—পাখিরাও সেরকম নানা জিনিস দিয়ে নানান কায়দায় নিজেদের বাসা বানায়। কেউ বানায় কাদা দিয়ে, কেউ বানায় ডাল-পালা দিয়ে, কেউ বানায় পালক দিয়ে, কেউ বানায় ঘাস দিয়ে ; তার গড়নই-বা কতরকমের—কারও বাসা কেবল একটি ঝুড়ির মতো, কারও বাসা গোল, কারও বাসা লম্বা চোঙার মতো। এক-একটা পাখির বাসা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়, তাতে বুদ্ধিই-বা কত খরচ করেছে, আর মেহনতই-বা করেছে কত। বাবুই পাখির বাসা তোমরা অনেকেই দেখেছ বোধ হয়। কেমন সন্দর করে শুকনো ঘাস দিয়ে বুনে তার বাসাটি সে তৈরি করে। পাছে কোনো জন্তু বা সাপ বাসা আক্রমণ করে, সেইজন্য বাসায় ঢুকবার রাস্তা তলার দিকে। শত্রুকে জব্দ করবার আর-একটা উপায় তারা করেছে—অনেক সময় বাসার গায়ে আর-একটা গর্তের মতো মুখ তৈরি করে রাখে, সেটা কেবল ঠকাবারই জন্যে, তার ভিতর দিয়ে বাসার মধ্যে ঢোকা যায় না।

টুনটুনি পাখি তার বাসা তৈরি করার আগে দুটি কি তিনটি পাতা সেলাই করে একটি বাটির মতো তৈরি করে ; তার মধ্যে নরম ঘাস পাতা দিয়ে সে তার বাসাটি বানায়। সেলাইয়ের সুতো সাধারণত রেশমেরই ব্যবহারই করে ; কাছে রেশম না থাকলে যে সুতো পায় তাই দিয়ে করে। সেলাইয়ের ছুঁচ হল তার সরু ঠোঁট-জোড়া। বাসাটা অনেকটা দোলনার মতো ঝুলতে থাকে। খুব ছোটো জাতের পাখিরা হিংস্র জন্তু আর সাপ গিরগিটির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে প্রায়ই ঐরকম দোলনার মতো বাসা তৈরি করে থাকে। অনেক জাতের পাখি আবার মাটিতেই বাসা করে ; গাছে বাসা তারা পছন্দই করে না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বাসা তৈরিই করে না। নিজেরা গাছের আড়ালে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে আর মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে ডিম পাড়ে। মোরগ, তিতির, পেরু এরা সবই এই জাতের। আবার কোনো কোনো পাখি সুন্দর করে লতা পাতা দিয়ে কুঞ্জ-বনের মতো বানায়। অস্ট্রেলিয়া দেশের 'কুঞ্জ-পাখি' (Bower bird) তার বাসার সামনে খুব সন্দর লতা-কুঞ্জ তৈরি করে। পাখিটি আকারে ছোটো বটে, কিন্তু কুঞ্জটি কিছু ছোটো হয় না। এদের আবার রঙচঙে জিনিসের বড়ো শখ ; ভাঙা কাঁচ, পাথর, রঙিন জিনিস, যা সামনে পাবে সব এনে বাসার চারিদিকে সাজিয়ে রাখবে।

কোনো কোনো পাখি থুতু দিয়ে বাসা তৈরি করে। তালচোঁচ পাখি এই জাতের। পালক, ঘাস এ-সব জিনিস থুতু দিয়ে জোড়া লাগিয়ে তার বাসা তৈরি হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জে এক জাতের তালচোঁচ আছে, তারা কেবলই থুতু দিয়ে নিজেদের বাসা বানায়। চীন দেশে এ বাসার খুব আদর ; তারা এর ঝোল বানিয়ে খায়। এইজন্য সেদেশে এর দামও খুব বেশি।

অনেক জাতের পাখি কাদা দিয়েও তাদের বাসা বানায়। আফ্রিকার ফ্লামিঙ্গোর বাসা কাদার তৈরি। একটা ঢিপির মতো কাদা সাজিয়ে তার মাঝে একটা গর্ত করে ফ্লামিঙ্গো ডিম পাড়ে। আরো অনেক জাতের পাখিও কাদার বাসা বানায়, তাদের অধিকাংশই আফ্রিকার।

তোমরা অনেকেই বোধ হয় কাঠ-ঠোকরা দেখেছ। এরা ঠোঁট দিয়ে ঠোকর মেরে গাছের গায়ে গর্ত করে তার ভিতরে বাসা বানায়। দুষ্টু ছেলেরা ছানা চুরি করার লোভে কাঠ-ঠোকরার বাসার গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে অনেক সময় সাপের কামড় খায়, কারণ সাপেরা কাঠ-ঠোকরার বাসা ডাকাতি করে অধিকার করতে বড়ো পটু।

সন্দেশ—কার্তিক, ১৩২৪

কুমিরের জাতভাই

টিকটিকি, গিরগিটি, বহুরূপী, তক্ষক, গোসাপ এঁরা সকলে হলেন কুমিরের জ্ঞাতিবর্গ। পৃথিবীর যে কোনো দেশে যাও, এঁদের কোনো-না-কোনোটির সাক্ষাৎ পাবেই। কিন্তু সাক্ষাৎ পেলেই যে সবসময়ে তাদের চিনতে পারবে, তা মনে কোরো না। অস্ট্রেলিয়ার সেই কাঁটা-ওয়ালা ভীষণমূর্তি জানোয়ার যে নিতান্ত নিরীহ গিরগিটি মাত্র, এ কথা আগে থেকে না জানলে কি কেউ বুঝতে পারবে? কেবল চেহারা দেখে যদি এর সম্বন্ধে কোনো মতামত দিতে হয়, তা হলে অনেকেই হয়তো বেচারির উপর অবিচার করবে। সমস্ত শরীরটি এর অস্ত্রে আর বর্মে ঢাকা, কিন্তু মেজাজটি যারপরনাই ঠাণ্ডা। দুপুরের রোদে শুকনো বালির উপর এরা পড়ে থাকে, ভয় পেলে তাড়াতাড়ি বালির মধ্যে ঢুকে যায়। অন্য জন্তুর অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, সামান্য একটা পাখি দেখলেই এরা পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়। এদের প্রধান খাদ্য পিঁপড়ে। সবচাইতে আশ্চর্য এই যে এক বাটি জলের মধ্যে যদি এই গিরগিটি ছেড়ে দাও, তবে দেখতে দেখতে এর গায়ের চামড়া সমস্ত জলে শুষে নেবে। শুকনো বালিতে থাকে কিনা, সবসময়ে তো স্নানের সুবিধা হয় না, তাই একবার স্নান করলেই সে অনেকদিনের মতো জল বোঝাই করে নেয়।

এক সবুজ রঙের জন্তু রয়েছে—মাদাগাস্কারের টিকটিকি। এর বিশেষত্বের মধ্যে পায়ের আঙুলগুলি আর গায়ে রঙের বাহার তা ছাড়া রয়েছে বহুরূপী। বহুরূপীর গুণের কথা তোমরা সকলেই জান: তার সমস্ত গায়ের রঙ সে চট্‌পট্ বদলাতে পারে। চোখে চেয়ে দেখছ তার দিব্যি ঘাসের মতো সবুজ রঙ, হয়তো এক মিনিট বাদেই দেখবে ফ্যাকাশে। তার পর ঘুরে এসে দেখ শুকনো পাতার রঙ কিম্বা সীসার মতো ময়লা। বহুরূপীর চাল-চলন ভারি অদ্ভুত। এক পা নড়তে হলে অতি সাবধানে ধীরে ধীরে সে পা ফেলে; হয়তো একটা পা অর্ধেকখানা তুলে পাঁচমিনিট চুপ করেই রইল। দেখে মনে হয় যেন পা ফেলবে কি না ফেলবে এর জন্যে তার কত হিসাব আর ভাবনাচিন্তা করতে হচ্ছে। এক সময়ে লোকের বিশ্বাস ছিল—অন্তত বিলাতে শিক্ষিত লোকেও এ কথা বিশ্বাস করত যে বহুরূপীরা

শুধু হাওয়া খেয়ে থাকে। এরকম বিশ্বাসের কারণ এই যে, বহুরূপী একে তো খায় খুবই কম, তার উপর খাওয়া কাজটি তার চক্ষের নিমেষে এমন চট্‌পট্‌ শেষ হয়ে যায় যে, একটু ঠাওর করে না দেখলে অনেক সময় বোঝাই যায় না। যতটুকু প্রাণী, জিভটি প্রায় ততখানি লম্বা ; সেই জিভটি তীরের মতো ছিট্‌কিয়ে পোকামাকড়ের উপরে পড়ে আর পরক্ষণেই টপ্‌ করে মুখের ভিতর ফিরে যায়। এর মধ্যে যে শিকার ধরা, শিকার মারা এবং খাওয়া, এই তিন কাজ শেষ হয়ে গেছে—সেটা বুঝতে অনেক সময় দেরি লাগে।

বহুরূপীর আর-একটি অদ্ভুত জিনিস তার চোখ দুটি। বড়ো-বড়ো চোখ দুটি এমনভাবে তৈরি যে একবার চোখ পাকালেই উপর নীচ ডাইনে বাঁয়ে ডাঙা এবং আকাশের প্রায় সব-খানিই বেশ দেখে নিতে পারে। তার উপর দুইটা চোখ একেবারে আলগাভাবে গাঁথা ; একটা যখন সামনের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে আছে, আর-একটা হয়তো ততক্ষণ চারিদিক ঘুরে ঘুরে ঘরবাড়ি গাছপালা সব তদ্‌বির করছে।

আর আছে বৃদ্ধ জরদ্গবের মতো এক জন্তু—আমেরিকার গেছো-গিরগিটি। গিরগিটি বললাম বটে কিন্তু গোসাপ বললেও চলত, কারণ এর এক-একটি নাকি প্রায় সাড়ে তিন হাত পর্যন্ত লম্বা হতে দেখা গিয়েছে। গলায় গলকম্বল, পিঠে সাংঘাতিক কাঁটা, তার উপর কোনো কোনোটার গায়ে মাথায় বড়ো-বড়ো আঁচিল, তাতে চেহারাটা কেমন কিম্ভূতকিমাকার হয় তা সহজেই কল্পনা করতে পার।

খাঁটি গোসাপ-জাতীয় জন্তু আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রায় সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। 'হিংস্র' বলতে যা বোঝায় গোসাপেরা ঠিক তা নয় কিন্তু একবার গোঁ ধরলে সেও ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে। আমাদের দেশে কথায় বলে 'কচ্ছপের কামড়', সাহেবেরা বলেন 'বুলডগের কামড়'—কিন্তু গোসাপ ক্ষেপলে পরে তার কামড় ছাড়ানোও বড়ো কম শক্ত নয়। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে যে, গিরগিটিটাকে খুব বড়ো করতে পারলেই বুঝি ঠিক গোসাপ হয়ে দাঁড়াবে, কিন্তু বাস্তবিক গিরগিটি আর গোসাপের গড়নে কিছু তফাত আছে। গোসাপের ঘাড়টা অনেকটা লম্বা গোছের, আর তার জিভটা সাপের মতো চেরা, চলতে ফিরতে লক্‌লক্‌ করে। গোসাপেরা আমিষ-খোর, সাপ, টিকটিকি, ইঁদুর, ব্যাঙ, পাখি, এই-সব খেয়ে থাকে—তাদের বিশেষ প্রিয় খাদ্য নাকি কুমিরের ডিম। আমাদের দেশে গোসাপ ডাঙায়ও থাকে জলেও নামে, তাই সাঁতারের সুবিধার জন্য তাদের ল্যাজগুলি চ্যাটাল হয়। যে-সব গোসাপ কেবল শুকনো ডাঙায় বা গাছে থাকে, তাদের ল্যাজ হয় চাবুকের মতো গোল।

আরেকরকমের জন্তু রয়েছে যার গায়ে চক্র চক্র দাগ, সেটি হচ্ছে মেক্সিকোর 'বীভৎস গিলা' (gila monster) বা বিষধর গিরগিটি। ছোটো-ছোটো পা, তাতে শরীরটা মাটি থেকে আলগাই হয় না—তাকে সাপের মতো এঁকে বেঁকে মাটি ঘষে চলতে হয়। ছোট্ট দুটি চোখ, মুখভরা দাগের মধ্যে চট্‌ করে তাকে খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। দুম্বা ভেড়ার মতো ল্যাজটি চর্বিতে ভরা। যখন খাবার জোটে না, তখন ঐ ল্যাজটা শুকিয়ে আসে, ল্যাজের চর্বি সমস্ত শরীরে শুষে গিয়ে শরীরটাকে তাজা রাখে। কিন্তু আসল দেখবার জিনিসটা ওর মুখের মধ্যে। সেখানে যদি খোঁজ করো তবে দেখবে, ঠিক সাপের মতো তার বিষদাঁত রয়েছে। সে বিষে ছোটোখাটো জন্তু বা পাখি তো মরেই, মানুষ পর্যন্ত মারা গেছে বলে শোনা যায়।

একরকমের অদ্ভুত গিরগিটি আছে যে মনে হয় রাগে একেবারে ফুলে উঠেছে। তার গলায় যে রঙিন ছাতার মতো রয়েছে, সেটা অন্য সময়ে গুটিয়ে গলার চার দিকে পর্দার মতো ঝুলানো থাকে, কিন্তু ভয় বা রাগের সময় খাড়া হয়ে ছাতার মতো ছড়িয়ে পড়ে। তখন তার মুখের চেহারাটিও ভয়ানক হয়ে ওঠে। লাল ছাতার নীচে আগুনের মতো চোখ, তার উপর ঐরকম ধারালো দাঁত আর টক্‌টকে জিভ—আর সেই সঙ্গে ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করে লাফিয়ে ওঠা—এতে বাস্তবিক ভয় হবারই কথা। এই গিরগিটি দু পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে বেশ রীতিমতো ছুটতে পারে। ল্যাজসুদ্ধ এক-একটা প্রায় দু হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। এই জন্তুর বাড়ি অস্ট্রেলিয়ায়।

মালয়দেশে এবং ফিলিপাইন দ্বীপে আর-এক-রকম গিরগিটি আছে, তাকে 'উড়ুক্কু গিরগিটি' বলা যেতে পারে। এদের পাঁজরের কয়েকখানা হাড় বুকের চামড়া ফুটো করে দু পাশে বেরিয়ে থাকে, সেগুলো পাতলা পর্দার মতো চামড়া দিয়ে ঢাকা। পর্দাটাকে পাখার মতো ছড়িয়ে এরা এক গাছ থেকে আর-এক গাছ পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে উড়ে যায়। ছোটোখাটো পোকা বা ফড়িং গাছের কাছ দিয়ে গেলে এরা চট্ করে তাদের উপর উড়ে পড়ে। এ ওড়া অবশ্য পাখির মতো ওড়া নয়, কারণ এরা রীতিমতো বাতাস ঠেলে উড়তে পারে না—লাফিয়ে বাতাসে ভর করে খানিকটা ভেসে যায় মাত্র। এরা থাকে বড়ো-বড়ো গাছের আগায়, কৃচিৎ কখনো নীচে নামে। এক গাছ থেকে আর-এক গাছে যেতে হলে এরা শূন্য দিয়েই যাতায়াত করে। এপর্যন্ত প্রায় কুড়িরকমের উড়ুক্কু গিরগিটি পাওয়া গিয়াছে—তাদের সবগুলোরই রঙ অতি চমৎকার—কোনো ফুল বা প্রজাপতির রঙও তার চাইতে সুন্দর বা উজ্জ্বল হয় না। সমস্ত গায়ে যেন রামধনুর নক্‌শা করা। এরাও কিন্তু বেশ রাগতে জানে, আর রাগলে পরে এদের গলাটি ফুলে তাতে নীল লাল নানারকম রঙের খেলা দেখা যায়।

এ ছাড়াও আরো কতরকমের গিরগিটি আছে, তাদের কথা বলবার আর জায়গা নেই। দাড়িওয়ালা গিরগিটি, শিংওয়ালা গিরগিটি, সাপের মতো গিরগিটি, মাছের মতো গিরগিটি, কত যে তাদের রকমারি তার আর অন্ত নেই। একটা আছে, তার কোন দিকটা ল্যাজ আর কোন দিকটা মাথা হঠাৎ দেখলে বোঝাই যায় না। আর-একটার হাত-পাগুলো লম্বা লম্বা কাঠির মতো। ল্যাজটা গোড়ায় সরু মাঝখানে মোটা আবার আগায় ছুঁচাল—ঠিক যেন কাঁচা লঙ্কাটি। এদের অনেকে আবার রঙ বদলাতে জানে—কেউ কেউ এ বিষয়ে বহুরূপীর চাইতেও ওস্তাদ। কেউ ডিম পাড়ে, কারও-বা একেবারে ছানা হয়। আবার কেউ-বা এমন ঠুন্‌কো যে, ধরামাত্র তার হাড়গোড় ভেঙে যায়।

সন্দেশ—অগ্রহায়ণ, ১৩২৪

সমুদ্রের ঘোড়া

সমুদ্রের ঘোড়া বলতে হঠাৎ যেন সিন্ধুঘোটক মনে করে বোসো না। সিন্ধুঘোটক থাকে সমুদ্রের ধারে, কিন্তু তাকে ঘোটক বলা হয় কেন তা জানি না। তার চাল-চলন চেহারা বা

শরীরের গড়ন, কিছুই ঘোড়ার মতো নয়—ঘোড়ার সঙ্গে তার খুব দূর সম্পর্কেও কোনো সম্বন্ধ পাওয়া যায় না—অথচ তাকে বলি 'সিন্ধুঘোটক'। হিপোপটেমাসকে বাংলায় অনেক সময় 'জলহস্তী' লেখা হয়। তারও কিন্তু প্রকাণ্ড নাদুসনুদুস চেহারাটি ছাড়া হাতির সঙ্গে আর কোনোরকম মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং তাকে শুয়োরের সঙ্গে সমতুলনা করলে তার পরিচয়টা অনেকটা ঠিক হয়।

এখানে যাকে সমুদ্রের ঘোড়া বলছি, তাকে বর্মধারী মাছ বললেই তার ঠিক মতো পরিচয় দেওয়া হয়। কিন্তু তার অদ্ভুত ঘাড় বাঁকানো চেহারা আর খাড়া হয়ে চলাফেরা —এই দেখেই ইংরেজিতে তার নাম দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের ঘোড়া (Sea Horse)। চেহারার বর্ণনা হিসাবে, নামটি যে চমৎকার হয়েছে তাতে আর সন্দেহ নেই। এই জন্তুর ল্যাজের দিকটা একেবারেই মাছের মতো নয়—তার উপর গায়ের চামড়াটিও চিংড়িমাছের খোলার মতো শক্ত। ল্যাজটি থাকাতে তার ভারি সুবিধা। যখন ইচ্ছা, জলের নীচে শ্যাওলা গাছে ল্যাজটি জড়িয়ে সে বেশ আরাম করে বিশ্রাম করে। যখন জলের নীচে মাথা উঁচিয়ে ল্যাজ নাড়িয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে এরা চলে ফিরে, তখন তেজী ঘোড়ার টগ্ বগ্ করে ছুটবার ধরনটাও মনে পড়ে। আসলে এরা যে 'নল' মাছের জ্ঞাতভাই, সেটা এদের চোঙের মতো মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

নলমাছের চেহারাটা ঠিক তার নামেরই মতো। নলমাছের মুখখানা এমনভাবে তৈরি যে সে হাঁ করতে পারে না। ঐ চোঙার আগার একটু ফুটো আছে, তাই দিয়ে সে সুড়্ সুড়্ করে খাবার টেনে খায়। সমুদ্রের ঘোড়ার মুখখানিও ঠিক এই ধরনের।

এই অদ্ভুত জন্তুগুলির এক-একটা আবার ত্রিভঙ্গ ঘোড়ার মতো চেহারা করেও সন্তুষ্ট নয়। তারা নানারকম সাজ করে, রঙবেরঙের ঝালর ঝুলিয়ে কেমন কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি করে থাকে। ঝালরের সাজগুলা বাস্তবিক তার গায়ের চামড়া। ইংরাজিতে এদের বলে সমুদ্রের 'ড্র্যাগন' (Sea dragon) বা রাক্ষস। নামটি ভয়ংকর হলেও জন্তুটি ঠিক সমুদ্রের ঘোড়ার মতোই নিরীহ। তার ঐ রঙচঙে পোশাকের বাহারটা কেবল শত্রুর চোখে ধোঁকা দিবার জন্য। সমুদ্রের নীচে যে-সব অদ্ভুত রঙিন বাগান থাকে, তারই মধ্যে ফুল পাতার রঙের সঙ্গে রঙ মিশিয়ে এরা বেমালুম গা ঢাকা দিয়ে থাকে। নানারকম হিংস্র জন্তু আর মাছ সেখানে ঘোরে ফিরে। তারা এর চেহারা দেখে হঠাৎ বুঝতেই পারে না যে এটাও একটা জানোয়ার।

এদের আর-একটি বড়ো মজার অভ্যাস আছে—এরা সব সময় ছানার দল সঙ্গে নিয়ে ফেরে। ক্যাঙারুর পেটে যেমন থলি থাকে, তার মধ্যে ছোটো-ছোটো ছানাগুলা দরকার হলেই ঢুকে পড়ে—তেমনি ওদেরও কারও বুকে, কারও পেটে ছোটো-ছোটো থলির মতো থাকে। ছানারা ভয় পেলে ছুটে তার মধ্যে লুকোয়।

সন্দেশ—মাঘ, ১৩২৪

গরিলার লড়াই

যতরকম বনমানুষ আছে তার মধ্যে, বুদ্ধিতে না হোক, শরীরের বলে গরিলাই সেরা। হাত-পায়ের মাংসপেশীর বাঁধন থেকে তার দাঁড়াবার ধরন আর ভ্রূকুটিভঙ্গি পর্যন্ত সবই যেন খাঁ খাঁ করে তেড়ে বলছে, "খবরদার! কাছে এসো না!"

মানুষের মধ্যে এত বড়ো পালোয়ান কেউ নাই, যে এক মিনিটের জন্যেও একটা গরিলার রোখ সামলাতে পারে। কিন্তু গরিলায় গরিলায় যদি লড়াই লাগে, তা হলে সেটা দেখতে কেমন হয়? বড়ো-বড়ো পালোয়ান কুস্তিগীরের লড়াই দেখতে কত মানুষ পয়সা দিয়ে টিকিট কেনে, সে লড়াই যতই ভীষণ হয়, হুড়াহুড়ি ধস্তাধস্তি যতই বেশি হয়, মানুষের ততই উৎসাহ বাড়ে। কিন্তু গরিলাদের মধ্যেও কি সেরকম লড়াই বা রেষারেষি লাগে? লাগে বৈকি! এমন গরিলা পাওয়া গিয়েছে যার দাঁত ভাঙা বা কানটা ছেঁড়া, অথবা গায়ে মাথায় অন্য গরিলার দাঁতের চিহ্ন রয়েছে; লড়াইয়ের সময় কোনো মানুষ উপস্থিত থেকে তা দেখেছে, আজ পর্যন্ত এরকম শোনা যায় নি—কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম লড়াই যে হয়, নানা-রকম গর্জন আর হুংকার আর বুক চাপড়াবার গুম্ গুম্ শব্দে অনেক সময় তার পরিচয় পাওয়া যায়। গরিলা যখন ক্ষ্যাপে, তখন রাগে সে খাড়া হয়ে দাঁড়ায় আর আপনার বুকে দমাদম্ কিল মারতে থাকে। তার চোখ দুটো তখন আগুনের মতো জ্বলজ্বল করে, তার কপালের লোম ফুলে ফুলে খাড়া হয়ে উঠে আর সেই সঙ্গে নাকের ফঁস্ ফঁস্ আর দাঁতের কড়্মড়্ শব্দ চলতে থাকে। তার উপর সে যখন হুংকার ছাড়ে, তখন অতি বড়ো সাহসী জন্তুও পালাবার পথ খুঁজতে চায়। লোকে বলে, সে হুংকার নাকি সিংহের ডাকের চাইতেও ভয়ানক।

মনে করো, জঙ্গলের মধ্যে কোনো গরিলাসুন্দরীর বিয়ের জন্য দুই মহাবীর পাত্র এসেছেন। দুজনেই তাকে ভালোবাসে, দুজনেই তাকে চায়, কেউ দাবি ছাড়তে রাজি নয়। এমন অবস্থায় পশুপাখির মধ্যে সর্বত্রই যা হয়ে থাকে, আর পুরাণের বড়ো-বড়ো স্বয়ংবর সভাতেও যেমন হয়ে এসেছে, এখানেও ঠিক তাই হওয়াই স্বাভাবিক। তখন দুই বীর আপন আপন তেজ দেখিয়ে লড়াই করতে লেগে যায়। সে ভীষণ লড়াই যে একটা দেখবার মতো ব্যাপার তাতে আর সন্দেহ কি? গরিলার চড় আর গরিলার ঘুঁষি, যার একটি মারলে মানুষের ভুঁড়ি ফেঁসে যায়, মাথার খুলি দু ফাঁক হয়ে যায়, সে কেবল গরিলার গায়েই সয়। সেই চট্পট্ দুম্দুম্ কিল চড়ের সঙ্গে খাম্চা-খাম্চি আর কাম্ড়া-কাম্ড়িও নিশ্চয়ই চলে। এইরকমে যতক্ষণ না লড়াইয়ের মীমাংসা হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ একপক্ষ হার মেনে চম্পট না দেয়, ততক্ষণ হয়তো গরিলাসুন্দরীর চোখের সামনেই এক ভীষণ কাণ্ড চলতে থাকে। সে বেচারা হয়তো চুপ করে তামাশা দেখে, কিম্বা দুজনের মধ্যে কাউকে যদি তার বেশি পছন্দ হয়, তবে তার পক্ষ হয়ে লড়াইয়ে একটু-আধটু যোগ দেওয়াও তার কিছু আশ্চর্য নয়।

সন্দেশ—মাঘ, ১৩২৪

বর্মধারী জীব

কচ্ছপ কুমির আর সজারু, এই তিন বর্মধারী জন্তুকে বোধ হয় তোমরা সকলেই দেখেছ। এদের তিনজনের বর্ম তিনরকমের। কচ্ছপের খোলাটা যেন তার জ্যান্ত বাসা—তার মধ্যে মুখ হাত-পা গুটিয়ে যখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে তখন দুর্গের মতো বর্মটাকেই দেখতে পাই—বর্মধারী যিনি, তাঁকে আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। কুমিরের বর্মটা যথার্থই বর্ম, অন্য জন্তুর নখ দাঁতের অস্ত্র থেকে কেবল শরীরটাকে বাঁচানোই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু সজারুর বর্ম কেবল বর্ম নয়, সেটা একটা সাংঘাতিক অস্ত্রও বটে।

কচ্ছপ আর কুমিরের কথা তোমরা অনেক শুনেছ, কিন্তু তাদের আশ্চর্য বয়সের কথা অনেকেই জানে না। হাতির বয়সের কথা শুনতে পাই, তারা নাকি অনেক বৎসর বাঁচে। কিন্তু এই দুই জন্তু দুশো-আড়াইশো বৎসর যে বাঁচে তা:তে কোনো সন্দেহই নেই, চার-পাঁচশো বৎসর পর্যন্ত তাদের বয়স হয়—এ কথা প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরাও বিশ্বাস করে থাকেন। এক ধরনের কচ্ছপকে বলে Giant Tortoise অর্থাৎ রাক্ষুসে কচ্ছপ। এরা এক-একটি তিন হাত, সাড়ে তিন হাত পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। আগে পৃথিবীর নানা জায়গায় এরকমের কচ্ছপ পাওয়া যেত, কিন্তু পেটুক মানুষের অত্যাচারে তাদের বংশ এমনভাবে লোপ পেয়ে এসেছে যে, এখন দু-একটি সমুদ্রের দ্বীপ ছাড়া এদের আর কোথাও খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। ১৭৬৬ খৃস্টাব্দ থেকে এইরকম আর-একটি রাক্ষুসে কচ্ছপকে মরিশাস্ দ্বীপে রাখা হয়েছে। সেই সময়ে তার বয়স যে খুব কম হলেও পঞ্চাশ বৎসর ছিল, তাতে আর সন্দেহ নাই - সুতরাং এখন তার দুশো বৎসর পার হয়ে গেছে। লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় একটা থুড়থুড়ে বুড়ো কচ্ছপ কয়েক বৎসর হল মারা গিয়েছে· তার বয়স আরো অনেক বেশি হয়েছিল—কেউ কেউ বলেন চারশো বৎসরেরও বেশি। কুমিরও অনেকদিন বাঁচে--বয়স নিয়ে কচ্ছপের সঙ্গে তার রেষারেষি হলে কে হারে কে জেতে সে কথা বলা শক্ত।

কুমিরের বর্মটি কতকগুলি চামড়ার চাকতি মাত্র। চামড়ার মধ্যে মোটা-মোটা কড়া জমিয়ে বর্মটি তৈরি হয়েছে। কিন্তু কচ্ছপের খোলাটি শুধু চামড়া নয়--মেরুদণ্ডের সঙ্গে পাঁজরের হাড় আর গায়ের চামড়া একসঙ্গে জুবড়িয়ে তাকে শিঙের মতো মজবুত করে বর্মের এই অদ্ভুত সৃষ্টি হয়েছে। আর সজারুর বর্মটি তৈরি হয়েছে তার লোম দিয়ে। লোমের গুচ্ছ মোটা আর মজবুত আর ধারালো হয়ে সাংঘাতিক কাঁটার বর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সজারুরা নিশাচর জন্তু। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে তারা সারাদিন ঘুমিয়ে থাকে আর রাত্তিরে বেরিয়ে ফল-মূল গাছের পাতা খেয়ে বেড়ায়। গর্তের মধ্যে নরম ঘাস আর কচি পাতা দিয়ে তারা বাসা বানায়। সজারুর যখন ছানা হয় তখন ছানার কাঁটাগুলো থাকে ঘাসের মতো নরম, কিন্তু খুব অল্পদিনের মধ্যেই সেগুলো বেশ শক্ত হয়ে ওঠে। সজারুর ল্যাজটা যেন একটা কাঁটার তোড়া, চলবার সময় তাতে খড়্‌খড়্ করে শব্দ হতে থাকে।

কোনো কোনো সজারু খুব চট্‌পট্ গাছে চড়তে পারে, তাদের ল্যাজ প্রায়ই খুব লম্বা হয়। আবার কোনো কোনোটার কাঁটা বড়ো-বড়ো লোমে ঢাকা।

কাঁটাওয়ালা জন্তু আরো অনেক আছে, কিন্তু সজারুর মতো এমন কাঁটার বাহার আর কারও নেই। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার একিড্‌না (Echidna) জন্তুটির একটুখানি চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবে যে, এমন অদ্ভুত জানোয়ার সম্বন্ধে দু-একটা কথা না বললে নিতান্তই অন্যায় হবে। সাধারণ একিড্‌নাগুলি বেড়ালের চাইতে বড়ো হয় না ; কিন্তু 'ধাড়ি একিড্‌না' বা Proechidna আরো অনেকখানি বড়ো হয়—বেশ একটি ছোটোখাটো ভাল্লুকের মতো। অস্ট্রেলিয়ার প্লেটিপাস (Platypus) বা হংসচঞ্চুর মতো এরাও স্তন্যপায়ী অথচ ডিম পাড়ে—ডিম ফুটে যে ছানা বেরোয় তারা মায়ের দুধ খায়। এই জন্তুর শরীরটি ছোটো-ছোটো কাঁটায় ভরা—ছোটো-ছোটো কিন্তু খুব শক্ত আর ধারালো মুখখানা ওরকম অদ্ভুত ছুঁচালো হবার কারণ এই যে, এরা পিঁপড়ে-খোর। চোঙার মতো মুখ, তার মধ্যে একটিও দাঁত নাই —আছে খালি একটি প্রকাণ্ড সরু লম্বা জিভ · তাই দিয়ে সে লক্‌লক্ করে পিঁপড়ে চেটে খায়। সজারুর মতো এরাও নিশাচর—তাই দিনের বেলায় গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে থাকে।

পিঁপড়ে-খোর জন্তুদের অনেকেরই মুখ ঐ চোঙার মতো কিন্তু সকলের গায়ে বর্ম নাই। যাদের গায়ে বর্ম আছে তাদের নাম প্যাঙ্গোলিন (Pangolin)। এই জন্তুর বর্মের গড়ন ভারি অদ্ভুত ; শিঙের মতো মজবুত চাকতি, সমস্তটি গায়ের উপর মাছের আঁশের মতো সাজানো। পায়ের নখগুলি সাংঘাতিক মজবুত - তাই দিয়ে আঁচড়িয়ে তারা উইয়ের ঢিপি আর পিঁপড়ের বাসা ভেঙে ফাঁক করে ফেলে। তার পর জিভ দিয়ে টপাটপ উই পিঁপড়ে চেটে খায়। হঠাৎ তাড়া করলে বা ভয় পেলে এরা ডিগবাজি খেয়ে ফুটবলের মতো গোল পাকিয়ে যায়। এদের গায়ের ধারালো আঁশগুলি তখন চারিদিকে খাড়া হয়ে ওঠে। দক্ষিণ আমেরিকার আর্‌মাডিলো এ বিষয়ে আরো ওস্তাদ। সে যখন হাত-পা গুটিয়ে শরীরটিকে লাড়ু পাকিয়ে ফেলে তখন কোথায় মুখ কোথায় হাত-পা, কিছুই বুঝবার জো থাকে না। তার বর্মের গড়নটি মাছের আঁশের মতো নয়—চিংড়ি মাছের খোলার মতো।

বর্মধারী জীবের কথা বলতে গেলে আরো অনেক জন্তুরই নাম করতে হয়। শামুক ঝিনুক প্রবাল হতে আরম্ভ করে কাঁকড়া চিংড়ি বিচ্ছু, এমন-কি, মাছ গিরগিটি পর্যন্ত প্রাণের দায়ে কত দেশে কতরকম বর্ম এঁটে ফেরে তার আর সীমা সংখ্যা নাই। হাজাররকম জীবজন্তু, তারা সবাই যখন বাঁচতে চায় তখন বাঁচবার উপায়ও তাদের করতে হয়। বাঁচবার উপায় তিনরকম। এক হচ্ছে গায়ের জোরে অস্ত্রেশস্ত্রে প্রবল হয়ে শত্রুকে মেরে বাঁচা ; আর-এক হচ্ছে দৌড়ের জোরে বা কলা-কৌশলে পালিয়ে আর লুকিয়ে বাঁচা ; আর তৃতীয়টি হচ্ছে শরীরটিকে এমন জবরদস্ত করা যে, মারধোর অত্যাচারের চোট সে সয়ে থাকতে পারে। বর্মধারী জীবেরা এই শেষ উপায়টিকে বাগাবার চেষ্টায় আছেন। এতে এক-একজন যে অনেকখানি ওস্তাদি দেখিয়েছেন তাতে সন্দেহ কি?

সন্দেশ—মাঘ, ১৩২৪

এ পাখির ইংরাজি নাম হর্নবিল্ (Hornbill) অর্থাৎ শৃঙ্গচঞ্চু, কিন্তু তার আসল বাংলা নামটি যে কি, তা আর খুঁজে পেলাম না। লোকে তাকে ধনঞ্জয় বা ধনেশ পাখি বলে, কিন্তু অভিধান খুঁজতে গিয়ে দেখি, ও নামে কোনো পাখিই নেই। ওর কাছাকাছি একটা আছে, তার নাম ধনচ্চু—'হাড়গিলার আকার-বিশিষ্ট পক্ষীবিশেষ, করেটু পক্ষী'। 'করেটু' মানে 'কর্করেটু পক্ষী'—'কর্করেটু' মানে 'করাটিয়া পক্ষী'। আবার 'করাটিয়া'র মানে দেখতে গেলে আরো কত নাম বেরুতে পারে, সেই ভয়ে আর দেখা হল না। যাহোক নাম দিয়ে কেউ যদি চিনতে না পারে, তবে চেহারাটা দেখলে তার পরিচয় পেতে বোধ হয় দেরি হবে না—কারণ, এ চেহারা একবার দেখলে আর সহজে ভুলবার জো নেই।
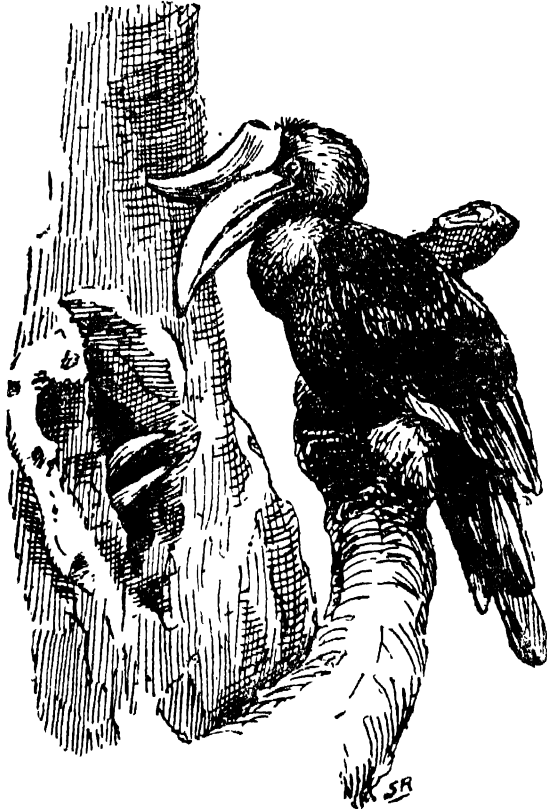
আলিপুরের চিড়িয়াখানায় যত অদ্ভুত পাখি আছে, তার মধ্যে 'ফার্স্ট প্রাইজ' কাউকে দিতে হলে বোধ হয় একেই দেওয়া উচিত। আমরা ছেলেবেলায় যখন এই পাখিকে প্রথম দেখি তখন তার নাম দিয়েছিলাম 'দুই-ঠোঁটওয়ালা পাখি'। বাস্তবিক কিন্তু এর একটামাত্রই

ঠোঁট। উপরেরটা শিং বলতে পার—সেটার সঙ্গে তার মুখ বা ঠোঁটের কোনো সম্পর্কই নেই। অত বড়ো একটা জমকাল শিং দিয়ে তার কি যে কাজ হয়, তা তো দেখতে পাই না। অত্যন্ত নিরীহ পাখি, কারও সঙ্গে গুঁতাগুঁতি করবার সাহস তার আছে কিনা সন্দেহ। চেহারা দেখলে মনে হয়—'বাপ্ রে! এই ঠোঁটের একটি ঠোকর খেলেই তো গেছি'। কিন্তু নিতান্ত ঠেকা না পড়লে গুঁতা মারার অভ্যাসটিও তার নেই বললেই হয়।

এত বড়ো ঠোঁট তার উপর এমনধারা শিং, এই বিষম বোঝা বয়ে বয়ে পাখিটার মাথাও কি ধরে না? চলতে ফিরতে উড়তে গিয়ে সে কি উলটেও পড়ে না? আসল কথা কি জান? তার ঠোঁটটি আর শিংটি আগাগোড়াই ফাঁপা, কাঁকড়ার খোলার মতো হালকা। তাই তার ঠোঁট নিয়ে বড়ো-বড়ো গাছের আগডালের উপরে সে লাফিয়ে বেড়ায়—খাবার দেখলে ঝুপ্ করে উড়ে এসে পড়ে। কেবল তাই নয়, তার দিকে খাবারের টুকরো ছুঁড়ে দেখ দেখি সে কেমন চট্‌পট্ ঘাড় ফিরিয়ে তার বিশাল ঠোঁটের মধ্যে খাবার লুফে নেবে। এ বিষয়ে তার মতো ওস্তাদ আর বোধ হয় দ্বিতীয় নেই; আর এমন খানেওয়ালাও বোধ হয় আর একটি পাওয়া দুষ্কর!

এক সাহেবের এক পোষা ধনঞ্জয় ছিল—সে আমাদের দেশে নয়, বোর্নিও দ্বীপে। সে-দেশে এই পাখি অনেকেই পুষে থাকে। সাহেব বলেন, এমন সর্বনেশে পেটুক জীব আর কোথাও মেলে না। সেই এতটুকু বাচ্চা বয়স থেকেই তাকে খাইয়ে খাইয়েও মানুষে ঠাণ্ডা রাখতে পারত না। এইমাত্র খাইয়ে গেলে, আবার পাঁচ মিনিট পরেই দেখবে হতভাগা ল্যাজের উপর ভর দিয়ে পা মুড়ে বসে বসে প্রকাণ্ড হাঁ করে ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দে বিকট কান্না লাগিয়েছে। তার পর একটু বয়স হলে তখন তার অত্যাচারে বাড়িতে টেঁকা দায় হয়ে উঠল। খাবার সময় তার ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে তাকে আটকে রাখতে হত, তা নইলে সে পাতের খাবারে, ভাতের হাঁড়িতে, ব্যঞ্জনের বাটিতে, দুধের কড়ায়, যেখানে সেখানে মুখ দিয়ে সকলকে অস্থির করে তুলত। মাছমাংস, ডালভাত, রুটিবিস্‌কুট, ময়দার ডেলা, যা দাও তাতেই সে খুশি, কিন্তু পেট ভরে দেওয়া চাই। পেটটি ভরলেই সে উড়ে গিয়ে গাছের আগায় বিশ্রাম করবে, রোদ পোহাবে আর প্রাণপণে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নতন করে সাংঘাতিক খিদে ডেকে আনবে।

ধনঞ্জয় পাখির চালচলন স্বভাব যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা বলেন, এই পাখির বাসা বাঁধবার ধরনটি তার চেহারার চাইতে কম অদ্ভুত নয়। যখন ছানা হবার সময় হয় তখন মা-পাখিটা একটা গাছের কোটরের মধ্যে আশ্রয় নেয়, আর বাবা পাখি সেই কোটরের মুখটাকে কাদামাটি শ্যাওলা দিয়ে বেশ করে এঁটে বন্ধ করে দেয়—কেবল একটুখানি ফোকর রাখে, তা না হলে বাইরে থেকে খাবার দেবে কি করে? সেই কোটরের মধ্যে ডিম পেড়ে মা-পাখি দিনের পর দিন তার উপর বসে বসে তা দেয়। আর বাবা-পাখি বাইরে থেকে পাহারা দেয়, আর ফোকরের ভিতর দিয়ে সারাদিন খাবার চালান করে। এমনি করে যখন ডিম ফুটে ছানা বেরোয়, আর সেই ছানাগুলো যখন একটু বড়ো হয়, তখন বাসা ভেঙে মা-পাখি বেরিয়ে আসে। এতদিন বদ্ধ জায়গায় বসে বসে তার পা এমন আড়ষ্ট হয়ে যায় যে কোটর থেকে বেরোবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে উড়তে পারে না, ভালো করে চলতে ফিরতেও

পারে না। এই বাসা গড়া ও ভাঙার সময় ধনঞ্জয়ের লম্বা ঠোঁট আর শিং এ দুটোই বোধ হয় বেশ কাজে লাগে।

ধনঞ্জয় পাখি আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ার নানা জায়গায় বাস করে এবং তার নানা-রকম চেহারা দেখা যায়। উড়িষ্যা দেশে এ পাখির নাম 'কুচিলাখাই'। 'কুচিলাখাই'য়ের গায়ের রঙ কালো, তার উপর ঠোঁট আর শিঙের চক্‌চকে লালচে হলুদ দেখতে বেশ মানায়। নেপালের লাল ধনঞ্জয়ের শিং নেই বললেই হয়, কিন্তু তার মুখে মাথায় খুব গম্ভীরগোছের কেশর আছে আর ঠোঁট দুটো করাতের মতো দাঁতালো। সুমাত্রা দ্বীপের ধনঞ্জয়ের শিং একেবারেই নেই, কিন্তু তার জমকাল কেশরটি অতি চমৎকার ধবধবে সাদা। আবার কেউ কেউ আছেন যাঁদের শিংও আছে, কেশরও আছে। শিঙের রকমারিও অনেক দেখা যায়—কারও শিং খড়্গের মতো বাঁকা, কারও কিরিচের মতো সোজা, আবার একজন আছেন তাঁর শিংটি শশার মতো গোল, তার উপরে ঝুঁটি।

ধনঞ্জয়ের চেহারাটি যেমন বিকট তার গলার আওয়াজটিও তেমনি কট্‌কটে। বনের মধ্যে হঠাৎ তার গলা শুনলে অন্য পাখিরা তো ভয় পায়ই, বাঁদর বা বনবেড়াল পর্যন্ত ভয়ে পালায় এমনও দেখা যায়! তা ছাড়া তার মাংস নাকি এমন বিস্বাদ যে কুকুরেও খেতে চায় না।

ধনঞ্জয়ের কথা বলতে গেলে আর-এক পাখির কথা বলতে হয়—তার নাম টুকান (Toucan)। এই পাখির বাসা আমেরিকায়। এদের গায়ে অনেক সময়ে খুব জমকাল রঙের বাহার দেখা যায়—কিন্তু আসল দেখবার জিনিস এদের সাংঘাতিক লম্বা ঠোঁট দুখানি। দেখলে মনে হয় যত বড়ো পাখি প্রায় তত বড়ো ঠোঁট—যেন 'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি'। তাতে চেহারাটি কেমন খোলে, তার আর বেশি বর্ণনা করবার দরকার নেই। দেখতে অনেকটা ধনঞ্জয়ের মতো হলেও আসলে এরা ধনঞ্জয় নয়—আর ধনঞ্জয়ের মতো অত বড়োও হয় না।

সন্দেশ—চৈত্র, ১৩২৪

শামুক ঝিনুক

আমাদের শরীরের ভিতরকার শক্ত কাঠামোটিকে আমরা কংকাল বলি। কংকালটা ভিতরে থাকে আর এই রক্ত-মাংসের শরীর তাহাকে ঢাকিয়া রাখে—এইরূপই আমরা সচরাচর দেখি। কিন্তু এমন জীবও আছে যাহার কংকালটা থাকে শরীরের বাহিরে। এমন অদ্ভুত কাণ্ড কেহ দেখিয়াছ কি? বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছ; কারণ, আমি কোনো অসাধারণ বিদ্‌ঘুটে জন্তুর কথা বলিতেছি না—এই নিতান্ত সাধারণ শামুক ঝিনুক প্রভৃতির কথাই বলিতেছি।

শামুক ঝিনুকের মতো নিতান্ত সামান্য জিনিসের মধ্যে যে কত আশ্চর্য ব্যাপার লুকানো থাকে, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। তোমরা গেঁড়ি দেখিয়াছ? বাগানে পুকুরের কাছে স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় ছোটো-ছোটো জীবন্ত শামুকগুলি যারপরনাই অলসভাবে আস্তে-আস্তে চলাফিরা করে—তাহাদের নাম গেঁড়ি। ঝিনুকের মধ্যে যে, জীবন্ত প্রাণীটি বাস করে, তাহার
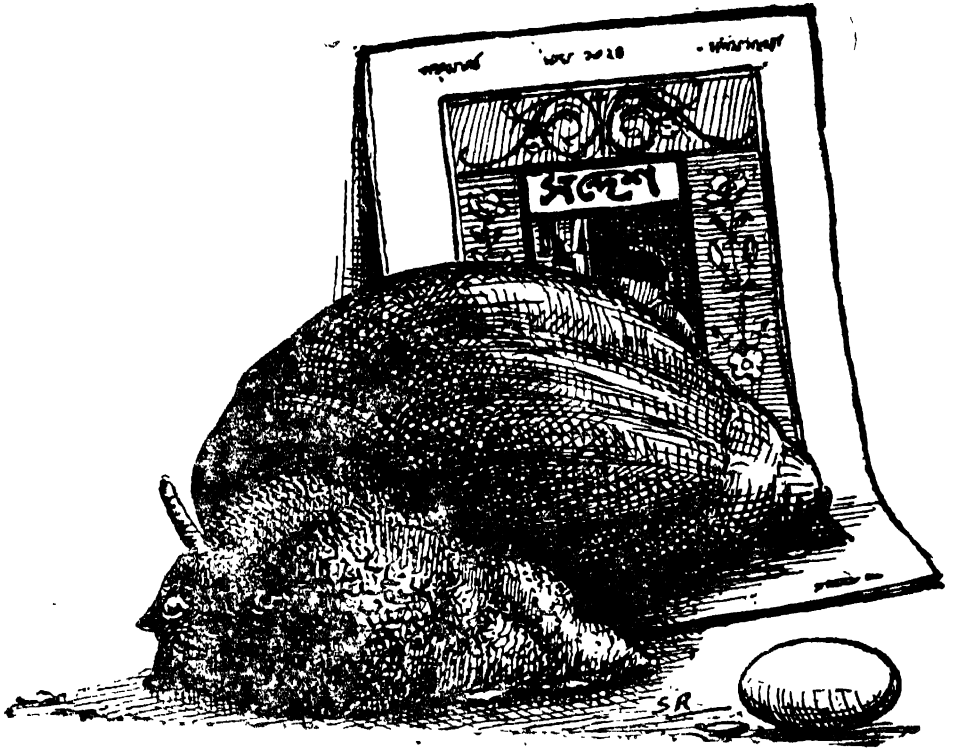
চালচলনটিও কম অদ্ভুত নয়। তাহাদের অনেকেই সারা জন্ম মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। কেহ কেহ এমন গোঁয়ার, তাহারা ক্রমাগত পাথর ফুঁড়িয়া তাহার ভিতর ঢুকিতে চায়। দুই-একজন আছে তাহারা লাফানো বিদ্যাটি বেশ অভ্যাস করিয়াছে, কথা নাই বার্তা নাই হঠাৎ তড়াক করিয়া এক-একটা লাফ দেয়। আর সমুদ্রের নীচে শুক্তিগুলো যে আপনাদের খোলার ভিতরে ছোটো-বড়ো নানারকম মুক্তা জমাইয়া রাখে, তাহার কথাও তোমরা নিশ্চয়ই জান। একরকম পোকার জ্বালায় অস্থির হইয়া ঝিনুকের গায়ে রস গড়ায় আর সেই রস জমিয়া মুক্তা হয়।

শামুক বা ঝিনুকের যখন জন্ম হয় তখন তাহাদের খোলাটি থাকে না, তাহার জায়গায় একটা পুরু চামড়ার মতো থাকে ; সেই চামড়াটি শক্ত হইয়া ক্রমে মজবুত খোলা তৈরি হয়। যে ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়, সেই ডিমগুলি দেখিতে বড়োই অদ্ভুত। কতগুলি ছোটো-ছোটো পোঁটলা একসঙ্গে মালার মতো বাঁধা থাকে। প্রত্যেকটি পোঁটলার মধ্যে কতগুলি ডিম। এক-একটি শামুক অনেকগুলি ডিম পাড়ে—একশো-দেড়শো হইতে দশ-বিশহাজার। কিন্তু এ-বিষয়ে এক-একটা ঝিনুকের ওস্তাদি অনেক বেশি। সমুদ্র বা নদীর জলে এমন সব ঝিনুক দেখা যায় যাহারা একেবারে দশ-বিশলাখ ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিয়া যখন ছানা বাহির হয়, তখন তাহাদের খাইবার জন্য নানারকম জীবজন্তু চারিদিক হইতে ঘিরিয়া আসে, কারণ খোলা জন্মিবার আগে এই নরম অবস্থাতেই এগুলিকে খাইবার সুবিধা। বাস্তবিক, অল্প বয়সেই ইহারা যদি এরূপভাবে উজাড় না হইত, তবে শামুক ঝিনুকের অত্যাচারে

পৃথিবীতে বাস করাই দায় হইত। যে প্রাণী এক-একবারে হাজার হাজার জন্মিতেছে তাহাদের প্রত্যেকটি যদি বড়ো হইতে পায়, আর প্রত্যেকের হাজার হাজার করিয়া ছানা হয়, আর এইরকম বছরের পর বছর চলিতে থাকে, তবে অবস্থাটা নিতান্তই সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায় বৈকি। এরূপভাবে বাড়িতে পারিলে একটিমাত্র শামুকের বংশধরেরা পাঁচ-সাত বৎসরের মধ্যে সমস্ত কলিকাতা শহরটিকে একেবারে বেমালুম ঢাকিয়া দিতে পারিত।

বলিতে গেলে একসময় এই পৃথিবীতে ইহাদেরই রাজত্ব ছিল। সেকালের হিসাবেও ইহা খুবই পুরাতন সময়ের কথা। তখন আর কোনো জীবজন্তু ছিল না কেবল নানারকম শঙ্খ আর অদ্ভুত জলজন্তুরা এই দুনিয়ার পরিচয় লইয়া ফিরিত। আজও তাহাদের কংকাল জমিয়া কত মাটির নীচে কত সমুদ্রের বুকে বড়ো-বড়ো স্তর বাঁধিয়া আছে।

গেঁড়ির কথা বলিতে গেলে সবচাইতে বড়ো যে আফ্রিকার রাক্ষুসে গেঁড়ি তাহার কথাও বলা উচিত। সেগুলি কতখানি বড়ো তাহা পুরাপুরি দেখাইতে গেলে বই-এর পৃষ্ঠায় কুলাইবে না। ইহারা একটি করিয়া লম্বাগোছের ডিম পাড়ে—ঠিক পাখির ডিমের মতো শক্ত আর সাদা।

কিন্তু সমুদ্রের শঙ্খজাতীয় জন্তুদের মধ্যে ইহার চাইতে অনেক বড়ো জীবও বিস্তর দেখা যায়। তাহাদের এক-একটির খোলা এমন প্রকাণ্ড হয় যে, একটি ছোটোখাটো ছেলেকে তাহার মধ্যে অনায়াসে শোয়াইয়া রাখা যায়।

শামুকেরা খায় কি? নরম ঘাস, কচি পাতা, জলের পানা—এইগুলি অনেকেরই প্রধান খাদ্য। আবার কেহ কেহ আছেন, তাঁহাদের নিরামিষে রুচি নাই, তাঁহারা নানারকম পোকা-

মাকড়, জলের কীট এই-সকল খাইয়া থাকেন। ঝিনুকেরও খাওয়া এইরকমই, তবে তাহারা এক জায়গায় পড়িয়া থাকে বলিয়া তাহাদের আহার জুটিবার সুযোগ কিছু কম। ঝিনুকের খোলায় দুটি করিয়া পাট থাকে, সে দুটিকে তাহারা ইচ্ছামতো কব্জা ঘুরাইয়া খুলিতে ও জুড়িয়া দিতে পারে। খাবারের দরকার হইলে তাহারা সেই দরজা ফাঁক করিয়া রাখে; চলিতে চলিতে অথবা স্রোতে ভাসিয়া যে-সকল কীট সেই হাঁ-করা মুখের মধ্যে আসিয়া পড়ে তাহাদের সে চট্‌পট্‌ খাইয়া ফেলে। শামুক আর ঝিনুকের খাওয়ার মধ্যে আর-একটি তফাত এই যে, ঝিনুকের দাঁত নাই, কিন্তু শামুকের দাঁত আছে। দাঁত বলিতে মানুষের দাঁতের মতো কিছু একটা মনে করিও না। এই দাঁতগুলি তাহাদের জিভের গায়ে অতি সূক্ষ্মভাবে সাজানো থাকে, এক-একটা শামুকের প্রায় দুই-চারশো বা হাজার-দেড় হাজার দাঁত। অণুবীক্ষণ দিয়া সেই দাঁতালো জিভটিকে কেমন দেখা যায় তাহার একটা নমুনা দেওয়া গেল। উখার মতো

ধারালো এই জিভটিকে সে তাহার খাবারের ভিতরে, উপরে, আশেপাশে ঘ্যাঁশ্‌ ঘ্যাঁশ্‌ করিয়া চালাইতে থাকে। তাহাতেই খাবার জিনিস সব টুকরা টুকরা হইয়া থ্যাৎলাইয়া কাদার মতো নরম হইয়া যায়। ছবিতে যেমন দেখানো হইল, সকলের জিভ ঠিক এইরকম নয় এক-একটার জিভের আগা পর্যন্ত সাংঘাতিক ধারালো; সেই জিভ দিয়া তাহারা অন্য জন্তুর গায়ে ফুটা করিয়া দেয়, নিরীহ ঝিনুকগুলির খোলা ফুঁড়িয়া তাহাদের চুষিয়া খায়।

তার পর শামুক ঝিনুকের চেহারার বাহার যদি বর্ণনা করিতে বসি, তবে তো শেষ করাই মুশকিল হইবে। কত হাজাররকমের শঙ্খ, তাদের কতরকম আকার, কতরকম রঙ। তার এক-একটার যে কি আশ্চর্য সুন্দর গড়ন শুধু কথায় তাহা আর কত বোঝানো যায়।

সন্দেশ : চৈত্র, ১৩২৪

মাছি

আমার সামনে টেবিলের উপর এক টুকরা চিনি পড়িয়াছিল। একটা মাছি খুব মন দিয়া সেইটাকে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। চিনির কাছে মুখ রাখিয়া সে অনেকক্ষণ

ইহারা সারাবছর কাটাইয়া দেয়। চিৎ হইয়া মাঝে মাঝে নীচের দিকে তাকানো, মাঝে মাঝে হাত বাড়াইয়া গাছের পাতা খাওয়া, আর যখন তখন ঘাড় গুঁজিয়া ঘুমানো—ইহাই যেন ইহাদের জীবনের কাজ। যখন এক ডালের পাতা ফুরাইয়া গেল, তখন আর-এক ডালে যাওয়াটা যেন ইহাদের পক্ষে প্রাণান্তকর। ধীরে ধীরে একটু-একটু করিয়া ভুঁড়ি দোলাইয়া, আস্তে আস্তে হাত-পা বাড়াইয়া আধ মিনিটের কাজ আধ ঘণ্টায় সারিতে না সারিতে ইহারা আবার পরিশ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। বাস্তবিক ইহারা এমন অলস যে অনেক সময়ে ইহাদের মাথায় একরকমের শ্যাওলা গজাইয়া সবুজ রঙের স্যাঁৎলা পড়িয়া যায়। পুরাণে বলে, বাল্মীকি, চ্যবন প্রভৃতি ঋষিরা ধ্যানে বসিলে তাঁহাদের গায়ে উইয়ের ঢিপি গজাইয়াছিল। ইনি সারাদিন চিৎপাত হইয়া যে কিসের ধ্যান করেন তাহা জানি না কিন্তু মাথায় শ্যাওলা না গজাইয়া আরেকটু বুদ্ধি গজাইলে বোধ হয় কতকটা সুবিধা হইত।

সন্দেশ —আশ্বিন, ১৩২৫

তিমির ব্যবসা

কথায় বলে 'ঠেলায় পড়লে বাঘেও ধান খায়'। ১৮৭১ খৃস্টাব্দে জার্মানরা যখন পারিস শহর ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল তখন পারিসের লোকেরা খাবারের অভাবে ঘোড়ার মাংস খাইতে বাধ্য হয়। তাহার আগে ইউরোপের লোকে ঘোড়ার মাংস খাইত না। কিন্তু এই সময় হইতে দেখা গেল যে ঘোড়ার মাংসটা খাইতে লাগে মন্দ নয়। এখন শুধু পারিসে নয়, ইউরোপের অন্যান্য বিস্তর শহরেও লোকে শখ করিয়া ঘোড়ার মাংস খাইয়া থাকে। তাহার জন্য আর 'ঠেলায় পড়িবার' দরকার হয় না।

এখন যে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতেও খাদ্য-সমস্যা একটা মস্ত সমস্যা। চল্লিশ পঞ্চাশ বা ষাট লক্ষ লোক এক-এক দিকে যুদ্ধ করিতেছে, কেবল তাহাদের খাওয়া জোগাইলেই নিশ্চিন্ত হইবার জো নাই—সমস্ত দেশের লোক কি খাইবে, কি পরিবে, তাহার ভাবনাও প্রত্যেক দেশের শাসনকর্তাদের ভাবিতে হয়। ইউরোপের খাওয়া জোগাইবার ভার এখন অনেক পরিমাণে আমেরিকার উপরে পড়িয়াছে। ইউরোপের লোকেরা মাংস-খোর জাতি, প্রতি বৎসর তাহারা লক্ষ লক্ষ মণ মাংস খাইয়া শেষ করে। এত মাংস চালান দেওয়া কি কম কথা? বিদেশ হইতে জাহাজে করিয়া ইংলণ্ডে যে-সব খাবার জিনিস চালান আসে জার্মান জলদস্যু ডুবুরী জাহাজ সেইগুলিকে নষ্ট করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাতেও কত খাবার সমুদ্রে ডুবিয়া নষ্ট হয়।

আমেরিকার বুদ্ধিমান লোকে এই সমস্যার একটা মীমাংসা করিয়াছেন বড়ো চমৎকার। তাঁহারা তিমির মাংস প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহার মধ্যেই আমেরিকার নানা স্থানে এই মাংসের ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছে—তিমি ধরিয়া তাহার মাংস চালান দিবার জন্য বড়ো-বড়ো কারখানা বসিয়াছে। তাহার একটিমাত্র কারখানা হইতে বছরে ৯০০০ মণ মাংস টিনে ভরিয়া চালান দেওয়া হয়। নূতন কোনো খাওয়ার অভ্যাস মানুষ সহজে ধরিতে

চায় না, সেইজন্য আমেরিকার একদল লোকে বক্তৃতা করিয়া, কাগজেপত্রে লিখিয়া, বায়োস্কোপে ছবি দেখাইয়া এ বিষয়ে মানুষের মনের বিরোধ ভাঙিতেছেন। আমেরিকার কোনো কোনো শহরে প্রকাশ্য বাজারে দশ-আনা সেরে তিমির মাংস বিক্রয় হইতেছে।

গোরু ঘোড়া শূকর কিছুতেই যাহাদের আপত্তি নাই তাহারা যে তিমি খাইতে বেশি দিন আপত্তি করিবে, এরূপ বোধ হয় না। যাঁহারা ইহার মধ্যেই ও জিনিসটা খাইতে অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন—চমৎকার মাংস! ইউরোপের বাজারে ইহাকে গো-মাংস বলিয়া চালাইলেও কেহ কোনো তফাত বুঝিবে কিনা সন্দেহ।

সবরকম তিমির মাংস খাইতে ভালো নয়। যেগুলি বিশেষভাবে খাওয়ার উপযোগী সেগুলি সাধারণ ছোটোখাটো তিমি—অর্থাৎ মোটে কুড়ি-পঁচিশ হাত লম্বা। মোম তিমি বা sperm whale লম্বায় খুব বড়ো হয়—এক-একটা ষাট হাত পর্যন্ত দেখা গিয়াছে। সব-চাইতে বড়ো যে তিমি সেগুলি থাকে একেবারে উত্তরে, মেরু সমুদ্রের কাছে—তাহারা লম্বায় মোম তিমির সমান, কিন্তু অনেকখানি চওড়া ও মোটা এবং ওজনেও প্রায় দেড়া। এক-একটি বড়ো তিমির ওজন চারহাজার মণেরও বেশি হয়—অর্থাৎ ত্রিশ-চল্লিশটা বড়ো-বড়ো হাতির সমান। এই-সমস্ত অতিকায় তিমি আগে সমুদ্রের মধ্যে অনেক দেখা যাইত, কিন্তু মানুষের অত্যাচারে ইহাদের বংশ ক্রমে প্রায় উজাড় হইয়া আসিতেছে।

তিমি নানারকমের হয়—তাহাদের মোটের উপর দুই দলে ভাগ করা যায়। এক দলের দাঁত নাই, আর এক দলের দাঁত আছে। যেগুলার দাঁত নাই তাহাদের মুখের ভিতরে প্রকাণ্ড চিরুনির ঝালরের মতো একটা জিনিস থাকে, তাহাকে বলে কাঁচকড়া বা whale bone। এই জিনিসটা মানুষের অনেক শৌখিন কাজে লাগে এবং বাজারে বিক্রয় করিলে বেশ দামও পাওয়া যায়। তা ছাড়া এক-একটা তিমির গায়ে যে পরিমাণ তেল বা চর্বি থাকে তাহার দামও বড়ো সামান্য নয়। যে মোম তিমির কথা আগে বলিয়াছি তাহার মুখে কাঁচকড়া নাই কিন্তু তাহার মাথার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা ভরা মোম থাকে! এই মোমের চমৎকার বাতি হয় এবং নানারকম মলম প্রভৃতি হয়। এই মোম চর্বি ও কাঁচকড়ার জন্য মানুষে সমুদ্রের নানা স্থানে বড়ো-বড়ো তিমিগুলিকে নিঃশেষ করিয়া এখন ছোটোখাটো তিমির পিছনে লাগিয়াছে।

যে-সব 'ছোটোখাটো' তিমির কথা বলা হইল, তাহাদের এক-একটাকে মারিলে প্রায় তিন-চারশত মণ মাংস পাওয়া যায়। আজকাল তিমির ব্যবসা অনেক কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু গত দুই বৎসরে কেবল উত্তর আমেরিকায় প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলেই বারোশতের বেশি তিমি মারা হইয়াছে। এখন এ ব্যবসায়ে আরো লাভ হইবার কথা, কারণ এখন হইতে তিমির হাড় মাংস চর্বি চামড়া সমস্তই কাজে লাগানো চলিবে। এতকাল চর্বি ও কাঁচকড়া বাহির করিবার পর অত বড়ো প্রকাণ্ড দেহটাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইত—তাহাতে কেবল হাজার হাজার জলজন্তুর খোরাক জুটিত। কিন্তু এখন সেই মাংসে মানুষের উদরপূর্তি হইবে। এইরূপ একটা তিমিকে মারিলে স্বচ্ছন্দে বিশ-ত্রিশ হাজার লোকের ভোজের আয়োজন হইতে পারে। তার পর কংকালটুকুও ফেলিবার জিনিস নয়—তাহাকে পোড়াইয়া চমৎকার জমির সার ও নানারকম ঔষধ তৈয়ারি হইবে। চামড়াটায় চর্বি ভরা

বলিয়া তাহাকে অনেকদিন পর্যন্ত কাজে লাগাইবার সুবিধা হয় নাই—এখন তিমির ছাল কলে পিষিয়া চবি বাহির করিয়া চমৎকার মজবুত চামড়া তৈয়ারি হইতেছে। সুতরাং মানুষের মতো এ-হেন অত্যাচারী রাক্ষসের হাত এড়াইবার জন্য তিমি গভীর সমুদ্রে পলাইয়া হয়তো এখনো বাঁচিতে পারে—না হইলে তাহার বংশ লোপ হওয়ার খুবই আশংকা আছে।

এত বড়ো প্রাণীটা, কিন্তু মোটের উপর তাহার স্বভাবটি বেশ নিরীহ বলিতে হইবে। অনেক সময়ে দেখা যায় তিমির দল সমুদ্রের উপর ভাসিয়া ভাসিয়া খেলা করিতেছে, তাহাদের একটাকে মারিলে বাকিগুলা ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে ভিড় করিয়া আসে। তখন একটার পর একটাকে বল্লমে গাঁথিয়া দলকে-দল মারিয়া ফেলা খুবই সহজ হইয়া পড়ে। কিন্তু সব তিমি সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না। কোনো কোনো দাঁতওয়ালা তিমি আছে, তাহাদের মেজাজটা দস্তুরমতো বদরাগী। এ বিষয়ে মোম তিমির দুর্নাম সবচাইতে বেশি। মাঝে মাঝে এক-একটা দলছাড়া মোম তিমি দেখা যায়, তাহাদের ঘাঁটাইবার দরকার হয় না—জাহাজ দেখিলেই তাহারা তাড়া করিয়া যায়। তিমির তাড়া যে কেমন তাড়া, সে তাড়া যে খাইয়াছে সেই জানে। কখনো সে ঢুঁ মারে, কখনো সে হাঁ করিয়া কামড়াইতে আসে, কখনো তাহার গায়ের ধাক্কায় জাহাজ চুরমার হয়—অথবা লেজের ঝাপটায় প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত করে, এই ভয়ে মাঝি-মাল্লা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। আর যাহাদের 'নিরীহ তিমি' বলি, তাহারাও যখন মরিবার সময় সমুদ্র তোলপাড় করিয়া ছট্‌ফট্‌ করে তখন সেও একটা কম সাংঘাতিক ব্যাপার হয় না।

তিমির খাওয়ার মধ্যেও রকমারি দেখা যায়। যাহাদের দাঁত নাই, তাহারা সমুদ্রের মধ্যে ছোটো-ছোটো মাছের ঝাঁক খাইয়া বেড়ায়। এক-এক বার হাঁ করিয়া মাছের ঝাঁক-সুদ্ধ সমুদ্রের জল মুখের ভিতর পুরিয়া লয়; তার পর সেই কাঁচকড়ার ঝালরের ভিতর দিয়া সেই জল ফুঁকিয়া বাহির করে—মাছগুলা সব এই অদ্ভুত ছাঁকনিতে আটকাইয়া থাকে। ইহাদের গলার ফুটা এত ছোটো যে নিতান্ত পুঁটি বাটা ছাড়া কোনো বড়ো মাছ গেলা ইহাদের সাধ্য নয়। কিন্তু দাঁতালো তিমিরা এরকম খুচরা খাইয়া সন্তুষ্ট হয় না। তাহারা বড়ো-বড়ো সমুদ্রের জন্তুকে মারিয়া খায়। মোম তিমিরা এক মাইল গভীর সমুদ্রে ডুব মারিয়া সেখানকার বড়ো-বড়ো বিদ্‌ঘুটে জন্তুগুলাকে খাইতে ছাড়ে না। একবার একটা তিমির পেটে একটা প্রকাণ্ড অক্টোপাসের কিছু কিছু টুকরা পাওয়া গিয়াছিল। তাহার এক-একটি পা হাতির পায়ের সমান মোটা! সে জন্তুটা যে আট-দশটা হাতির সমান বড়ো ছিল, তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই।

'তিমি মাছ' যে আসলে মাছই নয়, সে কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। ইহারা স্তন্যপায়ী জন্তু। ইহাদের এক-একটি ছানা হয় ঘোড়ার মতো মস্ত; তাহারা জন্মিয়া মায়ের দুধ খায়। মাছ যেমন অনায়াসে জলের নীচে ডুবিয়া থাকে—তিমি সেরকম পারে না। নিশ্বাস লইবার জন্য তাহাকে বার বার জলের উপরে উঠিতে হয়। কখনো কখনো জোরে নিশ্বাস ছাড়িবার সময় তাহার নাক হইতে গরম বাতাসের ঝাপটা ছুটিয়া সমুদ্রের উপর জলের ফোয়ারা উঠিতে থাকে। তাহা দেখিয়া শিকারীরা বুঝিতে পারে—ঐখানে তিমি।

সন্দেশ—কার্তিক, ১৩২৫

জানোয়ার এঞ্জিনিয়ার

পাখির মধ্যে কাক, আর পশুর মধ্যে শেয়াল –বুদ্ধির জন্য মানুষে ইহাদের প্রশংসা করে। কিন্তু এখন যে জন্তুটির কথা বলিব, তাহার বুদ্ধি শেয়ালের চাইতে বেশি কিনা, সেটা তোমরা বিচার করিয়া দেখ। এই জন্তুর বাড়ি উত্তরের শীতের দেশে—বিশেষত উত্তর আমেরিকায়। ল্যাজসুদ্ধ দুহাত-লম্বা জন্তুটি, দেখিতে কতকটা ইঁদুর বা 'গিনিপিগে'র মতো, তাহার চেহারায় বিশেষ কোনো বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহার কাজ যদি দেখ, তবে বুঝিবে সে কত বড়ো কারিকর। জানোয়ারের মধ্যে এত বড়ো 'এঞ্জিনিয়ার' আর দ্বিতীয় নাই। ইহার নাম বীভার।

মৌমাছির চাক, মাকড়সার জাল, পিঁপড়ার বাসা প্রভৃতি অনেক ব্যাপারের মধ্যে আমরা খুব কৌশলের পরিচয় পাই—কিন্তু বীভারের বুদ্ধি কৌশল আরো অদ্ভুত। ইহারা বড়ো-বড়ো বাঁধ বাঁধিয়া নদীর স্রোত আটকাইয়া রাখে, জঙ্গলের বড়ো-বড়ো গাছ কাটিয়া ফেলে এবং সেই গাছের 'লাক্‌ড়ি' বানাইয়া নানারকম কাজে লাগায়! খাল কাটিয়া এক জায়গার জল আরেক জায়গায় নিতেও ইহারা কম ওস্তাদ নয়। এই-সমস্ত কাজে ইহাদের প্রধান অস্ত্র বাটালির মতো ধারাল চারটি দাঁত। বড়ো-বড়ো গাছ, যাহা কোপাইয়া কাটিতে মানুষের রীতিমতো পরিশ্রম লাগে, বীভার তাহার ঐ দাঁত দুটি দিয়া সেই গাছকে কুরিয়া মাটিতে ফেলে। যেখানে বীভারেরা পল্লী বাঁধিয়া দলবলে বসতি করে, তাহার আশেপাশেই দেখা যায় যে অনেকগুলি গাছের গোড়ার দিকে, জমি হইতে হাতখানেক উপরে, খানিকটা কাঠ যেন খাবলাইয়া ফেলা হইয়াছে। এক-একটা গাছ প্রায় পড়ো-পড়ো অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে; আরেকটু কাটলেই পড়িয়া যাইবে। এ-সমস্তই বীভারের কাণ্ড। গাছটি যখন কাটা হইল তখন তাহাকে ছোটো-বড়ো নানারকম টুকরায় কাটিবার জন্য বীভারের দল ভারি ব্যস্ত হইয়া উঠে। শীতকালে যখন বরফ জমিয়া যায়, যখন চলাফিরা করিয়া খাবার সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়ে, তখন বীভারের প্রধান খাদ্য হয় গাছের ছাল। সেইজন্য শীত আসিবার পূর্বেই তাহাদের গাছ কাটিবার ধুম পড়িয়া যায়, এবং তাহারা গাছের নরম বাকল কাটিয়া বাসার মধ্যে জমাইতে থাকে।

বীভারের প্রধান আশ্চর্য কীর্তি নদীর বাঁধ; কিন্তু তাহার কথা বলিবার আগে ইহাদের বাসা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। জলের ধারে কাঠকুটা ও মাটির ঢিপি বানাইয়া তাহার মধ্যে বীভারেরা স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া বাস করে। এই অদ্ভুত বাসায় ঢুকিবার দরজাটি থাকে জলের নীচে, একটা লম্বা প্যাঁচালো সুড়ঙ্গের মুখে। জলে ডুব মারিয়া ঐ সুড়ঙ্গের মুখটি বাহির করিতে না পারিলে বাসায় ঢুকিবার আর কোনো উপায় নাই। বাসার উপরে যে ঢিপির মতো ছাদ থাকে, তাহাও দু-তিন হাত বা তাহার্ধ চাইতে বেশি পুরু এবং খুবই মজবুত। এক-একটা ঢিপি প্রায় পাঁচ, সাত বা দশ হাত উঁচু হয়।

শীত পড়িবার কিছু আগেই তাহারা বাসায় ঢুকিবার একটা নূতন সুড়ঙ্গপথ কাটিতে

আরম্ভ করে। এই পথটা একেবারে সোজা আর খুব মোটা হয়—কারণ এইখান দিয়াই তাহারা গাছের ডালপালা আনিয়া শীতকালের জন্য সঞ্চয় করিতে থাকে। এই সুড়ঙ্গেরও মুখটি থাকে জলের নীচে। প্রত্যেক পরিবারের লোকেরা আপন আপন বাসায় ঢুকিবার পথ জানে এবং প্রত্যেক পরিবার নিজের নিজের খাবার সংগ্রহ করে। কেবল বড়ো-বড়ো বাঁধ বাঁধিবার সময়ে দুটি-চারটি বা আট-দশটি পরিবার একত্র হইয়া কাজ করে। মেজের উপর পাতিবার জন্য প্রত্যেক বাসায় কিছু কিছু নরম ঘাসও রাখা হয়। কোনো কোনো জায়গায় আবার বাসার মধ্যে দেয়াল তুলিয়া ছোটোদের ঘর, বড়োদের ঘর ইত্যাদি নানারকম আলগা ঘরের ব্যবস্থা করা হয়। আবার কোথাও কোথাও দোতলা তিনতলা করিয়াও ঘরের ব্যবস্থা করা হয়। খাবার সংগ্রহ হইয়া গেলে অনেক সময়ে বড়ো সুড়ঙ্গটার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। শীতকালে যখন জলের উপরে বরফ জমিয়া যায় সেই সময়ে বাহির হইবার জন্য একটা আলগা সুড়ঙ্গের দরকার হয়। এই সুড়ঙ্গটা থাকে বাসার বাহিরে—ইহার এক মুখ জলের নীচে, আরেক মুখ উঁচু ডাঙার উপরে। জলের নীচে বাসার দরজা দিয়া বাহির হইয়া তার পর এই সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকিয়া তবে বীভারেরা বাহিরে আসে।

বীভারের শরীরের গঠন দেখিলেই বোঝা যায় যে জলে থাকা অভ্যাস তাহার আছে। হাঁসের পায়ের মতো চ্যাটালো পা, নৌকার বৈঠার মতো চওড়া চ্যাপ্টা ল্যাজ, গায়ের নরম লোমের উপরে আবার লম্বা তেলতেলা লোমের ঢাকনি—এ-সমস্তই জলজন্তুর উপযোগী ব্যবস্থা। বাসার কাছে জল না হইলে তাহাদের চলে না, সুতরাং সেখানে যাহাতে বারো মাস যথেষ্ট জল থাকে তাহার জন্য সে নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া জল আটকাইয়া বড়ো-বড়ো বিল জমাইয়া ফেলে। আর সেই বিলের ধারে বাসা বাঁধিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে। কোথাও বসতি করিবার আগে বীভারেরা দল বাঁধিয়া জায়গা দেখিতে বাহির হয়। যেখানে নদী আছে অথচ স্রোত বেশি নাই, অথবা জল খুব গভীর নয়, সেইরকম জায়গা তাহাদের খুব পছন্দ। জলের ধারে গাছ থাকা চাই আর জায়গাটা বেশ নির্জন চাই, তবেই তাহা ষোলো-আনা মনের মতো হয়। দলের মধ্যে যাহারা বয়সে প্রবীণ তাহারা প্রথমত চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া জায়গা ঠিক করে; তার পর সকলে মিলিয়া নদীর ধারের আঠালো মাটি আর ছোটো-বড়ো লাক্ড়ি ফেলিয়া জলের মধ্যে বাঁধ বাঁধিতে থাকে। এক পরত মাটি দিয়া তাহার উপর এক সার লাক্ড়ি চাপায়; তাহার উপরে আবার মাটি ফেলিয়া, তাহার উপর ডালপালা শিকড় জড়াইয়া মজবুত করিয়া গাঁথিয়া তোলে। বাঁধ যতই উঁচু হইতে থাকে, নদীর স্রোত বাধা পাইয়া ততই দুইদিকে ছড়াইয়া পড়ে—আর বীভারেরাও সেই বুঝিয়া বাঁধটাকে ক্রমাগতই লম্বা করিতে থাকে। এমনি করিয়া দেখিতে দেখিতে নদীর মধ্যে প্রকাণ্ড বিল জমিয়া যায়। অনেক সময় জলের বেগ কমাইবার জন্য কাছে কাছে আরো দু-একটা ছোটোখাটো বাঁধ দেওয়ার দরকার হয়। এ কাজটিও বীভারেরা খুব হিসাবমতো বুদ্ধি খাটাইয়া করে।

এ-সমস্ত কাজ করিতে হইলে—জলের স্রোত কোনদিকে, কোথায় কতখানি জল ইত্যাদি অনেক বিষয় জানা দরকার; কানাডার এক এঞ্জিনিয়ার সাহেব একটা নদীতে তিন-চারটি বীভারের বাঁধ পরীক্ষা করিয়া দেখেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার উপর ও কাজের ভার থাকিলে তিনি যেখানে যেখানে যেরকম ভাবে বাঁধ রাখা উচিত বোধ করিতেন, বীভারেরাও

ঠিক সেই-সব জায়গায় তেমনিভাবে বাঁধ বসাইয়াছে। এইরকম এক-একটি বাঁধ এক-এক সময়ে একশো বা দুইশো হাত লম্বা এবং পাঁচ হাত বা দশ হাত উঁচু হইতে দেখা যায়। একবার এক সাহেব তামাশা দেখিবার জন্য রাত্রে একটা বাঁধের খানিকটা কোদাল দিয়া ভাঙিয়া লুকাইয়া থাকেন। ভাঙা বাঁধের ফাঁক দিয়া হুড়্ হুড়্ করিয়া জল বাহির হইতে লাগিল—তাহার শব্দে কোথা হইতে একটা বীভার বাহির হইয়া আসিল—তার পর দেখিতে দেখিতে আট-দশটি বীভার অতি সাবধানে এদিক-ওদিক কান পাতিয়া আস্তে আস্তে বাঁধের কাছে আসিল। তার পর সবাই মিলিয়া খানিকক্ষণ কি যেন পরামর্শ করিয়া হঠাৎ সকলে ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে ছুটিয়া গেল এবং দু ঘণ্টার মধ্যেই কাঠ ও মাটি দিয়া বাঁধটাকে মেরামত করিয়া তুলিল। তার পর একটা বীভার তাহার ল্যাজ দিয়া জলের উপর চটাৎ করিয়া বাড়ি মারিতেই সকলে যে যার মতো কোথায় সরিয়া পড়িল আর সারারাত তাহাদের দেখাই গেল না। হঠাৎ ভয় পাইলে বা সকলকে সতর্ক করিতে হইলে বীভারেরা এইরূপ জলের উপর ল্যাজের বাড়ি মারিয়া শব্দ করে। নিস্তব্ধ রাত্রে এই শব্দ পিস্তলের আওয়াজের মতো শুনায় এবং অনেক সময়ে একটা আওয়াজের পর সকলের জলে ঝাঁপ দিবার চটাপট্ শব্দ অনেক দূর হইতে পরিষ্কার শুনিতে পাওয়া যায়। বাঁধ বাঁধিবার জন্য গাছের দরকার হয়। এই গাছ কাটিয়া বড়ো-বড়ো লাক্ড়ি বানাইয়া তাহা বহিয়া লওয়া খুবই পরিশ্রমের কাজ। সেইজন্য বীভারেরা এমন জায়গায় বাসা খোঁজে যাহার কাছে যথেষ্ট গাছ আছে। সেই গাছগুলিকে তাহারা দাঁত দিয়া এমনভাবে কাটে যে গাছগুলি পড়িবার সময় ঠিক নদী-মুখো হইয়া পড়ে। তখন তাহাকে কাটিয়া কুটিয়া অল্প পরিশ্রমেই জলে ভাসাইয়া লওয়া যায়, কিন্তু গাছগুলি যদি জল হইতে দূরে থাকে অথবা কাছের গাছগুলি যদি সব ফুরাইয়া যায় তাহা হইলে উপায় কি? তাহা হইলে বীভারেরা দস্তুরমতো খাল কাটিয়া সেই গাছ আনিবার সুবিধা করিয়া লয়। তাহারা নদীর কিনারা হইতে গাছের গোড়া পর্যন্ত দু হাত চওড়া ও দু হাত গভীর একটি খাল কাটিয়া যায়। তার পর সেই খালে যখন নদীর জল আসিয়া পড়ে, তখন গাছের টুকরাগুলি তাহাতে ভাসাইয়া ঠেলিয়া লইতে আর কোনোই মুশকিল হয় না।

এমন যে বুদ্ধিমান নিরীহ জন্তু, মানুষে তাহার উপরেও অত্যাচার করিতে ছাড়ে নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে, বীভারের গায়ের চামড়াটি বড়োই সুন্দর ও মোলায়েম—শৌখিন লোকের লোভ হইবার মতো জিনিস। সুতরাং এই জন্তুকে মারিয়া তাহার চামড়া বিক্রয় করিলে বেশ দু পয়সা লাভ করা যায়। এই চামড়ার লোভে বিস্তর শিকারী আজ প্রায় দেড়শো বৎসর ধরিয়া নানা দেশে ইহাদের মারিয়া উজাড় করিয়া ফিরিতেছে। মানুষের শখের জন্য কত লক্ষ লক্ষ বীভার যে প্রাণ দিয়াছে তাহার আর সংখ্যা হয় না। এখনো যে ইহারা পৃথিবী হইতে লোপ পায় নাই, ইহাই আশ্চর্য।

সন্দেশ—অগ্রহায়ণ, ১৩২৫

গ্লাটন

বীভারের কথা বলিয়াছি কিন্তু বুদ্ধিমান জীবের কথা বলিতে গেলে আর-একটি জন্তুর কথা বলিতে হয় তাহার নাম গ্লাটন। চুরি-বিদ্যায় ফাঁকি-বিদ্যায় খাওয়া-বিদ্যায় এবং নানা-রকম ধূর্ত-বিদ্যায় ইনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। শীতের দেশে যাহারা নানারকম দামী চামড়া সংগ্রহের জন্য বীভার প্রভৃতি জন্তু মারিয়া ফেরে, তাহারা এই গ্লাটনকে যেমন ভয় করে, এমন আর কাহাকেও নয়। এই গ্লাটন যেখানে দেখা দেয় সেখানে শিকারীর ব্যবসা মাটি। কত কৌশলে কত কষ্ট করিয়া শিকারীরা ফাঁদ পাতে আর গ্লাটন আসিয়া ফাঁদে পড়া জন্তু-গুলিকে খাইয়া সব ফাঁদ নষ্ট করিয়া চলিয়া যায়। সে নিজে কখনো ফাঁদে পড়িবে না, কিন্তু ফাঁদ নষ্ট করিতে তাহার মতো ওস্তাদ আর নাই। যখনি দেখা যায় ফাঁদগুলিকে টানিয়া ঘাঁটিয়া সব লণ্ডভণ্ড করা হইয়াছে, তখনি শিকারীরা বুঝিতে পারে গ্লাটন আসিয়াছে। এই গ্লাটনকে না মারা পর্যন্ত শিকারীর আর নিস্তার নাই। সে যতদিন থাকিবে ততদিন ফাঁদের সমস্ত শিকার খালি তাহারই পেটে যাইবে। ফাঁদকে সে গ্রাহ্য করে না, কারণ ফাঁদের মর্ম সে ভালো করিয়াই জানে। সে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফাঁদ বাহির করে আর ফাঁদের সুতা কাটিয়া স্প্রিং সরাইয়া কাঠি নড়াইয়া তাহাকে একেবারে নষ্ট করিয়া রাখে। সুতরাং শিকারীরা অনেক সময়েই সে স্থান ছাড়িয়া বহু দূরে গিয়া আবার নূতন করিয়া ফাঁদ পাতিতে বাধ্য হয়। তাহাতেও সকল সময়ে নিস্তার নাই; কারণ শিকারীর ফাঁদ হইতে শিকার চুরি করিয়া খাইবার সহজ সুযোগটা ইহারা ছাড়িতে চায় না। তাই একবার কোনো শিকারীর সন্ধান পাইলে ইহারা তাহার সঙ্গ ছাড়িতে চায় না, গোপনে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চেষ্টা করে।

একবার একটা গ্লাটন প্রায় একমাস ধরিয়া এক শিকারীকে এইরকম জ্বালাতন করিয়া-ছিল। শিকারী প্রতিদিন পশমী নেউল ধরিবার জন্য ঝোপের মধ্যে দশ-বিশটা করিয়া ফাঁদ পাতিয়া রাখিত, আর প্রতিদিনই আসিয়া দেখিত চারিদিকে গ্লাটনের পায়ের দাগ আর ফাঁদ-গুলি ভাঙা। তাহাতে দু-চারটি শিকার যাহা ধরা গিয়াছিল তাহাদের কিছু কিছু টুকরা মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। নানারকম কায়দা করিয়া নানারকম নূতন ফাঁদ বসাইয়াও সেই একই-রকম ব্যাপার চলিতে লাগিল। তখন শিকারী নেউল ছাড়িয়া গ্লাটন ধরিবার ফাঁদ বসাইল। একটা ঝোপের মধ্যে দরজার মতো খানিকটা ফাঁক, তাহার পিছনে একটা কাঠির আগায় মাংস গাঁথা। সেই মাংস খাইতে গেলেই কাঠিতে টান পড়ে আর স্প্রিং ছুটিয়া আপনা হইতেই দরজা আটকাইয়া যায়। কিন্তু গ্লাটন তাহাতে ভুলিবার পাত্র নয়। দরজাটি দেখিয়াই সে আর সে-মুখো হয় নাই—সে ঘুরিয়া ঝোপের পিছন দিক হইতে কাঠ সরাইয়া কাঠিসুদ্ধ মাংসটাকে বাহির করিয়া খাইয়া ফেলিল। তার পর শিকারী খোলা বরফের উপর এক-টুকরা মাংস বসাইয়া তাহার সঙ্গে খানিকটা সুতা দিয়া একটা বন্দুক এমন কৌশলে আটকাইয়া দিলেন যে মাংসটাকে খাইতে গেলেই সুতায় টান পড়িয়া বন্দুক ছুটিয়া যায়। বন্দুকটা একটা

গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকানো। পরের দিন শিকারী গিয়া দেখে যে মাংসের চারিদিকে গ্লাটনের পায়ের দাগ, কিন্তু সে মাংসটুকু ছোঁয় নাই। শিকারী আরো বেশি মাংস দিয়া ভাবিল, অমন পেটুক জন্তু কি আর মাংসের লোভ বেশিক্ষণ সামলাইতে পারে? পরদিন সকালে দেখা গেল মাংসও খাইয়াছে, বন্দুকও ছুটিয়াছে কিন্তু গ্লাটন মরে নাই। সে গাছের গুঁড়ির আড়ালে থাকিয়া সতা টানিয়া ছিঁড়িয়াছে। তাহাতে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া বোধ হয় সে ভয় পাইয়া পলাইয়াছিল কিন্তু পায়ের দাগ দেখিয়া বোঝা যায় যে সে পরে আবার আসিয়া মাংসটা খাইয়া গিয়াছে। তখন শিকারীর জেদ চড়িয়া গেল। সে ভাবিল যেমন করিয়া হউক এই হতভাগাটাকে মারিতেই হইবে। এই ভাবিয়া সে মাটিতে মাংস রাখিয়া জ্যোৎস্নারাত্রে বন্দুক হাতে করিয়া একটা গাছের উপর বসিয়া রহিল। কিন্তু সে রাত্রে আর গ্লাটনের দেখাই পাওয়া গেল না। শীতের রাত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া শিকারী যখন তাহার কাঠের তাঁবুতে ফিরিয়া আসিল, তখন সে দেখিল যে তাঁবুর জিনিসপত্র সব উলটপালট, আর অনেক জিনিস চুরি হইয়া গিয়াছে। তাঁবুর বাহিরে কেবল গ্লাটনের পায়ের দাগ। তার পর অনেক কষ্টে চারিদিকে নানা স্থান হইতে চোরাই জিনিস সব সংগ্রহ করিয়া শিকারী সেই যে সেখান হইতে একেবারে সরিয়া পড়িল, ত্রিশ মাইল পথ পার না হইয়া আর নূতন ফাঁদ পাতিল না।

গ্লাটনের নামে এই দুটি মস্ত অপবাদ—সে চোর এবং পেটুক! সে যে পেটুক তাহার আর অন্য প্রমাণ দরকার নাই—এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে ইংরাজিতে 'গ্লাটন' (Glutton) কথাটার অর্থই হয় পেটুক। দেখিতে কতকটা শেয়ালের মতো, চেহারাটাও তাহার চাইতে বড়ো নয়; কিন্তু সে যে পরিমাণ আহার করে তাহাতে একটা বাঘেরও বেশ পরিতোষ করিয়া নিমন্ত্রণ খাওয়া চলে। আর চোর হওয়ার কথাটা তো আগেই শুনিয়াছ। সে যে কিরকম চোর তাহা চুরির নমুনাতেই বোঝা যায়। যে জিনিস সে খায় না, যাহার ব্যবহার সে জানে না এবং যে জিনিসে তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এমন সব জিনিসও সে সুযোগ পাইলেই সরাইয়া ফেলে। ছাতা জুতা টুথব্রাশ কাগজ কলম হইতে আরম্ভ করিয়া হাঁড়িকুড়ি-ঘটিবাটি বা উনানের লোহার শিক পর্যন্ত চুরি করিতে সে ইতস্তত করে না।

গ্লাটনের আর-একটি অভ্যাস আছে, সেও কম অদ্ভুত নয়। হঠাৎ মানুষ বা অপরিচিত জন্তুকে দেখিলে সে খাড়া হইয়া দুই পায়ের উপর ভর দিয়া বসে এবং সামনের পা দুখানা চোখের উপরে এমনভাবে উঠাইয়া ধরে যে দেখিলে মনে হয় ঠিক যেন ভালো করিয়া পরখ করিবার জন্য চোখটাকে আড়াল দিয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরকম বুদ্ধি আর এই-সব অদ্ভুত রকম-সকম দেখিয়া সেদেশের লোকে অনেক সময়ে ভয় পায়—তাহারা বলে এই জন্তুটার চাল-চলন কেমন ভূতের কাণ্ড বলিয়া মনে হয়।

নরওয়ে দেশে ভালুক বা নেকড়ে বাঘ মারিতে পারিলে যে পুরস্কার পাওয়া যায়, গ্লাটন মারিলেও ঠিক সেই পুরস্কার। ইহাতে বুঝিতে পার যে এই ছোটো জন্তুটির অত্যাচারকে মানুষে কিরকম ভয় করে।

সন্দেশ—পৌষ, ১৩২৫

মানুষের নাকের প্রশংসা করতে হলে তিলফুলের সঙ্গে, টিয়াপাখির ঠোঁটের সঙ্গে গরুড়ের নাকের সঙ্গে তার তুলনা করে। কেউ কেউ আবার বলেন শুনেছি, 'বাঁশির মতো নাক'। কিন্তু মোটের উপর এ কথা বলা যায় যে, সকলের নাকেরই মোটামুটি ছাঁদটি সেই একঘেয়ে রকমের ; দো-নলা সুড়ঙ্গের মতো। কারও নলদুটি সরু কারও বা মোটা, কারও চ্যাপটা, কারও উঁচু—কারও মাঝখানে ঢালু, কারও আগাগোড়াই ঢিপি—এইরকম সামান্য উনিশ-বিশ যা একটু তফাত হয়। কারও কারও নাক যদি হাতির শুঁড়ের মতো লম্বা হত কি গণ্ডারের মতো খড়্গধারী হত, অথবা আর কোনো উদ্ভট জানোয়ারের মতো হত, তা হলে বেশ একটু রকমারি হতে পারত। সে রকমারি যে বড়ো সামান্য নয় তাই বোঝাবার জন্য এখানে কতক গুলি জানোয়ারের চেহারা দেখানো হল। এদের প্রায় সকলকেই বোধহয় তোমরা চেন।
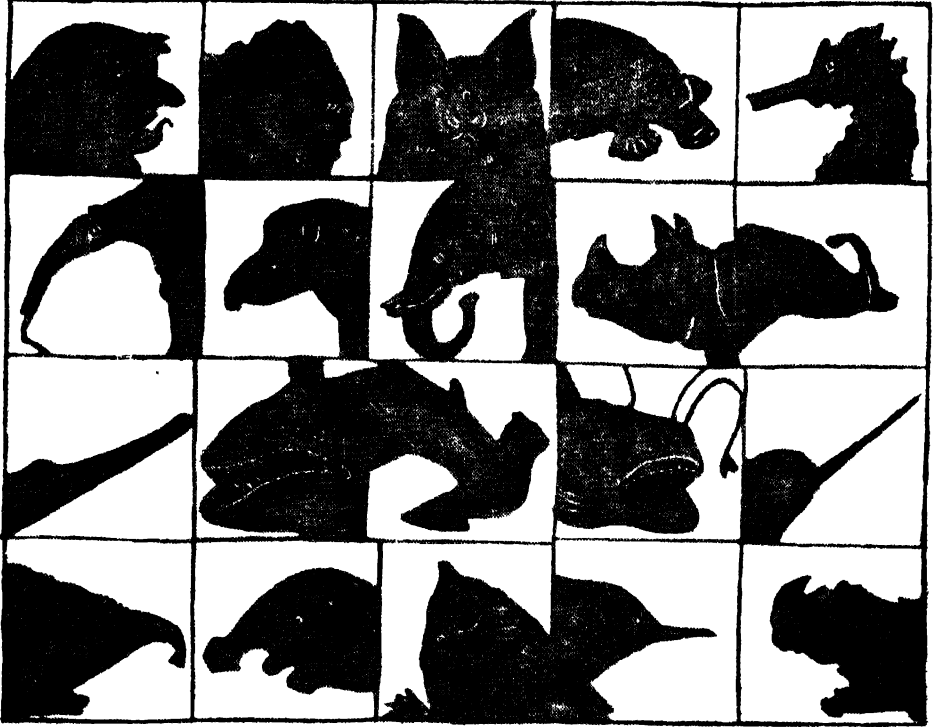
হাতির শুঁড়টাই যে তার নাক তোমরা নিশ্চয়ই জান। হাতির পাশেই যে জন্তুটির নাম করা যায়, তার নাম টেপির ; এর নাকটিও শুঁড় হতে চেয়েছিল, কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারে নি। তার পাশেই দেখ পিঁপড়ে-খোরের ছবি। এরও একটা শুঁড় আছে কিন্তু সেটা শুধ নাক নয়, নাকমুখ দুই মিলে লম্বা হয়ে ওরকম হয়ে গেছে। কুমিরেরও ঠিক তাই। আর

উপরের ডানদিকে যে চোঙামুখ জন্তুটি দেখছ, তার পরিচয়ও তোমরা পেয়েছ ('সমুদ্রের ঘোড়া') নীচের দুরকমের ছুঁচো আছে, তার একটির বেশ স্পষ্টরকম শুঁড় গজিয়েছে, আর-একটি কেবল শুড়ে সন্তুষ্ট নয়, তার নাকের আগাটি হয়েছে ঠিক ফুলের মতো। এই শৌখিন ছুঁচোটির গায়ের গন্ধ কিন্তু ফুলের মতো একেবারেই নয়। তার চেয়ে জমকাল নাকের কথা যদি বলতে হয় তবে পুষ্পনাসা বাদুড়ের কথাটা নিতান্তই বলা উচিত। পর্দার পর পর্দা গোলাপফুলের পাপড়ির মতো সাজিয়ে তার উপরে যেন তিলক চন্দন এঁকে নাকটিকে তৈরি করা হয়েছে। এত ঘটা করে নাকের বাহার ফোটাবার উদ্দেশ্যটা কি, মুখের 'সৌন্দর্য' বাড়ানো না শত্রুকে ভয় দেখানো তা আমি জানি না।

পুষ্পনাসার এক পাশে হাঁসচঞ্চু, তার নাকমুখ হাঁসের ঠোঁটের মতো চ্যাপটা। আর একপাশে ম্যান্‌ড্রিল বাঁদর। শুধু এই ছবি দেখে যদি বিচার কর, তবে এর উপর নিতান্তই অবিচার হবে; কারণ এর রঙটিই হচ্ছে এর আসল বাহার। টকটকে লাল নাক, তার দু-পাশে নীলরঙের ঢিব্‌লি, তার উপর চমৎকার কারুকার্য—যারা কলকাতায় আছ তারা চিড়িয়াখানায় গেলেই একবার স্বচক্ষে দেখে আসতে পার। ম্যানড্রিলের পাশে নাকেশ্বর বানর। এর নাক সম্বন্ধে আর বেশি কথা বলবার দরকার নেই, ছবিতেই দেখছ কেমন ছোটোখাটো বেগুনের মতো নাকটি। বাঁদরের খাঁদা নাকের দুর্নাম সকলেই করে, কিন্তু এই নাকটি খাঁদা না হলেও তাতে তার সুনাম বাড়বে কিনা সন্দেহ।

ব্যাঙ যখন হাতির উপর রাগ করে বলেছিল "বড়ো যে ডিঙোলি মোরে"—তখন হাতি তাকে "থ্যাব্‌ড়ানাকী" বলে গাল দিয়েছিল। হাতির গালটা খুব লাগসই হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্যাঙের বংশেও যে সকলেরই থ্যাব্‌ড়া নাক, তা নয়। এমন ব্যাঙও আছে যাদের নাকটি চড়াই পাখির ঠোঁটের মতো দিব্যি চোখালো। (নীচের লাইনের মাঝের ছবি)

কোনো কোনো জন্তু আবার শুধু নাকটাকে নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। তারা নাকের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র জুড়ে বেড়ায়। গণ্ডারের খড়্গটি থাকে তার নাকের উপরে। আফ্রিকায় একরকম বরাহ আছে তার নাম বাবিরুসা, তার নাকের দুপাশে চামড়া ফুঁড়ে দুই জোড়া দাঁত শিঙের মতো উঁচু হয়ে থাকে। তলোয়ার মাছের নাকের ডগায় যে অস্ত্রটি বসানো থাকে তাতে বাস্তবিকই তলোয়ারের কাজ হয়। করাতি মাছের তলোয়ারটির গায়ে আবার করাতের মতো কাটা থাকে। বঁড়শিবাজ মাছের কথা শুনেছ—তারা নাকের আগায় বাঁকা ছিপের মতো লম্বা নোলক ঝুলিয়ে রাখে। উদ্দেশ্য, অন্য মাছকে ভুলিয়ে এনে তার ঘাড় ভেঙে খাওয়া।

কোনো কোনো জন্তুর নাকটা যে কোথায় সেটা হঠাৎ খুঁজে পাওয়াই শক্ত। তিমি মাছের মাথার উপর যেখানে তার চোখ থাকবার সম্ভাবনা মনে হয় সেখানে তার নাক থাকে। কাঁটালো গিরগিটির গা-ভরা উবড়ো খাবড়ো শিঙের মতো কাঁটার ঝোপ—তার মধ্যে তার নাক মুখ চোখ অনেক সময়েই বেমালুম লুকিয়ে থাকে। আর হাতুড়িমুখো হাঙরের চেহারা তো আগাগোড়াই উলটোরকম। একটা দুমুখো হাতুড়ির মতো তার মাথা, সেই হাতুড়ির দুই মাথায় দুটি চোখ। আর নাকটা হচ্ছে হাতুড়ির মাঝামাঝি—হাতুড়ির ডাণ্ডাটা যেখানে বসানো থাকে সেইখানে।

এখন তোমরা বল, এর মধ্যে কার নাকের বাহার বেশি।

সন্দেশ—পৌষ, ১৩২৫

নিশাচর

নিশাচর বলে তাদের যারা রাত জেগে চলাফেরা করে, অর্থাৎ আহার খোঁজে। নিশাচর জন্তুদের মধ্যে একটির নাম তোমরা সকলেই বলতে পারবে, সেটি হচ্ছে 'প্যাঁচা'।

নিশাচরেরা রাত্রে আহার করে কেন ? তার নানা কারণ আছে। প্রথমত যারা শত্রুর ভয়ে দিনের আলোতে বেরুতে সাহস পায় না, রাত্রে অন্ধকারে তাদের গা ঢাকা দিয়ে চলবার সুবিধা হয়। যেমন আফ্রিকার 'কাকাপো' অথবা 'প্যাঁচাটিয়া'। এদের ডানা ছোটো বলে ভালো করে উড়তে পারে না ; দিনের বেলা বেরোলেই অন্য পাখিরা ঠুকরিয়ে অস্থির করে তোলে। ইঁদুর জাতীয় নানারকম নিরীহ জন্তু আছে, তারাও একরকম শত্রুর ভয়ে সারাদিন লুকিয়ে থাকে, রাত্রে শিকারের খোঁজে বেরোয়।

কোনো কোনো জন্তু আছে তাদের শরীরের গঠন এমন যে তারা দিনের আলো, রোদ বা গরম সইতে পারে না। প্যাঁচার চোখ এমন অদ্ভুত যে সে আলোর দিকে ভালো করে তাকাতেই পারে না, সহজেই চোখ ঝল্‌সে যায়। সাপ ব্যাঙ প্রভৃতি যে-সব জন্তুর রক্ত ঠাণ্ডা, তারা রোদে বেরোলে শরীরের রস শুকিয়ে যায়। তাই তারা সারাদিন ঝোপে জঙ্গলে ছায়ার মধ্যে থাকতে চায়।

আর একদল নিশাচর আছে, যারা রাত্রে বেরোয় ভালোরকম শিকার জোটে বলে। বাঘ সিংহ প্রভৃতি বড়ো মাংস-খোর জন্তুরা এই কারণেই অনেক সময় নিশাচর হয়। সন্ধ্যার পর নানারকম পোকামাকড় বেরোয় তাই পোকা-খোর জন্তুরাও এ সময়ই খাবার আশায় ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যার সময় যে চামচিকারা বা 'নাকাটি' পাখিরা ব্যস্ত হয়ে আকাশময় ছুটাছুটি করে, সেটাও তাদের ভোজের আনন্দ। ভালো করে দেখলেই বোঝা যায় যে তারা উড়তে উড়তে পোকা ফড়িং খেয়ে বেড়াচ্ছে।

'লেমার' বা ক্ষুদে বানরদেরও অনেকেই এই দলের মধ্যে পড়ে। তারাও রাত হলেই পোকামাকড় খুঁজে বেড়ায়। রাত্রে আলোর কাছে টিকটিকির পোকা শিকারের উৎসাহ তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। রাত্রে আলো দেখে যত পোকা এসে জড়ো হয় দিনের বেলায় একসঙ্গে তত পোকা পাওয়া শক্ত। টিকটিকির ভোজটাও তাই সন্ধ্যার পরে জমে ভালো।

নিশাচর জন্তুদের প্রায় সকলের মধ্যেই একটি অভ্যাস দেখা যায়—সেটি হচ্ছে নিঃশব্দে চলা। প্যাঁচার শরীরটি তো নেহাত ছোটো নয়, সে উড়তেও পারে বেশ ; অথচ উড়বার সময় তার ডানা ঝাপটের শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না। রাত্রে অন্ধকারে দেখতে হয় বলে তাদের চোখ দুটোও তেমনি করে তৈরি। প্রায়ই দেখা যায় নিশাচর জন্তুদের চোখ প্যাঁচার মতো বড়ো আর গোল-গোল হয়। সেইজন্য অনেক সময় তাদের দেখতেও অদ্ভুত দেখায়। যে-সব ক্ষুদে বানরদের কথা আগে বলেছি, তাদেরও চোখ মুখ আর চলাফেরা এমন অদ্ভুত গোছের হয় যে দেখলে অনেক সময় ভয় হয়। আরেক রকম বানর আছে, তার নাম 'টার্সীয়ের'। যেদেশে এর বাড়ি সেখানকার লোকেরা একে 'ভুত বানর' বলে। এর সমস্ত

কপালজোড়া বড়ো-বড়ো চোখ, আর রোগা রোগা কাঠির মতো হাত-পা। গাছের আড়াল থেকে হঠাৎ উঁকি মেরেই রবারের মতো নিঃশব্দে লাফ দিয়ে আবার দশ হাত দূর থেকে উঁকি মারা—এই হচ্ছে এর চাল-চলনের ধরন। কারও কোনো অনিষ্ট করে না, কেবল পোকামাকড় খেয়ে থাকে অথচ লোকে মিছামিছি তাকে ভূতের মতো ভয় করে। তার একটা কারণ সে নিশাচর।

আমাদের পুরাণে রাক্ষসদের নামও নিশাচর। তারাও নাকি দিনের আলোর চাইতে রাত্রের অন্ধকারটাই বেশি পছন্দ করে। আর চোর ডাকাত যারা পরের বাড়িতে সিঁদ কেটে ঘুমন্ত মানুষের সর্বনাশ করে, তাদেরও 'শিকার' করবার সুবিধা হয় রাত্রে। আজকালকার সভ্য মানুষ রাতকে দিন করে রাখে। রাত্রেও হাজার আলো জ্বালিয়ে দিয়ে তার কলকারখানা, রেল, স্টিমার চালাতে হয়। সুতরাং মাঝে মাঝে ভদ্র মানুষকেও কাজকর্মের জন্য নিশাচর হতে হয়। ভোরবেলা যে খবরের কাগজটি পড়, তার জন্যে যে কত লোকের রাত জেগে খাটতে হয় তা কখনো ভেবে দেখেছ কি? আর রেলে স্টিমারে ড্রাইভার গার্ড প্রভৃতি কত-জনকে যে দিনের পর দিন রাতমজুরি খাটতে হয়, তারাও একরকম নিশাচর বৈকি!

সন্দেশ—মাঘ, ১৩২৫

বেবুন

যে-সব বানরের মুখ কুকুরের মতো লম্বাটে, যারা চার পায়ে চলে, যাদের ল্যাজ বেঁটে আর গালের মধ্যে থলি আর পিছনের দিকটায় কাঁচা মাংসের মতো ঢিপি, তাদের নাম বেবুন। বেবুনের আসল বাড়ি আফ্রিকায়, কেউ কেউ এশিয়াতেও থাকে। বেবুন বংশের অনেক শাখা- হলদে বেবুন, লালমুখো বেবুন, ঝুঁটিওয়ালা কালো বেবুন, চিত্রমুখ সঙ-বেবুন বা ম্যানড্রিল, চাকমা বেবুন, ড্রিল বেবুন ইত্যাদি। কিন্তু সকলেরই মুখের ভঙ্গি চাল-চলন ও স্বভাব প্রায় একইরকম। উঁচু উঁচু ধারালো দাঁত, বদ্‌খত মেজাজ আর তার চাইতেও বদ্‌খত চেহারা। সমস্ত জানোয়ারদের মধ্যে বিদঘুটে চেহারা যদি কারও থাকে তবে সে ঐ ম্যান-ড্রিলের। টকটকে লাল নাক, খাঁজকাঁটা নীল গাল, ভেংচিকাটা ভ্রূকুটি মুখ, সব মিলে অপূর্ব চেহারাখানা হয়।

আফ্রিকার পাহাড়ে জঙ্গলে বেবুনেরা দল বেঁধে লুকিয়ে থাকে। বল, বুদ্ধি, ভরসা, এই তিন জিনিসের জোরে সে নীচের জমিতে নেমে এসে চাষার ক্ষেতের উপর অত্যাচার করে ফল শস্য খেয়ে পালায়। তাদের দল বাঁধবার কায়দা, আর পথঘাট পাহারা দেবার ব্যবস্থা এমন চমৎকার, আর এমন হঠাৎ এসে লুটপাট করে তারা ফস্ করে পালায় যে, চাষারা তাদের সঙ্গে কিছুতেই পেরে ওঠে না। পালাবার সময় বেবুনেরা কখনো দলের কাউকে ফেলে যায় না- যদি একজন বিপদে পড়ে অমনি পালের গোদারা তাকে সাহায্য করবার জন্য তেড়ে আসে। একবার একটা বাচ্চা বেবুনকে কতগুলো কুকুরে ঘেরাও করে ফেলেছিল, কিন্তু একটা ধাড়ি বেবুন এসে সেই কুকুরের দলের মধ্যে ঢুকে, এমনি দু-তিন ভেংচি দিয়ে তাদের

মুখের সামনে থেকেই সেই বাচ্চাটাকে কেড়ে নিয়ে গেল যে কুকুরগুলো ভয়ে কিছুই করতে সাহস পেল না—দূরে শিকারীরা পর্যন্ত তার তেজ দেখে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

বিপদে পড়লে বেবুনেরা পিছনের পায়ে ভর করে খাড়া হয়ে বসে—শত্রুকে হাতের কাছে পেলেই নখ দিয়ে খামচে টেনে মুখের কাছে নিয়ে এসে, তার পরেই প্রচণ্ড এক কামড়। কামড়ের জোরে হাড়গোড় পর্যন্ত অনায়াসেই গুঁড়িয়ে দিতে পারে। নখ দাঁতই হচ্ছে বেবুনের প্রধান অস্ত্র—কিন্তু দরকার হলে তারা পাথর ছুঁড়তেও জানে। বড়ো-বড়ো পাথর গড়িয়ে শত্রুর মাথায় ফেলতে তারা খুব ওস্তাদ।

সন্দেশ—আষাঢ়, ১৩২৬

সিংহ শিকার

আফ্রিকা হল সিংহের দেশ। ইউরোপ আমেরিকার বড়ো-বড়ো শিকারীরা সেখানে বন্দুক নিয়ে দলেবলে সিংহ শিকার করতে যান। তাঁরা মনে করেন, যতরকম শিকার আছে তার মধ্যে সিংহ শিকার খুব একটা বড়ো ব্যাপার; কারণ তাতে শিকারীর সাহস এবং বাহাদুরির পরিচয়টা ভালো করেই পাওয়া যায়। যে শিকারী সিংহ মেরেছে লোকে তাকে ওস্তাদ শিকারী বলে মানে। সিংহ শিকারের বিপদ খুব বেশি। আজকাল বন্দুকের এত যে উন্নতি হয়েছে, তবও এখনো কত শিকারী সিংহের হাতে প্রাণ হারান। তিন-চারটা সাংঘাতিক গুলি খাবার পরেও একশো গজ দৌড়ে এসে সিংহ তার শিকারীকে শিকার করেছে, এমন ঘটনার কথাও শোনা যায়। তার মধ্যে একটি গুলি সিংহের হৃৎপিণ্ড ফুটো করে বেরিয়ে গিয়েছিল, তবু মরবার আগে সে তার মরণকামড়টি না দিয়ে ছাড়ে নি। তা হলে ভাব সিংহ কি জিনিস!

এমন যে সিংহ তাকে আফ্রিকার 'মাসাই' ও 'নান্দি' জাতের নিগ্রোরা বল্লম দিয়ে শিকার করে থাকে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি এবং অসাধারণ মনস্বী লোক বলে সকল দেশে পরিচিত, কিন্তু শিকারী হিসাবেও তাঁর প্রতিপত্তি বড়ো কম নয়। তিনি নান্দিদের সিংহ শিকার স্বচক্ষে দেখে তার যে বর্ণনা লিখে গিয়েছেন, তা পড়লে অবাক হতে হয়।

নান্দিদের শিকার দেখবার জন্য তিনি একদিন আফ্রিকার জঙ্গলে দলেবলে সিংহের খোঁজে বেরিয়েছিলেন। কথা ছিল, সিংহ পাওয়া গেলে নান্দিরা শিকার করবে; সাহেবরা কেউ সে শিকারে যোগ দেবেন না, কিছু বলতে পারবেন না; তাঁরা কেবল দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখবেন। ঝোপ জঙ্গল ঘেঁটে অনেক খোঁজার পর প্রকাণ্ড এক সিংহ পাওয়া গেল। তেমন সিংহ সচরাচর মেলে না। রুজভেল্ট লিখেছেন, সিংহটাকে দেখে তাঁদের শিকার করবার লোভ জেগে উঠছিল, কিন্তু তা হলে তাঁদের কথা রক্ষা হয় না, আর নান্দিদের শিকারটাও দেখা হয় না; তাই তাঁরা দলেবলে সিংহটাকে ঘিরে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। নান্দিরা একটু পিছনে পড়েছিল, দেখতে দেখতে তারা এসে হাজির হল। এক হাতে বল্লম, আর এক হাতে ঢাল—বিশাল দেহটি যেন কালো পাথরে

তৈরি। মুখে দয়ামায়া দ্বিধা ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। সিংহ পাওয়া গিয়েছে শুনে তাদের আনন্দ দেখে কে? তারা এক-এক পা চলে আর এক-একটি বিরাট লাফ দেয়। দেখতে দেখতে সিংহের ঝোপটিকে তারা নিঃশব্দে ঘেরাও করে ফেলল।

সিংহটাও এতক্ষণ চুপ করে ছিল না। সে ঝোপের আড়ালে বসে ছিল, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দেখল কতগুলো মানুষ তার দিকে এগিয়ে আসছে। তারা সব ঢালের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বল্লম বাগিয়ে দাঁড়াচ্ছে। এক-একটি ঢালের উপর দিয়ে এক-এক জোড়া কালো চোখ যমের ভ্রূকুটির মতো তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে বেশ বুঝল যে তার জন্যই এত সব আয়োজন, তার গর্জনে সারা জঙ্গল কেঁপে উঠতে লাগল। তার ঘাড়ের কেশর খাড়া হয়ে দাঁড়াল, তার মুখখানা ভীষণভাবে বিকৃত হয়ে গেল, তার ল্যাজের বাড়িতে সমস্ত ঝোপটা চঞ্চল হয়ে উঠল। সে একবার এপাশ ফিরল একবার ওপাশ ফিরল, ডাইনে তাকাল বাঁয়ে তাকাল, কোনদিকে লোক কম দেখে তার পর তীরের মতো সেইদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

একটি লোকও সেদিক থেকে সরল না। সব ঢাল বাগিয়ে বল্লম তুলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। দুপাশ থেকে শিকারীরা বল্লম হাতে দৌড়ে এল, দলের যে নেতা সে লাফ দিয়ে দৌড়ে সকলের সামনে গিয়ে পড়ল। তার হাত থেকে বল্লমখানি বিদ্যুতের মতো ছুটে গিয়ে সিংহের গায়ের মধ্যে বিঁধে গেল। সিংহটাও আঘাত লাগামাত্র তার সামনে যাকে পেল তাকেই আক্রমণ করে ধরল। সে লোকটাও তার জন্য প্রস্তুত ছিল, তার বল্লমের এক ঘায়ে সে চক্ষের নিমেষে সিংহটাকে একেবারে এপার ওপার ফুঁড়ে ফেলল—একদিকের ঘাড়ের মধ্যে ঢুকে বল্লমের আগাটা অন্য দিকে পেটের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিংহটা তার ঢালের উপর দিয়ে প্রচণ্ড এক থাবা মেরে, তার ঘাড়ের মধ্যে নখ দাঁত বসিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলল। আর অমনি চার দিক থেকে বল্লমের পর বল্লম আগুনের ঝলকের মতো ছুটে এসে সিংহটাকে একেবারে অস্ত্রে অস্ত্রে গেঁথে ফেলল। এর মধ্যেও কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে আরো একটি শিকারীকে জখম করতে ছাড়ে নি। মরবার সময় একটা বল্লমকে সে এমন জোরে কামড়িয়ে ধরেছিল যে, লোহার বল্লমটা উলটে মুচড়ে বঁড়শির মতো বেঁকে গিয়েছিল। তার পর নান্দিদের উল্লাস দেখে কে! খানিকক্ষণ পর্যন্ত সিংহের চারি দিকে তাদের চীৎকার আর বিজয় নৃত্যের ঘটা চলল। সুখের বিষয়, আহত শিকারী দুজনেই বেঁচে উঠেছিল।

সিংহের তেড়ে-আসা থেকে এত কাণ্ড শেষ হওয়া পর্যন্ত দশ সেকেণ্ডও সময় লাগে নি। সিংহের আক্রমণ, শিকারীর অস্ত্র বৃষ্টি, আঁচড় কামড় হুড়াহুড়ি আঘাত যন্ত্রণা ও মৃত্যু, ওর মধ্যেই সব এক ঝাপটায় শেষ! সিংহটা যখন পড়ল, তখন তার অবস্থাটি হয়েছিল ঠিক ভীষ্মের শরশয্যার মতো।

সন্দেশ—ভাদ্র, ১৩২৬

আলিপুরের বাগানে

আলিপুরের চিড়িয়াখানায় আমাদের একটি বন্ধু আছেন। আমরা যখনই আলিপুর যাই অন্তত একটিবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ভুলি না। দেখা করবার সময় শুধু হাতে যাওয়াটা ভালো নয়, তাই বন্ধুর জন্য প্রায়ই কিছু উপহার নিয়ে যাই। তিনিও তাঁর সাধ্যমত নানারকম তামাশা কসরত ও মুখভঙ্গি দেখিয়ে আমাদের আপ্যায়িত করেন।

অনেকে চিড়িয়াখানায় গিয়ে গোড়া থেকেই বাঘের ঘরটা দেখবার জন্য ব্যস্ত হন। সাপ, কুমির, উটপাখি, গণ্ডার আর হিপোপটেমাস—কেউ কেউ এঁদেরও খুব খাতির করে থাকেন। কিন্তু যে যাই বলো বাগানে ঢুকতে না ঢুকতেই আমাদের মনটা সকলের আগে বলতে থাকে, বন্ধুর বাড়ি চল্, বন্ধুর বাড়ি চল্। বন্ধুর সঙ্গে কেন যে আমাদের এত ভাব, তা যদি শুনতে চাও, তা হলে তাঁর নামের পরিচয়, গুণের পরিচয়, বিদ্যার পরিচয়, সব তোমাদের শুনতে হয়।

বন্ধুটির নাম হচ্ছে শ্রীযুক্ত ওরাংচন্দ্র ওটান। আফ্রিকা নিবাসী, আলিপুর প্রবাসী। অমন অমায়িক চেহারা, অমন ঢিলাঢালা প্রশান্ত স্বভাব অমন ধীর গম্ভীর মেজাজী চাল, সমস্ত আলিপুর খুঁজে আর কোথাও দেখবে না।

কত যে ভাবনা আর কত যে হিসাবপত্র সর্বদা তাঁর মাথার মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে, তাঁর ঐ প্রকাণ্ড কপালজোড়া হিজিবিজি রেখাগুলো দেখলেই তা বুঝতে পারবে। যখন তিনি চিৎপাত হয়ে শুয়ে, মুখের মধ্যে আঙুল দিয়ে, পেট চুলকাতে থাকেন, 'আর তাঁর কালো কালো হ্যাংলা মতন চোখ-দুটি মিট্‌মিট্ করে তাকিয়ে থাকে, তখন যদি তাঁর মনের মধ্যে কান পেতে শুনতে পারতে, তা হলে শুনতে সেখানে অনর্গল হিসাব চলছে—'আর চারটে কলা, আর দু ঠোঙা বাদাম আর কতগুলো বিস্কুট, আর ঐ নাম-জানি না গোল-গোল-মতন অনেকখানি' —ইত্যাদি। যখন তিনি খাঁচার ছাত থেকে গরাদ ধরে অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো ঝুলতে থাকেন আর দুলতে থাকেন—যেন সংসারের কোনো কিছুতে তাঁর মন নেই—তখন যদি তাঁর মনের কথা শুনতে, তা হলে শুনতে পেতে, তিনি কেবলই ভাবছেন, কেবলই ভাবছেন, 'এই লোকটার পাগড়ি নাহয় ঐ লোকটার চাদর, নাহয় এই সাহেবটার টুপি, নাহয় ঐ বাবুটার ছাতা—নেবই নেব, নেবই নেব।'

একদিন আমরা চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখি, ওরাংবাবু দোলনা বেঁধে দোল খাচ্ছেন। কোত্থেকে কি করে, কার একটা পাগড়ি তিনি আদায় করেছেন, আর সেইটাকে ছাতের গরাদের উপর থেকে ঝুলিয়ে অপূর্ব দোলনা তৈরি হয়েছে। তিনি দুহাতে তার দুই মাথা ধরে মনের আনন্দে দুলছেন। তাঁর মুখখানা যেন সদানন্দ শিশুর মতো, নিজের বাহাদুরি দেখে নিজেই অবাক।

হঠাৎ তাঁর কি খেয়াল হল, পাগড়ির একটা দিক ছেড়ে দিয়ে তিনি গেলেন মাথা চুলকোতে। অমনি পাগড়ির একটা মাথা ভারী হয়ে নেমে পড়ল, আর আরেক মাথা আলগা পেয়ে সুড়ুৎ করে গরাদের উপর দিয়ে পিছলে বেরিয়ে এল। ব্যাপারখানা বুঝবার আগেই ওরাংবাবু

মেঝের উপর চিৎপাত। আর কেউ হলে অপ্রস্তুত হত, কিন্তু বন্ধু আমাদের অপ্রস্তুত হবার পাত্রই নন। তিনি পড়েই একটা ডিগবাজি খেয়ে উঠলেন আর এমনভাবে ফিরে দাঁড়ালেন যেন আগাগোড়া তিনি ইচ্ছা করেই আমাদের তামাশা দেখাচ্ছিলেন। তার পর অনেকখানি ভেবে আর অনেক বুদ্ধি খরচ করে আবার তিনি দোলনা খাটালেন। কাপড়টাকে গরাদের উপর দিয়ে গলিয়ে তার দুটো মাথাকেই যে ধরে রাখতে হয়, এটা বুঝতে তাঁর কিছুক্ষণ সময় লেগেছিল। তিনি পাগড়িটাকে ঝুলিয়ে এক মাথা ধরে টানেন, আর হুস্ করে দোলনা খুলে আসে, তাতে প্রথমটা বেচারার ভারি ভাবনা হয়েছিল।

আমাদের বন্ধুটির নানারকম বিদ্যা আছে। তিনি পান খেতে ভারি ভালোবাসেন। পানটা হাতে দিলে, আগে সেটাকে খুলে পরীক্ষা করে দেখেন, তার পর হাতের মুঠোর মধ্যে মুড়ে টপ্ করে মুখের মধ্যে দিয়ে ফেলেন। যখন পান খেয়ে তাঁর মুখখানা লাল হয়, আর গাল বেয়ে পানের রস পড়তে থাকে, তখন তিনি মাটির মধ্যে থুতু ফেলেন, আর লাল রঙের থুতু দেখে খুশি হয়ে তাকিয়ে থাকেন। একদিন গিয়ে দেখি, তিনি জবাফুলের মালা গলায় দিয়ে অত্যন্ত লাজুক ছেলের মতো চুপচাপ করে বসে আছেন। আমাদের দেখে তাঁর কি খেয়াল হল জানি না তিনি ফুলগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেললেন। শুনেছি, তিনি নাকি লুকিয়ে সিগারেট খেতেও শিখেছেন, আর সুযোগ পেলে মালীদের হুঁকোতেও দু-এক টান দিতে ছাড়েন না।

বন্ধু গান-বাজনার সমজদার কিনা, অথবা 'সন্দেশ' পড়তে পারেন কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ পাই নি, কিন্তু তিনি যে সুগন্ধ জিনিসের কদর বোঝেন তার পরিচয় অনেক পেয়েছি। তুলোয় করে খানিকটা এসেন্স দিয়ে দেখেছি, সেই তুলোটুকু নাকে ঠেকিয়ে শুঁকতে শুঁকতে আরামে তাঁর দুই চোখ বুজে আসে, জোরে জোরে নিশ্বাস টানতে টানতে, তিনি চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়েন। অনেকক্ষণ শুঁকে শুঁকে তার পর তুলোটাকে যত্ন করে তুলে রেখে দেন, আর থেকে থেকে ফিরে এসে তার গন্ধ শোঁকেন। একবার আমরা তামাশা দেখবার জন্য তুলোয় করে খানিকটা ঝাঁঝালো আমোনিয়া দিয়েছিলাম। সেটাকে শুঁকে যেরকম অদ্ভুত চোখমুখের ভঙ্গি তিনি করেছিলেন, আর যেরকম করে বার-বার হাতে আর রেলিঙে নাক ঘষেছিলেন সে কথা মনে হলে আজও আমাদের হাসি পায়। একবার শুঁকেও তাঁর কৌতূহল মেটে নি, খুব সাবধানে দূর থেকে আরো দু-চার বার তুলোটাকে শুঁকে, আর দু-চারবার চমৎকার মুখভঙ্গি করে, তিনি সেটাকে তাঁর প্রতিবেশী এক বেবুনের ঘরের মধ্যে ফেলে দিলেন। সেই হতভাগা বেবুনটাও কথা নেই বার্তা নেই, তুলোটুকু নিয়েই ঝপ্ করে মুখে দিয়ে ফেলেছে। তার পর যদি তার দুরবস্থা দেখতে! অনেকক্ষণ পর্যন্ত নাক রগড়িয়ে হাঁচতে হাঁচতে, আর হাঁ করে জিভের জল ফেলতে ফেলতে বেচারা অস্থির।

এই বেবুনটার সঙ্গে ওরাং ওটানের একটুও ভাব নেই। আরেকবার ওরাং আমাদের কাছ থেকে একটা লাঠি আদায় করেছিলেন। লাঠিটা পেয়েই তিনি ব্যস্তভাবে বাইরে গিয়ে, রেলিঙের ফাঁক দিয়ে তাঁর নিশ্চিন্ত প্রতিবেশীর ঘাড়ের উপর এক খোঁচা। তখন যদি বেবুনের রাগ দেখতে! আমরা সেবার দুই খাঁচার মাঝখানে কলা গুঁজে দিয়ে, বেবুন আর ওরাঙের

ঝগড়া দেখেছিলাম। বোকা বেবুনটা যতক্ষণে আঁচড় কামড় আর কিল ঘুঁষি চালাতে থাকে, ততক্ষণে ওরাংবাবু গম্ভীরভাবে ঘাড় গুঁজে কলাটুকু বার করে নেন। কলাটি নিয়ে মুখে দিয়ে তার পর উল্লাস আর ভেংচি। বেবুনটা রাগে যতই পাগলের মতো হয়ে উঠতে থাকে, বন্ধুর ততই ফুর্তি বাড়ে।

এ-সব কথা কিন্তু চুপিচুপি খালি তোমাদের কাছেই বললাম। তোমরা আলিপুরের কর্তাদের কাছে কক্ষনো এ-সব বোলো না; তা হলে আমাদের বাগানে যাওয়া মুশকিল হবে

সন্দেশ—মাঘ, ১৩২৬

খাঁচার বাইরে খাঁচার জন্তু

বনের জন্তুকে ধরে যখন খাঁচায় পোরা হয় তখন তার যে কিরকম দুরবস্থা হয়, সেটা বেশ সহজেই বুঝতে পারি। কিন্তু খাঁচার জন্তু যখন হঠাৎ ছাড়া পেয়ে বাইরে এসে পড়ে তখন তার দুরবস্থাটিও এক-এক সময়ে বড়ো কম হয় না।

লণ্ডনের চিড়িয়াখানার একটা রেলিং দেওয়া বাগান-করা জমির মধ্যে কতগুলি হরিণ থাকত। সেই ছোট্টো জমিটুকুর মধ্যে নতুন ঘর তৈরি হবে, তাই মজুরেরা সেখানে কাঠের তক্তা এনে ফেলেছিল। একদিন একটা হরিণ সেই রাশি-করা কাঠের উপর চড়ে হঠাৎ কেমন করে এক লাফ দিয়ে রেলিঙের বাইরে গিয়ে পড়েছে। হরিণ পালাচ্ছে দেখে চিড়িয়াখানার লোকেরা সব ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল, কিন্তু হরিণ বেচারা ব্যস্ত হল তাদের চাইতে আরো অনেকখানি বেশি। যখন সে বুঝতে পারল যে রেলিঙের মধ্যে ফিরে যাবার আর কোনো উপায় নেই, তখন সে কোথায় যাবে ঠিক করতে না পেরে পাগলের মতো চিড়িয়াখানার বাগানময় কেবল ছুটোছুটি করতে লাগল। হরিণের দৌড় দেখে বাগানের যত জন্তু সবাই যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল। বাঘ সিংহ উঠে দাঁড়ালো, হরিণেরা বড়ো-বড়ো চোখ মেলে যে যার ঘরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। আর বাঁদরগুলো রেলিঙে চোখ ঠেকিয়ে চেঁচাতে লাগল আর রেলিং ধরে ঝাঁকাতে লাগল। অনেক হাঙ্গামের পর, শেষটায় সেই ঘেরা জমির দরজাটা খুলে দিয়ে হরিণটাকে সেইদিকে তাড়া করে নিতে, তখন সে নিজের পরিচিত আশ্রয়ে ঢুকে তার পর শান্ত হল।

এক টিয়াপাখির গল্প পড়েছিলাম; এক বাজিওয়ালার কাছে সে নানারকমের বোলচাল শিখেছিল। যখন তামাশা দেখবার জন্যে দলে দলে লোক এসে বাজিওয়ালার তাঁবুর ধারে ভিড় করত আর ঢুকবার জন্য ঠেলাঠেলি করত, তখন টিয়াপাখিটা চীৎকার করে বলত—"আস্তে! আস্তে! ঢের জায়গা আছে! মশায়রা অত ভিড় করবেন না।" একদিন টিয়াপাখির কি দুর্মতি হল, সে খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে উড়ে পালাল। কিন্তু পালাবে আর কোথায়? একে তো বেচারার অনেকদিন উড়বার অভ্যাস নেই, তার উপর খাঁচায় থেকে খাঁচাটার উপরেও কেমন মায়া হয়ে গেছে। তাই দু-একদিন এদিক-ওদিক লুকিয়ে থেকে সে আবার ঘুরে ফিরে সেই তাঁবুর কাছেই একটা গাছে এসে বসল। বাজিওয়ালা ততক্ষণে তাকে খুঁজে

খুঁজে শেষটায় তার আশা ছেড়ে দিয়ে বসেছে। এমন সময়ে উপরে ভারি একটা হৈ চৈ গোলমাল শুনে বাজিওয়ালা বেরিয়ে এসে দেখল যে গাছের উপর টিয়াপাখি বসে আছে আর যত রাজ্যের পাখি এসে তার চার দিকে গোলমাল করে, তাকে ঠুকরিয়ে আর পালক ছিঁড়ে অস্থির করে তুলেছে। টিয়াপাখি বেচারা ব্যাপার দেখে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, আর ক্রমাগত বলছে,—"আস্তে! আস্তে! ঢের জায়গা আছে! মশায়রা অত ভিড় করবেন না।" তখন বাজিওয়ালা খাঁচাটা এনে খুলে ধরতেই বেচারা তাড়াতাড়ি তার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

পাখি বা হরিণ বা কোনো নিরীহ জন্তু না হয়ে যদি বাঘ বা সিংহের মতো হিংস্র জন্তু এইরকম ভাবে ছাড়া পেত তা হলে ব্যাপারটা কিরকম হত? হাঙ্গেরীর বুদাপেস্ত শহরে একবার একটা সিংহ সার্কাসওয়ালার খাঁচা থেকে কেমন করে বেরিয়ে পড়েছিল! সিংহ বেরিয়ে পড়েছে দেখে সার্কাসের লোকেরা হৈ চৈ করে গোলমাল করে উঠতেই সিংহ বেচারা ভয়ে থতমত খেয়ে একেবারে সার্কাসের জমি পার হয়ে সড়ক পার হয়ে পাঁচিল টপ্‌কিয়ে এক খোলা ময়দানের মধ্যে গিয়ে হাজির। সেটা ছিল ছেলেদের খেলার মাঠ—তারা সেখানে বল খেলছে ছুটছে, লাফাচ্ছে, হুড়োহুড়ি করছে। সিংহ বেচারার তো চক্ষুস্থির, সে এরকম কাণ্ড আর কখনো দেখে নি। কোথায় আর যায়, সে অপ্রস্তুত হয়ে চুপচাপ সরে পড়বার চেষ্টা করছে এমন সময়ে পাঁচিল টপকিয়ে সিংহওয়ালা স্বয়ং এসে হাজির। সিংহ তখন ভিড়ের মধ্যে চেনা মুখ দেখে আশ্বস্ত হল, আর পোষা বেড়ালটির মতো তার মালিকের সঙ্গে আস্তে আস্তে খাঁচায় ফিরে চলল।

আর-একবার আমেরিকার জানোয়ারওয়ালা বোস্টক সাহেবের এক সিংহ খাঁচা থেকে পালিয়েছিল। শহরের রাস্তায় বেরিয়েই সে দেখে চারদিকে লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া চলাচল করছে, নিরিবিলি বসবার জায়গা কোথাও নেই। তাই দেখে পশুরাজের মেজাজ গেল খারাপ হয়ে, তিনি গোঁসা করে এক পুরানো ড্রেনের মধ্যে গিয়ে যে ঢুকলেন, আর কিছুতেই বেরোতে চান না। কুকুর লেলিয়ে, বন্দুক ছুটিয়ে, নানারকমে খোঁচাখুঁচি করেও কিছুতেই তাকে হটানো গেল না। এমন সময়ে হঠাৎ কার হাত থেকে একটা টিনের বালতি ঝন্‌ঝন্‌ করে গিয়েছে ড্রেনের মধ্যে পড়ে। সেই শব্দ শুনে চমকে উঠে পশুরাজ এক দৌড়ে একেবারে তাঁর খাঁচার মধ্যে! কারণ, খাঁচার মতো নিরাপদ জায়গা আর নেই।

সন্দেশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭

লড়াইবাজ জানোয়ার

এক-একজন মানুষ থাকে—কেবল সকলের সঙ্গে ঝগড়া বাধানো হচ্ছে তাদের স্বভাব। কথায় কথায় যেমন তাদের মুখ চলে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে হাতও চলে। জানোয়ারদের মধ্যেও এইরকম বদমেজাজী জীবের অভাব নাই। যে-সব বড়ো-বড়ো জন্তুরা পেটের দায়ে অন্য জন্তু শিকার করে বেড়ায়, আমরা তাদের বলি শ্বাপদ জন্তু, হিংস্র জন্তু। কিন্তু মানুষ যখন

নিরীহ ছাগল ভেড়া বা হাঁস মোরগের গলায় ছুরি মেরে তাদের মাংস কেটে খায় তখন আমাদের মনেই হয় না যে আমরাও ঐ হিংস্র জন্তুর দলে। জানোয়ারদের মতো সাংঘাতিক নখ দাঁত বা শিং আমাদের না থাকতে পারে কিন্তু তার বদলে যে-সব ধারালো অস্ত্র আমরা ব্যবহার করি তাতে আমাদের হিংসা-বৃত্তির পরিচয়টা খুব ভালোরকমেই পাওয়া যায়।

জানোয়ারদের মধ্যে যারা আমিষভোজী, অন্য জন্তুর মাংস না খেলে যাদের চলে না তারাই যে কেবল হিংস্র হয় তাও নয়। যারা নিরামিষ খায়, যেমন হাতি, গণ্ডার, বুনো মহিষ বা বরাহ—তাদের মেজাজও সব সময় নিরীহ তপস্বীদের মতো হয় না। আর সে মেজাজ বিগড়ালে বেশ বোঝা যায় যে সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারে তারাও কম ওস্তাদ নয়। মহিষের শিং, বরাহের দাঁত, গণ্ডারের খড়্গ অস্ত্র হিসাবে এগুলি কোনোটাই বড়ো কম নয়। হাতিরও দাঁত আছে—কিন্তু তার চাইতে তার ঐ গোদা পায়ের চাপুনিটাই বোধ হয় বেশি মারাত্মক।

ছোটোখাটো জন্তুদের আমরা হিংস্র জন্তু বলে বড়ো একটা গ্রাহ্য করি না, কারণ তাদের দিয়ে আমাদের বিশেষ কোনো অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু তাদের সমান জন্তুদের কাছে তারাও বড়ো কম ভয়ানক নয়। এমন যে নিরীহ কাঠবেড়ালী, যে সারাদিন অন্য জন্তুর ভয়ে ভয়ে থাকে, কোথাও একটু শব্দ পেলেই চমকিয়ে ছুটে পালায়, ছোটো-ছোটো পাখির বাসায় ডিমের সন্ধান পেলে সেও একজন রীতিমতো অত্যাচারী হয়ে উঠতে জানে। হঠাৎ তাড়া খেলে বা ভয় পেলে ইঁদুর বা ছুঁচোর মতো ছোটো জন্তুও বেশ মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। সেরকম অবস্থায় তারা মানুষকেও কামড়াতে ছাড়ে না। আর সে কামড়ও বড়ো সামান্য নয়। ছুঁচোর কামড় খেয়ে মানুষকে কখনো কখনো মাসের পর মাস জ্বরে ভুগতে দেখা গিয়েছে।

কিছুদিন আগে এক সাহেব সাইকেল করে বিলাতের এক পাড়াগেঁয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সন্ধ্যার সময় পথের মাঝে নেমে তিনি সাইকেলের আলো জ্বালাচ্ছেন, এমন সময় ছোট্টো একটা বিলাতী বেজি ঘুরতে ঘুরতে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত। সাহেবের কি খেয়াল হল, তিনি রাস্তা থেকে একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে বেজিটার গায়ে ছুঁড়ে মারলেন। মারতেই বেজিটা অদ্ভুত কিচ্‌কিচ্ শব্দ করে উঠল ; আর তাই শুনে কোত্থেকে বারো-চোদ্দোটা বেজি এসে একসঙ্গে সাহেবকে আক্রমণ করে বসল। তারা ক্রমাগত লাফ দিয়ে সাহেবের গলার টুঁটি কামড়ে ধরবার চেষ্টা করতে লাগল। সাহেব একটুক্ষণ আত্মরক্ষার চেষ্টা করে তার পর প্রাণের ভয়ে সাইকেল চড়ে সেখান থেকে চম্পট দিলেন। বেজিগুলো তবু প্রায় দেড়মাইল পথ সাইকেলের পিছন পিছন তাড়া করে এসেছিল। হঠাৎ কি করে যে বেজিদের এতখানি তেজ আর সাহস হয়ে উঠল তার কোনো কারণ পাওয়া যায় না ; কারণ, সাধারণত তারা মানুষের শব্দ পেলেই ছুটে পালায়।

বেজিগুলো ইচ্ছা করলে খুব সহজেই সাহেবের পা কামড়াতে পারত, কিন্তু তা না করে তারা গলায় টুঁটির দিকেই বার বার তেড়ে উঠছিল ; যেন তারা জানে যে ঐখানে কামড়ালে জখমটা হবে সাংঘাতিক। এরকম প্রায়ই দেখা যায় যে শিকারী জন্তুরা অন্য জন্তু মারবার সময় তাকে এমনভাবে মারে যাতে সে সহজেই কাবু হয়। 'হেজহগ্' (Hedgehog) বা

কাঁটাচুয়ার সারা গায়ে কাঁটা, তার গায়ে কোথাও কামড় দেবার জো নাই ; কিন্তু তার গলার নীচটাতে কাঁটা নাই, সেখানে কামড় দিলে বেচারা আর আত্মরক্ষা করতে পারে না। ইঁদুরেরা তাই সুযোগ বুঝে তার গলায় কামড় বসাবার চেষ্টা করে ; ভুলেও কখনো পিঠের উপর কামড় দিতে যায় না। বেজি যখন সাপের সঙ্গে লড়াই করে তখন তার দৃষ্টি থাকে সাপের ঘাড়ের কাছে, ঠিক ফণাটির পিছনে ; সেখানে কামড় দিয়ে ধরলে সাপ আর উলটে ছোবল মারতে পারে না।

ছোটো-ছোটো পোকামাকড়েরা পর্যন্ত এই-সব সংকেত জানে। তোমরা বোলতা আর মাকড়সার লড়াই দেখেছ ? সে এক অদ্ভুত জিনিস। মাকড়সা জানে যে বোলতার একটি কামড় খেলে তার আর রক্ষা নাই, তাই সে কেবলই জালের আড়াল দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। সেই জালের ভিতর থেকে সবগুলি পা একসঙ্গে বার করে সে বোলতাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে, কিন্তু কখনো তেড়ে গিয়ে আক্রমণ করবার সাহস পায় না। বোলতাও বার বার ভন্‌ভন্ করে জালের কাছ পর্যন্ত তেড়ে এসে আবার পালিয়ে যায়, কারণ সেও জানে যে ঐ জালের মধ্যে একবার আটকা পড়লে তার আর বের হবার উপায় নাই।

কেবল যে অন্য জন্তুদের সঙ্গেই জানোয়ারদের লড়াই বাধে, তা নয়। ছাগলের লড়াই বেড়ালের ঝগড়া কিম্বা কুকুরের কামড়াকামড়ি তোমরা সকলেই দেখেছ। কাগে কাগে কিম্বা চড়াইয়ে চড়াইয়ে ঝগড়াও সর্বদাই দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের ঘরে একটা ধাড়ি টিকটিকি আছে, সন্ধ্যার পর দেয়ালের বাতির কাছে, যে-সব পোকা বসে সে তাদের ধরে ধরে খায়। অন্য টিকটিকিকে ঘরের ত্রিসীমানার মধ্যে আসতে দেখলে সে তাকে তাড়া করে যায়, পাছে সে এসে তার খাবারে ভাগ বসায়। খাবারের জন্যে জানোয়ারদের মধ্যে রেষারেষি তো চলেই, বিয়ের জন্যেও রেষারেষি চলে। মনে কর জঙ্গলে একজন পরমাসুন্দরী গণ্ডারনী আছেন আর দুটি ছোকরা গণ্ডার আছে, তাদের দুজনেরই তাঁকে ভারি পছন্দ। এখন উপায় ? উপায় হচ্ছে দস্তুরমতো লড়াই করে এর মীমাংসা করে নেওয়া। এরকম লড়াই হরিণদের মধ্যেও চলে, অন্যান্য অনেক জন্তুদের মধ্যেও চলে। পাখিদের মধ্যে তো খুবই চলে।

এ ছাড়া এমন অনেক জন্তু আছে যারা কেবল লড়াইয়ের খাতিরেই লড়ে। যে-সব দলছাড়া হাতি একলা একলা জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, তাদের স্বভাবটা অনেক সময়েই এইরকম হয়। বুনো বরাহদের স্বভাবটাও নাকি অনেকটা এই ধরনের। আর-এক রকম ভিমরুলের কথা আমি জানি, সে থাকে খাসিয়া পাহাড়ে, তার গায়ে ডোরা ডোরা দাগ ; তাকে কিছু না বললেও সে তেড়ে এসে বঁড়শির মতো হুল দিয়ে কামড় বসিয়ে দেয়। আমার মাথায় ভালো করে কামড়াতে পারে নি, তবু তিনদিন ব্যথার চোটে আমার ঘুমানো মুশকিল হয়েছিল।

সন্দেশ—আশ্বিন, ১৩২৯

মানুষ মুখো

বাঁদরের মুখের চেহারা যে অনেকটা মানুষের মতো তা দেখলেই বোঝা যায়; বিশেষত ওরাং ওটাং শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি বুদ্ধিমান বাঁদরদের চাল-চলন আর মুখের ভাব দেখলে মানুষের মতো আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। কোন কোনো বাঁদর আছে তাদের মাথায় লোমগুলি দেখলে ঠিক টেরিকাটা মানুষের মাথার মতো মনে হয়, যেন কেউ চিরুনি দিয়ে চুল ফিরিয়ে সিঁথে কেটে দিয়েছে। এক ধরনের বাঁদরের যেরকম গোঁফের বাহার খুব কম মানুষেরই সেরকম আছে। তার বাড়ি আমেরিকায়। ছোট্টো আধ হাত উঁচু বাঁদরটি, কিন্তু ঐ গোঁফের জন্যে তার মুখে একটা গাম্ভীর্যের ভাব দেখা যায়। এদের রঙ কালো, হাতে লম্বা-লম্বা নখ থাকে, তাই দিয়ে কাঠবেড়ালীর মতো গাছে খাম্‌চিয়ে ওঠে। এই জাতায় বাঁদরের নাম টামারিন্ : এদের সকলের এরকম গোঁফ থাকে না; গুঁফো বাঁদরদের এম্পারার টামারিন্ অর্থাৎ সম্রাট টামারিন্ বলে। তা সম্রাটের মতো চেহারাই বটে। সম্রাটের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে কলা। গুঁফো বাঁদরের পর দাড়িওয়ালা বাঁদর, তার নাম হচ্ছে কালো সাকী। তারও বাড়ি আমেরিকায়। সে দেশের লোকেরা এই বাঁদরকে শয়তান বাঁদর বলে। এরকম অন্যায় নাম দেবার কোনই কারণ পাওয়া যায় না, কারণ এদের মেজাজ যেমন ঠাণ্ডা, স্বভাবও তেমনি নিরীহ। দাড়ির বহর যতই হোক-না কেন, আসলে এরা ভীতুর একশেষ। মানুষের কোনো অনিষ্ট করা দূরে থাক কাছে কোথাও মানুষ আছে জানতে পারলে এরা তার ত্রিসীমানা ছেড়ে পালায়। এদের কোনোরকমে পোষ মানানো যায় না; ধরে আনলে অতি অল্প দিনের মধ্যে মরে যায়। আর-এক জাতের সাকী বাঁদর রয়েছে। তার গায়ের রঙ খুব হালকা তাই একে সাদা সাকী বলা হয়। তার চেহারা যেন আরো উদ্ভট গোছের। দাড়িও অন্য রকমের। এইরকমের গালপাট্টা দেওয়া চেহারা আর বিকট ধেব্‌ড়ানো মুখ দেখে বুঝবার জো নেই যে, বেচারার স্বভাবটি মোটেও তার চেহারার মতো নয়।

বুড়ো-ধাড়ী সিন্ধুঘোটকদের চেহারাও অনেক সময় খুব মাতব্বর গোছের মানুষের মতো মনে হয়। গোঁফ-দাড়ি, মাথায় টাক, সবই বেশ মানিয়ে যায়, কেবল হাতির মতো ঐ প্রকাণ্ড দাঁত দুটোতেই সব মাটি করে দেয়।

সন্দেশ—শ্রাবণ, ১৩৩৩

অভিনব ধাঁধা
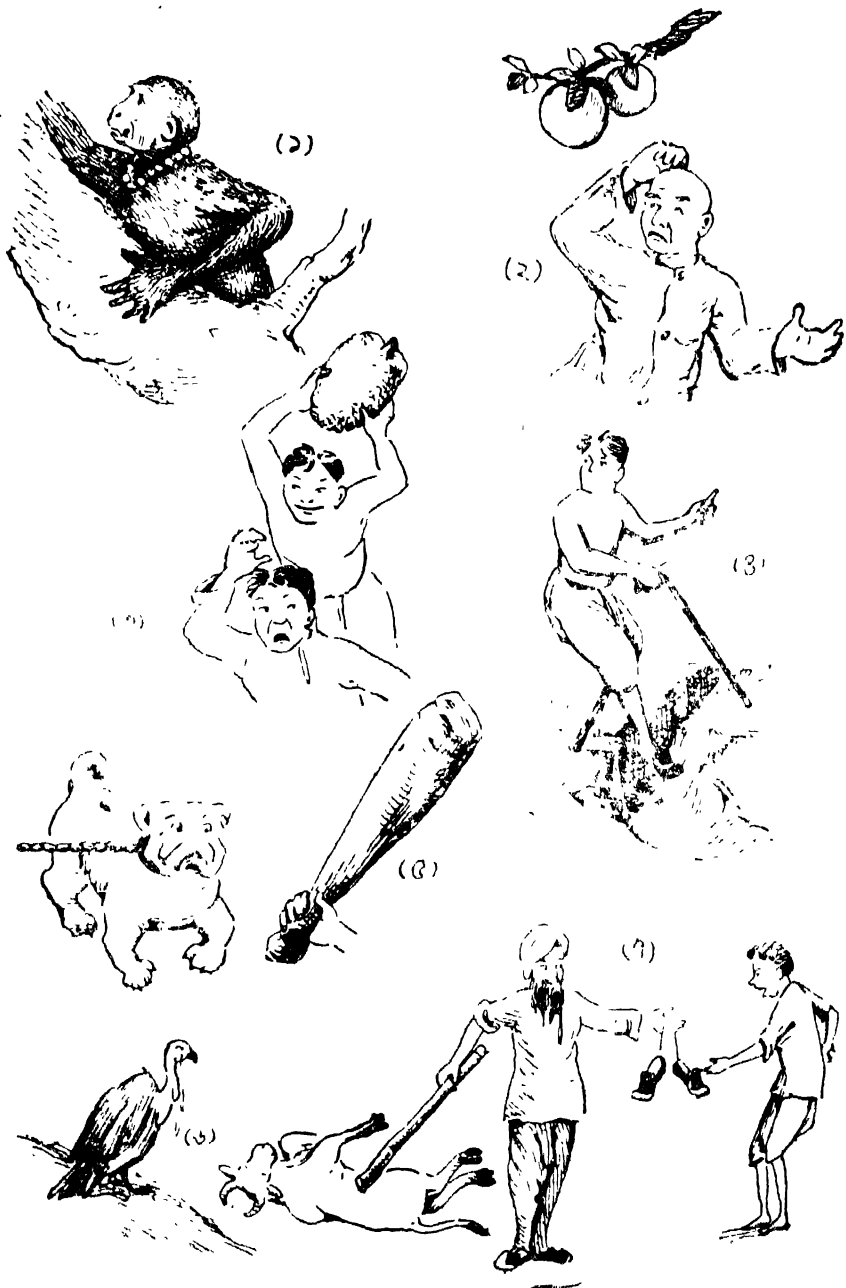
উপরের সাতটি প্রবাদ-বাক্যের ছবি আঁকিয়া দেখানো হইয়াছে। প্রবাদগুলি বাহির কর।

অন্যান্য গল্প

প্রথম খণ্ডে সুকুমার রায়ের প্রায় সব গল্পই প্রকাশিত হয়েছে। এ যাবৎ প্রাপ্ত অবশিষ্ট ছ'টি গল্প এই খণ্ডে দেওয়া হল। সমস্ত গল্পের সঙ্গেই প্রকাশের তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। এই ছ'টি গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও সুপরিচিত গল্প 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি' সন্দেশের একাদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা ও দ্বিতীয় সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সুকুমার সাহিত্যের উদ্ভট খেয়াল রস ও নতুন নতুন শব্দসৃষ্টির সন্ধান এই গল্পে পাওয়া যাবে—যা ছবিতে ও লেখায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শ্রাবণ ১৩২৮-এ প্রকাশিত 'একটি বর' গল্পটি অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২৬ সংখ্যার সন্দেশে 'অন্ধের বর চাওয়া' গল্পটির ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ। প্রথম খণ্ডে এই গল্পটি 'দেশ-বিদেশের গল্প' পর্যায়ে মুদ্রিত হয়েছে। সন্দেশে প্রকাশিত কালানুক্রমেই গল্পগুলি বিন্যস্ত হল।

সূচীপত্র

টিয়াপাখির বুদ্ধি

এক ফরাসি ভদ্রলোকের একটা কুকুর আর একটা টিয়াপাখি ছিল। কুকুরটাকে তিনি নানারকম খেলা আর কাজ শিখিয়েছিলেন। 'বাইরে যাও', 'দোকানে যাও', 'খাবার আনো' বলে তিনি যখন যেমন হুকুম করতেন, কুকুরটা ঠিক মতন তাঁর হুকুম তামিল করত। টিয়াপাখিটা কিন্তু কিছু কাজ করতে শেখে নি। সে কেবল সব সময় বকর্ বকর্ করে কথা বলত আর কুকুরটার উপর সর্দারি করত। কুকুর বেচারা হয়তো ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে হঠাৎ টিয়াপাখিটা চোখ পাকিয়ে ধমক দিয়ে বলল, "এইও, বাইরে যাও"—কুকুরেরও হুকুম শুনে অভ্যাস--সে ভয়ে ভয়ে লেজ গুটিয়ে দরজার দিকে রওনা হত। তখন আবার টিয়াপাখিটা ঠিক তার মনিবের মতো শিস্ দিয়ে তাকে ডেকে আনত।

সেই ভদ্রলোকটি কুকুরটাকে প্রায়ই রুটিওয়ালার দোকানে 'কেক্' আনবার জন্য পাঠাতেন। কুকুরটাকে সকলেই খুবই চিনত সুতরাং সে টুকরি মুখে নিয়ে দোকানে আসলেই রুটি-ওয়ালা টুকরির মধ্যে কেক্ পুরে দিত আর তার মনিবের নামে হিসাব লিখে রাখত। একদি ভদ্রলোকটি হিসাব করতে গিয়ে দেখেন যে তাঁর হিসাবের সঙ্গে দোকানের হিসাব মিলছে না। তিনি যতবার কুকুরটাকে পাঠিয়েছেন-- দোকানীর হিসাব তার চাইতেও বেশি লেখা হয়েছে। কয়েকদিন পর্যন্ত এর কারণ কিছু বোঝা গেল না। তার পর তিনি একদিন দেখেন কি, কুকুরটা শুয়ে আছে এমন সময় টিয়াপাখিটা হঠাৎ বলে উঠল, "টুক্রি আনো।" কুকুরটা একটু উঠে টুক্রি নিয়ে এল। টিয়াপাখি বলল, "দোকানে যাও।" কুকুর বেচারা ইতস্তত করতে লাগল, তাই দেখে সে আবার চীৎকার করে বলল, "এইও, দোকানে যাও।" কুকুর বেচারা আর কি করে? সে দোকানে গিয়ে দু'মিনিটের মধ্যে খাবার এনে পাখিটার সামনে রেখে লেজ নাড়তে লাগল, ইচ্ছাটা সেও কিছু ভাগ পায়, কিন্তু টিয়াপাখি "বাইরে যাও" বলে এক ধমক দিয়ে তাকে তাড়িয়ে, নিজেই সবটা খাবার খেতে লাগল।

তখন ভদ্রলোকটি বুঝতে পারলেন যে দোকানীর হিসাবে কেন বেশি লেখা হয়।

সন্দেশ—পৌষ, ১৩২১

ব্যাঙের সমুদ্র দেখা

গ্রামের ধারে কবেকার পুরানো এক পাতকুয়োর ফাটলের মধ্যে কোলাব্যাঙ তার পরিবার নিয়ে থাকত। গ্রামের মেয়েরা সেখানে জল তুলতে এসে যে-সব কথাবার্তা বলত কোলা-ব্যাঙ তার ছেলেদের সেই-সব কথা বুঝিয়ে দিত--আর ছেলেরা ভাবত, 'ইস্! বাবা কত জানে!'

একদিন সেই মেয়েরা সমুদ্রের কথা বলতে লাগল। ব্যাঙের ছানারা জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁ বাবা! সমুদ্র কাকে বলে?" ব্যাঙ খানিক ভেবে বলল, "সমুদ্র? সে একরকম জন্তুর নাম।" তখন একটা ছানা বলল, "ওরা যে বলছিল সমুদ্র খুব ভয়ানক বড়ো হয়, আর তার মধ্যে অনেক অনেক জল থাকে—আর লোকেরা সাঁতার কেটে তা পার হতে পারে না!" তখন কোলাব্যাঙ মুশকিলে পড়ল। সে গাছপালা দেখেছে, বাড়িঘর দেখেছে, মানুষ কুকুর ঘটিবাটি নানারকম জিনিসপত্র সব দেখেছে, আর ছেলেবেলায় অনেকরকম জিনিসের গল্প শুনেছে। কিন্তু সমুদ্রের কথা তো কখনো শোনে নি! তখন সে ভাবল, সমুদ্রের কথা একটু খোঁজ করে দেখতে হবে।

পরদিন সকালে উঠেই কোলাব্যাঙ তার ছাতা পোঁট্‌লা নিয়ে বলল, "আমি সমুদ্রের সন্ধান করতে যাচ্ছি।" তার গিন্নী কত কাঁদল, ছেলেরা নানারকম সুর করে তাকে বারণ করল কিন্তু কোলাব্যাঙ বলল, 'না, এতে আমার জ্ঞানলাভ হবে--তোমরা বাধা দিয়ো না।" এই বলে সে পাতকুয়ো থেকে উঠে একটা মাঠের দিকে চলল। ব্যাঙ বাইরে এসেই দেখল মানুষ কুকুর গোরু তারা কেউ তার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলে না--তাই দেখে সে ভাবল, 'লাফিয়ে চললে সবাই আমায় বেকুব ভাববে।' এই ভেবে সে হেঁটে হেঁটে চলতে লাগল। কিন্তু অমন করে চলে তো তার অভ্যাস নেই—খানিক দূর গিয়েই তার ভারি পরিশ্রম বোধ হল।

মাঠের ওপারে আর-এক গ্রামের কাছে এক গর্তের মধ্যে মেটে ব্যাঙদের বাসা ছিল। মেটে ব্যাঙেরাও সমুদ্রের কথা শুনেছে, তাই তাদের মধ্যে একজন বেরিয়েছে সমুদ্রটা দেখতে। মাঝপথে দুই ব্যাঙের দেখা হল। কোলাব্যাঙ বলল, "আমি ফাটলকুয়োর কোলাব্যাঙ, যাচ্ছি সমুদ্রে।" মেটে ব্যাঙ বলল, "আমি মেঠো-মাটির মেটে ব্যাঙ, আমিও যাচ্ছি সমুদ্রে।" তখন তাদের ভারি ফুর্তি হল।

কিন্তু সমুদ্রে যাবার পথ তো তারা জানে না। মাঠের মধ্যে একটা মস্ত ঢিপি ছিল; মেটে ব্যাঙ বলল, "ওর উপরে উঠে দেখি তো কিছু দেখা যায় কি না।"

এই বলে তারা অনেক কষ্টে সেই ঢিপির উপর চড়ে সেখান থেকে একটা গ্রাম দেখতে পেল। মেটে ব্যাঙ বলল, "আরে দুর ছাই! এরকম তো ঢের দেখেছি! আমার বাড়ির কাছেই তো অমন আছে।" কোলাব্যাঙ বলল, "তাই তো! আমিও ছেলেবেলা থেকে ওরকম কত দেখেছি। সব জায়গাই দেখছি একরকম। মিছামিছি আমরা হেঁটে মরলাম।"

তখন তারা ভারি বিরক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেল। কোলাব্যাঙ তার ছানাদের বলল, "সমুদ্র-টমুদ্র কিছু নেই—ও-সব মিছে কথা!"

(জাপানী গল্প)

সন্দেশ—আষাঢ়, ১৩২২

খুকির লড়াই দেখা

একদল ইংরেজ সৈন্য মাঠের পাশ দিয়ে লড়ায়ের জায়গায় যাচ্ছে, এমন সময় তাদের একজন হঠাৎ দেখতে পেল, মাঠের কিনারায় একটা খুকি ঘুমাচ্ছে! আশেপাশে কোথাও লোকজন নাই, ঘর বাড়ি যা কিছু ছিল কোন কালে গোলা লেগে ছাতু হয়ে গেছে—এমন জায়গায় খুকি আসল কোথা থেকে? খুকির বয়স বছর দুই, টুক্‌টুক্ করে হেঁটে বেড়ায়, অতি মিষ্টি ক'রে দু-চারটি কথা বলে ফরাসী ভাষায়। সে যে কোথা থেকে এল তা সে বুঝিয়ে বলতে পারে না। সৈন্যরা ঠিক করল, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া যাক, পরে খোঁজ করে যা হয় একটা করা যাবে। লড়াইয়ের জায়গায় মাটির মধ্যে খাদ কেটে সৈন্যরা সব সময় হুঁশিয়ার হয়ে বসে থাকে—কখনো একদিন, কখনো দুদিন কখনো বা সপ্তাহ ধরে এক-এক দলকে সেই খাদের মধ্যে থাকতে হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে তারা খুকিকে নিয়েই আস্তে আস্তে খাদের মধ্যে ঢুকল।

সামনে জার্মানদের খাদ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক গোলা ফাটার শব্দ হচ্ছে, কখনো-বা দুটো-একটা বন্দুকের গুলি সোঁ করে মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু খুকুমনির তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। সৈন্যরা তার জন্য খড় দিয়ে আর বালির বস্তা দিয়ে সুন্দর বিছানা করে দিয়েছে—তার মধ্যে সে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে! সকাল হতেই কামানের লড়াই আরম্ভ হল—প্রথমটা অল্প-স্বল্প—তার পরে ক্রমেই বেশি। খুকি তখন ঘুম থেকে উঠেছে, সে প্রথম প্রথম দুম্‌দাম্ শব্দে বোধ হয় একটু ভয় পেয়েছিল—কিন্তু খানিকক্ষণ শুনে শুনে আপনা হতেই তার ভয় ভেঙে গেল। সে তখন খাদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে আলাপ করতে লাগল, তাদের বন্দুক, দুরবীন অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়ে, 'এটা কি?' 'ওটা কি?' জিজ্ঞাসা করতে লাগল।

তার পর একদিন যায়, দুদিন যায়, সৈন্যরা তখনো সেখান থেকে বদলি হয় নি। তিন দিনের দিন জার্মানরা খাদের উপর প্রকাণ্ড এক বোমা ফেলল। বোমা ভয়ানক শব্দে ফাটবামাত্র খাদের খানিকটা ধ্বসে গিয়ে কতগুলো লোক চাপা পড়ল। অমনি সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "আগে খুকিকে দেখ।" খুকি এক কোণে পুঁটুলি পাকিয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে আছে। পরদিন সকালবেলা সকলে খাওয়া-দাওয়া করছে—এমন সময় একজন চেঁচিয়ে উঠল "দেখ, খুকিটা কোথায় গেল"। সকলে চেয়ে দেখে খুকিটা জার্মান খাদের দিকে খুট্‌খুট্ করে হেঁটে যাচ্ছে। জার্মানরা তো ব্যাপার দেখে অবাক্! খানিক বাদে তারা খুকিটাকে ডাকতে লাগল। খুকিও তাদের খাদে গিয়ে অনেক চকলেট লজঞ্চুস আদায় করে ভারি খুশি হয়ে ফিরে এল। এমনি করে তারা এক সপ্তাহ কাটাল।

তার পর দু বছর কেটে গেছে—সেই খুকির বাবা-মার কোনো খবর পাওয়া যায় নি। সেই সৈন্যদলই এখনো তাকে খরচ দিয়ে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করছে। অবশ্য এখন সে আর লড়াইয়ের জায়গায় থাকে না—সে থাকে লণ্ডনে—সকলে তার নাম রেখেছে ফিলিস্।

সন্দেশ—বৈশাখ, ১৩২৩

ছয় বীর

সে প্রায় ছয়শত বৎসর আগেকার কথা--সে সময়ে ইংরাজ ও ফরাসিতে প্রায়ই যুদ্ধ চলিত। দুই পক্ষেই বড়ো-বড়ো বীর ছিলেন - তাঁহাদের আশ্চর্য বীরত্বের কাহিনী ইউরোপের দেশ-বিদেশে লোকে অবাক হইয়া শুনিত।

ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় এড্ওয়ার্ড তখন খুব বড়ো সৈন্যদল লইয়া ফ্রান্সে যুদ্ধ করিতে-ছিলেন। ফ্রান্সের উত্তর দিকে সমুদ্রের উপকূলে ইংলণ্ডের খুব কাছাকাছি একটি শহর আছে, তাহার নাম 'ক্যালে' (Calais)। এই শহরটির উপর বহুকাল ধরিয়া ইংরাজদের চোখ ছিল--কারণ, এইটি দখল করিতে পারিলে, ফ্রান্সে যাওয়া-আসার খুবই সুবিধা হয়। এড্ওয়ার্ড জলস্থল দুইদিক হইতে এই শহরটিকে ঘেরাও করিয়া ফেলিলেন। 'ক্যালে' শহরে সৈন্য-সামন্ত বেশি ছিল না, কিন্তু সেখানকার দুর্গ বড়ো ভয়ানক। তার চারিদিক উঁচু দেয়াল ঘেরা--সেই দেয়ালের বাহিরে প্রকাণ্ড খাল--এক-একটা ফটকের সামনে এক-একটি পোল—সেই পোল দুর্গের ভিতর হইতে গুটাইয়া ফেলা যায়। সে সময়ে কামান ছিল বটে—তাহার গোলাতে মানুষ মরে কিন্তু দুর্গ ভাঙে না। সুতরাং জোর করিয়া দুর্গ দখল করা বড়ো সহজ ছিল না। কিন্তু এড্ওয়ার্ড তাহার জন্য ব্যস্ত হইলেন না—তিনি শহরের পথঘাট আটকাইয়া, প্রকাণ্ড তাম্বু গাড়িয়া দিনের পর দিন নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মতলবটি এই যে, যখন দুর্গের ভিতরের খাবার সব ফুরাইয়া আসিবে আর ভিতরের লোকজন ক্রমে কাহিল হইয়া পড়িবে, তখন তাহারা আপনা হইতেই হার মানিবে; মিছামিছি লড়াই হাঙ্গামা করিবার দরকার হইবে না।

'ক্যালে'র লোকেরা যখন দেখিল, ইংরাজেরা চারিদিক হইতে পথঘাট ঘিরিয়া ফেলিতেছে, তখন তাহারা শিশু, বৃদ্ধ, অক্ষম এবং দুর্বল লোকদিগকে এবং স্ত্রীলোকদিগকে শহরের বাহিরে পাঠাইয়া দিল।

তার পর কিছুদিন ধরিয়া ইংরাজ ও ফরাসিতে রেষারেষি চলিতে লাগিল। ফরাসিদের মতলব, বাহির হইতে দুর্গের ভিতরে খাবার পৌঁছাইবে—ইংরাজের চেষ্টা যে সেই খাবার কিছুতেই ভিতরে যাইতে দিবে না। ডাঙার পথে খাবার পৌঁছানো একরূপ অসম্ভব ছিল—কারণ, সেদিকে ইংরাজদের খুব কড়াক্কড় পাহারা। সমুদ্রের দিকেও ইংরাজদের যুদ্ধ-জাহাজ সর্বদা ঘোরাঘুরি করিত কিন্তু অন্ধকার রাত্রে তাহাদের এড়াইয়া, ফরাসি নাবিকেরা মাঝে মাঝে রুটি, মাংস, শাকসব্জি প্রভৃতি শহরের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিত। মোর্‌ৎ ও মেস্ত্রিয়েল নামে দুইজন নাবিক এই কাজে আশ্চর্য সাহস ও বাহাদুরি দেখাইয়াছিল। একবার নয়,

দুইবার নয়, তাহারা বহুদিন ধরিয়া এইরকমে সেই শহরে খাবার জোগাইয়াছিল। ইংরাজেরা তাহাদের ধরিবার জন্য কতবার কত চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু প্রতিবারেই তাহারা ইংরাজ জাহাজগুলিকে ফাঁকি দিয়া পলাইত।

এইরকমে ছয়মাস কাটিয়া গেল, তবু দুর্গের লোকেরা দুর্গ ছাড়িয়া দিবার নাম পর্যন্ত করে না। তখন রাজা এড্‌ওয়ার্ড কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি আরো লোকজন আনাইয়া সমুদ্রের তীরে দুর্গ বানাইলেন, সেখানে খুব জবরদস্ত পাহারা বসাইলেন, সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের বড়ো-বড়ো পাথর ছুঁড়িবার যন্ত্র বসাইলেন। নৌকার সাধ্য কি সেদিক দিয়া শহরে প্রবেশ করে! খাবার আসিবার পথ যখন বন্ধ হইতে চলিল, দুর্গের লোকদেরও তখন হইতে ক্ষুধার কষ্ট আরম্ভ হইল, তাহারা দুর্বল হইয়া পড়ায় তাহাদের মধ্যে নানারকম রোগ দেখা দিতে লাগিল। তবু তাহারা মাঝে মাঝে দল বাঁধিয়া ইংরাজদের শিবির হইতে খাবার কাড়িয়া আনিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাহাতে যেটুকু খাওয়া জুটিত তাহা অতি সামান্য। দুর্গের সৈন্যরা মাসের পর মাস ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করিয়াও, আশ্চর্য তেজের সঙ্গে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিল—তাহাদের এক ভরসা এই যে, ফরাসি রাজা ফিলিপ নিশ্চয়ই সৈন্য-সামন্ত লইয়া তাহাদের সাহায্য করিতে আসিবেন।

একদিন সত্য সত্যই দেখা গেল, শহর হইতে কিছু দূরে ফরাসি সৈন্যদল আসিয়া হাজির হইয়াছে। তাহাদের রঙিন নিশান আর সাদা তাম্বুগুলি দুর্গের লোকেরা যখন দেখিতে পাইল, তখন তাহাদের আনন্দ দেখে কে! তাহারা ভাবিল আমাদের এত দিনের ক্লেশ সার্থক হইল। যাহা হউক, ফিলিপ আসিয়াই ইংরাজেরা কোথায় কেমনভাবে আছে, তাহার খবর লইয়া দেখিলেন যে, এখান হইতে ইংরাজদের হটানো বড়ো সহজ হইবে না। 'ক্যালে' ঢুকিবার পথ মাত্র দুইটি, একটি একেবারে সমুদ্রের ধারে—সেদিকে ইংরাজের বড়ো-বড়ো যুদ্ধ-জাহাজ চব্বিশ ঘন্টা পাহারা দেয়। আর-একটি পথে পোলের উপর দিয়া নদী পার হইতে হয়—সেই পোলের উপর ইংরাজেরা রীতিমতো দখল জমাইয়া বসিয়াছে। পোলের মুখে দুর্গ বসাইয়া বড়ো-বড়ো যোদ্ধারা তাহার মধ্যে তীরন্দাজ লইয়া প্রস্তুত রহিয়াছে—তাহারা প্রাণ থাকিতে কেহ পথ ছাড়িবে না। ইহা ছাড়া আর সব জলাভূমি, সেখান দিয়া সৈন্য-সামন্ত পার করা এক দুরূহ ব্যাপার।

ফিলিপ তখন ইংরাজ শিবিরে দূত পাঠাইয়া প্রস্তাব করিলেন, "আইস! তোমরা এক-বার খোলা ময়দানে আসিয়া আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।" এড্‌ওয়ার্ড উত্তর দিলেন, "আমি আজ বৎসরখানেক এইখানে অপেক্ষা করিয়া আছি, ইহাতে আমার খরচপত্র যথেষ্ট হইয়াছে এতদিনে দুর্গের লোকেরা কাবু হইয়া আসিয়াছে, এখন তোমার খাতিরে আমি এমন সুযোগ ছাড়িতে প্রস্তুত নই। তোমার রাস্তা তুমি খুঁজিয়া লও।"

তিন দিন ধরিয়া দুই দলে আপসের কথাবার্তা চলিল, কিন্তু তাহাতে কোনোরূপ মীমাংসা হইল না। তখন ফিলিপ অগত্যা তাঁহার সৈন্যদল লইয়া আবার বিনা যুদ্ধেই ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাকে ফিরিতে দেখিয়া দুর্গবাসীদের মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। এতদিন তাহারা যে ভরসায় সকল কষ্ট ভুলিয়া ছিল, এখন সে ভরসাও আর রহিল না। তখন তাহারা একেবারে নিরাশ হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিল।

এড্‌ওয়ার্ড বলিলেন, "সন্ধি করিতে আমি প্রস্তুত আছি, কিন্তু তোমরা আমায় বড়ো ভোগাইয়াছ, আমার অনেক জাহাজ ডুবিয়াছে, টাকা ও সময় নষ্ট হইয়াছে, এবং অন্য নানা-রকমের ক্ষতি হইয়াছে। আমি ইহার ষোলো-আনা শোধ না লইয়া ছাড়িব না। আমার সন্ধির শর্ত এই—ক্যালের দুর্গ শহর টাকাকড়ি লোকজন সমস্ত আমার হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে—আমার যেমন ইচ্ছা ফাঁসি, কয়েদ, জরিমানা ইত্যাদি দণ্ডবিধান করিব এবং ইহাও জানিও যে, আমি যে শাস্তি দিব তাহা বড়ো সামান্য হইবে না।"

ইংরাজ দূত যখন ক্যালের লোকেদের এই কথা জানাইল, তাহারা এমন শর্তে সন্ধি করিতে রাজী হইল না। তাহারা বলিল, "রাজা এড্‌ওয়ার্ড স্বয়ং একজন বীরপুরুষ, তাঁহাকে বুঝাইয়া বলুন, তিনি এমন অন্যায় দাবি কখনো করিবেন না।" ইংরাজ দলের ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা তখন তাহাদের পক্ষ লইয়া রাজাকে অনেক বুঝাইলেন। ক্যালের লোকেরা কিরূপ সাহসের সহিত কত কষ্ট সহ্য করিয়া, বীরের মতো দুর্গ রক্ষা করিয়াছে, সে-সকল কথা তাঁহারা বার বার বলিলেন। এমন শত্রুকে যে সম্মান করা উচিত এ কথা এক বাক্যে সকলে স্বীকার করিলেন। কিন্তু এড্‌ওয়ার্ডের প্রতিজ্ঞা অটল। অনেক বলা-কওয়ার পর তিনি একটু নরম হইয়া এই হুকুম দিলেন—"ক্যালের লোকেরা যদি ক্ষমা চায় তবে তাহাদের ছয়জন প্রতিনিধি পাঠাইয়া দিক—তাহারা দুর্গের চাবি লইয়া, খালি পায়ে খালি মাথায় গলায় দড়ি দিয়া আমার কাছে আসুক এবং সকলের হইয়া শাস্তি গ্রহণ করুক। তাহা হইলে আর সকলকে মাপ করিতে পারি, কিন্তু এই ছয়জনের আর রক্ষা নাই।"

ইংরাজ দূত আবার দুর্গে গিয়া এই হুকুম জানাইল। দুর্গের লোকেরা রাজার আদেশ জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল—এই হুকুম শুনিয়া তাহারা স্তব্ধ হইয়া গেল। তখন ক্যালের সম্ভ্রান্ত ধনী বৃদ্ধ সেন্ট পিয়ের বলিয়া উঠিলেন, "বন্ধুগণ, আমার জীবন দিয়া যদি তোমাদের বাঁচাইতে পারি, তবে ইহার চাইতে সুখের মৃত্যু আমি চাহি না। আমি ছয়জনের মধ্যে প্রথম প্রতিনিধিরূপে দাঁড়াইলাম।" এই কথায় চারিদিকে ক্রন্দনের রোল উঠিল—অনেকে সেন্ট পিয়েরের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আরো পাঁচজন লোক অগ্রসর হইয়া, তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, "আমরাও মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।" এই দৃশ্য দেখিয়া ইংরাজ দূতের চক্ষে জল আসিল—তিনি বলিলেন, "রাজা এড্‌ওয়ার্ড যাহাতে ইঁহাদের প্রতি সদয় হন, আমি সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব।"

ছয়জন প্রতিনিধিকে রাজার সভায় উপস্থিত করা হইল। তাঁহারা শান্তভাবে রাজার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন। তার পর সেন্ট পিয়ের ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "আমাদের 'ক্যালে'বাসী বন্ধুগণ এতদিন অসহ্য দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া দুর্গ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের অযোগ্য প্রতিনিধি আমরা, আজ তাঁহাদের জীবনরক্ষার জন্য দুর্গের চাবি আপনার কাছে দিতেছি। এখন আমরা সম্পূর্ণভাবে আপনার ইচ্ছা ও আদেশের অধীন রহিলাম।"

সভাসুদ্ধ লোকে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। ছয়জনের সকলেই বয়সে বৃদ্ধ; বহুদিন অনাহারে তাঁহাদের শরীর শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাদের গম্ভীর প্রশান্ত মুখে কষ্টের রেখা পড়িয়াছে, এক-একজন এত দর্বল যে, চলিতে পা কাঁপে, অথচ তাঁহাদের মন

এখনো তেজে পরিপূর্ণ। তাঁহাদের দেখিয়া ইংরাজ যোদ্ধাগণের মনে শ্রদ্ধার উদয় হইল। সকলেই বলিতে লাগিল, "ইহাদের উপর শাস্তি দিয়া প্রতিশোধ লওয়া কখনই উচিত নয়।" যিনি দূত হইয়া গিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, "ইহাদের শাস্তি দিলে রাজা এড্‌ওয়ার্ডের কলঙ্ক হইবে—ইংরাজ জাতির কলঙ্ক হইবে।" কিন্তু এড্‌ওয়ার্ডের মন গলিল না—তিনি জল্লাদ ডাকিতে হুকুম দিলেন। তখন ইংলণ্ডের রানী ফিলিপা বন্দীদের মধ্যে কাঁদিয়া পড়িলেন এবং দুই হাত তুলিয়া ভগবান যীশুর দোহাই দিয়া এড্‌ওয়ার্ডকে বলিলেন, "ইহাদের তুমি ছাড়িয়া দাও।" তখন এড্‌ওয়ার্ড আর 'না' বলিতে পারিলেন না।

ছয় বীরকে মুক্তি দিয়া রানী তাহাদিগকে তাঁহার নিজের বাড়িতে লইয়া, পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইলেন এবং নানা উপহার দিয়া বিদায় দিলেন। ইঁহাদের বীরত্বের কথা ফরাসিরা আজও ভোলেন নাই—ইংরাজও তাহা স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন।

সন্দেশ—অগ্রহায়ণ, ১৩২৬

একটি বর

একটি অন্ধ ভিখারী রোজ মন্দিরে পূজা করতে যায়। প্রতিদিন ভক্তিভরে পূজা শেষ করে মন্দিরের দরজায় প্রণাম করে ফিরে আসে; মন্দিরের পুরোহিত সেটা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেন।

এইভাবে কত বৎসর কেটে গেছে কেউ জানে না। একদিন পুরোহিত ভিখারীকে ডেকে বললেন, "দেখ হে! দেবতা তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। তুমি কোনো একটা বর চাও। কিন্তু, মনে রেখ—একটিমাত্র বর পাবে।"

ভিখারী বেচারা বড়ো মুস্কিলে পড়ল। কি যে চাইবে, কিছু আর ঠিক করতে পারে না। একবার ভাবল, দৃষ্টি ফিরে চাইবে; আবার ভাবল, টাকাকড়ি চাইবে; আবার ভাবল, আত্মীয়স্বজন ছেলেপিলে দীর্ঘ জীবন এই-সব চাইবে, কিছুতেই আর ঠিক করতে পারে না। তখন সে বলল, "আচ্ছা, আমি কাল ভালো করে ভেবে এসে বর চাইব। এখন কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না, কি চাই।"

অনেক ভেবেচিন্তে সে মনে মনে একটা ঠিক করে নিল। তার পর মন্দিরে গিয়ে পুরোহিতকে বলল, "পুরুত ঠাকুর! আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি—আপনি আমার বড়ো উপকার করলেন। যে একটি বরের কথা বলেছেন সেটি এখন আমি চাইব—মনে রাখবেন, একটিমাত্র বর আমি চাচ্ছি। আমি এই বর চাই যে মরবার আগে যেন আমার নাতিকে ছয়তলা বাড়ির মধ্যে বসে সোনার থালায় পায়স খেতে স্বচক্ষে দেখে যেতে পারি।"

এই এক বরে ভিখারী চোখের দৃষ্টি ফিরে পেল, ধনজন পেল, ছেলেপিলে, নাতি-নাতনি পেল, দীর্ঘজীবন পেল।

সন্দেশ—শ্রাবণ, ১৩২৮

হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি

প্রফেসর হুঁশিয়ার আমাদের উপর ভারি রাগ করেছেন। আমরা সেকালের জীবজন্তু সম্বন্ধে নানাকথা ছাপিয়েছি; কিন্তু কোথাও তাঁর অদ্ভুত শিকার কাহিনীর কোনো উল্লেখ করি নি। সত্যি এ আমাদের ভারি অন্যায়। আমরা সে-সব কাহিনী কিছুই জানতাম না। কিন্তু প্রফেসর হুঁশিয়ার তাঁর শিকারের ডায়েরি থেকে কিছু কিছু উদ্ধার করে আমাদের পাঠিয়েছেন। আমরা তারই কিছু কিছু ছাপিয়ে দিলাম। এ-সব সত্যি কি মিথ্যা তা তোমরা বিচার করে নিও।

"২৬শে জুন, ১৯২২ কারাকোরম্, বন্দাকুশ পাহাড়ের দশ মাইল উত্তর। আমরা এখন সবসুদ্ধ দশজন—আমি, আমার ভাগ্নে চন্দ্রখাই, দুইজন শিকারী (ছক্কড় সিং আর লক্কড় সিং) আর ছয়জন কুলি। আমার কুকুরটাও সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে।

"নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়ে জিনিসপত্র সব কুলিদের জিম্মায় দিয়ে, আমি, চন্দ্রখাই আর শিকারী দুজনকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে বন্দুক, ম্যাপ আর একটা মস্ত বাক্স, তাতে আমাদের যন্ত্রপাতি আর খাবার জিনিস। দু ঘণ্টা পথ চলে আমরা এক জায়গায় এলাম, সেখানকার সবই কেমন অদ্ভুতরকম। বড়ো-বড়ো গাছ, তার একটারও নাম আমরা জানি না। একটা গাছে প্রকাণ্ড বেলের মতো মস্ত-মস্ত লাল রঙের ফল ঝুলছে; একটা ফুলের গাছ দেখলাম, তাতে হলদে সাদা ফুল হয়েছে, এক-একটা দেড় হাত লম্বা। আর-একটা গাছে ঝিঙের মতো কি সব ঝুলছে, পঁচিশ হাত দূর থেকে তার ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যায়। আমরা অবাক হয়ে এই-সব দেখছি, এমন সময় হঠাৎ হুপ্‌হাপ্ গুব্‌গাপ্ শব্দে পাহাড়ের উপর থেকে ভয়ানক একটা কোলাহল শোনা গেল।

"আমি আর শিকারী দুজন তৎক্ষণাৎ বন্দুক নিয়ে খাড়া; কিন্তু চন্দ্রখাই বাক্স থেকে দুই টিন জ্যাম বের করে নিশ্চিন্তে বসে খেতে লাগল। ঐটে তার একটা মস্ত দোষ; খাওয়া পেলে তার আর বিপদ আপদ কিছুই জ্ঞান থাকে না। এইভাবে প্রায় মিনিট দুই দাঁড়িয়ে থাকবার পর লক্কড় সিং হঠাৎ দেখতে পেল হাতির চাইতেও বড়ো কী একটা জন্তু গাছের উপর থেকে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। প্রথমে দেখে মনে হল একটা প্রকাণ্ড মানুষ, তার পর মনে হল মানুষ নয় বাঁদর, তার পর দেখি মানুষও নয়, বাঁদরও নয়—একেবারে নতুন রকমের জন্তু। সে লাল লাল ফলগুলোর খোসা ছাড়িয়ে খাচ্ছে আর আমাদের দিকে ফিরে ফিরে ঠিক মানুষের মতো করে হাসছে। দেখতে দেখতে পঁচিশ-ত্রিশটা ফল সে টপাটপ্ খেয়ে শেষ করল। আমরা এই সুযোগে তার কয়েকখানা ছবি তুলে ফেললাম। তার পর চন্দ্রখাই ভরসা করে এগিয়ে গিয়ে তাকে কিছু খাবার দিয়ে আসল। জন্তুটা মহা খুশি হয়ে এক গ্রাসে আস্ত একখানা পাঁউরুটি আর প্রায় আধসের গুড় শেষ করে, তার পর পাঁচ-সাতটা সিদ্ধ ডিম খোলাসুদ্ধ কড়্‌মড়িয়ে খেয়ে ফেলল। একটা টিনে করে গুড় দেওয়া হয়েছিল, সেই টিনটাও সে খাবার মতলব করেছিল, কিন্তু খানিকক্ষণ চিবিয়ে হঠাৎ বিশ্রী মুখ করে সে

কান্নার সুরে গাঁও গাঁও শব্দে বিকট চীৎকার করে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আমি জন্তুটার নাম দিয়েছি হ্যাংলাথেরিয়াম্।"

"২৪শে জুলাই, ১৯২২—বন্দাকুশ পাহাড়ের একুশ মাইল উত্তরে। এখানে এত দেখবার জিনিস আছে, নতুন নতুন এত-সব গাছপালা জীবজন্তু, যে তারই সন্ধান করতে আর নমুনা সংগ্রহ করতে আমাদের সময় কেটে যাচ্ছে। দুশোরকম পোকা আর প্রজাপতি আর পাঁচশোরকম গাছপালা ফুলফল সংগ্রহ করেছি; আর ছবি যে কত তুলেছি তার সংখ্যাই হয় না। একটা কোনো জ্যান্ত জানোয়ার ধরে সঙ্গে নেয়ার ইচ্ছা আছে, দেখা যাক কতদূর কি হয়। সেবার যখন কট্‌ক টোডন্ আমায় তাড়া করেছিল, তখন সে কথা কেউ বিশ্বাস করে নি। এবার তাই জলজ্যান্ত প্রমাণ সংগ্রহ করে নিচ্ছি।

"আমরা যখন বন্দাকুশ পাহাড়ে উঠেছিলাম, তখন পাহাড়টা কত উঁচু তা মাপা হয় নি। সেদিন জরীপের যন্ত্র দিয়ে আমি আর চন্দ্রখাই পাহাড়টাকে মেপে দেখলাম। আমার হিসাবে হল ষোলোহাজার ফুট। কিন্তু চন্দ্রখাই হিসাব করল বেয়াল্লিশহাজার। তাই আজ আবার সাবধানে দুজনে মিলে মেপে দেখলাম, এবার হল মোটে দুহাজার সাতশো ফুট। বোধ হয় আমাদের যন্ত্রে কোনো দোষ হয়ে থাকবে! যাহোক এটা নিশ্চয় যে এপর্যন্ত ঐ পাহাড়ের চুড়োয় আর কেউ ওঠে নি। এ-এক সম্পূর্ণ অজানা দেশ, কোথাও জনমানুষের চিহ্নমাত্র নাই, নিজেদের ম্যাপ নিজেরা তৈরি করে পথ চলতে হয়।

"আজ সকালে এক কাণ্ড হয়ে গেছে। লক্কড় সিং একটা গাছে হলদে রঙের ফল ফলেছে দেখে তারই একটুখানি খেতে গিয়েছিল। এক কামড় খেতেই হঠাৎ হাত-পা খিঁচিয়ে সে আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগল। তাই দেখে ছক্কড় সিং "ভাইয়া রে, ভাইয়া" বলে কেঁদে অস্থির। যাহোক মিনিট দশেক ঐরকম হাত-পা ছুঁড়ে লক্কড় সিং একটু ঠাণ্ডা হয়ে উঠে বসল। তখন আমাদের চোখে পড়ল যে একটা জন্তু কাছেই ঝোপের আড়াল থেকে অত্যন্ত বিরক্ত মতন মুখ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চেহারা দেখলে মনে হয় যে, সংসারে তার কোনো সুখ নেই, এ-সব গোলমাল কান্নাকাটি কিছুই তার পছন্দ হচ্ছে না। আমি তার নাম দিয়েছি গোমড়াথেরিয়াম্। এমন খিট্‌খিটে খুঁতখুঁতে গোমরা মেজাজের জন্তু আর আমরা দ্বিতীয় দেখি নি। আমরা তাকে তোয়াজ টোয়াজ করে খাবার দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করেছিলাম। সে অত্যন্ত বিশ্রী মতো মুখ করে, ফোঁস্ ফোঁস্ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে অনেক আপত্তি জানিয়ে, আধখানা পাঁউরুটি আর দুটো কলা খেয়ে

তার পর একটুখানি পেয়ারার জেলি মুখে দিতেই এমন চটে গেল যে রেগে সারা গায়ে জেলি আর মাখন মাখিয়ে আমাদের দিকে পিছন ফিরে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগল।"

"১৪ই আগস্ট, বন্দাকুশ পাহাড়ের পঁচিশ মাইল উত্তর—ট্যাপ্ ট্যাপ্ থ্যাপ্ থ্যাপ্ ঝুপ্ ঝাপ্—সকালবেলায় খেতে বসেছি, এমন সময় এইরকম একটা শব্দ শোনা গেল। একটুখানি উঁকি মেরে দেখি আমাদের তাঁবুর কাছে প্রায় উটপাখির মতন বড়ো একটা অদ্ভুতরকম পাখি অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে কোন দিকে চলবে তার কিছুই যেন ঠিক-ঠিকানা নাই। ডান পা এদিকে যায় তো বাঁ পা ওদিকে; সামনে চলবে তো পিছনভাগে চায়, দশ পা না যেতেই পায়ে পায়ে জড়িয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে। তার বোধ হয় ইচ্ছা ছিল তাঁবট ভালো করে দেখে, কিন্তু হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়ে সে এমন ভড়কে গেল যে তক্ষুনি হুমড়ি খেয়ে হুড়্মুড়্ করে পড়ে গেল। তার পর এক ঠ্যাঙে লাফাতে লাফাতে প্রায় হাত দশেক গিয়ে আবার হেলেদুলে ঘাড় বাঁকিয়ে আমাদের দেখতে লাগল। চন্দ্রখাই বলল, "ঠিক হয়েছে, এইটাকে ধরে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাক।" তখন সকলের উৎসাহ দেখে কে! আমি ছক্কড় সিংকে বললাম,"তুমি বন্দুকের আওয়াজ কর, তা হলে পাখিটা নিশ্চয়ই চমকে পড়ে যাবে আর সেই সুযোগে আমরা চার-পাঁচজন তাকে চেপে ধরব! ছক্কড় সিং বন্দুক নিয়ে আওয়াজ করতেই পাখিটা ঠ্যাং মুড়ে মাটির উপর বসে পড়ল, আর আমাদের দিকে তাকিয়ে ক্যাট্ ক্যাট্ শব্দ করে ভয়ানক জোরে ডানা ঝাপ্টাতে লাগল। তাই দেখে আমাদের আর এগুতে সাহস হল না। কিন্তু লক্কড় সিং হাজার হোক তেজী লোক, সে দৌড়ে গিয়ে পাখিটার বুকে ধাঁই করে এক ছাতার বাড়ি বসিয়ে দিল। ছাতার বাড়ি খেয়ে পাখিটা তৎক্ষণাৎ দুই পা ফাঁক করে উঠে দাঁড়াল। তার পর লক্কড় সিং-এর দাড়িতে কামড়ে ধরে তার ঘাড়ের উপর দুই পা দিয়ে ঝুলে পড়ল। ভাইয়ের বিপদ দেখে ছক্কড় সিং বন্দুকেরবাঁট দিয়ে পাখিটার মাথাটা থেঁৎলে দেবার আয়োজন করেছিল।

কিন্তু সে আঘাতটা পাখিটার মাথায় লাগল না, লাগল গিয়ে লক্কড় সিং-এর বুকে। তাতে পাখিটা ভয় পেয়ে লক্কড় সিংকে ছেড়ে দিল বটে, কিন্তু দুই ভাইয়ে এমন মারামারি বেধে

উঠল যে আমরা ভাবলাম দুটোই এবার মরে বুঝি। দুজনের তেজ কি তখন! আমি আর দুজন কুলি ছক্কড় সিং-এর জামা ধরে টেনে রাখছি, সে আমাদের সুদ্ধ হিঁচড়ে নিয়ে ভাইয়ের নাকে ঘুঁষি চালাচ্ছে। চন্দ্রখাই রীতিমতো ভারিক্কে মানুষ; সে ছক্কড় সিং-এর কোমর ধরে লটকে আছে, ছক্কড় সিং তাই সুদ্ধ মাটির থেকে তিন হাত লাফিয়ে উঠে বন্‌বন্‌ করে বন্দুক ঘোরাচ্ছে। হাজার হোক পাঞ্জাবের লোক কি না। মারামারি থামাতে গিয়ে সেই ফাঁকে পাখিটা যে কখন পালালো তা আমরা টেরই পেলাম না। যাহোক এই ল্যাগ্‌ব্যাগে পাখি বা ল্যাগ-ব্যাগর্নিসের কতকগুলো পালক আর কয়েকটা ফোটোগ্রাফ সংগ্রহ হয়েছিল। তাতেই যথেষ্ট প্রমাণ হবে।"

"১লা সেপ্টেম্বর, কাঁকড়ামতী নদীর ধারে—আমাদের সঙ্গের খাবার ইত্যাদি ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। তরিতরকারি যা ছিল, তা তো আগেই ফুরিয়েছে। টাটকা জিনিসের মধ্যে সঙ্গে কতগুলো হাঁস আর মুরগি আছে, তারা রোজ কয়েকটা করে ডিম দেয়, তা ছাড়া খালি বিস্কুট, জ্যাম, টিনের দুধ আর ফল, টিনের মাছ, আর মাংস। এই-সব কয়েক সপ্তাহের মতো আছে, সুতরাং এই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের ফিরতে হবে। আমরা এই-সব জিনিস গুনছি আর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছি, এমন সময় ছক্কড় সিং বলল যে, লক্কড় সিং ভোরবেলা কোথায় বেরিয়েছে, এখন পর্যন্ত ফেরে নি। আমরা বললাম, "ব্যস্ত কেন, সে আসবে এখন। যাবে আবার কোথায়?" কিন্তু তার পরেও দুই-তিন ঘণ্টা গেল অথচ লক্কড় সিং-এর দেখা পাওয়া গেল না। আমরা তাকে খুঁজতে বেরুবরি পরামর্শ করছি, এমন সময় হঠাৎ একটা ঝোপের উপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড জানোয়ারের মাথা দেখা গেল। মাথাটা উঠছে নামছে আর মাতালের মতো টলছে। দেখেই আমরা সুড়্‌সুড়্‌ করে তাঁবুর আড়ালে পালাতে যাচ্ছি, এমন সময় শুনলাম লক্কড় সিং চেঁচিয়ে বলছে, "পালিয়ো না, পালিয়ো না, ও কিছু বলবে না।" তার পরের মুহূর্তেই দেখি লক্কড় সিং বুক ফুলিয়ে সেই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তার পাগড়ির কাপড় দিয়ে সে ঐ অত বড়ো জানোয়ারটাকে বেঁধে নিয়ে এসেছে। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে লক্কড় সিং বলল যে, সে সকালবেলায় কুঁজো নিয়ে নদী থেকে জল আনতে গিয়েছিল। ফিরবার সময় এই জন্তুটার সঙ্গে তার দেখা। তাকে দেখেই জন্তুটা মাটিতে শুয়ে কোঁ-কোঁ শব্দ করতে লাগল। সে দেখল জন্তুটার পায়ে কাঁটা ফুটেছে আর তাই দিয়ে দর্‌দর্‌ করে রক্ত পড়ছে। লক্কড় সিং খুব সাহস করে তার পায়ের কাঁটাটি তুলে, বেশ করে মুছে, নিজের রুমাল দিয়ে বেঁধে দিল। তার পর জানোয়ারটা তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে দেখে সে তাকে পাগড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে এসেছে। আমরা সবাই বললাম, "তা হলে ওটা ঐরকম বাঁধাই থাক, দেখি ওটাকে সঙ্গে করে দেশে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা।" জন্তুটার নাম রাখা গেল ল্যাংড়াথেরিয়াম্‌।

"সকালে তো এই কাণ্ড হল; বিকালবেলা আর এক ফ্যাসাদ উপস্থিত। তখন আমরা সবেমাত্র তাঁবুতে ফিরেছি। হঠাৎ আমাদের তাঁবুর বেশ কাছেই একটা বিকট চীৎকারের শব্দ শোনা গেল। অনেকগুলো চিল আর পেঁচা একসঙ্গে চেঁচালে যেরকম আওয়াজ হয়, কতকটা সেইরকম। ল্যাংড়াথেরিয়ামটা ঘাসের উপর শুয়ে শুয়ে একটা গাছের লম্বা-লম্বা পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছিল; চীৎকার শুনবামাত্র সে, ঠিক শেয়াল যেমন করে ফেউ ডাকে সেই-

রকম ধরনের একটা বিকট শব্দ করে, বাঁধন-টাধন ছিঁড়ে, কতক লাফিয়ে কতক দৌড়িয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে গভীর জঙ্গলের ভিতর মিলিয়ে গেল। আমরা ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে না পেরে ভয়ে ভয়ে খুব সাবধানে এগিয়ে গিয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড জন্তু—সেটা কুমিরও নয়, সাপও নয়, মাছও নয়, অথচ তিনটারই কিছু কিছু আদল আছে—সে এক হাত মস্ত হাঁ করে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে ; আর একটা ছোটো নিরীহ গোছের কি যেন জানোয়ার হাত-পা এলিয়ে ঠিক তার মুখের সামনে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। আমরা মনে করলাম যে, এইবার
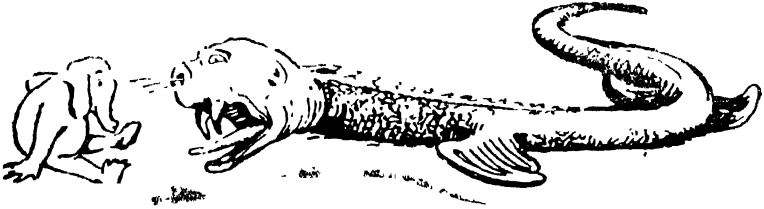
বেচারাকে খাবে বুঝি, কিন্তু পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, কেবল চীৎকারই চলতে লাগল ; খাবার কোনো চেষ্টাই দেখা গেল না। লক্কড় সিং বলল, "আমি ওটাকে গুলি করি।" আমি বললাম, "কাজ নেই, গুলি যদি ঠিকমতো না লাগে, তা হলে জন্তুটা ক্ষেপে গিয়ে কি জানি করে বসবে, তা কে জানে ?" এই বলতে বলতেই ধেড়ে জন্তুটা চীৎকার থামিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে নদীর দিকে চলে গেল। চন্দ্রখাই বলল, "এ জন্তুটার নাম দেওয়া থাক চিল্লানোসরাস্।" ছক্কড় সিং বলল, "উ বাচ্চাকো নাম দেও, বেচারাথেরিয়াম্।"

"৭ই সেপ্টেম্বর, কাঁকড়ামতী নদীর ধারে—নদীর বাঁক ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা পাহাড়ের একেবারে শেষ কিনারায় এসে পড়েছি। আর কোনোদিকে এগোবার জো নাই। দেওয়ালের মতো খাড়া পাহাড় ; সোজা দুশো-তিনশো হাত নীচে সমতল জমি পর্যন্ত নেমে

গিয়েছে। যেদিকে তাকাই সেই দিকেই এরকম। নীচের যে সমতল জমি সে একেবারে মরুভূমির মতো; কোথাও গাছপালা, জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নাই। আমরা একেবারে পাহাড়ের কিনারায় ঝুঁকে এই-সব দেখছি, এমন সময় আমাদের ঠিক হাত পঞ্চাশেক নীচেই কি যেন একটা ধড়্ফড়্ করে উঠল। দেখলাম বেশ একটা মাঝারি গোছের তিমি মাছের মতো মস্ত কি একটা জন্তু পাহাড়ের গায়ে আঁকড়ে ধরে বাদুড়ের মতো মাথা নিচু করে ঘুমাচ্ছে। তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে এইরকম আরো পাঁচ-সাতটা জন্তু দেখতে পেলাম। কোনোটা ঘাড় গুঁজে ঘুমাচ্ছে, কোনোটা লম্বা গলা ঝুলিয়ে দোল খাচ্ছে, আর অনেক দূরে একটা পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে ঠোঁট ঢুকিয়ে কি যেন খুঁটে খুঁটে বের করে খাচ্ছে। এইরকম দেখছি এমন সময় হঠাৎ কট্ কটাং কট্ শব্দ করে সেই প্রথম জন্তুটা হুড়ুৎ করে ডানা মেলে একেবারে সোজা আমাদের দিকে উড়ে আসতে লাগল। ভয়ে আমাদের হাত-পাগুলো গুটিয়ে আসতে লাগল; এমন বিপদের সময় যে পালানো দরকার, তা পর্যন্ত আমরা ভুলে গেলাম। জন্তুটা মুহূর্তের মধ্যে একেবারে আমাদের মাথার উপরে এসে পড়ল। তার পর কি যে হল তা আমার ভালো করে মনে নাই—খালি একটু-একটু মনে পড়ে, একটা অসম্ভব বিটকেল গন্ধের সঙ্গে ঝড়ের মতো ডানা ঝাপটানো আর জন্তুটার ভয়ানক কট্ কটাং
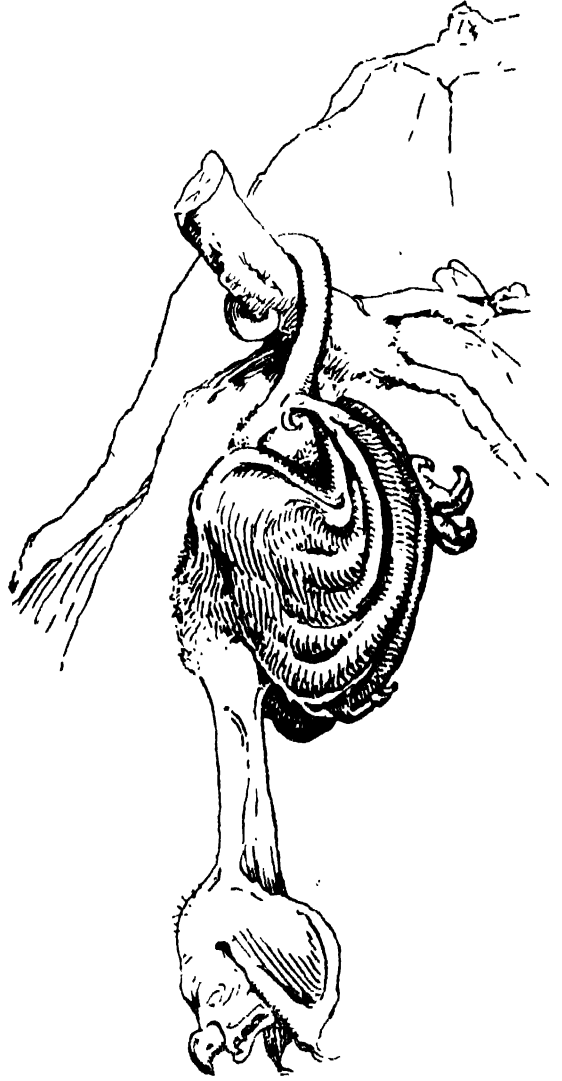
আওয়াজ। একটুখানি ডানার ঝাপটা আমার গায়ে লেগেছিল তাতেই আমার দম বেরিয়ে প্রাণ বের হবার জোগাড় করেছিল। অন্যসকলের অবস্থাও সেইরকম অথবা তার চাইতেও খারাপ। যখন আমার হুঁশ হল তখন দেখি সকলেরই গা বেয়ে রক্ত পড়ছে। ছক্কড় সিং-এর একটা চোখ ফুলে প্রায় বন্ধ হবার জোগাড় হয়েছে, লক্কড় সিং-এর বাঁ হাতটা এমন মচকে

গিয়েছে যে সে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে, আমারও সমস্ত বুকে পিঠে বেদনা ধরে গিয়েছে ; কেবল চন্দ্রখাই এক হাতে রুমাল দিয়ে কপালের আর ঘাড়ের রক্ত মুছছে, আর-এক হাতে একমুঠো বিস্কুট নিয়ে খুব মন দিয়ে খাচ্ছে। আমরা তখনই আর বেশি আলোচনা না করে জিনিসপত্র গুটিয়ে বন্দাকুশ পাহাড়ের দিকে ফিরে চললাম।"

[প্রফেসর হুঁশিয়ারের ডায়েরি এইখানেই শেষ। কিন্তু আমরা আরো খবর জানবার জন্য তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম। তার উত্তরে তিনি তাঁর ভাগ্নেকে পাঠিয়ে দিয়ে লিখলেন, "এর কাছেই সব খবর পাবে।" চন্দ্রখাই-এর সঙ্গে আমাদের যে কথাবার্তা হয় খুব সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই—

আমরা। আপনারা যে-সমস্ত নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন সে-সব কোথায় গেলে দেখতে পাওয়া যায় ?

চন্দ্র। সে-সব হারিয়ে গেছে।

আমরা। বলেন কি! হারিয়ে গেল ? এমন সব জিনিস হারিয়ে ফেললেন!

চন্দ্র। হ্যাঁ, প্রাণটুকু যে হারায় নি তাই যথেষ্ট। সে-দেশের ঝড় তো আপনারা দেখেন নি। তার এক-এক ঝাপটায় আমাদের যন্ত্রপাতি, বড়ো-বড়ো তাঁবু আর নমুনার বাক্স, সব কাগজের মতো হুস্ করে উড়িয়ে নেয়। আমাকেই তো পাঁচ-সাতবার উড়িয়ে নিয়েছিল। একবার তো ভাবলাম মরেই গেছি। কুকুরটাকে যে কোথায় উড়িয়ে নিল, সে তো আর খুঁজেই পেলাম না। সে যা বিপদ! কাঁটা কম্পাস, প্ল্যান ম্যাপ, খাতাপত্র, কিছুই আর বাকি রাখে নি। কি করে যে ফিরলাম, তা শুনলে আপনার ঐ চুল দাড়ি সব সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠবে। আধপেটা খেয়ে, কোনোদিন না খেয়ে, আন্দাজে পথ চলে, দুই সপ্তাহের রাস্তা পার হতে আমাদের পুরো তিনমাস লেগেছিল।

আমরা। তা হলে আপনাদের প্রমাণ-টমান যা কিছু ছিল সব নষ্ট হয়েছে ?

চন্দ্র। এই তো আমি রয়েছি, মামা রয়েছেন, আবার কি প্রমাণ চাই, আর এই আপনাদের জন্য কতকগুলো ছবি এঁকে এনেছি ; এতেও অনেকটা প্রমাণ হবে।

আমাদের ছাপাখানার একটা ছোকরা ঠাট্টা করে বলল, "আপনি কোন থেরিয়াম ?" আর-একজন বলল, "উনি হচ্ছেন গপ্পথেরিয়াম—বসে বসে গপ্প মারছেন।" শুনে চন্দ্রখাই ভীষণ রেগে আমাদের টেবিল থেকে একমুঠো চীনেবাদাম আর গোটা আষ্টেক পান উঠিয়ে নিয়ে গজ্‌গজ্ করতে করতে বেরিয়ে গেল। ব্যাপার তো এই। এখন তোমরা কেউ যদি আরো জানতে চাও, তা হলে আমাদের ঠিকানায় প্রফেসর হুঁশিয়ারকে চিঠি লিখলে আমরা তার জবাব আনিয়ে দিতে পারি।]

সন্দেশ, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ—১৩৩০

নাটক

সুকুমার রায়ের ঝালাপালা ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল নাটক দুটি প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান খণ্ডে সুকুমারের অবশিষ্ট সমস্ত নাটক প্রকাশিত হল। এর মধ্যে অবাক জলপান (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭), হিংসুটি (ভাদ্র, ১৩২৭) ও মামা গো (চৈত্র, ১৩২৭) 'সন্দেশ'-এর সম্পাদনাকালে সুকুমার রচনা করেন। মামা গো নাটিকাটি সিগনেট প্রেস প্রকাশিত সুকুমার রায়ের নাট্য-সংকলন 'ঝালাপালা'র পরিবর্ধিত সংস্করণে ছিল না। 'ঝালাপালা'র প্রথম সংস্করণে (১৩৫১) ঝালাপালা, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, অবাক জলপান ও হিংসুটি এই চারটি নাটক সংকলিত হয়েছিল। পরবর্তী সংস্করণে (বৈশাখ, ১৩৬৯) বাকি তিনটি নাটক সংকলিত হয়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত 'সুকুমার সাহিত্য সমগ্র'র দ্বিতীয় খণ্ডে মামা গো নাটিকাটি সংকলিত হয়েছে। ভাবুক সভা (আশ্বিন, ১৩২১) লেখক অঙ্কিত চিত্র-সহ প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম ১৩২১ সালে রচিত হয়। ১৯২৪ সালে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব-অনুষ্ঠানে সুকুমার রায় ও তাঁর সম্প্রদায় এই নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। পরবর্তী কালে 'অলকা' পত্রিকায় নাটকটি প্রকাশিত হয়।

চলচিত্তচঞ্চরি নাটকটি 'শব্দকল্পদ্রুমে'র প্রায় সমসাময়িক রচনা। কিন্তু সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পরে বিচিত্রা পত্রিকার আশ্বিন, ১৩৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম' বা চলচিত্তচঞ্চরি এই দুটি নাটককে ঠিক কিশোর-মনের উপযোগী বলা যায় না বটে কিন্তু তার বহিরঙ্গের রসগ্রহণে কিশোর পাঠকেরাও পলকিত হবেন নিশ্চয়ই। এই দুটি নাটকে সুকুমারের বিচিত্র শব্দসৃষ্টি ও ভাষা ব্যবহার লক্ষ্য করার মতো। পণ্ডিত ও রসিক এখানে একাত্ম হয়ে-গেছেন, নাটকগুলিও হয়ে উঠেছে সর্বজন উপভোগ্য।

নাটকের 'পাঠ'-এ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত 'পাঠ'কেই আমরা গ্রহণ করেছি। সিগনেট সংস্করণে 'হিংসুটি' নাটকটিতে সুকুমার রায়ের 'হিংসুটি' নামক কবিতাটি যুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু পত্রিকার পাঠে না থাকায় এটি আমরা প্রথমে গ্রহণ করেও তার পর বর্জন করলাম। নাটকগুলির বিন্যাসে কোনো কালানুক্রম অনুসৃত হয় নি।

সূচীপত্র

অবাক জলপান

পাত্রগণ : পথিক। ঝুড়িওয়ালা। প্রথম বৃদ্ধ। দ্বিতীয় বৃদ্ধ। ছোকরা। খোকা। মামা

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ

ছাতা মাথায় এক পথিকের প্রবেশ। পিঠে লাঠির আগায় লোটা-বাঁধা পুঁটলি, উস্কখুস্ক চুল, শ্রান্ত চেহারা

পথিক। নাঃ—একটু জল না পেলে আর চলছে না। সেই সকাল থেকে হেঁটে আসছি, এখনো প্রায় এক ঘণ্টার পথ বাকি। তেষ্টায় মগজের ঘিলু পর্যন্ত শুকিয়ে উঠল। কিন্তু জল চাই কার কাছে? গেরস্তর বাড়ি দুপুর রোদে দরজা এঁটে সব ঘুম দিচ্ছে, ডাকলে সাড়া দেয় না। বেশি চেঁচাতে গেলে হয়তো লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে। পথেও তো লোকজন দেখছি নে!—ঐ একজন আসছে। ওকেই জিগ্‌গেস করা যাক।

ঝুড়ি মাথায় এক ব্যক্তির প্রবেশ

পথিক। মশাই, একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?

ঝুড়িওয়ালা। জলপাই? জলপাই এখন কোথায় পাবেন? এ তো জলপাইয়ের সময় নয়। কাঁচা আম চান দিতে পারি—

পথিক। না, না, আমি তা বলি নি—

ঝুড়িওয়ালা। না, কাঁচা আম আপনি বলেন নি, কিন্তু জলপাই চাচ্ছিলেন কিনা, তা তো আর এখন পাওয়া যাবে না, তাই বলছিলুম—

পথিক। না হে, আমি জলপাই চাচ্ছি নে—

ঝুড়িওয়ালা। চাচ্ছেন না তো, 'কোথায় পাব' 'কোথায় পাব' কচ্ছেন কেন? খামকা এরকম করবার মানে কি?

পথিক। আপনি ভুল বুঝেছেন—আমি জল চাচ্ছিলাম—

ঝুড়িওয়ালা। জল চাচ্ছেন তো 'জল' বললেই হয়—'জলপাই' বলবার দরকার কি? জল আর জলপাই কি এক হল? আলু আর আলুবোখরা কি সমান? মাছও যা আর মাছরাঙাও তাই? বরকে কি আপনি বরকন্দাজ বলেন? চাল কিনতে গেলে কি চালতার খোঁজ করেন?

পথিক। ঘাট হয়েছে মশায়। আপনার সঙ্গে কথা বলাই আমার অন্যায় হয়েছে।

ঝুড়িওয়ালা। অন্যায় তো হয়েছেই। দেখছেন ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছি—তবে জলই-বা চাচ্ছেন কেন? ঝুড়িতে করে কি জল নেয়? লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে একটু বিবেচনা করে বলতে হয়।

[ঝুড়িওয়ালার প্রস্থান

পথিক। দেখলে! কি কথায় কি বানিয়ে ফেললে! যাক, ঐ বুড়ো আসছে, ওকে একবার বলে দেখি।

লাঠি হাতে, চটি পায়ে, চাদর গায়ে এক বৃদ্ধের প্রবেশ

বৃদ্ধ। কে ও? গোপলা নাকি?

পথিক। আজ্ঞে না, আমি পুব গাঁয়ের লোক—একটু জলের খোঁজ করছি—

বৃদ্ধ। বল কিহে? পুব গাঁও ছেড়ে এখেনে এয়েছ জলের খোঁজ করতে?—হাঃ, হাঃ, হাঃ। তা যাই বল বাপু, অমন জল কিন্তু কোথাও পাবে না। খাসা জল, তোফা জল, চমৎকা-া-র জল।

পথিক। আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই সকাল থেকে হাঁটতে-হাঁটতে বেজায় তেষ্টা পেয়ে গেছে।

বৃদ্ধ। তা তো পাবেই। ভালো জল যদি হয়, তা দেখলে তেষ্টা পায়, নাম করলে তেষ্টা পায়, ভাবতে গেলে তেষ্টা পায়। তেমন-তেমন জল তো খাও নি কখনো!—বলি ঘুম্‌ড়ির জল খেয়েছ কোনোদিন?

পথিক। আজ্ঞে না, তা খাই নি—

বৃদ্ধ। খাও নি? অ্যাঃ! ঘুম্‌ড়ি হচ্ছে আমার মামাবাড়ি—আদত জলের জায়গা। সেখানকার যে জল সে কি বলব তোমায়? কত জল খেলাম—কলের জল, নদীর জল, ঝরনার জল, পুকুরের জল—কিন্তু মামাবাড়ির কুয়োর যে জল,

অমনটি আর কোথাও খেলাম না। ঠিক যেন চিনির পানা, ঠিক যেন কেওড়া-দেওয়া শরবৎ।

পথিক। তা মশাই আপনার জল আপনি মাথায় করে রাখুন—আপাতত এখন এই তেষ্টার সময় যাহয় একটু জল আমার গলায় পড়লেই চলবে—

বৃদ্ধ। তা হলে বাপু তোমার গাঁয়ে বসে জল খেলেই তো পারতে? পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে জল খেতে আসবার দরকার কি ছিল? 'যা হয় একটা হলেই হল' ও আবার কিরকম কথা? আর অমন তাচ্ছিল্য করে বলবারই-বা দরকার কি? আমাদের জল পছন্দ না হয় খেও না—ব্যস। গায়ে পড়ে নিন্দে করবার দরকার কি? আমি ওরকম ভালোবাসি নে। হ্যাঃ—

[রাগে গজগজ করিতে-করিতে বৃদ্ধের প্রস্থান

পাশের এক বাড়ির জানলা খুলিয়া আর
এক বৃদ্ধের হাসিমুখে বাহির করণ

বৃদ্ধ। কি হে! এত তর্কাতর্কি কিসের?

পথিক। আজ্ঞে না, তর্ক নয়। আমি জল চাইছিলুম, তা উনি সে কথা কানেই নেন না—কেবলই সাত-পাঁচ গপ্পো করতে লেগেছেন। তাই বলতে গেলুম তো রেগে-মেগে অস্থির!

বৃদ্ধ। আরে দূর দূর! তুমিও যেমন! জিগ্‌গেস করবার আর লোক পাও নি? ও হতভাগা জানেই-বা কি, আর বলবেই-বা কি? ওর যে দাদা আছে, খালিপুরে চাকরি করে, সেটা তো একটা আস্ত গাধা। ও মুখ্যুটা কি বললে তোমায়?

পথিক। কি জানি মশাই—জলের কথা বলতেই কুয়োর জল, নদীর জল, পুকুরের জল, কলের জল, মামাবাড়ির জল, বলে পাঁচরকম ফর্দ শুনিয়ে দিলে—

বৃদ্ধ। হুঁঃ—ভাবলে খুব বাহাদুরি করেছি। তোমায় বোকা মতন দেখে খুব চাল চেলে নিয়েছে। ভারি তো ফর্দ করেছেন! আমি লিখে দিতে পারি, ও যদি পাঁচটা জল বলে থাকে তা আমি এক্ষুনি পঁচিশটা বলে দেব—

পথিক। আজ্ঞে হ্যাঁ! কিন্তু আমি বলছিলুম কি একটু খাবার জল—

বৃদ্ধ। কি বলছ? বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা শুনে যাও। বিষ্টির জল, ডাবের জল, নাকের জল, চোখের জল, জিভের জল, হুঁকোর জল, শান্তি জল, ফটিক জল, রোদে ঘেমে জ—ল, আহ্লাদে গলে জ—ল, গায়ের রক্ত জ ল, বুঝিয়ে দিল যেন জ—ল —কটা হল? গোনো নি বুঝি?

পথিক। না মশাই, গুনি নি—আমার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই—

বৃদ্ধ। তোমার কাজ না থাকলেও আমার কাজ থাকতে পারে তো? যাও, যাও, মেলা বকিও না—একেবারে অপদার্থের একশেষ!

বৃদ্ধের সশব্দে জানলা বন্ধ করণ

পথিক। নাঃ, আর জল-টল চেয়ে কাজ নেই—এগিয়ে যাই, দেখি কোথাও পুকুর-টুকুর পাই কি না।

লম্বা-লম্বা চুল, চোখে সোনার চশমা, হাতে খাতা-
পেন্সিল, পায়ে কটকী জুতো, একটি
ছোকরার প্রবেশ

লোকটা নেহাত এসে পড়েছে যখন একটু জিজ্ঞাসাই করে দেখি। মশাই, আমি অনেক দূর থেকে আসছি, এখানে একটু জল মিলবে-না কোথাও?

ছোকরা। কি বলছেন? 'জল' মিলবে না? খুব মিলবে। একশোবার মিলবে। দাঁড়ান এক্ষুনি মিলিয়ে দিচ্ছি—জল চল তল বল কল ফল—মিলের অভাব কি? কাজল-সজল-উজ্জ্বল-জ্বলজ্বল—চঞ্চল চল চল, আঁখিজল ছলছল, নদীজল কলকল, হাসি শুনে খলখল, অ্যাকানল, ব্যাকানল, আগল ছাগল পাগল—কত চান?

পথিক। এ দেখি আরেক পাগল! মশাই আমি সেরকম মিলবার কথা বলি নি।

ছোকরা। তবে কোনরকম মিল চাচ্ছেন বলুন? কিরকম, কোন ছন্দ, সব বলে দিন—যেমনটি চাইবেন তেমনটি করে মিলিয়ে দেব।

পথিক। ভালো বিপদেই পড়া গেল দেখছি—(জোরে) মশাই! আর কিছু চাই নে, (আরো জোরে) শুধু একটু জল খেতে চাই!

ছোকরা। ও, বুঝেছি! শুধু—একটু—জল—খেতে—চাই। এই তো? আচ্ছা বেশ। এ আর মিলবে না কেন?—শুধু একটু জল খেতে চাই—ভারি তেষ্টা প্রাণ আই-ঢাই। চাই কিন্তু কোথা গেলে পাই—বল্ শীঘ্র বল্ নারে ভাই। কেমন ঠিক মিলছে তো?

পথিক। আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব মিলছে—খাসা মিলছে—নমস্কার। (সরিয়া গিয়া) নাঃ বকে-বকে মাথা ধরিয়ে দিলে—একটু ছায়ায় বসে মাথাটা ঠাণ্ডা করে নিই।

পথিক একটা বাড়ির ছায়ায় গিয়া বসিল

ছোকরা। (খুশি হইয়া লিখিতে-লিখিতে) মিলিবে না? বলি, মেলাচ্ছে কে? সেবার যখন বিষ্টুদা 'বৈকাল' কিসের সঙ্গে মিল দেবে খুঁজে পাচ্ছিল না, তখন 'নৈপাল' বলে দিয়েছিল কে? নৈপাল কাকে বলে জানেন তো? নেপালের লোক হল নৈপাল (পথিককে না দেখিয়া) লোকটা গেল কোথায়? দুত্তেরি!

[ছোকরার প্রস্থান

নেপথ্যে বাড়ির ভিতরে বালকের পাঠ—
পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল
সমুদ্রের জল লবণাক্ত, অতি বিস্বাদ।

পথিক। ওহে খোকা। একটু এদিকে শুনে যাও তো?

রুক্ষমূর্তি, মাথায় টাক, লম্বা দাড়ি খোকার মামা বাড়ি হইতে বাহির হইলেন

মামা। কে হে? পড়ার সময় ডাকাডাকি করতে এয়েছ? —(পথিককে দেখিয়া) ও। আমি মনে করেছিলুম পাড়ার কোনো ছোকরা বুঝি। আপনার কি দরকার?

পথিক। আজ্ঞে, জলতেষ্টায় বড়ো কষ্ট পাচ্ছি—তা একটু জলের খবর কেউ বলতে পারলে না।

মামার তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলিয়া দেওয়া

মামা। কেউ বলতে পারলে না? আসুন, আসুন। কি খবর চান, কি জানতে চান, বলুন দেখি? সব আমায় জিগ্‌গেস করুন, আমি বলে দিচ্ছি।

পথিককে মামার ঘরের মধ্যে টানিয়া নেওয়া

দ্বিতীয় দৃশ্য

ঘরের ভিতর

ঘর নানারকম যন্ত্র, নকশা, রাশি-রাশি বই ইত্যাদিতে সজ্জিত

মামা। কি বলছিলেন? জলের কথা জিগ্‌গেস করছিলেন না?

পথিক। আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই সকাল থেকে হাঁটতে-হাঁটতে আসছি।

মামা। আ হা হা! কি উৎসাহ! কি আগ্রহ! শুনেও সুখ হয়। এরকম জানবার আকাঙ্ক্ষা কজনের আছে, বলুন তো? বসুন! বসুন! (কতকগুলি ছবি আর বই আর এক টুকরো খড়ি বাহির করিয়া) জলের কথা জানতে গেলে প্রথমে জানা দরকার, জল কাকে বলে, জলের কি গুণ—

পথিক। আজ্ঞে, একটু খাবার জল যদি—

মামা। আসছে—ব্যস্ত হবেন না। একে একে সব কথা আসবে জল হচ্ছে দুই ভাগ হাইড্রোজেন আর এক ভাগ অক্সিজেন—

[মামা বোর্ডে খড়ি দিয়া লিখিলেন—$H_2+O=H_2O$

পথিক। এই মাটি করেছে!

মামা। বুঝলেন? রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জলকে বিশ্লেষণ করলে হয়—হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন! আর হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হলেই, হবে জল! শুনেছেন তো?

পথিক। আজ্ঞে হ্যাঁ, সব শুনছি। কিন্তু একটু খাবার জল যদি দেন, তা হলে আরো মন দিয়ে শুনতে পারি।

মামা। বেশ তো। খাবার জলের কথাই নেওয়া যাক-না। খাবার জল কাকে বলে? না, যে জল পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর, যাতে দুর্গন্ধ নাই, রোগের বীজ নাই—কেমন? এই দেখুন এক শিশি জল—আহা, ব্যস্ত হবেন না। দেখতে মনে হয় বেশ পরিষ্কার, কিন্তু অণুবীক্ষণ দিয়ে যদি দেখেন, দেখবেন পোকা সব কিলবিল করছে। কেঁচোর মতো কৃমির মতো সব পোকা—এমনি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখায় ঠিক এতো বড়ো-বড়ো। এই বোতলের মধ্যে দেখুন ও বাড়ির পুকুরের জল, আমি এইমাত্র পরীক্ষা করে দেখলুম, ওর মধ্যে রোগের বীজ সব গিজগিজ করছে—প্লেগ, টাইফয়েড ওলাউঠো, ঘেয়োজ্বর—ও জল খেয়েছেন কি মরেছেন! এই ছবি দেখুন—এইগুলো হচ্ছে কলেরার বীজ, এই ডিপথিরিয়া, এই নিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়া—সব আছে। আর এই-সব হচ্ছে জলের পোকা—জলের মধ্যে শেওলা ময়লা যা-কিছু থাকে, ওরা সেইগুলো খায়। আর এই জলটার কি দুর্গন্ধ দেখুন! পচা পুকুরের জল—ছেঁকে নিয়েছি, তবু গন্ধ।

পথিক। উঁ হুঁ হুঁ হুঁ। করেন কি মশাই? ও-সব জানবার কিচ্ছু দরকার নেই—

মামা। খুব দরকার আছে। এ-সব জানতে হয়—অত্যন্ত দরকারি কথা।

পথিক। হোক দরকারি, আমি জানতে চাই নে, এখন আমার সময় নেই।

মামা। এই তো জানবার সময়। আর দুদিন বাদে যখন বুড়ো হয়ে মরতে বসবেন, তখন জেনে লাভ কি? জলে কি-কি দোষ থাকে, কি করে সে-সব ধরতে হয়, কি করে তার শোধন হয়, এ-সব কি জানবার মতো কথা নয়? এই যে নদীর জল সব সমুদ্রে যাচ্ছে, সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে উঠছে, মেঘ হচ্ছে, বৃষ্টি পড়ছে—এরকম কেন হয়, কিসে হয়, তাও তো জানা দরকার।

পথিক। দেখুন মশাই। কি করে যে কথাটা আপনাদের মাথায় ঢোকাব তা তো ভেবে পাই নে। বলি, বার বার করে যে বলছি—তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, সেটা তো কেউ কানে নিচ্ছেন না দেখি। একটা লোক তেষ্টায় জল-জল করছে, তবু জল খেতে পায় না, এরকম কোথাও শুনেছেন?

মামা। শুনেছি বৈকি—চোখে দেখেছি। বদ্যিনাথকে কুকুরে কামড়াল, বদ্যিনাথের হল হাইড্রোফোবিয়া—যাকে বলে জলাতঙ্ক। আর জল খেতে পারে না—যেই জল খেতে যায় অমনি গলায় খিঁচ ধরে যায়। মহা মুশকিল!—শেষটায় ওঝা ডেকে, ধুতরো দিয়ে ওষুধ মেখে খাওয়াল, মন্তর চালিয়ে বিষ ঝাড়াল—তার পর সে জল খেয়ে বাঁচল। ওরকম হয়।

পথিক। নাঃ, এদের সঙ্গে আর পেরে ওঠা গেল না—কেনই বা মরতে এয়েছিলাম এখানে? বলি মশাই, আপনার এখানে নোংরা জল আর দুর্গন্ধ জল ছাড়া ভালো খাঁটি জল কিছু নেই?

মামা। আছে বৈকি! এই দেখুন-না বোতলভরা টাটকা খাঁটি 'ডিস্টিল ওয়াটার'—যাকে বলে 'পরিস্রুত জল'।

বড়ো সবুজ একটি বোতল আনিয়া মামা পথিককে দেখাইলেন

পথিক। (ব্যস্ত হইয়া) এ জল কি খায় ?

মামা। না, ও জল খায় না, ওতে তো স্বাদ নেই—একেবারে বোবা জল কিনা, এইমাত্র তৈরি করে আনল—এখনো গরম রয়েছে।

পথিকের হতাশ ভাব

তার পর যা বলছিলাম শুনুন—এই-যে দেখছেন গন্ধওয়ালা নোংরা জল—এর মধ্যে দেখুন এই গোলাপী জল ঢেলে দিলুম—ব্যস গোলাপী রঙ উড়ে সাদা হয়ে গেল। দেখলেন তো ?

পথিক। না মশাই কিচ্ছু দেখি নি, কিচ্ছু বুঝতে পারি নি, কিচ্ছু মানি না ও কিচ্ছু বিশ্বাস করি না—

মামা। কি বললেন! আমার কথা বিশ্বাস করেন না ?

পথিক। না, করি না। আমি যা চাই, তা যতক্ষণ দেখাতে না পারবেন, ততক্ষণ কিচ্ছু শুনব না, কিচ্ছু বিশ্বাস করব না।

মামা। বটে! কোনটা দেখতে চান একবার বলুন দেখি—আমি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি—

পথিক। তা হলে দেখান দেখি। সাদা, খাঁটি চমৎকার এক গেলাস খাবার জল নিয়ে দেখান দেখি। যাতে গন্ধ পোকা নেই, কলেরার পোকা নেই, ময়লা-টয়লা কিচ্ছু নেই, তা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখান দেখি। খুব বড়ো এক গেলাস ভর্তি জল নিয়ে দেখান তো।

মামা। এক্ষুনি দেখিয়ে দিচ্ছি—ওরে ট্যাপা, দৌড়ে আমার কুঁজো থেকে এক গেলাস জল নিয়ে আয় তো।

পাশের ঘরে দুপ্‌দাপ্‌ শব্দে খোকার দৌড়

নিয়ে আসুক, তারপর দেখিয়ে দিচ্ছি। ঐ জলে কিরকম হয়, আর এই নোংরা জলে কিরকম তফাত হয়, সব আমি এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছি।

জল লইয়া ট্যাপার প্রবেশ

রাখ, এইখানে রাখ।

জল রাখিবামাত্র পথিকের আক্রমণ—মামার হাত হইতে জল কাড়িয়া এক নিশ্বাসে চুমুক দিয়া শেষ করা

পথিক। আঃ, বাঁচা গেল!

মামা। (চটিয়া) এটা কিরকম হল মশাই ?

পথিক। পরীক্ষা হল—এক্সপেরিমেণ্ট। এবার আপনি নোংরা জলটা একবার খেয়ে দেখান তো, কিরকম হয় ?

মামা। (ভীষণ রাগিয়া) কি বললেন!

পথিক। আচ্ছা থাক, এখন নাই-বা খেলেন—পরে খাবেন এখন। আর গাঁয়ের মধ্যে আপনার মতো আনকোরা পাগল আর যতগুলো আছে, সব কটাকে খানিকটা করে খাইয়ে দেবেন। তার পর খাটিয়া তুলবার দরকার হলে আমায় খবর দেবেন—আমি খুশি হয়ে ছুটে আসব, হতভাগা জোচ্চোর কোথাকার।

পথিকের দ্রুত প্রস্থান

পাশের গলিতে কে সুর করিয়া হাঁকিতে লাগিল—
'অবাক জলপান'

হিংসুটে

পাত্রীগণ : পাঁচটি মেয়ে। স্বপ্নবুড়ি। হিংসে

প্রথম দৃশ্য

উদ্যান-সংলগ্ন বারান্দা

পাঁচটি ছোটো মেয়ের প্রবেশ

প্রথম। আমি ভাই একটা স্বপ্ন দেখেছি—এমন মজার!

দ্বিতীয়, তৃতীয়। কি ভাই—কি স্বপ্ন ?

চতুর্থ, পঞ্চম। বল্‌-না ভাই—

প্রথম। না ভাই, আমি ঐ ওকে বলব না—ও ভারি হিংসুটে।

পঞ্চম। আচ্ছা, নাই-বা বললি! ভারি তো স্বপ্ন—আমি বুঝি আর স্বপ্ন দেখতে জানি নে—

প্রথম। দেখলি ভাই, কিরকম হিংসে!

দ্বিতীয়, তৃতীয়। আচ্ছা, ওকে নাই-বা বললি, আমাদের বল-না!

চতুর্থ। আর নাহয় ও শুনলই-বা—তাতে দোষ কি ভাই ?

পঞ্চম। আমার বয়ে গেছে—ও ছাই স্বপ্ন আমি একটও শুনতে চাই না।

প্রথম। শুনলি ভাই! কিরকম হিংসে করে-করে কথা কয়? আমি কি ওকে শুনতে বলেছি?

চতুর্থ। কিসের স্বপ্ন ভাই—রাজহাঁসের?

প্রথম। দ্যুৎ! রাজহাঁসের স্বপ্নকে বুঝি মজার স্বপ্ন বলে?

চতুর্থ। হ্যাঁ—রাজহাঁসের স্বপ্ন খুব মজার হয়। আমি যখন রাজহাঁসের সঙ্গে মেঘের মধ্যে ভাসছিলাম, তখন নীল-নীল আকাশের ঢেউগুলো সব আমার গায়ে লাগছিল। আর তারাগুলো সব ফুটেছিল, ঠিক যেন পদ্মফুলের মতো। আমার খুব মজা লাগছিল।

পঞ্চম। তুই সেখানে দোলনা-দেওয়া লালফুলের বাগান দেখেছিলি?—আর পেখমধরা ময়ূর দেখেছিলি?

চতুর্থ। কই, না তো?

পঞ্চম। আমি দেখেছিলাম। ময়ূরদের পায়ে সোনার ঘুঙুর এমনি সুন্দর বাজছিল। এমন সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, শুনলাম সকালবেলায় বোর্ডিঙের ঘণ্টা বাজছে।

প্রথম। দেখলি ভাই, আমি একটা কথা বলতে যাচ্ছিলুম, এর মধ্যে কিরকম বকবক করতে লেগেছে। ওরা ইচ্ছা করে আমায় বলতে দেবে না।

দ্বিতীয়, তৃতীয়। আহা, তোরা একটু থাম-না বাপু—

প্রথম। আবার কিন্তু ওরকম করলে আমি কক্ষনো বলব না।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ। না, না, কেউ বাধা দেব না—বল্।

প্রথম। আমি স্বপ্ন দেখেছি—ঐ বাগানের মধ্যে একটা মেলা হচ্ছে। আমি সেই মেলায় গিয়েছি, আর সেখানে এক মেম সকলকে পুতুল দিচ্ছে—ঠিক এত্তো বড়ো-বড়ো পুতুল!—তার জন্যে পয়সা নিচ্ছে না। আমায় একটা পুতুল দিল, তার মাথায় ভরা কোঁকড়া চুল, এমনি মোটা-মোটা গাল, আর সত্যিকার মানুষের মতন কথা বলে।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ। ও—মা। কি চমৎকার!

তৃতীয়। হাত-পা নাড়তে পারে?

চতুর্থ। নিজে নিজে চলতে পারে?

দ্বিতীয়। হাসতে পারে?

প্রথম। হ্যাঁ, হাসতে পারে, খেলতে পারে, সব পারে।

পঞ্চম। সত্যিকার মানুষের মতন তৈরি?

দ্বিতীয়। কেন—এখন যে বড়ো কথা বলতে এয়েছিস?

তৃতীয়। তবে যে বলেছিলি ছাই স্বপ্ন—তুই একটুও শুনতে চাস না—

চতুর্থ। তা কেন? তোরাই তো ভাই ওকে শুনতে দিচ্ছিলি না।

প্রথম। বেশ করেছি। ও কেন কথায়-কথায় হিংসে করে? তার পর শোন—সবাইকে পুতুল দিল, কিন্তু কারো পুতুল ওরকম কথাও কয় না, খেলাও করে না—আর ঐ ও একটা পুতুল পেয়েছিল—নোংরা, কালো, দাঁত ভাঙা, বিচ্ছিরি মতন।

পঞ্চম। ইস্। তা বৈকি। নিজের বেলায় সব ভালো-ভালো, আর পরের বেলায় সব নোংরা আর ময়লা আর বিচ্ছিরি।

প্রথম। দেখলি ভাই, কিরকম হিংসে করে-করে বলছে! মেমসাহেব ওরকম দিয়েছে, তা আমি কি করব ভাই?

তৃতীয়। হ্যাঁ, তা ছাড়া এ তো সত্যি নয়—স্বপ্ন।

দ্বিতীয়। স্বপ্ন নিয়ে আবার হিংসে কি? ছি-ছি-ছি।

চতুর্থ। হ্যাঁ—তার পর কি হল ভাই?

প্রথম। তার পর সে পুতুল নিয়ে কত মজা হল—সব আমার মনে নেই। শেষটায় কিন্তু ভাই আমার ভারি কষ্ট হয়েছিল।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ। কেন, কি হয়েছিল?

প্রথম। সে ভাই বলব কি—পুতুলটাকে সবাই নিয়ে দেখছে-দেখছে, হঠাৎ দেখি পুতুলটা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। আমার ভাই এমন কান্না পেতে লাগল।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ। কি করে ভাঙল ভাই?

প্রথম। কি জানি, কি করে। আমার বোধ হয় নিশ্চয় ঐ হিংসুটিটা কখন হিংসে করে ভেঙে দিয়েছিল।

পঞ্চম। মাগো! এমন বানিয়ে-বানিয়ে বলতে পারে আমার নামে!

প্রথম। তা বৈকি! যারা হিংসুটি, তারা স্বপ্নেও হিংসুটি হয়।

দ্বিতীয়। হয় না তো কি? নিশ্চয়ই হয়—হিংসুটি! হিংসুটি!

তৃতীয়। আমি কিন্তু ভাই যেদিন স্বপ্নে পথ হারিয়েছিলুম, সেদিন ও-ই আমায় বলে দিয়েছিল।

চতুর্থ। কি করে পথ হারিয়েছিলি ভাই?

তৃতীয়। সেই একটা বাগানের মধ্যে এক বুড়ি একটা কাঠি ছুঁয়ে-ছুঁয়ে সবাইকে পাথর করে দিচ্ছিল—আর আমি কিছুতেই পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তার পর ও এসে আমায় একটা লুকোনো পথ দেখিয়ে দিল, সেইখেন দিয়ে আমরা পালিয়ে গেলাম।

চতুর্থ। তবু কিন্তু ভাই ওরা ওকে হিংসুটি বলে! আচ্ছা ভাই, তুই বুঝি খালি ময়ূরের স্বপ্ন দেখিস?

পঞ্চম। না—সে খালি একদিন দেখেছিলাম। অন্য সময়ে আমি আলতা মাসির স্বপ্ন দেখি।

তৃতীয়, চতুর্থ। আলতা মাসি কে ভাই?

পঞ্চম। সে আমার একজন মাসি হয়। তার কেউ নেই কিনা, সব মরে গিয়েছে, তাই সে রোজ-রোজ কাঁদে। আমি ভাই স্বপ্ন দেখি, আলতা মাসির খোকাকে কত করে খুঁজছি, কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না; আর আলতা মাসির চোখ দিয়ে কেবলই জল পড়ছে।

প্রথম। দেখলি ভাই, আমার দেখাদেখি ও আবার স্বপ্ন বলতে লেগেছে। এমন হিংসুটে!

দ্বিতীয়। ওঃ! আমার ভাই বড়ো ঘুম পাচ্ছে।

তৃতীয়, চতুর্থ। সত্যি, আমারও!

প্রথম। আমারও ভাই ঘুম পেয়ে গেল!

পঞ্চম। হ্যাঁ, তাই তো! চোখ বুজে আসছে যে!

একে-একে সকলে বসিয়া পড়িল, ঘুমে চোখ ঢুলিতে লাগিল। স্বপ্নবুড়ি স্বপ্নের গান গাহিতে-গাহিতে সকলের চোখে ঘুমের কাঠি বুলাইয়া দিল। রঙ-মাখানো বিশ্রী চেহারা, ঝুঁটিবাঁধা কে একজন আসিয়া প্রথম ও দ্বিতীয়ার পিছনে দাঁড়াইল। তাহার নাম হিংসে।

পঞ্চম। ঠিক যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। না, ভাই?

চতুর্থ। হ্যাঁ, সত্যি হচ্ছে কি স্বপ্ন হচ্ছে, কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না।

তৃতীয়। ওমা! ও কে ভাই! ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে?

চতুর্থ, পঞ্চম। মাগো! কি বিশ্রী চেহারা!

হিংসে। দেখ্ তো, আমায় চিনিস কিনা?

প্রথম। হ্যাঁ, কোথায় দেখেছি মনে নেই, কিন্তু চেনা-চেনা লাগছে।

দ্বিতীয়। তুই কোথায় থাকিস ভাই?

হিংসে। তাও জানিস নে। এই তো তোদের মনের মধ্যেই থাকি।

প্রথম। মনের মধ্যে থাকে সে আবার কিরকম ভাই? সেখানে কি থাকবার জায়গা আছে?

হিংসে। হ্যাঁ, আছে বৈকি। ঘর বাগান জল মাটি আকাশ —সব আছে।

দ্বিতীয়। তাই নাকি? তোর নাম কি ভাই?

হিংসে। আমার নাম হিংসে—হিংসুটিদের মনের মধ্যে যে থাকে, সেই হিংসে—

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম। হিংসে হাসি চিম্‌সে বাঁকা
কালকুট্‌কুট্ গরল মাখা।

দ্বিতীয়। কি সুন্দর কালো-কালো হাত দেখেছিস?

প্রথম। হ্যাঁ, আবার মুখে কি সুন্দর রঙ-বেরঙের কাজ করেছে!

চতুর্থ। মাগো! ওকে আবার সুন্দর বলছে!

তৃতীয়, পঞ্চম। এমন কুচ্ছিত! ছ্যাঃ!

প্রথম। আচ্ছা ভাই, যারা হিংসুটি, তারা বুঝি খুব দুষ্টু?

হিংসে। হ্যাঁ, দুষ্টু বৈকি—দুষ্টু আর ঝগড়াটে—

প্রথম। কথায়-কথায় বুঝি রাগ করে?

হিংসে। হ্যাঁ, নিজেরা রাগ করে আর অন্যদের বলে হিংসুটি।

দ্বিতীয়। অন্যদের ভালো দেখতে পারে না, না?

হিংসে। একেবারেই পারে না। এমনিও পারে না—স্বপ্নেও পারে না।

প্রথম। ঠিক ঐ ওর মতো?

দ্বিতীয়। আচ্ছা ভাই, তুই হিংসুটিদের মধ্যে থাকিস কেন?

হিংসে। বাঃ! তা না হলে থাকব কোথায়? তোদের মনের মধ্যে, যেখানে কালো-কালো ঝুল-মাখানো পর্দা ঝোলে, সেখানে ছ্যাঁকছেঁকে আগুন জ্বেলে বসি—আর কাটা-কাটা ঝাল-ঝাল কথা বানিয়ে খাই। ভারি আরাম!

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম। কি ভয়ানক দুষ্টু!

হিংসে। দেখলি! ওরা আমাকে দুষ্টু বলছে, বিশ্রী বলছে—তাই ওদের কাছে আমি একটুও ঘেঁষি না। আর তোরা আমায় লক্ষ্মী বলিস, মনের মধ্যে আদর করে পুষে রাখিস—তাই তোদের সঙ্গে আমার কত ভাব।

প্রথম। দেখলি ভাই, কেমন মিষ্টি করে-করে কথা বলছে!

দ্বিতীয়। দেখলি! আমাদের কত ভালোবাসে, আর ওদের একটুও ভালোবাসে না।

হিংসে। তা হলে এখন আসি ভাই? মনে থাকবে তো? এই আমার ছাপ রেখে গেলাম।

কালো-কালো আঙুল দিয়া দুইজনের গালে কালো ছাপ লাগাইয়া দিল। জাল গুটাইয়া লইয়া স্বপ্নবুড়ি চলিয়া গেল। আস্তে-আস্তে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল

তৃতীয়। ওমা! কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, মনেও নেই।

চতুর্থ। কি যে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি! সেই হিংসে বলে একজন কে আছে—

পঞ্চম। কি আশ্চর্য! আমিও ঠিক তাই দেখেছি! ওদের সঙ্গে তার কত ভাব!

তৃতীয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদের মনের মধ্যে থাকে—

চতুর্থ। আর ঝাল-ঝাল কথা খায়—

প্রথম। ও কি ভাই! তোর গালে অমন দাগ দিয়ে গেল কে?

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম। ও কি! সত্যি-সত্যি ছাপ দিয়ে গেছে যে!

দ্বিতীয়ার দাগ মুছিবার চেষ্টা

সকলে। কি দুষ্টু! কি দুষ্টু! কি দুষ্টু!

প্রথম। আবার বলে আমাদের সঙ্গে ভাব করবে!

দ্বিতীয়। কক্ষনো আর কোনোদিন ভাব করব না।

প্রথম। এমনিও করব না, স্বপ্নেও করব না।

সকলে। কক্ষনো না, কক্ষনো না, কক্ষনো না।

চলচিত্তচঞ্চরি

পাত্রগণ : সাম্য-সিদ্ধান্ত সভার পাণ্ডাগণ ॥ সত্যবাহন সমাদ্দার—চিন্তাশীল নেতা। ঈশান বাচস্পতি—কবি ও ভাবুক নেতা। সোমপ্রকাশ—উন্নতিশীল যুবক। জনার্দন—ঈশানের ধামাধারী। নিকুঞ্জ—সত্যবাহনের ধামাধারী

শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রমচারীগণ ॥ শ্রীখণ্ডদেব—আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা নেতা ও সর্বেসবা। নবীন মাস্টার প্রভৃতি আশ্রমবাসী শিক্ষকগণ। রামপদ, বিনয়, সাধন প্রভৃতি ছাত্রগণ

ভবদুলাল—আগন্তুক জিজ্ঞাসু ভদ্রলোক।

প্রথম দৃশ্য

সাম্য-সিদ্ধান্ত সভাগৃহ। ঈশানবাবু এক কোণে বসিয়া সংগীত রচনায় ব্যস্ত। জনার্দন তাঁহার নিকটেই উপবিষ্ট। সোমপ্রকাশ খুব মোটা মোটা দু-তিনটি কেতাব লইয়া তাহারই একটাকে মন দিয়া পড়িতেছে, এমন সময়ে মাল্য হস্তে নিকুঞ্জের প্রবেশ

জনার্দন। আচ্ছা, শ্রীখণ্ডবাবুরা কেউ এলেন না কেন বলুন দেখি ?

নিকুঞ্জ। শুনলাম ঈশানবাবু নাকি ওঁদের কি ইন্‌সাল্ট করেছেন।

ঈশান। কিরকম! ইন্‌সাল্ট করলাম কিরকম ? একটা কথা বললেই হল ? এই জনার্দনবাবুই সাক্ষী আছেন—কোথায় ইন্‌সাল্ট হল তা উনিই বলুন।

জনার্দন। কই, তেমন তো কিছু বলা হয় নি—খালি স্বার্থপর মর্কট বলা হয়েছিল। তা ওঁরা যেমন অসহিষ্ণু ব্যবহার করছিলেন, তাতে ওরকম বলা কিছুই অন্যায় হয় নি।

সোমপ্রকাশ। আর যদি ইন্‌সাল্ট করেই থাকে তাতেই-বা কি ? তার জন্যে কি এইটুকু সাম্যভাব ওঁদের থাকবে না যে, হৃদ্যতার সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে মিলতে পারেন ?

ঈশান। তা তো বটেই! কিন্তু ঐ যে ওঁরা একটি দল পাকিয়েছেন, ওতেই ওঁদের সর্বনাশ করেছে।

জনার্দন। অন্তত আজকের মতো এইরকম একটা দিনেও কি ওঁরা দলাদলি ভুলতে পারেন না ?

সোমপ্রকাশ। যাই বলুন, এই সম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত যা বলেছেন আমারও সেই মত। আমি বলি, ওঁরা না এসেছেন ভালোই হয়েছে।

সত্যবাহনের শশব্যস্ত প্রবেশ

সত্যবাহন। আসছেন, আসছেন, আপনারা প্রস্তুত থাকুন, এসে পড়লেন বলে। সোমপ্রকাশ আমার খাতাখানা ঠিক আছে তো ? নিকুঞ্জবাবু, আপনি সামনে আসুন। না, না, থাক, ঈশানবাবু আপনি একটু এগিয়ে যান।

ঈশান। আমি গেলে চলবে কেন ? আমার গানটা আগে হয়ে যাক—

সত্যবাহন। না, না, ও-সব গানটানে কাজ নেই—ও-সব আজ থাক। আমার লেখাটা পড়তেই মেলা সময় যাবে—আর বাড়িয়ে দরকার নেই।

ঈশান। বেশ তো! আপনার লেখাটাই যে পড়তেই হবে তার মানে কি ? ওটাই থাকুক-না কেন ?

সত্যবাহন। আচ্ছা, তা হলে তাই হোক—আপনাদের গান আর বাজনাই চলুক। আমার লেখা যদি আপনাদের এতই বিরক্তিকর হয়, তা হলে দরকার কি ? চল সোমপ্রকাশ, আমরা চলে যাই।

সকলে। না, না, সে কি, সে কি। তা কি হতে পারে ?

সোমপ্রকাশ। (গদগদ) দেখুন, আমি মর্মান্তিকভাবে অনুভব করছি, আজ আমাদের প্রাণে-প্রাণে দিকবিদিকে কত-না আকুতিবিকুতি অল্পে-অল্পে ধীরে-ধীরে—

জনার্দন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হবে, তাই হবে। গানটাও থাকুক, লেখাটাও পড়া হোক।

নিকুঞ্জ। ঐ এসে পড়েছেন।

সকলে। আসুন, আসুন, স্বাগতং, স্বাগতম্‌।

ভবদুলালের প্রবেশ, অভ্যর্থনা ও সংগীত

গুণীজন-বন্দন লহ ফুল চন্দন—কর অভিনন্দন কর অভিনন্দন
আজি কি উদিল রবি পশ্চিম গগনে
জাগিল জগৎ আজি না জানি কি লগনে,
স্বাগত সংগীত গুঞ্জন পবনে—কর অভিনন্দন কর অভিনন্দন
আলাভোলা বাবাজীর চেলা তুমি শিষ্য
সৌম্য মুরতি তব অতি সুখদৃশ্য,
মজিয়া হরষরসে আজি গাহে বিশ্ব—কর অভিনন্দন কর অভিনন্দন।

সত্যবাহন। সোমপ্রকাশ, আমার খাতাখানা দাও তো।

সোমপ্রকাশ। আজ আমাদের হৃদয়ে-হৃদয়ে গোপনে-গোপনে—

সকলে। আহা-হা, খাতাখানা চাচ্ছেন, সেইটা আগে দাও।

সত্যবাহন। (খাতা লইয়া) আজ মনে পড়ছে সেই দিনের কথা, যেদিন সেই চৈত্রমাসে আমরা আলাভোলা বাবাজীর আশ্রমে গিয়েছিলাম। ওঃ, সেদিন যে দৃশ্য দেখেছিলাম, আজও তা আমাদের মানসপটে অঙ্কিত হয়ে আছে। দেখলাম মহা প্রশান্ত আলাভোলা বাবাজী হাস্যোজ্জ্বল মুখে পরম নির্লিপ্ত আনন্দের সঙ্গে তার পোষা চামচিকেটিকে জিলিপি খাওয়াচ্ছেন। আজ আমাদের কি সৌভাগ্য যে বাবাজীর প্রিয়শিষ্য—একি সোমপ্রকাশ, এ কোন খাতা নিয়ে এসেছ? ধুতি চারখানা, বিছানার চাদর একখানা, বালিশের ওয়াড় একখানা, বাকি একখানা তোয়ালে—এ-সব কি?

সোমপ্রকাশ। কেন? আপনিই তো আমার কাছে রাখতে দিলেন।

সত্যবাহন। বলি, একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে হয়তো, সাপ দিলাম না ব্যাঙ দিলাম?—দেখুন দেখি! এত কষ্ট করে রাত জেগে, সুন্দর একটি প্রবন্ধ লিখলাম, এখন নিয়ে এসেছে কিনা কার একটা ধোপার হিসেবের খাতা! এত যে বলি, নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুসারে কাজ করবে, তা কেউ শুনবে না!

ভবদুলাল। তা দেখুন, ওরকম ভুল অনেক সময় হয়ে যায়—করতে গেলাম এক, হয়ে গেল আর! আমার সেজো-মামা একবার ঘিয়ের কারবার করে ফেল মেরেছিলেন—সেই থেকে কেউ গব্যঘৃত বললেই তিনি ভয়ানক ক্ষেপে যেতেন। আমি তো তা জানি না; মামাবাড়ি গিয়েছি, মহেশদা বললে, 'বল তো গব্যঘৃত!' আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'গ-ব্য-ঘৃ-ত'—অমনি দেখি সেজোমামা ছাতের সমান লাফ দিয়ে তেড়ে মারতে এয়েছে! দেখুন তো কি অন্যায়! আমি তো ইচ্ছা করে ক্ষেপাই নি!

সত্যবাহন। যাক, আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা এই যে, বাইরের জিনিস যেমন মানুষের ভেতরে ধরা পড়ে, তেমনি ভেতরের জিনিসও সময়-সময় বাইরে প্রকাশ পায়। আমাদের মধ্যে আমরা অন্তরঙ্গভাবে যে-সব জিনিস পাচ্ছি সেগুলোকে এখন বাইরে প্রকাশ করা দরকার।

ভবদুলাল। ঠিক বলেছেন। এই মনে করুন, যে কেঁচো মাটির মধ্যে থাকে, মাটির রস খেয়ে বাড়ে, সেই কেঁচোই আবার মাটি ফুঁড়ে বাইরে চলে আসে।

সকলে। (মহোৎসাহে) চমৎকার! চমৎকার!

নিকুঞ্জ। দেখেছেন, কেমন সুন্দরভাবে উনি কথাটা গুছিয়ে নিলেন!

ভবদুলাল। তা হলে সম্পাদারমশাই, আপনি ঐ যেটা পড়বেন বলেছিলেন, আমায় সেটা দেবেন তো। আমি একখানা বড়ো বই লিখছি, তাতে ওটা ঢুকিয়ে দেব—

সোমপ্রকাশ। এ আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য বলতে হবে। আপনি যদি এ কাজের ভার নেন, তাহলে আমাদের ভেতরকার ভাবগুলি সুন্দরভাবে সাজিয়ে বলতে পারবেন।

জনার্দন। হ্যাঁ, এ বিষয়ে ওঁর একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা দেখা যাচ্ছে।

ভবদুলাল। আর আপনার ঐ গানটিও আমায় শিখিয়ে দেবেন, ওটাও আমার বইয়ে ছাপাতে চাই।

ঈশান। নিশ্চয়! নিশ্চয়! ওটা আমার নিজের লেখা। গান লেখা হচ্ছে আমার একটা বাতিক।

সোমপ্রকাশ। কিরকম আগ্রহ আর উৎসাহ দেখেছেন ওঁর?

ঈশান। তা তো হবেই। সকলের উৎসাহ কেন যে হয় না এই তো আশ্চর্য।

ঈশানের সংগীত

এমন বিমর্ষ কেন?
মুখে নাই হর্ষ কেন?
কেন ভব-ভয়-ভীতি ভাবনা প্রভৃতি
বৃথা বয়ে যায় বর্ষ কেন?
(হায় হায় হায় বৃথা বয়ে যায় বর্ষ কেন?)

ভবদুলাল। (লিখিতে-লিখিতে) চমৎকার! এটা আমার বইয়ে দিতেই হবে। আমার কি মুশকিল জানেন? আমিও পোয়েট্রী লিখি, কিন্তু তার সুর বসাতে পারি না। এই তো এবার একটা লিখেছিলাম—

বলি ও হরি রামের খুড়ো
(তুই) মরবি রে মরবি বুড়ো।

মশায় কতরকম সুর লাগিয়ে দেখলাম—তার একটাও লাগল না। কি করা যায় বলুন তো?

ঈশান। ওর আর করবেন কি? ওটা ছেড়ে দিন না—

ভবদুলাল। তা অবিশ্যি, তবে টুইঙ্কল্‌, টুইঙ্কল্‌, লিটল্‌ ষ্টার—এই সুরটা অনেকটা লাগে—

ভবদুলালের সংগীত

বলি ও হরি রামের খুড়ো—
(তুই) মরবি রে মরবি বুড়ো।
সর্দি কাশি হল্‌দি জ্বর
ভুগবি কত জল্‌দি মর।

কিন্তু এটাও ঠিক হয় না। ঐ যে 'মরবি রে মরবি' ঐ জায়গাটায় আরো জোর দেওয়া দরকার। কি বলেন ?

ঈশান। হ্যাঁ, যেরকম গান—একটু জোরজার না করলে সহজে মরবে কেন ?

সোমপ্রকাশ। (জনান্তিকে) কিন্তু শ্রীখণ্ডবাবুদের এ-সমস্ত কাণ্ড প্রকাশ করে দেওয়া উচিত।

সত্যবাহন। উচিত সে তো আজ বছর ধরে শুনে আসছি। উচিত হয় তো বলে ফেললেই হয় ? নিকুঞ্জবাবু কি বলেন ?

নিকুঞ্জ। নিশ্চয়ই। কিসের কথা হচ্ছিল ?

সত্যবাহন। ঐ শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রমের কথা। এবারে 'সত্যসন্ধিৎসা'য় কি লিখেছি পড়েন নি বুঝি ?

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা চমৎকার হয়েছে। পড়ে দিন না—উনি শুনে সুখী হবেন।

সত্যবাহন। (পাঠ) এই-যে অগণ্য গ্রহ-তারকা মণ্ডিত গগনপথে ধরিত্রী ধাবমান, ভূধরকন্দর ভ্রাম্যমাণ—এই-যে সাগরে ফেনিল লবণাম্বুরাশি নীলাম্বর অভিমুখে নৃত্য করিতে-করিতে নিত্য নবোৎসাহে দিকদিগন্ত ধ্বনিত ঝংকৃত করিয়া, কি যেন চায়, কি যেন চায়—প্রতিধ্বনি বলিতেছে সাম্য সমীক্ষপন্থা।

নিকুঞ্জ। শুনছেন ? ভাষা কেমন সতেজ অথচ সহজ ভঙ্গি, সেটা লক্ষ্য করেছেন ? ওর মধ্যে শ্রীখণ্ডবাবুদের উপর বেশ একটু কটাক্ষ রয়েছে।

জনার্দন। তা হলে আশ্রমের কথাটা আগে বলে নিন-- নইলে উনি বুঝবেন কেমন করে।

ঈশান। সেইটিই তো আগে বলা উচিত। সোমপ্রকাশ তুমি বল তো হে—বেশ ভালো করে গুছিয়ে বল।

সত্যবাহন। আচ্ছা, তা হলে সোমপ্রকাশই বলুক--- (অভিমান)

সোমপ্রকাশ। কথাটা হয়েছে কি—এই-যে ওঁরা একটা আশ্রম করেছেন, তার রকম-সকমগুলো যদি দেখেন—সর্বদাই কেমন একটা · অর্থাৎ, আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না—কি শিক্ষার দিক দিয়ে, কি অন্য দিক দিয়ে, যেমন ভাবেই দেখুন—আমার কথাটা বুঝতে পারছেন তো ? যেমন, ইয়ের কথাটাই ধরুন-না কেন—মানে সব কথা তো আর মুখস্থ করে রাখি নি।

ভবদুলাল। তা তো বটেই, এ তো আর একজামিন দিতে আসেন নি।

নিকুঞ্জ। সমাদ্দারমশাইকে বলতে দাও-না।

সত্যবাহন। না না, আমায় কেন ? আমি কি আপনাদের মতো তেমন গুছিয়ে ভালো করে বলতে পারি ?

সকলে। কেন পারবেন না ? খুব পারবেন।

সত্যবাহন। আর মশাই, ও-সব ছোটো কথা—কে কি বলল আর কে কি করল। ওর মধ্যে আমায় কেন ?

জনার্দন। আচ্ছা, তা হলে আর কেউ বলুন-না।

সত্যবাহন। কি আপদ! আমি কি বলব না বলছি ? তবে, কিরকম ভাব থেকে বলছি সেটা তো একবার জানানো উচিত, তা নয়তো শেষকালে আপনারাই বলবেন সত্যবাহন সমাদ্দার পরনিন্দা করছে।

জনার্দন। হ্যাঁ, শুধু বললেই তো হল না, দশ দিক বিবেচনা করে বলতে হবে তো ?

সত্যবাহন। আমার হয়েছে কি, ছেলেবেলা থেকেই কেমন অভ্যাস—পরনিন্দা পরচর্চা এ-সব আমি আদবে সইতে পারি না।

জনার্দন। আমারও ঠিক তাই। ও-সব একেবারে সইতে পারি না।

সোমপ্রকাশ। পরনিন্দা তো দূরের কথা, নিজের নিন্দাও সহ্য হয় না।

সত্যবাহন। কিন্তু তা বলে সত্য কি আর গোপন রাখা যায় ?

ভবদুলাল। গোপন করলে আরো খারাপ। ছেলেবেলায় একদিন আমাদের ক্লাসে একটা ছেলে 'কু' করে শব্দ করেছিল। মাস্টার বললেন, 'কে করল, কে করল ?' আমি ভাবলাম আমার অত বলতে যাবার দরকার কি। শেষটায় দেখি, আমাকেই ধরে মারতে লেগেছে। দেখুন দেখি! ও-সব কক্ষনো গোপন করতে নেই।

জনার্দন। আমাদেরও তাই হয়েছে। কিছু বলি না বলে দিন-দিন ওরা যেন আস্কারা পেয়ে যাচ্ছে।

নিকুঞ্জ। আশ্রমের ছেলেগুলো পর্যন্ত যেন কি-একরকম হয়ে উঠেছে।

জনার্দন। হ্যাঁ, ঐ রামপদটা সেদিন সমাদ্দারমশাইকে কি না বললে।

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ কথাটা একবার বলুন দেখি, তা হলে বুঝবেন ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে।

জনার্দন। হ্যাঁ, বুঝলেন ? ছোকরার এতবড়ো আস্পর্ধা সমাদ্দারমশাইকে মুখের উপর বলে কি যে—হ্যাঁ, কি-না বললে!

নিকুঞ্জ। কি যেন—সেই খুলনার মকদ্দমার কথা নয় তো ?

জনার্দন। আরে না, ঐ-যে পিলসুজের বাতি নিয়ে কি-একটা কথা।

সোমপ্রকাশ। হ্যা, হ্যাঁ, মনে পড়েছে কি-একটা সংস্কৃত কথা তার দু-তিন রকম মানে হয়।

নিকুঞ্জ। ওঁরই কি-একটা কথা ওঁরই উপর খাটাতে গিয়েছিল। মোটকথা, তার ওরকম বলা একেবারেই উচিত হয় নি।

ভবদুলাল। কি আপদ! তা আপনারা এ-সব সহ্য করেন কেন?

সত্যবাহন। সহ্য না করেই-বা করি কি? কিছু কি বলবার জো আছে? এই তো সেদিন একটা ছোকরাকে ডেকে গায়ে হাত বুলিয়ে মিষ্টি করে বুঝিয়ে বললাম—'বাপু হে, ওরকম বাঁদরের মতো ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছ, খালি কেবল এয়ারকি করলে তো চলবে না। কর্তব্য বলে যে জিনিস আছে সেটা কি ভুলেও এক-আধবার ভাবতে নেই? এদিকে নিজের মাথাটি যে খেয়ে বসেছ!'—মশাই, বললে বিশ্বাস করবেন না, এতেই সে একেবারে গজগজিয়ে উঠে আমার কথাগুলো না শুনেই হনহন করে চলে গেল।

সোমপ্রকাশ। এই তো দেখুন না, এখানে সকলে সাধু সঙ্গে বসে কত সৎপ্রসঙ্গ হচ্ছে শুনলেও উপকার হয়। তা, ওরা কেউ ভুলেও একবার এদিকে আসুক দেখি, তা আসবে না।

জনার্দন। তা আসবে কেন? যদি দৈবাৎ ভালো কথা কানে ঢুকে যায়।

সত্যবাহন। আসল কথা কি জানেন? এ-সব হচ্ছে শিক্ষা এবং দৃষ্টান্ত। এই-যে শ্রীখণ্ডদেব, লোকটি একটু বেশ অহং-ভাবাপন্ন। এই তো দেখুন না, আমাদের এখানে আমি আছি, এঁরা আছেন, তা মাঝে-মাঝে আমাদের পরামর্শ নিলেই—

রামপদর প্রবেশ

সত্যবাহন। এই দেখুন এক মূর্তিমান এসে হাজির।

নিকুঞ্জ। আরে দেখছিস আমরা বসে কথা বলছি, এর মধ্যে তোর পাকামো করতে আসবার কি দরকার বাপু?

জনার্দন। বলি, একি বাঁদর নাচ না সঙের খেলা, যে তামাশা দেখতে এয়েছ?

রামপদ। (স্বগত) কি আপদ! তখনি বলেছি, আমায় ওখানে পাঠাবেন না—

নিকুঞ্জ। কি হে, তুমি সমাদ্দার মহাশয়ের সঙ্গে বেয়াদবি কর—এইরকম তোমাদের আশ্রমে শিক্ষা দেওয়া হয়?

রামপদ। আমি? কই আমি তো আমার তো মনে পড়ে না, আমি—

সত্যবাহন। আমি, আমি, আমি কেবল আমি। আমি আমি, এত আত্মপ্রচার কেন? আর কি বলবার বিষয় নেই?

ঈশান। 'আত্মম্ভরী অহঙ্কার আত্মনামে হুহুঙ্কার তার গতি হবে না হবে না—'

সোমপ্রকাশ। দেখ, ওরকমটা ভালো নয় নিজের কথা দশজনের কাছে বলে বেড়াব, এ ইচ্ছাটাই ভালো নয়।

সত্যবাহন। আমি যখন খুলনায় চাকরি করতাম, ফাউসন সাহেব নিজে আমায় সার্টিফিকেট দিলে—'বিদায় বুদ্ধিতে জ্ঞানে উৎসাহে, চরিত্রে সাধুতায়, সেকেণ্ড টু নান্!' কারুর চাইতে কম নয়। আমি কি সে কথা তোমায় বলতে গিয়েছিলাম?

নিকুঞ্জ। আমার পিসতুতো ভাই সেবার লাট সাহেবের সামনে গান করলে আমি কি তা নিয়ে ঢাক পিটিয়েছিলাম?

ঈশান। আমার তিন ভল্যুম ইংরাজি কাব্য 'ইন্ মেমো-রিয়াম' 'ও মান্ধাতা!' 'ও মোর্স্!' যেবার বেরুল সেবার 'বেঙ্গলী'-তে কি লিখেছিল জানেন তো? 'উই কনগ্র্যাচুলেট দি ডিস্টিঙ্গুইসড অথার অফ দিস মনুমেণ্টাল প্রোডাকশান (ডাব্ল ডিমাই অক্টেভো ৯৭৪ পেজেস) হু ইজ এভিডেণ্টলি ইন পোজেশান অভ এ স্টুপেণ্ডাস অ্যামাউণ্ট অভ অ্যাস্টাউডিং ইনফরমেশান!' এঁরা যদি কথাটা না তুলতেন, আমি কি গায়ে পড়ে গল্প করতে যেতুম?

রামপদ। কি জানি মশাই, আমায় শ্রীখণ্ডবাবু পাঠিয়ে দিলেন—তাই বলতে এলুম।

সত্যবাহন। দেখ তর্ক কোরো না। তর্ক করে কেউ কোনো-দিন মানুষ হতে পারে নি।

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, ওটা তোমাদের ভারি একটা বদভ্যাস। আজ পর্যন্ত তর্ক করে কোনো বড়ো কাজ হয়েছে এরকম কোথাও শুনেছ?

ঈশান। এই-যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, যাতে করে চন্দ্র-সূর্য গ্রহ নক্ষত্রকে চালাচ্ছে, সে কি তর্ক করে চালাচ্ছে?

সোমপ্রকাশ। আমি দেখছি এ বিষয়ে বড়ো-বড়ো পণ্ডিতের সকলেরই এক মত।

সত্যবাহন। আমার সিদ্ধান্ত-বিশুদ্ধিকা বইখানাতে এ কথা বার বার করে দেখিয়েছি যে তর্ক করে কিছু হবার জো নেই। মনে করুন যেন তর্ক হচ্ছে যে, আফ্রিকা দেশে সেউ-ফল পাওয়া যায় কি না। মনে করুন যদি সত্যি করে সে ফল থাকে, তবে আপনি বলবার আগেও সে ছিল, বলবার পরেও সে থাকবে। আর যদি সে ফল না থাকে, তবে আপনি হ্যাঁ বললেও নেই, না বললেও নেই। তবে তর্ক করে লাভটা কি?

ভবদুলাল। তা তো বটেই—ফোড়া যদি পাকবার হয় তাকে আদুড় করেই রাখ—আর পুলটিশ দিয়েই ঢাক, সে টনটনিয়ে উঠবেই।

নিকুঞ্জ। আরে মশাই এ-সব বলিই-বা কাকে—আর বললে শোনেই-বা কে।

সোমপ্রকাশ। শুনলেই-বা বোঝে কয়জন আর বুঝলেই-বা ধরতে পারে কয়জন? ঐ ধরাটাই আসল কিনা।

ঈশানের সংগীত

ধরি ধরি ধর ধর ধারি কিন্তু ধরে কই?
কারে ধরি কেবা ধরে ধরাধরি করে কই?
ধরনে ধারণে তারে ধরণী ধরিতে নারে
আঁধার ধারণা মাঝে সে ধারা শিহরে কই?

জনার্দন। কথাটা বড়ো খাঁটি। এই-যে আমাদের সমীক্ষা-চক্র আর সমসাম্য-সাধন আর মৌলিক খণ্ডাখণ্ড ভাব, এ-সমস্ত ধরেই-বা কে, আর ধরতে জানেই-বা কে?

সত্যবাহন। ধরা না হয় দূরের কথা, ও-বিষয়ে ভালো-ভালো বই যে দু-একখানা আছে, সেগুলো পড়া উচিত। আমি বেশি কিছু বলছি না—অন্তত আমার সাম্য-নির্ঘণ্ট আর সিদ্ধান্ত-বিশুদ্ধিকা, এ দুখানা পড়তে পারে তো

ভবদুলাল। তা হলে তো পড়ে দেখতে হচ্ছে। কি নাম বললেন বইটার ?

সত্যবাহন। সাম্য-নির্ঘণ্ট, তিন টাকা দু আনা, আর সিদ্ধান্ত-বিশুদ্ধিকা—তিন ভল্যুম, খণ্ড-সিদ্ধান্ত অখণ্ড-সিদ্ধান্ত আর খণ্ডাখণ্ড-সিদ্ধান্ত—সাত টাকা চার আনা। দুখানা বই একসঙ্গে নিলে সাড়ে নয় টাকা, প্যাকিং চার পয়সা, ডাকমাশুল সাড়ে পাঁচ-আনা, এই সবসুদ্ধ ন টাকা চৌদ্দ আনা।

ভবদুলাল। তা এটা আপনার কোন এডিশান বললেন ?

ঈশান। আঃ—ফার্স্ট এডিশান মশাই, ফার্স্ট এডিশান—এই তো সবে সাত বছর হল, এর মধ্যেই কি ?

সত্যবাহন। তা আমি তো আর অন্যদের মতো বিজ্ঞাপনের চটক দিয়ে নিজের ঢাক নিজে পেটাই না।

ঈশান। হ্যাঁ, উনি তো আর নিজে পেটান না—ওঁর পেটাবার লোক আছে। তা ছাড়া এই-সব কাগজওয়ালাগুলো এমন হতভাগা, কেউ ওঁর বইয়ের সুখ্যাত করতে চায় না।

সত্যবাহন। কেন, সচ্চিন্তা-সন্দীপিকায় বেশ লিখেছিল।

ঈশান। ও হ্যাঁ, আপনার মেজোমামা লিখেছিলেন বুঝি ?

সত্যবাহন। মেজোমামা নয়, সেজোমামা। কি হে, তোমার এখানে হাঁ করে সব কথা শুনবার দরকার কি বাপু ?

[রামপদর প্রস্থান

ভবদুলাল। আচ্ছা, ঐ-যে খণ্ডাখণ্ড কি-সব বলছিলেন, ওগুলোর আসল ব্যাপারটা কি একটু বুঝিয়ে বলতে পারেন ?

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা এই বেলা বুঝে নিন। এ-বিষয়ে উনিই হচ্ছেন অথরিটি।

সত্যবাহন। ব্যাপারটা কি জানেন, খণ্ড-সিদ্ধান্ত হচ্ছে যাকে বলে পৃথগ্ দর্শন। যেমন কুকুরটা ঘোড়া নয়, ঘোড়াটা গোরু নয়, গোরুটা মানুষ নয়—এইরকম। এ নয়, ও নয়, তা নয়, সব আলগা, সব খণ্ড-খণ্ড—এই সাধারণ ইতর লোকে যেমন মনে করে।

ভবদুলাল। (স্বগত) দেখলে! আমার দিকে তাকিয়ে বলছে সাধারণ ইতর লোক!

সত্যবাহন। আর অখণ্ড-সিদ্ধান্ত হচ্ছে, যাকে আমরা বলি কেন্দ্রগতং নিবিশেষং অর্থাৎ এই যে নানারকম সব দেখছি এ কেবল দেখবার রকমারি কিনা। আসলে বস্তু হিসাবে ঘোড়াও যা গোরুও তা—কারণ বস্তু তো আর স্বতন্ত্র নয়—মূলে কেন্দ্রগত-ভাবে সমস্তই এক অখণ্ড—বুঝলেন না ?

ভবদুলাল। হ্যাঁ, বুঝেছি। মানে কেন্দ্রগতং নিবিশেষং—এই তো ?

সত্যবাহন। হ্যাঁ, বস্তুমাত্রেই হচ্ছে তার কেন্দ্রগত কতকগুলি গুণের সমষ্টি। মনে করুন ঘোড়া আর গোরু—এদের গুণগুলি সব মিলিয়ে-মিলিয়ে দেখুন। ঘোড়া চতুষ্পদ, গোরু চতুষ্পদ, ঘোড়া পোষ মানে, গোরু পোষ মানে—সুতরাং এখান দিয়ে অখণ্ড হিসাবে কোনো তফাত নেই, এখানে ঘোড়াও যা গোরুও তা। আবার দেখুন, ঘোড়াও ঘাস খায় গোরুও ঘাস খায়—এও বেশ মিলে যাচ্ছে, কেমন ?

ভবদুলাল। কিন্তু ঘোড়ার তো শিঙ নাই, গোরুর শিঙ আছে—তা হলে সেখান দিয়ে মিলবে কি করে ?

সত্যবাহন। সেখানে গাধার সঙ্গে মিলবে। এমনি করে সব পদার্থের সব গুণ নিয়ে যদি কাটাকাটি করা যায় তবে দেখবেন খণ্ড ফ্র্যাকশন সব কেটে গিয়ে বাকি থাকবে—এক। তাকেই বলি আমরা অখণ্ডতত্ত্ব।

ভবদুলাল। এইবারে বুঝেছি। এই যেমন তাসে তাসে জোড় মিলিয়ে সব গেল কেটে বাকি রইল—গোলামচোর।

সত্যবাহন। কিন্তু সাধন করলে দেখা যায়, এর উপরেও একটা অবস্থা আছে। সেটা হচ্ছে সমসাম্যভাব, অর্থাৎ খণ্ডাখণ্ড মীমাংসা। এ অবস্থায় উঠতে পারলে তখন ঠিকমতো সমীক্ষা সাধন আরম্ভ হয়।

ভবদুলাল। 'সমীক্ষা' আবার কি ?

সত্যবাহন। সাধনের স্তরে উঠে যেটা পাওয়া, তাকে বলে সমীক্ষা—সেটা কিরকম জানেন ?

ভবদুলাল। থাক, আজ আর নয়। আমার আবার কেমন মাথার ব্যারাম আছে।

সত্যবাহন। না, আমি ওর ভেতরকার জটিল তত্ত্বগুলো কিছু বলছি না, খালি গোড়ার কথাটা একটুখানি ধরিয়ে দিচ্ছি। অর্থাৎ এটুকু তলিয়ে দেখবেন যে ঘোড়াটা যে অর্থে ঘাস খাচ্ছে গোরুটা ঠিক সে অর্থে ঘাস খাচ্ছে কিনা—

ভবদুলাল। তা কি করে খাবে ? এ হল ঘোড়া, ও হল গোরু—তবে দুজনের যদি একই মালিক হয়, তবে এ-ও মালিকের অর্থে খাচ্ছে, ও-ও মালিকের অর্থে খাচ্ছে—

সত্যবাহন। না, না—আপনি আমার কথাটা ঠিক ধরতে পারেন নি।

ভবদুলাল। ও—তা হবে। আমার আবার মাথার ব্যারাম আছে কিনা। আচ্ছা আজকে তা হলে উঠি। অনেক ভালো-ভালো কথা শোনা গেল—বই লেখবার সময় কাজে লাগবে।

ঈশান। ওঁকে একখানা নোটিশ দিয়েছেন তো ?

জনার্দন। ও, না। এই একখানা নোটিশ নিয়ে যান ভবদুলালবাবু। আজ অমাবস্যা, সন্ধ্যার সময় আমাদের সমীক্ষা-চক্র বসবে।

সোমপ্রকাশ। আজ ঈশানবাবু চক্রাচার্য—ওঃ! ওঁর ইয়ে শুনলে আপনার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠবে।

ঈশান। এই তত্ত্ব-টত্ত্ব যে-সব শুনলেন ওগুলো হচ্ছে

বাইরের কথা। আসল ভেতরের জিনিস যদি কিছু পেতে চান তবে তার একমাত্র উপায় হচ্ছে সমীক্ষা-সাধন।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

সমীক্ষা মন্দির। অন্ধকার ঘরের মাঝখানে লাল বাতি, ধূপধুনা ইত্যাদি। কপালে চন্দন মাখিয়া ঈশান উপবিষ্ট, তাহার পাশে একদিকে সোমপ্রকাশ ও জনার্দন, অপরদিকে নিকুঞ্জ ও দুইটি শূন্য আসন

ঈশানের সংগীত ও তৎসঙ্গে সকলের যোগদান

ঈশান। দেখতে-দেখতে সব যেন নিস্তেজ হয়ে ছায়ার মতো মিলিয়ে গেল। বোধ হল যেন ভেতরকার খণ্ড-খণ্ড ভাবগুলো সব আলগা হয়ে যাচ্ছে। যেন চারদিকে কি-একটা কাণ্ড হচ্ছে, সেটা ভেতরে হচ্ছে কি বাইরে হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। কেবল মনে হচ্ছে, ঝাপসা ছায়ার মতো কে যেন আমার চারদিকে ঘুরছে। ঘুরছে-ঘুরছে আর মনের বাঁধন সব খুলে

সত্যবাহন ও ভবদুলালের প্রবেশ

ভবদুলাল। (সশব্দে খাতা ফেলিয়া মুখ মুছিতে-মুছিতে) বস্ রো কি গরম!

সকলে। স্-স্-স্-স্—

ভবদুলাল। এখন সেই মক্ষিকা চক্র হবে বুঝি?

নিকুঞ্জ। এখন কথা বলবেন না—স্থির হয়ে বসুন।

সোমপ্রকাশ। মক্ষিকা নয়—সমীক্ষা।

ঈশান। অনেকক্ষণ চেয়ে তার পর ভয়ে ভয়ে বললাম, 'কে?' শুনলাম আমার বুকের ভিতর থেকে ক্ষীণ সরু গলায় কে যেন বললে, 'আমি।' বোধ হল যেন ছায়াটা চলতে-চলতে থেমে গেল। তখন সাহস করে আবার বললাম, 'কে?' অমনি 'কে-কে-কে' বলে কাঁপতে-কাঁপতে-কাঁপতে-কাঁপতে কে যেন পর্দার মতো সরে গেল—চেয়ে দেখলাম, আমিই সেই ছায়া, ঘুরছি-ঘুরছি আর বাঁধন খুলছে।

জনার্দন। মনের লাটাই ঘুরছে আর সুতো খুলছে, আর আত্মা-ঘুড়ি উধাও হয়ে শূন্যে উড়ে গোঁৎ খাচ্ছে।

ঈশান। কালের স্রোতে উজান ঠেলে ঘুরতে-ঘুরতে .ছি আর দেখছি যেন কাছের জিনিস সব ঝাপসা হয়ে সরে যাচ্ছে, আর দূরের জিনিসগুলো অন্ধকার করে ঘিরে আসছে। ভূত, ভবিষ্যৎ সব তাল পাকিয়ে জমে উঠেছে আর চারিদিক হতে একটা বিরাট অন্ধকার হাঁ করে আমায় গিলতে আসছে। মনে হল একটা প্রকাণ্ড জঠরের মধ্যে অন্ধকারের জারকরসে অল্পে-অল্পে, আমায় জীর্ণ করে ফেলছে আর সৃষ্টি প্রপঞ্চের শিরায় আমি অল্পে অল্পে ছড়িয়ে পড়ছি। অন্ধকার যতই জমাট হয়ে উঠছে, ততই আমায় আস্তে আস্তে ঠেলছে আর বলছে, 'আছ নাকি, আছ নাকি?' আমি প্রাণপণে চীৎকার করে বললাম, 'আছি।' কিন্তু কোনো আওয়াজ হল না—খালি মনে হল অন্ধকারের পাঁজরের মধ্যে আমার শব্দটা নিশ্বাসের মতো উঠছে আর পড়ছে।

ভবদুলাল। উঃ! বলেন কি মশাই?

ঈশান। কোথাও আলো নেই, শব্দ নেই, কোনো স্থূল নেই, বস্তু নেই—খালি একটা অন্ধপ্রাণের ঘূর্ণি ঝড়ের বাঁধন ঠেলে-ঠেলে বুদ্বুদের মতো চারিদিকে ফুলে উঠছে। দেখলাম সৃষ্টির কারখানায় মালপত্রের হিসেব মিলছে না। অন্ধকারের ভাঁজে ভাঁজে পঞ্চতন্মাত্রা সাজানো থাকে, এক জায়গায় তার কাঁচা মসলাগুলো ভূতশুদ্ধি না হতেই হুড়হুড় করে স্থূলপিণ্ডের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি চিৎকার করে বলতে গেলুম 'সর্বনাশ! সর্বনাশ! সৃষ্টিতে ভেজাল পড়েছে–' কিন্তু কথাগুলো মুখ থেকে বেরোল না। বেরোল খালি হা-হা-হা-হা একটা বিকট হাসির শব্দ। সেই শব্দে আমার সমীক্ষা-বন্ধন ছুটে গিয়ে সমস্ত শরীর ঝিম-ঝিম করতে লাগল।

ভবদুলাল। আপনি চলে আসবার পর আমি দেখলাম সেই যে লোকটা ভেজাল দিয়েছে, সেই ভেজাল ক্রমাগত ঠেলে উপর দিকে উঠতে চাচ্ছে। উঠতে পারছে না, আর গুমরে-গুমরে কেঁপে উঠছে। আর কে যেন ফিস-ফিস করে বলছে—'শেক দি বট্‌ল, শেক দি বট্‌ল!'—সত্যি!

ঈশান। কি মশাই আবোল তাবোল বকছেন!

সোমপ্রকাশ। দেখুন, এ-সব বিষয়ে ফস করে কিছু বলতে নেই—আগে ভিতরে-ভিতরে ধারণা সঞ্চয় করতে হয়।

জনার্দন। হ্যাঁ, সব জিনিসে কি আর মেকি চলে?

ভবদুলাল। ও, ঠিক হয় নি বুঝি? তা আমার তো অভ্যেস নেই—তার উপর ছেলেবেলা থেকেই কেমন মাথা খারাপ। সেই একবার পাগলা বেড়ালে কামড়েছিল, সেই থেকে ঐরকম। সে কিরকম হল জানেন? আমার মেজোমামা, যিনি ভাগলপুরে চাকরি করেন, তাঁর ঐ পশ্চিমের ঘরটায় টেপি, টেপির বাপ, টেপির মামা, মনোহর চাটুয্যে—না, মনোহর .য়া নয়—মহেশ দা, ভোলা—

ঈশান। তাহলে ঐ চলুক, আমি এখন উঠি।

ভবদুলাল। শুনুন-না—সবাই বসে-বসে গল্প করছে এমন সময়ে আমরা ধর-ধর বলে বেড়ালটাকে তাড়া করে ঘরের মধ্যে নিতেই বেড়ালটা এক লাফে জানালার উপর যেই না উঠেছে, অমনি আমি দৌড়ে গিয়ে খপ্ করে ধরেছি তার ল্যাজে—আর বেড়ালটা ফ্যাঁস করে আমার হাতের উপর কামড়ে দিয়েছে।

ঈশানের প্রস্থানোদ্যম

ভবদুলাল। এই একটু শুনে যান—গল্পটা ভারি মজার।

ঈশান। দেখুন, এটা হাসবার এবং গল্প করবার জায়গা নয়।

ভবদুলাল। তাই নাকি, তবে আপনি যে এতক্ষণ গল্প করছিলেন।

ঈশান। গল্প কি মশাই? সমীক্ষা কি গল্প হল?

জনার্দান। কাকে কি বলে তাই জানেন না, কেন তর্ক করেন মিছিমিছি?

ভবদুলাল। না, না, তর্ক করব কেন? দেখুন তর্ক করে কিছু হবার জো নেই। এই যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, এ যে তর্ক করে সব চালাচ্ছে, সে কি ভালো করছে? আমি তর্কের জন্য বলি নি।

সত্যবাহন। দেখুন, এ আপনাদের ভারি অন্যায়। ভুলচুক কি আর আপনাদের হয় না? অমন করলে মানুষের শিখবার আগ্রহ থাকবে কেন?

আশ্রমের ছাত্র বিনয়সাধনের প্রবেশ

ঈশান। ঐ দেখ, আবার একটি এসে হাজির। তুমি কে হে?

বিনয়সাধন। আমি? হ্যাঁ, আমার কথা কেন বলেন? আমি আবার একটা মানুষ। হ্যাঁঃ, কি যে বলেন।

ঈশান। বলি, এখানে এয়েছ কি করতে?

সত্যবাহন। কি নাম তোমার?

বিনয়সাধন। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীবিনয়সাধন। (পকেট হইতে পত্র বাহির করিয়া) ভবদুলালবাবু কার নাম?

সত্যবাহন। কেন হে, বেয়াদব? সে খবরে তোমার দরকার কি?

নিকুঞ্জ। এ কি এয়ার্কি পেয়েছ? তোমার বাপ-ঠাকুর্দার বয়সী ভদ্রলোক সব—ছি, ছি, ছি।

জনার্দন। কি আস্পর্ধা দেখুন তো।

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ—কার বাপের নাম কি, শ্বশুরের বয়েস কত, ওর কাছে তার কৈফিয়ত দিতে হবে।

সত্যবাহন। এঁরই নাম ভবদুলালবাবু। এখন কি বলতে চাও এঁর বিরুদ্ধে বল।

বিনয়সাধন। না, না, বিরুদ্ধে বলব কেন?

সত্যবাহন। কাপুরুষ। এইটুকু সৎসাহস নেই—আবার আস্ফালন করতে এসেছ?

বিনয়সাধন। আহা, আমার কথাটাই আগে বলতে দিন—

সত্যবাহন। শুনলেন ভবদুলালবাবু? ওর কথাটা আগে বলতে দিতে হবে। আমাদের কথাগুলোর কোনো মূল্যই নেই।

নিকুঞ্জ। দশজনে যা শুনবার জন্যে কত আগ্রহ করে আসে, এঁরা সে-সব তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবেন।

সোমপ্রকাশ। এইজন্য সাধকেরা বলেন যে মানুষের ভূয়ো-দর্শনের অভাব হলে মানুষ সব করতে পারে।

বিনয়সাধন। কি আপদ। মশায় চিঠিখানা দিতে এসেছিলুম তাই দিয়ে যাচ্ছি—এই নিন। আচ্ছা ঝকমারি যা হোক।

[বিনয়সাধনের দ্রুত প্রস্থান

সোমপ্রকাশ। মানুষের মনের গতি কি আশ্চর্য। একদিকে হেরিডিটি আর একদিকে এন্‌ভাইয়ারনমেণ্ট—এই দুয়ের প্রভাব এক সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

ভবদুলাল। (পত্র পাঠ করিয়া) শ্রীখণ্ডবাবু আমাকে কাল ওখানে নিমন্ত্রণ করেছেন।

ঈশান। কি। এত বড়ো আস্পর্ধা। আবার নিমন্ত্রণ করতে সাহস পান কোন মুখে?

সত্যবাহন। না, যাব না আমরা। সত্যবাহন সমাদ্দার ও-সব লোকের সম্পর্ক রাখে না।

ভবদুলাল। উনি লিখছেন, 'কাল ছুটির দিন, আপনার সঙ্গে নিরিবিলি বসিয়া কিছু সৎপ্রসঙ্গ করিবার ইচ্ছা আছে।'

ঈশান। ঐ দেখছেন? 'নিরিবিলি বসিয়া'। কেন বাপু, আমরা এক-আধজন ভদ্রলোক থাকলে তোমার আপত্তিটা কি?

জনার্দন। এর থেকেই বোঝা উচিত যে ওঁর মতলবটা ভালো নয়।

নিকুঞ্জ। ঠিক বলেছেন। মতলব যদি ভালোই হবে, তবে এত ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় কেন? নিরিবিলি বসতে চান কেন?

সোমপ্রকাশ। বুঝলেন ভবদুলালবাবু আপনি ওখানে যাবেন না। গেলেই বিপদে পড়বেন।

ভবদুলাল। বল কি হে? ছুরিছোরা মারবে নাকি?

সোমপ্রকাশ। না, না, বিপদটা কি জানেন? চিন্তাশীল লোকেরা বলেন যে, বিপদ মারাত্মক হয় সেখানে, যেখানে তার অন্তর্গূঢ় ভাবটিকে তার বাইরের কোনো অবান্তর স্বরূপের দ্বারা আচ্ছন্ন করে রাখা হয়।

ভবদুলাল। (পুলকিত ভাবে) এ আবার কি বলে শুনুন।

সোমপ্রকাশ। স্বয়ং হার্বার্ট্ স্পেন্‌সার এ কথা বলেছেন। আপনি হার্বাট স্পেন্সারকে জানেন তো?

ভবদুলাল। হ্যাঁ...হার্বাট, স্পেন্সার, হাঁচি, টিকটিকি, ভূত, প্রেত সব মানি।

সত্যবাহন। আপনি ভাববেন না ভবদুলালবাবু, আপনার কোনো ভয় নেই। আমি আপনার সঙ্গে যাব, দেখি ওরা কি করতে পারে।

নিকুঞ্জ। ব্যাস, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

ঈশান। সেই জুবিলির বছর কি হয়েছিল মনে নেই? শ্রীখণ্ডবাবু ওঁদের ওখানে এক বক্তৃতা দিলেন, আমরা দল বেঁধে শুনতে গেলাম। গিয়ে শুনি, তার আগাগোড়াই কেবল নিজেদের কথা। ওঁদের আশ্রম, ওঁদের সাধন, ওঁদের যত ছাইভস্ম, তাই খুব ফলাও করে বলতে লাগলেন।

সত্যবাহন। শেষটায় আমি বাধ্য হয়ে উঠে তেজের সঙ্গে বললাম, 'লালাজি দেওনাথের সময় থেকে আজ পর্যন্ত যে অখণ্ড-সাধন-ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে, তা যদি কোথাও অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে সে হচ্ছে আমাদের সাম্য-সিদ্ধান্ত সভা।'

ঈশান। ওঁরা সে-সব ভেঙেচুরে এখন বিজ্ঞানের আগড়ুম-

ধাগড়ুম করছেন। আরে বিজ্ঞান-বিজ্ঞান বললেই কি লোকের চোখে ধুলো দেওয়া যায়।

নিকুঞ্জ। বেশি দূরে যাবার দরকার কি? ওঁরা কি-রকম সব ছেলে তৈরি করছেন তাও দেখুন, আর আমাদের সোমপ্রকাশকেও দেখুন।

জনার্দন। একটা আদর্শ ছেলে বললেই হয়।

সোমপ্রকাশ। না, না, ছি-ছি-ছি, কি বলছেন! আমি এই যেমন লোহিত সাগর আর ভূমধ্য সাগরের মধ্যে সুয়েজ প্রণালী, আমায় সেইরকম মনে করবেন।

জনার্দন। আসল কথা হচ্ছে, আমরা এখন সাধনের যে স্তরে উঠেছি, ওঁরা সে পর্যন্ত ধারণা করতেই পারেন নি।

নিকুঞ্জ। ওঃ! গতবারে যদি আপনি থাকতেন! ঈক্ষা ও সমীক্ষা সম্বন্ধে সমাদ্দারমশাই যা বললেন শুনলে আপনার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত।

ঈশান। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাঁটা দিয়ে তো উঠত, কিন্তু এখন দুপুর রাত পর্যন্ত আপনাদের ঐ আলোচনাই চলবে নাকি।

সকলের গাত্রোত্থান

সত্যবাহন। তা হলে এই কথা রইল, কাল আপনার বাড়ি হয়ে আমি আপনাকে নিয়ে যাব।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রম। ছাত্রেরা সেমিসার্কল হইয়া দণ্ডায়মান। শিক্ষক নবীনবাবু প্রভৃতি ব্যস্তভাবে ঘোরাঘুরি করিতেছেন। শ্রীখণ্ডদেব ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলের উপর বড়ো-বড়ো বই সাজাইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন। একপাশে কতকগুলি অদ্ভুত যন্ত্র ও অর্থহীন চার্ট প্রভৃতি। দেয়ালে কতকগুলি কার্ডে নানা-রকম মটো লেখা রহিয়াছে।

নবীন। (জানলা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া) এই মাটি করেছে। সঙ্গে-সঙ্গে সত্যবাহন সমাদ্দারও আসছে দেখছি।

শ্রীখণ্ড। আসুক, আসুক। একবার চোখ মেলে সব দেখে যাক। তারপর দেখি, ওর কথা বলবার মুখ থাকে কিনা।

নবীন। এসে একটা গোলমাল না বাধালেই হয়।

শ্রীখণ্ড। তা যদি করে তাহলে দেখিয়ে দেব যে শ্রীখণ্ড লোকটিও বড় কম গোলমেলে নয়।

সত্যবাহন ও ভবদুলালের প্রবেশ

সত্যবাহন। এই যে, ছেলেগুলো সব হাজির রয়েছে দেখছি।

শ্রীখণ্ড। না, সব আর কোথায়? ছুটিতে অনেকেই বাড়ি গিয়েছে।

সত্যবাহন। খালি খুব খারাপ ছেলেগুলো রয়ে গেছে বুঝি?

শ্রীখণ্ড। খারাপ ছেলে আবার কি মশায়? মানুষ আবার খারাপ কি? খারাপ কেউ নয়। ঘোর অসাম্য বদ্ধ পাষণ্ড যে তাকেও আমরা খারাপ বলি না।

ভবদুলাল। তা তে বটেই ও-সব বলতে নেই। আমি একবার আমাদের গোবরা মাতালকে খারাপ লোক বলেছিলাম, সে এত বড়ো একটা থান ইঁট নিয়ে আমায় মারতে এসেছিল। ওরকম কক্ষনো বলবেন না।

সত্যবাহন। সে কি মশায়! যে খারাপ তাকে খারাপ বলব না? আলবৎ বলব। খারাপ ছেলে!

শ্রীখণ্ড। আহা-হা, উনি আশ্রমের শিক্ষক—নবীনবাবু।

সত্যবাহন। ও, তাই নাকি? যাই হোক, তুমি কি পড়ছ ছোকরা?

ছাত্র। শব্দার্থ-খণ্ডিকা, আয়স্কন্ধ-পদ্ধতি, লোকাণ্টপ্রকরণ, সিনেক্স্ কম্পোমোপোডিয়া, পালস এক্সট্রা সাইক্লিক ইকুইলিব্রিয়ম এ্যাণ্ড দি নেগেটিভ জিরো—

সত্যবাহন। থাক, থাক, আর বলতে হবে না! দেখুন, অত বেশি পড়িয়ে কিছু লাভ হয় না। আমি দেখেছি ভালো বই খান-দুই হলেই এদিককার শিক্ষা সব একরকম হয়ে যায়।

ভবদুলাল। আমার 'চলচিত্তচঞ্চরি' বইখানা আপনাদের লাইব্রেরিতে রাখেন না কেন?

শ্রীখণ্ড। বেশ তো, দিন-না এক কপি।

ভবদুলাল। আচ্ছা, দেব এখন। ওটা হয়েছে কি, বইটা এখনো বেরোয় নি। মানে খুব বড়ো বই হচ্ছে কিনা, অনেক সময় লাগবে। কোথায় ছাপতে দিই বলুন তো?

শ্রীখণ্ড। ও, এখনো ছাপতে দেন নি বুঝি?

ভবদুলাল। না, এই লেখা হলেই ছাপতে দেব। আগে একটা ভূমিকা লিখতে হবে তো? সেটি কিরকম লিখব তাই ভাবছি। খুব বড়ো বই হবে কিনা।

শ্রীখণ্ড। কি নাম বললেন বইখানার?

ভবদুলাল। কি নাম বললাম? চলচঞ্চল, কি না? দেখুন তো মশাই, সব ঘুলিয়ে দিলেন—এমন সুন্দর নামটা ভেবেছিলাম।

সত্যবাহন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আজকাল বাজারে দুখানা বই বেরিয়েছে—সাম্য-নির্ঘণ্ট আর সিদ্ধান্ত-বিশুদ্ধিকা—তাতে শিক্ষাতত্ত্ব আর সাধনতত্ত্ব এই দুটো দিকই সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

শ্রীখণ্ড। ঐ তো—ও বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আমাদের মিলবে না। আমরা বলি অখণ্ড শিক্ষার আদর্শ এমন হওয়া উচিত যে তার মধ্যে বেশ একটা সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য থাকবে—যেমন নিঃশ্বাস আর প্রশ্বাস।

সত্যবাহন। ঐ করেই তো আপনারা গেলেন। এদিকে ছেলেগুলোর শাসন-টাসনের দিকে আপনাদের এক ফোঁটা দৃষ্টি নেই।

শ্রীখণ্ড। শাসন আবার কি মশাই? জানেন, ছেলেদের ধমক-ধামক শাসন এতে আমি অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করি।

ভবদুলাল। আমারও ঠিক ঐরকম। আমি যখন পাটনায় মাস্টার ছিলুম—একদিন একেবারে বারো-চোদ্দোটা ছেলেকে আচ্ছা করে পিটিয়ে দেখলুম সন্ধ্যার সময় ভারি ক্লেশ হতে লাগল—হাত টনটন কাঁধে ব্যথা।

সত্যবাহন। যাক, যে কথা বলছিলাম। আমরা আজ কদিন থেকে বিশেষভাবে চিন্তা করে বেশ বুঝতে পারছি যে এদের শিক্ষার মধ্যে কতকগুলো গুরুতর গলদ থেকে যাচ্ছে। কেবল নির্বিকল্প সত্যের অনুরোধেই আমি সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য হচ্ছি। যথা- (পাঠ) প্রথম সাম্যসাধনাদি অবশ্য সম্পাদনীয় বিষয় অনৈকাগ্রতা, অনভিনিবেশ ও চঞ্চলচিত্ততা।

ভবদুলাল। 'চলচিত্তচঞ্চরি'—মনে হয়েছে।

সত্যবাহন। বাধা দেবেন না। দ্বিতীয়—বিবিধ মৌলিক বিষয়ে সম্যক শিক্ষাভাবজনিত খণ্ডাখণ্ড বিচারহীনতা। তৃতীয়—বিবেক-বৃত্তির নানা বৈষম্যঘটিত অবিমৃষ্যকারিতা—

ভবদুলাল। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সত্যবাহন। হোক দেরি। বিবেকবৃত্তির নানা বৈষম্য-ঘটিত—

ভবদুলাল। ওটা বলা হয়েছে—

সত্যবাহন। আঃ—নানা বৈষম্যঘটিত অবিমৃষ্যকারিতা ও আত্মপ্রচার-তৎপরতা। চতুর্থ—শ্রদ্ধা গাম্ভীর্যাদি পরিপূর্ণ বিনয়াবনতির ঐকান্তিক অভাব। পঞ্চম—

শ্রীখণ্ড। দেখুন, ও-সব এখন থাক। আপনাদের এ-সব অভিযোগ আমরা অনেক শুনেছি। তার জবাব দেবার কোনো প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু তা হলেও সম্যক শিক্ষাভাব বলে যেটা বলছেন সেটা একেবারে অন্যায়। যেরকম সাবধানতার সঙ্গে উন্নত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে আমরা আধুনিক মেটাসাইকোলজিক্যাল প্রিন্সিপল্‌স অনুসারে সমস্ত শিক্ষা দিয়ে থাকি তার সম্বন্ধে এমন অভিযোগের কোনো প্রমাণ আপনি দিতে পারেন?

সত্যবাহন। একশোবার পারি। তা হলে শুনবেন? আপনাদেরই কোনো-এক ছাত্রের কাছে কোনো-একটি ভদ্রলোক খণ্ডাখণ্ডেরযে ব্যাখ্যা শুনলেন—আমাদের নিকুঞ্জবাবুর দাদা বলছিলেন সে একেবারে রাবিশ—মানেই হয় না।

শ্রীখণ্ড। তাতে কি প্রমাণ হল? ও তো একটা শোনা কথা।

সত্যবাহন। দেখুন, নিকুঞ্জবাবু আমার অত্যন্ত নিকট বন্ধু। তাঁর দাদাকে অবিশ্বাস করা আর আমাকে মিথ্যাবাদী বলা একই কথা।

শ্রীখণ্ড। তাহলে দেখছি আপনাদের সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করতে হবে।

সত্যবাহন। দেখুন, উত্তেজিত হবেন না। উত্তেজিত ভাবে কোনো প্রসঙ্গ করা আমাদের রীতি বিরুদ্ধ।

ভবদুলাল। বড্ডো দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সত্যবাহন। আঃ—কেন বাধা দিচ্ছেন? জিজ্ঞাসা করি খণ্ডাখণ্ডের যে তত্ত্বপর্যায় সেটা আপনারা স্বীকার করেন তো?

শ্রীখণ্ড। আমরা বলি, খণ্ডাখণ্ডটা তত্ত্বই নয়—ওটা তত্ত্বাভাষ। আর সমসাম্য যেটাকে বলেন সেটা সাধন নয়—সেটা হচ্ছে একটা রসভাষ। আপনারা এ-সব এমনভাবে বলেন যেন খণ্ডাখণ্ড সমসাম্য সব একই কথা। আসলে তা নয়। আপনারা যেখানে বলেন—কেন্দ্রগতং নির্বিশেষং, আমরা সেখানে বলি-কেন্দ্রগতং নির্বিশেষঞ্চ। কারণ ও-দুটো স্বতন্ত্র জিনিস। আপনারা যা আওড়াচ্ছেন ও-সব সেকেলে পুরোনো কথা—এ-যুগে ও-সব চলবে না। এ-কালের সাধন বলতে আমরা কি বুঝি শুনবেন—? (ছাত্রের প্রতি) বল তো, সাধন কাকে বলে।

ছাত্র। নবাগত যুগের সাধন একটা সহজ বৈজ্ঞানিক প্রণালী যার সাহায্যে একটা যে কোনো শব্দ বা বস্তুকে অবলম্বন করে তারই ভিতর থেকে উত্তরোত্তর পর্যায়ক্রমে নানারকম অনুভূতির ধারাকে অব্যাহত স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়।

শ্রীখণ্ড। শুনলেন তো? আপনাদের সঙ্গে আকাশ পাতাল তফাত। ওটা আবার বল তো হে।

ছাত্র। (পুনরাবৃত্তি)

সত্যবাহন। দেখুন, কোনো কথা ধীরভাবে শুনবেন সে সহিষ্ণুতা আপনার নেই। অকাট্য কর্তব্যের প্রেরণায় আপনারই উপকারের জন্য এ কথা আজকে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, ঐ অহংকার ও আত্মসর্বস্বতাই আপনার সর্বনাশ করবে। চলুন, ভবদুলালবাবু।

ভবদুলাল। এই একটু শুনে যাই। বেশ লাগছে মন্দ না।

সত্যবাহন। তা হলে শুনুন, খুব করে শুনুন। অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক, পাষণ্ড— [প্রস্থান

ভবদুলাল। হ্যাঁ, তার পর সেই বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

শ্রীখণ্ড। হ্যাঁ, ওটা এই আশ্রমের একটা বিশেষত্ব—একটা গ্রাজুয়েটেড সাইকো-থীসিস অভ ফোনেটিক ফরম্‌স। ওটা অবলম্বন করে অবধি আমরা আশ্চর্য ফল পাচ্ছি। অথচ আমাদের প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রেরা পর্যন্ত এর সাধন করে থাকে। মনে করুন যে-কোনো সাধারণ শব্দ বা বস্তু—কতখানি জোরের কথা একবার ভাবুন তো?

ভবদুলাল। চমৎকার। আমার চলচিত্তচঞ্চরিতে ওটা লিখতেই হবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যে কোনো সাধারণ শব্দ বা বস্তু—একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারেন?

শ্রীখণ্ড। হ্যাঁ, মনে করুন গোরু। গো, রু। 'গো' মানে কি? 'গোস্বর্গপশুবাক্‌বজ্রদিঙ্‌ নেত্রঘৃণিভূজলে', গো মানে গোরু,

গো মানে দিক, গো মানে ভূ—পৃথিবী, গো মানে স্বর্গ, গো মানে কত কি। সুতরাং এটা সাধন করলে গো বললেই মনে হবে পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, ব্রহ্মাণ্ড। 'রু' মানে কি? 'রব রাব রুত রোধন' 'কর্ণেরৌতি কিমপিশনৈবিচিত্রং'; 'রু' মানে শব্দ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অব্যক্ত মর্মর শব্দ বিশ্বের সমস্ত সুখ দুঃখ ক্রন্দন—সব ঘুরতে ঘুরতে ছন্দে ছন্দে বেজে উঠছে—মিউ-জিক অভ দি স্ফীয়ার্স—দেখুন একটা সামান্য শব্দ দোহন করে কি অপূর্ব রস পাওয়া যাচ্ছে। আমার শব্দার্থ খণ্ডিকায় এইরকম দেড়-হাজার শব্দ আমি খণ্ডন করে দেখিয়েছি। গোরুর সূত্রটা বল তো হে।

ছাত্রগণ। খণ্ডিত গোধন মণ্ডল ধরণী
শবদে শবদে মন্থিত অরণী,
ত্রিজগৎ যজ্ঞে শ্বাশত স্বাহা—
নন্দিত কলকল ক্রন্দিত হাহা!
স্তম্ভিত সুখ দুখ মন্থন মোহে
প্রলয় বিলোড়ন লটপট লোহে;
মৃত্যু ভয়াবহ হম্বা হম্বা
রৌরব তরণী তুহুঁ জগদম্বা
শ্যামল স্নিগ্ধানন্দন বরণী
খণ্ডিত গোধন মণ্ডল ধরণী

ভবদুলাল। ঐ গোরুর কথা যা বললেন—আমি দেখেছি মহিষেরও ঠিক তাই। জয়রামের মহিষ একবার আমায় তাড়া করেছিল—তার পর যেই না গুঁতো মেরেছে অমনি দেখি সব বোঁ-বোঁ করে ঘরছে। তখন মনে হল—চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ। আচ্ছা আপনারা ঐ সমীক্ষা-টমীক্ষা করেন না?

শ্রীখণ্ড। ওগুলো মশায়, করে করে বুড়ো হয়ে গেলাম। আসল গোড়াপত্তন ঠিক না হলে ও-সবে কিছু হয় না। ওদের খণ্ডাখণ্ড আর আমাদের শব্দার্থ-খণ্ডন—দুটোই দেখলেন তো? আসল কথা ওদের মতলবটা হচ্ছে একেবারে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবেন। খণ্ড সাধন হতে না হতেই ওঁরা এক লাফে আগ ডালে গিয়ে চড়ে বসতে চান। তাও কি হয় কখনো?

নবীন। দেখুন, এরা কিছু শুনবে বলে আশা করে আছে। আপনি এদের কিছু বলুন।

ভবদুলাল। বেশ তো, দেখ বালকগণ, চলচিত্তচঞ্চরি বলে আমার একখনো বড়ো বই হবে—ডবল ডিমাই ৭০০ কি ৮০০ পৃষ্ঠা—দামটা এখনো ঠিক করি নি—একটু কম করেই করব ভাবছি—আচ্ছা, চার টাকা করলে কেমন হয়? একটু বেশি হয়, না? আচ্ছা ধরুন ৩।।০ টাকা? ঐ বইয়ের মধ্যে নানা-রকম ভালো ভালো কথা লেখা থাকবে। যেমন মনে কর, এই এক জায়গায় আছে—চুরি করা মহাপাপ—যে না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করে তাহাকে চোর বলে। তোমরা না বলে কখনো পরের জিনিস নিয়ো না। তবে অবিশ্যি সব সময় তো আর বলে নেওয়া যায় না। যেমন, আমি একবার একটি ভদ্রলোককে বললাম, 'মশায় আপনার সোনার ঘড়িটা আমায় দেবেন?' সে বলল, 'না দেব না।' ছোটোলোক! আমরা ছেলেবেলায় একটা বই পড়েছিলাম তার নাম মনে নেই—তার মধ্যে একটা গল্প ছিল তার সবটা মনে পড়ছে না—ভুবন বলে একটা ছেলে তার মাসির কান কামড়ে দিয়েছিল। মনে কর তার নিজের কান তো নয়—মাসির কান। তবে না বলে কামড়ে নিল কেন? এর জন্য তার কঠিন শাস্তি হয়েছিল।

শ্রীখণ্ড। আচ্ছা আজ এ পর্যন্তই থাক। আবার আসবেন তো?

ভবদুলাল। আসব বৈকি! রোজ আসব। এই তো আজকেই আমার সতেরো পৃষ্ঠা লেখা হয়ে গেল। এরকম হপ্তা-খানেক চললেই বইখানা জমে উঠবে। আচ্ছা আজ আসি।

[গুন-গুন গান করিতে-করিতে ভবদুলালের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

সামা-সিদ্ধান্ত সভাগৃহ। ঈশান, নিকুঞ্জ, জনার্দন ও সোমপ্রকাশ উপবিষ্ট। সত্যবাহনের প্রবেশ।

জনার্দন। তার পর সেদিন ওখানে কি হল?

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, আপনি কদিন আসেন নি; আমরা শোনবার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছি।

সত্যবাহন। হবে আর কি, হুঃ! এ কথা ভাবতেও কষ্ট হয় যে শ্রীখণ্ডবাবু একদিন আমাদেরই একজন ছিলেন। আজ আমাদের সংস্পর্শে থাকলে তাঁর কি এমন দশা হত? সামান্য ভদ্রতা পর্যন্ত ওঁরা ভুলে গেছেন।

ঈশান। ভবদুলালবাবুকে ওখানেই রেখে এলেন নাকি?

সত্যবাহন। তাঁর কথা আর বলবেন না। তিনি তাঁর গুরুর নামটি একেবারে ডুবিয়েছেন। কি বলব বলুন, তাঁর সামনে শ্রীখণ্ডবাবু আমায় বার-বার কিরকম দারুণভাবে অপমান করতে লাগলেন—উনি তার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলেন না—উলটে বরং ওঁদের সঙ্গেই নানারকম হৃদ্যতা প্রকাশ করতে লাগলেন।

নিকুঞ্জ। ছি, ছি, ছি, এ একেবারে অমার্জনীয়।

সোমপ্রকাশ। দেখুন কিসে যে কি হয় তা কি কেউ বলতে পারে? আমরা অসহিষ্ণু হয়ে ভাবছি ভবদুলালবাবু আমাদের ত্যাগ করেছেন—আমি বলি কে জানে?—হয়তো অলক্ষিতে আমাদের প্রভাব এখনো তাঁর উপর কাজ করছে।

সত্যবাহন। ও-সব কিছু বিশ্বাস নেই হে—সামান্য বিষয়ে যে খাঁটি ও ভেজাল চিনতে পারে না—তার থেকে কি আর আশা করতে বল?

ঈশান। (গান) কিসে যে কি হয় কে জানে?
কেউ জানে না, কেউ জানে না
যার কথা সে বুঝেছে সে জানে।

বাহিরে পদশব্দ ও গান গাহিতে-গাহিতে ভবদুলালের প্রবেশ—টুইঙ্কিল-টুইঙ্কিল-এর সুরে—ভব ভয় ভীতি ভাবনা প্রভৃতি

ঈশান। ও কিরকম বিশ্রী সুরে গান গাইছেন বলুন তো?

ভবদুলাল। ওটা আমার একটা নতুন গান।

ঈশান। আপনার কিরকম? আমি আজ পাঁচ-বছর ওটা গেয়ে আসছি। আর ওটার ওরকম সুর মোটেই নয়। ওটা এইরকম—(গান)।

ভবদুলাল। তাই নাকি? ওটা আপনার গান? ঐ যা, ওটাও আমার চলচ্চিত্তচঞ্চরিতে দিয়ে ফেলেছি। তা আপনার নামেই দিয়ে দেব।

নিকুঞ্জ। কি মশায়, আপনার আশ্রমিক পর্ব শেষ হল?

ভবদুলাল। কি বললেন? কি পর্বত?

নিকুঞ্জ। বলি আশ্রমের সখটা মিটল?

ভবদুলাল। হ্যাঁ, দুদিন বেশ জমেছিল, তারপর ওঁরা কি-রকম করতে লাগলেন তাই চলে এলাম। আসবার সময় একটা ছেলের কান মলে দিয়ে এসেছি।

সোমপ্রকাশ। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে যেমন দূরের জিনিসকে কাছে এনে দেখায় তেমনি কিছুক্ষণ আগে আমার একটা অনুভূতি এসেছিল যে আপনি হয়তো আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসবেন।

ভবদুলাল। ওঁদের আশ্রমে একটা দুরবীণ আছে—তার এমন তেজ যে চাঁদের দিকে তাকালে চাঁদের গায়ে সব ফোসকা-ফোসকা মতন পড়ে যায়। বোধ হয় থাউজ্যাণ্ড হর্স্-পাওয়ার কি তার চাইতেও বেশি হবে।

ঈশান। এত বুজরুকিও জানে ওরা।

জনার্দন। ওঁকে ভালোমানুষ পেয়ে সাপ বোঝাতে ব্যাঙ বুঝিয়ে দিয়েছে।

ভবদুলাল। হ্যাঁ, ব্যাঙ বলতে মনে হল—সোমপ্রকাশের কথা ওঁরা কি বলেছেন শোনেন নি বুঝি?

সোমপ্রকাশ। না, না, কিছু বলেছেন নাকি?

ভবদুলাল। আমি ওঁদের কাছে সোমপ্রকাশের সুখ্যাতি করছিলাম, তাই শুনে শ্রীখণ্ডবাবু বললেন যে আমরা চাই মানুষ তৈরি করতে—কতকগুলো কোলা ব্যাঙ তৈরি করে কি হবে?

নিকুঞ্জ। আপনি এর কোনো প্রতিবাদ করলেন না?

ভবদুলাল। না—তখন খেয়াল হয় নি।

সোমপ্রকাশ। মানুষকে চেনা শক্ত। হার্বার্ট ল্যাথাম্ তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে, ক্ষমতা এবং অক্ষমতা দুয়েরই মৌলিক রূপ এক। ওঁরা একথা স্বীকার করবেন কিনা জানি না।

ভবদুলাল। হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব স্বীকার করেন—এই তো সেদিন আমায় বলছিলেন যে ঈশান আর সত্যবাহন দুই সমান—এ বলে আমায় দেখ আর ও বলে আমায় দেখ। আরে দেখব আর কি? এরও যেমন কানকাটা খরগোশের মতন চেহারা, ওরও তেমনি হাঁ-করা বোয়াল মাছের মতন চেহারা।

সত্যবাহন। কি! এত বড় আস্পর্ধা! আমায় কানকাটা খরগোশ বলে।

ভবদুলাল। না, না, আপনাকে তো তা বলেন নি—আপনাকে বোয়াল মাছ বলেছে।

নিকুঞ্জ। কি অভদ্র ভাষা। আমায় কিছু বললে?

ভবদুলাল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম—তা, বলুন্, নিকুঞ্জ কোনটা? ঐ ছাগলা দাড়ি, না যার ডাবা হুঁকোর মতো মুখ?

নিকুঞ্জ। আপনি কি বললেন?

ভবদুলাল। আমি বললাম ডাবা হুঁকো।

নিকুঞ্জ। নাঃ এক-একটা মানুষ থাকে, তাদের মাথায় খালি গোবর পোরা।

ভবদুলাল। কি আশ্চর্য! শ্রীখণ্ডবাবুও ঠিক তাই বলেন। বলেন ওদের মাথায় খালি গোবর—তাও শুকিয়ে ঘুঁটে হয়ে গেছে।

সত্যবাহন। এ-সব আর সহ্য হয় না। মশায়, আপনি ওখানে ছিলেন—বেশ ছিলেন। আবার আমাদের হাড় জ্বালাতে এলেন কেন?

ঈশান। আহা, ও কি? উনি আগ্রহ করে আসছেন সে তো ভালোই।

জনার্দন। হ্যাঁ, বেশ তো, উনি আসুন না।

সত্যবাহন। আগ্রহ কি নিগ্রহ কে জানে?

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, অত অনুগ্রহ নাই করলেন?

ভবদুলাল। হাঃ, হাঃ, হাঃ, ওটা বেশ বলেছেন। ছেলে-বেলায় আমাদের সঙ্গে একজন পড়ত—সেও ঐরকম কথা গোলমাল করত। দ্রাক্ষাকে বলত দ্রাক্ষা! ঐ 'ক'-এ মূর্ধণ্য 'ষ'-এ ক্ষ, আর 'হ'-এ 'ম' হ্ম, বুঝলেন না?

সত্যবাহন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি মশাই।

ভবদুলাল। আমরা ছেলেবেলায় পড়েছিলাম—শৃগাল ও দ্রাক্ষা ফল। দ্রাক্ষা বলে একরকম ফল আছে—মানে আছে কিনা জানি না, কিন্তু তর্ক করে তো লাভ নেই। মনে করুন যদি বলেন নেই, তা সে আপনি বললেও আছে, না বললেও আছে। তাহলে তর্ক করে লাভ কি? কি বলেন?

সত্যবাহন। আপনার কাছে কোনো কথা বলাই বৃথা।

ভবদুলাল। না, না, বৃথা হবে কেন? ওটা আমার চলচ্চিত্তচঞ্চরিতে দিয়েছি তো। আপনার নাম করেই দিয়েছি।

সত্যবাহন। আমার নাম করেছেন, কিরকম? আপনি তো সাংঘাতিক লোক দেখছি মশায়। দেখুন, ঐ যা-তা লিখবেন আর আমার নামে চালাবেন—এ আমি পছন্দ করি না।

ভবদুলাল। বাঃ! নাম করব না? তা নইলে শেষটায় লোকে আমায় চেপে ধরবে আর আমি জবাব দিতে পারব না, তখন? সে হচ্ছে না। ঐ ঈশানবাবুর বেলাও তাই। যার-যার গান, তার-তার নাম।

সত্যবাহন। দেখুন, আপনি সহজ কথা বুঝবেন না, আবার জেদ করবেন।

ভবদুলাল। ও, ভুল হয়েছে বুঝি? তা আমার আবার মাথার ব্যারাম আছে কিনা। সেই সেবার সজারুতে কামড়েছিল—

ঈশান। কি মশায়, সেদিন বললেন, বেড়াল, আর আজ বলছেন সজারু!

ভবদলাল। ও, তাই নাকি? বেড়াল বলেছিলাম নাকি? তা হবে। তা, ও বেড়ালও যা সজারুও তাই। ও কেবল দেখবার রকমারি কিনা। আসলে বস্তু তো আর স্বতন্ত্র নয়। কারণ কেন্দ্রগতং নির্বিশেষম্। কি বলেন? ওটাও দিয়ে দিই; কেমন?

সত্যবাহন। দেখুন, যে বিষয়ে আপনার বুঝবার ক্ষমতা হয় নি সে-বিষয়ে এরকম যা-তা যদি লেখেন তবে আপনার সঙ্গে আমার জন্মের মতন ছাড়াছাড়ি।

ভবদুলাল। কি মুশকিল! শ্রীখণ্ডবাবুও ঠিক ঐরকম বললেন। ওঁদেরই কতকগুলো ভালো ভালো কথা সেদিন আমি ছেলেদের কাছে বলছিলাম; এমন সময় উনি রেগে—'ও-সব কি শেখাচ্ছেন' বলে একেবারে তেইশখানা পাতা ছিঁড়ে দিলেন। তাই তো চলে এলাম।

ঈশান। একি মশায়? খাতায় এ-সব কি লিখেছেন?

ভবদুলাল। কেন, কি হয়েছে বলুন দেখি?

ঈশান। কি হয়েছে? এই আপনার চলচ্চিত্তচঞ্চরি? এ-সব কি? ঈশানবাবুর ছায়া ঘুরছে—লাটাই পাকাচ্ছে—আর ঈশানবাবু গোঁৎ খাচ্ছেন। পেটের ভিতর বিরাট অন্ধকার হাঁ করে কামড়ে দিয়েছে—চ্যাঁচাতে পারছেন না, খালি নিশ্বাস উঠছে আর পড়ছে—সব ঝাপসা দেখছে—গা ঝিম-ঝিম- নাস্ত ভমিকা থার্টি—

ভবদুলাল। বাঃ! ও ওগুলো তো আপনাদেরই কথা। শুধু নাস্ত ভমিকাটা আমার লেখা—

ঘোর উত্তেজনা

সকলে। দিন দেখি খাতাখানা।

ভবদুলাল। আঃ—আমার চলচ্চিত্তচঞ্চরি—

সত্যবাহন। ধ্যেৎ তেরি চলচ্চিত্তচঞ্চরি—

ভবদুলাল। ওকি মশায়—টানাটানি করেন কেন? একে তো শ্রীখণ্ডবাবু তেইশখানা পাতা ছিঁড়ে দিয়েছেন—হাঁ, হাঁ, হাঁ করেন কি, করেন কি? দেখুন দেখি মশায়, আমার চলচ্চিত্ত-চঞ্চরি ছিঁড়ে দিলে!

ছেঁড়া খাতা সংগ্রহের চেষ্টা

সত্যবাহন। এই ঈশেনবাবুর যত বাড়াবাড়ি। আপনার ও-সব গান আর সমীক্ষা ওঁকে শোনাবার কি দরকার ছিল?

ঈশান। আপনি আবার আহ্লাদ করে ওঁর কাছে খণ্ডাখণ্ডের ব্যাখ্যা করতে গেলেন কেন?

ভবদুলাল। খাতা ছিঁড়ে দিয়েছেন তা কি হয়েছে। আবার লিখব—চলচ্চিত্তচঞ্চরি—লাল রঙের মলাট—চামড়া দিয়ে বাঁধানো। তার উপরে বড়-বড় করে সোনার জলে লেখা—চলচ্চিত্তচঞ্চরি—পাবলিশড় বাই ভবদুলাল। একুশ টাকা দাম করব। তখন দেখব—আপনাদের ঐ সাম্যঘণ্ট আর সিদ্ধান্ত বিসূচিকা কোথায় লাগে।

গান

সংসার কটাহ তলে জ্বলে রে জ্বলে!
জ্বলে মহাকালানল জ্বলে জ্বল জ্বল,
সজল কাজল জ্বলে রে জ্বলে।
অলক তিলক জ্বলে ললাটে,
সোনালী লিখন জ্বলে মলাটে,
খেলে কাঁচাকচু জ্বলে চুলকানি
জ্বলে রে জ্বলে।

॥ ভাবুক সভা ॥

[ভাবুকদাদা নিদ্রাবিষ্ট—ছোকরা ভাবুকদলের প্রবেশ]

প্রথম ভাবুক: ইকি ভাই লম্বকেশ, দেখছ নাকি ব্যাপারটা?
ভাবুকদাদা মূর্ছাগত, মাথায় গুঁজে র‍্যাপারটা।

দ্বিতীয় ভাবুক। তাই তো বটে! আমি বলি এত কি হয় সহ্য?
সকাল বিকাল এমন ধারা ভাবের আতিশয্য!

প্রথম ভাবুক। অবাক করলে! ঠিক যেমন শাস্ত্রে আছে উক্ত—
ভাবের ঝোঁকে একেবারে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত।
সাংঘাতিক এ ভাবের খেলা বুঝতে নারে মূর্খ—
ভাবরাজ্যের তত্ত্ব রে ভাই সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম।

দ্বিতীয় ভাবুক। ভাবটা যখন গাঢ় হয়—বলে গেছেন ভক্ত,
হৃদয়টাকে এঁটে ধরে আঠার মতো শক্ত।

প্রথম ভাবুক। (যখন) ভাবের বেগে জোয়ার লেগে বন্যা আসে তেড়ে,
আত্মারূপী সূক্ষ্ম শরীর পালায় দেহ ছেড়ে—
(কিন্তু) হেথায় যেমন গতিক দেখছি শঙ্কা হচ্ছে খুবই
আত্মা পুরুষ গেছেন হয়তো ভাবের স্রোতে ডুবি।
যেমন ধারা পড়ছে দেখ গুরু-গুরু নিশ্বাস,
বেশিক্ষণ বাঁচবে এমন কোরো নাকো বিশ্বাস।
কোনখানে হায় ছিঁড়ে গেছে সূক্ষ্ম কোনো স্নায়ু
ক্ষণজন্মা পুরুষ কিনা, তাইতে অল্প আয়ু।

বিলাপ সঙ্গীত

ভবনদী পার হবি কে চড়ে ভবের নায়?
ভাবের ভাবনা ভাবতে-ভাবতে ভবের পারে যায় রে

ভাবুক ভবের পারে যায়।
ভবের হাটে ভাবের খেলা, ভাবুক কেন ভোল ?
ভাবের জমি চাষ দিয়ে ভাই ভবের পটোল তোল রে—
ভাই ভবের পটোল তোল ।
শান বাঁধানো মনের ভিটেয় ভাবের ঘুঘু চরে—
ভাবের মাথায় টোক্কা দিলে বাক্য-মানিক ঝরে রে মন
বাক্য-মানিক ঝরে।
ভাবের ভারে হদ্দ কাবু ভাবুক বলে তায়
ভাব-তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ভাবের খাবি খায় রে
ভাবুক ভাবের খাবি খায়।

[কীর্তন 'জমাট' হওয়ায় ভাবুকদাদার নিদ্রচ্যুতি

ভাবুক দাদা। জুতিয়ে সব সিধে করব, বলে রাখছি পষ্ট—
চ্যাঁচামেচি করে ব্যাটা ঘুমটি করলি নষ্ট ?

প্রথম ভাবুক। ঘুম কি হে ? সিকি কথা ? অবাক কল্লে খুব।
ঘুমোওনি তো—ভাবের স্রোতে মেরেছিলে ডুব।
ঘুমোয় যত ইতর লোকে—তেলী মুদী চাষা—
তুমি আমি ভাবুক মানুষ ভাবের রাজ্যে বাসা।

ভাবুক দাদা। সে ঘুম নয়, সে ঘুম নয় ভাবের ঝোঁকে টং,
ভাবের কাজল চোখে দিয়ে দেখছি ভাবের রঙ ;
মহিষ যেমন পড়ে রে ভাই শুকনো নদীর পাঁকে,
ভাবের পাঁকে নাকটি দিয়ে ভাবুক পড়ে থাকে।

প্রথম ভাবুক। তাই তো বটে, মনের নাকে ভাবের তৈল গুজি
ভাবের ঘোরে ভোঁ হয়ে যাই চক্ষু দুটি বুজি।

দ্বিতীয় ভাবুক। হাঃ হাঃ হা—দাদা তোমার রচনাগুলো খাসা,
ভাবের চাপে জমাট, আবার হাস্য রসে ঠাসা।

ভাবুক দাদা। ভাবের ঝোঁকে দেখতেছিলেম স্বপ্ন চমৎকার
কোমর বেঁধে ভাবুক জগৎ ভবের পগার পার।
আকাশ জুড়ে তুফান চলে, বাতাস বহে দমকায়,
গাছের পাতা শিহরি কাঁপে, বিজলী ঘন চমকায়
মাভৈ রবে ডাকছি সবে খুঁজছি ভাবের রাস্তা
(এই) ভণ্ডগুলোর গণ্ডগোলে স্বপ্ন হল ভ্যাস্তা।

প্রথম ভাবুক। যা হবার তা হয়ে গেছে—বলে গেছেন আর্য—
গতস্য শোচনা নাস্তি বুদ্ধিমানের কার্য।

দ্বিতীয় ভাবুক। কি আশ্চর্য, ভাবতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে মশায়
এমনি করে মহাত্মারা পড়েন ভাবের দশায়।

ভাবুক দাদা। অন্তরে যার মজুত আছে ভাবের খোরাকি—
(তার) ভাবের নাচন মরণ বাঁচন বুঝবি
তোরা কি ?

দ্বিতীয় ভাবুক। পরাবিদ্যা ভাবের নিদ্রা—আর কি প্রমাণ বাকি
পায়ের ধুলো দাও তো দাদা মাথায় একটু মাখি।

ভাবুক দাদা। সবুর কর স্থিরোভব, রাখ এমন টিপ্পনী,
ভাবের একটা ধাক্কা আসছে, সরে দাঁড়াও
এক্ষুনি।

প্রথম ভাবুক। বিনিদ্র চক্ষু মুখে নাহি অন্ন
আক্কেল বুঝি জড়তাপন্ন।
স্নানবিহীন যে চেহারা রুক্ষ—
এত কি চিন্তা—এত কি দুঃখ ?

দ্বিতীয় ভাবুক। সঘনে বহিছে নিশ্বাস তপ্ত—
মগজে ছুটিছে উদ্দাম রক্ত।
দিন নাই রাত নাই—লিখে লিখে হাত ক্ষয়-
একেবারে পড়ে গেলে ভাবের পাতকোয়।

ভাবুক দাদা। শৃঙ্খল টুটিয়া উন্মাদ চিত্ত
আঁকুপাঁকু ছন্দে করিছে নৃত্য—
নাচে ল্যাগব্যাগ তাণ্ডব তালে
ঝলক জ্যোতি জ্বলিছে ভালে।
জাগ্রত ভাবের শব্দ পিপাসা
শূন্যে শূন্যে খুঁজিছে ভাষা।
সংহত ভাবের ঝংকার মাঝে
বিদ্রোহ ডম্বরু অনাহত বাজে।

দ্বিতীয় ভাবুক। (হ্যাঁ-হ্যাঁ) ঐ শোনো দুড়দাড় মার-মার, শব্দ
দেবাসুর পশুনর ত্রিভুবন স্তব্ধ।

প্রথম ভাবুক। বাজে শিঙা ডম্বরু শাঁখ জগঝম্প,
ঘন মেঘ গর্জন, ঘোর ভূমিকম্প—।

ভাবুক দাদা।
কিসের তরে দিশেহারা ভাবের ঢেঁকি পাগল পারা
আপনি নাচে নাচে রে।
ছন্দে ওঠে ছন্দে নামে নিত্যধ্বনি চিত্তধামে
গভীর সুরে বাজে রে।
নাচে ঢেঁকি তালে তালে যুগে-যুগে কালে-কালে
বিশ্ব নাচে সাথে রে।
রক্ত-আঁখি নাচে ঢেঁকি, চিত্ত নাচে দেখাদেখি
নৃত্যে মাতে মাতে রে।

প্রথম ভাবুক। চিন্তা পরাহত বুদ্ধি বিওক্ষা
মগজে পড়েছে ভীষণ ফোসকা।
সরিষার ফুল যেন দেখি দুই চক্ষে।
ডুবজলে হাবুডুবু কর দাদা রক্ষে।

দ্বিতীয় ভাবুক। সূক্ষ্ম নিগূঢ় নব ঢেঁকিতত্ত্ব,
ভাবিয়া-ভাবিয়া নাহি পাই অর্থ।

ভাবুক দাদা। অর্থ। অর্থ তো অনর্থের গোড়া।
ভাবুকের ভাত-মারা সুখ-মোক্ষ-চোরা ;
যত সব তালকানা অঘামারা আনাড়ে
'অর্থ-অর্থ' করি খুঁজে মরে ভাগাড়ে।

(আরে) অর্থের শেষ কোথা কোথা তার জন্ম
অভিধান ঘাঁটা, সে কি ভাবুকের কম্ম ?
অভিধান, ব্যাকরণ, আর ঐ পঞ্জিকা—
ষোলো আনা বুজরুকী আগাগোড়া গঞ্জিকা।
মাখন-তোলা দুগ্ধ, আর লবণহীন খাদ্য,
(আর) ভাবশূন্য গবেষণা—একি ভূতের
বাপের শ্রাদ্ধ।

ভাবের নামতা

ভাবের পিঠে রস তার উপরে শূন্যি—
ভাবের নামতা পড় মাণিক বাড়বে কত পুণ্যি—
(ওরে মানিক মানিক রে নামতা পড়
খানিক রে)
ভাব এক্কে ভাব, ভাব দুগুণে ধোঁয়া,
তিন ভাবে ডিসপেপ্‌সিয়া—ঢেকুর উঠবে চোঁয়া
(ওরে মানিক মানিক রে চুপটি কর
খানিক রে)
চার ভাবে চতুর্ভুজ ভাবের গাছে চড়—
পাঁচ ভাবে পঞ্চত্ব পাও গাছের থেকে পড়।
(ওরে মানিক মানিক রে এবার গাছে চড়
খানিক রে)

যবনিকা পতন

শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম

পাত্রগণ : হরেকানন্দ। বৃহস্পতি। জগাই। ইন্দ্র। বেহারী। অশ্বিনী। পটলা। নারদ। বিশ্বম্ভর। কার্তিক। গুরুজি। বিশ্বকর্মা।

প্রথম দৃশ্য

গুরুজির আশ্রম। হরেকানন্দ, জগাই, বেহারী, পটলা,
বিশ্বম্ভর ও অন্যান্য শিষ্যরা উপবিষ্ট

হরেকানন্দ। দেখ জগাই, তুই বললে বিশ্বেস করবি নে—

সকলে। কেউ বিশ্বেস করবে না—

হরেকানন্দ। কাল থেকে মনটা আমার এমনি ওলটপালট করছে, সারারাত আর ঘুম হয় নি। দুপুরে একটু তন্দ্রার ভাব এয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ প্রশ্নটা তেড়ে উঠে মনের মধ্যে এমনি গুঁতো মারলে—

জগাই। ওর একটা কবিরেজী ওষুধ আছে খুব ভালো—আয়াপানের শেকড় না বেটে- -

হরেকানন্দ। দেখ্ বড় যে বেশি ওপর চালাকি কচ্ছিস, এক কথায় সব কটার মুখ বন্ধ করে দিতে পারি—জানিস। পরশু রাত্তিরে গুরুজি নিজে আমায় ডেকে নিয়ে যে-সব ভেতরকার কথা বলেছেন, জানিস।

বেহারী। হ্যাঁরে পটলা, সত্যি নাকি।

পটলা। কিসের ? সব মিছে কথা।

বেহারী। এমন মিথ্যে কথা বলতে পারে এই হরেটা—ছিঃ ছিঃ রাম-রাম—

বেহারীর সংগীত

রাম কহ—ইয়ে রাম কহ
বলবেন না আর মশাই গো, মানুষ নয় সব কষাই গো
তলে তলে যত শয়তানী—(রাম কহ)
এই কিরে তোদের ভদ্রতা ঘ্যান-ঘ্যান ক্যাঁচ-ক্যাঁচ সর্বদা
ডুবে-ডুবে জল খাও সব জানি (রাম কহ)

হরেকানন্দ। প্রশ্ন যখন এয়েছে, জবাব তার একটা আসবেই আসবে- -তা তোমাদের ধমকানি আর চোখরাঙানি, হাসি-ঠাট্টা আর এয়াকি, এ-সব বেশিদিন টিকছে না।

বিশ্বম্ভর। হ্যাঁ হে, তর্কটা কিসের একবার শুনতে পাই কি ? কিই বা প্রশ্ন হল আর তা নিয়ে মামলাটাই বা কিসের ? আচ্ছা, হরিচরণ কি বল ?

হরেকানন্দ। হরিচরণ। দেখলি আমায় হরিচরণ বলছে, 'হরিচরণ' কি মশাই ?

বিশ্বম্ভর। তবে, ওরা যে 'হরে'-'হরে' বলছিল।—

হরেকানন্দ। হরে বললেই হরিচরণ। 'ক' বললেই কার্তিকচন্দ্র।

জগাই। ওঁর নাম শ্রীহরেকানন্দ—

বিশ্বম্ভর। হরে কাননগু—

হরেকানন্দ। আরে খেলে যা। তুমি কোথাকার মুখ্যু হে।

বিশ্বম্ভর। আজ্ঞে, ফরেশডাঙার—আপনি ?

হরেকানন্দ। দেখ, এই-যে ছ্যাবলামি আর ডোণ্ট কেয়ার এ-সব ভালো নয়। কাউকে যদি নাই মানবে, তবে বাপু ইদিকে এসো-টেসো না।

হরেকানন্দের মৌনাবলম্বন—সাড়ম্বর

বেহারী। (জনান্তিকে) দেখ্ পটলা—সেদিন রাত্তিরে একটা স্বপ্ন দেখেছিলুম—কদিন থেকে গুরুজিকে বলব-বলব ভাবছি কিন্তু ঐ হরেটার জন্যে বলা হচ্ছে না। দেখলি না,

সেদিন ঐ ফকিরের গল্পটা বলতেই কি রকম হেসে উঠল—গল্পটা জমতেই দিল না।

বিশ্বম্ভর। হ্যাঁ, হ্যাঁ? ফকিরের স্বপ্নটা কি হয়েছিল।

বেহারী। আ মোলো যা! মশাই, আমরা-আমরা কথা কইছি—আপনি মধ্যে থেকে অমন ধারা করছেন কেন।

বিশ্বম্ভর। ও বাবা! এও দেখি ফোঁস করে! মশাই, আমার ঘাট হয়েছে—আপনাদের কথা আপনারা বলুন—আমার ও-সব শুনে-টুনে দরকার নেই—

[বিশ্বম্ভরের সংগীত]

শুনতে পারি নে রে শোনা হবে না
এসব কথা শুনলে তোদের লাগবে মনে ধাঁধা
কেউ বা বুঝে পুরোপুরি কেউ বা বুঝে আধা।
(কেউ বা বুঝে না)
কারে বা কই কিসের কথা, কই যে দফে-দফে
গাছের পরে কাঁঠাল দেখে তেল মেখো না গোঁফে
(কাঁঠাল পাবে না)
একটি-একটি কথায় যেন সদ্য দাগে কামান
মন বসনের ময়লা ধুতে তত্ত্ব কথাই সাবান
(সাবান পাবে না)
বেশ বলেছ ঢের বলেছ ঐখেনে দাও দাঁড়ি
হাটের মাঝে ভাঙবে কেন বিদ্যে-বোঝাই হাঁড়ি
(হাঁড়ি ভাঙবে না)

বেহারী। আহা, রাগ করেন কেন মশাই। আমি স্বপ্ন দেখছি বৈ তো নয়—আর সে স্বপ্নও এমন কিছু নয়। আমি দেখলুম, একটা অন্ধকার গর্তের মধ্যে এক সন্নিসি বসে-বসে ঘড়-ঘড় করে নাক ডাকছে!

বিশ্বম্ভর। বলেন কি মশাই? তারপর?

বিহারী। ব্যস্! তারপর আর কি? সে নাক ডাকছে তো ডাকছেই!

বিশ্বম্ভর। কি আশ্চর্য! আপনার গুরুজিকে জিগগেস করবেন তো—

পটলা। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওটা চেপে গেলে চলবে না দাদা—ওটা বলতে হবে। দেখিস, তখন হরেটার মুখ একেবারে দিস্ কাইণ্ড অভ স্মল হয়ে যাবে—

বিশ্বম্ভর। হ্যাঁ বুঝলেন, বেশ একটু রঙ-চঙ নিয়ে বলবেন।

বেহারী। আ মোলো যা! আমার স্বপ্ন আমার, যেমন ইচ্ছা তেমন করে বলব।

গুরুজির শুভাগমন। হরেকানন্দ ও বেহারীলালের যুগপৎ কথা বলিবার চেষ্টা

হরেকানন্দ। একটা প্রশ্ন এই কদিন থেকে—

বেহারী। সিদিন একটা স্বপ্ন দেখলুম—

হরেকানন্দ। তার জন্যে দুদিন ধরে আর সোয়াস্তি নেই—

বেহারী। একটু নিরিবিলি যে জিগগেস করব তার তো জো নেই—

হরেকানন্দ। তাই জগাইকে আমি বলছিলুম—

বেহারী। পটলা জানে আর এই ভদ্রলোকটি সাক্ষী আছেন—

হরেকানন্দ। আঃ—কথা বলতে দাও না—

বেহারী। কেন ওরকম করছ বল দেখি।

গুরুজি। এত গোলমাল কিসের।

বেহারী। আজ্ঞে, হরে বড় গোলমাল করছে—

হরেকানন্দ। বিলক্ষণ! দেখলেন মশাই—

বেহারী। হয়েছে কি আমি একটা স্বপ্ন দেখছিলুম—

বিশ্বম্ভর। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী আছি।

বেহারী। আমি স্বপ্ন দেখলুম, অমাবস্যার রাত্তিরে একটা অন্ধকার গর্তের মধ্যে ঢুকে আর বেরুবার পথ পাচ্ছিনে। ঘুরতে-ঘুরতে এক জায়গায় দেখি এক সন্নেসি—

পটলা। তার মাথায় ইয়া বড় জটা—

বিশ্বম্ভর। তার গায়ে মাথায় ভস্মমাখা—তার ওপর রক্ত-চন্দনের ছিটে—

বেহারী। (স্বগত) কি আপদ! স্বপ্ন দেখলুম আমি আর রঙ ফলাচ্ছেন ওঁরা!—সন্নেসিকে খাতির-টাতির করে পথ জিগগেস করলুম—বললে বিশ্বেস করবেন না মশাই, সে কথার জবাবই দিলে না। বসে ঘড়ঘড়, ঘড়ঘড় করে নাকই ডাকছে, নাকই ডাকছে।

পটলা। সে নাক ডাকানি এক অদ্ভুত ব্যাপার—নাক ডাকতে-ডাকতে সারে গামা পাধা নিসা...করে সুর খেলাচ্ছে।

বিশ্বম্ভর। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক বলেছ! আর সাতটে সুরের সঙ্গে রামধনুর সাতটে রঙ একবার ইদিক আসছে, একবার উদিকে যাচ্ছে।

বেহারী। সুরের সঙ্গে রঙের সঙ্গে না মিশে দেখতে-দেখতে দেখতে-দেখতে চারিদিক সব ফরসা হয়ে উঠল—আমি তো অবাক হয়ে হাঁ করে রইলুম!

বিশ্বম্ভর। যে বলে এটা বাজে স্বপ্ন, সে নাস্তিক।

গুরুজি। অতি সুন্দর, অতি সুন্দর! একেবারে ভেতরকার প্রশ্নে এসে ঠেকেছে—এতদিন বলব-বলব করেও যে কথা বলা হয়নি, সেই কথার মূলে এসে ঘা দিয়েছ। বৎস হরেকানন্দ, তুমি স্বপ্নে যা দেখেছ, তা যথার্থই বটে।

বেহারী। ও তো স্বপ্ন দেখেনি—আমি দেখেছিলুম—

পটলা। হ্যাঁ—ওরা তো দেখেনি আমরা দেখেছিলুম—

হরেকানন্দ। আমি তো এই বিষয়ই প্রশ্ন করব ভেবেছিলুম কিনা। ঐ যে ভেতরকার প্রশ্ন যেটা বলে-বলেও বলা হচ্ছে না, আমার প্রশ্নই হচ্ছে তাই।

গুরুজি। হ্যাঁ। তোমরা স্বপ্নে যা দেখেছ তা যথার্থই বটে। শব্দই আলোক। শব্দই বিশ্ব—শব্দই সৃষ্টি শব্দই সব। আর দেখ, সৃষ্টির আদিতে এক অনাহত শব্দ ছিল, আর কিছুই ছিল না। দেখ, প্রলয়ের শেষে যখন আর কিছু থাকবে না—তখনো শব্দ থাকবে। এই যে শব্দ, এ সেই শব্দ। যাদবচন্দ্র দিবাকর, যে শব্দের আর অন্ত নেই, মানুষ ঘাটে-ঘাটে ধাপে-ধাপে যগের পর যুগ প্রশ্ন করতে করতে যার কিনারা পায়নি—সেই শব্দের তুমি নাগাল পেয়েছ। একে বলে অন্তর্দৃষ্টি। দেখ শব্দকে তোমরা তাচ্ছিল্য কোরো না—এই শব্দকে চিনতে পারেনি বলেই, এই আমি আসবার আগে, যে যা কিছু করতে চেয়েছে সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। এই কথাটুকু বলবার জন্যই আমি এতদিন দেহ ধারণ করে রয়েছি।

বিশ্বম্ভর। হ্যাঁ-হ্যা, ঠিক বলেছেন। আমার মনের কথাটা টেনে বলেছেন। এ সংসার মায়াময়—সবই অনিত্য—দারা-পুত্র-পরিবার তুমি কার কে তোমার। সব দুদিন আছে দুদিন নেই। বুঝলেন কিনা? আমি ছেলেবেলায় একটা পদ্য লিখেছিলুম, শুনবেন? কি না?

[বিশ্বম্ভরের আবৃত্তি]

ভব পান্থ বাসে এসে কেঁদে-কেঁদে হেসে-হেসে
ভুগে-ভুগে কেশে-কেশে, দেশে-দেশে ভেসে-ভেসে
কাছে এসে ঘেঁষে-ঘেঁষে এত ভালো বেসে-বেসে
টাকা মেরে পালালি শেষে।

গুরুজি। বেদ বল, পুরাণ বল স্মৃতি বল, শাস্ত্র বল, এ সব কি? কতগুলো বাক্য, অর্থাৎ কতকগুলো শব্দ—এই তো? এই যেসব শঙ্খ-ঘণ্টা, মন্ত্রতন্ত্র হ্রীং-ক্লীং ঝাড়-ফুঁক নাম-জপ এসব কি? একি শব্দ নয়? সৃষ্টির গোড়াতে প্রাণ কারণ, আকাশ সব মিলে যখন হব-হব কচ্ছিল, তখন যদি 'ওম' শব্দ করে প্রণব ধ্বনি না হত, তবে কি সৃষ্টি হতে পারত? শব্দে সৃষ্টি, শব্দে স্থিতি, শব্দে প্রলয়। বেশি কথায় কাজ কি? বিষ্ণুর হাতে শঙ্খ কেন? শিবের মুখে বিষাণ কেন? হাতে তার ডমরু কেন? নারদ যখন স্বর্গে যায়, চলতে-চলতে বীণা বাজায় কেন? এসব কি শব্দ নয়? আর অনাদিকাল হতে যে অনাহত শব্দ যোগীদের ধ্যান-কর্ণে ধ্বনিত হয়ে আসছে সে কি শব্দ নয়? তার সেই কালিন্দীর কূলে যমুনার তীরে শ্যামের যে বাশরী বেজেছিল, সেও কি শব্দ নয়? এমনি করে ভেবে দেখ, যা ভাববে তাই শব্দ—শাস্ত্রে বলেছে 'শব্দ ব্রহ্ম'—

বিশ্বম্ভর। আমাদের মতিলাল সেবার ভুঁই পটকা বানিয়ে-ছিল, উঃ—তার যে শব্দ! আমি ও বিষয়ে একটা কবিতা লিখেছি শুনবেন?

হরেকানন্দ। দেখ গুরুজির সামনে এরকম বেয়াদবি, এট-কি ভালো হচ্ছে?

বিশ্বম্ভর। ভালো রে ভালো! ইনি বলছেন স্বপ্নের কথা—উনি তাঁর প্রশ্ন হাকছেন, এ-ও ফোড়ন দিচ্ছে—ও-ও ফোড়ন দিচ্ছে—আর আমি কথা কইলেই যত দোষ?

বেহারী। আহা, গুরুজি আছেন যে, তাঁকে ডিঙিয়ে কথা বলবে?

বিশ্বম্ভর। গুরুজির ন্যাজ ধরে-ধরেই যে ঘুরতে হবে তার মানে কি?

জগাই। ন্যাজ বলেছে। গুরুজির ন্যাজ বলেছে।

পটলা। তুই থাম না, তোর ন্যাজ তো বলেনি—

গুরুজি। ওরে হতভাগা, শব্দ নিয়ে তোরা ছেলেখেলা করিস-শব্দ যে কি জিনিস আজও তোরা বুঝলিনে। কিন্তু এখন বুঝবার সময় হয়েছে। এই নাও আমার শব্দসংহিতা—এইটে এখন পড়ে নাও। ওর মধ্যে আমি দেখিয়েছি এই যে—এক-একটি শব্দ এক-একটি চক্র, কেননা শব্দ তার নিজের অর্থের মধ্যে আবদ্ধ থেকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। তাই কথা বলা হয়েছে অর্থই শব্দের বন্ধন। এই অর্থের বন্ধনটিকে ভেঙে চক্রের মুখ যদি খুলে দাও, তবেই সে মুক্তগতি স্পাইরাল মোশান হয়ে কুণ্ডলীক্রমে উর্ধ্বমুখে উঠতে থাকে। অর্থের চাপ তখন থাকে না কিনা। যে সঙ্কেত জানে সে ঐ কুণ্ডলীর সাহায্যে করতে না পারে এমন কাজই নেই। তাই বলছি তোমরা প্রস্তুত হও—অমাবস্যার অন্ধকার রাত্তিরে সেই সঙ্কেত মন্ত্র দিয়ে তোমাদের দেখাব শব্দের কি শক্তি! রাতারাতি স্বর্গ বরাবর পৌঁছে দেবে। পথ-পথ করে সব ঘুরে বেড়ায়—কিন্তু শব্দ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই।

[শিষ্যগণের উল্লাস গদগদভাব]

[গান—ধূম কীর্তন]

তাই ফিরি তুমি আমি ধাঁধায় দিবস যামী
তাই ফিরে মহাজন পথে-পথে অনুখন
অন্ধ আঁধারে মরে নামি।
নিজ বেগে নিজ তালে শব্দ ফিরে দেশে কালে
আপনি পথিক পথ চালায় আপন রথ
ভুবন ঘেরিল পথ জালে।
প্রাণে-প্রাণে এঁকে বেঁকে পথ যায় হেঁকে-হেঁকে
আপনি পথিক পথ চালায় আপন রথ
সেই পথে চল আগে থেকে॥

গুরুজি। পূর্বে-পূর্বে ঋষিরা এই শব্দমার্গকে ধরে-ধরেও ধরতে পারেনি। কেন? ঐ যে সন্নেসি অমাবস্যার অন্ধকার রাত্তিরে ঘড়ঘড় করে নাক ডাকছিল, কেন ডাকছিল? শব্দমার্গের সন্ধান পেয়েছে কিন্তু তার সঙ্কেতটুকু ধরতে পারেনি। ওরা যে ধরেছে সে সব শব্দের অর্থ নেই এবং ছিল না—চোঁড়া শব্দ। তা করলে তো চলবে না। জ্যান্ত-জ্যান্ত শব্দ, যাদের চলৎশক্তি চাপা রয়েছে, ধরে-ধরে মটমট করে তাদের বিষদাঁত ভাঙতে হবে। অর্থের বিষ জমে-জমেউঠতে থাকবে—আর ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচ করে তাকে কেটে ফেলবে। এইজন্যে তোমাদের ঐ শব্দসংহিতাখানা পড়ে রাখতে বলছি।

গুরুজির প্রস্থান। শিষ্যগণের 'শব্দসংহিতা' পাঠ

শ্রীশ্রীগুরু প্রসাদগুণে তত্ত্বদৃষ্টি লভি
জগৎখানা ঠেকছে যেন শব্দে আঁকা ছবি
শব্দ পিছে শব্দ জুড়ি চক্রে গাঁথি মায়া
বাক্য ফিরে ছদ্মদেহে বিশ্ব তারি ছায়া
চক্রমুখে মন্ত্র ঠুকে বাঁধন কর ঢিলা
শব্দ দিয়ে শব্দ কাটো, এই তো শব্দলীলা,
যাঁহা স্বর্গ তাঁহা মর্ত্য তাঁহা পাতালপুরী
সত্য মিথ্যা একই মতি খেলছে লুকোচুরি!
ভালো মন্দ বিষম ধন্দ্ব কিছু না যায় বোঝা
সহজ কথায় মোচড় দিয়ে বাঁকিয়ে করে সোজা।
ভক্ত বলেন 'আদ্যিকালের শাদার নামই কালো
আঁধার ঘন জমাট হলে তারেই বলে আলো।'
শাস্ত্রে বলে 'সৃষ্টি মূলে শব্দ ছিল আদি'
জগৎ স্রোতে জড়ের বাঁধন শব্দে রাখে বাঁধি।
বস্তুতত্ত্ব বদ্ধ মায়া সদ্য পরিহরি
শব্দ চক্রে ঘোরে বিশ্ব সূক্ষ্ম দেহ ধরি।
শব্দ ব্রহ্মা, শব্দ বিষ্ণু, শব্দ সরস্বতী
বিশ্বযন্ত্র ধ্বংস শেষে শব্দে মাত্র গতি॥

দ্বিতীয় দৃশ্য। স্বর্গ কাণ্ড

গুরুজি। ঘনায়েছে কলিকাল ঘেরিয়া আঁধার জাল
পাতিয়ে প্রলয় ফাঁদ কাল রাহু ধরে চাঁদ।
ওই শোনো অতি দূরে সুদূর অসুর পুরে
ভেদিয়া পাতাল তল ওই ওঠে কোলাহল:
ওই রে আঁধার ফুঁড়ি ওই আসে গুড়ি-গুড়ি
ঐ এল লাখে লাখ দলে-দলে ঝাঁকে-ঝাঁক॥

গান

সকলে। ওরে ভাই তোরে তাই কানে-কানে কইরে
ঐ আসে ঐ আসে ঐ-ঐ-রে
নিঝুম রাতে ফিসফাস, বাতাস ফেলে নিঃশ্বাস
স্বপ্নে যেন খোঁজে কারে কৈ-কৈ-কৈ-রে।
আঁধার চলে চলাচল স্তব্ধ দেহ রক্ত জল
শব্দ নাচে হাড়ে-হাড়ে হৈ-হৈ-হৈ-রে।
পাণ্ডু ছায়া অন্ধ হিম শূন্যে করে ঝিমঝিম
ঐরে গেল গা ঘেঁষে আর তো আমি নই রে।
মর্মকথা বলি শোন্ লাগল প্রাণে 'কলিশন্',
প্রাণপণে হেঁকে বল মাভৈ-ভৈ-রে॥

গুরুজি।
দেবতা সবে গাত্র তোলো স্বপ্নলীলা সাঙ্গ হল
দেখ্ রে জেগে কাণ্ডটা কি সৃষ্টি বাঁধন ভাঙল নাকি?

ঈশান কোণে মেঘের পরে শব্দ তরল রক্ত ঝরে
পাণ্ডু বরণ দখিনে বামে অন্ধ আঁধার শব্দ নামে।
প্রলয় বাদল রক্ত রাঙা পাগল জেগেছে আগল ভাঙা
উল্কা ঝলকে বিজলী ছোটে গহন শূন্য শিহরি ওঠে।
তুহিন তিমির ধরণী গায় সভয় পবন থমকি চায়
হরষে পিশাচী পিশাচে কয় রক্ত মড়ক জগৎময়॥
হে অলক্ষ্মী একি খেলা অনাহূত হেন বেলা
নৃত্য তোমার এমনি ধারা সৃষ্টিছাড়া ছন্দোহারা!
অনাদৃতে হুহঙ্কময়ী খেয়াল তব সর্বজয়ী—
কহ আজি কেন স্কন্ধে, চাপিলে নাছোড়বন্দে।
কেন ঠাট্টা সর্বনাশী, কেন অট্ট আঁধার হাসি,
কেন আজি ঘুমটি ভাঙাও অকারণে চক্ষু রাঙাও?

গান

কেন-কেন কেনরে কেন-কেন?
চেঁচিয়ে কাঁচা ঘুম ভাঙ কেন?
পটকা শব্দ অট্ট রোল, শঙ্খ ঘণ্টা ঢক্ক ঢোল
স্বর্গপুরী হদ্দ হইল বাদ্যভাণ্ড হট্টগোল।
দেবতা বিলকুল কান্দে গো তল্পিতল্পা বান্ধে গো
পাগলা রাহু একলা তেড়ে গিলতে চাহে চান্দে গো।
আগডুম বাগডুম শব্দ ছায় চিত্ত গুড়গুড় দপদপায়
দন্ত কড়কড়, হাড্ডি মড়মড়, প্রাণটা ধড়ফড় সর্বদাই॥

গুরুজি। কাকস্য পরিবেদনা বৎসগণ আর কেঁদ না,
গতস্য শোচনা নাস্তি যথা কর্ম তথা শাস্তি;
মিথ্যা এত কান্না কেন অলমতি বিস্তারেণ?
অত্র এখন দেবতা সভায় ঠাণ্ডা হয়ে বসেছে সবাই
তোমরা একটু ক্ষান্ত হও শান্ত হয়ে মন্ত্র কও॥

বৃহস্পতির স্তোত্রপাঠ

এ ভব সঙ্কট অর্ণব মন্থনে মাকুর সংহার
মাকুর সংহার মাকুর সংহার মাকুর হে
হে গুরু গীস্পতি অষ্টম দিকপতি
হে গুরু রক্ষ হে গুরু রক্ষ হে গুরু হে॥

বৃহস্পতির আবির্ভাব

বৃহস্পতি।
মাকুর কোলাহল ভো ভো শিষ্য হে
দরজাটুকু ছেড়ে বস আজকে বড় গ্রীষ্ম হে,
আসনটাকে নাড়িও না বস না কেউ সোফাতে।
তোমার গায়ে গন্ধ বড় সরে দাঁড়াও তফাতে।
কি বলছিলে বলে ফেল নেইকো আমার চাকর-বাকর
সময় কেন নষ্ট কর করে মেলা বকর-বকর?
কারুর বাড়ি যোগ্যি নাকি বংশ প্রথা চিরন্তন?
তোমার বুঝি ছেলের ভাতে ফলার ভোজে নিমন্ত্রণ?
তোমার বুঝি মেয়ের বিয়ে—আটকে ছিল অনেক দিন?
যা হোক এবার উতরে গেল রয়ে সয়ে বছর তিন॥

তোমার বাড়ি শ্রাদ্ধ নাকি ? ঘরজামাইটি গেছেন মরে
বেজায় বুঝি ভুগেছিল ডেঙ্গু জ্বরে বছর ভরে ?

সকলে।

বিপদকালে হ্যাপস্থিতে ঠাকুর মোদের যুক্তি দাও
ঐ চরণের শরণ নেব মরণ হতে মুক্তি দাও ॥

বৃহস্পতি।

মরবে যে তা আগেই জানি—যেমনতর অনাসৃষ্টি
ইন্দ্র তোমার এ সব দিকে একেবারেই নেইকো দৃষ্টি !
কাজে কর্মে নেইকো ছিরি কচ্ছে সবাই যাচ্ছেতাই
অমৃত সে ভেজাল গোলা দেবতাগুলো খাচ্ছে তাই।
মড়ক সে তো হবেই এতে সর্দিগর্মি বেরিবেরি
একে-একে মরবে সবাই আর বেশি দিন নেইকো দেরি।
হাজার কর ডিসিনফেক্টো, হাজার কেন ওষুধ গেলো—
যাহোক তোমরা যে-যার মতো উইল-পত্র লিখে ফেলো ॥
দেবতা লীলা সাঙ্গ যদি নেহাত যাবে জাহান্নমে
যার যা কিছু দেবার থাকে দাও না লিখে আমার নামে।

বীণা হস্তে নারদের প্রবেশ ও গান

ও বীণা তুই দেখবি মজা বাদ্যি বাজা (তারে না তা না)
হেন সুযোগ মাগ্যি বড় ও বীণা তোর ভাগ্যি বড়
এত মজা আর পাবি না পাগলা বীণা (তারে না তা না)
নাচি আমি সঙ্গে তোরই, বাহু তুলে রঙ্গ করি
তোরে বাজাই আপনি বাজি নাচিয়ে নাচি (তারে না তা না)
লাঠালাঠি রক্ত মাটি দেখে লাগে দাঁত কপাটি
ও বীণা তুই থাকবি তফাত লাগবে হঠাৎ (তারে না তা না)

বৃহস্পতি।

কি গো ঠাকুর অলুক্ষুণে—ঝাড়তে এলে পায়ের ধুলো ?
দেখছি এবার হ্যাপায় পড়ে মরবে তবে দেবতাগুলো।

নারদ।

নাকে ছিপি কানে তুলো ভায়া বড় বিজ্ঞ যে
ডিঙোতে চাও টপাটুপ আমা হেন দিগ্‌গজে।

ইন্দ্র ও অশ্বিনীর প্রবেশ

ইন্দ্র।

শব্দ শুনে দৌড়ে এলাম যুদ্ধু-টুদ্ধু লাগল কি ?
দৈত্য দেখে ভীষণ ভয়ে দেবতারা সব ভাগল কি ?

বৃহস্পতি।

ওঁর কথা কেউ শুনো নাকো ঠাকুর বড় রগচটা
তাই তো ইন্দ্র তোমার হাতে দেখছি না যে বজ্রটা !

ইন্দ্র।

বজ্র সে কি হেথায় আছে, গিয়েছে সে কোন চুলোয়
তার বেঁধে তায় কাজে লাগায় মর্ত্যলোকের লোকগুলোয়।

নারদ।

তোমাদের খুব স্নেহ করি, কাজ কি বলে সবিস্তার
এমনি উপায় বাতলে দেব একেবারে পরিষ্কার ॥

বৃহস্পতি।

একটা উপায় আছে বটে—তোমায় সেটা খুলে জানাই
হাড় কখানা দাও না মোদের নতুন করে বজ্র বানাই !
তোমার হাড়ে বজ্র গড়ে পিটলে পরে দমাদম
একটি ঘায়ে মরবে না যে সেই ব্যাটারাই নরাধম।
শুষ্ক হাড়ে ঘুণ ধরেছে, সূক্ষ্মতর শক্তি তায়
জ্বলবে ভালো হাড্ডি তোমার কাজ কি বল বক্তৃতায় ॥

নারদ।

হোঁৎকামুখো গণ্ডে গোদ আমার উপর টিপ্পুনী
আমায় তুমি মরতে বল ? মরবে তুমি এক্ষুণি !
আমার ওপর চক্ষ ঠারো ? আমায় বল কুন্দুলে
মুখে মাখ জুতোর কালি—গালে লাগাও চুন গুলে।

কার্তিকের প্রবেশ

কার্তিক।

আমায় সবাই মাপ করো ভাই, হয়ে গেল আসতে দেরি
হিসেব-মতো পছন্দসই হচ্ছিল না চোস্ত টেরি !
গোঁফ জোড়াটা মেপে দেখি ডাইনে একটু গেছে উঠে
লাগল দেরি সামলে নিতে টেনেটুনে ছেঁটেছুঁটে।
চাকর ব্যাটা খেয়ালশূন্য কাজে কর্মে ঢিলে দিয়ে
শেষ মুহূর্তে কাপড়খানা কুঁচিয়ে দিল গিলে দিয়ে ॥

নারদ।

তুমিই এখন ভরসা এদের তুমিই এদের কর্ণধার
তুমিই এদের ত্রাণ কর ভাই নইলে সবই অন্ধকার !
বলছি এদের বারে-বারে নেই রে উপায় যুদ্ধ বই
তোমরা সবাই হটলে এখন কোথায় আমি মুখ লুকাই ?

কার্তিক।

লড়াই করে মরতে যাব আর তো আমার সেদিন নয়
কারে তুমি হুকুম কর শর্মা কারো অধীন নয় !
যে কয়জনা যুদ্ধে যাবেন ফিরবে না তার অর্ধেকও
তল্পিতল্পা বাঁধ রে ভাই থাকতে সময় পথ দেখ।

১। আমি বলি ঢের হয়েছে শান্তি বাদ্য পিটিয়ে দাও
হাঙ্গামাতে কাজ কি বাপু আপোস করে মিটিয়ে নাও।

২। শাস্ত্রে বলে শোনরে চাচা আপনা বাঁচা আগে ভাগে—
পিট্টি খেয়ে মরবি কেন থাকলে দেহ কাজে লাগে।

৩। কিসের দাদা স্বর্গভূমি কিসের পুরী পাঁচতলা
দৈত্য যখন ধরবে ঠেসে করবে তুমি কাঁচকলা।

৪। ত্যাগ কর ভাই মিথ্যে মায়া ত্যাগ কর এ স্বর্গধাম
আর তো সবই ছাড়তে পার প্রাণটুকুরই বড্ড দাম।

নারদ।

কিসের এত ভাবনা তোদের মিথ্যে এত কিসের ডর
যুক্তি করে দেখ্ না ভেবে ঠাণ্ডা হয়ে হিসেব কর।
না হয় দুটো খসবে মাথা না হয় দুটো ভাঙত ঠ্যাং
তাই বলে কি ঢুকবি ভয়ে কুয়োর মধ্যে জ্যান্ত ব্যাঙ।

আমরা যদি দেবতা হতুম দৈত্য দেখলে ক্যাঁক করে
ঘাড়টি ধরে পিট্টি দিতুম হাড্ডি মাসে এক করে ॥

ইন্দ্র।

অস্ত্রগুলো মর্চে-পড়া অনেক কালের অনভ্যাস
এমন হলে লড়বে নাকো স্বয়ং বলেন বেদব্যাস।

নারদ।

বিষ্টু বল আত্মা পাখি। এমন দিনও ঘটল শেষে
দৈত্য বেড়ায় বুক ফুলিয়ে দেবতা পালায় ছদ্মবেশে।
আসছি ধেয়ে ব্যস্ত হয়ে পয়সা-কড়ি খরচ করে
করলে না কেউ খাতির আমায় ডাকলে না কেউ গরজ করে।
তোমরা সবাই ডুবে মরো ইন্দ্র তোমার গলায় দড়ি
কার্তিকেয় মরবে তুমি ঐরাবতের তলায় পড়ি।
মরব এবার দেহত্যাগে এ-ভাবে আর থাকছিনে কো
ঐখেনেতেই মূর্ছা যাব তোমরা সবাই সাক্ষী থেক।

শয়ন ও মূর্ছা

বৃহস্পতি।

ব্রহ্মহত্যা আমার ঘরে ও ঠাকুর তোর পায়ে পড়ি
মরতে চাও তো বাইরে মর আমরা কেন দায়ে পড়ি ?
অশ্বিনী গো বদ্যিমশাই দাঁড়িয়ে কেন চুপটি করে
ঠাকুর হোথা তুলছে পটল বাঁচাও তারে যুক্তি করে ॥

অশ্বিনী-কর্তৃক রোগ পরীক্ষাদি

অশ্বিনী।

বদ্যি রাজা ধন্বন্তরি শিষ্য হয়ে স্মরণ করি
তোমার নামে মন্ত্র পড়ি হাতে নিলাম জ্যান্ত বড়ি
প্রেত পিশাচ শুদ্ধি হোক যেই খাবে তার বুদ্ধি হোক
রুক্ষ্ট বায়ু ক্ষান্ত হও মরা মানুষ জ্যান্ত হও
মুক্ত হবে পিত্ত দোষ নিত্য রবে চিত্ত তোষ
লুপ্ত নাড়ি শক্ত বেশ উঠবে কোঁকড়া পক্ব কেশ।
ঘুচবে পিলে ছুটবে বাত ফোকলা মুখে উঠবে দাঁত।
রাত্রি দিনে ফুর্তি রবে কার্তিকেরি মূর্তি হবে ॥
কিন্তু যারা মিথ্যা কয় নাইকো যাদের চিত্তে ভয়
মিথ্যা রোগের নিত্য ভান ওষুধ তাদের মৃত্যুবাণ।
রোগ যেথা নয় সত্যিকার তোর পরে নাই ভক্তি যার
জ্যান্ত বড়ি বিষ বড়ি কণ্ঠে তাদের দিস দড়ি
নরকো যে জন শান্ত রকম হয় যেন সে জ্যান্ত জখম—
নিত্য কোঁদল বন্ধ রবে চক্ষু দুটি অন্ধ হবে,
জ্বলবে গরল তিক্ত ধারা নাচবে রোগী ক্ষিপ্ত পারা
গণ্ডে ফোড়া তুণ্ডে বাত ভণ্ডজনের মুণ্ড পাত।
ও বড়ি তুই নিদান কর বিচার বুঝে বিধান কর
কপট রোগী খবরদার ওষুধ আমার সমঝদার।

নারদের গাত্রোত্থান

নারদ।

গা-ঝিমঝিম মাথা ঘোরা একেবারে কেটে গেল
মূর্ছা আমার আপনি সারে ওষুধটা কেউ চেটে ফেল।

হায় রে হায় কলির ফেরে দেবতা গুরু ভোগ না পায়
যার লাগি লোক চুরি করে চোর বলে সে চোখ পাকায়।
তোদের ভেবেই শরীর মাটি রাত্রে আমার ঘুমটি নেই
তোদের ছেড়ে জগৎ যেন ব্যঞ্জনেতে নুনটি নেই।
তোদের তরেই মূর্ছা গেলাম. তোদের তরেই প্রাণটি ধরি
তোরাই আমার মাথার মানিক তোরাই আমার কলসী দড়ি।
এই কি তোদের দেবতাগিরি এই কি সাহস জ্বলন্ত।
দুয়ো দেবতা দুয়ো ইন্দ্র দেবতা কুলের কলঙ্ক।

গান

বীণা রে এই কি রে তোর সেই সনাতন দেবতা এরা

বৃহস্পতি।

রাখ তোমার বকর বকর ভগ্ন ঢেঁকির কচকচি
মিথ্যে তুমি পেচাল পাড় বাক্য ঝাড় দশগজি
ঐদিকে যে বিশ্ব ডোবে বাণ ডেকেছে সৃষ্টিতে
লুটিয়ে গেল চুকিয়ে গেল শব্দ বাণের বৃষ্টিতে।
অর্থ হারা শব্দ ফেরে স্থাবর হতে জঙ্গমে
বিশ্বব্যাপার উধাও হল শব্দ সাগর সঙ্গমে
ঘূর্ণি পাকের ছন্দ জাগে গুপ্তগভীর গর্জনে
মুক্ত কৃপাণ শক্তি মাতে অর্থ মহিষ মর্দনে।
আদ্যিকালের বাদ্যি বাজে স্বর্গ-মর্ত্য ফক্কিকার
ধাক্কা লাগে গোলকধামে রোধ করে তায় শক্তি কার ॥
শব্দ ধারার বর্ষা যেন কৃষ্ণ ভাদ্র অষ্টমী
শীঘ্র দেখ ছিদ্র খুঁজে কার এ সকল নষ্টামী ॥

গুরুজি।

ওরে বাস্ রে! এমনি ব্যাপার ? আর কি আছে রক্ষে ?
আরেক টুকুন সবুর কর দেখবে ধোঁয়া চক্ষে
মন্ত্র নাচে ছন্দ নাচে শব্দ নাচে রঙ্গে
বুকের শব্দ শোষণ করে রক্ত ধারার সঙ্গে
দেখবে ক্রমে শব্দ জমে হাত-পা হবে ঠাণ্ডা
শক্ত কঠিন শব্দ দিয়ে মারবে মাথায় ডাণ্ডা—
অর্থ বাঁধন হুড়কো ভেঙে শব্দ এল পশ্চিমে
যার খুশি হয় বসে থাক আমরা দাদা বসছিনে ॥

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্বর্গপথে সশিষ্য গুরুজি—বহু পশ্চাতে বিশ্বম্ভর

বিশ্বকর্মা।

আদিকাল হতে বিশ্ব ফিরে মহাচক্র পথে,
চক্রে চলে জলস্থল, চক্রে ঘোরে ভূমণ্ডল
সেই চক্রে চির গণ্ডি ঘেরা শব্দ করে চলা ফেরা।
মহাকাল ফিরে শূন্যে বস্তুরূপ মাগি, স্পর্শ তার শব্দ ওঠে জাগি

অর্থ তার চক্র পথে টানি ঘোরায় আপন ঘানি—
বাক্-অর্থ দোঁহে যুক্ত নিত্য বসবাস ইতি কালিদাস ॥
আজ কেন রুদ্ধ পথ খুলে মন্ত্রাঘাত করি শব্দ মূলে
ছিন্ন করে শব্দের বাঁধন—অসাধ্য সাধন।
কাল চক্র ব্যূহ ভেদ করি ঊর্ধ্বগতি কুণ্ডলীর মুক্ত পথ ধরি
জাগে ঐ নিদ্রিত অশনি— হাহাকার ক্রন্দনের ধ্বনি!
অন্ধকার রাতে অঙ্গহীন শব্দের পশ্চাতে
কার তপ্ত নিশ্বাসের রুদ্ধ অভিশাপ জপিছে প্রলাপ?

বিশ্বকর্মার মন্ত্রপাঠ

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং ইটপাটকেল চিত পটাং
গন্ধ গোকুল হিজিবিজি নো এ্যাড্‌মিশন ভেরি বিজি
নন্দী ভৃঙ্গী সারেগামা নেই মামা তাই কানা মামা
মুশকিল আসান উড়ে মালি ধর্মতলা কর্মখালি
চীনে বাদাম সর্দি কাশি বুটিংপেপার বাঘের মাসি।

গুরুজি। দাঁড়াও আমাদের গতি যে ক্রমশ মন্দীভূত হয়ে আসছে সেটা কি তোমরা অনুভব করেছ?

সকলে। আজ্ঞে—ক্রমশই কমে আসছে—

গুরুজি। এর কি কোনো কারণ নির্ণয় করতে পারছ? কেউ কি পশ্চাতে পড়ে থাকছ?

বেহারী। আজ্ঞে, আপনার পরেই এই তো আমি আসছি—

হরেকানন্দ। তার পরেই আমি শ্রীহরেকানন্দ—

জগাই। তার পর আমি জগাই—

পটলা। তার পর আমি—

গুরুজি। তবে এর কারণ কি? শব্দের আকর্ষণটা বেশ অনুভব করছ কি?

পটলা। আজ্ঞে, আমার বাক্য পিছন দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে।

গুরুজি। সর্বনাশ! তবে একবার নির্বিশেষ মন্ত্রটা বেশ করে উচ্চারণ করে শক্তি সঞ্চার করে—তারপর তাকিয়ে দেখ কিছু দেখা যায় কিনা—

সকলে। গৌ গাবৌ গাবঃ—গৌ গাবৌ গাবঃ—গৌ গাবৌ গাবঃ—

বিশ্বম্ভর। ইত্যমরঃ

সকলে। কে শব্দ করে?

পটলা। সেই লোকটা!

সকলে। সর্বনাশ! ও আবার চায় কি?

বিশ্বম্ভর। ঐ যে, তোমরা কোথায় যাচ্ছ সেইখেনে যাব।

গুরুজি। বৎস বিশ্বম্ভর, তুমি আসলেই যদি, তবে এমন পশ্চাতে পড়ে থাকছ কেন?

বিশ্বম্ভর। আজ্ঞে—বেজায় পরিশ্রম লাগছে—

গুরুজি। কেন? তুমি কি সম্যকরূপে মন্ত্রে আরোহণ করতে পার নাই? তুমি কি কোনোরূপ ভার বহন করে আনছ?

বিশ্বম্ভর। আজ্ঞে—এই শরীরটা—

গুরুজি। ও-সব ছেড়ে দাও—কিছুক্ষণ ধুকধুক মন্ত্র জপ কর—ও সব স্থূল সংস্কার কেটে যাবে—

ছাত্রগণের মন্ত্রজপ

বিশ্বম্ভর। আমি ভাবছিলুম—

সকলে। ভাবছিলে? সর্বনাশ!—সর্বনাশ! ভেব না, ভেব না—

গুরুজি। শব্দের ঘাড়ে চিন্তাকে চাপাচ্ছ—? ছিঃ! এমন করে শব্দশক্তি ম্লান কোরো না—আমার পূর্ব-উপদেশ স্মরণ কর—শব্দের সঙ্গে তার অর্থের যে একটা সূক্ষ্ম ভেদাভেদ আছে সাধারণ লোকে সেটা ধরতে পারে না।

বেহারী। তাদের শব্দজ্ঞান উজ্জ্বল হয় নি—

হরেকানন্দ। তারা শব্দের রূপটিকে ধরতে জানে না—

গুরুজি। তারা ধরে তার অর্থকে। তারা শব্দ চক্রের আবর্তের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়। যেমন কর্মবন্ধন, যেমন মোহবন্ধন, যেমন সংসারবন্ধন, তেমনি শব্দবন্ধন।

সকলে। শব্দ বন্ধন পড় না—পড় না—

গুরুজি। শব্দকে যে অর্থ দিয়ে ভোলায়—সে অর্থপিশাচ। শব্দকে আটকাতে গিয়ে সে নিজেই আটকা পড়ে। নিজেকেও ঠকায় শব্দকেও বঞ্চিত করে। সে কেমন জানো? এই মনে কর, তুমি বললে 'পৃথিবী'—তার অর্থ করে দেখ দেখি?—সূর্য নয় চন্দ্র নয় আকাশ নয় পাতাল নয়—সব বাদ—শুধু পৃথিবী। এরা নয় ওরা নয় তারা নয়—এ-সব কি উচিত? আবার যদি বল 'পৃথিবী গোল'—তার সঙ্গে অর্থ জুড়ে দেখ দেখি, কী ভয়ানক সংকীর্ণতা!—পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে তা বলা হল না—পৃথিবীর উত্তরে কি দক্ষিণে কি, তা বলা হল না—তার তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল, তা বলা হল না—তবে বলা হল কি? গোটা পৃথিবীটার সবই তো বাদ গেল! এটা কি ভালো?

বিশ্বম্ভর। আজ্ঞে না—এটা তো ভালো ঠেকছে না—তাহলে কি করা যায়?

গুরুজি। তাই বলেছিলাম—শব্দের বিষদাঁত যে অর্থ, আগে তাকে ভাঙো। শুধু পৃথিবী নয়, শুধু গোল নয় শুধু এটা নয়, শুধু ওটা নয়; আবার এটাই ওটা, ওটাই সেটা—তাও নয়। তবে কী? না সবই সব। তাকেই আমরা বলি গৌ গাবৌ গাবঃ—

গৌ গাবৌ গাবঃ—

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং—ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ

বিশ্বকর্মার আবির্ভাব

বিশ্বকর্মা।

নিঝুম তিমির তীরে শব্দ হারা অর্থ আসে ফিরে

কালের বাঁধন টুটে দশ দিশি কেঁদে ওঠে
দশদিকে ওড়ে শব্দ ধূলি উড়ে যায় উড়ে যায় মোক্ষপথ
ভুলি—
ভেবেছ কি উদ্ধতের হবে না শাসন ? জাগে নি সুপ্ত
হুতাশন ?
বিদ্রোহের বাজে নি সানাই ? শব্দ আছে প্রতিশব্দ নাই ?

শব্দ মুখে প্রতিলোম শক্তি এস ফিরে কুণ্ডলীর মুখ
যাও ফিরে
শব্দঘন অন্ধকার নিত্য অর্থভারে নামে বৃষ্টি ধারে
শব্দ যজ্ঞ হবিকুণ্ড অফুরন্ত ধূম এই মারি শব্দকল্পদ্রুম।

'দ্রুম' শব্দে সশিষ্য গুরুজির স্বর্গ হইতে পতন

যবনিকা

মামাগো

[ঘরের এক পাশে মাদুরে বসিয়া একটি ছেলে কাগজ হাতে লইয়া কি যেন ভাবিতেছে, অন্য পাশে তাহার দিকে পিছন করিয়া আরাম-কেদারার উপর হাত-পা ছড়াইয়া তাহার মামা আধা-ঘুমন্ত অবস্থায় বিশ্রাম করিতেছেন।

বালক। (হঠাৎ ব্যাকুলস্বরে) মামা।

মামা। (চমকিয়া) কি রে!

বালক। ও মামা!

মামা। (একটুখানি মাথা তুলিয়া) আরে, হল কি ?

বালক। (প্রায় কাঁদ কাঁদ সুরে) মামা গো।

মামা। (বিরক্তভাবে) আরে, কি হল তাই বল্ না ? খালি 'মামা' 'মামা' করতে লেগেছে।

বালক। ও মামা গো, তা হলে কি হবে গো ?

মামা। (উঠিয়া বসিয়া ভ্যাংচানো সুরে) এই তোমার পিঠে ঘা দু-চার পড়বে গো—আর হবে কি ?

বালক। (ঘ্যাঙানি সুরে) না মামা, দেখ না—এই কাগজে কি লিখেছে!

মামা। কি আবার লিখবে ? ওদের যা খুশী তাই লিখেছে—তোর তা নিয়ে চ্যাঁচাবার দরকার কি ?

বালক। শোনো-না একবার কি বলছে ওরা—(মামার কাছে গিয়ে পাঠ) "আমেরিকার কোনো বিখ্যাত মানমন্দির হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, তত্রস্থ দূরবীক্ষণ যন্ত্রে একটি ধূমকেতু দেখা গিয়াছে। জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, আগামী জুন মাসে এই ধূমকেতু পৃথিবীর নিকটবর্তী হইবে এবং তখন পৃথিবীর সহিত তাহার সংঘর্ষ হইবে।"

মামা। হবে তো হবে—তাতে চেঁচাবার কি হয়েছে ?

বালক। (আবার কাঁদ কাঁদ) যদি ধূমকেতুর সঙ্গে ধাক্কা লাগে, আর পৃথিবী চুরমার হয়ে ভেঙে যায় ? —তাহলে তো—

মামা। যাঃ যাঃ—কাঁচের পুতুল কিনা, অমনি চুরমার হয়ে ভেঙে যাবে।

বালক। যদি ধূমকেতুটা ধুম করে আমাদের বাড়ির উপর এসে পড়ে ?—কিংবা ভূমিকম্প হয় ?

মামা। (ভ্যাঙচানো সুরে) কিংবা বাড়িতে আগুন লেগে যায় কিংবা পরেশনাথের পাহাড় তোর মাথায় এসে পড়ে, কিংবা তোর মগজের গোবরগুলো শুকিয়ে ঘুঁটে হয়ে যায়।

বালক। (অত্যন্ত গম্ভীরভাবে) তা কখন কি হয় কিছু তো বলা যায় না। (কাঁদ কাঁদ ভাবে) এই তো গোবিন্দরও তো মামা ছিল, সে মামা তো গত বছর সর্দিগর্মি হয়ে মরে গেল।

মামা। মরেছে ত আপদ গেছে, তাতে হয়েছে কি ?

বালক। না, তাই বলছিলুম—এই সেদিনও তো আমাদের জিমনাস্টিক মাস্টার পিলে হয়ে মরে গেল। তা হলে কে কতদিন বাঁচবে, কখন মরবে, কখন কি হবে, কিছু তো বলা যায় না—

মামা। (কতক রাগে, কতক ব্যঙ্গসুরে) ওরে বাবা রে। এ যে একেবারে বৈরাগীর দাদাঠাকুর হয়ে উঠল দেখি—দেখ্! কান ধরে এমন থাপ্পড় লাগাব!

বালক। (আবার কাঁদ কাঁদ) বা। ব্রজলালের বাবা যদি এক মাস আগে মরে যেত, তা হলে সে কি ব্রজলালকে সেদিন এমন চমৎকার সুন্দর প্রাইজ দিতে পারত ?

মামা। (কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইয়া) তুই কি বলতে চাস বল্ দেখি।

বালক। (হঠাৎ কাঁদিয়া) তুমি যে বলেছিলে আমাকে প্রাইজ দেবে—কই দিচ্ছো না তো—শেষটায় যদি—ভ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ—

মামা। (ধমক দিয়া) সেই কথাটা সোজাসুজি একসময়ে বললেই হত—তার জন্য ঘ্যাঙানি ঘোঙানি করে আমার ঘুমটি নষ্ট করবার কি দরকার ছিল ? (চড় মারিয়া) যা। আজ বিকেলে প্রাইজ পাবি এখন।

[হাসিতে হাসিতে ও গালে হাত ঘষিতে ঘষিতে বালকের প্রস্থান]

সুকুমার রায়ের তুলিতে
বর্ণ-পরিচয়

বিবিধ কবিতা

এ-সব কথা শুন্‌লে তোদের লাগবে মনে ধাঁধা,
কেউ-বা বুঝে পুরোপুরি কেউ-বা বুঝে আধা।

কারে-বা কই কিসের কথা, কই যে দফে দফে,
গাছের পরে কাঁঠাল দেখে তেল মেখো না গোঁফে।

একটি-একটি কথায় যেন সদ্য দাগে কামান,
মন-বসনের ময়লা ধুতে তত্ত্বকথাই সাবান।

বেশ বলেছ, ঢের বলেছ, ঐখেনে দাও দাঁড়ি
হাটের মাঝে ভাঙ্‌বে কেন বিদ্যে বোঝাই হাঁড়ি!

এই পর্যায়টিকে বিবিধ কবিতা, ছড়া, মহাভারত ও অতীতের ছবি এই চারটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশে সুকুমর রায়ের এ যাবৎ প্রাপ্ত অবশিষ্ট সমস্ত কবিতাই প্রকাশিত হল। বৈশাখ ১৩২১ থেকে মাঘ ১৩২৭ পর্যন্ত সুকুমারের সম্পাদনায় সন্দেশ-পত্রিকাতেই এর অধিকাংশ কবিতা মুদ্রিত হয়। 'সম্পাদকের দশা' সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পর ফাল্গুন ১৩৩১-এ সন্দেশে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া 'ফাজিলের ডিকসেনারি' এম, সি, সরকার প্রকাশিত রঙমশাল পূজাবার্ষিকী ১৩২৭-এ এবং 'কলিকাতা কোথা রে' ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রকাশিত সুভাষ মুখোপাধ্যায় সংকলিত 'পাতাবাহার' সংকলনগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। সন্দেশে প্রকাশিত কবিতাগুলির অধিকাংশই পরবর্তীকালে সিগনেট প্রেস প্রকাশিত সুকুমার রায়ের কাব্যসংকলন 'খাই খাই'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কার্তিক ১৩২৫-এ প্রকাশিত সন্দেশে খাই খাই কবিতাটির নীচে 'নূতন প্রকাশিত গ্রন্থ 'পার্বণী' হইতে এই কবিতাটি গৃহীত হইল।' এই কথার উল্লেখ আছে। এই অংশের পাঠ-এ সন্দেশ-এর 'পাঠ'কে অনুসরণ করা হয়েছে। কবিতাগুলিও মোটামুটি সন্দেশে প্রকাশ কালানুক্রমে বিন্যস্ত হয়।

ছড়া অংশে প্রকাশের কালানুক্রম রক্ষা করা হয় নি। সুকুমার রায়ের অবশিষ্ট সমস্ত ছড়াই এই 'অংশে'র অন্তর্ভুক্ত হল। এর মধ্যে 'টিক-টিক-টং' জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪ সংখ্যার মুকুলে প্রকাশিত হয়। এর আগে তাঁর আর একটি মাত্র বাল্য রচনা 'নদী' মুকুল জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩-এ প্রকাশিত হয়েছিল। অন্য ছড়াগুলি সন্দেশে বেরিয়েছিল। 'শ্রীগোবিন্দ-কথা' শিরোনাম বিহীন অসমাপ্ত রচনা। 'হিজিবিজি খাতা' থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত সুকুমার সাহিত্য সমগ্রতে উল্লেখ আছে। রচনার তারিখ জানা যায় নি। আমরা প্রকাশিত শিরোনামই এখানে গ্রহণ করেছি।

ভীষ্ম ও মহাভারত-আদিপর্ব সন্দেশ পত্রিকার অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এখানে 'সন্দেশে' মুদ্রিত পাঠকেই অনুসরণ করা হয়েছে।

অতীতের ছবি—ইউ. রায় এণ্ড সন্স থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। ১৩২৯ সালের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব উপলক্ষে বালক-বালিকা সম্মেলনে পুস্তিকাটির প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছিল। এই সময় সুকুমার প্রায় শয্যাশায়ী ছিলেন। ফাল্গুন ১৩২৯ সংখ্যা সন্দেশে 'লভ তাঁরে জীব যতনে অতি।' এই অংশ পর্যন্ত পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। পরে সুবিমল রায় পুস্তিকাটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন।

সূচীপত্র

বন্দনা

নমি সত্য সনাতন নিত্য ধনে,
নমি ভক্তিভরে নমি কায়মনে।
নমি বিশ্বচরাচর লোকপতে
নমি সর্বজনাশ্রয় সর্বগতে।
নমি সৃষ্টি-বিধারণ শক্তিধরে,
নমি প্রাণপ্রবাহিত জীব জড়ে।

তব জ্যোতিবিভাসিত বিশ্বপটে
মহাশূন্যতলে তব নাম রটে।
কত সিন্ধুতরঙ্গিত ছন্দ ভরে
কত স্তব্ধ হিমাচল ধ্যান করে!
কত সৌরভ সঞ্চিত পুষ্পদলে
কত সূর্য বিলুণ্ঠিত পাদতলে।
কত বন্দনঝঙ্কৃত ভক্তচিতে
নমি বিশ্ব বরাভয় মৃত্যুজিতে।

সন্দেশ—বৈশাখ, ১৩২১

কানে খাটো বংশীধর

কানে খাটো বংশীধর যায় মামাবাড়ি,
গুন্‌গুনে গান গায় আর নাড়ে দাড়ি॥
চলেছে সে একমনে ভাবে ভরপুর,
সহসা বাজিল কানে সুমধুর সুর॥
বংশীধর বলে, "আহা, না জানি কি পাখি
সুদূরে মধুর গায় আড়ালেতে থাকি॥
দেখ, দেখ সুরে তার কত বাহাদুরি,
কালোয়াতি গলা যেন খেলে কারিকুরি॥"
এদিকে বেড়াল ভাবে, 'একি বড়ো দায়,
প্রাণ যদি থাকে তবে ল্যাজখানি যায়॥
গলা ছেড়ে চেঁচামেচি এত করি হায়,
তবু যে ছাড়ে না বেটা, কি করি উপায়॥
আর তো চলে না সহা এত বাড়াবাড়ি,
যা থাকে কপালে দেই এক থাবা মারি॥'
বংশীধর ভাবে, 'একি! বেসুরা যে করে,
গলা গেছে ভেঙে তাই 'ফ্যাঁস্' সুর ধরে॥'
হেনকালে বেরসিক বেড়ালের চাঁটি,
একেবারে সব গান করে দিল মাটি।

সন্দেশ—কার্তিক, ১৩২৩

বর্ষশেষ

শুন রে আজব কথা, শুন বলি ভাই রে—
বছরের আয়ু দেখ আর বেশি নাই রে।
ফেলে দিয়ে পুরাতন জীর্ণ এ খোলসে
নূতন বরষ আসে, কোথা হতে বল সে!
কবে যে দিয়েছে চাবি জগতের যন্ত্রে,
সেই দমে আজও চলে না জানি কি মন্ত্রে!
পাকে পাকে দিনরাত ফিরে আসে বার বার,
ফিরে আসে মাস ঋতু—এ কেমন কারবার।
কোথা আসে কোথা যায় নাহি কোনো উদ্দেশ,
হেসে খেলে ভেসে যায় কত দূর দূর দেশ।
রবি যায় শশী যায় গ্রহ তারা সব যায়,
বিনা কাঁটা কম্পাসে বিনা কল কব্জায়।
ঘুরপাকে ঘুরে চলে, চলে কত ছন্দে,
তালে তালে হেলে দুলে চলে রে আনন্দে।

সন্দেশ—চৈত্র, ১৩২৩

নাচন।
নাচ্ছি মোরা মনের সাধে গাচ্ছি তেড়ে গান
হলো মেনী যেযারগলার কালোয়াতীর তান
নাচ্ছি দেখে চাঁদা মামা · হাস্‌ছে ভ'রে গাল
চোখ্‌টি ঠেরে ঠাট্টা করে দেখ্‌না বুড়োর চাল

পরিবেষণ

'পরি'পূর্বক 'বিষ'ধাতু তাহে 'অনট্' ব'সে
তবে ঘটায় পরিবেষণ, লেখে অমরকোষে।
—অর্থাৎ ভোজের ভাণ্ড হাতে লয়ে মেলা
ডেলা ডেলা ভাগ করি পাতে পাতে ফেলা।
এই দিকে এসো তবে লয়ে ভোজভাণ্ড
সম্মুখে চাহিয়া দেখ কি ভীষণ কাণ্ড।
কেহ কহে "দে আনো" কেহ হাঁকে "লুচি"
কেহ কাঁদে শূন্য মুখে পাতখানি মুছি।
কোথা দেখি দুই প্রভু পাত্র লয়ে হাতে
হাতাহাতি গুঁতাগুঁতি দ্বন্দ্বরণে মাতে।
কেবা শোনে কার কথা সকলেই কর্তা-
অনাহারে কতধারে হল প্রাণ হত্যা।
কোনো প্রভু হস্তিদেহ ভুঁড়িখানা ভারী
উর্ধ্ব হতে থপ্ করি খাদ্য দেন্ ছাড়ি।

কোনো চাচা অন্ধপ্রায় ('মাইনাস্ কুড়ি')
ছড়ায় ছোলার ডাল পথঘাট জুড়ি।
মাতব্বর বৃদ্ধ যায় মুদি চক্ষু দুটি,
"কারো কিছু চাই" বলি তড়্ বড়্ ছুটি—
সহসা ডালের পাঁকে পদার্পণ মাত্রে
হুড়্ মুড়্ পড়ে কার নিরামিষ পাত্রে।
বীরোচিত ধীর পদে এসো দেখি ত্রস্তে—
ঐ দিকে খালি পাত, চল হাঁড়ি হস্তে।

তবে দেখো, খাদ্য দিতে অতিথির থালে
দৈবাৎ না ঢোকে কভু যেন নিজ গালে!
ছুটো নাকো ওরকম মিছে খালি হাতে
দিয়ো না মাছের মুড়া নিরামিষ পাতে।
অযথা আক্রোশে কিবা অন্যায় আদরে
ঢেলো না অম্বল কারো নূতন চাদরে।
বোকাবৎ দন্তপাটি করিয়া বাহির
কোরো নাকো অকারণে কৃতিত্ব জাহির।

সন্দেশ—আষাঢ়, ১৩২৬

ক্যাঁজিলের ডিক্‌সেনারী

সব যেন ধোঁয়া ধোঁয়া ছায়া-ঢাকা ধুলোতে,
চোখ কান খিল দেওয়া গিজ্‌ গিজ্‌ তুলোতে।
বহে নাকো নিঃশ্বাস চলে নাকো রক্ত—
স্বপ্ন না জেগে দেখা, বোঝা ভারি শক্ত।
মন বলে, "ওরে ওরে আক্কেল মত্ত,
কানদুটো খুলে দিয়ে এইবেলা শোন্‌তো।"
ঠাস্‌ ঠাস্‌ দ্রুম্‌ দ্রাম, শুনে লাগে খট্‌কা,—
ফুল ফোটে? তাই বল! আমি ভাবি পট্‌কা!
শাঁই শাঁই পন্‌ পন্‌, ভয়ে কান বন্ধ—
ঐ বুঝি ছুটে যায় সে ফুলের গন্ধ?
হুড়্‌মুড়্‌ ধুপ্‌ধাপ্‌ ওকি শুনি ভাই রে!
দেখ্‌ছ না হিম পড়ে—যেয়ো নাকো বাইরে।
চুপ্‌চুপ্‌ ঐ শোন! ঝুপঝাপ্‌ ঝপা-স্‌!
চাঁদ বুঝি ডুবে গেল গব্‌ গব্‌ গবা-স্‌!
খ্যাঁশ্‌ খ্যাঁশ্‌, ঘ্যাচ্‌ ঘ্যাচ্‌, রাত কাটে ঐ রে?
দুড়দাড় চুরমার—ঘুম ভাঙে কই রে!
ঘর্ঘর ভন্‌ ভন্‌ ঘোরে কত চিন্তা!
কত মন নাচে শোন্‌—ধেই ধেই ধিন্‌তা!
ঠুংঠাং ঢং ঢং কত ব্যথা বাজে রে?
ফট্‌ ফট্‌ বুক ফাটে তাই মাঝে মাঝে রে!
হৈ হৈ মার্‌ মার্‌, 'বাপ্‌ বাপ্‌' চীৎকার,
মালকোঁচা মারে বুঝি? সরে পড় এইবার!

মশাল (পূজাবার্ষিকী) ১৩২৭

হিংসুটিদের গান

আমরা ভালো লক্ষ্মী সবাই তোমরা ভারি বিশ্রী,
তোমরা খাবে নিমের পাঁচন, আমরা খাব মিশ্রী।
আমরা পাব খেলনা পুতুল, আমরা পাব চম্‌চম্‌,
তোমরা তো তা পাচ্ছ না কেউ পেলেও পাবে কম্‌ কম্‌।
আমরা শোব খাট্‌ পালঙে মায়ের কাছে ঘেঁষ্‌টে,
তোমরা শোবে অন্ধকারে একলা ভয়ে ভেস্তে।
আমরা যাব জামতাড়াতে চড়্‌ব কেমন ট্রেইনে,
চেঁচাও যদি "সঙ্গে নে যাও" বল্‌ব "কলা এই নে"।
আমরা ফিরি বুক ফুলিয়ে রঙিন্‌ জুতোয় মচ্‌মচ্‌,
তোমরা হাঁদা নোংরা ছিছি হ্যাংলা নাকে ফঁচ্‌ফঁচ্‌।
আমরা পরি রেশ্‌মি জরি, আমরা পরি গয়না,
তোমরা সে-সব পাও না ব'লে তাও তোমাদের সয় না।
আমরা হব লাটমেজাজী, তোমরা হবে কিপ্‌টে,
চাইবে যদি কিচ্ছু তখন ধর্‌ব গলা চিপ্‌টে।

সন্দেশ—মাঘ, ১৩২৭

কলিকাতা কোথা রে

গিরিধি আরামপুরী, দেহ মন চিৎপাত,
খেয়ে শুয়ে হু হু ক'রে কেটে যায় দিনরাত,
হৈ চৈ হাঙ্গামা হুড়োতাড়া হেথা নেই,
মাস বার তারিখের কোনো কিছু ল্যাঠা নেই।
খিদে পেলে তেড়ে যাও, ঘুম পেলে ঘুমিও—
মোট কথা কি আরাম, বুঝলে না তুমিও।
ভুলেই গেছিনু কোথা এই ধরা মাঝেতে
আছে সে শহর এক কলকেতা নামেতে—
হেনকালে চেয়ে দেখি চিঠি এক সমুখে
চায়েতে অমুক দিন ভোজ দেয় অমুকে।
'কোথায়? কোথায়?' বলে মন ওঠে লাফিয়ে,
তাড়াতাড়ি চিঠিখানা তেড়ে ধরি চাপিয়ে,
ঠিকানাটা চেয়ে দেখি নিচু পানে ওধারে
লেখা আছে 'কলিকাতা'—সে আবার কোথা রে!
স্মৃতি কয়, 'কলিকাতা? রোস দেখি; তাইতো,
কোথায় শুনেছি যেন, মনে ঠিক নাই তো।'

বেগতিক শুধালেম সাধুরাম ধোপারে,
সে কহিল, 'হলে হবে উশ্রীর ওপারে।'
ওপারের জেলে বুড়ো মাথা নেড়ে কয় সে,
'হেন নাম শুনি নাই আমার এ বয়সে।'

তার পরে পুছিলাম সরকারি মজুরে ;
তমাম মুলুক সে তো বাৎলায় হুজুরে'
ব্যোবাদ, বরাকর, ইদিকে পচম্বা
উদিকে পরেশনাথ, পাড়ি দাও লম্বা
সব তার সড়গড় নেই কোনো ভুল তায়—
'কলকাতা কাঁহা' বলি সেও মাথা চুলকায়।
অবশেষে নিরুপায় মাথা যায় ঘুলিয়ে,
'টাইম টেবিল' খুলে দেখি চোখ বুলিয়ে!
সেথায় পাটনা, পুরী, গয়া, গোমো, মালদ
বজবজ, দমদম, হাওড়া ও শিয়ালদ
ইত্যাদি কত নাম চেয়ে দেখি সামনেই ;
তার মাঝে কোনোখানে কলিকাতা নাম নেই!
—সব ফাঁকি বুজরুকী রসিকতা চেষ্টা!
উদ্দেশে 'শালা' বলি গাল দিনু শেষটা ॥

সহসা স্মৃতিতে যেন লাগিল কি ফুৎকার
উদিল কুমড়া হেন চাঁদপানা মুখ কার!
আশে-পাশে টিপিটুপি পাহাড়ের পুঞ্জ,
মুখচাঁচা ময়দান, মাঝে কিবা কুঞ্জ!
সে শোভা স্মরণে ঝরে নয়নের ঝরনা ;
গৃহিনীরে কহি, 'প্রিয়ে মারা যাই ধরো-না।'
তার পরে দেখি ঘরে অতি ঘোর অনাচার—
রাখে নাকো কেউ কোনো তারিখের সমাচার
তখনি আনিয়া পাঁজি দেখা গেল গণিয়া,
চায়ের সময় এল একেবারে ঘনিয়া!
হায় রে সময় নাই, মন কাঁদে হতাশে—
কোথায় চায়ের মেলা! মুখশশী কোথা সে!
স্বপন শুকায়ে যায় আঁধারিয়া নয়নে,
কবিতায় গলি তাই গাহি শোক শয়নে।

হোমভিলা—বারগণ্ডা, গিরিধি
৮।১।২২
(মিসেস এস. কে. দত্তকে লেখা)

সম্পাদকের দশা

সম্পাদকীয়—

একদা নিশীথে এক সম্পাদক গোবেচারা।
পোঁটলা পুঁটুলি বাঁধি হইলেন দেশছাড়া ॥
অনাহারী সম্পাদকী হাড়ভাঙা খাটুনি সে।
জানে তাহা ভুক্তভোগী অপরে বুঝিবে কিসে?
লেখক পাঠক আদি সকলেরে দিয়া ফাঁকি।
বেচারি ভাবিল মনে—বিদেশে লুকায়ে থাকি ॥
এদিকে তো ক্রমে ক্রমে বৎসরেক হল শেষ।
'নোটিস' পড়িল কত 'সম্পাদক নিরুদ্দেশ' ॥
লেখক পাঠকদল রুষিয়া কহিল তবে।
জ্যান্ত হোক মৃত হোক ব্যাটারে ধরিতে হবে ॥
বাহির হইল সবে শব্দ করি 'মার্ মার্'।
—দৈবের লিখন, হায়, খণ্ডাইতে সাধ্য কার ॥
একদা কেমনে জানি সম্পাদক মহাশয়।
পড়িলেন ধরা—আহা দুরদৃষ্ট অতিশয় ॥
তার পরে কি ঘটিল কি করিল সম্পাদক।
সে-সকল বিবরণে নাহি তত আবশ্যক ॥
মোট কথা হতভাগ্য সম্পাদক অবশেষে।
বসিলেন আপনার প্রাচীন গদিতে এসে ॥
(অর্থাৎ লেখকদল লাঠ্যৌষধি শাসনেতে।
বসায়েছে তারে পুনঃ সম্পাদকী আসনেতে ॥)
ঘুচে গেছে বেচারীর ক্ষণিক সে শান্তি সুখ।
লেখকের তাড়া খেয়ে সদা তার শুষ্কমুখ ॥
দিস্তা দিস্তা গদ্য পদ্য দর্শন সাহিত্য প'ড়ে।
পুনরায় বেচারীর নিত্যি নিত্যি মাথা ধরে ॥
লোলচর্ম অস্থি সার জীর্ণ বেশ রুক্ষ কেশ।
মুহূর্ত সোয়াস্তি নাই—লাঞ্ছনার নাহি শেষ ॥

সন্দেশ—ফাল্গুন, ১৩৩১

পাকাপাকি

আম পাকে বৈশাখে কুল পাকে ফাগুনে,
কাঁচা ইঁট পাকা হয় পোড়ালে তা আগুনে।
রোদে জলে টিঁকে রঙ, পাকা কই তাহারে।
ফলারটি পাকা হয় লুচি দই আহারে।
হাত পাকে লিখে লিখে, চুল পাকে বয়সে,
জ্যাঠামিতে পাকা ছেলে বেশি কথা কয় সে।
লোকে কয় কাঁঠাল সে পাকে নাকি কিলিয়ে?
বুদ্ধি পাকিয়ে তোলে লেখাপড়া গিলিয়ে!
কান পাকে ফোড়া পাকে, পেকে করে টন্‌টন্—
কথা যার পাকা নয়, কাজে তার ঠন্‌ঠন্।
রাঁধুনী বসিয়া পাকে পাক দেয় হাঁড়িতে,
সজোরে পাকালে চোখ ছেলে কাঁদে বাড়িতে।
পাকায়ে পাকায়ে দড়ি টান হয়ে থাকে সে।
দুহাতে পাকালে গোঁফ তবু নাহি পাকে সে॥

সন্দেশ—বৈশাখ, ১৩২৪

বর্ষার কবিতা

কাগজ কলম লয়ে বসিয়াছি সদ্য,
আষাঢ়ে লিখিতে হবে বরষার পদ্য।
কি যে লিখি কি যে লিখি ভাবিয়া না পাই রে,
হতাশে বসিয়া তাই চেয়ে থাকি বাইরে।
সারাদিন ঘনঘটা কালো মেঘ আকাশে,
ভিজে ভিজে পৃথিবীর মুখখানা ফ্যাকাশে।
বিনা কাজে ঘরে বাঁধা কেটে যায় বেলাটা,
মাটি হল ছেলেদের ফুটবল খেলাটা।
আপিসের বাবুদের মুখে নাই ফূর্তি,
ছাতা কাঁধে জুতা হাতে ভ্যাবাচ্যাকা মূর্তি।
কোনখানে হাঁটু জল, কোথা ঘন কর্দম—
চলিতে পিছল পথে পড়ে লোকে হর্‌দম।
ব্যাঙেদের মহাসভা আহ্লাদে গদ্‌গদ্,
গান করে সারারাত অতিশয় বদ্‌খদ্।

সন্দেশ—আষাঢ়, ১৩২৫

খাই খাই

খাই খাই করো কেন, এসো বসো আহারে—
খাওয়ার আজব খাওয়া, ভোজ কয় যাহারে।
যত কিছু খাওয়া লেখে বাঙালির ভাষাতে,
জড়ো করে আনি সব—থাক সেই আশাতে।
ডাল ভাত তরকারি ফল-মূল শস্য,
আমিষ ও নিরামিষ, চর্ব্য ও চোষ্য,
রুটি লুচি, ভাজাভুজি, টক ঝাল মিষ্টি,
ময়রা ও পাচকের যত কিছু সৃষ্টি,
আর যাহা খায় লোকে স্বদেশে ও বিদেশে—
খুঁজে পেতে আনি খেতে—নয় বড়ো সিধে সে!
জল খায়, দুধ খায়, খায় যত পানীয়,
জ্যাঠাছেলে বিড়ি খায়, কান ধরে টানিয়ো।
ফল বিনা চিঁড়ে দই, ফলাহার হয় তা,
জলযোগে জল খাওয়া শুধু জল নয় তা।

ব্যাঙ খায় ফরাসিরা (খেতে নয় মন্দ),
বার্মার 'ঙাপ্পি'তে বাপ্ রে কি গন্ধ!
মান্দ্রাজী ঝাল খেলে জ্বলে যায় কণ্ঠ,
জাপানেতে খায় নাকি ফড়িঙের ঘণ্ট!
আরশুলা মুখে দিয়ে সুখে খায় চীনারা,
কত কি যে খায় লোকে নাহি তার কিনারা।
দেখে শুনে চেয়ে খাও, যেটা চায় রসনা;
তা না হলে কলা খাও—চটো কেন? বসো না—
সবে হল খাওয়া শুরু, শোনো শোনো আরো খায়—
সুদ খায় মহাজনে, ঘুষ খায় দারোগায়।
বাবু যান হাওয়া খেতে চড়ে জুড়ি-গাড়িতে,
খাসা দেখ 'খাপ্ খায়' চাপ্‌কানে দাড়িতে।
তেলে জলে 'মিশ খায়', শুনেছ তা কেও কি?
যুদ্ধে যে গুলি খায় গুলিখোর সেও কি?
ডিঙি চড়ে স্রোতে প'ড়ে পাক খায় জেলেরা,
ভয় খেয়ে খাবি খায় পাঠশালে ছেলেরা;
বেত খেয়ে কাঁদে কেউ, কেউ শুধু গালি খায়,
কেউ খায় থতমত—তাও লিখি তালিকায়।
ভিখারিটা তাড়া খায়, ভিখ্ নাহি পায় রে—

'দিন আনে দিন খায়' কত লোকে হায় রে।
হোঁচটের চোট্ খেয়ে খোকা ধরে কান্না
মা বলেন চুমু খেয়ে, 'সেরে গেছে, আর না।'
ধমক বকুনি খেয়ে নয় যারা বাধ্য
কিলচড় লাথি ঘুঁষি হয় তার খাদ্য।
জুতো খায় গুঁতো খায়, চাবুক যে খায় রে,
তবু যদি নুন খায় সেও গুন গায় রে।
গরমে বাতাস খাই, শীতে খাই হিমসিম্,
পিছলে আছাড় খেয়ে মাথা করে ঝিম্‌ঝিম্।

কত যে মোচড় খায় বেহালার কানটা,
কানমলা খেলে তবে খোলে তার গানটা।
টোল খায় ঘটি বাটি, দোল খায় খোকারা,
ঘাব্‌ড়িয়ে ঘোল খায় পদে পদে বোকারা।
আকাশেতে কাৎ হ'য়ে গোঁৎ খায় ঘুড়িটা,
পালোয়ান খায় দেখ ডিগ্‌বাজি কুড়িটা।
ফুটবলে ঠেলা খাই, ভিড়ে খাই ধাক্কা,
কাশীতে প্রসাদ খেয়ে সাধু হই পাক্কা।
কথা শোনো, মাথা খাও, রোদ্দুরে যেয়ো না—
আর যাহা খাও বাপু বিষমটি খেয়ো না।
'ফেল্' ক'রে মুখ খেয়ে কেঁদেছিলে সেবারে,
আদা-নুন খেয়ে লাগো পাশ করো এবারে।
ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ো নাকো; যেয়ো নাকো ভড়্‌কে,
খাওয়াদাওয়া শেষ হলে বসে খাও খড়্‌কে।
এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা—
খাও তবে কচুপোড়া খাও তবে ঘণ্টা।

সন্দেশ—কার্তিক, ১৩২৪

অবুঝ

চুপ করে থাক্, তর্ক করার বদভ্যাসটি ভালো না,
একেবারেই হয় না ওতে বুদ্ধিশক্তির চালনা।
দেখ্ তো দেখি আজও আমার মনের তেজটি নেভে নি-
এইবার শোন্ বল্‌ছি এখন—কি বলছিলেম ভেবেনি।
বল্‌ছিলাম কি, আমি একটা বই লিখেছি কবিতার
উঁচুরকম পদ্যে লেখা আগা গোড়াই সবই তার।
তাইতে আছে "দশমুখে চায়, হজম করে দশোদর,
শ্মশানঘাটে শষ্পানি খায় শশব্যস্ত শশধর।"
এই কথাটার অর্থ যে কি, ভাবছে না কেউ মোটেও—
বুঝছে না কেউ লাভ হবে কি, অর্থ যদি জোটেও।
এরই মধ্যে হাই তুলিস্ যে? পুঁতে ফেল্‌ব এখনি,
ঘুঘু দেখেই নাচ্‌তে শুরু, ফাঁদ তো বাবা দেখ নি!
কি বললি তুই? সাতান্নবার শুনেছিস্ ঐ কথাটা?
এমন মিথ্যে কইতে পারিস্ লক্ষীছাড়া বখাটা!
আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাধ্যি নেই কো পেরোবার
হিসেব দেব, বলেছি এই চোদ্দোবার কি তেরোবার।
সাতান্ন তুই শুনতে পারিস্? মিথ্যাবাদী! শুনে যা—
ও শ্যামদাস! পালাস্ কেন? রাগ করিনি, শুনে যা।

দাঁড়ের কবিতা

চুপ কর্ শোন্ শোন্, বেয়াকুল হোস্ নে
ঠেকে গেছি বাপ্ রে কি ভয়ানক প্রশ্নে!
ভেবে ভেবে লিখে লিখে বসে বসে দাঁড়েতে
ঝিম্‌ঝিম্ টন্‌টন্ ব্যথা করে হাড়েতে।
এক ছিল দাঁড়ি মাঝি—দাড়ি তার মস্ত,
দাড়ি দিয়ে দাঁড়ি তার দাঁড়ে খালি ঘষ্‌ত।
সেই দাঁড়ে একদিন দাঁড়কাক দাঁড়াল,
কাঁকড়ার দাঁড়া দিয়ে দাঁড়ি তারে তাড়াল।
কাক বলে রেগেমেগে, "বাড়াবাড়ি ঐতো!
না দাঁড়াই দাঁড়ে তবু দাঁড়কাক হই তো?
ভারি তোর দাঁড়িগিরি, শোন্ বলি তবে রে—
দাঁড় বিনা তুই ব্যাটা দাঁড়ি হোস্ কবে রে?
পাখা হলে 'পাখি' হয় ব্যাকরণ বিশেষে—
কাঁকড়ার 'দাঁড়া' আছে, দাঁড়ি নয় কিসে সে?
দ্বারে বসে দারোয়ান, তারে যদি 'দ্বারী' কয়,
দাঁড়ে-বসা যত পাখি সব তবে দাঁড়ি হয়!
দূর দূর! ছাই দাঁড়ি! দাড়ি নিয়ে পাড়ি দে!"
দাঁড়ি বলে, "বাস্ বাস্! ঐখেনে দাঁড়ি দে।"

সন্দেশ—আষাঢ়, ১৩২৭

ছড়া

টিক্ টিক্ টং

টিক টিক্ চলে ঘড়ি, টিক্ টিক্ টিক্,
একটা ইঁদুর এল সে সময়ে ঠিক।
ঘড়ি দেখে একলাফে তাহাতে চড়িল,
টং করে অমনি ঘড়ি বাজিয়া উঠিল।
অমনি ইঁদুরভায়া ল্যাজ গুটাইয়া,
ঘড়ির ওপর থেকে পড়ে লাফাইয়া।
ছুটিয়া পালায়ে গেল আর না আসিল,
টিক্ টিক্ টিক্ ঘড়ি চলিতে লাগিল॥

হাতে ধনু, পিঠে তূণ, বাছা তবু কেঁদে খুন।
তূণভরা আছে তীর, কাঁদ কেন মহাবীর ?
ভাঙা ধনু, কাঁদ তাই ? আহা ! আহা ! মরে যাই।

সন্দেশের গন্ধে বুঝি দৌড়ে এলে মাছি ?
কেন ভন্ ভন্ হাড়-জ্বালাতন, ছেড়ে যেও না বাচি।
নাকের গোড়ায় শুড়শুড়ি দাও, শেষটা দেবে ফাঁকি ?
সুযোগ বুঝে সুড়ুৎ করে হুল ফোটাবে নাকি ?

মামদো পুতুল আসছে তেড়ে, কাঠের ঘোড়া খট্‌খটাং
সামনেওয়ালা জলদি ভাগো, নৈলে পরে চিৎপটাং।

ডাক্তার ফস্টার
ইস্কুল মাস্টার
বেত তার চট্‌পট্,
ছাত্রেরা ছটফট্—
ভয়ে সব পস্তায়,
বাড়ি ছেড়ে রাস্তায়,
গ্রাম ছেড়ে শহরে,
গয়া কাশী লাহোরে।
ফিরে আসে সন্ধ্যায়
পড়ে শোনে মন দ্যায়॥

বড়ো তুমি লোকটি ভালো,
চেহারাও নয়তো কালো—
তবু কেন তোমায় ভালোবাসছি নে ?
কেন তা তো কেউ না জানে,
ভেবে কিছু পাই নে মানে,
যতই ভাবি ততই ভালোবাসছি নে॥

জংলাবনের পাগলাবুড়ো আমায় এসে বলে,
"আড়াই বিঘা সমুদ্রেতে কাঁটাল কত ফলে ?"
আমিও বলি আন্দাজেতে, "বলছি শোনো কত—
তোমাদের ঐ ঝিঙের খেতে চিংড়ি গজায় যত।"

বাস্ রে বাস্ ! সাবাস বীর !
ধনুকখানি ধরে,
পায়রা দেখে মারলে তীর—
কাগটা গেল মরে।

নন্দঘোষের শামলা গোরু ভাগল কোথায় লক্ষ্মীছাড়া ?
নন্দ ছোটে বনবাদাড়ে, সন্ধানে ধায় বদ্যিপাড়া।
শেষ কালেতে, অর্ধরাতে হদ্দ হয়ে ফিরলে পরে—
বাসায় দেখে ঘুমোয় গোরু ল্যাজ গুটিয়ে গোয়ালঘরে।

আরে ছিছি, রাম, রাম ! কলকাতা শহরে,
লাল ধুতি পরে খুদি তিনহাত বহরে।
মখমলি জামাজুতো, ঝকমকে টোপরে,
খায় দায়, গান গায়, রাস্তার ওপরে॥

বলছি ওরে, ছাগলছানা, উড়িস নে রে উড়িস নে।
জানিস তোদের উড়তে মানা—হাত-পাগুলো ছুঁড়িস নে॥

উঠোন কোণে কড়াই ছিল, পায়েস ছিল তাতে,
তাই নিয়ে কাক লড়াই করে কুঁকড়ো বুড়োর সাথে।
যুদ্ধ জিতে বড়াই ভারি, তখন দেখে চেয়ে—
কখন এসে চড়াইপাখি পায়েস গেছে খেয়ে॥

খিলখিল্লির মুল্লুকেতে থাকত নাকি দুই বেড়াল।
একটা শুধোয় আরেকটাকে, "তুই বেড়াল, না মুই বেড়াল ?"
সেই থেকে হয় তর্ক শুরু, চীৎকারে তার ভূত পালায়,
আঁচড়কামড়, চকিবাজি, ধাঁই ধপাধপ্ চড় চালায়।

খামচা, খাবল, ডাইনেবাঁয়ে, হড় মুড়িয়ে হলোর মতো।
তক্ক যখন শান্ত হল, ক্ষান্ত হল আঁচড়দাগা,
থাকত দুটো আস্ত বেড়াল, রইল দুটো ল্যাজের ডগা ॥

তিনবুড়ো পণ্ডিত টাকচুড়ো নগরে
চড়ে এক গামলায় পাড়ি দেয় সাগরে।
গামলাতে ছেঁদা ছিল, আগে কেউ দেখ নি,
গানখানি তাই মোর থেমে গেল এখনি ॥

ছোটো-ছোটো ছেলেগুলো কিসে হয় তৈরি,
—কিসে হয় তৈরি ?
কাদা আর কয়লা, ধুলো, বালি, ময়লা,
এই দিয়ে ছেলেগুলো তৈরি।
ছোটো-ছোটো মেয়েগুলি কিসে হয় তৈরি ?
—কিসে হয় তৈরি ?
ক্ষীর, ননী, চিনি আর ভালো যাহা দুনিয়ার,
মেয়েগুলি তাই দিয়ে তৈরি ॥

"ম্যাও ম্যাও হলোদাদা, তোমার যে দেখা নাই ?',
"গেছিলাম রাজপুরী রানীমার সাথে ভাই।"
"তাই নাকি ? বেশ, বেশ, কি দেখেছ সেখানে ?"
"দেখেছি ইঁদুর এক রানীমার উঠানে।"

গাধাটার বুদ্ধি দেখ চাটি মেরে সে নিজের গালে,
কে মেরেছে দেখবে বলে চড়তে গেছে গাছের চালে।

রঙ হল চিড়েতন, সব গেল ঘুলিয়ে,
গাধা যায় মামাবাড়ি টাকে, হাত বুলিয়ে।
বেড়াল মরে বিষম খেয়ে, চাঁদের ধরল মাথা,
হঠাৎ দেখি ঘরবাড়ি সব ময়দা দিয়ে গাঁথা ॥

কেন সব কুকুরগুলো খামখা চ্যাঁচায় রাতে ?
কেন বল দাঁতের পোকা থাকে না ফোকলা দাঁতে ?
পৃথিবীর চ্যাপটামাথা, কেন সে কানের দোষে ?
এসো ভাই চিন্তা করি দুজনে ছায়ায় বসে ॥

দাদা গো দাদা, সত্যি তোমার সুরগুলো খুব খেলে।
এমনি মিঠে, ঠিক যেন কেউ গুড় দিয়েছে ঢেলে।

দাদা গো দাদা, এমন খাসা কণ্ঠ কোথায় পেলে ?
এই খেলে যা! গান শোনাতে আমার কাছেই এলে ?
দাদা গো দাদা, পায় পড়ি তোর, ভয় পেয়ে যায় ছেলে—
গাইবে যদি ঐখেনে গাও, ঐদিকে মুখ মেলে ॥

শ্রীগোবিন্দ-কথা

আমি অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ মানুষটি নই বাঁকা।
যা বলি তা ভেবেই বলি, কথায় নেইকো ফাঁকা
এখানকার সব সাহেবসুবো, সবাই আমায় চেনে
দেখতে চাও তো দিতে পারি সার্টিফিকেট এনে
ভাগ্য আমায় দেয় নি বটে করতে বি. এ. পাশ
তাই বলে কি সময় কাটাই কেটে ঘোড়ার ঘাস ?
লোকে যে কয় বিদ্যে আমার 'কথামালাই শেষ
এর মধ্যে সত্যি কথা নেইকো বিন্দুলেশ।
ওদের পাড়ার লাইব্রেরিতে কেতাব আছে যত ?
কেউ পড়েছে তন্নতন্ন করে আমার মতো ?

আমি অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ এমনি পড়ার যম
পড়াশুনো নয়কো আমার কারুর চেয়ে কম।
কতকটা এই দেখেশিখে কতক পড়েশুনে
('আর) কতক হয়তো স্বাভাবিকী প্রতিভারই গুণে
উন্নতিটা করছি যেমন আশ্চর্য তা ভারি
নিজের মুখে সব কথা তার বলতে কি আর পারি?
বলে গেছেন চণ্ডীপতি কিংবা অন্য কেউ
"আকাশ জুড়ে মেঘের বাসা সাগরভরা ঢেউ
জীবনটাও তেমনি ঠাসা কেবল বিনা কাজে
যেদিক দিয়ে খরচ করি সেই খরচই বাজে।"
আমি অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ চলতে ফিরতে শুতে
জীবনটাকে হাঁকাই নেকো মনের রথে জুতে।
হাইড্রোজেনের দুই বাবাজি অক্সিজেনের এক
নৃত্য করেন গলাগলি কাণ্ডখানা দেখ্
আহ্লাদেতে এক্‌সা হয়ে গলে হলেন জল
এই সুযোগে সুবোধ শিশু "শ্রীগোবিন্দ" বল্।

[অসমাপ্ত]

মহাভারত

ভীষ্ম

কুরুকুলে পিতামহ ভীষ্মমহাশয়
ভুবন বিজয়ী বীর শুন পরিচয়—
শান্তনু রাজার পুত্র নাম সত্যব্রত
জগতে সার্থক নাম সত্যে অনুরত।
স্বয়ং জননী গঙ্গা বর দিলা তাঁরে
নিজ ইচ্ছা বিনা বীর না মরে সংসারে।
বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে হায় শান্তনু রাজার
বিবাহের লাগি বুড়া করে আবদার
মৎস্য রাজকন্যা আছে নামে সত্যবতী
তারে দেখি শান্তনুর লুপ্ত হল মতি।
মৎস্যরাজ কহে, 'রাজা, কর অবধান—
'কিসের আশায় কহ করি কন্যাদান?
'সত্যব্রত জ্যেষ্ঠ সেই রাজ্য অধিকারী,
'আমার নাতিরা হবে তার আজ্ঞাকারী,
'রাজমাতা কভু নাহি হবে সত্যবতী,
'তেঁই এ বিবাহ-কথা অনুচিত অতি।'
ভগ্ন মনে হস্তিনায় ফিরিল শান্তনু
অনাহারে অনিদ্রায় জীর্ণ তার তনু।

মন্ত্রিমুখে সত্যব্রত শুনি সব কথা
মৎস্যরাজপুরে গিয়া কহিল বারতা—
'রাজ্যে মম সাধ নাহি, করি অঙ্গীকার
'জন্মিলে তোমার নাতি রাজ্য হবে তার।'
রাজা কহে, 'সাধু তুমি, সত্য তব বাণী,
'তোমার সন্তান হতে তবু ভয় মানি।
'কে জানে ভবিষ্যকথা, দৈবগতিধারা—
'প্রতিবাদী হয় যদি রাজ্যলাভে তারা?'
সত্যব্রত কহে, 'শুন প্রতিজ্ঞা আমার,
'বংশ না রহিবে মম পৃথিবী মাঝার।

'সাক্ষী রহ চন্দ্র সূর্য লোকে লোকান্তরে
'এই জন্মে সত্যব্রত বিবাহ না করে।'
শুনিয়া অদ্ভুত বাণী ধন্য কহে লোকে
স্বর্গ হতে পুষ্পধারা ঝরিল পলকে।
সেই হতে সত্যব্রত খ্যাত চরাচরে
ভীষণ প্রতিজ্ঞাবলে ভীষ্ম নাম ধরে।
ঘুচিল সকল ব্যথা, আনন্দিত চিতে
সত্যবতী রানী হয় হস্তিনাপুরীতে।
ক্রমে হলে বর্ষ গত শান্তনুর ঘরে
জন্ম নিল নব শিশু, সবে সমাদরে।
রাখিল বিচিত্রবীর্য নামটি তাহার
শান্তনু মরিল তারে দিয়া রাজ্যভার।
অকালে বিচিত্রবীর্য মুদিলেন আঁখি
পাণ্ডু আর ধৃতরাষ্ট্র দুই পুত্র রাখি॥

মহাভারত-আদিপর্ব

হস্তিনায় চন্দ্রবংশ কুরুরাজকুল
রাজত্ব করেন সুখে বিক্রমে অতুল।
সেই কুলে জন্মি তবু দৈববশে হায়
অন্ধ বলি ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য নাহি পায়।
কনিষ্ঠ তাহার পাণ্ডু, রাজত্ব সে করে,
পাঁচটি সন্তান তার দেবতার বরে।
জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠির ধীর শান্ত মন
'সাক্ষাৎ ধর্মের পুত্র' কহে সর্বজন।
দ্বিতীয় সে মহাবলী ভীম নাম ধরে,
পবন সমান তেজ পবনের বরে।
তৃতীয় অর্জুন বীর, ইন্দ্রের কৃপায়
রূপেগুণে শৌর্যেবীর্যে অতুল ধরায়।
এই তিন সহোদর কুন্তীর কুমার,
বিমাতা আছেন মাদ্রী দুই পুত্র তাঁর—
নকুল ও সহদেব সুজন সুশীল
এক সাথে পাঁচজনে বাড়ে তিল তিল।
অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র শতপুত্র তার,
অভিমানী দুর্যোধন জ্যেষ্ঠ সবাকার।
পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই নষ্ট হয় কিসে,
এই চিন্তা করে দুষ্ট জ্বলি হিংসাবিষে।
হেনকালে সর্বজনে ভাসাইয়া শোকে
মাদ্রীসহ পাণ্ডুরাজা যায় পরলোকে।
'পাণ্ডু গেল,' মনে মনে ভাবে দুর্যোধন,
'এইবারে যুধিষ্ঠির পাবে সিংহাসন!
ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে গিয়া তারে মারি—
ভীমের ভয়েতে কিছু করিতে না পারি।
আমার কৌশলপাকে ভীম যদি মরে
অনায়াসে যুধিষ্ঠিরে মারি তার পরে।'
কুচক্র করিয়া তবে দুষ্ট দুর্যোধন
নদীতীরে উৎসবের করে আয়োজন—
একশত পাঁচ ভাই মিলি একসাথে
আমোদ আহ্লাদে ভোজে মহানন্দে মাতে।
হেন ফাঁকে দুর্যোধন পরম যতনে
বিষের মিষ্টান্ন দেয় ভীমের বদনে।
অচেতন হল ভীম বিষের নেশায়
সুযোগ বুঝিয়া দুষ্ট ধরিল তাহায়
গোপনে নদীর জলে দিল ভাসাইয়া
কেহ না জানিল কিছু উৎসবে মাতিয়া॥

এদিকে নদীর জলে ডুবিয়া অতল তলে
ভীমের অবশ দেহ, কেমনে জানে না কেহ,
কোথায় ঠেকিল শেষে বাসুকী নাগের দেশে।
ভীমের বিশাল চাপে নাগের বসতি কাঁপে
দেহভারে কত মরে, কত পলাইল ডরে
কত নাগ দলে দলে ভীমেরে মারিতে চলে
দংশিয়া ভীমের গায় মহাবিষ ঢালে তায়।
অদ্ভুত ঘটিল তাহে ভীম চক্ষু মেলি চাহে
বিষে হয়ে বিষক্ষয় মুহূর্তে চেতনা হয়,
দেখে ভীম চারিপাশে নাগেরা ঘেরিয়া আসে।
দেখিয়া ভীষণ রাগে ধরি শত শত নাগে
চূর্ণ করে বাহবলে, মহাভয়ে নাগ দলে
ছুটে যায় হাহাকারে বাসুকী রাজার দ্বারে।
বাসুকী কহেন, 'শোনো আর ভয় নাই কোনো,
তুষি তারে সুবচনে আনো হেথা সযতনে।'
রাজার আদেশে তবে আবার ফিরিয়া সবে
করে গিয়া নিবেদন বাসুকীর নিমন্ত্রণ।
শুনি ভীম কুতূহলে রাজার পুরীতে চলে,
সেথায় ভরিয়া প্রাণ, করিয়া অমৃত পান,
বিষের যাতনা আর কিছু না রহিল তার,
মহাঘুমে ভরপুর সব ক্লান্তি হল দূর।
তখন বাসুকী তারে স্নেহভরে বারে বারে
আশিস করিয়া তায় পাঠাইল হস্তিনায়।
সেথা ভাই পরিজনে আছে শোকাকুল মনে,
কুন্তীর নয়নজল ঝরে সেথা অবিরল,
মগন গভীর দুখে ফিরে সবে ম্লান মুখে।
হেন কালে হারানিধি সহসা মিলাল বিধি,
বিষাদ হইল দূর জাগিল হস্তিনাপুর,
উল্লসিত কলরবে আনন্দে মাতিল সবে॥

সন্দেশ—অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৩১

অতীতের ছবি

১

ছিল এ-ভারতে এমন দিন
মানুষের মন ছিল স্বাধীন ;
সহজ উদার সরল প্রাণে
বিস্ময়ে চাহিত জগত পানে
আকাশে তপন তারকা চলে,
নদী যায় ভেসে, সাগর টলে,
বাতাস ছুটিছে আপন কাজে,
পৃথিবী সাজিছে নানান্ সাজে ;
ফুলে ফলে ছয় ঋতুর খেলা,
কত রূপ কত রঙের মেলা ;
মুখরিত বন পাখির গানে,
অটল পাহাড় মগন ধ্যানে ;
নীলাকাশে ঘন মেঘের ঘটা,
তাহে ইন্দ্রধনু বিজলী ছটা,
তাহে বারিধারা পড়িছে ঝরি—
দেখিত মানুষ নয়ন ভরি।
কোথায় চলেছে কিসের টানে
কোথা হতে আসে, কেহ না জানে।
ভাবিত মানব দিবস-যামী,
ইহারি মাঝারে জাগিয়া আমি,
কিছু নাহি বুঝি কিছু না জানি,
দেখি দেখি আর অবাক মানি।
কেন চলি ফিরি কিসের লাগি
কখন ঘুমাই কখন জাগি,
কত কান্না হাসি দুখে ও সুখে
ক্ষুধা তৃষ্ণা কত বাজিছে বুকে।
জন্ম লভি জীব জীবন ধরে,
কোথায় মিলায় মরণ পরে ?
ভাবিতে ভাবিতে আকুল প্রাণে
ডুবিত মানব গভীর ধ্যানে।

অকূল রহস্য তিমিরতলে,
জ্ঞানজ্যোতির্ময় প্রদীপ জ্বলে,
সমাহিত চিতে যতন করি
চলেছে একেরই শাসন মানি,
লোকে লোকান্তরে একেরই বাণী।
এক সে অমৃতে হয়েছে হারা
নিখিল জীবন-মরণ ধারা।
সে অমৃতজ্যোতি আকাশ ঘেরি,
অন্তরে বাহিরে অমৃত হেরি।
যাঁহা হতে জীব জনম লভে,
যাঁহা হতে ধরে জীবন সবে,
যাঁহার মাঝারে মরণ পরে
ফিরি পুন সবে প্রবেশ করে
তাঁহারে জানিবে যতন ধরি
তিনি ব্রহ্ম তাঁরে প্রণাম করি।
আনন্দেতে জীব জনম লভে
আনন্দে জীবিত রয়েছে সবে ;
আনন্দে বিরাম লভিয়া প্রাণ
আনন্দের মাঝে করে প্রয়াণ।
শুন বিশ্বলোক, শুনহ বাণী
অমৃতের পুত্র সকল প্রাণী,
দিব্যধামবাসী শুনহ সবে—
জেনেছি তাঁহারে, যিনি এ ভবে
মহান পুরুষ, নিখিল গতি,
তমসার পরে পরম জ্যোতি ;
তেজোময় রূপ হেরিয়া তাঁরে
স্তব্ধ হয় মন, বচন হারে।
বামে ও দখিনে উপরে নীচে,
ভিতরে বাহিরে, সমুখে পিছে,

কিবা জলেস্থলে আকাশ পরে,
আঁধারে আলোকে চেতনে জড়ে ;
আমার মাঝারে, আমারে ঘেরি
এক ব্রহ্মময় প্রকাশ হেরি।
সে আলোকে চাহি আপন পানে
আপনারে মন স্বরূপ জানে।
আমি আমি করি দিবস-যামী,
না জানি কেমন কোথা সে 'আমি'।
অচঞ্চল শিখা সে আলো ধরি
দিব্য জ্ঞানময় নয়ন লভি,
হেরিল নূতন জগত ছবি।
অনাদি নিয়মে অনাদি স্রোতে
ভাসিয়া চলেছে অকূল পথে
প্রতি ধূলিকণা নিখিল টানে
এক হতে ধায় একেরই পানে
অজয় অমর অরূপ রূপ
নহি আমি এই জড়ের স্তূপ,
দেহ নহে মোর চির-নিবাস
দেহের বিনাশে নাহি বিনাশ।
বিশ্ব আত্মা মাঝে হয়ে মগন
আপন স্বরূপ হেরিলে মন
না থাকে সন্দেহ না থাকে ভয়
শোক তাপ মোহ নিমেষে লয়,
জীবনে মরণে না রহে ছেদ,
ইহ-পরলোকে না রহে ভেদ।
ব্রহ্মানন্দময় পরম ধাম,
হেথা আসি সবে লভে বিরাম ;
পরম সম্পদ পরম গতি,
লভ তাঁরে জীব যতনে অতি।

২

কালচক্রে হায় এমন দেশে
ঘোর দুঃখদিন আসিল শেষে।
দশদিক হতে আঁধার আসি
ভারত আকাশ ফেলিল গ্রাসি।
কোথা সে প্রাচীন জ্ঞানের জ্যোতি,
সত্য অন্বেষণে গভীর মতি ;
কোথা ব্রহ্মজ্ঞান সাধন ধন,
কোথা ঋষিগণ ধ্যানে মগন ;
কোথা ব্রহ্মচারী তাপস যত,
কোথা সে ব্রাহ্মণ সাধনা রত ?
একে একে সবে মিলাল কোথা,
আর নাহি শুনি প্রাচীন কথা।
মহামূল্য নিধি ঠেলিয়া পায়
হেলায় মানুষ হারাল তায়।
আপন স্বরূপ ভুলিয়া মন
ক্ষুদ্রের সাধনে হল মগন।
ক্ষুদ্র চিন্তা মাঝে নিয়ত মজি,
ক্ষুদ্র স্বার্থ-সুখ জীবনে ভজি ;
ক্ষুদ্র তৃপ্তি লয়ে মূঢ়ের মতো
ক্ষুদ্রের সেবায় হইল রত।
রচি নব নব বিধি-বিধান
নিগড়ে বাঁধিল মানব প্রাণ ;
সহস্র নিয়ম নিষেধ শত,
তাহে বদ্ধ নর জড়ের মতো ;
লিখি দাসখত ললাটে তার
রুদ্ধ করি দিল মনের দ্বার।
জ্বলন্ত যাঁহার প্রকাশ ভবে
হায় রে তাঁহারে ভুলিল সবে ;
কল্পনার পিছে ধাইল মন,
কল্পিত দেবতা হইল সৃজন,
কল্পিত রূপের মুরতি গড়ি,
মিথ্যা পূজাচার রচন করি,
ব্যাখ্যা করি তার মহিমা শত,
মিথ্যা শাস্ত্রবাণী রচিল কত।
তাহে তপ্ত হয়ে অবোধ নরে
রহে উদাসীন মোহের ভরে
না জাগে জিজ্ঞাসা অলস মনে,
দেখিয়া না দেখে পরম ধনে।
ব্রাহ্মণেরে লোকে দেবতা মানি
নির্বিচারে শুনে তাহারি বাণী।
পিতৃপুরুষের প্রসাদ বরে

বসি উচ্চাসনে গরব ভরে
পূজা-উপচার নিয়ত লভি
ভুলিল ব্রাহ্মণ নিজ পদবী।
কিসে নিত্যকাল এ ভারতভবে
আপন শাসন অটুট রবে
এই চিন্তা সদা করি বিচার
হল স্বার্থপর হৃদয় তার।
ভেদবুদ্ধিময় মানব মন
নব নব ভেদ করে সৃজন।
জাতিরে ভাঙিয়া শতধা করে,
তাহার উপরে সমাজ গড়ে ;
নানা বর্ণ নানা শ্রেণী বিচার,
নানা কূটবিধি হল প্রচার।
ভেদ বুদ্ধি কত জীবন মাঝে
অশনে বসনে সকল কাজে,
ধর্ম অধিকারে বিচার ভেদ
মানুষে মানুষে করে প্রভেদ।
ভেদ জনে জনে, নারী ও ঘরে,
জাতিতে জাতিতে বিচার ঘরে।
মিথ্যা অহংকারে মোহের বশে
জাতির একতা বাঁধন খসে ;
হয়ে আত্মঘাতী ভারতভবে
আপন কল্যাণ ভুলিল সবে।

৩

এখনো গম্ভীর তমসা রাতি,
ভারত ভবনে নিভেছে বাতি—
মানুষ না দেখি ভারতভূমে,
সবাই মগন গভীর ঘুমে।
কত জাতি আজ হেলার ভরে
হেথায় আসিয়া বসতি করে।
ভারতের বুকে নিশান গাঁথি
বসেছে সবলে আসন পাতি।
নিজ ধনবান নিজ বিভব
বিদেশীর হাতে সঁপিয়া সব,
ভারতের মুখে না ফুটে বাণী,
মৌন রহে দেশ শরম মানি।
—হেনকালে শুন ভেদি আঁধার
সুগম্ভীর বাণী উঠিল কার—
"ভাব সেই একে ভাবহ তাঁরে,
জলে স্থলে শূন্যে হেরিছ যাঁরে ;
নিয়ত যাঁহার স্বরূপ ধ্যানে
দিব্য জ্ঞান জাগে মানব প্রাণে।
ছাড় তুচ্ছ পূজা জড়-সাধন,
মিথ্যা দেবসেবা ছাড় এখন ;
বেদান্তের বাণী স্মরণ কর,
ব্রহ্মজ্ঞান-শিখা হৃদয়ে ধর।
সত্য মিথ্যা দেখ করি বিচার
খুলি দাও যত মনের দ্বার।
মানুষের মতো স্বাধীন প্রাণে
নির্ভয়ে তাকাও জগত পানে—
দিকে দিকে দেখ ঘুচিছে রাতি,
দিকে দিকে জাগে কত না জাতি ;
দিকে দিকে লোক সাধনারত
জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলেছে কত।
নাহি কি তোমার জ্ঞানের খনি!
বেদান্ত-রতন মুকুটমণি?
অসারে মজে কি ভুলেছ তুমি
ধর্মে গরীয়ান ভারতভূমি?"
—শুনি মৃতদেশ পরান পায়,
বিস্ময়ে মানুষ ফিরিয়া চায়।
দেখে দিব্যরূপ পুরুষবরে
কান্তি তেজোময় নয়ন হরে,
সবল শরীর সুঠাম অতি,
ললাট প্রসর, নয়নে জ্যোতি,
গম্ভীর স্বভাব, বচন ধীর,
সত্যের সংগ্রামে অজেয় বীর ;
অতুল প্রখর প্রতিভাবরে
নানা শাস্ত্র ভাষা বিচার করে।
রামমোহনের[১] জীবন স্মরি,

কৃতজ্ঞতা ভরে প্রণাম করি।
দেশের দুর্গতি সকলখানে
হেরিয়া বাজিল রাজার প্রাণে।
কত অসহায় অবোধ নারী
সতীত্বের নামে সকল ছাড়ি,
কেহ স্ব-ইচ্ছায়, কেহ-বা ভয়ে,
শাসনে-তাড়নে পিষিত হয়ে,
পতির চিতায় পুড়িয়া মরে—
শুনি কাঁদে প্রাণ তাদের তরে।
নারীদুঃখ নাশ করিল পণ,
ঘুচিল নারীর সহমরণ।
নিষ্কাম করম-যোগীর মতো
দেশের কল্যাণ সাধনে রত,
নানা শাস্ত্রবাণী করে চয়ন,
দেশ-দেশান্তের ঋষিবচন;
পশ্চিমের নব জ্ঞানের বাণী
দেশের সমুখে ধরিল আনি।
কিরূপেতে পুন এ ভারতভবে
ব্রহ্মজ্ঞান কথা প্রচার হবে,
নিয়ত যতন তাহারি তরে,
কত শ্রম কত প্রয়াস করে;
তর্ক আলোচনা, কত বিচার
কত গ্রন্থ রচি করে প্রচার;
—ক্রমে বিনাশিতে জড়-ধরম
'ব্রহ্ম সমাজে'র হল জনম!
শুনে দেশবাসী নূতন কথা,
মুরতিবিহীন পূজার প্রথা;
উপাসনা-গৃহ দেখে নূতন
যেথায় স্বদেশী-বিদেশী জন
শূদ্র দ্বিজ আদি মিলিয়া সবে
নির্বিচারে সবে আসন লভে।
মহাপুরুষের বিপুল শ্রমে
দেশে যুগান্তর আসিল ক্রমে।
স্বদেশের তরে আকুল প্রাণ
প্রবাসেতে রাজা করে প্রয়াণ;

সেথায় সুদূর বিলাতে হায়
অকালেতে রাজা ত্যজিল কায়।
অসমাপ্ত কাজ রহিল পড়ে,
ফিরে যায় লোকে নিরাশা ভরে;
একে একে সব যেতেছে চলে—
ভাসে রামচন্দ্র[২] নয়নজলে।
রাজার জীবন নিয়ত স্মরি'
উপাসনা-গৃহে রহে সে পড়ি,
নিয়ম ধরিয়া পূজার কালে
নিষ্ঠাভরে সেথা প্রদীপ জ্বালে।
একা বসি ভাবে, রাজার কাজ
এমন দুর্দিনে কে লবে আজ?

৪

ধনী যুবা এক শ্মশান ঘাটে
একা বসি তার রজনী কাটে।
অদূরে অন্তিম শয়নোপরি
দিদিমা তাহার আছেন পড়ি,
সমুখে পূর্ণিমা গগনতলে,
পিছনে শ্মশানে আগুন জ্বলে,
তাহারি মাঝারে নদীর তীরে
হরিনাম ধ্বনি উঠিছে ধীরে।
একাকী যুবক বসিয়া কূলে
সহসা কি ভাবি আপনা ভুলে।
প্রসন্ন আকাশ চাঁদিম রাতি
ধরিল অপূর্ব নূতন ভাতি,
তুচ্ছ বোধ হল ধন-বিভব
বিলাস বাসনা অসার সব,
অজানা কি যেন সহসা স্মরি
পলকে পরান উঠিল ভরি।
আর কি সে মন বিরাম মানে?
গভীর পিপাসা জাগিল প্রাণে।
কোথা শান্তি পাবে ব্যাকুল তৃষা
শুধায় সবারে না পায় দিশা।

—সহসা একদা তাহার ঘরে
ছিন্নপত্র এক উড়িয়া পড়ে ;
কি যেন বচন লিখিত তায়
অর্থ তার যুবা ভাবি না পায়।
বিদ্যাবাগীশের নিকটে তবে
যুবা সে বাণীর মরম লভে—
"যাহা কিছু এই জগততলে
অনিত্যের স্রোতে ভাসিয়া চলে
ব্রহ্মে আচ্ছাদিত জানিবে তায়"—
শুনিয়া যুবক প্রবোধ পায়।
শুনি মহাবাণী চমক লাগে,
আরো জানিবারে বাসনা জাগে ;
ব্রহ্মজ্ঞান লাভে পিপাসু মন
গভীর সাধনে হল মগন ;
যত ডোবে আরো ডুবিতে চায়—
ডুবি নব নব রতন পায়।
হেনকালে হল অশনিপাত—
যুবকের পিতা দ্বারকানাথ,
অতুল সম্পদ ধন বিভব
ঋণের পাথারে ডুবায়ে সব
কিছু না বুঝিতে জানিতে কেহ
অকালে সহসা ত্যজিল দেহ।
আত্মীয়-স্বজন কহিল সবে,
"যে উপায়ে হোক বাঁচিতে হবে—
কর অস্বীকার ঋণের দায়
নহিলে তোমার সকলি যায়।"
নাহি টলে তায় যুবার মন,
পিতৃঋণ শোধ করিল পণ,
হয়ে সর্বত্যাগী ফকির দীন
ছাড়ি দিলে সব শোধিতে ঋণ।
উত্তমর্ণজনে অবাক মানি
কহে শ্রদ্ধাভরে অভয় বাণী,
"বিষয় বিভব থাকুক তব,
মোরা তাহা হতে কিছু না লব।
সাধুতা তোমার তুলনাহীন ;
সাধ্যমতো তুমি শুধিয়া ঋণ।"

বরষের পরে বরষ যায়,
যুবক এখন প্রবীণ-প্রায়।
সংসারে বাসনা-বিগত মন,
ঋষিকল্পরূপ ধ্যানে মগন,
ব্রহ্ম-ধ্যান-জ্ঞানে পূরিত প্রাণ,
ব্রহ্মানন্দ রস করিছে পান ;
বচনেতে যেন অমৃত ঝরে—
নমি নমি তারে ভকতি ভরে।
ব্রাহ্মসমাজের আসন হতে
দীপ্ত অগ্নিময় বচন স্রোতে
ব্রহ্মজ্ঞান ধারা বহিয়া যায়,
কত শত লোকে শুনিতে ধায়।
"ব্রহ্মে কর প্রীতি নিয়ত সবে,
প্রিয়কার্য তাঁর সাধহ ভবে।
হের তাঁরে নিজ হৃদয় মাঝে,
সেথা ব্রহ্মজ্যোতি নিয়ত রাজে।
জ্ঞানসমুজ্জ্বল বিমল প্রাণে,
যে জানে তাঁহারে ধ্রুব সে জানে।
জানিবার পথ নাহিক আর,
নহে শাস্ত্রবাণী প্রমাণ তার।
বহু তর্ক বহু বিচার বলে
বহু জপ তপ সাধন ফলে
বহু তত্ত্বকথা আলোড়ি চিতে
নাহি পায় সেই বচনাতীতে।"
ব্রাহ্মসমাজের অসাড় প্রাণে,
মহর্ষির[৩] বাণী চেতনা আনে।
দলে দলে লোক সেথায় ছোটে
উৎসাহের স্রোতে আসিয়া জোটে।
মত্ত অনুরাগে কেশব[৪] ধায়,
প্রতিভার জ্যোতি নয়নে ভায় ;
আকুল আবেগে পরান খুলি
ঝাঁপ দিল স্রোতে আপনা ভুলি।
হেরি মহর্ষির পুলক বাড়ে,
'ব্রহ্মানন্দ' নাম দিলেন তারে।
লভি নব প্রাণ সমাজ-কায়
নব নব ভাবে বিকাশ পায় ;

ধর্মগ্রন্থ নব, নব সাধন,
ব্রহ্ম উপাসনা বিধি নূতন,
ধর্মপ্রাণ কত নারী ও নরে
তাহে নিমগন পুলক ভরে।

সমাজে সুদিন এল আবার,
ক্রমে প্রসারিল জীবন তার।
কেশব আপন প্রতিভা বলে
যতনে গঠিল যুবকদলে।
নগরে নগরে হল প্রচার—
"ধর্মরাজ্যে নাহি জাতিবিচার ;
নাহি ভেদ হেথা নারী ও নরে,
ভক্তি আছে যার সে যায় তরে।
জাতিবর্ণ-ভেদ কুরীতি যত
ভাঙি দাও চিরদিনের মতো।
দেশ-দেশান্তরে ধাউক মন,
সর্বধর্মবাণী করো চয়ন ;
ধর্মে ধর্মে নাহি বিরোধ রবে,
মহা সমন্বয় গঠিত হবে!"
পশিল সে বাণী দেশের প্রাণে,
মুগ্ধ নরনারী অবাক মানে!
নগরে নগরে তুফান উঠে,
ঘরে ঘরে কত বাঁধন টুটে ;
ব্রহ্ম নামে সবে ছুটিয়া চলে,
প্রাণ হতে প্রাণে আগুন জ্বলে।
আসিল গোঁসাই[৫] ব্যাকুল হয়ে
প্রেমে ভরপুর ভকতি লয়ে।
আসিল প্রতাপ[৬] স্বভাব ধীর,
গম্ভীর বচন জ্ঞানে গভীর।
স্বল্পভাষী সাধু অঘোরনাথ[৭]
যোগমগ্ন মন দিবসরাত।
গৌরগোবিন্দের[৮] সাধক প্রাণ
হিন্দুশাস্ত্রে তাঁর অতুল জ্ঞান।
কান্তিচন্দ্র[৯] সদা সেবায় রত
সেবাধর্ম তাঁর জীবন-ব্রত।

ত্রৈলোক্যনাথের[১০] সরস গান
নব নব ভাবে মাতায় প্রাণ।
আরো কত সাধু ধরমমতি
বঙ্গচন্দ্র[১১] আদি প্রচার-ব্রতী
একসাথে মিলি প্রেমের ভরে
প্রেমপরিবার গঠন করে।
কাল কিবা খাবে কেহ না জানে,
আকুল উৎসাহ সবার প্রাণে।
নূতন মন্দির নব সমাজ
নব ভাবে কত নূতন কাজ।
দিনে দিনে নব প্রেরণা পায়,
উৎসাহের স্রোত বাড়িয়া যায়।
সমাজ-চালনা বিধি-বিচার
কেশবের হাতে সকল ভার ;
কেশবপ্রেরণা সবার মূলে
তাঁর নামে সবে আপনা ভুলে।
ধন্য ব্রহ্মানন্দ যাঁহার বাণী
শিরে ধরে লোকে প্রমাণ মানি।
যাঁহার সাধনা আজিও হেরি
রয়েছে সমাজ জীবন ঘেরি,
যাঁহার মূরতি স্মরণ করি,
যাঁহার জীবন হৃদয়ে ধরি,
শত শত লোক প্রেরণা পায়—
আজি ভক্তিভরে প্রণমি তায়।
আবার বহিল নূতন ধারা,
সমাজের প্রাণে বাজিল সাড়া ;
ভাসি বহুজনে সে নব স্রোতে
বাহির হইল নূতন পথে।
মিলি অনুরাগে যতন ভরে
এই 'সাধারণ' সমাজ গড়ে।
ওদিকে কেশব নূতন বলে
বাঁধিল আবার আপন দলে।
নব ভাবে 'নববিধান' গড়ি,
নূতন সংহিতা রচনা করি,
ভগ্নদেহ লয়ে অবশপ্রায়,
খাটিতে খাটিতে ত্যজিল কায়।

ধরি নব পথ নূতন ধারা
নবীন প্রেরণে আসিল যারা
আজি তাঁহাদের চরণ ধরি
ভক্তিভরে সবে স্মরণ করি।
শাস্ত্রী শিবনাথ সকল ফেলি
বিষয় বাসনা চরণে ঠেলি
বহু নির্যাতন বহিয়া শিরে,
অনুরাগে ভাসি নয়ন নীরে,
সর্বত্যাগী হয়ে ব্যাকুল প্রাণে
ছুটে আসে ঐ কিসের টানে ?
দেখ এই চলে পাগলমতো
ভক্তশ্রেষ্ঠ বীর বিনয়নত,
বিজয় গোঁসাই সরল প্রাণ—
হেরি আজি তাঁর প্রেম বয়ান।
সাধু রামতনু[১২] জ্ঞানে প্রবীণ
শিশুর মতন চির নবীন।
শিবচন্দ্র দেব সুধীর মন,
কর্মনিষ্ঠায় সাধু জীবন।
নগেন্দ্রনাথের[১৩] সুর্কতি বাণে
কূট তর্ক যত নিমেষে হানে।
আনন্দমোহন[১৪] প্রেমে উদার
আনন্দ মোহন মূরতি যার।
উমেশচন্দ্রের[১৫] জীবন মন,
নীরব সাধনে সদা মগন।
দুর্গামোহনের[১৬] জীবনগত
সমাজের সেবা দানের ব্রত।
দ্বারকানাথের[১৭] স্মরণ হয়
ন্যায়ধর্মে বীর অকুতোভয়।
পূর্ববঙ্গে হোথা সাধক কত
নবধর্মবাণী প্রচারে রত।
সংসারে নির্লিপ্ত ভাবুক প্রাণ
সার্থক প্রচারে কালীনারাণ[১৮]—
কত নাম কব, কত যে জ্ঞানী,
কত ভক্ত সাধু যোগী ও ধ্যানী ;
কত মধুময় প্রেমিক মন,
আড়ম্বরহীন সেবকজন ;
আসিল হেথায় আকাশ ভরে
সবার যতনে সমাজ গড়ে।
এই যে মন্দির, হেরিছ যার
ইঁটকাঠময় স্থূল আকার ;
ইহারই মাঝারে কত যে স্মৃতি,
কত অকিঞ্চন সমাজপ্রীতি,
ব্যাকুল ভাবনা দিবসরাত
বিনিদ্র সাধনে জীবনপাত।
বহু কর্মময় এই সমাজ,
সে-সব কাহিনী না কব আজ—

আজিকে কেবল স্মরণে আমি
ব্রাহ্মসমাজের মহান বাণী।
যে বাণী শুনিনু রাজার মুখে,
মহর্ষি যাহারে ধরিল বুকে,
কেশব যে বাণী প্রচার করে—
স্মরি আজ তাহা ভকতি ভরে।
রক্তাক্ষরে লিখা যে-বাণী রটে
এই সমাজের জীবনপটে—
"স্বাধীন মানবহৃদয়তলে—
বিবেকের শিখা নিয়ত জ্বলে।
গুরুর আদেশ সাধুর বাণী
ইহার উপরে কারে না মানি।"
স্বাধীন মনের এই সমাজ
মুক্ত ধর্মলাভ ইহার কাজ।
হেথায় সকল বিরোধ ঘুচি
রবে নানা মত নানান্ রুচি,
কাহারো রচিত বিধি বিধান
রুধিবে না হেথা কাহারো প্রাণ।
প্রতি জীবনের বিবেক ভাতি
সবার জীবনে জ্বলিবে বাতি।
নরনারী হেথা মিলিয়া সবে
সম অধিকারে আসন লভে।
'প্রেমেতে বিশাল, জ্ঞানে গভীর
চরিত্রে সংযত, করমে বীর ;
ঈশ্বরে ভকতি, মানবে প্রীতি,'—
হেথা মানুষের জীবন নীতি।
ফুরাল কি সব হেথায় আসি ?
আসিবে না প্রেম জড়তা নাশি ?
জাগিবে না প্রাণ ব্যাকুল হয়ে,
নব নব বাণী জীবনে লয়ে ?
জ্বলিবে না নব সাধন শিখা ?
নব ইতিহাস হবে না লিখা ?
চিররুদ্ধ রবে পূজার দ্বার ?
আসিবে না নব পূজারি আর ?
কোথাও আশার আলো কি নাহি ?
শুধাই সবার বদন চাহি।

---

১ রামমোহন রায় ২ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ৩ দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর ৪ কেশবচন্দ্র সেন ৫ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামি ৬ প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার ৭ অঘোরনাথ গুপ্ত ৮ গৌরগোবিন্দ রায় ৯ কান্তিচন্দ্র মিত্র ১০ ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ১১ বঙ্গচন্দ্র রায় ১২ রামতনু লাহিড়ী ১৩ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৪ আনন্দ-মোহন বসু ১৫ উমেশচন্দ্র দত্ত ১৬ দুর্গামোহন দাস ১৭ দ্বারকা-নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮ কালীনারায়ণ গুপ্ত